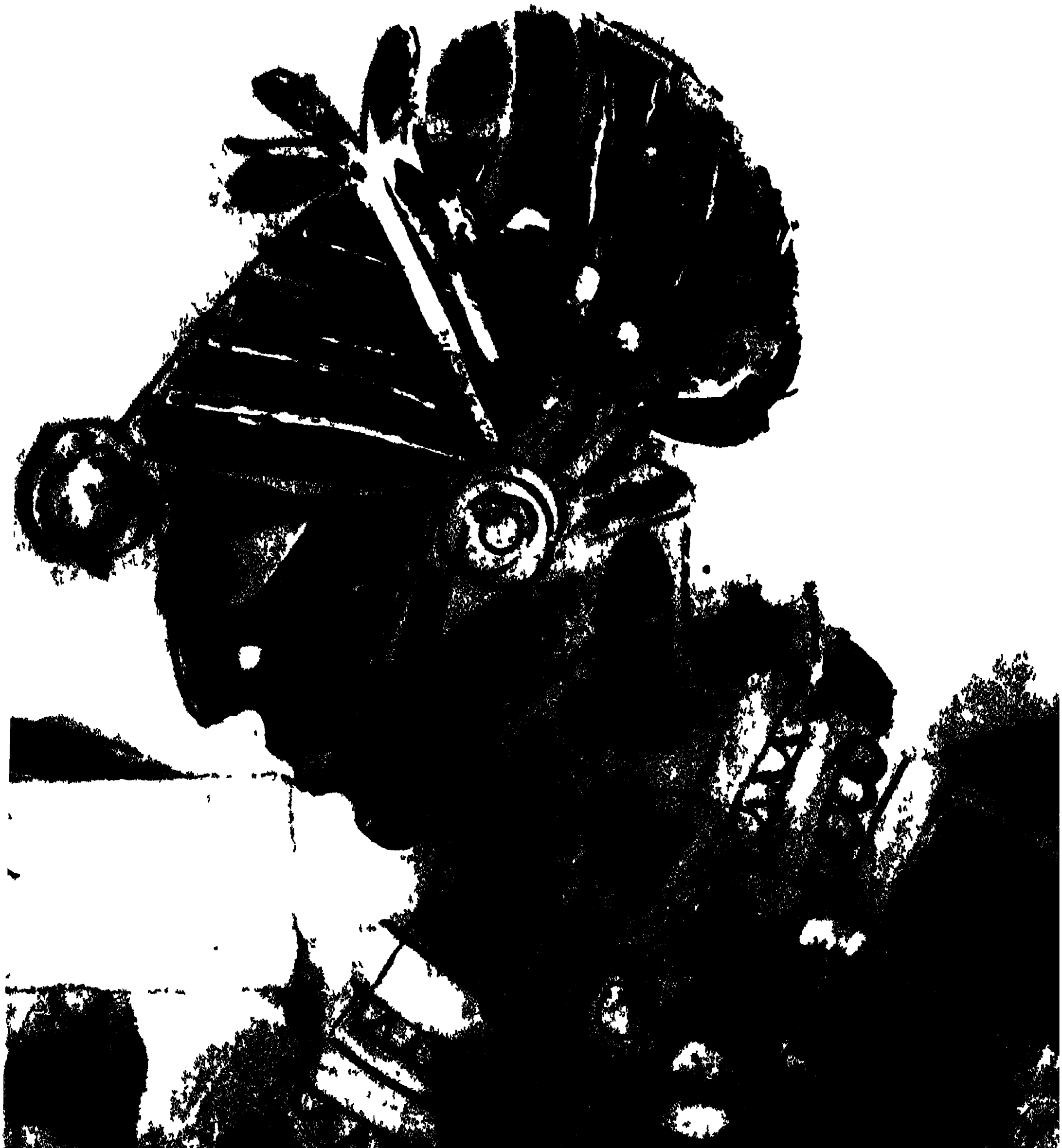
রঙ্গনটী গল্পকথা

সম্পাদনা বিষ্ণু বসু ও অশোককুমার মিত্র



রঙ্গনটী গল্পকথা
রঙ্গনটী গল্পকথা
রঙ্গনটী গল্পকথা
রঙ্গনটী গল্পকথা
রঙ্গনটী গল্পকথা
রঙ্গনটী গল্পকথা
রঙ্গনটী গল্পকথা
রঙ্গনটী গল্পকথা

রঙ্গনটী গল্পকথা



সম্পাদনা

বিষ্ণু বসু ▫ অশোককুমার মিত্র

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

[illegible] Public Library
[illegible] Com. [illegible]
[illegible] Com. [illegible]
68624

RANGANATI GALPOKATHA

An anthology of Bengali Love Stories

Edited By

Bishnu Basu & Asoke Kumar Mitra

ISBN No 81-7332-444-X

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
প্রণবেশ মাইতি

পুনশ্চ ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জি রোড কলকাতা-৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত

শঙ্করীভূষণ নায়ক-কে



আমাদের কথা

সংকলনের নামেই স্বপ্রকাশ কাদের গল্প নিয়ে এই গল্পসংগ্রহ। শুধু একটি বলার কথা, রঙ্গ-নটী বলতে কেবলমাত্র জনপদবধূ বারবনিতাদের কথামালাই এখানে গাঁথা হয় নি, একই সঙ্গে গাঁথা হয়েছে অন্য বধূদের কথাও। এমনকি সমাজের উঁচুতলার মহিলাদের কথাও যারা বারাঙ্গনা না হয়েও প্রকৃত অর্থে ভ্রষ্টা—বহুগামিতার পঙ্কতিলক যাদের কপালে আঁকা।

একথা অবশ্য সবার জানা, পতিতাবৃত্তি মানব সমাজের আদিমতম পেশা। সভ্য সমাজের ঘৃণা ও পরিহার্যতা সত্ত্বেও চিরবহমান। তাই কলুষ কালিমা মাখা এই মানুষগুলি আমাদের জীবনের লজ্জা ও গ্লানিও। এ পেশায় যারা যুক্ত তারা কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ পরেচ্ছায়, কেউ অবস্থা বিপর্যয়ে এ পথ বেছে নিয়েছে। কেউ রয়েছে পুরুষানুক্রমে, কেউ এখানে নবাগতা, অন্ধকার জগতের কলঙ্ক তাদের অপবিত্র করেছে। রাতের পর রাত এক গ্লানিময় জীবন কাটিয়ে তারা ক্রমশ আলোর পৃথিবী থেকে আরও অন্ধকারময় জগতে নির্বাসিত হয়েছে। তাই তাদের স্বপ্নে আলোক ছন্দ বাজে না। এই নরকের জীবন যে তাদের নিয়তি —এই অন্ধবিশ্বাসে কত জীবন কেটে গেছে। বদ্ধমূল বিশ্বাসে কোনো চিড় ধরে নি। তবু তারই মাঝে কখনো একচিলতে আলোর রেখা দেখা দিলে রুনুঝুনু ছন্দে নেচেছে পুরো পল্লি, কখনও বা সে বন্ধ হওয়ায় বেজেছে মুক্তির সানাই। আবার সেই স্বপ্নের মাধুর্য ভেঙে প্রকাশিত নির্যাতনের পাশব তান্ডব। জীবন এমনি—জীবন সত্যও। তবে এ কাহিনিমালা পতিতা জীবনের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ নয়, বরং নানা গল্পের আলোছায়ায় রচিত খণ্ডচিত্রে সে জীবনের এক সার্মগ্রিক রূপ এখানে ফুটেছে। শুধুমাত্র অন্ধকার জীবনের ব্যভিচারের কাহিনিমালা নয়, এ সংকলনে রয়েছে নানা রসের সমাহার। আনন্দ-বেদনা, স্বপ্নপূরণ, আশাভঙ্গ, নির্মমতা-হাহাকার, সজল মানবিকতার দীর্ঘ মিছিল। এমনকি এখানে সংকলিত হয়েছে নিখাদ প্রেমের চন্দনগন্ধবহ কাহিনিও। আছে অন্ধকার জীবন ছেড়ে আলোকিত ভুবনে ফেরার আন্তর আকুতি।

নারী চরিত্রের অসংখ্য বৈচিত্র্যময় দিক উদঘাটিত হয়েছে সংগৃহীত গল্পমালায়। পুরুষ মানুষ কোথাও আপন তীব্র বাসনা-প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করতে কুল ভাঙিয়েছে কত কামিনীর, ফের কত নারী ওঁৎ পেতে পুরুষ শিকার করে তাদের ঘরছাড়া করেছে—এমন পরস্পরবিরোধী আলোকচ্ছটায় বিভাসিত এ কাহিনিমালা।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটোগল্পের জনক। তাঁর গল্প দিয়েই এই সংকলনের শুরু। ভাবলে অবাক লাগে, রবীন্দ্রনাথ সেকালেই তাঁর গল্পের পরিসীমা থেকে পতিতা চরিত্রকে বর্জন করেন নি, বরং একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গল্প লিখে গিয়েছেন। নব যৌবনের আনন্দে একদিন স্খলন ঘটেছিল মোহিতমোহনের। তিনি প্রতিবেশীর বিধবা কন্যাকে একদা অপহরণ করে তাকে পঙ্কময় জীবন গ্রহণে বাধ্য করেন। শুধুমাত্র একজন নয়, এপথে আরো অনেককে তিনি ঠেলেছেন। পরবর্তী জীবনে বিচারক মোহিতমোহনের আদেশে দণ্ডিতা এক বারবনিতার কাছে তাঁরই উপহার সযত্নে রক্ষিত দেখে "কলঙ্কিনী পতিতা রমনি তাঁহার সম্মুখে দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।"

আর এই সংকলনের শেষ গল্প এক তরুণ গল্পকারের যাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বয়সের ব্যবধান প্রায় এক শতাব্দীর। এঁদের মাঝখানে যাঁরা আছেন তাঁদের সৃজনকর্মে বাংলা গল্পভাণ্ডার বহু মূল্যবান সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে।

আসলে উনিশ শতকে বাঙালির চেতনার যে নতুন করে উন্মোচন ঘটেছিল তার একটি বড়ো অংশই জুড়ে ছিল রমণীসমাজ। লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে পরবর্তী দীর্ঘ সময় বাঙালির ভাবনার কেন্দ্রে ছিল নারী। এ সমাজ চেতনারই শিল্পগত প্রকাশ ঘটেছিল তার সাহিত্যে। নারীর এক বিস্ময়কর বিকাশ তাই দেখা যায় বাংলা কাব্যে, গল্পে ও উপন্যাসে। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী অথবা কপালকুণ্ডলা, এমনকি বিহারীলালের সারদাও এ নারীচেতনারই অভিব্যক্তি। তাই বিচিত্ররূপিণী রমণীকুল আমাদের সাহিত্যে বিপুল বিন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। এ সূত্র ধরেই আসছে সমাজের নানাধরনের নারীর অবস্থান বিষয়ক কাহিনি। প্রচুর রমণী সমাজের অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতে আলোড়িত হয়ে বিভিন্ন অবয়বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা হতে বাধ্য হয়েছে। 'বিচারক' এ অবস্থানেরই প্রথম না হলেও প্রধান প্রকাশ তো বটেই।

এ প্রবাহ ধরেই তারপর ক্রমশ আবির্ভূত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পের বিজলী যে একদিন সত্যকে আঘাত করে তার জন্য অনুশোচনা ও ধ্যানে নিমগ্ন থেকেছে। আবার নারীর শরীরগত বাণিজ্য নিয়ে পিতা ও পুত্রের মধ্যেও কমপিটিশন হতে পারে, তার ব্যঙ্গ মিশ্রিত ছবি এঁকেছেন বিভূতিভূষণ। এ বিষয়েরই ভিন্নতর বিন্যাস দেখা যায় আবুল ফজলের 'সিতারা'য়। ঘটনাচক্রে এক পতিতা মাতার ঘরে পুত্রের আগমন ও পতিতার উদ্ভাস প্রচণ্ড তীব্র ও বিষণ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পরশুরামের উর্বশী আবার নারীত্বের পৃথক আবাহনে মা 'মেহেরজানের মা' গল্পে মির্জা আবদুল হাই আবার তেমন এক রমণীর কথা তুলে ধরেছেন যে উদগ্র রক্ষীদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তথাকথিত পতিতা মেয়ে মেহেরজানের নামই আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। নারীচরিত্রের এও এক আশ্চর্য প্রকাশ। শুধু নারীচরিত্রের কেন, সমগ্র মনুষ্য চরিত্রেরই প্রতিবিম্ব হয়ে উঠতে পেরেছে মেহেরজানের মা।

শরদিন্দুর কবুতরী' আবার আলাদা অভিজ্ঞতার আস্বাদন। বরদাকে প্রলুব্ধ করতে এসে সাহেব ভূতের কাছে ধর্ষিতা হবার অবিশ্বাস্য বর্ণনাও নারীচরিত্রের এক উদ্ভাস হয়ে দেখা দেয়। আবার ইন্দ্রমিত্রের 'পরিণাম রমণীয়' আকস্মিক পরিণামও পাঠকদের সচকিত করে তোলে। প্রফুল্ল রায়ের 'নরকের পোকা'রা সমাজকে স্বর্গীয় করে তোলে। হুমায়ুন আহমেদের 'সংসার' এর নারীটিও সংসারের যাবতীয় মহত্ত্ব নিয়ে নিজেকে বিকশিত করে। মধুময় পাল স্বৈরিণী মোতিসুন্দরীকে শবযানের উপর মরণোত্তর সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

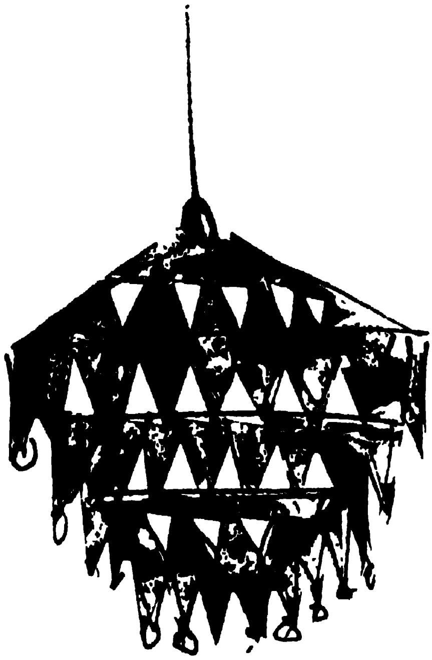
এভাবেই কেন্দ্রচ্যুত অথবা কেন্দ্রলগ্ন বিচিত্র সব রমণীদের নিয়েই সন্নিবেশিত হল 'রঙ্গনটী গল্পকথা।' বাংলা ভাষায় যাঁরা গল্প লিখে থাকেন তা ওপার বাংলায় হোক কী এপার বাংলায়, শহর কলকাতায় কী দূর মফসসলে - আমরা সর্বত্র আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিত করেছি। যাতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের গল্পটি নজর এড়িয়ে না যায়। ইতিপূর্বে বাংলায় এ ধরনের গল্প সংকলনের কিছু চেষ্টা হয়েছে বটে কিন্তু এমন ব্যাপক প্রেক্ষাপটে বাংলার গল্পভাণ্ডার ছেঁকে এনে কোনো সংকলন প্রস্তুত করা হয়নি। শুধু ব্যাপকতাই নয়, বিষয়বৈচিত্র্যেও এ সংকলনটি সমুজ্জ্বল।

এই সংকলনে গল্প প্রকাশে অনুমতি দেবার জন্য গল্পকার বা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিবার্য কারণে আমরা অনুমতি সংগ্রহ করতে পারি নি। আশা করি এই বিপুল উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তাঁরা অকৃত কর্মকে ক্ষমা করে দেবেন।

পুনশ্চ এ ধরনের বিশাল বিশাল আকারের নানা গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছেন। আশা করা যায় সেগুলির মতো এ সংকলনটিও পাঠক সমাজে সমাদৃত।

বিষ্ণু বসু
অশোককুমার মিত্র

সূচিপত্র





বিচারক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। ততদিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাঁধা একপ্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, অনেক ভালোমন্দ, অনেক সুখদুঃখ জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তখন নূতন প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরো প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবনলাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে কিন্তু জরাবিহীন অন্তরপ্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতররূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোকতাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত চিরপরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয় নূতন পরিচয় নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয় তখনো যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই সংসারে তাহার মতো শোচনীয় আর কেহ নাই

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বাড়ি ভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই — তিন বৎসরের শিশুপুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই — যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার ও মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই যখন তাহার মনে পড়িল, আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে, তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারংবার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল— সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া 'ক্ষীরো ক্ষীরো' শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটাহস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কণ্ঠে 'মা মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোরুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া নিকটবর্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে সেশনে চালান করিয়া দিলেন

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

জজ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাটুটারি সিভিলিয়ান। তাহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে , এক দিকে তিনি হিন্দুমহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপর দিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাহার এরূপ বিশ্বাসের কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি, মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুরধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে , কিন্তু তখন তিনি সোনার চশমায়, গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেশবিন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতনসংস্করণ কার্তিকটির মতো ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল মদ্যমাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরো দুটো একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনেরোয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের বিচ্ছেদবশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্তী পরমরহস্যময় প্রমোদবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎ যন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন— সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত, সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ, সম্মুখবর্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবর্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষত, তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবনসমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল সমস্ত নীলাম্বর তাহারই হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্মকোষের চতুর্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপড়িগুলির মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট-ইস্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাস্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জন ঘরের বাতায়নে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোকচলাচল দেখিত , ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত, তাহাই শুনিত , এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন এবং ফেরিওয়ালারা যে জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে— উহারা যেন এই লোকচলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মাত্র।

আর, সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটি-বেশধারী গর্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মতো মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশ সুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকল প্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত, মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্তকীর নূপুরনিক্বণ এবং বামাকণ্ঠের সংগীতধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃৎপিণ্ড পিঞ্জরের পক্ষীর মতো বক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশীকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক, ছায়া ও সংগীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানস পুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জীবন-যৌবন সুখ দুঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মতো পুড়াইয়া সেই নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না তাহার সম্মুখবর্তী ঐ হর্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি গ্লানি পঙ্কিলতা বীভৎস ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন তাহাকে 'বিনোদচন্দ্র' নামক মিথ্যা স্বাক্ষরে বারংবার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্ক, উৎকণ্ঠিত, অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগপূর্ণ উত্তর পাইল, এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে উল্লাসে সংকোচে সন্দেহে সম্ভ্রমে আশায় আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পরে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎসংসার বিধবার চারি দিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মতো কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং অবশেষে কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, সে-সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র-ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল, তখন সে লজ্জায় ধিক্‌কারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল, বলিল, 'ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এসো।' মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল . গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশীর মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না ; মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসে ; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার

মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পানসাজা, চুলবাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা-করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা— এ সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মতো বোধ হইতে লাগিল , বুঝিতে পারিল না, এ-সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে।

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের, তাহা ইতিপূর্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচে নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোনখানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটোখাটো ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে তখন সেখানে সহসা কী লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে— কী লাঞ্ছনা, কী হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল সকরুণ অনুনয়সহকারে বলিতে লাগিল, 'এখনো রাত আছে। আমার মা আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস ' কিন্তু তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না , এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণরথে চড়িয়া আর এক পথে প্রস্থান করিলেন রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

মোহিতমোহনের পূর্ব ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে 'একঘেয়ে' হইয়া উঠে এইজন্য অন্যগুলি বলিলাম না।

এখন সে সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে এমন কোনো লোক জগতে আছে কিনা সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন তিনি আহ্নিকতর্পণ করেন এবং সবদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য চন্দ্র মরুদগণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এককালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতে মনোমত তরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন , ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে। মৃত্যু সন্নিকট তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশের দ্বারা এখন ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করজোড়ে কহিল, 'ওগো জজবাবু, দোহাই তোমার ! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।'

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো ছিল— দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে, তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না , গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব।

প্রহরীকে কহিলেন, 'কই, আংটি দেখি।' প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির এক দিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপর দিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে- বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর-একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল : সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর-এক বার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ডালিম



চিত্তরঞ্জন দাশ

তখন আমার বয়স বেশ একটু হইয়া গিয়াছিল কিন্তু আমোদ প্রমোদ ছাড়ি নাই। ছাড়িও নাই, ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোনো কালেই মানুষ বড়ো ভালো ছিলাম না। সংসারের আমোদ আহ্লাদের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণের যোগ ছিল। আমার মনে হইত, কখনও যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা এক রজনীর উৎসবের মতো কাটাইয়া দিয়াছি। কখন আরম্ভ হইল কখন শেষ হইল, বুঝিতেও পারিলাম না। কোনো সুখ হইতে আপনাকে কখনো বঞ্চিত করি নাই, আর তার জন্য কোনো অনুশোচনাও হয় নাই। প্রাণের মাঝে যে একটা মুক্ত আকাশ, একটা অতল পাতাল আছে, তাহা তখন বুঝিতাম না। জীবনটা সবদাই এক বিশাল সমতল ভূমির মতো মনে হইত। জীবনের রাজপথে [illegible] হাসিতে হাসিতে ছুটাইতে চলিয়া যাইতাম। কখনও পায়ে একটা কাঁটাও লাগে নাই। কখনও প্রাণে দাগ বসে নাই। সকল আমোদ প্রমোদের মধ্যে বিনা চেষ্টায় সহজেই [illegible] ছিলাম। কিন্তু আজ [illegible] হইতে [illegible] আজ তার জন্য ভাবি। ভাবিয়া জীবন [illegible] হইয়াছে। [illegible] কথা। তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। [illegible] খুঁজিয়াছি [illegible] কোথাও পাই নাই। সে যে অদৃশ্যভাবে আমার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় [illegible] তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই, তাহাকে দেখিতে পাই না। [illegible] তাহাকে বুকের ভিতর পাই, [illegible] কোথায় মিলাইয়া যায়। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুঝি খুঁজিতে খুঁজিতেই কাটিয়া যাইবে। তাহাকে পাইব না? তবু আমি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

তাহার নাম জানি না, সকলে তাহাকে 'ডালিম' বলিয়া জানিত। সে দেখিতে সুন্দর কি কুৎসিত আমি এখনও [illegible] না। [illegible] আমার [illegible] প্রদীপের মতো জ্বলিতেছে। মাথায় অন্ধকারের মতো [illegible] চাহিবামাত্র আমার চোখ ছলছল করিয়া উঠিয়াছিল। [illegible] অনেক রমণীর সঙ্গে মিশিয়াছি, আমোদ প্রমোদ করিয়াছি কিন্তু এমন বিষাদের প্রতিমূর্তি, [illegible] আর কখনও দেখি নাই। [illegible] আর কখনও দেখিবও না।

সেদিন [illegible] কয়জন বন্ধু লইয়া বাগানে আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্ণবাবুর বাগান চাহিলেই [illegible] চাহিয়া লইতে ছিলাম। বাগানটি খুব বড়ো। ফটক হইতে সব একটা রাস্তা ধরিয়া অনেক [illegible] যাওয়া যায়। বাড়ির সামনেই একটা ঘাট বাঁধানো পুকুর। ঘাটের ঠিক উপরেই শান বাঁধানো [illegible] রাস্তা ধরিয়া, সেই লতামণ্ডপের ভিতর দিয়া, বাড়ির ভিতরে যাইতে হয়। সে দিন বন্দোবস্তের কোনো অভাব ছিল না। নানারকমের প্রচুর সুরা, নানারকমের খাবার, আলোয় আলোয় প্রমোদ মন্দির দিনের মতো জ্বলিতেছিল।

আমার পৌঁছিতে একটু দেরি হইয়াছিল। ফটকে নামিয়াই সেই সব রাস্তা। চাঁদের আলো খুব ক্ষীণ হইয়া ছায়ার মতো সব ঢাকিয়াছিল। নানা ফুলের গন্ধে, সেই ম্লানছায়ালোকে লতাপল্লবের মর্মরধ্বনিতে সেই সব রাস্তাটিকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে কী হইতেছিল, আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক পদধ্বনিতে কে যেন আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল। সে রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি, সেই বাগানে অনেক প্রমোদ রাত্রি কাটাইয়াছি কিন্তু সর্বদাই হালকা মনে ফুর্তি করিতে গিয়াছি। সেদিন আমার প্রাণে কোথা হইতে একটা ভার চাপিয়া ছিল, সে যে কেমন ভার, আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে সে বাড়িতে ঢুকিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে, গান হইতেছে, শুনিলাম। পরিচিত গায়িকা গাহিতেছে "চমকি চমকি যাও।" ঘুঙুরের শব্দ শুনিলাম। নৃত্যগীতে আমার মন নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সেদিন কী জানি কীসের ভারে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মতো আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম

তখনও নাচ হইতেছে। সেই গায়িকা হাত ঘুরাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে — "চমকি চমকি যাও।" আমাকে দেখিয়াই আমার বন্ধুরা সব চেঁচাইয়া উঠিল —"কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ দাদা আ—গিয়া।" একজন বলিল, "দাদা এই লাও, এক পাত্র চড়াও, আনন্দ কর।" আর একজন গান ধরিল, "এত গুণের বঁধু হে।" আমার এক বন্ধু উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল — "কাঁটা বনে তুলতে গিয়ে কলঙ্কেরি ফুল। ওগো সই কলঙ্কেরি ফুল।" আর একজন উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিল, 'দেখলে তারে আপনহারা হই।' আমার আর একজন বন্ধু একটা গেলাসে মদ ঢালিয়া আমার হাতে দিয়া গাহিলেন, "দাদা, হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়, ঠিক জানি কখন সন্ধ্যা হয়।" সবার হাতে মদের গেলাস, মদের গন্ধ, ফুলের সৌরভ, সিগারেটের ধূয়া, গানের ধ্বনি, সারেঙ্গের সুর, ঘুঙুরের শব্দ, তবলার চাঁটি। কিন্তু আমি যেন একটা অপরিচিত লোকে আসিয়া পৌঁছিলাম। অনেকবার এই প্রমোদে মন ভাসাইয়া আনন্দ করিয়াছি। সে দিন কে যেন আমার মনের ভিতর থাকে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল, এ সবই আমার নূতন অপরিচিত। হঠাৎ যেন কাহারা এই নূতন অপরিচিত লোকে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল — বিডন স্ট্রিটের সশালা, হাতিবাগানের নুরি পুতুল, কিরণ, বেড়াল হরি, এই রকম অনেক। কিন্তু সে দিন তখন মনে হইতে লাগিল, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না।

ইহাদের একটু তফাতে এক কোণে বসিয়াছিল 'ডালিম'। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও মেয়েটিকে আগে কখনও দেখি নাই।" সে বলিল, "বাসি, ওকে জান না? ও যে ডালিম, শহর মাত করেছে, অনেক কাপ্তেন ভাসিয়েছে।" আমি বলিলাম, "কাপ্তেন ভাসানোর মতো চেহারা তো ওর নয়, ও যে এক কোণে সরে বসে আছে।" বন্ধু বলিল, "ওই তো ওর ঢং, ও অমনি করে লোক ধরে।" আমার মন তাহা জানিতে চাহিল না। আমি কিছু না বলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সেও আমায় দেখিতেছিল। কয়বার চোখে চোখে মিলিয়া গেল। আমি দেখিলাম, তাহার চাহনিতে কী ছিল। আমি কেমন করিয়া বলিব, আমি নিজেই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম না। আমার মনে হইল সেই আমোদ প্রমোদের সঙ্গে তাহার প্রাণের যোগ নাই। তার চোখ দুটি যেন কী যেন প্রকাশ করিতেছে। আমার প্রাণে যা হইতেছিল তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না। আমার ভিতর হইতে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল উহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লই।

এমন সময় কে বলিল, "ডালিম একটা গাও।" আর একজন বলিল, "ডালিম ভালো গাইতে পারে না।" আমি উহার দিকে চাহিলাম। সে বুঝিল, বলিল, "আমি ভালো গাহিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "গাও।" সে একটু সরিয়া আমার সামনে বসিয়া গান ধরিল। আমি সে রকম গান কখনও শুনি নাই। সে গানে সুরের কারদানি ছিল না, তালের বাহাদুরি ছিল না, কিন্তু সে গানে যাহা ছিল তাহা আর কখনও কোনো গানে পাই নাই। মনে হইল ওই গানের জন্য আমার সমস্ত মনটা অপেক্ষা করিয়াছিল। চোখের জলে ভিজে সেই সব সুরের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন নয়নের ধারে অশ্রুবিন্দুর মতো দুলিতেছিল। সেই সুরের প্রত্যেক সুর, সেই গানের প্রত্যেক কথা আজও আমার প্রাণপটে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মতো জ্বলিতেছে, ডালিম গাহিতেছিল—

"কেমন করে মনের কথা কইব কারে বলো।
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে।।
আজি আমি ঝরা ফুল, পড়ি তোমার পায়
কণ্টক বক্ষে বধূ বিঁধায় বিঁধায়
প্রাণের পাতে ফুলের মতো
রাখব তোমায় আবরত
তফাত থেকে দেখব শুধু রাখব প্রাণে প্রাণে
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে।।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম — "তুমি কখনও গান শিখেছিলে?" সে বলিল, "না, ওস্তাদের কাছে কখনও শিখি নাই।" আমি বলিলাম, "আমি এমন গান কখনও শুনি নাই। তুমি কোথায় থাক?" সে কোনো কথা বলিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম —"এই গানটি আমারে একলা একদিন শুনাইবে?" সে কোনো উত্তর দিল না। আমি বলিলাম, "এ সব তোমার ভালো লাগে?" তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। সে কোনো কথা বলিল না।

আমার বন্ধুদের সকলেরই তখন প্রায় মত্ত অবস্থা। একজন উঠিয়া টলিতে টলিতে ইলেকট্রিক বাতিগুলি সব

নিভাইয়া দিল। আমি সেই অন্ধকারে ডালিমকে বুকে টানিয়া লইলাম। সে কিছু বলিল না। তারপর, — তার হাত ধরিয়া উঠাইলাম। আমিও দাঁড়াইলাম। তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম — "আমার সঙ্গে চল।" সে আমার হাত ধরিল। আমার সঙ্গে চলিল।

কোথায় যাইব, মনে মনে কিছুই ঠিক করি নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিলাম, তারপর একটা ঘরের ভিতর দিয়া সেই লতা মণ্ডপে গেলাম। তখন চাঁদের আলো আরও ম্লান মনে হইতেছিল। পুকুরের উপর একটু উজ্জ্বল ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। বাতাস বন্ধ। ফুলের গন্ধ থামিয়া গিয়াছে। মনে হইল, আকাশে যেন একটু মেঘ উঠিয়াছে। সেই উজ্জ্বল অন্ধকারে একখানা বেঞ্চির উপর তাহাকে বসাইলাম। আমার সর্বশরীর তখন অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের ভিতর ধক্‌ধক্‌ করিতেছিল। আমিও তাহার পাশে বসিলাম। আমি তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম — "ডালিম, আমার তোমাকে বড়ো ভালো লাগে। আমার তো এমন কখনও হয় নাই।" সে বলিল — "ও কথা তো সবাই বলে। মনে করিয়াছিলাম তুমি ও কথা বলিবে না।" আমি বলিলাম — "তুমি তো আমাকে চেনো না।" তাহার একখানি হাত আমার বুকের উপর দিলাম। সে বলিল — "তোমার কী হইয়াছে?" আমি বলিলাম — "জানি না। ইচ্ছা হয় তোমাকে লইয়া কোথাও পলাইয়া যাই। এত দিনের ভাবনাচিন্তা সবই মিথ্যা মনে হইতেছে।" সে আরও একটু আমার কাছে সরিয়া আসিল। আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমারও চোখে জল আসিয়াছিল, কোনো কথা বলিতে পারি নাই। সে যতই কাঁদিতে লাগিল ততই তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিলাম। মনে হইল ইহাকে কোথায় রাখি, কেমন করিয়া শান্ত করি। এক নিমেষে আমার সংসারের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। নিশীথের স্বপ্ন যেমন প্রভাতে এক নিমেষে মিলাইয়া যায়। আমার জীবনের সকল স্মৃতি, সংসারের সকল বন্ধন, সকল বাসনা এক মুহূর্তে কোথায় মিলাইয়া গেল? একি সেই আমি! আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন কোনো অপরিচিত ব্যক্তি, এইমাত্র এক নূতন জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে ভাবের কী যে ঘোর, আমি আজ পর্যন্ত ধরিতে পারিতেছি না। তাহাকে কেবল বুকে চাপিতে লাগিলাম। কথা বলার শক্তি ছিল না। মনে মনে বলিতে লাগিলাম — "হে আমার প্রাণের পাখি এস, তোমাকে [illegible] দি, তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দি, তুমি আর বাহিরে থাকিও না। আমার বুকের ভিতর থাকিয়া যাও। আমিও তোমাকে বুকে করিয়া জীবন সার্থক করি।" কতক্ষণ পরে সে একটু শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল — "আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে আসিব না। কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বাহির [illegible] তাই আসিলাম। তুমি আমার কথা শুনিতে চাও? আমি মনে করিয়াছিলাম বলিব না, কিন্তু কে যেন আমার প্রাণের ভিতর থেকে বলাইতেছে। শুনিবে?" আমি বলিলাম — "তোমার কথা শুনিবার জন্যই তোমাকে এখানে আড়াল করিয়া আনিয়াছি।" সে তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল। আমি শুনিতে লাগিলাম, সেই কণ্ঠস্বর আজও আমার প্রাণে লাগিয়া আছে, তাহার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে বাঁশির মতো বাজিতে লাগিল, আজও বাজিতেছে।

সে বলিল — "আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কুলীন বামুনের মেয়ে মামার বাড়িতে প্রতিপালিত। মামা বেশ [illegible] করিতেন। দিদিমা সবারও, তাহার কাছ থেকে কখনও ভালো ব্যবহার পাই নাই। মামি আমাকে একটা বোঝা মনে করিত। তার মুখে কটূক্তি ছাড়া মিষ্টি কথা কখনও শুনি নাই। আমার মামার মামাতো ভাই আমাকে ভালোবাসিতেন। তাহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যখন বারো বৎসর বয়স তখন তিনি মারা যান। তারপর চারি বৎসর পর্যন্ত সে বাড়িতে যে কী যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা তোমার না শুনাই ভালো। আমার ষোলো বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তারপর চার বৎসর শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম। এই চার বৎসরের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে বোধহয় ছয়-সাত দিনের বেশি দেখা হয় নাই। তিনি বিদেশে চাকরি করিতেন। কখনও কখনও দু'এক দিনের জন্য বাড়ি আসিতেন। বাড়িতে আসিলেও বাহির বাড়িতেই থাকিতেন। আমার সঙ্গে দুই একবার দেখা হইয়াছিল। কখনও কথাবার্তা হয় নাই। তাহার আগে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে ছিল। আমার শাশুড়ি তাঁহার বিমাতা। আমার কথা কহিবার কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শাশুড়ির কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখনও কখনও মারও খাইয়াছি। বাড়িতে ঝি ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া — রাঁধাবাড়া, ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়ার পর বাসনগুলি — বাড়ির কাছে নদী, সেই নদীতে — মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে, এই চার বৎসরের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মতো হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাংলা বই ছিল। মাঝে মাঝে রাত্রে

সবাই ঘুমাইলে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতাম। আমার শাশুড়ির তাহা সহিল না। একদিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমারও আর সহ্য হইল না। সেইদিন মনে মনে স্থির করিলাম এ বাড়িতে আর থাকিব না। পাড়ার একটি ছেলে [illegible] আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম তখন আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত আর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম চাঁদের আলো ছিল, বাতি লইয়া যাই নাই। দেখিলাম, সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বাসনগুলি নদীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম — 'আমাকে মামার বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে পার?' সে বলিল [illegible] 'কত দূর?' আমি গ্রামের নাম বলিলাম। সে বলিল 'নৌকায় যাইতে তিন চার ঘণ্টা লাগিবে।' আমি বলিলাম 'এক্ষণই আমাকে লইয়া যাও।' এই বলিয়া তাহার পায়ে আছড়াইয়া পড়িলাম। সে বলিল 'আচ্ছা তুমি এইখানে বসো, আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসি।' সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় উঠিলাম। ভাবিলাম এইবার যমের বাড়ি ছাড়িয়া মামার বাড়ি যাইতেছি। যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম সে ঠিক সেই রকম করিয়া আমার দিকে চাহিয়া ছিল। একটি কথা বলে নাই, শুধু চাহিয়া ছিল। আমার মনে হইতেছিল তাহার চোখ দুটি যেন আমাকে [illegible]। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া ছিলাম।

যখন মামার বাড়ি গিয়া পৌঁছিলাম তখন বেশ রাত। মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন আর সকলেই ঘুমাইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর মামি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বলিলাম 'আমি পলাইয়া আসিয়াছি, আমি সেখানে আর যাব না। আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে রক্ষা কর। তোমার বাড়িতে একটু স্থান দাও।' মামি কর্কশস্বরে বলিলেন 'পালাইয়া আসিয়াছিস কার সঙ্গে?' আমি সে কথার অর্থ তখন ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটিকে দেখাইয়া বলিলাম 'এর সঙ্গে।' মামি বলিলেন, 'এ কে?' আমি বলিলাম, 'জানি না।' মামি বলিলেন 'আমার বাড়িতে তোমার স্থান হবে না।' 'আমি কোথায় যাব?' মামি বলিলেন 'গোল্লায়।' বলিয়া সেই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম, কেহ সাড়া দিল না। তখন সে আমার পিছনে দাঁড়াইয়া [illegible]। সামনে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে [illegible] লইয়া চলিল।

আমি চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম কোথায় যাব, কোথায় যাব? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মতো সে যেদিকে লইয়া গেল সেদিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কোথা যাইবে?' সে বলিল 'কলকাতায়।' তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। [illegible] আমার মন [illegible]। আমি চিৎকার করিয়া তাহার [illegible] বলিলাম 'আমাকে রক্ষা কর, আবার আমাকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া চল।' সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল 'আচ্ছা।' [illegible] সেই চাহনি। আমি ভয়ে, অপমানে, দুঃখে [illegible] লাগিলাম।

ভোর হইবার আগেই নৌকা ঘাটে লাগিল। আমি দৌড়িয়া শ্বশুরবাড়ির দিকে চলিলাম। সে বাধা দিল না কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল। আমি কিছু না বলিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। আমার শাশুড়ি উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল। আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি চিৎকার করিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিলাম। আর কোনো সাড়াশব্দ পাইলাম না।

তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামির কথা মনে পড়িল "গোল্লায় যাও।" তখন ফিরিলাম। দেখিলাম সে দাঁড়াইয়া আছে আর ঠিক তেমনি করিয়া চাহিয়া আছে। আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম — 'আমি গোল্লায় যাব, যেখানে ইচ্ছে লইয়া যাও।'

তখন নিশ্চয়ই সূর্য উঠিয়াছে কিন্তু আমার চোখে ঘোর অন্ধকার। মনে হইল যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোনো অদৃশ্য বলিদান মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তারপর?

তারপর কলিকাতায় আসিলাম। ভাবিলাম সে কোনো জমিদারের ছেলে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া দুজনে থাকিলাম। সাতদিন সে আমার গায় গায় লাগিয়া ছিল। তাহার সেই চাহনির অর্থ সেই কয়দিনে বেশ ভালো করিয়া বুঝিলাম। আট দিনের দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তারপর?

এখন আমি কলকাতাব ডালিম। আমাব সুখেব শেষ নাই। শহবেব বড়ো বড়ো লোক আমাব পাযেব তলায় গড়াগড়ি যায়। আমাব বাড়িতে সাজ সজ্জাব অভাব নাই, সোনাব খাট, হিবাব গহনা। বাড়িতে ইলেকট্রিক বাতি, ইলেকট্রিক পাখা। দাস দাসীব অন্ত নাই। আলমাবি ভবা কাপড়, বাক্স ভবা টাকা।

আমি কলকাতাব ডালিম কিন্তু— কিন্তু বলিয়াই কিছুক্ষণ নীবব হইয়া বহিল। দু'হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধবিল। তখন জ্যোৎস্নাব লেশমাত্র নাই। সেই লতাকুঞ্জ গাঢ় অন্ধকাবে ভবা। তাহাব বুক ধড়াস ধড়াস কবিতেছিল— আমি সেই অন্ধকাবে তাহাব শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম আব আমাব অন্তবে এক অসীম বেদনা অনুভব কবিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পবে সে বলিল— "কিন্তু আমি যেন অঙ্গাবেব মতো জ্বলিতেছি। বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়?"

আবাব কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া বহিল। বোধহয় কাঁদিতেছিল। তাবপব বলিল, "তোমাব আমাকে ভালো লাগিয়াছে? তোমাব মতো আব কাবও সঙ্গে আমাব এ জীবনে কখনও দেখা হয় নাই। কেন তোমাকে আগে দেখিলাম না? আমি যখন নবক যন্ত্রণা ভোগ কবিতেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে? এখন— তোমাকে তো দিবাব কিছু নাই।"

এই বলিয়া সে আমাব বুকে ঢলিয়া পড়িল, শিশুব মতো কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম— "আমি আব কিছু চাহি না, আমি তোমাকেই চাই।" এই বলিয়া দুজনেই কাঁদিতে লাগিলাম। পাগলেব মতো জ্ঞানহাবা হইয়া কাঁদিতেছিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না। আমি কি জাগিয়াছিলাম? মনে হইতেছিল আমি ডালিমকে লইয়া এই সংসাবেব বাহিবে এক অপূর্ব নন্দন কাননে বাস কবিতেছি। আমি আব ডালিম— সে জগতে আব কেহ নাই। চিবদিন তাহাকেই বুকে কবিয়া বাখিয়াছি। প্রতি প্রভাতে তাহাকে নব নব ফুলে সাজাইয়াছি, প্রতি নিশাশেষে তাহাকে নব নব চুম্বনে জাগাইয়া দিয়াছি। প্রাণেব যে একটা মুক্ত আকাশ আছে, আব একটা অতি গভীব পাতাল আছে, সেদিন প্রথম অনুভব কবিলাম। আমাব হৃদয়েব সেই স্বর্গ ও সেই পাতাল পূর্ণ কবিয়াছিল ডালিম— ডালিম।

কোন সময় ভোবেব কোলাহল শুনিলাম। চমকিয়া দেখিলাম ডালিম আমাব কাছে নাই। আমি অস্থিব হইয়া পাগলেব মতো ছুটাছুটি কবিতে লাগিলাম। দৌড়িয়া উপবে গেলাম, দেখিলাম সেখানে ডালিম নাই। আমাকে দেখিয়া একজন বলিল— "কী বাবা একেবাবে উধাও?" আমি তাহাকে গালি দিলাম, আবাব ছুটিয়া বাগানে আসিলাম। সেই বাগানে সকল স্থানে খুঁজিলাম। ডালিম ডালিম বলিয়া চিৎকাব কবিয়া ডাকিলাম। কোনো সাড়া শব্দ পাইলাম না। ফটকে গিয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম, "কোই বিবি চলা গিয়া?" একজন দাবোয়ান বলিল— "হাঁ বাবু, বো বিবি গাড়িমে চলা গিয়া।" আবাব দৌড়িয়া উপবে গেলাম। জিজ্ঞাসা কবিলাম "ডালিম কোথায় থাকে?" এবাব আব কেহ বসিকতা কবিল না। ঠিকানা জানিয়া লইয়া আবাব ফটকে দৌড়িয়া আসিলাম। একখানা মটব ভাড়া কবিয়া তাহাব বাড়ি গেলাম। শুনিলাম ডালিম আসে নাই। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানি না। ডালিমেব দেখা পাইলাম না। আবাব বাগানে গেলাম, আবাব খুঁজিলাম কিন্তু তাহাকে আব পাইলাম না।

সে বাত্রে ঘুমাই নাই। পাগলেব মতো ছুটাছুটি কবিলাম। পবদিন প্রভাতে আবাব ডালিমেব বাড়ি গেলাম। ঝি বলিল— সে শেষ বাত্রে এসেছিল, আবাব ভোব না হতে হতেই চলে গেছে। একখানা চিঠি বেখে গেছে, আমাকে বলে গেছে— সকালে একজন বাবু খোঁজ কবতে আসবে, তাকে এই চিঠিখানা দিস। আমি সেই চিঠিখানা লইলাম। খুলিতে খুলিতে আমাব হাত কাঁপিতে লাগিল, চিঠিখানা পড়িলাম—

'তুমি আমাকে খুঁজিতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আব খুঁজিও না। আমাকে আব কোথাও দেখিতে পাইবে না। মনে কবিও আমি মবিয়া গিয়াছি। আমি মবি নাই— আমি মবিতে পাবিব না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহাবি গৌবব অক্ষুণ্ণ বাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসাবে যাকে বলে সুখ, তাহাও পাইয়াছি কিন্তু কালবাত্রে যে সত্য প্রাণেব পবশ পাইয়াছি তাহা কখনও পাই নাই। তাহাবি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপেব মতো জ্বালাইয়া বাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি তাহা আব হাবাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না, প্রাণসবস্ব। আমি বড়ো দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমাব দুঃখ বাড়াইও না, এ জন্মে হইল না, জন্মান্তবে যেন তোমাব দেখা পাই।

ডালিম"

সচ্চরিত্র

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

যে বুধবারে গেজেটে খবর বাহির হইল সুরেন্দ্রনাথ সম্মানের সহিত বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার পরের বুধবারেই ভাগলপুর হইতে তাহার কাকার মৃত্যুসংবাদ আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়। তাহাকে ও তাহার দুই দাদাকে এই কাকাই ভাগলপুরে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। সুতরাং কাকার মৃত্যুতে সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইল।

কাকা ভাগলপুরের একজন বড়ো উকিল ছিলেন। সুরেনের দাদারা ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখে নাই, তাহাদের তিনি সামান্য চাকরি জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল, আইন পাস করিয়া সুরেন ওকালতি করে। সুরেনও নিজের জীবনের গতি ওই পথেই আঁকিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ দেখিল আইন পড়ার খরচা যোগাইবার আর কেহ নাই।

সুরেনের মাকে সকলে পরামর্শ দিলেন, 'ছেলের বিয়া দাও, শ্বশুর পড়ার খরচ যোগাবে।' কিন্তু সুরেন বলিল 'কৃতী না হয়ে বিয়ে করব না।'

আইন পড়িয়া উকিল হইবার মতলবও সুরেন ছাড়িতে পারিল না। মাকে বলিল, 'কলকাতায় যাই, ছেলে পড়িয়ে কিছু উপার্জন করব, তাইতে আমার বাসা খরচ চলে যাবে।'

বিধবা মাতার সামান্য পুঁজি ভাঙিয়া কয়েকটি টাকা লইয়া সুরেন্দ্র কলিকাতায় উপনীত হইল। আইন ক্লাসে নাম লেখাইল। অনেক দিনের চেষ্টায় দশটাকা বেতনের একটি প্রাইভেট টিউশনও জুটিল, আর দশটি টাকা জুটিলেই কোনো রকমে বাসা খরচের সংস্থান হইয়া যাবে।

কিন্তু এই দশটি টাকা জুটিতে বড়ো বিলম্ব হইতে লাগিল। বাড়ি হইতে টাকা যাহা আনিয়াছিল তাহা ফুরাইল। সুরেন্দ্র মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ মাস, কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আহারান্তে সুরেন তাহাদের বাসার ছাদে উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে নয়টা বাজিল, দশটা বাজিয়া গেল। ছাদের অন্যত্র বাসার অন্যান্য যুবকেরাও পদচারণা করিতেছে। কেহ সিগারেট খাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বা গুনগুন করিয়া থিয়েটারের গান গাহিতেছে।

হঠাৎ নিম্নে সুরেন্দ্র একটা কণ্ঠ শুনিতে পাইল, 'সুরেনবাবু হ্যায়?'

সরমন চাকর বাসন মাজিতেছিল, সে উত্তর দিল, 'বাবু ছাদমে আছে দেখা যাবে।' বঙ্গভাষায় আলাপ করা সরমনের উচ্চাভিলাষ, কেহ তাহাকে হিন্দিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও সে বাংলাতেই উত্তর দিত।

আগন্তুক তখন খট খট করিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্র উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষায় রহিল।

'কেও? রজনী দাদা যে!'

'সুরেন, ভালো আছিস?'

রজনী দাদা সুরেনেরই গ্রামের লোক। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর। কনট্রাকটারি ব্যবসা করেন। অনেক টাকা উপার্জন।

হ্যারিসন রোড হইতে বিদ্যুতের আলোক আসিতেছিল। সে আলোকে সুরেন্দ্র দেখিল, রজনীর পায়ে রেশমি মোজা চিকচিক করিতেছে, তদুপরি পম্পশু। গায়ে রেশমি পাঞ্জাবির উপর জরির পাড় দেওয়া কোঁচান চাদর। চুল হইতে সেন্টের ও মুখ হইতে মদের গন্ধ আসিতেছে।

'সুরেন ভালো আছিস?'

'ভালো আছি। হঠাৎ যে রজনীদাদা? খবর কী?'

রজনী বলিল, 'একটা কথা আছে, এখানে বলব? তোর ঘরে চল্ না!'

সুরেন স্বর নামাইয়া বলিল, 'ঘরেও তো লোক আছে।'

রজনী বলিল, 'তবে আয়, আমার সঙ্গে আয়। পথে বলব। নে চট করে জামা পরে একটা চাদর নে।'

এই বলিয়া রজনী চুরুট বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিল। সুরেন নামিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে দুইজনে রাস্তায় নামিল। দরজার কাছে একখানা ঠিকা-গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল, উঠিয়া রজনী বলিল, 'আয়।'

সুরেন উৎসুক হইয়া বলিল, 'কোথায় নিয়ে যাচ্চ আমায়? কী বলবে এইখানেই বল না।'

গ্রামে রজনীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি নাই। সুরেনের মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে বারংবার করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন রোজোটার সঙ্গে মিশিয়া বিগড়াইয়া না যায়। সেই কথা সুরেনের মনে পড়িতে লাগিল।

রজনী বলিল, 'আমি যাচ্ছি থিয়েটারে। এখানে দাঁড়িয়ে বললে আমার দেরি হয়ে যাবে। পথে বলব। এইটুকু আর হেঁটে আসতে পারবি নে? ভারি লবাব হয়েছিস যে দেখছি! আয় আয়।'

সুরেন্দ্র উঠিল। রজনী গাড়োয়ানকে হুকুম দিল, 'বিডিন ইস্টিট।'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

গাড়ি চলিলে সুরেন জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপারখানা কী?'

'তোর জন্যে একটা প্রাইভেট টিউশন ঠিক করেছি।'

সুরেন খুশি হইয়া বলিল, 'কোথায়? কত?'

'মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে। পঁচিশ টাকা।'

সুরেন শুনিয়া মহা খুশি। বলিল, 'পঁচিশ টাকা? বল কি রজনীদাদা? কখন?

'বিকেলে দু'ঘণ্টা।'

'কী পড়াতে হবে?'

'এক ঘণ্টা বাংলা, এক ঘণ্টা ইংরেজি।'

হঠাৎ সুরেনের মনে হইল, যখন অত টাকা, তখন বোধ হয় একাধিক ছাত্র; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল, 'ক'টি ছেলে?'

রজনী বলিল, 'একটিও না।' বলিয়া জোরে জোরে চুরুট টানিতে লাগিল।

সুরেন বলিল, 'একটিও না! তার মানে কী?'

'ছেলে একটিও না। মেয়ে একটি।'

'মেয়ে? কত বড়ো মেয়ে?'

রজনী হাসিয়া বলিল, 'তোর সে খোঁজে কাজ কী? তুই যাবি, পড়াবি। বয়স যতই হোক না।'

সুরেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

রজনী তখন উদারভাবে বলিল, 'বয়স পনেরো-ষোলো।'

সুরেন বয়স শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্রাহ্ম?'

'না।'

'ক্রিশ্চান?'

'না।'

'তবে কী? হিন্দু নাকি?'

'তাই।'

'হিন্দু! অত বড়ো মেয়ে, পড়বে? কার মেয়ে, বাপের নাম কী?'

রজনী হাসিয়া বলিল, 'খোদা জানে। মার নাম জিজ্ঞাসা করিস তো বলতে পারি।'

সুরেন উত্তরোত্তর অধিক আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী?'

'মার নাম আমোদিনী। বেঙ্গল থিয়েটারের আমোদিনী। নাম শুনেছিস?'

কিন্তু এ সংবাদে সুরেনের সমস্ত উৎসাহ নির্বাপিত হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'শুনেছি।'

রজনী বলিল, 'কী বলিস?'

সুরেন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিল, 'আমার দ্বারা হবে না।'

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

সুরেন্দ্র উত্তেজিতভাবে বলিল, 'বেশ্যার মেয়েকে পড়াব? কখনোই না।'

রজনী বলিল, 'অতি গর্দভ তুই! কেন, আপত্তিটা কী শুনি?'

সুরেন বলিল, 'আপত্তি অনেক।'

'কী? এ, উপার্জন অনেস্ট নয়?'

'অনেস্ট হবে না কেন?'

'তবে? নিজে পাছে প্রলোভনে পড়ে যাস?'

সুরেন গর্বিতভাবে বলিল, 'সে ভয় করিনে।'

'তবে? তবে কী আপত্তি বল।'

'বেশ্যার মেয়েকে পড়াব? লোকে শুনলে বলবে কী?'

রজনী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল। বলিল, 'অতি গর্দভ তুই! বি-এ পাস করে এমন কথাটা বললি? লোকে কী বলবে না বলবে সেই ভয়েই জড়সড়?'

সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রজনী বলিল— 'শোন। ও আপত্তি কোনো কাজের নয়। আর, লোকের জানবার দরকারই বা কি? পড়াতে যাচ্চিস না পড়াতে যাচ্চিস। কাকে পড়াতে যাচ্চিস, কোথায় পড়াতে যাচ্চিস, এত খবর তোর লোকের কাছে দেবার দরকার কি? তবে হ্যাঁ, যদি বুঝিস নিজের মনে যথেষ্ট বল নেই, চরিত্র ঠিক রাখতে পারবিনে, তাহলে অবিশ্যি নেওয়া উচিত নয়। সেইটে বেশ করে বুঝে দেখ নিজের মনে।'

নিজের চরিত্রের বলের প্রতি সুরেনের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ কথায় তাহার আত্মাভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হইল। সগর্বে বলিল, 'সেজন্যে ভেব না।'

রজনী বলিল, 'তবে না। টাকা নিয়ে কথা রে ভাই! যে টাকা দেবে তার কাজ করব। অমনি তো আর টাকা নিচ্চিনে।'

সুরেন ভাবিয়া বলিল, 'বাড়ির লোক যদি শোনে তো কী বলবে?'

রজনী বলিল, 'অতি গর্দভ তুই! বাড়ির লোক জানবে কী করে? এ কলকাতা শহর সমুদ্দুর! কে কার খবর রাখে— তুইও যেমন!'

গাড়ি এই সময় থিয়েটারে পৌঁছিল। রজনী বলিল, 'তাহলে, কী বলিস? আজ আমোদিনীর সঙ্গে দেখা হবে আমার কী বলব?'

সুরেন একবার মনে করিল বলি —'না।' আবার ভাবিল, 'এত তাড়াতাড়ি কি—না হয় দু'দিন পরেই বলব।' বলিল, 'রজনীদা, ভেবে তোমায় দুই একদিন পরে বলব।' —বলিয়া বিদায় চাহিল।

রজনী বলিল, 'আচ্ছা, তা যে রকম হয় আমায় লিখিস; কিন্তু ওই কথা রে ভাই। যদি বুঝিস নিজে ঠিক থাকতে পারবি, নিজের মনে এক চুল এদিক ওদিক হবে না—তবেই নিস। আমরা তো বয়ে গেছিই। তোরা এখন ছেলেমানুষ আছিস— গোড়া থেকে সাবধান হওয়া ভালো।' —বলিয়া রজনী থিয়েটারে প্রবেশ করিল— সুরেনও ধীরপদে ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিল।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

সে রাত্রি সুরেনের ভালো নিদ্রা হইল না। অনেক ভাবিল। পরদিনও সারাদিন ভাবিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি কাজটা অস্বীকার করি তবে রজনী দাদা ভাবিবে, নিজের চরিত্রবলের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস নাই বলিয়াই অগ্রসর হইল না। এই ভাবের সহিত অর্থকৃচ্ছ্রতাও মনে প্রবলরূপে আধিপত্য করিতে লাগিল। পঁচিশ টাকা। দশ টাকা আর পঁচিশ টাকা— পঁয়ত্রিশ টাকা। যদি মাসে কুড়ি টাকা করিয়া খরচ করি, তাহা হইলে পনেরো টাকা করিয়া জমিবে। তিন বৎসর যদি মাসে পনেরো টাকা করিয়া জমে, তাহা হইলে পাঁচশত টাকারও উপর হাতে হইবে; ওকালতি পাস করিয়া, তাহা লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিব।

আবার ভাবিল, তিন বৎসর ধরিয়া যদি আমি ঐ বেশ্যার মেয়েটাকে পড়াই, তাহা হইলে কি জানাজানি হইতে বাকি থাকিবে? ছি ছি ছি — সে বড়ো কেলেঙ্কারি হইবে।

অবশেষে স্থির করিল, এক কাজ করা যাউক। এখন কাজটা লই। এ দিকে অন্য প্রাইভেট্ টিউশন জুটাইবার জন্য চেষ্টাও করিতে থাকি। আর একটা সুবিধামতো জুটিলেই ওটা ছাড়িয়ে দেওয়া যাইবে। রজনীদাদা যাহা বলিয়াছে ঠিকই বটে-- পরিশ্রম করিব, টাকা লইব—কীরূপ লোকের টাকা অত আমার হিসাব করিবার দরকার কি?

জানাজানির ভয়টা যখনই মনে উদিত হইতে লাগিল, তখনই কিন্তু তাহার উৎসাহ ভারি কমিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারও ঔষধ রজনী দিয়া গিয়াছে। 'কলকাতা শহর সমুদ্দুর—কে কার খবর রাখে!'

ভাবিয়া চিন্তিয়া রজনী দাদাকে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি শেষ করিয়া, খামে ভরিয়া, সতর্ক সুরেন্দ্রনাথ ভাবিল- -কাগজে কলমে এর সাক্ষীসাবুদ রাখি কেন? যাই, মুখেই গিয়া রজনী দাদাকে বলিয়া আসি।

চিঠি ছিঁড়িয়া আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া ফেলিল। বাহির হইয়া বউবাজারে রজনী দাদার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে রজনী পাশা খেলিতেছে ও মদ খাইতেছে।

সুরেন খানিক বসিয়া খেলা দেখিল। একটা বাজি শেষ হইলে রজনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কীরে, খবর কী?'

সুরেন বলিল, 'খবর ভালো। একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

রজনী বলিল, 'ওঃ আচ্ছা দাঁড়া।' – বলিয়া তাহার গেলাসের মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, 'আয়।'

দুইজনে একাকী হইলে রজনী বলিল, 'কী ঠিক করলি?'

সুরেন বলিল, 'নেওয়াই ঠিক করলাম।'

রজনী বলিল, 'তা বেশ; কিন্তু খুব সাবধান রে ভাই! ধরি মাছ না ছুঁই পানি, বুঝেছিস তো। তোকে জানি ছেলেবেলা থেকে তুই অতি সৎ ছোকরা, তাই সাহস করে তোকে এ কাজে যেতে দিচ্চি। আমি আমোদিনীকে গর্ব করে বলেছি যে তুই অতি সচ্চরিত্র, কোনও রকম খেলাপ হবে না।'

সুরেন বলিল, 'কেন রজনীদাদা, সচ্চরিত্রতা নিয়ে এত মারামারি কেন এ সব লোকের?'

রজনী বলিল, 'আঃ —এইটুকু বুঝতে পারলিনে, বি এ পাস করেছিস! অতি গর্দভ তুই। কেন, বলি শোন্। আমোদিনী একজন মস্ত অ্যাকট্রেস। ওর ইচ্ছে, ওর মেয়েও একদিন একটা মস্ত অ্যাকট্রেস হয়। সেই জন্যে ভালো রকম লেখাপড়া শেখাচ্চে। ওরা প্রথম প্রথম মেয়ে পড়বার জন্যে বুড়োগোছ পণ্ডিত-টণ্ডিত রাখত, কিন্তু বুড়ো হলে হবে কি বুড়োদের প্রাণে আবার বেশি শখ! পড়ায় না— খালি ইয়ার্কি দেয়। কেউ কেউ মেয়ে নিয়ে চম্পটও দিয়েছে। তাই ওরা এখন ভালো লোক চায়। কলেজের সচ্চরিত্র দেখে লোক রাখলে কোনো ভয় থাকে না-— এই জন্যে আর কী — বুঝেছিস?'

সুরেন বলিল, 'ওঃ — তা বটে।' ভাবিতে তাহার মনে বেশ একটু গর্ব হইতে লাগিল যে, সে একজন কলেজের ভালো সচ্চরিত্র শ্রেণীর লোক – নিজে যাহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, তাহারাও এ বিশুদ্ধতার মূল্য বুঝে

রজনী বলিল, 'তবে ঠিকানা দিচ্চি। কাল কি পরশু একদিন যাস— গিয়ে সব ঠিকঠাক করে নিস।'

সুরেন বলিল, 'না রজনীদাদা, আমি একলা যেতে পারব না।'

'কেন? মসজিদবাড়ি স্ট্রিট চিনিসনে?'

'তা চিনি, কিন্তু একলা যেতে পারব না রজনীদাদা।'

'অতি গর্দভ তুই! আচ্ছা আসিস কাল বিকেলে, নিয়ে যাব এখন সঙ্গে করে।'

পরদিন রজনী সুরেনকে লইয়া গিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিল।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

সুরেনের ছাত্রীর নাম নলিনী। পড়ে মেঘনাদবধ, সীতার বনবাস, আর রয়্যাল রিডার নম্বর থ্রি। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। আর এমন শান্ত ও শিষ্ট— যেন গৃহস্থঘরের মেয়ে। ইংরাজি কী পড়ে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে নলিনী বলিয়াছিল 'রয়্যাল রীডার নম্বর থার্ড।' সুরেন সংশোধন করিয়া দিল, 'নম্বর থ্রি বলিবে, থার্ড হয় না।' তখনই বিনীতভাবে 'নম্বর থ্রি' বলিয়া নিজেকে বালিকা সংশোধন করিল।

শনিবার অবধি নিয়মিতভাবে সুরেন তাহাকে পড়াইল। তাহার মা আসিয়া মাঝে মাঝে পড়া শুনিয়া যাইত।

রবিবারে ছুটি— রবিবারে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না। সুরেন মনে মনে বলিল, 'আঃ বাঁচা গেল, আজ আর বেরুতে হবে না।' যতটা খুশি হইবার কথা, মন কিন্তু ততটা খুশি হইতে রাজি হইল না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মেয়েটি পরমা সুন্দরী।

পরের সপ্তাহে— পাঠের মাঝে মাঝে সুরেন একটু আধটু গল্প করিল। ভাগলপুরের গল্প, আরও নানাদেশের গল্প, নানা বিষয়ের গল্প। গল্পের আধিক্যবশত এক একদিন পড়ার কামাই হইয়া যাইত; সে অপব্যয়টুকু পুরাইয়া দিবার জন্য সেদিন সুরেন দুই ঘণ্টার একটু অতিরিক্তও থাকিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যে রবিবার আসিল, সেটা নিতান্তই নীরস মনে লাগিল। সেদিন নলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে সে মনে করিল— আহা! মেয়েটির অদৃষ্টে কী আছে? এখনও অনাঘ্রাত কুসুমের মতো নির্মল, বিধাতার স্বহস্ত নির্মিত একটি শুভ্র আত্মা। এও কি পাপে পঙ্কিল হবে— ইহাই ধ্রুব বিধান? ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার কোনো উপায় কি নাই?

সে রাত্রে সুরেন স্বপ্ন দেখিল, যেন নদীর ধারে একটা শালবন, সেই শালবনে যেন নলিনীর সঙ্গে সে বেড়াইতেছে।

পরদিন পড়াইতে পড়াইতে স্বপ্নের গল্পটা নলিনীকে সুরেন বলিল।

নলিনী বলিল, 'কী করে স্বপ্ন দেখে বলুন দেখি?'

সুরেন বলিল, 'এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, দিনের বেলা আমরা যা চিন্তা করি রাত্রে তাই স্বপ্ন দেখি।'

নলিনী বলিল, 'না তা নয়। আমাদের আত্মা আছে কি না। একজনকার আত্মা, যদি আর একজনকার আত্মার কাছে যায়, তাহলে দুজনেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঘুম ভাঙলে শুধু একজনকার মনে থাকে, একজন ভুলে যায়।'

সুরেন বলিল, 'বাঃ বেশ তো!'

মাস্টারবাবু আসিলে ঝি রোজ টেবিলের উপর কয়েক খিলি পান রাখিয়া যাইত। একদিন সুরেন বলিল, 'আজকের পানটা খুব ভালো করেছে অন্যদিনের চেয়ে।'

নলিনী বালিকাসুলভ গর্বে বলিল, 'ভালো হয়েছে আজ?— আমি সেজেছি আজ মাস্টারমশায়!'

সুরেন বলিল, 'বটে! তুমি এমন পান সাজতে পার? আমাদের বাসায় যে পান সাজে, রাম রাম।'

পরদিন পাঠান্তে বিদায় লইবার সময় নলিনী সুরেনকে বলিল, 'আপনাদের বাসায় পান ভালো হয় না বলছিলেন, গোটাকতক পান তৈরি করেছি। নিয়ে যাবেন?'

সুরেন পান লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'ভারি লক্ষ্মী তুমি।'

নলিনীকে তাহার মাতা একটু স্বতন্ত্র রকমে পালন করিয়াছিল। তথাপি সুরেনের কাছে নলিনী যে জগতের সংবাদ পাইত, সে জগৎ নলিনীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন; তাহার জগৎ, যে জগৎ আবাল্য তাহাকে ঘিরিয়া আছে, সে জগতে এ জগতে কত প্রভেদ! সুরেন তাহার মার গল্প, কাকিমার গল্প, কাকার মেয়েদের বিবাহের গল্প যখন করিত, কী একটা অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষায় নলিনীর হৃদয় ভরিয়া উঠিত। সুরেনের জগতের সংবাদ নলিনীর কাছে পিপাসার শীতল জলের মতো লাগিত। সুরেনের প্রতি নলিনী একটা অপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল।

নলিনীর কণ্ঠস্বরের মধুরতায়, যৌবনের নবীনতায় ও অন্তরের সরসতায় সুরেনও যেন একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিল। কিছুদিনে সে নিজের মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করিল; কিন্তু কোনো প্রতিকার চেষ্টা করিল না। বুঝিল, মন তাহার বশের অতীত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে সুরেনের মনের অবস্থা এমন হইল যে, নলিনীকে তাহার মন্দসংসর্গ হইতে উদ্ধার করাই সে তাহার একমাত্র পুরুষার্থ স্থির করিল। ইহাতেই তাহার মানবজন্মের সফলতা জ্ঞান করিল। প্রেমের নির্দেশে কর্তব্যের পথ অতি সরল বোধ হইল। নলিনীর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেও বিলম্ব হইল না। তাহাকে শ্রদ্ধায়, আশায় ও সুখে পুলক-কম্পিত ও উচ্ছ্বসিত করিয়া বলিল— 'আমি তোমার স্বামী, তোমায় না পেলে আমি সুখী হব না; আমায় না পেলে তুমিও সুখী হবে না। তোমাকে আমার ধর্মপত্নী করব, লোকের কথার জন্যে ভয় করব না। পৃথিবী কি যথেষ্ট বৃহৎ নয়? আমরা এমন কোথাও যাব যেখানে লোকগঞ্জনা আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। কী খাব? পরিশ্রম করব;— আবশ্যক হয় দুজনে পরিশ্রম করব। দু'বেলা না জোটে, একবেলা খেয়ে থাকব। তাতেও আমরা সুখে থাকব।'

অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ঝি আলো আনিল। সুরেনের সম্মুখে নলিনীর অনুবাদের খাতা ছিল, তাহা সংশোধনের জন্য দক্ষিণ হস্তে সে কলম ধরিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাম হস্ত নলিনীর হস্তে সংযুক্ত ছিল। যখন ঝির পদধ্বনি শুনা গেল, তখন দুইজনেই ত্রস্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইল।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

ইহার পর চারিটি সপ্তাহ সুরেন ও নলিনী পরস্পরের নেশায় ভরপুর মাতিয়া রহিল।

সোমবারে বৈকালে পড়াইতে গিয়া সুরেন শুনিল, নলিনী নাই--- সে তাহার মাসির বাড়ি গিয়াছে। আমোদিনী আসিয়া বলিল— নলিনী এখন মাসকতক সেখানে থাকিবে, কলিকাতার জলবায়ু তাহার সহ্য হইতেছিল না আবার যখন আসিবে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে আবার আমোদিনী সুরেন্দ্রকে সংবাদ পাঠাইবে। এই বলিয়া সুরেনের প্রাপ্য আমোদিনী চুকাইয়া দিল।

সুরেন চলিয়া গেল, কিন্তু বাসায় গেল না। গড়ের মাঠে গিয়া একটি নিভৃত স্থান খুঁজিয়া, ঘাসের উপর বসিয়া রহিল।

ভাবিতে লাগিল - এ কী হইল? বিনা মেঘে এ বজ্রাঘাত কেন? শনিবারে যখন নলিনীর কাছে বিদায় লইয়াছে, তখন নলিনী কিছুই জানিত না, জানিলে অবশ্যই সুরেনকে বলিত। সহসা এ কী হইল?

গিয়াছে, তাহাও দুই-চারিদিনের জন্য নয়। কয়মাস থাকিবে তাহারও অবধি স্থিরতা নাই। কলিকাতার জলবায়ু সহ্য হইতেছিল না! বাজে কথা। আজ দুইমাস প্রতিদিন তাহাকে দেখিতেছে, একদিনও তো সেরূপ মনে হয় নাই।

অন্ধকার হইল, আকাশে নক্ষত্র, অদূরে গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল।

নলিনী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে অনেক বিপদ। সুরেনের এখন মনে হইতে লাগিল, সেই কথার সঙ্গে এ ঘটনার কোথাও সংযোগ আছে। হয়তো তাহার মাতা তাহার উপর কোনো জলুম করিতেছে। নলিনী এখন কী অবস্থায় কোথায় আছে, মনে করিতে সুরেনের চক্ষু দিয়া টসটস করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এই এক মাসের কত ঘটনা, কত সুখ, কত হাসি, কত মিষ্ট কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত স্বপ্ন দেখা— সেই স্বপ্নের জাগ্রৎ অনুকরণ, কত মানাভিমান মনে পড়িতে লাগিল। যত মনে পড়ে, তত যেন বুক ফাটিয়া যায়।

আর দেখা হইবে না।

ক্রমে ঘাসের উপর সুরেন শয়ন করিল। রাত্রি দশটা অবধি বালকের মতো কাঁদিল। দশটা বাজিলে, উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় আসিল।

সপ্তাহ কাটিল; সপ্তাহ পরে শোক অনেকটা লঘু হইল। তখন মনে হইল - 'উঃ, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি!'

'কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম!'

'কী সর্বনাশটাই হইতে বসিয়াছিল!'

'কী মোহেই পড়িয়াছিলাম! ভগবান এ জাল কাটিয়া দিলেন — এ পরম সৌভাগ্য। নিজে কাটিতে পারিতাম না।'

'কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম কে জানে! যদি শুনিতাম তাহার মাতা তাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, তাহা হইলে হয়তো তাহাকে লইয়া তখনই কোথাও চলিয়া যাইতাম। তাহা হইলে জন্মের মতো যাইতাম আর কি! এ জীবনে সে ভাঙা আর জোড়া লাগিত না।'

দুই সপ্তাহ পরে সুরেন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

পূজার ছুটির আর দুই সপ্তাহ বাকি। বিকাল বেলা সুরেন বাসার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে বঙ্কিমবাবুর 'ধর্মতত্ত্ব' পড়িতেছিল, ঝি আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। শিরোনামা দেখিয়া সুরেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল— নলিনীর হস্তাক্ষর।

চিঠির ছাপ দেখিল— ভবানীপুর।

চিঠি খুলিল। তাহা এইরূপ।

৪৪/১নং নীলমণি বসুর গলি,
ভবানীপুর

প্রিয়তম,

আজ একমাস তোমায় দেখি নাই, কিন্তু বাঁচিয়া আছি। বড়ো কষ্টে আছি। বেশি লিখিবার সময় নাই। এখানে আমি অত্যন্ত কড়া পাহারায় আছি। যে বৃদ্ধা আমার রক্ষয়িত্রী তাহার কন্যা আসিয়াছে। আমি তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহারই সাহায্যে এ পত্র ডাকে দিবার আয়োজন করিয়াছি।

যেদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সেদিন সন্ধ্যাবেলা মা আমার প্রতি ভারি অত্যাচার করে। আমি অনেক কাঁদি। মা আসিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে— আমি স্বীকার করি যে আমি তোমায় ভালোবাসি। মা বলিল— তুমি ভিক্ষুক, নিজে খাইতে পাও না ইত্যাদি। যদিও বা আমায় বিবাহ কর, লোকগঞ্জনায় অপমানে অস্থির হইয়া দুইদিন বাদেই আমাকে পরিত্যাগ করিবে। আরও বলিল, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না, তোমায় ভুলিতে হইবে। পরদিন প্রাতে আমায় এইখানে আনিয়া রাখিয়া গেল।

আমি এ একমাস অনেক ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে যে আমার চিরবিচ্ছেদ হইল এ কথা এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। একদিন আমাদের মিলন হইবে এ আশা এক মুহূর্তের তরেও আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

আমাদের মিলন হইলে তোমার অবস্থা কী হইবে তাহাও আমি ভাবিয়াছি। লোকে তোমায় কী বলিবে তাহা মনে করিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার একার সুখের জন্য হইলে আমি তোমার জীবনের পথ হইতে সরিয়া যাইতাম: কিন্তু হে আমার স্বামী, আমায় না পাইলে তুমিও সুখী হইবে না এ বিশ্বাস তুমি আমার মনে জন্মাইয়াছ। তোমার সুখের ও আমার সুখের জন্য, আমাদের মিলনই আমি আকাঙ্ক্ষা করি।

আমার এ পত্রের উত্তর তুমি ডাকে দিও না। কাল সন্ধ্যাবেলা চিঠি হাতে করিয়া আসিও। ভবানীপুরে যে পদ্মপুকুর আছে, তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া থাকিও। একজন স্ত্রীলোক তোমার নাম করিয়া ডাকিবে, তাহার হাতে পত্র দিও, তাহা হইলে আমি পাইব।

তোমারই নলিনী

পুঃ-- 'ঠিক সাতটার সময় আসিও।'

পত্র পড়িয়া সুরেন তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। ঝিকে ডাকিয়া দুই আনার জলখাবার আনিতে দিল। নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। বাসার লোককে বলিল, 'বাড়ি হতে এইমাত্র চিঠি পেলাম, মার ভারি ব্যারাম, এখনি আমায় রওনা হতে হবে।'

জলখাবার আসিলে চাকরকে বলিল, 'সবমন্ একখানা গাড়ি ডাক, জলদি।' গাড়ি আসিলে জিনিসপত্র লইয়া হাওড়ায় গেল। রাত্রি এগারোটার সময় বাড়ি পৌঁছিল।

মাকে বলিল, 'কলকাতায় ভয়ানক কলেরা হচ্ছিল তাই পালিয়ে এলাম।'

আঁধারে আলো



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

সে অনেকদিনের ঘটনা। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে, বি এ পাস করিয়া বাড়ি গিয়াছিল, তাহার মা বলিলেন, মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী—বাবা, কথা শোন্, একবার দেখে আয়।

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, এখন আমি কোনমতেই পারব না। তা হলে পাস হতে পারব না।

কেন পারবি নে? বৌমা থাকবেন আমার কাছে, তুই লেখাপড়া করবি কলকাতায় পাস হতে তোর কি বাধা হবে আমি ত ভেবে পাইনি, সতু!

না মা সে সুবিধে হবে না—এখন আমার সময় নেই, ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল

মা বলিলেন, যাসনে দাঁড়া, আরও কথা আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, আমি কথা দিয়েচি বাবা, আমার মান রাখবি নে?

সত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, না জিজ্ঞাসা করে কথা দিলে কেন?

ছেলের কথা শুনিয়া মা অন্তরে ব্যথা পাইলেন, বলিলেন সে আমার দোষ হয়েছে কিন্তু তোকে ত মায়ের সম্ভ্রম বজায় রাখতে হবে। তা ছাড়া, বিধবার মেয়ে, বড় দুঃখী কথা শোন সত্য রাজী হ।

আচ্ছা পরে বলব, বলিয়া সত্য বাহির হইয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐটি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সাত-আট বৎসর হইল স্বামীর কাল হইয়াছে, তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব গোমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারি শাসন করিয়া আসিতেছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয় আশয়ের কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয় না। জননী মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতি পাস করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্রবধূর হাতে জমিদারি এবং সংসারের সমস্ত ভারাৰ্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ইহার পূর্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না। কিন্তু অন্যরূপ ঘটিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর মৃত্যুর পর এ বাটীতে এতদিন পযন্ত কোন কাজকর্ম হয় নাই। সেদিন কি একটা ব্রত উপলক্ষে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মৃত অতুল মুখয্যের দরিদ্র বিধবা এগারো বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটিকে তাঁহার বড় মনে ধরিয়াছে। শুধু যে মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী, তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুণবতী তাহাও তিনি দুই চারিটি কথাবার্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা আগে ত মেয়ে দেখাই, তারপর কেমন না পছন্দ হয়, দেখা যাবে।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের জায়গার ঠিক সুমুখে আসন পাতিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীঠাকরুনটি কে হীরা-মুক্তায় সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে।

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, খেতে ব'স্।

সত্যর চমক ভাঙ্গিল। সে থতমত খাইয়া বলিল, এখানে কেন, আর কোথাও আমার খাবার দাও।

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই ত আর সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছিস নে—ঐ একফোঁটা মেয়ের সামনে তোর আর লজ্জা কি।

আমি কারুকে লজ্জা করিনে, বলিয়া সত্য প্যাঁচার মত মুখ করিয়া সুমুখের আসনে বসিয়া পড়িল। মা চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোনমতে নাকে-মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া গেল।

বাইরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বন্ধুরা জুটিয়াছে এবং পাশার ছক পাতা হইয়াছে। সে প্রথমেই দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি কিছুতেই বসতে পারব না—আমার ভারী মাথা ধরেচে। বলিয়া ঘরের এক

কোণে সরিয়া গিয়া তাকিয়া মাথায় দিয়া, চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে মনে কিছু আশ্চর্য হইল এবং লোকাভাবে পাশা তুলিয়া দাবা পাতিয়া বসিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক চেঁচামেচি ঘটিল, কিন্তু সত্য একবার উঠিল না, একবার জিজ্ঞাসা করিল না—কে হারিল, কে জিতিল। আজ এ-সব তাহার ভালই লাগিল না।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া সোজা নিজের ঘরে যাইতেছিল, ভাঁড়ারের বারান্দা হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মধ্যে শুতে যাচ্ছিস যে রে?

শুতে নয়, পড়তে যাচ্ছি। এম.এ'র পড়া সোজা নয় ত! সময় নষ্ট করলে চলবে কেন? বলিয়া সে গূঢ় ইঙ্গিত করিয়া দুমদুম শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টা কাটিযাছে, সে একটি ছত্রও পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই খোলা, চেয়ারে হেলান দিয়া, উপরের দিকে মুখ করিয়া কড়িকাঠ ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সে কান খাড়া করিয়া শুনিল--ঝুম্। আর একমুহূর্ত—ঝুমঝুম। সত্য সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই আপাদমস্তক গহনাপরা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা আপনার মত জিজ্ঞেসা করলেন।

সত্য মুহূর্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কার মা?

মেয়েটি কহিল, আমার মা।

সত্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণেক পরে কহিল, আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, সত্য সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তোমার নাম কি?

আমার নাম রাধারানী, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

॥ দুই ॥

একফোঁটা রাধারানীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সত্য এম.এ. পাস করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ত কোন মতেই না, খুব সম্ভব, পরেও না। সে বিবাহই করিবে না। কারণ সংসারে জড়াইয়া গিয়া মানুষের আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও রহিয়া রহিয়া তাহার সমস্ত মনটা যেন কি একরকম করিয়া ওঠে, কোথাও কোন নারীমূর্তি দেখলেই আর একটি অতি ছোট মুখ তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিয়া তাহাকেই আবৃত করিয়া দিয়া একাকী বিরাজ করে; সত্য কিছুতেই সেই লক্ষ্মীর প্রতিমাটিকে ভুলিতে পারে না। চিরদিনই সে নারীর প্রতি উদাসীন; অকস্মাৎ এ তাহার কি হইয়াছে যে, পথে-ঘাটে কোথাও বিশেষ একটা বয়সের কোন মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে যেন কোনমতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ, হয়ত অত্যন্ত লজ্জা করিয়া, সমস্ত দেহ বারংবার শিহরিয়া উঠে, সে তৎক্ষণাৎ যে-কোন একটা পথ ধরিয়া দ্রুতপদে সরিয়া যায়।

সত্য সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে ভালবাসিত। তাহার চোরবাগানের বাসা হইতে গঙ্গা দূর নয়, প্রায়ই সে জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে আসিত।

আজ পূর্ণিমা। ঘাটে একটু ভিড় হইয়াছিল। গঙ্গায় আসিলে সে যে উৎকলী ব্রাহ্মণের কাছে শুষ্ক বস্ত্র জিম্মা রাখিয়া জলে নামিত, তাহারই উদ্দেশে আসিতে গিয়া, একস্থানে বাধা পাইয়া স্থির হইয়া দেখিল, চার-পাঁচজন লোক একদিকে চাহিয়া আছে। সত্য তাঁহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে গিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে হইল, একসঙ্গে এত রূপ সে আর কখনও নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশের বেশী নয়। পরনে সাদাসিধা কালাপেড়ে ধুতি, দেহ সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জিত, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে, এবং তাহারই পরিচিত পাণ্ডা একমনে সুন্দরীর কপালে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে।

সত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডা সত্যর কাছে যথেষ্ট প্রণামী পাইত, তাই রূপসীর চাঁদমুখের খাতির ত্যাগ করিয়া হাতের ছাঁচ ফেলিয়া দিয়া 'বড়বাবু'র শুষ্ক বস্ত্রের জন্য হাত বাড়াইল।

দুজনের চোখাচোখি হইল। সত্য তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পাণ্ডার হাতে দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া জলে গিয়া নামিল। আজ তাহার সাঁতার কাটা হইল না, কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া যখন সে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য উপরে উঠিল, তখন সেই অসমান্যা রূপসী চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সমস্তদিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল, এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা গঙ্গা এমনি সজোরে টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয়া, আলনা হইতে একখানি বস্ত্র টানিয়া লইয়া গঙ্গাযাত্রা করিল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল, অপরিচিতা রূপসী এইমাত্র স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছেন। সত্য নিজেও যখন স্নানান্তে পাণ্ডার কাছে আসিল, তখন পূর্বদিনের মত আজিও তিনি ললাট চিত্রিত করিতেছিলেন। আজিও চারি চক্ষু মিলিল, আজিও তাহার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল; সে কোনমতে কাপড় ছাড়িয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

॥ তিন ॥

রমণী যে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, সত্য তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাহার একমাত্র হেতু---পূর্বে সত্য নিজে কতকটা বেলা করিয়াই স্নানে আসিত।

জাহ্নবীতটে উপর্যুপরি আজ সাতদিন উভয়ের চারি চক্ষু মিলিয়াছে, কিন্তু, মুখের কথা হয় নাই। বোধ করি তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। এই অপরিচিতা রূপসী যেই হোন, তিনি যে চোখ দিয়া কথা কহিতে শিক্ষা করিয়াছেন, এবং সে বিদ্যায় পারদর্শী, সত্যর অন্তর্যামী তাহা নিভৃত অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

সেদিন স্নান করিয়া সে কতকটা অন্যমনস্কের মত বাসায় ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল, 'একবার শুনুন!' মুখ তুলিয়া দেখিল, রেলওয়ে লাইনে ওপারে সেই রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম কক্ষে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পিতলের কলস, দক্ষিণ হস্তে সিক্তবস্ত্র। মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। সত্য এদিক-ওদিক চাহিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তিনি উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার ঝি আজ আসেনি, দয়া করে একটু যদি এগিয়ে দেন ত বড় ভালো হয়।

অন্যদিন তিনি দাসী সঙ্গে করিয়া আসেন, আজ একা। সত্যের মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিল, কাজটা ভাল নয় বলিয়া একবার মনেও হইল, কিন্তু সে 'না' বলিতেও পারিল না। রমণী তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া একটু হাসিলেন। এ হাসি যাহারা হাসিতে জানে, সংসারে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সত্য তৎক্ষণাৎ 'চলুন' বলিয়া উঁহার অনুসরণ করিল। দুই-চারি পা অগ্রসর হইয়া রমণী আবার কথা কহিলেন, ঝির অসুখ, সে আসতে পারলে না, কিন্তু আমিও গঙ্গাস্নান না করে থাকতে পারিনে—আপনারও দেখচি এ বদ অভ্যাস আছে।

সত্য আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ্ঞে হাঁ, আমিও প্রায় গঙ্গাস্নান করি।

এখানে কোথায় আপনি থাকেন?

চোরবাগানে আমার বাসা।

আমাদের বাড়ি জোড়াসাঁকোয়। আপনি আমাকে পাথুরেঘাটার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তা হয়ে যাবেন।

তাই যাব।

বহুক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হইল না। চিৎপুর রাস্তায় আসিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন, কাছেই আমাদের বাড়ি—এবার যেতে পারব—নমস্কার।

নমস্কার, বলিয়া সত্য ঘাড় গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল। সে কথা লিখিয়া জানান অসাধ্য। যৌবনে পঞ্চশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত যাঁহাকে সহিতে হইয়াছে, শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনি বুঝিবেন, সেদিন কি হইয়াছিল। সবাই বুঝিবেন না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস---সব রাঙ্গা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বক-শলাকার মত শুধু সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই 'অনুক্ষণ' উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

পরদিন সকালে সত্য জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, রোদ উঠিয়াছে। একটা ব্যথার তরঙ্গ তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া গড়াইয়া গেল; সে নিশ্চিন্ত বুঝিল, আজিকার দিনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। চাকরটা সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, হারামজাদা, এত বেলা হয়েছে, তুলে দিতে পারিস নি? যা, তোর একটাকা জরিমানা।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। সত্য দ্বিতীয় বস্ত্র না লইয়াই রুষ্ট-মুখে বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

পথে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়া হাঁকাইতে হুকুম কবিয়া রাস্তার দুইদিকেই প্রাণপণে চোখ পাতিয়া রাখিল। কিন্তু গঙ্গায় আসিয়া, ঘাটের দিকে চাহিতেই তাহার সমস্ত ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল, বরঞ্চ মনে হইল, যেন অকস্মাৎ পথের উপরে নিক্ষিপ্ত একটা অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইল।

গাড়ি হইতে নামিতেই তিনি মৃদু হাসিয়া নিতান্ত পরিচিতের মত বলিলেন, এত দেরি যে? আমি আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি — শিগগির নেয়ে নিন, আজও আমার ঝি আসেনি।

এক মিনিট সবুর করুন, বলিয়া সত্য দ্রুতপদে জলে গিয়া নামিল। সাঁতার কাটা তাহার কোথায় গেল! সে কোনমতে গোটা দুই-তিন ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমার গাড়ি গেল কোথায়?

রমণী কহিলেন, আমি তাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করেচি।

আপনি ভাড়া দিলেন!

দিলামই বা। চলুন। বলিয়া আব একবার ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া অগ্রবর্তিনী হইলেন।

সত্য একেবারেই মরিয়াছিল, না হইলে যত নিবীহ. যত অনভিজ্ঞই হোক, একবারও সন্দেহ হইত — এ সব কি।

পথ চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন, কোথায় বাসা বললেন, চোরবাগানে?

সত্য কহিল, হাঁ।

সেখানে কি কেবল চোরেরাই থাকে?

সত্য আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন?

আপনি ত চোরেব রাজা। বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষে হাসিয়া আবার নির্বাক মরালগমনে চলিতে লাগিলেন। আজ কক্ষের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ ছল্-ছলাৎ ছল্ শব্দে - অর্থাৎ. ওবে মুগ্ধ — ওরে অন্ধ যুবক। সাবধান! এ-সব ছলনা —সব ফাঁকি, বলিয়া উছলিয়া উছলিয়া একবার ব্যঙ্গ. একবার তিরস্কার করিতে লাগিল।

মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া সত্য সসঙ্কোচে কহিল, গাড়ি-ভাড়াটা --

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, সে ত আপনার দেওয়াই হয়েচে।

সত্য এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, আমার দেওয়া কি করে?

আমার আর আছে কি যে দেব! যা ছিল সমস্তই ত তুমি চুরি ডাকাতি করে নিয়েচ। বলিয়াই সে চকিতে মুখ ফিরাইয়া, বোধ করি উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ জোর করিয়া রোধ করিতে লাগিল।

এ অভিনয় সত্য দেখিতে পায় নাই, তাই এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎরেখাব মত তাহাব সংশয়েব শেল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকেব অন্তস্তল পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্তে সাধ হইল, এই প্রকাশ্য রাজপথেই ওই দুটি রাঙ্গা পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু চক্ষের নিমিষে গভীর লজ্জায় তাহার মাথা এমনি হেঁট হইয়া গেল যে, সে মুখ তুলিয়া একবার প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নিঃশব্দে নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ও-ফুটপাতে তাহাব আদেশমত দাসী অপেক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, আচ্ছা দিদিমণি, বাবুটিকে এমন করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? বলি, কিছু আছে টাছে? দু'পয়সা টানতে পারবে ত?

রমণী হাসিয়া বলিল, তা জানিনে, কিন্তু হাবাগোবা লোকগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে আমার বেশ লাগে।

দাসীটিও খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল, এতও পার তুমি! কিন্তু যাই বল দিদিমণি, দেখতে যেন রাজপুত্তুর! যেমন চোখমুখ, তেমনি রঙ। তোমাদের দুটিকে দিব্যি মানায় — দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলে, যেন একটি জোড়াগোলাপ ফুটে ছিল।

রমণী মুখ টিপিয়া বলিল, আচ্ছা চল্। পছন্দ হয়ে থাকে ত না হয় তুই নিস্।

দাসীও হটিবার পাত্রী নয়, সেও জবাব দিল, না দিদিমণি, ও জিনিস প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারবে না, তা বলে দিলুম।

॥ চার ॥

জ্ঞানীরা কহিয়াছেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখিলেও বলিবে না, কারণ অজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না। এই অপরাধেই শ্রীমন্ত বেচারা নাকি মশানে গিয়াছিল। সে যাই হোক, ইহা অতি সত্য কথা, সত্য লোকটা সেদিন বাসায় ফিরিয়া টেনিসন্ পড়িয়াছিল এবং ডন্ জুয়ানের বাঙলা তর্জমা করিতে বসিয়াছিল। অতবড় ছেলে, কিন্তু একবারও এ সংশয়ের কণামাত্রও তাহার মনে উঠে নাই যে, দিনেরবেলা শহরের পথেঘাটে এমন অদ্ভুত প্রেমের বান ডাকা সম্ভব কি না, কিংবা সে বানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা নিরাপদ কি না।

দিন-দুই পরে স্নানান্তে বাটী ফিরিবার পথে অপরিচিতা সহসা কহিল, কাল রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম, সরলার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায় না?

সত্য সরলা প্লে দেখে নাই, স্বর্ণলতা বই পড়িয়াছিল, আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ, বড় দুঃখ পেয়েই মারা গেল।

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, কি ভয়ানক কষ্ট! আচ্ছা, সরলাই না তার স্বামীকে এত ভালবাসলে কি করে, আর তার বড়জা-ই বা পারেনি কেন বলতে পার?

সত্য সংক্ষেপে জবাব দিল, স্বভাব।

রমণী কহিল, ঠিক তাই! বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু সব স্ত্রী পুরুষই কি পরস্পরকে সমান ভালবাসতে পারে? পারে না। কত লোক আছে, মরবার দিনটি পর্যন্ত ভালবাসা কি জানতেও পায় না। জানবার ক্ষমতাই তাদের থাকে না। দেখনি, কত লোক গান বাজনা হাজার ভাল হলেও মন দিয়ে শুনতে পারে না, কত লোক কিছুতেই রাগে না— রাগতে পারেই না! লোকে তাদের খুব গুণ গায় বটে, আমার কিন্তু নিন্দে করতে ইচ্ছে করে।

সত্য হাসিয়া বলিল, কেন?

রমণী উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল, তারা অক্ষম বলে। অক্ষমতার কিছু কিছু গুণ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু দোষটাই বেশি। এই যেমন সরলতার ভাশুর, — স্ত্রীর অতবড় অত্যাচারেও তার রাগ হ'ল না।

সত্য চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনরায় কহিল, আর তার স্ত্রী, ঐ প্রমদাটা কি শয়তান মেয়েমানুষ! আমি থাকতুম ত রাক্ষসীর গলা টিপে দিতুম।

সত্য সহাস্যে কহিল, থাকতে কি করে? প্রমদা বলে সত্যই ত কেউ ছিল না—কবির কল্পনা—

রমণী বাধা দিয়া কহিল, তবে অমন কল্পনা করা কেন? আচ্ছা, সবাই বলে, সমস্ত মানুষের ভেতরেই ভগবান আছেন, আত্মা আছেন, কিন্তু প্রমদার চরিত্র দেখলে মনে হয় না যে, তার ভেতরেও ভগবান ছিলেন। সত্যি বলচি তোমাকে, কোথায় বড় বড় লোকের বই পড়ে মানুষ ভাল হবে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, তা না, এমন বই লিখে দিলেন যে, পড়লে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় — বিশ্বাস হয় না যে সত্যিই সব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে।

সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড়?

রমণী কহিল, ইংরেজী জানিনে ত, বাংলা বই যা বেরোয়, সব পড়ি। এক-একদিন সারা রাত্রি পড়ি — এই যে বড় রাস্তা— চল না আমাদের বাড়ি, যত বই আছে সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল -- তোমাদের বাড়ি?

হাঁ, আমাদের বাড়ি — চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, ছি ছি —

ছি ছি কিছু নেই -- চল।

না, না আজ না — আজ থাক, বলিয়া সত্য কম্পিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ তাহার এই অপরিচিতা প্রেমাস্পদার উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার ভারে তাহার হৃদয় অবনত হইয়া রহিল।

॥ পাঁচ ॥

সকালবেলা স্নান করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা তখনও আর্দ্র। আজ চারদিন গত হইয়াছে, সেই অপরিচিতা প্রিয়তমাকে সে দেখিতে পায় নাই — আর তিনি গঙ্গাস্নানে আসেন না।

আকাশ পাতাল কত কি যে এই কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মাঝে মাঝে এ দুশ্চিন্তাও মনে উঠিয়াছে, হয়ত তিনি বাঁচিয়াই নাই, হয়ত বা মৃত্যুশয্যায়। কে জানে।

সে গলিটা জানে বটে, কিন্তু আর কিছু চেনে না। কাহার বাড়ি, কোথায় বাড়ি, কিছুই জানে না। মনে করিলে অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। কেন সে সেদিন যায় নাই, কেন সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল?

সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যাহা ছিল — তাহা সত্যই নিঃস্বার্থ, সত্যই পবিত্র, বুকজোড়া স্নেহ।

বাবু!

সত্য চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই দাসী যে সঙ্গে আসিত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল, কি হয়েছে তার? বলিয়াই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল— সামলাইতে পারিল না।

দাসী মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল, বোধ করি হাসিয়া ফেলিবার ভয়েই মুখ নীচু করিয়াই বলিল, দিদিমণির বড় অসুখ, আপনাকে দেখতে চাইচেন।

চল, বলিয়া সত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া চোখ মুছিয়া সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, কি অসুখ? খুব শক্ত দাঁড়িয়েছে কি?

দাসী কহিল, না তা হয়নি, কিন্তু খুব জ্বর।

সত্য মনে মনে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল আর প্রশ্ন করিল না। বাড়ির সুমুখে আসিয়া দেখিল, খুব বড় বাড়ি দ্বারের কাছে বসিয়া একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান ঝিমাইতেছে। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল আমি গেলে তোমার দিদিমণির বাবা রাগ করবেন না ত? তিনি ত আমাকে চেনেন না।

দাসী কহিল দিদিমণির বাপ নেই, শুধু মা আছে। দিদিমণির মত তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন।

সত্য আর কিছু না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি বাহিয়া তেতলার বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পাশাপাশি তিনটি ঘর, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায় মনে হইল, সেগুলি চমৎকার সাজান। কোণের ঘর হইতে উচ্চহাসির সঙ্গে তবলা ও ঘুঙুরের শব্দ আসিতেছিল দাসী হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ ঘর চলুন। দ্বারের সুমুখে আসিয়া সে হাত দিয়া পর্দা সরাইয়া দিয়া সু উচ্চকণ্ঠে বলিল, দিদিমণি এই নাও তোমার নাগর।

তীব্র হাসি ও কোলাহল উঠিল। ভিতরে যাহা দেখিল তাহাতে সত্যর সমস্ত মস্তিষ্ক ওলট পালট হইয়া গেল তাহার মনে হইল, হঠাৎ সে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে কোনমতে দোর ধরিয়া, সে সেখানেই চোখ বুজিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে মেঝেয় মোটা গদি পাতা বিছানার উপর দু তিনজন ভদ্রবেশী পুরুষ। একজন হারমোনিয়াম একজন বাঁয়া তবলা লইয়া বসিয়া আছে, — আর একজন একমনে মদ খাইতেছে। আর তিনি? তিনি বোধ করি এইমাত্র নৃত্য করিতেছিলেন, দুই পায়ে একরাশ ঘুঙুর বাঁধা, নানা অলঙ্কারে সর্বাঙ্গ ভূষিত সুর্মারঞ্জিত চোখ দুটি ঢুলুঢুলু করিতেছে, দ্রুতপদে কাছে সরিয়া আসিয়া, সত্যর একটা হাত ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বঁধুর মির্‌গি ব্যামো আছে নাকি? নে ভাই, ইয়ারকি করিস নে ওঠ— ও সবে আমার ভারী ভয় করে।

প্রবল তড়িৎস্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে, ইহার করস্পর্শে সত্যর আপাদমস্তক তেমনি করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

রমণী কহিল, আমার নাম শ্রীমতী বিজ্‌লী — তোমার নামটা কি ভাই? হাবু? গাবু? —

সমস্ত লোকগুলো হো হো শব্দে অট্টহাসি জুড়িয়া দিল, দিদিমণির দাসীটি হাসির চোটে একেবারে মেঝের উপর গড়াইয়া শুইয়া পড়িল -- কি রঙ্গই জান দিদিমণি!

বিজ্‌লী কৃত্রিম রোষের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, থাম্‌, বাড়াবাড়ি করিস নে – আসুন, উঠে আসুন, বলিয়া জোর করিয়া সত্যকে টানিয়া আনিয়া, একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া, পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাত জোড় করিয়া শুরু করিয়া দিল —

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলু পিয়া মুখ-চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।
অব সো ন যবহু মরি পরিহোয়ত —
তবহুঁ মানব নিজ দেহা—

যে লোকটা মদ খাইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার নেশা হইয়াছিল, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠাকুরমশাই, বড় পাতকী আমি—একটু পদরেণু —

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ সত্য স্নান করিয়া একখানা গরদের কাপড় পরিয়াছিল।

যে লোকটা হারমোনিয়াম বাজাইতেছিল, তাহার কতকটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল, সে সহানুভূতির স্বরে কহিল, কেন বেচারাকে মিছামিছি সঙ্ সাজাচ্ছ?

বিজ্‌লী হাসিতে হাসিতে বলিল, বাঃ মিছামিছি কিসে? ও সত্যিকারের সঙ্ বলেই ত এমন আমোদের দিনে ঘরে এনে তোমাদের তামাশা দেখাচ্চি। আচ্ছা, মাথা খাস হাবু, সত্যি বল্ ত ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি? নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই, কাজেই ব্রাহ্মও নই, মোচলমান খ্রিষ্টানও নই। হিঁদুর ঘরের এতবড় ধাড়ি মেয়ে, হয় সধবা, নয় বিধবা — কি মতলবে চুটিয়ে পিরিত করছিলি বল্‌ত? বিয়ে করবি বলে, না, ভুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি বলে?

ভারী একটা হাসি উঠিল। তার পর সকলে মিলিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল। সত্য একটিবার মুখ তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না। সে মনে মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিবই বা কি করিয়া, আর বলিলে বুঝিবেই বা কে? থাক্ সে।

বিজ্‌লী সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, বেশ ত আমি! যা ক্ষ্যামা, শিগ্‌গির যা — বাবুর খাবার নিয়ে আয়, স্নান করে এসেচেন —বাঃ, আমি কেবল তামাশাই কচ্ছি যে! বলিতে বলিতেই তাহার অনতিকাল পূর্ব্বের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ-বহ্ন্যুত্তপ্ত কণ্ঠস্বর অকৃত্রিম সস্নেহ অনুতাপে যথার্থই জুড়াইয়া গেল।

খানিক পরে দাসী একথালা খাবার আনিয়া হাজির করিল। বিজ্‌লী নিজের হাতে লইয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, মুখ তোল, খাও।

এতক্ষণে সত্য তাহার সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিজেকে সামলাইতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল, আমি খাব না।

কেন? জাত যাবে? আমি হাড়ী না মুচি?

সত্য তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, তা হলে খেতুম। আপনি যা তাই।

বিজ্‌লী খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, হাবুবাবুও ছুরি-ছোরা চালাতে জানেন দেখচি! বলিয়া আবার হাসিল। কিন্তু তাহা শব্দ মাত্র, হাসি নয়, তাই আর কেহ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

সত্য কহিল, আমার নাম সত্য, 'হাবু' নয়। আমি ছুরি-ছোরা চালাতে কখন শিখিনি, কিন্তু, নিজের ভুল টের পেলে শোধরাতে শিখেচি।

বিজ্‌লী হঠাৎ কি কথা বলিতে গেল, কিন্তু চাপিয়া লইয়া শেষে কহিল, আমার ছোঁয়া খাবে না?

না।

বিজ্‌লী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহাসের স্বরে এবার তীব্রতা মিশিল; জোর দিয়া কহিল, খাবেই। এই বলচি তোমাকে, আজ না হয় কাল, না হয় দু'দিন পরে খাবেই তুমি।

সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড়, তা সবাই টের পেয়েছে; কিন্তু আপনারও ভুল হচ্চে। আজ নয়, আগামী জন্মে নয় — কোনকালেই আপনার ছোঁয়া খাব না। অনুমতি করুন, আমি যাই — আপনার নিঃশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে।

তাহার মুখের উপর গভীর ঘৃণার এমনি সুস্পষ্ট ছায়া পড়িল যে, তাহা ঐ মাতালটার চক্ষুও এড়াইল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, বিজ্‌লীবিবি, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্! যেতে দাও — যেতে দাও — সকালবেলার আমোদটাই ও মাটি করে দিলে।

বিজ্‌লী জবাব দিল না, স্তম্ভিত হইয়া সত্যর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যথার্থই তাহার ভয়ানক ভুল হইয়াছিল। সে ত কল্পনাও করে নাই, এমনি মুখচোরা শান্ত লোক এমন করিয়া বলিতে পারে।

সত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজ্‌লী মৃদুস্বরে কহিল, আর একটু বসো।

মাতাল শুনিতে পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, উঁ হুঁ হুঁ, প্রথম চোটে একটু জোর খেলবে—যেতে দাও — যেতে দাও — সুতো ছাড়ো —সুতো ছাড়ো —

সত্য ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল; বিজ্‌লী পিছনে আসিয়া পথরোধ করিয়া চুপি চুপি বলিল, ওরা দেখতে পাবে, তাই, নইলে হাতজোড় করে বলতুম, আমার বড় অপরাধ হয়েচে—

সত্য অন্যদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনর্বার কহিল, এই পাশের ঘরটা আমার পড়ার ঘর। একবার দেখবে না? একটিবার এসো, মাপ চাচ্চি।

না, বলিয়া সত্য সিঁড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিজ্‌লী পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, কাল দেখা হবে?

না।

আর কি কখনো দেখা হবে না?

না।

কান্নায় বিজলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; ঢোক গিলিয়া জোর করিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস হয় না, আর দেখা হবে না। কিন্তু তাও যদি না হয়, বল, এই কথাটা আমার বিশ্বাস করবে?

ভগ্নস্বর শুনিয়া সত্য বিস্মিত হইল, কিন্তু এই পনর-যোল দিন ধরিয়া যে অভিনয় সে দেখিয়াছে, তাহার কাছে ত ইহা কিছুই নয়। তথাপি সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সে-মুখের রেখায় রেখায় সুদৃঢ় অপ্রত্যয় পাঠ করিয়া বিজ্‌লীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে করিবে কি ? হায়, হায়! প্রত্যয় করাইবার সমস্ত উপায়ই যে সে আবর্জনার মত স্বহস্তে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে!

সত্য প্রশ্ন করিল, কি বিশ্বাস করব?

বিজলীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ মুহূর্তের জন্য তুলিয়াই অবনত করিল। সত্য তাহাও দেখিল, কিন্তু অশ্রুর কি নকল নাই! বিজ্‌লী মুখ না তুলিয়াই বুঝিল, সত্য অপেক্ষা করিয়া আছে; কিন্তু সেই কথাটা যে মুখ দিয়া সে কিছুতেই বাহির করিতে পারিতেছে না, যাহা বাহিরে আসিবার জন্য তাহার বুকের পাঁজরগুলো ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে!

সে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসার একটা কণা সার্থক করিবার লোভে সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে — কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে! সে যে দাগী আসামী! অপরাধের শতকোটি চিহ্ন সর্বাঙ্গে মাখিয়া বিচারের সুমুখে দাঁড়াইয়া, আজ কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তাহার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দোষ! যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে লাগিল, বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিতে বসিয়াছে, কিন্তু কি করিয়া সে রোধ করিবে?

সত্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; সে বলিল, চললুম।

বিজ্‌লী তবুও মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু এবার কথা কহিল। বলিল, যাও, কিন্তু যে কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে কথা অবিশ্বাস করে যেন তুমি অপরাধী হয়ো না। বিশ্বাস করো, সকলের দেহতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না। একটু থামিয়া কহিল, সব মন্দিরেই দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না। বলিয়াই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, সত্য ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে।

স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না। বিজ্‌লী নর্তকী, তথাপি সে যে নারী! আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা তাহার নারীদেহ! ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত, অর্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ঐ মাতালটা পর্যন্ত টের পাইল। সে-ই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল, কি বাইজী, চোখের পাতা ভিজে যে! মাইরি ছোঁড়াটা কি একগুঁয়ে, অমন জিনিসগুলো মুখে দিলে না। দাও দাও, থালাটা এগিয়ে দাও ত হ্যাঁ, বলিয়া নিজেই টানিয়া গিলিতে লাগিল।

তাহার একটি কথাও বিজ্‌লীর কানে গেল না। হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলো খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল খুললে যে?

বিজলী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পারব না বলে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আর না। বাইজী মরেছে

মাতাল সন্দেশ চিবাইতেছিল। কহিল, কি রোগে বাইজী?

বাইজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল, যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্যি উঠলে রাত্রি মরে - আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্য মরে গেল বন্ধু।

॥ ছয় ॥

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটা বড় বাড়িতে জমিদারের ছেলের অন্নপ্রশান। খাওয়ানো দাওয়ানোর বিরাট ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বহির্বাটির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসর করিয়া আমোদ আহ্লাদ, নাচ গানের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

একধারে তিন চারটি নর্তকী – ইহারাই নাচ গান করিবে। দ্বিতলের বারান্দায় চিকের আড়ালে বসিয়া রাধারানী একাকী নীচের জনসমাগম দেখিতেছিল। নিমন্ত্রিতা মহিলারা এখনও শুভাগমন করেন নাই।

নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া সত্যেন্দ্র কহিলেন, এত মন দিয়ে কী দেখচ বল ত?

রাধারানী স্বামীর দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিল, যা সবাই দেখতে আসচে বাইজীদের সাজসজ্জা কিন্তু হঠাৎ তুমি যে এখানে?

স্বামী হাসিয়া জবাব দিলেন, একলাটি বসে আছ, তাই একটু গল্প করতে এলুম।

ইস।

সত্যি! আচ্ছা, দেখচ ত, বল দেখি, ওদের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টিকে তোমার পছন্দ হয়?

ঐটিকে, বলিয়া রাধারানী আঙুল তুলিয়া, যে স্ত্রীলোকটি সকলের পিছনের নিতান্ত সাদাসিধা পোশাকে বসিয়াছিল তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

স্বামী বলিলেন, ও যে নেহাত রোগা।

তা হোক, ঐ সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু, বেচারি গরিব -- গায়ে গয়না-টয়না এদের মত নেই।

সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন তা হবে। কিন্তু এদের মজুরি কত জান? — না।

সত্যেন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এদের দু'জনের ত্রিশ টাকা করে, ঐ ওর পঞ্চাশ, আর যেটিকে গরিব বলচ, তার দু শ টাকা।

রাধারানী চমকিয়া উঠল – দু শ! কেন, ও কি খুব ভাল গান করে?

কানে শুনিনি কখনো। লোকে বলে, চার পাঁচ বছর আগে খুব ভালই গাইত, —কিন্তু এখন পারবে কিনা, বলা যায় না।

তবে, অত টাকা দিয়ে আনলে কেন?

তার কমে ও আসে না। এতেও আসতে রাজি ছিল না, অনেক সাধাসাধি করে আনা হয়েছে।

রাধারানী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, টাকা দিয়ে সাধাসাধি কেন?

সত্যেন্দ্র নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, তার প্রথম কারণ, ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচে। গুণ ওর যতই হোক, এত টাকা সহজে কেউ দিতেও চায় না, ওকেও আসতে হয় না, এই ওর ফন্দি! দ্বিতীয় কারণ, আমার নিজের গরজ।

কথাটা রাধারানী বিশ্বাস করিল না। তথাপি আগ্রহে ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল, তোমার গরজ ছাই। কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে দিলে কেন?

শুনবে?

হাঁ, বল।

সত্যেন্দ্র একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, ওর নাম বিজ্‌লী। এক সময়ে — কিন্তু, এখানে লোক এসে পড়বে যে রানী, ঘরে যাবে?

যাব, চল, বলিয়া রাধারানী উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া রাধারানী আঁচলে চোখ মুছিল। শেষে বলিল, তাই আজ ওঁকে অপমান করে শোধ নেবে? এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে?

এদিকে সত্যেন্দ্রর নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না, অনেকবার গলাটাও ধরিয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, অপমান বটে, কিন্তু সে অপমান আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। কেউ জানবেও না।

রাধারানী জবাব দিল না। আর একবার আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে আসর ভরিয়া গিয়াছে এবং উপরের বারান্দায় বহু স্ত্রীকণ্ঠের সলজ্জ চিৎকার চিকের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য নর্তকীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজলী তখনও মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে, যাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু, সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে, পা এমন করিয়া দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিবে, তাহা সে ঘণ্টা দুই পূর্বে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

আপনাকে ডাকচেন - -। বিজ্‌লী মুখ তুলিয়া দেখিল পাশে দাঁড়াইয়া একটি বার-তের বছরের ছেলে। সে উপরের বারান্দা নির্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, মা আপনাকে ডাকচেন।

বিজ্‌লী বিশ্বাস করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কে আমাকে ডাকচেন?

মা ডাকচেন।

তুমি কে?

আমি বাড়ির চাকর।

বিজ্‌লী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমাকে নয়, তুমি আবার জিজ্ঞাসা করে এসো।

বালক খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার নাম বিজ্‌লী ত? আপনাকেই ডাকচেন, -- আসুন আমার সঙ্গে, মা দাঁড়িয়ে আছেন।

চল, বলিয়া বিজ্‌লী তাড়াতাড়ি পায়ের ঘুঙুর খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া অন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনে করিল, গৃহিণীর বিশেষ কিছু ফরমায়েস আছে, তাই এই আহ্বান।

শোবার ঘরের দরজার কাছে রাধারানী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ত্রস্ত কুণ্ঠিত পদে বিজ্‌লী সমুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্রই সে সসম্ভ্রমে হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল; এবং একটা চৌকির উপর জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া হাসিমুখে কহিল, দিদি, চিনতে পার?

বিজ্‌লী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। রাধারানী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, ছোটবোনকে না হয় নাই চিনলে দিদি, সে দুঃখ করিনে; কিন্তু, এটাকে না চিনতে পারলে সত্যিই ভারী ঝগড়া করব। বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন হাসি দেখিয়াও বিজ্‌লী তথাপি কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার আঁধার আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল। সেই অনিন্দ্যসুন্দর মাতৃমুখ হইতে সদ্যবিকশিত গোলাপ-সদৃশ শিশুর মুখের প্রতি তাহার

দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। রাধারানী নিস্তব্ধ। বিজলী নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধারানী কহিল, চিনেচ দিদি?

চিনেচি বোন।

রাধারানী কহিল, দিদি, সমুদ্র-মন্থন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোটবোনটিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন বলেই আমি তাঁকে পেয়েচি।

সত্যেন্দ্রর একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ হাতে তুলিয়া বিজলী একদৃষ্টে দেখিতেছিল; মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, বিষের বিষই সে অমৃত বোন। আমি বঞ্চিত হইনি ভাই। সেই বিষই এই ঘোর পাপিষ্ঠাকে অমর করেচে।

রাধারানী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, দেখা করবে দিদি?

বিজলী একমুহূর্ত চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, না দিদি। চার বছর আগে যেদিন তিনি এই অস্পৃশ্যাটাকে চিনতে পেরে, বিষম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, সেদিন দর্প করে বলেছিলুম, আবার দেখা হবে, আবার তুমি আসবে। কিন্তু, সেই দর্প আমার রইল না, আর তিনি এলেন না। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি, কেন দর্পহারী আমার সে দর্প ভেঙ্গে দিলেন! তিনি ভেঙ্গে দিয়ে যে কি করে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন, সে কথা আমার চেয়ে আজ কেউ জানে না বোন! বলিয়া সে আর একবার ভালো করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, প্রাণের জ্বালায় ভগবানকে নির্দয় নিষ্ঠুর বলে অনেক দোষ দিয়েচি, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পাপিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেচেন। তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে, আমি যে সবদিকে মাটি হয়ে যেতুম! তাঁকেও পেতুম না, নিজেকেও হারিয়ে ফেলতুম।

কান্নায় রাধারানীর গলা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না। বিজলী পুনরায় কহিল, ভেবেছিলুম, কখনও দেখা হলে তাঁর পায়ে ধরে আর একটিবার মাপ চেয়ে দেখব। কিন্তু তার আর দরকার নেই। এই ছবিটুকু শুধু দাও দিদি — এর বেশি আমি চাইনে। চাইলেও ভগবান তা সহ্য করবেন না — আমি চললুম, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধারানী গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে দেখা হবে, দিদি?

দেখা আর হবে না বোন। আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, সেইটে বিক্রি করে যত শীঘ্র পারি চলে যাব। ভাল কথা, বলতে পার ভাই, কেন হঠাৎ তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করেছিলেন? যখন তাঁর লোক আমাকে ডাকতে যায়, তখন কেন একটা মিথ্যে নাম বলেছিল?

লজ্জায় রাধারানীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিজলী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, হয়ত বুঝচি। আমাকে অপমান করবেন বলে, না? তা ছাড়া, এত চেষ্টা করে আমাকে আনবার ত কোন কারণই দেখিনে।

রাধারানীর মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল। বিজলী হাসিয়া বলিল, তোমার লজ্জা কি বোন? তবে তাঁরও ভুল হয়েচে। তাঁর পায়ে আমার শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছু নেই। অপমান করলে, সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।

নমস্কার দিদি।

নমস্কার বোন! বয়সে ঢের বড় হলেও তোমাকে আশীর্বাদ করবার অধিকার ত আমার নেই — আমি কায়মনে প্রার্থনা করি বোন, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। চললুম।

নির্মোক নৃত্য



পরশুরাম

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, তোমার মতলবটা কী উর্বশী? এই স্বর্গধামে তো পরম সুখে আছ, উত্তম বাসগৃহে, সুন্দর প্রমোদকানন, মহার্ঘ বেশভূষা, প্রচুর বেতন, সবই তো ভোগ করছ। এসব ত্যাগ করে মর্ত্যলোকে যেতে চাও কেন? এখন রাজা পুরূরবা সেখানে নেই যে তোমাকে মাথায় করে রাখবেন। স্বর্গে তুমি চিরযৌবনা অনিন্দিতা নরেন্দ্রবন্দিতা, কিন্তু মর্ত্যে গেলেই দু দিনে বুড়িয়ে যাবে, তখন যতই প্রসাধন লেপন কর তোমার দিকে কেউ ফিরে তাকাবে না।

উর্বশী নতমস্তকে বললেন, দেবরাজ, এখানে আমার অরুচি ধরেছে। সব পুরুষকেই আমি জয় করেছি, তাদের একঘেয়ে চাটুবাক্য আমার আর ভালো লাগে না। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে আমার অসংখ্য ভক্ত জুটবে, অর্থও প্রচুর পাব। জরার লক্ষণ দেখলে আবার না হয় এখানে চলে আসব।

— তোমার অত্যন্ত অহংকার হয়েছে দেখছি। এখানে তোমার আদরের অভাবটা কী?

—মানুষের কাছে ঢের বেশি আদর পাওয়া যায়। মর্ত্যের এক কবি লিখেছেন, 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।' অমরাবতীর কোন কবি এমন লিখতে পারে?

— কবিরা বিস্তর মিছে কথা লেখে। যদি প্রমাণ করতে পার যে এখানকার পুরুষকে তুমি জয় করেছ তবে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। দেবর্ষি আর মহর্ষিদের কাবু করতে পার?

—তাঁরা তো সেই কবে কাবু হয়ে গেছেন।

—আচ্ছা, তোমাকে পরীক্ষা করব। দিব্য মানব জান? যাঁরা স্বর্গে মর্ত্যে অবাধে আনাগোনা করেন, যেমন সনৎকুমার সনাতন সনক সদানন্দ। এঁরা হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। এঁদের ঘাঁটাতে চাই না, অত্যন্ত বদরাগী মুনি। তবে আরও তিনজন সম্প্রতি এখানে বেড়াতে এসেছেন, কুতুক, পর্বত আর কর্দম ঋষি। এঁরা বেশ শান্তস্বভাব আর একেবারে নির্বিকার। এঁদের কাবু করতে পারবে?

—যদি পুরুষ হন তবে কাবু করতে পারব না কেন?

—শুধু পুরুষ নন, ওঁরা মহাপুরুষ।

— তবে ওঁদের মহাকাবু করব।

—উত্তম কথা। ওঁরা হলেন দেবর্ষি নারদের বন্ধু। নারদকে বলব, তোমার নাচ দেখবার জন্যে আমার সভায় ওঁদের নিমন্ত্রণ করে আনবেন।

নারদের মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিন ঋষি প্রীত হলেন। বললেন, আমরা ময়ূরনৃত্য, খঞ্জননৃত্য দেখেছি, বানর-ভল্লুকাদির নৃত্যও দেখেছি, কিন্তু নারীনৃত্য কখনও দেখিনি। দেখবার জন্য খুব কৌতূহল আছে। কিন্তু উর্বশী তো শুনেছি অপ্সরা, সে নারী বটে তো?

নারদ বললেন, এমন নারী যার জন্যে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।' তার নৃত্য দেখলে তোমরা মুগ্ধ হবে। এখন ইন্দ্রসভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও।

পর্বত ঋষির দাড়ি গলা পর্যন্ত, কর্দমের বুক পর্যন্ত, আর কুতুক ঋষির হাঁটু পর্যন্ত। এঁরা যথাসাধ্য ভব্য বেশ ধারণ করে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। পর্বত একটি বল্কল পরলেন, বল্কল না থাকায় কর্দম শুধু কৌপীন ধারণ করলেন। মহামুনি কুতুক একবারে সর্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন, তাঁর বল্কলও নেই কৌপীনও নেই, অগত্যা তিনি দিগম্বর হয়েই রইলেন। নারদ বললেন, ওহে কুতুক, অন্তত একটি তৃণগুচ্ছের মেখলা পরে নাও। কুতুক বললেন, কোনো প্রয়োজন নেই, আজানুলম্বিত শ্মশ্রুই আমার বসন।

নবাগত তিন ঋষিকে পাদ্য অর্ঘ্য আসন ইত্যাদি দিয়ে যথাবিধি সৎকার করে ইন্দ্র বললেন, হে মহারাজা তপঃসিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিত্রয়, আমার মুখ্যা অপ্সরা উর্বশী আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত একটি অভিনব নৃত্য দেখাবে— নির্মোক নৃত্য, মর্ত্যলোকের প্রতীচ্যখণ্ডের ম্লেচ্ছগণ যাকে বলে স্ট্রিপ-টিজ। এখানে অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ সকলেই সমবেত হয়েছেন, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাও আছেন। আপনাদের আগমনে আমরা সকলেই কৃতার্থ হয়েছি। এখন অনুমতি দিন, উর্বশী নৃত্য আরম্ভ করুক।

আগন্তুক তিন ঋষির মুখপাত্র মহামুনি কতুক বললেন, হাঁ হাঁ, বিলম্বে প্রয়োজন কী, আমরা নৃত্য দেখবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি।

লাস্যনৃত্যের উপযুক্ত বেশভূষার উপর একটি আলখাল্লা বা ঘেরাটোপ পরে উর্বশী ইন্দ্রসভায় প্রবেশ করলেন। সকলকে প্রণাম করে যুক্তকরে বললেন, হে মহাভাগ দেবগণ এবং অগ্নিকল্প ঋষিগণ, আমি যে নির্মোক নৃত্য দেখাব তাতে আমার দেহ ক্রমে ক্রমে অপাবৃত হবে। আপনাদের তাতে আপত্তি নেই তো?

কুতুক তাঁর মাথা আর বিপুল দাড়ি নেড়ে বললেন, আপত্তি কীসের? যাবতীয় জন্তুর ন্যায় তোমার দেহও পঞ্চভূতের সমষ্টি। তার অভ্যন্তরে নারীসত্তা কোথায় আছে তাই আমরা দেখতে চাই।

উর্বশী পুনর্বার সবিনয়ে বললেন, আমার নৃত্যে যদি অসভ্য বা কুৎসিত কিছু দেখতে পান তো দয়া করে জানাবেন, তৎক্ষণাৎ আমি নৃত্য সংবরণ করব।

ঘেরাটোপ ফেলে দিয়ে উর্বশী তাঁর মণিমুক্তাস্বর্ণময় দৃষ্টিভ্রমকর উজ্জ্বলবেশ প্রকাশ করলেন। তারপর কিছুক্ষণ নৃত্য করে তাঁর উত্তরীয় বা ওড়না খুলে ফেলে দিলেন।

পর্বত ঋষি হাত তুলে বললেন, উর্বশী, নিবৃত্ত হও, তোমার নৃত্যে শালীনতার অত্যন্ত অভাব দেখছি, এই চিত্তপীড়াকর নৃত্য আমরা দেখতে চাই না।

মহামুনি কুতুক ধমক দিয়ে বললেন, তোমার চিত্তপীড়া হয়েছে তো আমাদের কী ? তুমি চক্ষু মুদ্রিত করে থাক, নৃত্য চলুক।

উর্বশী চুপি চুপি ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, পর্বত ঋষি কাবু হয়েছেন।

নৃত্য চলতে লাগল। পর্বত ঋষি দুই হাতে চোখ ঢাকলেন, কিন্তু কৌতূহল দমন করতে না পেরে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে উর্বশী তাঁর দেহের উর্ধ্বাংশ অনাবৃত করলেন। তখন কর্দম ঋষি চোখ ঢেকে বললেন, উর্বশী, তোমর এই জুগুপ্সিত নৃত্য দেখলে আমাদের তপস্যা নষ্ট হবে, ক্ষান্ত হও।

কুতুক ভর্ৎসনা করে বললেন, কেন ক্ষান্ত হবে? তোমার সহ্য না হয় তো উঠে যাও এখান থেকে।

সহাস চক্ষুর ইঙ্গিতে উর্বশী ইন্দ্রকে জানালেন যে কর্দমও কাবু হয়েছেন।

তার পর উর্বশী ক্রমশ তাঁর সমস্ত আবরণ আর আভরণ খুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন এবং অবশেষে 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি' প্রকাশ করে পাষাণবিগ্রহবৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সভাস্থ দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ বললেন, সাধু সাধু!

কুতুক বললেন, থামলে কেন উর্বশী, আরও নির্মোক ত্যাগ কর।

নারদ বললেন, আর নির্মোক কোথায়? উর্বশী তো সমস্তই মোচন করেছে।

কুতুক বললেন, ওই যে, ওর সর্বগাত্রে একটি পদ্মপলাশতুল্য শুভ্রারক্ত মসৃণ আবরণ রয়েছে।

— আরে ও তো ওর গায়ের চামড়া।

— ওটাও খুলে ফেলুক।

- পাগল হলে নাকি হে কুতুক? গায়ের চামড়া তো শরীরেরই অংশ, ও তো পরিচ্ছদ নয়।

— পরিচ্ছদ না হোক নির্মোক তো বটে। ওই খোলসটাও খুলে ফেলুক, নীচে কী আছে দেখব।

নারদ বললেন, কী আছে শোন। চর্মের নীচে আছে মেদ, তার নীচে মাংস, তার নীচে কংকাল।

— তার নীচে কী আছে?

— কিচ্ছু নেই।

— যার প্রভাবে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা', উর্বশীর সেই নারীত্ব কোথায় আছে?

—নারীত্ব আছে ওর বসনে, আভবণে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভাবভঙ্গিতে, আর অনুরাগী পুরুষের চিত্তে। তুমি তো বীতরাগ, চিত্ত পুড়িয়ে খেয়েছ, দেখবে কী করে?

মহামুনি কুতুক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে প্রতারিত করবার জন্যে এখানে ডেকে এনেছ? এই উর্বশী একটা অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে ওর দেহের প্রভেদ কী? ওহে পর্বত, ওহে কর্দম, চল আমরা যাই, এখানে দেখবার কিছু নেই।

উর্বশীর লাঞ্ছনা দেখে মেনকা ঘৃতাচী মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরার দল আনন্দে করতালি দিলেন।

কুতুক পর্বত ও কর্দম সভা ত্যাগ করলে উর্বশী নতমুখে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

ইন্দ্র বললেন, উর্বশী, শান্ত হও, নিরন্তর জয়লাভ করাও ভাগ্যে ঘটে না, আমিও বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলাম।

উর্বশী বললেন, একে কি পরাজয় বলে দেবরাজ? ওই কুতুক ঋষি একটা অপুরুষ অপদার্থ দগ্ধেন্দ্রিয় উন্মাদ, ওকে দিয়ে এই সভায় আমার এমন অপমান করিয়ে আপনার কী লাভ হল? আমি অমরাবতীতে থাকব না, মর্ত্যেও যাব না, তপশ্চর্যা করব।

অনন্তর উর্বশী মাথা মুড়োলেন, তুলসীমালা পরলেন, তিলকচর্চা করলেন এবং নিত্যধাম গোলোকে গিয়ে হরিপাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন।

আদরিণী



প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ভাদ্র মাসের এক পড়ন্ত বেলায় খালধার দিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম। কদিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ, দারুণ চাপা গরমের ঠেলায় শহরবাসীরা অস্থির। মধ্যে মধ্যে প্রকৃতি দেবী তাঁর ত্যাজ্যসন্তান বঙ্গবাসীদের ওপর দিয়ে তাপসহনশীলতার যে পরীক্ষা চালান তারই একটি মহলা চলেছিল। ঘামে আর খালধারের মেটে রাস্তার ধুলোয় অঙ্গটি পচা ভাদ্রের একটি বিশিষ্ট সংস্করণ হয়ে উঠেছে, এমন সময় আকাশের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল।

দেখতে দেখতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই সারা শহর অন্ধকার হয়ে গেল। বরাতে দুঃখ আছে ভেবে দৌড়ে-হাঁটা শুরু করলুম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! কিছুদূব যেতে না যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে গেল। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে আশ্রয়ের চেষ্টায় মারলুম দৌড়। শেষকালে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে এক খোলার চালের বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়া গেল।

যে জায়গাটায় এসে আশ্রয় নিলুম সেখানে আবও দু'চারজন রাহীলোক দাঁড়িয়েছিল। একটা বড়ো খোলার চালের বাড়ি, রাস্তার ধারে চালাটা খানিকটা বের করা আর ঝোলা — তাবই নীচে মাথা গুঁজে আত্মবক্ষার চেষ্টা করতে লাগলুম। মাথা বাঁচল বটে, কিন্তু জলের ছাটে সর্বাঙ্গ ভিজতে লাগল আর মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আত্মসম্ভ্রমের ওপর বলাৎকার শুরু করে দিলে।

অনন্যোপায় হয়ে কাকভেজার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলুম। বৃষ্টির ছাট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা একে একে সরে পড়তে লাগল। আমার বাড়ি অনেক দূরে - বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া সুবিবেচনার কাজ হবে না, কাজেই স্থির করা গেল জল না থামলে নড়ব না।

এতক্ষণে আমার আশপাশের চারিদিকে ভালো করে দেখবার সুযোগ হল। গলিটা বেশ চওড়া —দু'খানা গোরুর গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। গলির দু'ধারেই খোলার বাড়ি —একেবারে শেষ অবধি।

দেখলুম আমার সামনেই রাস্তার ওপাশে আর একখানা খোলার বাড়ির গা ঘেঁষে এক ভিখারি বসে অবিশ্রান্ত চেঁচিয়ে ভিক্ষা চাইছে। লোকটি অন্ধ। মাথায় লম্বা চুল ও মুখের লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। হিন্দুস্থানী ভাষায় সে চেঁচাচ্ছিল— সে আক্ষেপের মধ্যে আল্লা ও খোদার বাহুল্য শুনে মনে হল সে ব্যক্তি মুসলমান।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছে। বৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সামনের সেই অন্ধ ভিখারিও অবিশ্রান্ত চিৎকার করছে। কখনো বা বৃষ্টির শব্দ তার আওয়াজকে ঢেকে ফেলছে, কখনো বা তার কণ্ঠস্বর বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে। আমি এপারে দাঁড়িয়ে ভিজে ভিজে লোকটার কৃচ্ছ্রসাধনা দেখছি আর মনে মনে গবেষণা কবছি, আল্লা ওরফে খোদা হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝতে পারে কি না!

বেলা পড়ে আসতে লাগল। ক্রমে রাস্তা জনবিরল হয়ে পড়ল। বৃষ্টিধারা কখনো একেবারে কমে আসে কিন্তু আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করলেই আবার চেপে আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলসমাধিস্থ হওয়ার চাইতে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া শ্রেয়ঃ— এই রকম একটা সঙ্কল্প মনে মনে দৃঢ় করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার কানের কাছে করুণ কণ্ঠে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ধ্বনিত হল— কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

চমকে পাশে দেখি একটি মেয়ে! বয়স তার বাইশ-তেইশ বছর হবে, রংটি ফিকে মেঘের মতো ময়লা। একখানা ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত। শাড়িখানা ভিজে গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে গিয়েছে, তার ছিন্ন অবকাশ দিয়ে উত্তমাঙ্গের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। অঙ্গ তার ভিখারিনির মতো কৃশ নয়, বেশ সুপুষ্ট— বিশেষজ্ঞের চোখে প্রথমেই তা ধরা পড়ে। সমস্ত দেহে এমন কমনীয়তা ও লাবণ্য যে রাস্তা দিয়ে চলে গেলে ফিরে চাইতে হয়, পাশে এসে দাঁড়ালে তো কথাই নেই।

ভিখারিনি আবার বললে — কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

দেখলুম সে থর-থর করে কাঁপছে।

বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবছি এমন সময় আবার সে বলে উঠল— একটি পয়সা ভিক্ষে দাও বাবা।

এবার তার চোখে চোখ পড়ল। চোখ দুটি এমন কিছু সুন্দর নয়, কিন্তু কী অদ্ভুত চাহনি চোখে! এমন করুণ দৃষ্টি আমি খুব কমই দেখেছি। হতশ্রী মালঞ্চের এক কোণে জঙ্গল পরিবেষ্টিত নির্জন স্বচ্ছ পুষ্করিণীর ধারে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে ধরণীর যে মর্মব্যথা সেই কালো জলের বুকে ফুটে উঠতে দেখা যায়, তার দৃষ্টিতে যেন সেই ব্যথা স্থির হয়ে আছে। কোনো প্রশ্ন না করে একটা পয়সা পকেট থেকে বের করে তার হাতে দিলুম।

ওপাবে সেই অন্ধ বৃদ্ধ তখনো তারস্বরে খোদাকে আবেদন জানাচ্ছে, বৃষ্টিধারা সমানে চলেছে। মেঘমণ্ডিত স্তিমিত সূর্যালোক আমার চারিদিকে অলৌকিক মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল।

পাশের মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলুম, আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে।

তার সঙ্গে আমি যে কথা বলতে চাই, তার সম্বন্ধে জানতে চাই তা বুঝতে পেরে আমার কাছ থেকে সে বেশ একটু দূরে সরে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে সেই অন্ধ বৃদ্ধেব হাতে পয়সাটা দিয়ে সামনের খোলার বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল।

ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল। মনে হতে লাগল, ওই মেয়েটা বোধ হয় ওই বুড়োরবই কেউ হবে. চারিদিক থেকে ভিক্ষে করে নিয়ে এসে বুড়োর কাছে জমা দেয়। ঐ বাড়িটার মধ্যেও সে নিশ্চয় ভিক্ষা করতে ঢুকেছে— ব্যাপারটা শেষ অবধি দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বৃষ্টি সমানে চলেছে। ওবই মধ্যে কখনো চেপে আসে, কখনো বা প্রায় থেমে যায়। সন্ধে হয়ে এলেও মেঘ কেটে যাওয়ায় তখনো একটু আলো আছে। বৃদ্ধ ভিখারির চিৎকারে একটু মন্দা পড়েছে, বোধ হয় সারাদিন চেঁচিয়ে এবার তার দম ফুরিয়ে এসেছে। আমি একদৃষ্টে সেই খোলার বাড়ির দরজার দিকে চেয়ে আছি।

হঠাৎ দেখলুম, একটি স্ত্রীলোক সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে দবজাব ধারের বাঁধানো রকের ওপর এসে বসল। চামচিকের মতন কালো আর রোগা, ধপধপে সাদা একখানা চওড়াপাড় শাড়ি পরা — চুল বাঁধার বাহাব দেখেই বুঝতে পারলুম কে সে--কেন ওখানে বসে আছে।

মিনিট কয়েকেব মধ্যে আর একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে রকে বসল। আমি যে বাড়িটার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলুম, দেখলুম সেখানকার দরজাতেও দু' চাবজন স্ত্রীলোক এসে জমা হয়েছে। অন্ধকার ঘোর হবাব আগেই তাবা বেসাতি খুলে বসল। দেখলুম ওপাবেব সেই অন্ধ বৃদ্ধও তার জায়গা ছেড়ে উঠে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই দেখলুম, আমার সেই দয়াময়ী ভিখারিনি পরিষ্কার কাপড় পরে দরজায় এসে দাঁড়াল। বোধ হয় এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে বৃষ্টিও একেবারে থ মেরে গেল।

সংসারে আশ্চর্য ব্যাপারের অভাব নেই। শহরে যাবা চোখ চেয়ে বাস করে অনেক আশ্চর্য ব্যাপারই তাদের কাছে অতিসাধারণ হয়ে ওঠে, তবুও এই ভিখারিনির ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। আমি স্থির কবলুম তার সম্বন্ধে জানতেই হবে।

জামাটা গা থেকে খুলে নিংড়ে কাঁধে ফেলেছিলুম। সেই অবস্থাতেই রাস্তা পার হয়ে ভিখারিনির কাছে গিয়ে দবদস্তুর করে একেবারে তার ঘরে গিয়ে উঠলুম।

ঘরের ভেতরকার আসবাব ও তৈজসপত্রের বিবরণ আর দেব না। বাঙালি পাঠক-পাঠিকারা সে বিবরণ বহুবার অন্যত্র পাঠ করেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম— তোমার নাম কী?

—আদরিণী, আৎরী বলে সবাই ডাকে।

ঘরের মধ্যে একটা ডিটমারের আলো জ্বলছিল, আদরিণী তার পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল।

জিজ্ঞাসা করলুম — আমাকে চিনতে পারছ?

প্রশ্ন শুনেই আৎরী হাসতে আরম্ভ করে দিলে? হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বললে —আহা কত ঢংই জান! আজ কী নেশা করা হয়েছে শুনি?

এই বলেই সে ভিজে জামাটা আমার কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে বললে— দাঁড়াও। উনুনের ধারে এটাকে টাঙিয়ে দিয়ে আসি—এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে।

আদরিণী জামাটা আমার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কী জানি বেপোট জায়গায় এসে আজ জামাটাই বুঝি আক্কেলসেলামী দিতে হয়। কিন্তু তখুনি সে ফিরে এসে বললে—এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে।

তারপরে আমার ধুতিটাকে হাত দিয়ে বললে—এঃ ধুতিও যে ভিজে গিয়েছে। একখানা শাড়ি পরে ওটা খুলে দাও, শুকোতে দিয়ে দি।

সে উঠে গিয়ে আলনা থেকে একখানা চিরকুট ময়লা শাড়ি নিয়ে এসে বললে—নাও ওটা ছেড়ে ফেল।

ধুতিখানা আর বেহাত করবার ইচ্ছা ছিল না। বললুম—ও এখুনি গায়েই শুকিয়ে যাবে। তুমি একটু স্থির হয়ে বসো তো, তোমায় গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করি!

শাড়িখানা ছুঁড়ে একপাশে ফেলে দিয়ে সে আমার গা ঘেঁষে বসে বললে—বল।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম—ঠিক করে বল তো আমায় চিনতে পারছ কি না?

— তুমি তো মোড়ের ওই বাঁশগোলায় কাজ কর। আগে দু'তিনবাব এসেছিলে।

একটু রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলুম না। বললুম—ছেলেবেলা থেকে বাঁশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও ঠিক বাঁশগোলায় কখনো কাজ করিনি।

রসিকতাটা ঠিক বুঝতে না পেরে আদরিণী হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি বললুম—দেখ তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজে এসেছি। গোটাকতক কথার ঠিক উত্তর দিতে হবে—আমার অন্য কোনো মতলব নেই, অবিশ্যি তোমার যা প্রাপ্য তা দেব, ভয় নেই।

আমার কথা শুনে আদরিণী ভয় পেয়ে গেল। সে আমায় ঠেসে গা ঘেঁষে বসেছিল, বেশ বুঝতে পারলুম অতি সন্তর্পণে আমার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে সেই দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনি কি পুলিশের লোক? বাবা আমি কোনো দোষ করিনি, আমার ওপর কোনো অত্যাচার করবেন না, আমি আপনার মেয়ে—মেয়েকে রক্ষে করুন।

এই বলে সে আমার পা দুটো চেপে ধরলে।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। কেন যে আদরিণী অতখানি বাড়াবাড়ি করলে, তা বুঝতে পারলুম না। তাকে অভয় ও সান্ত্বনা দিয়ে বললুম—আমি মোটেই পুলিশের লোক নই, বরং আমার দ্বারা যদি তোমার কোনো উপকার হয় তো বল আমি তা করতে চেষ্টা করব। তুমি বড়ো ভালো মেয়ে। তোমার মনের একটু পরিচয় পেয়েছি বলেই তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি - তোমার কোনো ভয় নেই।

আদরিণীর মুখে হাসি ফুটল। আশ্বাস পেয়ে সে আবার 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরলে। বললে—আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার বাবা।

এই বলে সে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললে— বাবার বয়েস কত?—

তেইশ বছর।

আদরিণী খিলখিল করে হেসে উঠে বললে—বেশ হল, বাপ আর মেয়ে একই বয়সি। আমারও তেইশ বছর বয়েস বাবা।

ঠিক এইসময় আমাদের চমকে দিয়ে ঘরের বাইরে কে ঝঙ্কার দিলে—কে রে! কার সঙ্গে অমন মশকরা হচ্ছে! কে এয়েছে?

আদরিণীর হাসি থেমে গেল। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলে উঠল—তোর বর এয়েছে। রাস্তা থেকে তোর বর নিয়ে এয়েছি—আয় না ভেতরে।

দরজা ধাক্কা দিয়ে এক নারী ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমার মনে হল দীনবন্ধু মিত্তিরের 'জগদম্বা' বুঝি নাটক থেকে উঠে এল।

আদরিণী বললে—দেখ তোর জন্যে কেমন বর জুটিয়ে এনেছি।

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি বাবা পছন্দ হয়?

—মুখ্যে আগুন! দিনে দিনে কত রঙ্গই হচ্ছে! নে নে আদিখ্যেতা রেখে শিগগির কর। আবার লোক আসবে—

এই বলে স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

আদরিণী হাসতে হাসতে বললে—কেমন বাবা, পছন্দ হয়েছে আমার মাকে?

জিজ্ঞাসা করলুম—উটি কি তোমার মা নাকি?

আদরিণী অন্যদিকে মুখ করে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই আমার জামাটা হাতে নিয়ে সে ফিরে এল। দেখলুম আমার ধপধপে সাদা সিল্ক টুইলের সার্ট ধোঁয়ায় প্রায় কালো হয়ে গিয়েছে, আর তা থেকে মাছের ঝোল আর ধোঁয়া মিলিয়ে এমন একটা বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে যে, গায়ে দেওয়া দূরের কথা, সেটাকে কাছে রাখলে বমি ঠেলে আসে।

জামাটাকে গুটিয়ে পাশে রেখে বললুম—রসিকতা তো খুব হল, এবার আমার কথার জবাব দাও দিকিনি।

—কী বল?

আমার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে নিয়ে ওই যে অন্ধ বুড়োটাকে দিলে, ও তোমার কে হয়?

আদরিণী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে—ও তুমিই বুঝি ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিলে! এতক্ষণে বুঝেছি!

—কে হয় ও বুড়োটা তোমার?

— কে আবার হবে! ও তো মোচলমান।

– তবে?

আদরিণী কোনো কথা বললে না, চুপচাপ মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

বললুম--তোমার তো অভাব কিছুই দেখছি না, তবে তুমি ভিক্ষাবৃত্তি কর কেন? আর কার জন্যেই বা কর?

আদরিণী চট করে উঠে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে কী দেখে ফিরে এসে বললে—বাবা, আজ তুমি বাড়ি যাও, বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে—বলব—তোমাকে আমার সব কথা বলব, কিন্তু আজ নয়—কবে আসবে বল?

—আবার আসতে হবে?

নিশ্চয় আসতে হবে। ভুলো না, আমি তোমার মেয়ে।

আদরিণী আমায় জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা কী জাত?

জাত-টাত আমি মানি না, তবে আমার শরীরে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে, এইটুকু বলতে পারি।

--- কী গোত্তর?

— ভরদ্বাজ।

— তোমার ভরদ্বাজের দিব্যি রইল--পরশু এস।

আদরিণীর বাবা ছিল ব্রাহ্মণ। বাঁকুড়ার কোন এক গ্রামে তাদের বাড়ি ছিল। কলকাতায় রসুইয়ে বামুনের কাজ করে সে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করত। পরিবার থাকত দেশে, কিন্তু আদরিণীর যখন সাত বছর বয়েস, তখন তার বাপ তাকে ও তার মাকে কলকাতায় নিয়ে এসে বাড়িতে তুললে। বছরখানেক যেতে না যেতে তার এক ভাই জন্মাল, আর তার ফলে তার মা মারা গেল। বাপের সঙ্গে আগে থাকতেই বাড়িউলির প্রণয় ছিল, মা মারা যেতে সে খোলাখুলিভাবেই ওই মেয়েমানুষটির সঙ্গে ঘর করতে লাগল। আট বছরের আদরিণী তার মা-মরা ভাইটিকে মানুষ করতে লাগল।

ভাইটি তার কাছেই থাকে, সেই তাকে খাওয়া দাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। তার ওপরে নতুন মার সঙ্গে খাটে, সংসারের কাজে জোগান দেয়, বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে আনে। দোষ করলে বাপও ঠেঙায়, নতুন মাও ঠেঙায় —গালাগালিগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

এমনি করে দিন চলছিল। যখন তার দশ-এগারো বছর বয়েস, সেই সময় তার বাপ মারা গেল। বাপ মারা যেতে নতুন মা তাকে এক বাবুদের বাড়ি বাসনমাজার কাজে লাগিয়ে দিল। সকালবেলা উঠে সে তার ভাই নন্দকে নিয়ে বাবুদের বাড়ি চলে যেত কাজ করতে, আর বাড়ি ফিরত রাত্রি দশটা-এগারোটার সময়—সেখানেই দু বেলা খেতে পেত। দু টাকা তার মাইনে ছিল বটে কিন্তু সে টাকা সে পেত না। তার নতুন মা ঠিক সময়ে বাবুদের কাছে গিয়ে তার মাইনেটা নিয়ে আসত—ছেলেমানুষ, হারিয়ে ফেলতে পারে।

আদরিণী নন্দকে মানুষ করে তুলবে—এই তার বালিকামনের অভিমান। নন্দর জামাকাপড় কোনো কিছুর খরচই নতুন মা দেয় না। তাই কাজের ফাঁকে মাঝেমাঝে বাবুদের বাড়ি থেকে নন্দকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষে করতে। দু'চার পয়সা যা পায়, তাই জমিয়ে ভাইকে জামাকাপড় কিনে দেয়। মধ্যে মধ্যে বাবুদের বাড়ি ছোটো ছেলেদের ছেঁড়া জামাও পায়।

নন্দ বড়ো হবে, লেখাপড়া শিখবে, বিয়ে করে বউ নিয়ে এসে সংসার পাতবে, দিদির দুঃখ ঘোচাবে এই তার চিন্তা, এই তার সুখ। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সে সব কষ্ট সহ্য করে। আরও কষ্ট সহ্য করতে রাজি।

নন্দর ছ বছর বয়স হল। আদরিণী ঠিক করলে তাকে ইশকুলে পাঠাবে। তার জামাকাপড়, ইশকুলের মাইনে, বইয়ের দাম এসব কোথা থেকে আসবে? নতুন মা কিছুই দিতে চায় না। নন্দকে ইশকুলে পাঠাবার জন্য বেশি জেদাজেদি আরম্ভ করায় নতুন মা বললে—আমি এত পয়সা কোথায় পাব? তুই তো উপযুক্ত হয়েছিস, এবার পয়সা রোজগার করে ভাইকে মানুষ কর।

নতুন মার প্রস্তাব শুনে আদরিণী বুঝতে পারলে নন্দর সঙ্গে তারও বয়েস বেড়েছে—বিনা সুপারিশে সে নিজেই পয়সা রোজগার করতে পারে।

ভাইকে সে ছেলের মতো করে মানুষ করেছে, তার জন্য বেশ্যা-বৃত্তি তো দূরের কথা, প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে—বাবুদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে সে রাস্তায় দাঁড়াতে আরম্ভ করলে।

নন্দ রোজ সকালে সেজেগুজে বই বগলে নিয়ে ইশকুলে যায়, আর তারই খরচ জোগাবার জন্য আদরিণী সন্ধ্যাবেলায় সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়ায়। প্রতি রাত্রে যা রোজগার হয়, নতুন মা নিয়ে নেয়। সে বলে তোদের মানুষ করার জন্য আমার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকাটা উঠে গেলে তোর পয়সা তুই রাখিস—তার আগে একটি পয়সাও পাবিনে।

আদরিণীর কোনো দুঃখ নেই। ভাই মানুষ হবে, যে ভাইকে সে বুকে করে মানুষ করেছে, তার তুলনায় কোনো কষ্টই কষ্ট নয়।

বছর পাঁচ ছয় বেশ কাটল। একদিন আদরিণী শুনতে পেলে নন্দ আর ইশকুলে যায় না। সারাদিন ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে সিদ্ধি বিড়ি খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—ইশকুলের মাইনে তাতেই খরচ হয়ে যায়।

খবরটা শুনে সে কেঁদে ফেললে। ভাইকে ডেকে বোঝালে, এমন করিসনি ভাই। তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে আমার দুঃখ ঘুচবে।

ভাই মানলে না। লেখাপড়া তার হবে না। নতুন মাও তার সঙ্গে সায় দিলে। বললে—এতগুলো করে টাকা মিছিমিছি নষ্ট করা—যদিও সে টাকা তারই রোজগার।

নন্দ খায়দায়, হই হই করে ঘুরে বেড়ায়। মাঝেমাঝে রাতে বাড়ি আসে না। বলে কোথায় কাজ শিখছে, সারারাত খাটতে হয়। সকালবেলা বাড়ি আসে—চুল উশকোখুশকো, চোখ রাঙা।

নতুন মার সঙ্গে নন্দর ঝগড়া হয়। নতুন মা বলে, তোকে আর খেতে দিতে পারব না—বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।

আদরিণী তাকে বোঝায়। নিজেও বুঝতে পারে নন্দ আর সে নন্দ নেই। ভরত ঋষির হরিণের মতন সে হরিণীর সন্ধান পেয়েছে—তার বুকের মধ্যে হা হা করে ওঠে।

একদিন নতুন মার সঙ্গে কী নিয়ে নন্দর ঝগড়া বাধল। নতুন মা তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিলে। আদরিণী তাকে কত মানা করলে। বললে, যাসনি নন্দ, তুই চলে গেলে আমার কী রইল। দু'দিন থাক, দেনাটা শেষ হয়ে গেলে আমরা দুজনেই চলে যাব।

নন্দ শুনলে না, চলে গেলে।

আদরিণীর সংসার শূন্য হয়ে গেল। ভাইকে মানুষ করে তুলবে, সে লেখাপড়া শিখে পয়সা রোজগার করবে, তার বিয়ে হবে, ছেলেমেয়ে হবে, তাদের কোলে করে মানুষ করবে—এই তার চিন্তা ছিল। এইজন্য তেরো বছর বয়সে সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কালো মেঘ এসে তার মানসউদ্যান ছেয়ে ফেললে, তার জীবন অন্ধকার হয়ে গেল। তার একমাত্র অবলম্বন, যাকে কেন্দ্র করে সে বেঁচে ছিল, সে-ই অতি রূঢ় আঘাত দিয়ে তার সুখস্বপ্ন নষ্ট করে দিলে।

নন্দ মধ্যে মধ্যে আসে। রুক্ষ চুল, মনে হয় কদিন নাওয়াখাওয়া হয়নি। সে পয়সা চায়। কিন্তু আদরিণী পয়সা কোথায় পাবে!

আবার সে ভিক্ষায় বেরুতে লাগল। দুপুরবেলা ঘণ্টা দু'তিন ঘুরে বেশ রোজগার হতে লাগল। ভিক্ষার পয়সা জমিয়ে জমিয়ে সে নন্দকে সাহায্য করতে থাকে। আশা কুহকিনী আবার মনে রঙিন কল্পনা জাগিয়ে তুলতে থাকে। নন্দ মানুষ হবে— তাকে নিয়ে সে নিজের সংসার গড়ে তুলবে।

এই সময় আদরিণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার জীবনের এই ইতিহাস একদিন নয়, তার ঘরে চোদ্দ পনেরো দিন গিয়ে কিছু কিছু দেখে শুনে একটু একটু করে জানতে পারলুম।

সাধারণ মানুষ একসঙ্গে দুটো জীবন যাপন করে। এক তার কর্মজীবন অর্থাৎ বাস্তব জীবন। যেখানে সে খায়দায়, কাজকর্ম করে, অর্থ রোজগার করে, নিজের সুখ ও স্বার্থের সঙ্গে নিয়ত যেখানে বাইরের সংসারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে। যাকে বৈজ্ঞানিকগণ নাম দিয়েছেন জীবন সংগ্রাম। অন্যটি তার মানসজীবন, যেখানে বাস্তবের সঙ্গে কোনো সংগ্রাম নাই। নিজের মনের গঠন, অভিরুচি ও কল্পনা দিয়ে সে এক রাজ্য তৈরি করে সেখানে বাস করে। হয়তো বাস্তবজীবনে সে রাস্তার মুটে, মানসজীবনে সে বিশ্বের রাজা। এই কর্মজীবনের সঙ্গে মানসজীবনের যে যত বেশি আপোস করতে পারে, সেই তত বেশি কাজের লোক। অধিকাংশ লোকই সে আপোষ করতে পারে না, তাই জগতে কাজের লোকের সংখ্যা কম।

বাস্তবজীবনে অতি নিম্নশ্রেণির দেহোপজীবিনী হলেও আমি দেখতে পেতুম মানসজীবনে আদরিণী মহীয়সী নারী। বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী সে। সেখানে স্বামী, পুত্র, পরিজন ও আশ্রিতজনে ভরা তার গৃহ। বাস্তবজীবনে সে নিঃস্ব, কিন্তু মানসজীবনে তার দানধ্যানের অন্ত নাই— দুঃখীজনের প্রতি সহমর্মিতায় সে পরমকারুণিক। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি দেহ বিক্রয় করা তার উপজীবিকা, কিন্তু মনে সে সাবিত্রীসমা। সেখানে স্বামী ছাড়া তার অন্য ধ্যান নাই।

একদিন আদরিণী আমায় বললে -বাবা, আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। যে ভাইকে মানুষ করবার জন্য স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি বরণ করেছিলুম, সে তো বদমায়েস হয়ে গেল। আর কেন! তুমি আমায় নিয়ে চল তোমার বাড়িতে।

বললুম - আমার বাড়িতে গিয়ে কী করবে?

সে বললে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে ঝিয়ের কাজ করব। আমার মাইনে দিতে হবে না - দু'বেলা দুটি খেতে দেবে।

সমানবয়সি মেয়ে নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হলে আমার পিতৃত্বে যে কেউ বিশ্বাস করবে না, সে কথা বলে তাকে আঘাত দিতে সঙ্কোচ হল। বললুম - আচ্ছা বাড়িতে জিজ্ঞেস করে দেখব।

কিছুদিন পরে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তার ঘরের সামনে উঠোনে একটা ছোঁড়া দাঁড়িয়ে আছে, আর সে তার ঘরের দরজার একটা পাল্লা ধরে তার সঙ্গে গল্প করছে। আমাকে দেখেই ছোঁড়াটা চলে গেল। দেখলুম আদরিণীর ডান দিকের ভুরুর পাশে রগটা একটু ফোলা আর তার চারদিকে অনেকখানি জায়গা কালশিরে পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম— কী হয়েছে, কী করে লাগল ওখানটায়?

আদরিণী গম্ভীরভাবে বললে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বাবা।

—নেশা করে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

—খেতে পাইনে আবার নেশা!

জেরায় প্রকাশ পেল দিনদশেক আগে একদিন তার ভাই নন্দ মদ খেয়ে এসে তার কাছে টাকা চায়। টাকা কাছে ছিল না। কদিন থেকে শরীর খারাপ থাকায় দুপুরবেলা ভিক্ষায় বেরুতে পারেনি। নন্দ সে কথা মানলে না। শেষকালে রেগে গিয়ে সে তাকে মেরে অজ্ঞান করে রেখে যায়।

আদরিণীর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, —একে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলব না তো আর কী বলব!

সেদিন সে আশ্চর্য রকমের গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার কী হল, একবারও সে প্রশ্ন আমাকে করলে না। যদিও প্রতি মুহূর্তেই আমি আশঙ্কা করছিলুম এবার বোধ হয় সে-কথা জিজ্ঞাসা করবে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একবার সে বললে—বাবা, তোমাকে একটা কথা বলব।

—কী বল?

—আমি এই বৃত্তি ছেড়ে দিতে চাই।

—খুব ভালো। কী করবে?

· আমি বিয়ে করে চলে যাব এখান থেকে।

— সে তো ভালো কথা। কাকে বিয়ে করবে?

— হেমাকে। তোমায় সম্প্রদান করতে হবে কিন্তু।

বললুম— সম্প্রদান করতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু হেমাটি কে?

—ওই যে লোকটি উঠানে দাঁড়িয়েছিল, তুমি আসতে চলে গেল।

—ও কাদের ছেলে?

—হাড়ীদের!!!

আদরিণীর বস্তির একটু দূরেই একটা বড়ো মাঠ পড়েছিল। বড়ো মানে শহরের হিসাবে বড়ো। এই মাঠের একদিকে কয়েকঘর মুসলমান বাস করত। এরা সারা মাঠে বড়ো বড়ো চেটাই পেতে টিকে দিত, এইজন্য এই মাঠকে ও অঞ্চলের লোকেরা 'টিকেপাড়া'র মাঠ বলত। সে সময় কলকাতার অনেক জায়গায় এই রকম টিকেপাড়ার মাঠ ছিল। এই টিকেপাড়ার মাঠের আর এককোণে ছিল ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর হাড়ীর বাস। হাড়ীরা শুয়োর পুষত আর সেই শুয়োরের দল মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে টিকেপাড়ায় গিয়ে চেটাইয়ের আধশুকনো টিকে চটকে দিত বলে টিকেওয়ালাদের সঙ্গে হাড়ীদের দস্তুরমতন যুদ্ধ বেধে যেত। হাড়ীরা স্ত্রীপুরুষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত। হাড়ীদের মধ্যে বড়োলোক, মেজোলোক ও ছোটোলোক এই তিন সম্প্রদায়। বড়োলোকের মেয়েরা মেথরানির কাজ ছেড়ে দিয়ে ছেঁড়া জামাকাপড়ের বদলে বাসন বিক্রি করত। ছেলেরা পুজোপার্বণে লোকের বাড়িতে শানাই বাজাত ও অন্য সময় বাঁশের চ্যাচাবি দিয়ে ঝুড়ি, চেটাই, দর্মা ও শোভাযাত্রায় বাহার দেবার বড়ো বড়ো পুতুল তৈরি করত। মেজোলোকদের মেয়েরা লোকের বাড়ি মেথরানির কাজ করত আর পুরুষেরা বাঁশের কাজ করত। আর ছোটোলোকদের স্ত্রীপুরুষ মেথরের কাজ করত। হেমা হচ্ছে হাড়ীদের মধ্যে বড়োলোকের ছেলে। তাদের বাড়ির কেউ মেথর মেথরানির কাজ করে না। হেমা শানাই বাজায় আর অন্য সময়ে বাঁশের কাজ করে।

আদরিণীর নতুন মায়ের নাম নিস্তারিণী। তার অধীনে আদরিণী ছাড়া আরও অনেকগুলি হতভাগিনী বাস করত। এদের সবার রোজগারই তার তহবিলে জমা হত। এই মেয়েগুলি তাকে নিস্তার মা বলে ডাকত। আমি তার নাম দিয়েছিলুম —ফাদার নিস্তার।

নিস্তারিণীর বাড়িতে কতকগুলো খালি ঘর ছিল। সেগুলোকে সে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দিত। এই ঘরগুলোকে বলা হত খোঞ্চে। আসলে কিন্তু ঘরগুলো ছিল গোপন মিলনকুঞ্জ। বাইরের যে কোনো স্ত্রীপুরুষ এসে ঘণ্টায় দু'আনা দিয়ে এই ঘর ভাড়া নিতে পারত। ফাদার নিস্তারের খোঞ্চের কথা তখনকার দিনে গুণীলোক মাত্রেরই জানা ছিল।

হাড়ীপাড়ার মেয়েদের দেহসৌষ্ঠবের কথা সকলেই জানে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তারা দু-পট্টির লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে করতে যেত। ফলে তাদের মধ্যে অনেককেই ফাদার নিস্তারের খোঞ্চেতে দেখা যেত। মাঝেমাঝে সেখানে শাশুড়ি-বউয়ে, মায়ে-ঝিয়ে ঠোকাঠুকি হয়ে গিয়ে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হত। এইখানকারই এক বয়স্থা হাড়ীগিন্নির সঙ্গে হেমার প্রণয় হয়েছিল এবং তারা প্রায়ই ফাদার নিস্তারের খোঞ্চেতে আসত, মিলনের জন্য। এই সূত্রে আদরিণীর সঙ্গে হেমার পরিচয় ঘটে।

হেমাকে নিয়ে তাদের পাড়ার যে স্ত্রীলোক খোঞ্চেতে আসত, তার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। এদিকে ফাদার নিস্তারের দাপটে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। এরা দুজনেই তাদের বিয়ে নিয়ে দুদিকে ঘোঁট বাধিয়ে তুললে। এই ঘোঁট যখন বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় আমি তাদের বিয়ের কথা শুনলুম।

সত্যি কথা বলতে কী, আদরিণীর বিয়ের সম্বন্ধটি আমারও ভালো লাগল না। বিয়েতে কিছু আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাড়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, এই চিন্তা আমাকে পীড়া দিতে লাগল।

আদরিণী আমায় বার-বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল—বাবা তুমি কী বল?

জিজ্ঞাসা করলুম —আচ্ছা, তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? এখন যে অবস্থায় আছ, বিয়ে করে কি তার চেয়ে ভালো থাকবে?

আদরিণী বললে— এখন আমি কিছুই ভালো নেই, বিয়ে করলে হয়তো এর চেয়ে ভালো থাকতে পারি। নন্দকে মানুষ করব বলে এ কাজ আরম্ভ করেছিলুম, নইলে লোকের বাড়ি গতর খেটে আমার ভাতকাপড়ের খরচ উঠে যেত। হয়তো একটা ভালো লোকের সঙ্গে ঘর করতে পারতুম। কিন্তু আমার বরাত। যার জন্য এত করলুম সে হল একটা অমানুষ—আমার দুঃখ সে বুঝলে না। বিয়ে করলে আর যাই হোক, তবু নিজের ঘর পাব—ছেলেপিলে পাব। এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি বললুম— আচ্ছা, তোমাকে যদি লেখাপড়া শেখবার বন্দোবস্ত করে দিই। তুমি নিজের জীবিকার জন্য কোনো একটা কাজ শিখে স্বাধীনভাবে থাকবে। কোনো ভদ্রলোককে বিয়ে করবে-না হয় এমনিই ভদ্রভাবে থাকবে-—এমন তো অনেক মেয়ে আছে।

আমার কথা শুনে আদরিণীর মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। সে বললে— আমার লেখাপড়া হবে বাবা? বয়েস যে অনেক হয়ে গিয়েছে তোমার মেয়ের!

—লেখাপড়ার আবার বয়েস আছে নাকি? মন দিলে সব বয়েসে লেখাপড়া শেখা যায়।

- সেই ভালো বাবা। তুমি তার ব্যবস্থা কর--বিয়ে এখন থাক।

বাল্যকালে একটি বিধবা মহিলা আমাদের পড়াতেন। ভবিষ্যতে ইনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছেড়ে দিয়ে এক বিধবা আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিজের টাকাকড়ি কিছু ছিল না, চারদিক থেকে চাঁদা তুলে কোনো রকমে আশ্রম চালাতেন। আমার বাবা এই আশ্রমের একজন মুরুব্বি ছিলেন। আশ্রমে অনেকগুলি বিধবার সঙ্গে কয়েকটি অনাথা কুমারীও প্রতিপালিত হত। আমি সাহস করে একদিন আশ্রমের কর্ত্রী ঠাকুরানির সঙ্গে দেখা করে আদরিণীর কথা বললুম। বলা বাহুল্য আদরিণী যে ফাদার নিস্তারের আশ্রমের লোক, সে কথা একদম চেপে গিয়েছিলুম। তার সম্বন্ধে সত্যমিথ্যায় মিলিয়ে বেশ একটি করুণ কাহিনী রচনা করে তাকে শোনালুম।

সব শুনে তিনি প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলেন -তার সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ? কোথায় আলাপ হল?

এই রকম সব প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলুম। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক জেরা করে তিনি আমায় বললেন - আপাতত তাঁদের ফন্ড কম থাকায় কিছুদিন নতুন মেয়ে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, আমার হাতে যে একটি উদ্ধারকামী যুবতি আছে এবং তার হিতাহিতের প্রতি আমি বিশেষ মনোযোগী-- এই শুভ সংবাদটি অবিলম্বে আমার বাড়িতে জানিয়ে দিলেন।

আমার বাবার সঙ্গে একই সরকারি দপ্তরে এক ভদ্রলোক চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন ক্রিশ্চান এবং অবিবাহিত। আতুর ও দুঃখীজনের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। ইনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, বাবাও মাঝেমাঝে আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে যেতেন। কলকাতার রাস্তায় যে অসংখ্য আতুর ও অনাথ বালক-বালিকা ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য কী করে একটা আশ্রম খোলা যায়, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত। কিছুদিন পরে ভদ্রলোক সত্যিই একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। আমাদের বাড়ির কাছেই সস্তায় একখানা ভাঙা বাড়ি ভাড়া নিয়ে রাস্তা থেকে আট-দশজন আতুর কুড়িয়ে নিয়ে এসে তিনি কাজ শুরু করে দিলেন। সহায় সম্পদ তাঁর কিছুই ছিল না। প্রতিদিন সকালে বড়ো একখানা থলি বগলে নিয়ে তিনি মুষ্টিভিক্ষায় বেরুতেন। বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ আধমনটাক চাল ও কিছু তরকারি নিয়ে বাড়ি ফিরে রান্না চড়িয়ে দিতেন। তারপর নিজের হাতে আতুরদের স্নান করিয়ে খাইয়ে আবার বেরুতেন ভিক্ষা সংগ্রহে। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সেই প্রচেষ্টা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। সাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল — দেশজোড়া তার নামডাক হল, তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হল। কিন্তু বিখ্যাত হওয়ার বিপদ আছে। বৃদ্ধ বয়সে বদনামের পশরা মাথায় নিয়ে তাঁকে সেই নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে সরে যেতে হল।

সে কথা যাক, আমি একদিন সন্ধের সময় তাঁর কাছে গিয়ে আদরিণীকে তাঁর আশ্রমে স্থান দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করলুম। আদরিণীর যে-যে দুঃখের কাহিনী আমি তৈরি করেছিলুম তা শুনে ভদ্রলোকের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। কী করে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল, তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, বাবা এ বিষয়ে কিছু জানেন কি না, সে সব কোনো প্রশ্নই তিনি আমাকে করলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন— দেখ হে, আমাদের আশ্রমে কোনো মেয়ে নেই তো। পুরুষদের আশ্রমে তাকে নিয়ে এসে রাখা সুবিবেচনার কাজ হবেনা।

তুমি ছেলেমানুষ (তখন আমার চব্বিশ বছর বয়স), এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এই ব'লে ভবিষ্যতে আশ্রমে মেয়েদের যে বিভাগ হবে, সে সম্বন্ধে আমাকে বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি উঠতেই তিনি বললেন— তাই তো হে, তবে সে মেয়েটির সম্বন্ধে কী করা যায়? তুমি যে রকম বললে, তাতে তো মনে হচ্ছে সে যদি ভালো আশ্রয় না পায় তাহলে বিপথগামিনী হতে পারে।

— আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারে।

—তবে! তার সম্বন্ধে আমরা যখন জানতে পেরেছি, তখন কিছু দায়িত্ব আমাদের ওপরেও এসেছে। তার ভালোমন্দের বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ তো হতে পারছি না। কি বল?

আমি আব কী বলব। চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

তিনি বললেন-- এক কাজ করা যাক। মেয়েটিকে নিয়ে এস। আপাতত তাকে আমার ভাই কিংবা বোনের বাড়িতে রেখে দোব। পরে একটা ব্যবস্থা হবেই। ভগবান যখন তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন একটা ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন।

পরদিন সকালে আদরিণীকে গিয়ে বললুম— তোমার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি। ভালো গৃহস্থের বাড়িতে থাকবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে- - খুব ভালো লোক তারা।

আদরিণী একেবারে লাফিয়ে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে সে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে— তুমি আমার সত্যিকারের বাবা। গেল জন্মে আমার বাবা ছিলে নিশ্চয়।

শুনলুম ফাদার নিস্তার এ কয়দিন উঠতে-বসতে আদরিণীকে ঠেঙিয়েছে। হেমাকে সে বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে, কিন্তু হেমা কিছুতেই নিস্তারের কথা শোনে না। আদরিণী বললে--আহা! আমি চ'লে গেলে ছোঁড়াটার ভারী কষ্ট হবে- বড্ড ভালবাসে সে আমাকে।

আনন্দের উৎসাহে গড়গড় করে সে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। আমি বললুম— আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তোমার জিনিসপত্র কী নেবার গুছিয়ে নাও — এইবেলা বেরিয়ে পড়ি।

আদরিণী বললে--এখানকার কোনো জিনিস নেব না বাবা— এ পাপের জিনিস নিয়ে গেরস্তর পুণ্যের সংসারে ঢুকব না। নতুন করে জীবন আরম্ভ করব। এতদিন আমার জীবন যেভাবে কেটেছে, আমি মনে করব সে আমার নয়। এই পৃথিবীতে আমি যেন এমনি এসেছি, আমার বাপ, মা, ভাই কেউ নেই —কেউ কোনোদিন ছিল না। আমি যেন এক্ষুনি জন্মেছি—যারা আমায় আশ্রয় দিলে, তারাই হবে আমার সব।

আমি বললুম—তবুও একটা দুটো শাড়ি-গামছা ইত্যাদি নাও, কী জানি সেখানে গিয়ে তুমিও অসুবিধায় পড়বে, তাদেরও অসুবিধা হবে।

আমার কথায় রাজি হয়ে আদরিণী আলমারি থেকে কতকগুলো কাপড় বার করলে। পোঁটলা বাঁধতে বাঁধতে সে বললে --এবার বাবা আমি মন্তর নেব। তোমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিন্তু —

বললুম — বেশ।

আদরিণী জিজ্ঞাসা করলে-- কী জাত তারা?

— কারা?

—যেখানে যাচ্ছি।

—তারা ক্রিশ্চান, জাত-টাত মানে না।

—অ্যাঁ! ক্রিশ্চান! গোরু খায়?

আদরিণীর মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। সে পোঁটলাটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একদিকে সরিয়ে দিলে।

বললুম—ক্রীশ্চান হলেই কি গোরু খেতে হবে নাকি! তার বোধ হয় মাছ-মাংসও খায় না।

আদরিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কঠিন সুরে বললে—না বাবা, জীবনভোর অনেক পাপ করেছি, আর ক্রিশ্চানের অন্ন খাব না। বরাতে যা আছে হবে, সেখানে যাব না। হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে আমি।

কথাগুলো শুনে আমার রাগ হল। প্রতিদিন ছত্রিশ জাতের কাছে দেহ বিক্রি করে যে হিন্দুত্ব অক্ষুন্ন থাকে, ক্রিশ্চানের ঘরে থাকলে সে হিন্দুত্ব যে কিছুতেই নষ্ট হবে না, এই সোজা কথাটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই সে সেকথা মানতে রাজি হল না। শেষকালে সে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

ফাদার নিস্তার বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এরই মধ্যে সে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে—আবার কী হল? দিনরাত অমন করে মরছ কেন?

আদরিণী কিছু না বলে নীরবে কাঁদতে লাগল। নিস্তারিণী আমার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ গা, ভালোমানুষের বাছা! ওর মাথায় এ সব কী বুদ্ধি দিচ্ছ? এতে কি তোমার ভালো হবে, না ওরই ভালো হবে? কদিন থেকে যে এমন নাচানাচি শুরু করেছে—বলি কেন? কিসের জন্য শুনি?

জিজ্ঞাসা করলুম—কী হয়েছে?

—বলে চলে যাব, বিয়ে করব—লেখাপড়া শিখব। যা দিকিন্ তুই-—

আদরিণী এবার গর্জে উঠল—আলবাৎ যাব।

—তবে রে? বলে ফাদার নিস্তার একেবারে সিংহবিক্রমে আদরিণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অমানুষিক প্রহার করতে আরম্ভ করলে। আদরিণী কোনো বাধা দিলে না। সে মাটিতে পড়ে বলতে লাগল—মার, মার, মেরে যদি ফেলতে পারিস তবে বুঝব।

ফাদার নিস্তারের চিৎকারে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়াল, কিন্তু তারা কেউ আদরিণীকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এল না। এদিকে নিস্তারিণী মেরেই যেতে লাগল। শেষকালে খাটের তলা থেকে একটি ঘটি টেনে নিয়ে তাই নিয়ে আদরিণীর মাথা ও মুখ থেঁতলাতে আরম্ভ করে দিলে।

এবার আমি ছুটে গিয়ে নিস্তারিণীকে ধরে ফেললুম। বাড়ির মধ্যে বাইরেরও অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসে জমা হয়েছিল, তারা সকলেই পাড়ার লোক, সকলেই আৎরী ও ফাদার নিস্তারকে চেনে।

আমি ধরামাত্র নিস্তারিণী গর্জে উঠল— ভাল হবে না বলছি, তুমি সরে যাও। আমি নিস্তারিণী বাড়িউলি-—আমায় চেনো না?

আমার মাথায় তখন রাগ চড়ে গিয়েছে। নিস্তারিণীকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলুম। সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের বললুম—আমি একে পুলিশে দেব—তোমরা সবাই দেখেছ, এ আৎরীকে কী রকম মেরেছে।

পুলিশের নাম শুনেই ভিড়ের পুরুষ দর্শকরা একে একে সরে পড়তে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই হেমা ও তাদের পাড়ার এক পাল স্ত্রী-পুরুষ দৌড়ে বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

হেমা জিজ্ঞাসা করতে লাগল— কে কাকে মেলে! আৎরী-—আৎরী কোথায়?

একবার চারিদিক চেয়ে নিয়ে সে তড়াক করে দাওয়ায় উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে আদরিণীকে দেখে বললে— ইঃ এ যে মেরে ফেলেছে রে! কে মেলে? বল কে মেলে?

আদরিণীর মুখে কথা নেই, চোখে তার অশ্রু পর্যন্ত নেই—একটা বিশ্রী নিস্তব্ধতা। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, হেমাদের পাড়ার মেয়েরা ফাটিফাটি করছে, এমন সময় হেমা বললে—চ আৎরী আমাদের ঘরকে চ—কাল নগনসা আছে-

আদরিণী মাটি থেকে উঠে টলতে টলতে বললে—চ।

ফাদার নিস্তার এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাপরের মতন ভোঁস্ ভোঁস্ করছিল। মোটা মানুষ, পরিশ্রম করে কিছু ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আদরিণীকে অগ্রসর হতে দেখে সে গর্জে উঠে বললে— খবরদার আৎরী, বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছ কী খুন করে ফেলব—আমার নাম নিস্তারিণী—

নিস্তারিণীর মুখের কথা শেষ হতে না হতে আদরিণী ঘরের ভেতর থেকে লাফিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট দাওয়া টপকে একেবারে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিস্তারিণীর নাকে ছিল ইয়া ফাঁদি নৎ। দুই কানের ওপর থেকে ডিম অবধি সারি করে মাকড়ি— এক মুহূর্তের মধ্যে নাকের নৎ ও কানের দু'তিনটে মাকড়ি ও তার সঙ্গে যথোচিত চামড়া ও মাংস উড়ে গিয়ে রক্তধারা ছুটতে লাগল।

—ওরে বাবা, এত রক্ত —বলে নিস্তারিণী তো ঘুরে মাটিতে পড়ল ঐরাবতের মতন। রক্ত দেখে আদরিণীর মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে উঠলেই তার পেটে দমাদম লাথি মারতে আরম্ভ করে দিলে।

বাড়ির অন্য মেয়েরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। কেউ কাছে গিয়ে এসে তাকে ধরলে না—উঠোন রক্তে ভেসে যেতে লাগল। আদরিণীকে গিয়ে ধরব না পলায়ন করব ভাবছি, এমন সময় হেমা গিয়ে তাকে ধরে ফেললে।

আদরিণীকে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—চ হেমা।

আমি গুটিগুটি দরজা অবধি এগিয়ে পড়েছিলুম। আদরিণী এসে আমার একখানা হাত ধরে বললে—বাবা বুঝি মেয়ের কীর্তি দেখে সরে পড়ছিলে?

আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। মাঠের কাছে পৌঁছে আমি বললুম— আচ্ছা এবার আমি চললুম।

আদরিণী বললে—চললে বাবা! আচ্ছা তাহলে কাল নিশ্চয় এস—কাল আমার বিয়ে।

বললুম —ঠিক বলতে পারছি না, তবে দু' একদিনের মধ্যে আসব

—না, না, কাল আসতেই হবে।

তারপর একটু হেসে বললে -- তোমার ভরদ্বাজের দিব্যি রইল।

তার সঙ্গে সেই প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ল।

ভরদ্বাজের দিব্যি রাখতে পারিনি। বোধ হয় সপ্তাহখানেক পরে একদিন বিকেলে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। দেখলুম তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এক মাথা সিঁদুর দিয়ে একখানা লালপেড়ে কোরা শাড়ি পরে সে আমায় প্রণাম করলে।

বিয়ে করে কেমন লাগছে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রলোভন হতে লাগল। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবার আগেই খুশিতে ডগমগ হয়ে আদরিণী বললে—জান বাবা, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি পশ্চিমে। আমাদের দু-জনেরই রেলে চাকরি হয়েছে—মেথর ও মেথরানীর কাজ। ও পাস আনতে গেছে, কাল সকালবেলায় চলে যাব -

কমপিটিশন



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবশঙ্কর সকালে উঠেই দু দফা ফোন করলেন। একবার অ্যাটর্নি রায় ও মিত্রের জীবনধন রায়কে ও আর একবার প্রসন্নদাস বড়ালের অংশীদার ও কর্তা হরিদাস বড়ালকে; কারণ ওদের আপিস এখনো খোলে নি।

— নমস্কার, কি খবর?

— আসুন একবার। কতদূর করলেন?

— আসবো এখন?

— এখানেই চা খাবেন।

একটু পরে বাড়ির বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল এবং জীবনধন রায় ঘরে ঢুকলেন। জীবনধন রায়ের পরনে সাহেবি পোশাক, চোখে স্টিলের ফ্রেমের চশমা, পায়ে পেটেন্ট চামড়ার চকচকে বুট, বগলে ফোলিও ব্যাগ।

— আসুন, মিঃ রায়, বসুন। নমস্কার।

— নমস্কার।

— ওরে, চা নিয়ে আয়। তারপর?

— তৈরি। সরেজমিন তদারক করবেন না?

— রেজেস্ট্রি আপিস সার্চের রেজাল্ট কি?

— ভালো। দাগী মাল নয়, তবে দেড় — দেড়ের কমে হবে না। আমাদের তিন পার্সেন্ট।

শিবশঙ্করবাবু হরিশ মুখুয্যে স্ট্রিটে তিনতলা বড় বাড়ি কিনছেন এঁদের দালালিতে। দেড় লক্ষ টাকা দাম, অ্যাটর্নিরা তিন পার্সেন্ট কমিশন নেবেন --- আসল কথা হচ্ছে এই।....রূপোর ট্রে ভরে টোস্ট, ডিম সেদ্দ, আলু সেদ্দ ও লেটুস সেদ্দ এল, তার সঙ্গে চায়ের লিকার, দুধ চিনি, আলাদা

শিবশঙ্করবাবু বললেন — মিষ্টি দিই নি — কারণ আমাদের এ বয়সে —

— না না। থাক। তারপর আমার গাড়ি রেডি, চলুন একবার সরেজমিনে। জিনিসটা দেখুন।

— বেডরুম কতগুলো?

— উনিশটা রুম সবসুদ্ধ ওপরে নিচে। ছটা বাথরুম, এ বাদে বাইরে তিনটে আলাদা পাইখানা। খুব ভালো বাড়ি। কুণ্ডু কোম্পানিকে রাজি করতে বেগ পেতে হয়েছে খুব। বুড়ো একেবারে বেঁকে বসেছিল শেষকালে।

— এখন যেতে পারবো না — মাপ করুন। এখন বেলা দশটা পর্যন্ত মরবার ফুরসত নেই — এখুনি আবার লোক আসবে —

— আচ্ছা উঠি তাহলে। ওবেলা আপিসে ফোন করবেন এখন — ওখান থেকে যাওয়া যাবে।

একটু পরে হরিদাস বড়ালকে আবার ফোন করা হোল।

— নমস্কার, কি খবর? হ্যাঁ, একবার, করেছিলাম, —হ্যাঁ— এই আধ ঘণ্টা আগে। হ্যাঁ। সোনাটার কি হোল? বারের দাম কত বললেন? তিন আনা? আমার চাই কিছু — হাঁ — হ্যাঁ —হ্যাঁ — আচ্ছা। আজ? — হ্যাঁ — আচ্ছা। আপিসে? আচ্ছা।

সাধারণ লোকে এ কথাবার্তা থেকে বিশেষ কিছু বুঝবে না, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর 'বড়াল বার' নামক বিখ্যাত সুবর্ণের বাট কিনবার পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ক্রয়-বিক্রয়ের পালা শেষ হোতেই শিবশঙ্করের আপিস ম্যানেজার ও তদারককার মিঃ ঘোষাল ঢুকে শিবশঙ্করকে খানিকটা নিচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন। দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা শুরু হোলো তা স্কোয়ার ফুট রেট, পার্সেন্ট, ইস্পাতের জালতি, সিমেন্ট, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম, গ্যারিসন্ এনজিনিয়ার প্রভৃতি শব্দে পরিপূর্ণ ও কণ্টকিত। আজই মিঃ ঘোষালকে আপিসের কাজে তেজপুর যেতে হচ্ছে, ফোনে এখুনি

আসাম মেলে বার্থ রিজার্ভ সম্বন্ধে শেয়ালদা স্টেশনের কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হোলো। অন্য অন্য কথার পরে বেলা ন'টার সময়ে মিঃ ঘোষাল বললেন — তা হোলে আমি উঠি —

-- কত টাকার দরকার?

-- সতেরো হাজার তো ওদের পেমেন্ট করতে হবে, আর পুজোর ব্যবস্থা — তাও তিন হাজার নেবে সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হাজার খানেক দিতে হবে উপদেবতাদের। মিসেস বর্মনকে একটা প্রেজেন্ট দিতে হবে ভালো দেখে। কি দেওয়া যায়, স্যার, আপনিই বলুন।

একটা জড়োয়ার কিছু দাও গিয়ে — হাজার খানেকের মধ্যে। বিশ হাজারের একটা চেক নিয়ে যাও —

— আজ্ঞে স্যার, ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙানোর আমার সুবিধে হবে না। একটায় আসাম মেল। তার আগে আমার অনেক কাজ। একবার আপিসে যেতে হবে। ড্রয়ারের মধ্যে কাগজপত্র রয়েছে, নিয়ে যেতে হবে। গহনাই বা কিনবো কখন?

আচ্ছা গহনার জন্যে আমি সুরেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বদ্রিদাসের বাড়ি। যদি কিছু ভালো থাকে দেখে আসুক। সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি এখান থেকে বাড়ি যাও — নেয়ে খেয়ে গাড়ি নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে আগে চেক ভাঙাও। ওখান থেকে ইস্টিশানে চলে যাও —গহনা যদি পাই সুরেশকে দিয়ে ট্রেনে পাঠাবো। মিসেস বর্মনকে খুশি রাখা চাই মোটের ওপর। দেবতাকে তুষ্ট রাখতে হোলে দেবীর পুজো না দিলে হয় না। কম্পিটিশনের বাজার, বুঝে কাজ করবে।

ডাক এল। এক গাদা চিঠি। হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি একবার দেখে নিতে নিতে শিবশঙ্কর ডেকে বললেন

ও বিন্দে, নিয়ে যা — বড় বৌমার চিঠি, নিয়ে যা — সুলেখার — ছোট বৌমার — ওপরে দিগে যা। আর শোন — বলে আয় আমি চান করবো এখুনি।

খাবার ঘরে পুত্রবধূ নন্দা ভাত নিয়ে এলো টেবিলে। ছোট বাটিতে কাচামুগের ডাল, বে মশলার মৌরলা মাছের ঝোল আর কাগজি লেবু কাটা পৃথক ডিশে। সামান্য একটু 'বে-পাতা দই শ্বেতপাথরের বাটিতে। শিবশঙ্কর খেয়ে হজম করতে পারেন না, লিভারের রুগী। পুত্রবধূ বললে — ও বেলা কখন ফিরবেন বাবা'

তা কি বলতে পারি কখন ফিরবো? নানা কাজ। তারপর আজ আটর্নির সঙ্গে গুরুতর কাজ রয়েছে। কেন?

পুত্রবধূ হেসে বললে — আমরা ভাবছি বেহালা যাব পিকনিক করতে। গাড়িখানার দরকার ছিল

ও। তা — কটার সময়ে যাবে। গাড়ি না হয় শোভা সিং আপিস থেকে নিয়ে আসবে এখন। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। আসবার সময় তোমরা ট্যাক্সিতে এসো। পৌঁছে গাড়ি ছেড়ে দিও — বিমান কোথায়? ওপরে আছে?

পুত্রবধূ মুখ নত করে বললে — তা তো জানি নে বাবা।

তার মানে? বেরিয়েছে?

পুত্রবধূ পায়ের নখে মাটি খুঁটতে খুঁটতে সেদিকে চেয়ে থেকে উত্তর দিলে — উনি কাল রাত্তিরে তো বাড়ি আসেননি।

সে কি কথা। কালও আবার আসেনি — হুঁ

শিবশঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, আর কিছু বললেন না।

বেলা একটা। শিবশঙ্করের আপিস বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে। বেশি বড় আপিস নয়। জন আট নয় কেরানি বিবিধ খাতা নিয়ে ব্যস্ত। একজন ছোকরা টাইপরাইটারে ঠকঠক টাইপ করছে। শিবশঙ্করকে আপিসে ঢুকতে দেখে সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সন্ত্রস্ত হবার কথা।

দেখতে আপিস ছোট হোক, কিছু দিন আগে এই আপিসে বসেই শিবশঙ্কর সরকার চালের কারবারে কম করেও সাত লক্ষ টাকা মুনাফা পেয়েছেন। তেরশ' পঞ্চাশ সালে দুর্ভিক্ষের বছর। তেরো সিকে দরে ধানের মণ কিনে সাড়ে ষোল টাকা মণ দরে ধান বিক্রি করেন। চালের কনট্রাক্ট নিয়ে এক হাজার টন চাল খরিদ করেন ত্রিপুরা জেলা থেকে। তারপর সে দেশে চালের দর উঠে গেল চল্লিশ টাকা মণ।

ভালো করেননি তা নয়। দেশের বাড়িতে প্রায় দুহাজার লোককে ফেন-ভাতের খিচুড়ি খাইয়েছেন, কাপড় বিতরণ করেছেন কত লোককে। সম্প্রতি দুটি মিলিটারি কনট্রাক্টের কাজে শিবশঙ্কর অনেক টাকা রোজগার করেছেন। দুহাতে ঘুষ বিলিয়েও ছ লক্ষ টাকা ঘরে এনেছেন। এ বাদে খুচরো কারবার তাঁর অনেক রকম আছে,

এই ছোট আপিসটাতে বসে সারা বাজারের গুপ্ত খবর রাখচেন। টেলিফোনের বিরাম বিশ্রাম নেই এক মিনিট। বাজারে তাঁর বহু চর সর্বদা ঘোরাঘুরি করচে, শেয়ার মার্কেট থেকে সর্ষে পর্যন্ত কোনো বাজারের গুপ্ত খবর ওদের জানতে বাকি নেই।

মোটের উপর শিবশঙ্করের দিন যাচ্ছে ভালো, ধুলো-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হচ্ছে। আর কি অসম্ভব খাটিয়ে লোক শিবশঙ্কর! চরকির মতন ঘুরচেন এখানে ওখানে, এ আপিস ও আপিস, কত লোকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করচেন, কত লোক তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করচেন — যে লোক এমনি নরম হয় না, তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে অগ্রসর হতে হচ্ছে, ছুঁচ যেখানে গলে না, সেখানে হাতি গলিয়ে দিচ্ছেন শিবশঙ্কর, — পয়সা কি অমনি হয়?

শিবশঙ্করেব অভিজ্ঞতা এই যে, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে দয়া মায়া চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি দুর্বলতা। যে বিচক্ষণ কারবারি সে এ সব মানবে না। কমপিটিশনের বাজার, চক্ষুলজ্জা এখানে খাটে না।

আর একটা অভিজ্ঞতা, অবিশ্যি বড় মূল্যবান অভিজ্ঞতা যে, ঘুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। শিবশঙ্করবাবু বলেই থাকেন — ওহে এমন লোক দেখলাম না যে পুজো পেলে খেতে চায় না। তবে বেশি আর কম। কেউ চায় ষোড়শোপচারে পুজো, কারো বা চাল কলা, কারো চিনির নৈবিদ্যি — ঢের ঢের দেখলাম হে, যেখানে ভেবেচি এর কাছে কেমন করে যাবো, এত বড় পদস্থ লোক .... পুজো দাও, বাস্ সব ঠিক! সবাই সমান, তবে ওই যে বললাম, বেশি আর কম। চুরি করার সুবিধে জোটেনি যার, সেই সাধু।

বেলা একটার সময় একটি রোগা, দীর্ঘ চেহারার সাহেবি পোশাকপরা লোক শিবশঙ্করের আপিসে এসে ঢুকলো।

শিবশঙ্কব বললেন - কি খবর? আসুন, বসুন।

বড্ড বেশি চায়।

— কত?

— সাড়ে পাঁচ করে কাঠা।

শিবশঙ্কর বিস্ময়েব সুরে বললেন -- জমি কার? ব্যাঙ্কের?

— আজ্ঞে না, মাগনলাল মুখনলাল ক্ষেত্রীব। একবাব মর্টগেজ আছে। রেজেস্ট্রি আপিস সার্চ করা হয়েচে।

- বড় বেশি দর বলছে না?

— ও অঞ্চলে ওর কম দব নেই। এর পরে সাত পর্যন্ত উঠবে। ন কাঠা একসঙ্গে আর পাওয়া যায় না স্যার। আপনি কাল নিজে একবার চলুন — বায়নাপত্তর রেজেস্ট্রি না করলে দু-তিনটে খদ্দেব মুখিয়ে রয়েচে।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। অল্প খানিকক্ষণ কথা বলে শিবশঙ্কর ফোন রেখে সামনের লোকটিকে বললেন - অ্যাটর্নিব আপিস থেকে বলচে হরিশ মুখুয্যে স্ট্রিটেব বাড়িটা এখুনি দেখতে যেতে হবে। চলুন না বাড়িটা দেখে আসবেন —

উভয়ে মোটরে বার হয়ে সোজা হরিশ মুখুয্যে স্ট্রিটে সেই নম্বরের বাড়ির সামনে এসে দেখলেন মিঃ ঘোষাল তাঁদের পূর্বেই সেখানে মোটর থামিয়ে অপেক্ষা করচেন।

বাড়ির ওপরের নিচের সব ঘর, বাথরুম, দরদালান, ছাদ সব ঘুরে দেখা হোলো। মিঃ ঘোষাল বললেন -- মতামত দিন মিঃ সরকার।

—মতামত আর কি নেওয়া হবে।

— তিন পার্সেন্টের কথা স্মরণ রাখবেন। ও আমাদের একটা শর্ত। নয়তো আমারই হাতে দুটো খদ্দের। আপনি ক্রেতা, আপনার কাছ থেকে কমিশন নেওয়া নিয়ম নয় জানি — কিন্তু এখানে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা—

— সে যা হয় হবে। ইলেকট্রিক ইন্‌স্টলেশন নেই কেন? অত বড় বাড়ি —

-- ছিল। ওয়্যারিং করে নিতে যা খরচ পড়বে তা তো আপনি এমনি বাদ পাচ্চেন। ওই বাড়ি কি দুইয়ের কমে হয় — চার লক্ষ সত্তর হাজার পঁচাত্তর হাজার তো উইদাউট এনি ডাউট! আপনি বলুন, এখুনি এক মাড়োয়াড়ি খদ্দের —

— না, না, সে কথা বলিনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন —

শিবশঙ্কর একাই আপিসে ফিরলেন, তখন বেলা পৌনে তিন।

আপিসের চাকর কারুয়া বললে — হুজুর, টেলিফোন দুবার বাজিয়েছে। হামি লম্বর লিয়ে রাখিয়েসে।

— কই নম্বর?

— হুজুরের ঘরের টেবিলমে আছে। মনুবাবাকে দিয়ে লিখিয়ে রাখিয়েসে। এক তো সাউথ ওয়ান ফাইভ —

শিবশঙ্কর চাকরকে থামিয়ে দিয়ে বললে — আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা — এক পেয়ালা চা জলদি তৈরি কর —

— আউর কুছ্ বাবু?

— আজ বাড়ি থেকে টিফিন আনেনি কেউ? ফল-টল?

— না হুজুর। সড়া পোচা দু আপেল হুজুরের টেবিলমে ছিল, ও হামি ফেকিয়ে দিয়েসে — ও কালওয়ালা —

— বেশ করিচিস। যা চা নিয়ে আয় —

কারুয়া আনেক দিনের চাকর; আগে শিবশঙ্করের বাড়িতে ছিল, এখন কাজকর্মের সুবিধের জন্যে ওকে আপিসে নিজের খাসকামরার চাকর রেখেচেন শিবশঙ্কর। শিবশঙ্কর কি খান না খান, কি তাঁর অভ্যেস, কারুয়া এ সব জানে। কারুয়ার আনীত চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে শিবশঙ্করবাবু ভাবছিলেন আরও কিছু জমির সন্ধান নিতে হবে।

জমি বড় দরকার।

এইসব অঞ্চলে বড় বড় প্লটের সন্ধানে আছে।

শিবশঙ্কর কাগজ কলমে ছোট্ট একটু হিসেব করে নিলেন। লাখ দুই টাকার জমি কিনে রাখতে হবে। টালিগঞ্জের দিকে কিছু জমি এখনো আছে। ব্যাঙ্কের জমি কিছু আছে লেক আর ঢাকুরে যাদবপুর অঞ্চলে।

'টাকা হোলে মাটি করো' মস্ত বড় কথা। এত বড় ইনভেস্টমেন্ট নেই টাকার। দালালেরা নানারকম সন্ধান নিয়ে আসে। তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে আছে জমিজমা-সংক্রান্ত নানা রকম খবর, দালালদের দেওয়া। শিবশঙ্করবাবু ড্রয়ার খুলে অর্ধ-অন্যমনস্কভাবে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন। মেদিনীপুর জেলায় শালের জঙ্গল একশো কুড়ি বিঘে এক প্লটে! ধানের জমি ওই সাথে এক প্লটে সত্তর বিঘে, মাঝখানে বড় পুকুর।

বর্ধমান জেলায় ধানের জমি নব্বুই বিঘে। বনপাশ স্টেশনের কাছে।

কুমারডি কয়লাখনি এক-তৃতীয়াংশের মালিকানা স্বত্ব, বড় বাংলোঘর, ইঁদারা, ছোট বাগান একত্রে।

রানাঘাট টাউনে রেলের নিকট স্টেশন রোডের ওপর দুখানা বাড়ি, রেলের ওপারে বাইশ বিঘের সেগুন বাগান, ইটের ভাঁটা।

যশোর জেলায় মৌজা ধরমপুর ও মৌজা চণ্ডীরামপুর — দুইটি বড় মৌজা নিলামে উঠেচে। সামনের মাসে বারোই তারিখে যশোর সদরে নিলাম হবে। লোক পাঠিয়ে শিবশঙ্কর জেনেচেন মৌজার আদায় ভালো, একাত্তরটি জমার মধ্যে উনিশটি খাস হয়ে গিয়েচে এবং আশা আছে আরও আটটি জমা এই বছরের মধ্যেই খাস হবে বাকি খাজনা পড়ে আছে প্রজাদের কাছে কয়েক হাজর টাকা।

হাজারিবাগ জেলায় সিংজানি-ভোজুড়ি অভ্রের খনি ও শালবন, বাংলো, ইঁদারা এবং কিছু ধানের জমি।

উল্টোডিঙির খাল ধার থেকে সামান্য দূরে মহেশচন্দ্র সিমলাইয়ের বাগানবাড়ি ও পুকুর, বাগানে জমির পরিমাণ দশ বিঘে। কলমের আম, লিচু, ফলসা, ম্যাঙ্গোস্টিন প্রভৃতি ফলের গাছ। দোতলা বাড়ি।

অভ্রের খনির ওপর ঝোঁক বেশি শিবশঙ্করের। দু-পার্সেন্টের অনেক বেশি আসবে টাকার ওপর। স্বাস্থ্যকর স্থান, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকাও যাবে, কলকাতায় তো যা খান হজম হয় না, লিভারের রোগে কষ্ট পাচ্চেন।

আর বাকি সব পাড়াগাঁয়ে জমিজমা, ধানক্ষেত — নাঃ ওদের কি মূল্য আছে? জমি কিনতে গেলে কলকাতায়। কলকাতার সম্পত্তির মত সম্পত্তি নেই — বাড়ি বা জমি। মহেশ সিমলাইয়ের বাগানবাড়ি ভালো, ফলবান গাছ অনেকগুলো, নার্সারি করবার জন্যে কেউ ভাড়া নিতে পারে, অনেকখানি জমি — মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারে দু-চার বছর পরে। দালালে বলচে আটষট্টি হাজার, তিনি বলচেন পঞ্চাশ হাজার। যদি ওটা হয়, তবে খুবই ভালো।

শিবশঙ্কর কেঁপে উঠলেন তো সেদিন। কবছরের কথা আর? কি ছিল শিবশঙ্করের? বারাসাতের কাছে ভবনহাটি বিষ্ণুপুর, ক্ষুদ্র গ্রাম, সেখানেই পৈতৃক বাড়ি। অবিশ্যি নিতান্ত গরিব ছিলেন না, সেকেলে বড় গৃহস্থ তবে ইদানীং নামেই ছিল তালপুকুর, ঘটি ডুবতো না।

নিজের বুদ্ধিতে শিবশঙ্কর সব করেচেন। বীরের মত করেচেন, বীরের মতই ভোগ করে যাচ্ছেন শিবশঙ্কর। এখনো হয় নি, লেক অঞ্চলের বড় একখানা বাড়ি করবার শখ তাঁর, কিন্তু পছন্দসই জমি পাচ্ছেন না।

তেজপুরের কাজটা যদি হাতে এসে যায়, তবে নির্ঘাত তিন লক্ষ ঘরে আসবে। হিসেব করে দেখা আছে তাঁর। এই বছরের শেষেই টাকাটা হাতে আসতে পারে, যদি বিলের টাকা গভর্নমেন্ট এ বছরেই শোধ করে। পুজো দিলে শেষের ব্যবস্থা চটপট হয়ে যাবে। শিবশঙ্করকে কাজ শেখাতে হবে না, ঘুঘু হয়ে বসে আছেন তিনি। অনেস্টি বলে জিনিস নেই এ বাজারে। অনেস্টি একটা মুখের কথা মাত্র। কমপিটিশনের বাজার, অনেস্টিতে হয় না। টাকা ... টাকা .. চাই, টাকা। দুনিয়াতে টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। টাকা যে পথে আসে আসুক। টাকা রোজগারের এই তো সময়। যুদ্ধের বাজারে যে যা করে নিতে পারে। কলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়চে... যার বুদ্ধি আছে ধরে নাও। কিছুই এখনো রোজগার করা হয়নি। অনেক কিছুই বাকি।

কেবল একটা ব্যাপার শিবশঙ্করকে বড় চিন্তিত করে তুলেচে।

বড়ো ছেলে বিমান প্রায়ই রাত্রে বাড়ি আসে না। নিজের আলাদা একখানা মোটর কিনেচে। নানা রকম কথা কানে গিয়েচে শিবশঙ্করের। ঠিক বুঝতে পারচেন না এখনও তিনি। বিমান এমন ছিল না। বড় বৌমা প্রায়ই কাঁদেন, সুলেখার মুখে শুনতে পান তিনি। গিন্নি কিছু বলেন না, এজন্যে গিন্নির ওপর শিবশঙ্কর সন্তুষ্ট নন। গিন্নির প্রশ্রয় না পেলে বিমান এমন হতে পারতো না। যত নির্বোধ নিয়ে হয়েচে তাঁর সংসার।

টেলিফোন বেজে উঠে শিবশঙ্করের চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিল। -- হ্যাঁ, কে? ও আচ্ছা — বেশ, বেশ। তুমি চলেই এসো এখানে। দেরি করো না।

একটি শৌখিন বাবুমত লোক, চোখে সোনাবাঁধানো চশমা, ঘরে ঢুকলো দশ মিনিট পরে। এই লোকটি ঘরে ঢোকবার পরে শিবশঙ্কর সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের দরজার দিকে দুতিনবার চাইলেন। লোকটি চাপা মৃদুস্বরে মিনিট দশেক কথা বলে তারপর হঠাৎ স্বাভাবিক সুরে ফিরে এসে বললে -- বেশ, যাই তা হোলে।

বসো, বোসো --

-- বুঝতে পারলে না? সামলে বাখতে বলিগে যাই! সিনেমায় আজকাল নাম করে উঠেচে ঠেলে, দেখতে পবমা রূপসী - মৌমাছির ঝাঁক কম নয়। বুঝতে পারলে না? ঠিক আটটাতে —

বেলা ছটার পরে শিবশঙ্কর ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিলেন -— শোভা সিং, চলা যাও বেহালামে। বৌমাদের লে আও। হাম ট্যাক্সিমে যায়েঙ্গে। ঠিক করে লে আও, যেন মিলিটারি গাড়িমে ধাক্কা মৎ লাগে —

— বহুৎ আচ্ছা হুজুর — বলে শোভা সিং গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আপিসে নানা কাজ সেরে সাড়ে সাতটার সময় শিবশঙ্কর ট্যাক্সি নিয়ে বার হোলেন। ভবানীপুবেব একটা ছোট গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকলো। আগের শৌখিন লোকটি বারান্দা থেকে নেমে এসে বললে — এসো ভায়া, এসো - চা খাবে না?

-- আব এখন চা নয়। চলো --

-- এখনো দেবি আছে। আমি কাপড় পরিনি। আসচি --

দুজনে আবার গাড়ি নিয়ে চললেন — বেলতলা রোডের পার্কের কাছাকাছি একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো। দুজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। লোকটি বললে — আমি ফোন করেছিলুম, আটটার সময় সব সরিয়ে দিও। খুব সুন্দরী, আর বয়েস উনিশের বেশি নয়। নিজের চোখেই দ্যাখো ভায়া, এ শর্মার নাম গোপাল চক্কোত্তি। মাসে চারশোতেই রাজি করিয়ে দেবো — তুমি শুধু দেখে যাও — সিনেমাতে আজকাল নাম কি!

সব চ্যাংড়া ছোকরার ভিড় সেই জন্যে —

ওপরে দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বারন্দা, ফুলের টব সাজানো। অর্কিডের টব ঝুলচে বারান্দার ছাদের প্রান্ত থেকে।

সঙ্গী লোকটি কড়া নাড়তেই ওদিকের দরজা দিয়ে যে তরুণটি সিগারেট মুখে বেরিয়ে এসে পাশের সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল — শিবশঙ্কর যেন ভূত দেখলেন তাকে দেখে।

শিবশঙ্করের সঙ্গী বললে — ওই দ্যাখো, যত সব ছেলে ছোকরার মরণ — সিনেমার ইয়ে কিনা? আসলে কমপিটিশন হচ্চে এদের কাছে টাকায় — সে কমপিটিশনে দাঁড়ানো চ্যাংড়াদের কর্ম নয় — ও কি! দাঁড়ালে যে? কি হোলো?

শিবশঙ্কর ততক্ষণ দম নিলেন।

যে ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, সে বিমান, তাঁর ছেলে বিমান।

সাকীর প্রথম রাত্রি



রমেশচন্দ্র সেন

অনেক দুঃখ কষ্টের পর বারিবালা রূপজীবিনীদের পাশে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। সবে তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, করপোরেশনের লোকে মই লাগাইয়া উত্তরে গলির মোড়ে ও দক্ষিণে মেসবাড়ির দেওয়ালের গ্যাস জ্বালিয়া দেয়। বাদ পড়ে তাদের মাট-কোঠার সামনের আলোটা।

হরিমতী বারিবালার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, মিনসের মুখে আগুন, আমাদের আলোটা দেখতে পায় না। মারে ঝাঁটা।

পাঁচি বলে, আমাদের বাতি যে খারাপ হয়ে গেছে।

হরিমতী জবাব করে, ইচ্ছে করে ওরা খারাপ করে দেয়। জানে তো যে আমরা কিছু করতে পারব না। যত সব হারামজাদার দল।

পাঁচি বলিল, অন্ধকারও মন্দ নয়। ভদ্দর নোকেরা এদিক ওদিক চেয়ে টুক করে ঢুকতে পারে।

হরিমতী বলে, সেদিন তোর ঘরে কলেজের সেই মাস্টার আসার পর থেকেই তুই আঁধারের ভূত বনে গেছিস। মর্ অন্ধকার নিয়ে।

খোয়া ও ইটতোলা গলি, উঁচুনিচু এবড়ো খেবড়ো। সংস্কারও হয় নাই বহু দিন। এক পাশে কতগুলি ঘরে টিনের সুটকেশ তৈরি হয়। আর এক ধারে মাটকোঠার পতিতারা বাস করে। লোকে বলে সুটকেশের গলি।

কিছুদিন যাবত বারিদের বাড়ির সামনেটা অন্ধকার তবে দুইদিকের আলোর জন্য পথ ধরিয়া কোনো রকমে চলা যায় কিন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না। বারিবালার মনে হয় যেন কতগুলি ছায়ামূর্তি চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একটা ফুলকি জ্বলিয়া ওঠে, পথচারিদের মুখের বিড়ি সিগারেটের আগুন।

চলিতে চলিতে রূপজীবিনীদের দিকে চাহিয়া কেহ বলিয়া ওঠে, মেরি, জান, কেহ বা — প্রাণ তব্ হয়ে গেল।

তুফানের ওপর পানসির মতন কেহ কেহ মদের নেশায় টলিয়া চলে। দুইটি প্রৌঢ় কোনো বিখ্যাত সিনেমা স্টারের গল্প করিতে করিতে যাইতেছিল। একজন বলিল, পমেটম ত, ওর দাম ছিল দু-টাকা। হাওড়ায় থাকত, ওর ঘরে কত গেছি।

তার বন্ধুটি সশ্রদ্ধভাবে বলিল, তুই মাইরি একখানা এনসাইক্লোন।

পমেটমের পরিচিত ব্যক্তিটি হরিমতীদের সামনে আসিয়া দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া তাদের মুখের উপর তুলিয়া ধরে। বারুদের গন্ধ ও ধোঁয়া সবই যেন বারিবালার নাকের মধ্যে যাইয়া ঢোকে। সে পিছাইয়া পাঁচির পাশে আসিয়া দাঁড়ায়।

পথচারিদের উদ্দেশে হরিমতী বলে, ধুত্তোর হাড় হা-ভাতের দল।

প্রৌঢ় দুইটি একসঙ্গে হাসিয়া ওঠে, সে কী হাসি — যেন করপোরেশনের দুইটা হাইড্রান্ট দিয়া কলকল করিয়া জল বাহির হয়।

বারিবালা এই সুটকেশের গলিরই মেয়ে। যেখানে মিত্র বাবুদের আস্তাবল উঠিয়াছে তার মা পরিবালা ওইখানে এক খোলার ঘরে থাকিত। তার বাবা কে বারিবালা তাহা জানে না, পরিবালাও জানিত কিনা সন্দেহ।

কৈশোরের ফুল মুকুলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবালা মেয়ের বিবাহ দেয়। পুরোহিত আসে, মন্ত্র পড়া হয়, মালাবদল হয়। কয়েকটি লোকও নিমন্ত্রণ খায়, সব চেয়ে বেশি খায়, তাদের পোষা একটা বাঁদর। একথালা চালমাখা, একছড়া কলা ও আট দশটি বিলাতি আমড়া। তার পর সোল্লাসে হাততালি দিতে থাকে।

বিবাহের পরদিন বারিবালার স্বামী জামা-কাপড়, এই গলিতে তৈরি এই সুটকেশ ও নগদ কয়েকটি টাকা

লইয়া সেই যে বিদায় হয় তারপর আর এ পাড়ায় কেহ তাকে দেখে নাই। জামাইর ঠিকানা ও পরিচয় পরিবালা হয়তো জানিত। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো কথা উঠিলেই সে বলিত, তার ঠিকানার দরকার? এ বিয়ে তো পিত্তিরক্ষে।

পরিবালার কৈশোরেও এইরূপ পিত্তরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সে জন্য বারবনিতার জীবন যাপনে তার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। কিন্তু বারিবালা বেশ্যাবৃত্তি করিতে রাজি হইল না। পরিবালা বলিল, কি অলক্ষুণে কাণ্ড, তুই আমার নাম হাসালি

পরিবালা মেয়েকে গালি দিত, তার খাওযা বন্ধ করিত, মধ্যে মধ্যে তালা দিয়া তাকে ঘরে পুরিয়া রাখিত। কিন্তু বারির সুবুদ্ধির উদয় হইল না।

ক্ষুধার তাড়নায় সেই বারিবালা আসিযা দরজায় দাঁড়ায়। আজ সকালেও সে পাঁচিকে বলিয়াছে, দুনিয়ায় পেটের জ্বালাই সব চাইতে বড়ো।

পাঁচি বলে, একশো বার। এ রাস্তায় পনরো আনা মেয়ে আসে পেটের জন্যে; যৈবনের তাড়ায় আর কটা?

হরিমতী গামছা পরিযা কলতলায় স্নান করিতেছিল। সে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, আমি কিন্তু পেটের জন্য আসি নি। এসেছি যৈবন লুঠতে। নইলে মা মাসি ঘুঁটে দিয়ে আমায় সুখেই রেখেছিল, সকালে মুড়ি বেগুনি খেতুম আর চা। বিকেলে চায়ের সঙ্গে কোনোদিন পাঁপড়, কোনোদিন পকৌড়ি।

মাতার মৃত্যুর পর অন্নের জন্য বারিবালা গলির দক্ষিণ প্রান্তে বড়ো রাস্তার মোড়ে পানের দোকান করে। তার খরিদ্দার জোটে অনেক, নানা বযসের, নানা জাতির। লুঙ্গি পরিহিত কেহ উর্দু মিশ্রিত বাংলায় পান ও পানওয়ালির সুখ্যাতি করে, যজন যাজন করিযা টিকিতে ফুল বাঁধিযা পুরোহিত বারিবালার পানের মিঠা খিলি খাইযা যায়।

বই বগলে কলেজের একটি ছেলে তার দোকানের সামনে আসিয়া গান ধরে, ভাটিয়ালি সুরে তার প্রাণ ও বারিবালার পানের অনন্ত মিলনের গাথা।

বারিবালা সব উপদ্রবই নীরবে সহ্য করে। একদল ভাবে মেয়েটি বোকা। কেহ কেহ বা মনে করে গভীর জলের মাছ।

শেষের দিকে জুটিল এক প্রৌঢ়। আপিস ফেরার পথে ভুঁড়িওয়ালা এই ব্যক্তিটি রোজ দু-পয়সার পান কেনে, চুন নিবার অছিলায় বারিবালার হাতে একবার করিয়া হাত ঠেকায়। একখানা আনি দিয়া বাকি দু-পয়সা ফেরত লয় না। খানিকটা আগাইয়া গিয়া একবার ফিরিয়া তাকায়।

শুনিয়া হরিমতী বলে, ওই দুটো পয়সা হল তোর যৈবনের পেন্নামি। যৈবন একটা দেবতা তো। দুনিয়ার সেরা দেবতা।

দোকান বন্ধ হইল কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য। ওই রাস্তাটা ছিল হিন্দু-মুসলমানের শক্তি পরীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র।

বারিবালা এবার গলির উত্তর প্রান্তে হিন্দুপল্লিতে দোকান করিল। নূতন এই রোয়াকের মালিক ঘোষজা মশাই বলিলেন, তুই পরির মেয়ে, তুই দোকান করবি, সে তো সুখের কথা। তোর মাকে চিনতুম। সে মামাদের ভাড়াটে ছিল। তোর আর ভাড়া লাগবে না, তবে রোজ আমাদের ফ্যামিলির যা পান দরকার সেইটে দিস।

আগের রোয়াকের মালিক ছিল গরিব, ভদ্রলোকও নয়। কিন্তু সে কখনও ভাড়ার কথা তোলে নাই, বিনা পয়সায় একটা পান খায় নাই। ভাড়ার বিনিময়ে রসিকতাও করিত না।

বারিবালার এই নূতন দোকান বেশি দিন চলিল না। সে একদিন শুনিল, মোটা সেলামি এবং ভাড়া পাইয়া ঘোষজা রোয়াকটা আর একজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতেছেন। সে যাইয়া তাকে ধরিল, আপনি রোয়াকটা আর কাউকে দিলে আমি যে না খেয়ে মরব।

ঘোষজা কহিলেন, দূর পাগলি। তুই হলি পরির মেয়ে। তোকে কি তুলে দিতে পারি?

কৃতজ্ঞ গদগদ কণ্ঠে বারি বলে, আর জন্মে আমি আপনার মেয়ে ছিলুম।

মেয়ে নয়রে, নাতনি — বলিয়া ঘোষজা এদিক ওদিক চাহিয়া বারিবালার গালে দুইটা টোকা দেন, তারপর বলেন, বারি নামটা ভারি সুইট।

পরের দিন বারিবালা যাইয়া দেখে হিন্দু রাজমিস্ত্রীরা রোয়াকে ইটের উপর ইট গাঁথিতেছে।

রেশন কন্ট্রোলের বাজারে দিনের পর দিন অর্ধভুক্ত, অভুক্ত থাকিয়া সামান্য একখানা কাপড় জোগাড় করিতে না পারিয়া বারিবালা শেষটায় হরিমতীর উপদেশ মানিয়া লয়। হরিমতী বলে, গতরের উপর দিয়ে যৌবনের জোয়ার বয়ে যাবে আর তুই শুকিয়ে মরবি। সে কি হয়? আয় আমাদের পাশে এসে দাঁড়া।

বারিবালাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না। মিনিট কুড়ির মধ্যেই বাবু জুটিয়া যায়। অলস্টার পরিহিত একটি লোক তাদের দরজার সামনে আসিয়া ডাকে, শোন —

পাঁচি বারিবালাকে বলিয়া দিয়াছিল, তোর সাজ সজ্জে নেই কিন্তু যৌবন আছে তো। আগুনের মতন যৌবন। তুই ঘণ্টায় চার টাকা চাইবি। কয়লা, ঘুঁটে, কেরোসিন— সব মাগ্‌গি। একটা উনুন ধরাতে গেলেও আট গণ্ডা পয়সার দরকার।

কিন্তু লোকটির সামনে বারিবালার সব গুলাইয়া যায়। কত চাই তোমার? — এই প্রশ্নের উত্তরে বারিবালা বলে, যা দেন।

হরিমতী আজ সকালে তার চৌকাঠে ঘোড়ার নাল লাগাইয়া দিয়াছিল। ইহা নাকি তাদের ব্যবসায়ের লক্ষ্মী। বারিবালা সেই লক্ষ্মীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ঘরের শিকল খুলিয়া আগন্তুককে ভিতরে লইয়া যায়।

ঘরে একটা হারিকেন জ্বলিতেছিল। তার পলিতা বাড়াইয়া বারিবালা আগন্তুকের দিকে চায়। দৃঢ় বলিষ্ঠ গড়ন, বেঁটে খাটো মানুষ, মাথায় টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, তাতে পাক ধরিয়াছে। চোখ দুটি শিকারি বিড়ালের মতন।

বারিবালার ভয় করে। মানুষটিকে বলিতে ইচ্ছা করে, আপনি আমার বাপের বয়সি। আপনি এখানে কেন? যান এক্ষুনি চলে যান।

কিন্তু পেটের চিন্তা সব ছাপাইযা ওঠে।

ছোটো ঘর, পাকা মেজে, তার ওপর মাদুর ও বালিশ পাতা। এক প্রান্তে তোলা উনানের ওপর মাটির হাঁড়ি, পাশেই কড়াইতে কী যেন ঢাকা রহিয়াছে। আর এক কোণে দুটা বালতি, একটায় জল আর একটায় পানের দোকানের সরঞ্জাম।

দেওয়াল মাটির, তার ওপর বিভিন্ন আকার ও বর্ণের কতগুলি কাগজ আঁটা। তার মধ্যে থিয়েটার বায়স্কোপের বিজ্ঞাপন ও চিত্র-তারকাদের ছবিই বেশি।

বারিবালা মাদুরের একপাশে পান সাজিতে বসিলে লোকটি বলল, ও কী চাঁদ, অত দূরে কেন? পান পরে হবে খন। তোমার নামটি কী বল দেখি?

বারিবালা।

না, না, তোমার নাম দিলুম সাকী। তুমি আমার মদ ঢেলে দেবে, বলিয়াই আগন্তুক অলস্টারের পকেট হইতে দেশি মদের একটা বোতল বাহির করে, আর এক পকেট হইতে পাউরুটি, ডিম সিদ্ধ ও পেয়াজের কুচি এবং কর্ক স্ক্রু। মানুষটা যেন চলন্ত একটা ক্যান্টিন। সে বলে, দুটো সোডা আনাও, আর দুটো গেলাস দাও।

বারিবালা বলে, গেলাস তো আমার ঘরে নেই।

তার সাজা একটা পান মুখে ফেলিয়া আগন্তুক বলিল, গলিতে পানওয়ালা নেই?

হ্যাঁ, আছে।

তাকে বল সোডা ও সিগারেটের সঙ্গে যেন দুটো গেলাসও দেয়। গেলাস ভাঙলে দাম দেব খন।

একটা গেলাসেই চলবে। আমি মদ খাই না।

মদ খাও না? অ্যাঃ! একেবারে নিরিমিষ্যি মেয়েমানুষ, হাঃ হাঃ।

বারিবালা বড়ো রাস্তার পানওয়ালাকে সিগারেট, সোডা ও গেলাস দিতে বলার জন্য বাহিরে গিয়াছিল। আসিয়া দেখে আগন্তুক বোতলটা মুখে লাগাইয়া ঢক ঢক করিয়া মদ গিলিতেছে। দেখিলে মনে হয় শুঁড়ওয়ালা একটা জানোয়ার।

বোতলটা নামাইয়া তালুতে জিভ ঠেকাইয়া চুম্বনের মতো শব্দ করিয়া সে বলে, এত দেরি হল যে চাঁদ? এস এস, কাছে এস — বলিয়া সে বারিবালাকে কাছে টানিয়া নেয়।

মদের উগ্র গন্ধে বারিবালার দম বন্ধ হইয়া আসে, খোঁচা খোঁচা দাড়ির ঘষায় মনে হয় গাল ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সে আগন্তুককে হাত দিয়া ঠেলিয়া দেয়।

মাগনা নাকি? এর জন্য পয়সা দেব না? — বলিয়া লোকটা আবার বারিবালাকে কাছে টানিয়া নেয়।

দুঃখ কষ্টের সঙ্গে বারিবালার পরিচয় যথেষ্ট, বহু লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সে সহ্য করিয়াছে কিন্তু জীবনের এত কদর্য রূপ কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। বিরক্তিতে, ভয়ে, ঘৃণায় তার মাথা ঝিমঝিম করিতেছিল। এই সময়ে তাকে রক্ষা করিল পানওয়ালা ভালু সাহ। দরজায় ধাক্কা দিয়া সে ডাকিল, বারিদি।

আগে ডাকিত পানওয়ালি। তার জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিনে পানওয়ালি বারিদি বনিয়া গেল।

সোডা গেলাস সিগারেট রাখিয়া ভালু সাহ দাম চায়। আগন্তুক বলে, পরে হবে খন।

তুমি জামিন রইলে দিদিমণি — বলিয়া ভালু সাহ চলিয়া যায়।

আগন্তুক এবার খাইতে আরম্ভ করে, একবার পাঁউরুটিতে কামড় দেয়, সঙ্গে খানিকটা কাটলেট মুখে পোরে আর পেঁয়াজের কুচি, কখনও আস্ত একটা সিদ্ধ ডিম। মধ্যে মধ্যে মদ দিয়া গলা ভিজায়, তাতে সোডা থাকে খুব কম। বারিবালা আলিপুর পশুশালায় সিন্ধুঘোটকের খাওয়া দেখিয়াছিল, তার মনে পড়ে সেই দৃশ্য।

খানিকটা পরে লোকটি বলিল, তুমি খাচ্ছ না যে? ডিম, কাটলেট সব ফাস্টো কেলাস জিনিস। খাও।

হ্যাঁ খাচ্ছি — বলিয়া বারিবালা শশব্যস্তে একটা ডিম তুলিয়া লয়।

আরও খানিকটা মদ খাইয়া আগন্তুক বলে, আমায় তুমি ডাকবে রোজা বলে।

এর পরে সে অনর্গল বকিয়া যায়, সে একজন বে-পরোয়া লোক, যাকে বলে ডোন্টো-কেয়ার ম্যান। রোজগার করে, ফুর্তি করে, রেস খেলে। যে ঘোড়া তাকে বেশি পয়সা দেয়, নিজে সেই ঘোড়ার নাম গ্রহণ করে, পরের সপ্তাহে আবার অন্য ঘোড়ার নাম। জেতে খুব কম তাই অনেক সময় এক নামেই দীর্ঘ দিন চলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে রেসও বন্ধ থাকে। গেল বছর একটানা প্রায় ছয়মাস তার নাম ছিল ব্ল্যাক ডেভিল। আজ রোজা তাকে তিন টাকায় একশো পঞ্চান্ন টাকা দিয়াছে। বোজা একটা মাদি ঘোড়া, ফিরোজার মেয়ে।

নিজের রোজা নামেব ইতিহাস সে শেষ করিল এই বলিয়া — শেষটায় একটা মাদি ঘোড়ার নাম নিতে হল এই হল যা দুঃখ।

একটি ইঁদুর বালতি দুইটার মধ্য হইতে উঁকি মারিতেছিল। কেহ কিছু না বলায় ক্রমে তার সাহস বাড়ে। শেষটায় মাদুরের কাছে আসিয়া পেঁয়াজের কুঁচি ও রোজার উচ্ছিষ্ট মাংসের ছিবড়া কুট কুট কবিয়া খাইতে থাকে। একবার আসে আবার ছুটিয়া যায়।

বোজা বলে, ওটাকে ধরে একটু মদ খাইয়ে দেব নাকি?

তার পরই সে শুরু করে প্রেমের গল্প। ছেলেবেলা হইতে অনেককে সে ভালোবাসিয়াছে। প্রথম বাসিয়াছিল তাদের গ্রামের এক নাপিতানীকে, সে রোজার চেয়ে অন্তত পনরো বছরের বড়ো। নারী জাতির প্রতি এই দুর্বলতা এখন আসিয়া এক জায়গায় ঠেকিয়াছে। রোজা বলিল, এই ভালোবাসাই ফাইনেল।

সে ভালোবাসে তার মনিবের স্ত্রীকে। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী। তার স্বামী তাকে ডাকে সাকী বলিয়া।

তোমায় যদি আগে দেখতুম তা হলে তোমায়ই ভালোবাসতুম সারি। মেয়েলোক দেখলেই ডাকতুম সারি বলে, সাকী নয়। যাক তোমায় সেকেন্ডো করে নিলুম। সাকীর পর সারি। কি বল ভাই?

বারিবালা বলিল, আমার নাম সারি নয়, বারি।

ভালো, বেশ তুমি আমার সেকেন্ডো সাকী — আর আমি রোজা—বলিয়া রোজা বারিবালার গায়ে ঢলিয়া পড়ে।

হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে ঘরের আলোটা খুব তীব্র। সে বলে, আলোটা কমিয়ে দাও তো সাকী।

বারি বলে, থাক না।

না না, আলোতে ভালোবাসা ঠিক জমে না।

বারি তবুও ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া রোজা তাকে ধমক দেয়, যাও, জলদি উঠে বাতিটা কমিয়ে দাও।

বারিবালা উঠিয়া বাতিটা কমাইয়া দিলে রোজা জিজ্ঞাসা করিল, এ রাস্তায় এসেছ কদ্দিন?

বারিবালা কোনো উত্তর করে না। রোজা বলে, ভাগ্যিস বলনি, যে নতুন এসেছো। তা হলে রাগ করতুম।

কেন?

সবাই বলে, আমি নতুন, আনকোরা। ও সব আমি ধরে ফেলতে পারি। পাকা জহুরি তো, ঝুটো আর আসল মাল চিনি।

বারিবালা বলে, হ্যাঁ আমি পুরোনো, খুব পুরোনো — এ রাস্তায় এসেছি অনেক দিন।

রোজা বলে, মদ আর মেয়ে মানুষ পুরোনোই ভালো, হেঃ হেঃ। সে আবার বিনা সোডায় খানিকটা মদ খায়। তারপর হঠাৎ বারিবালার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলে, খাও তুমি একটুখানি খাও — তার মতামতের আর অপেক্ষা করে না। বারির মুখ জোর করিয়া খুলিয়া খানিকটা মদ ঢালিয়া দেয়।

না খাইলে রোজা হয়তো গলা টিপিয়া মারিবে। এই ভয়ে বারিবালা একটুখানি মদ গিলিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গেই বমি হইয়া যায়।

রোজা এরপর আর তাকে মদ খাওয়ার জন্য জিদ করে না। বলে, তুমি শুধু আমার সাকী হও। মদ ঢালো, আমি খাই। বেশি সোডা মিশিও না কিন্তু, ও হচ্ছে মেয়েদের ড্রিঙ্ক।

বারি মদ ঢালে, রোজা ঢুক ঢুক করিয়া খায় আর গল্প করে, দেশের গল্প, চাকরির গল্প।

আমি হচ্ছি মৈষণ্ডির দে। নাম ডাক আমাদের কত। ঠাকুরদা ডাকাত ছিল। বাবাটা গোবেচারী, পাঠশালার পণ্ডিত আর গাঁয়ের পোস্ট মাস্টার। লোকে বলে, ঠাকুরদাদার উপযুক্ত নাতি হচ্ছি আমি। পেতুম একটা ডিলারি, তা সে তেলেরই হোক আর চিনি কাপড়েরই হোক। দেশে তাহলে কোঠা করতুম সাকী মঞ্জিল, আর সাকীর নামে দিঘি কাটাতুম।

বড়ো বড়ো মিলিটারি সার্ভিসও অনেক করেছি, এখন করি সিভিল।

বারি তার মুখের দিকে চায়।

রোজা বলে, কোহিমা জান? মণিপুর কোহিমা, যে অবধি নেতাজী এসেছিলেন? কোহিমায় আমি মিলিটারি সাহেবের গাড়ির ক্লিনার ছিলুম। এখন করি ড্রাইভারি, বাসের ড্রাইভার। গাড়ির মালিক হচ্ছে সাকী।

রোজা গল্প বলে আর বারিবালাকে আদর করে। কখনও বলে, তোমার মাথাটা আমার ঘাড়ের উপর রাখ। কখনও তাকে কোলে বসায়।

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়। হঠাৎ তার শখ হয় বারিবালার গান শুনিবার। সে গান জানে না শুনিয়া নিজেই শুরু করিয়া দেয়,

এক রাজকুমারী স্বপ্নে দেখেছে সে।

কয়েক কলি গাহিয়া বলে, না সুবিধে হচ্ছে না। শোন একখানা মিলিটারি গান —

কদম কদম বাঢ়ায়ে যাও— —
বাঢ়ায়ে যাও

পরক্ষণেই ধরে —

বুড়া বয়সে নূপুর দেখি পায়

গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচে, ধেই ধেই নৃত্য। যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি লয়মান বোধ তার উপযোগী নাচ, সে এক মহাতাণ্ডব।

মাথায় টাক, চুলে পাক ধরিয়াছে কিন্তু লোকটা যেন উৎসাহের অবতার। নাচের পরই বারিবালাকে আদর করিতে আরম্ভ করে।

প্রথম প্রথম সিগারেটের ধোঁয়া মদের গন্ধ ও রোজার দাড়ি গোঁফের খোঁচায় বারিবালা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর তাহা নাই। সব কথা তার কানে যায় কিনা সন্দেহ। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতন সে কখনও কখনও সাকীর গলা জড়াইবার ভান করে।

রোজা ভারি খুশি হয়। বলে, সাকী বরাতে ছিল তোকে পাব তাই আজ বেঁচে গেছি। সকালে যা ফাঁড়া গেছে আমার ওপর দিয়ে।

নূতন এই প্রসঙ্গে অবতারণায় বারিবালা খানিকটা স্বস্তি বোধ করে। জিজ্ঞাসু নেত্রে রোজার দিকে চায়।

রোজা বলে, সকাল আটটায় কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট দিয়ে বাস চালাচ্ছি। গাড়ি তিরের মতন ছুটছে। পাশেই আর একটা বাস, সেটা অনেকক্ষণ হেদোর মোড়ে দাঁড়িয়েছিল। পিছন থেকে আমি এসে ধরায় সেই গাড়ির ড্রাইভারও স্পিড বাড়িয়ে দিলে। চলল রেস।

হঠাৎ একটা চিৎকার — চিৎকার না যেন সমুদ্দুরে বান ডেকেছে। তার পরই শুনি, ধর্ ধর্, মার শালাকে মার।

চেয়ে দেখি আমার সামনের চাকার তলায় একখানা কচি হাত। দিলুম পা দিয়ে অ্যাকসিলেটর চেপে, গাড়ি আরও জোরে ছুটল।

বারিবালা বলিল, আপনি গাড়ি থামালেন না?

আরে পাগলি। জানি, ছেলেটা চাকার তলায় থেঁতলে পিষে যাচ্ছে! কিন্তু গাড়ি থামালে তোকে কি আজ আদর করতে পারতুম?

বারিবালা যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল, ছেলেটা থেঁতলে গেল, আর আপনি —

রোজা গর্জন করিয়া উঠিল, আপনি নয় তুমি। বল তুমি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি।

রোজা বলিল, একটু দূরে সেফসাইডে গিয়ে গাড়ি বাঁধলুম। আর তার পরই নেমেই দে ছুট —

আর ছেলেটি?

আর ছেলেটি! তার ঘি আর রক্তমাংসে রাস্তাটা তখন একাকার হয়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ।

রোজা আগেও কয়েকবার অট্টহাস্য করিয়াছে। প্রতিবারের হাসি আগের বারের চেয়ে হিংস্র। কিন্তু এবারের হাঃ হাঃ'র তুলনা হয় না, ঠিক যেন ভালুকের হাসি।

রোজা বলিয়াই চলে, কম স্পিডে আমি চালাতে পারি না। আরও অনেকবার এরকম হয়েছে। কিন্তু ধরা পড়ি নি কোনো দিন। আমি হচ্ছি মানুষ চাপা দেওয়ার কল।

আপনি আরও অনেক মানুষ মেরেছেন?

আরে পাগলি। ঢাল ঢাল আর একটু মদ ঢাল। আর দুটো পান সেজে দে।

বারিবালা গেলাসে মদ ঢালে। তার হাত কাঁপে, চোখের উপর ভাসে একটি কিশোরের পিষ্ট দেহ। তার রক্তমাংসে রাজপথ ক্লেদাক্ত হইয়া গিয়াছে।

রোজা বলিয়া উঠিল, তোর হাত কাঁপছে যে বড়ো? সন্ধের পর আমি তো ওই পথ দিয়েই এলুম। একটু নজর দিতেই চোখে পড়ল ফুটপাথের নীচে একটা ঝাঁঝরির পাশে ক'টা দাঁত। ছেলেটির দাঁত, কচি কচি —

বারিবালা আর শুনিতে পারে না। তার মনে হয় লোকটা খুনী। সকালে ছেলেটিকে চাপা দিয়া সন্ধ্যায় তাকে মারিয়া ফেলিতে আসিয়াছে। সে বলিয়া উঠিল যাও, যাও — তুমি — আপনি যাও এখান থেকে।

রোজা বলে, মাগনা নাকি? হাঃ হাঃ। তার মুখ দিয়া তখন গাঁজলা বাহির হইতেছে।

বারিবালা শতবঞ্চির ওপর চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। তার ডান পায়ের কাপড় হাঁটুর একটু উপরে উঠিয়াছে। পাশেই রোজার উচ্ছিষ্টের ওপর মাঝি ভন ভন করে।

খুব দূরে সাইরেন বাজিলে যেরূপ শব্দ হয় তার কানে আসে সেই রকম অর্ধস্পষ্ট শব্দ। রাস্তায় মানুষের কলরব। সাইরেন শুনিয়া দলে দলে মানুষ ছুটিয়া পালায়। সেও পলাইতেছিল, পিছন হইতে চুলের মুঠি ধরিয়া তার মা বলিল, পালাচ্ছিস কোথায়? বাবু করবি না তো খাবি কী?

বারিবালা ভয়ে ভয়ে বলে, মের না মা, মের না। আমি সব করব।

এই সময় পানওয়ালা ভালু সাহ ডাকে, বারি দিদিমণি। বারিবালা আধ ঘুমের ঘোরেই বলে, হ্যাঁ শুনব, বাবু —

ভালু সাহ বেশ একটু উঁচু গলায় বলে, ঝুটমুট কী বকছ?

বারিবালা এবার চোখ মেলিয়া চায়।

ভালু সাহ বলে, আমার পয়সা দাও। সোডা, সিগ্রেট, গিলাচ।

বারি বলে কী, পয়সা কিসের?

তার সর্বশরীরে একটা গ্লানি, গা ঘিন ঘিন করে। পরমুহূর্তেই মনে পড়ে অলস্টার পড়া মানুষটাকে। সে চাহিয়া দেখে মেজেয় বোতল, ভাঙা গেলাস, পাশেই পেঁয়াজের কুচি ও চিংড়ির খোসা ছড়ানো।

মনে পড়ে লোকটার নৃত্য, তার আদর। সে আদর করিয়া গিয়াছে কিন্তু একটা কানাকড়িও রাখিয়া যায় নাই।

মেলা



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা দিঘির চারি পাড় ঘিরিয়া মেলাটা বসিয়াছে। কোনো পর্ব উপলক্ষে নয়, কোন এক সিদ্ধ মহাপুরুষের মহা-প্রয়াণের তিথিই মেলাটির উপলক্ষ।

দোকানিরা বলে, বাবার মাহাত্ম্য আছে বাপু। যা নিয়ে আসবে ফিরে নিয়ে যেতে হয় না কাউকে।

সত্য কথা, দোকানের জিনিসও ফেরে না, যাত্রীর ট্যাকের পয়সাও না।

সিউড়ির ময়রা নাকি তিন বছর আগে এগারোশো টাকা লাভ পাইয়াছিল। গত বছরের মতো মন্দা বাজারেও তাহার দুশো টাকা মুনাফা দাঁড়াইয়াছে। সিউড়ীর দোকানের পাশেই লাভপুরের দুখানা মিষ্টির দোকান। একখানা হরিহরের, অপরখানা রাম সিং-এর। রাম সিং-এর দোকানের পরই পশ্চিম পাড়ের দোকানের সারি পূর্ব মুখে উত্তর পাড়ে মোড় ফিরিয়াছে।

উত্তর পাড়ে মনিহারির দোকান সারি বাঁধিয়া চলিয়া গেছে। প্রথম দোকান ঘনশ্যাম ঘোষের। ঘনু আপনার দোকানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। খরিদ্দার তখনও জুটে নাই। রাম সিং-এর দোকান তখন সাজিয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর সুন্দর একখানি চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে। নীচে তক্তপোশের উপর পাটাতনের সিঁড়ি। শুভ্র একখানি চাদেব ঢাকা সেই সিঁড়ির উপর হরেক রকম মিষ্টি বড়ো বড়ো পরাতে সুকৌশলে সাজানো। বরফি যেন পাথরের জালি রঙিন দরবেশের চূড়া উঠিয়াছে। বড়ো বড়ো খাজাগুলি শ্বেতপাথরের থালার মতো সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্মুখেই গামলায় রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পান্তোয়া ভাসিতেছে। তারও আগে পথের ঠিক সম্মুখেই ডালায় মুড়িমুড়কি চূড়া দিয়া রাখা হইয়াছে।

বাজারের পথে অল্প দুই-দশটা যাত্রী এদিক যাওয়া-আসা করিতেছিল। তাহাদের উদাসীনতায় ঘনশ্যাম বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোড়া বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে রাম সিং-এর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

—বিকিকিনি যা-কিছু কাল থেকেই শুরু হবে, কি বল সিং?

রামদাস কহিল—সন্ধে থেকেই লোক জুটবে। আনন্দ-বাজার এবার জমজমাট — দেখেছ তুমি?

ঘনশ্যাম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল— সে আমি দেখে এসেছি। এবার একশো চৌত্রিশ ঘর এসেছে। চার দল ঝুমুব। মেয়েগুলো দেখতে শুনতে ভালো হে। চটক আছে।

সিংও সায় দিল—হ্যাঁ, গোটা বিশ-পঁচিশেক এরই মধ্যে বেশ। চার-পাঁচটা খুবই খুপ্- সুরৎ।

ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল—কমলি আর পটলি বলে যে দুজন আছে, বুঝেছ! ফেসান কী তাদের। টেরিবাগানো ছোকরাদের ভিড় লেগে গেছে এরই মধ্যে। ... কী চাই গো তোমাদের?

একজন যাত্রী পথে দাঁড়াইয়াছিল। সে চলিতে শুরু করিল।

সিং কহিল--ডাইস্ কত টাকায় ডাক হল জানো?

অনামনস্ক ঘনশ্যাম কহিল—অ্যাঁ? ডাইস্? দেড় হাজার।

— কে ডাকলে?

ঘনশ্যাম উত্তর দিল না।

একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছিল। তাহার পিছনে একটি ছয়-সাত বছরের ফুট-ফুটে মেয়ে। মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরিয়া টানিল। ছেলেটি কহিল, কী?

ঘনশ্যামের দোকানে দড়িতে ঝুলান নাগরদোলায় মেম-পুতুল তখনও দমের জোরে বনবন শব্দে ঘুরিতেছিল। মেয়েটি আঙুল দিয়া পুতুলটা দেখাইয়া দিল। ছেলেটিও দাঁড়াইল। পকেটে হাত পুরিয়া কহিল—আয় আয়, ও ছাই।

ঘনশ্যাম তাদের দেখিয়াই গল্প বন্ধ করিয়াছিল। সে কহিল—এসো খুকি এসো। পুতুল নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে সে দম দিয়া এরোপ্লেনটা দোলাইয়া দিল। দমের জোরে টিনের প্রপেলারটা ফর্-ফর্ শব্দে ঘোরে, এরোপ্লেনটা দোলে, ঠিক মনে হয় এরোপ্লেনটা উড়িতেছে। মেয়েটি আবার কহিল—দাদা?

ঘনশ্যাম ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, এরোপ্লেন নিয়ে যান। দেখুন কেমন উড়ছে।

ঘনশ্যামের কথাবার্তার ভব্যতায় ছেলেটি খুশি হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল —কত দাম?

—কীসের? পুতুল না এরোপ্লেনের?

কথার উত্তর দিতে গিয়া ছেলেটি বোনের মুখপানে তাকাইল। বোনটিও দাদার মুখপানে চাহিয়াছিল।

ঘনশ্যাম আবার প্রশ্ন করিল—কোনটা নেবেন বলুন?

—দুটোই।

—দুটোর দাম দেড় টাকা।

ছেলেটি আর একবার পকেটে হাত পুরিয়া কী ভাবিয়া লইল। পরমুহূর্তে বোনটির হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল —আয় মণি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যাম কহিল— এরোপ্লেনটাই নিয়ে যান খোকাবাবু। দুজনেই খেলা করবেন। ওটার দাম এক টাকা।

সে হাঁটুর উপর ভর দিয়া খেলনাটার দড়িতে হাত দিয়াছিল।

ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু মেয়েটি গিন্নির মতো দিব্য মিষ্টস্বরে কহিল —না মানিক, আমাদের কাছে এত পয়সা নাই।

একদল বাউল একতারা, গাব্গুবাগুব্, খঞ্জনি বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—'রইলাম ডুবে পাঁকাল জলে কমল তোলা হল না।'

পিছনে পিছনে একদল সংকীর্তনের পুরোভাগে একটি শ্রীমান সন্ন্যাসী নীরবে চলিয়াছে।

মযবাবা বাতাসা ছিটাইয়া দিল। দু-পাশের লোক উঠিয়া প্রণাম করিতেছিল। ঘনশ্যামও উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতাসের লোভে সংকীর্তনের পিছনে পিছনে দল কোলাহল করিতে করিতে চলিয়াছিল। তাহাদের পাশে পাশে কয়টা জীর্ণ মলিনবসনা নীচজাতীয়া নারী।

সংকীর্তন পার হইয়া গেল।

মেয়েটি তখনও বলিতেছিল— না, বাপু, আমাদের কাছে দুটি আনি আছে শুধু।

ঘনশ্যাম কহিল -- দেখ দেখ কড়াই দেখ। বড়ো বড়ো কড়াই আছে। আঃ যাও না ছোকরা, সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় কর কেন?

পিছনে তখন কয়জন যাত্রী দাঁড়াইয়া পরস্পরকে কড়াই দেখাইতেছিল।

মেয়েটির নাম মণি। মণি দাদাকে কহিল —এস ভাই। চলে এস। বকছে ওরা সব।

সিং এর দোকানে একদল মুসলমান দাঁড়াইয়া মোরব্বার দর করিতেছিল।

সিং বলিতেছিল-—চেখে দেখুন আগে, ভালো না হয় দাম দেবেন না আপনি!

দোকানের ফাজিল ছোকরাটা হাঁক দিয়া কহিল – খেয়ে দাম দেবেন, খেয়ে দাম দেবেন। ক্যাওড়া-দেওয়া জল।

মণি দাদাকে কহিল—মোরব্বা খাবে না দাদা?

দাদা মণিকে টানিয়া লইয়া আর একটা দোকানের পটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

সিং তখন বলিতেছিল—কী বলেন? বাসি? ফল কি কখনও বাসি হয় আজ্ঞে?

ছোকরাটা কহিল —চাখ্না মিষ্টির দাম দিয়ে যান মশায়। আপনি খারাপ বললেই খারাপ হবে নাকি?

মণি চলিতে চলিতে হাসিয়া দাদাকে কহিল—সবাই তোমাকে বলছে খোকাবাবু। তোমার নাম জানে না কেউ, অমরকেষ্ট বললেই হয়।

—চুপ কর মণি। কাউকে নিজের নাম, বাড়ি বলতে যেও না। চুরি করে পালিয়ে এসেছি মনে আছে তো। খবরদার!

—দিন না বাবু, হিলটা একদম ছেড়ে গেছে ... লাগিয়ে দিই।

জুতাব পটিব পথেব দুপাশে মুচিব সাবি বসিযাছিল। অমবেব জুতাটিব অবস্থা দেখিযা একজন ওই কথা বলিল।

অমব কথা কহিল না। গোডালি ছাডা জুতাটায সত্যসত্যই তাহাব বড়ো কষ্ট হইতেছিল কিন্তু সম্বলেব কথা স্মবণ কবিযা সাহস হইতেছিল না। সে মণিব হাত ধবিযা আগাইযা চলিযাছিল। মুচিব দল কিন্তু নাছোড়বান্দা।

অমব যত আগাইযা চলে দুপাশ হইতে তত অনুবোধ আসে— আসুন না বাবু! দিন না বাবু! একদম নূতন বানিয়ে দেব বাবু।

মণি কহিল— কেন বাপু তোমবা বলছ? আমাদেব পযসা নাই - না, আমবা যে বাডি থেকে—

অর্ধপথে মণি নীবব হইযা গেল। দাদাব কথাটা তাহাব মনে পডিল।

মুচিটা হাসিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, হিলটা আমি ঠুকে দিই। পযসা লাগবে না আপনাব।

অমবেব মাথাটা যেন কাটা যাইতেছিল। সে ঠাস কবিযা একটা চড মণিব গালে বসাইযা দিল। মণি কাঁদিযা উঠিল। মুচিটা তাডাতাডি উঠিযা মণিকে ধবিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মণি কান্না থামাইযা কহিল—না না বাপু ছুঁয়ো না তুমি। অবেলায চান কবতে পাবব না।

হঠাৎ চডটা মাবিযা অমব লজ্জিত হইযা পডিযাছিল। কিন্তু সে আপনাব মর্যাদা ক্ষুণ্ণ কবিল না। বেশ গম্ভীবভাবে কহিল — আয আয মণি, চলে আয।

মণি ক্রোধভবে কহিল—যাবে তাই? কিছুতেই যাব না আমি, সবাইকে বলে দোব সেই কথা

অমব এবাব আগাইযা আসিযা মণিব হাত ধবিযা কহিল—লক্ষ্মী মেয়ে তুমি! এস, আবাব বাডি যেতে হবে।

মাবলে কেন তুমি?

ওদিকে কোথায ডুম ডুম শব্দে বাজিব বাজনা বাজিতেছিল। অমব তাডাতাডি মণিকে আকর্ষণ কবিযা কহিল — আয, আয বাজি দেখি গে আয।

মণি চলিতে চলিতে সহসা থামিযা কহিল — মখমলেব চটি কেমন দেখ দাদা।

অমব কহিল -আয আয। ওব চেযেও ভালো চটি তোকে কিনে দেব।

মণি কহিল — আব বছবে তো তুমি কলকাতায পডতে যাবে। আমাকে এনে দেবে নয দাদা?

হ্যা — হ্যা দোব।

অমব সিক্সথ ক্লাসে পড়ে।

ভিড যেন ক্রমশ বাডিতেছিল।

বড়ো বড়ো দোকানগুলিব সম্মুখে পথেব উপব ছোটো ছোটো দোকান বসিযাছে তাহাবা হাকিতেছিল—

শাঁক আলু, পালং শিষ!

- পযসা বাণ্ডিল বিঁডি বাবু।

—লাঙলেব কাঠ নিয়ে যাও ভাই।

একজন যাত্রী বলিল - লাঙলেব কাঠ কত কবে ভাই?

—দশ আনা, বাবো আনা। খাঁটি বাবলা কাঠ।

লাঙলেব দোকানেব পাশেই ছোটো একটি কাচেব কেসে কেমিকেলেব গযনা লইযা একজন বসিযাছিল। সে কযজন নিম্নশ্রেণীব দর্শককে ডাকিযা কহিল—তিন পাথবেব আংটি একটি কবে নিযে যেতে হবে যে দাদা! বেশি নয, চাব পযসা কবে।

লোক কযজন চলিযা গেল না। তাহাব আংটি দেখিতেই বসিল। দোকানদাব বলিল —বসো দাদা, বসো।

লাঠিব মাথায কাব, ফিতা, গেঁজে ঝুলাইযা একটি লোক পথে হাঁকিযা চলিযাছিল—চার হাত কাব দু'পযসা, বড়ো বড়ো কাব, দু'পযসা, বকম বকম দু'পযসা— জামাই-বাঁধা কাব দু'পযসা। টানলে পবে ছিঁডবে না, চুল বাঁধলে খুলবে না, না নিলে মন ভুলবে না — দু-দু পযসা, দু-দু পযসা।

পটিটাব মোড ফিবিতেই নিবিড জনতাব স্রোত কলবোল কবিতেছিল। অমব ও মণি সেই জনতাব মধ্যে ডুবিযা গেল। জনতাব গতিবেগ দুইদিকে চলিযাছিল। একদিকে বাজিব বাজনা বাজিতেছিল। সাবিবন্দি তাঁবুগুলো দেখা যাইতেছিল। অমব মণিব হাত ধবিযা তাঁবুব দিকে অগ্রসব হইতে হইতে কহিল—ওই দেখ মণি বাজিব ঘব সব। মণি আঙুলেব উপব ভব দিযা ঘাড উঁচু কবিযা দেখিবাব চেষ্টা কবিল।

কহিল—কই দাদা?

আবও পিছনেব দিকে চলিযাছিল জনতাব আব একটা প্রবাহ। সন্ধ্যাব আলো তখন জ্বলিতে শুরু কবিযাছে। এই জনতা-প্রবাহেব লক্ষ্যস্থানে সমচতুষ্কোণ কবিযা বড়ো চাবিটি ডে লাইট জ্বলিতেছিল। উজ্জ্বল আলোক কযটিব চাবিপাশে সমচতুষ্কোণ কবিযা ছোটো ছোটো খড়েব ঘবেব সাবি, বেষ্টনীব মধ্যেব অঙ্গনটি লোকে লোকাবণ্য হইযা আছে। দলে দলে মানুষ চঞ্চল হইযা অঙ্গনে ছুটিযা চলিযাছে। স্থানটায প্রবেশ কবিতেই নানা দ্রব্যেব সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি উৎকট গন্ধে মানুষেব বুকটা কেমন কবিযা উঠে। মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগাবেট, সস্তা এসেন্সেব তীব্র গন্ধে বাতাস যেন ভাবী হইযা উঠিযাছে।

অঙ্গনেব মধ্যে জনতাব স্রোত আগেব মানুষেব ঘাড়েব উপব মুখ তুলিযা নিবিড়ভাবে ওই ঘবগুলিব দিকে আগাইযা চলিযাছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বাঙ্গালি, খোট্টা, উড়িযা, মাড়োযাবি, কাবুলিওয়ালা, হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল সব ইহাব মধ্যে আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী সব যেন এখানে একাকাব হইযা গেছে।

এইটাই আনন্দ বাজাব অর্থাৎ বেশ্যাপটী।

প্রতি ঘবেব দবজায ছোটো ছোটো চাবপাযাব উপব এক একটি স্ত্রীলোক বসিযা আছে। আব তাহাদেব লেহন কবিযা ফিবিতেছিল অন্তত পাঁচশো জোড়া ক্ষুধাতুব চোখ। সস্তা অশ্লীল বসিকতাব মুহুর্মুহু উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি আবর্তিত হইযা উঠিতেছিল।

এইখানে তাবপব ওই দবজায আবাব আব একটা দবজায মোট কথা বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই।

মাতালেব চিৎকাব আস্ফালনে আকাশেব বুকেব নিষ্পন্দ অন্ধকাব পর্যন্ত যেন তবঙ্গিত হইযা উঠিতেছিল।

সমস্ত সমবেত কোলাহল ছাপাইযা মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইযা উঠিতেছিল জুযাব আড্ডায উন্মত্ত উল্লাসবোল। অঙ্গনটিব ঠিক মধ্যস্থলে আলোটিব নীচে জুযাখেলা চলিতেছে। কোন ঘবে নাবীকণ্ঠে অশ্লীল গান আবম্ভ হইযা গেছে। বাহিবেব জনতা সে অশ্লীল গান শুনিযা হো হো শব্দে হাসিযা উঠিল।

মানুষেব বুকেব ভিতবকাব পশুত্ব ও বর্ববতা পঙ্কিল জলস্রোতেব ঘূর্ণীব মতো মুহুর্মুহু পঙ্কিলতব হইযা এখানে আবর্তিত হইযা উঠিতেছিল।

ওদিকে কোথায শব্দ হইল ওযাক — ওযাক।

একটি মেযে বমি কবিতেছিল। সেই দুর্গন্ধে দাঁড়াইযাই দর্শকেব দল কৌতুক দেখিতেছিল আব দেখিতেছিল অসম্বৃত বাসা নাবীব দেহ।

বমিব উপব বসিযাই মেযেটা গান ধবিযা দিল—

'মবিব মবিব সখি নিশ্চযই মবিব।'

জনতা হাসিযা উঠিল হো হো হো।

একজন পানওযালা হাঁকিতেছিল মনমোহিনী খিলি বাবু মনমোহিনী খিলি। যে যে বযসে খাবে সে সেই বযসে থাকবে

প্রজাপতিব মতো সুবেশা একটি সুশ্রী মেযে অঙ্গন দিযা যাইতে যাইতে গান ধবিযা দিল— 'পান খেযে যাও হে বধু —

একজন দর্শক সঙ্গীকে বলিল —দেখেছিস?

অপবজন কহিল — এব চেযে ভালো আছে। তাব নাম কমলি। ফড়িং বললে আমায।

মেযেটি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

প্রথমজন বলিল— কী নাম তোমাব?

মেযেটি বলিল —চেহাবা দেখে নাম বুঝে নাও। কমলিনী ফুলবাণি। বলিযা হেলিতে দুলিতে আপন ঘবেব দিকে আগাইযা গেল।

—শোন-শোন। দক্ষিণে —

—সিকি আধুলিতে কমল-মালা গলায় পবা হয না নাগব। গোটা গোটা।

একজন কহিল— মদ খাবে তো।

—খাওযায কে? বলি বকে বকে মুখ তেতো হযে গেল। পান খাওযাও দেখি নাগব।—

একটা ঘবেব সম্মুখে কলবোল উঠিযাছিল।

কোন বন্ধুর গোপন অভিসার বন্ধুর দল ধরিয়া ফেলিয়াছে। কুৎসিত ছন্দে উলঙ্গ নৃত্যে বর্বরতার পায়ে বীভৎসতার নূপুর বাজিতেছিল।

কমলি বলিতেছিল—টাকা দিলেই নাচতে পারি। পয়সা দিয়ে হুকুম কর, আমি তোমার পায়ের দাসী।

একটা ঘর হইতে একটি প্রায়-উলঙ্গ মাতাল একটি স্ত্রীলোককে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল। মেয়েটিও মাতাল হইয়াছে। পুরুষটি মত্তকণ্ঠে কহিতেছিল—আমায় ভালোবাসবি না তুই? তোর নামে আমি নালিশ করব। ডিফামেসন সুট!

মেয়েটি কহিল—যা-যা যাঃ আমি হাইকোর্ট থেকে উকিল নিয়ে আসব।

সহসা মাতালটার কোন খেয়াল হইল কে জানে, সে মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল —আমি আর সংসারেই থাকব না। সন্নেসী হব আমি।

স্খলিত কাপড়খানাকে টানিতে টানিতে চলিয়া গেল। মেয়েটি নেশার তাড়নায় বসিয়া পড়িয়া তখনও আস্ফালন করিতেছিল—তোকে আমি জেলে দেব। ব্যারিস্টার আনব আমি। কই যা দেখি তুই সন্নেসী হয়ে!

বাজির ওখানে আসিয়াই মণি আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল —ওই দেখ দাদা, ওই দেখ!

সে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। ভিড়ে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবার ভয়ে অমর তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। একটা বাজি-ঘরের সম্মুখে একটা লোক নাক-লম্বা মুখোশ পরিয়া নাচিতেছে। পরনের পোশাকটাও তার অদ্ভুত। হাতে একজোড়া প্রকাণ্ড করতাল।

মণি আবার তাহার জামা ধরিয়া টানিল— ভূত, দাদা, ভূত। ওই দেখ ভূত আঁকা রয়েছে। অমর উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল সত্য সত্যই সাইনবোর্ডটায় কতকগুলো বড়ো বড়ো চামচিকার মতো ভূত নৃত্য করিতেছে। ছবিগুলোর নীচে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে, "ভৌতিক বিদ্যা ও ভোজবাজি।"

অমর চুপি চুপি মণিকে কহিল—জানিস মণি, এটা ভূতের খেলা, দেখবি?

মণি ঘাড় নাড়িয়াই আছে।

অমরের কিন্তু এত সহজে মন স্থির হইল না। অল্প পয়সায় সব চেয়ে ভালো বাজিটা দেখা তাহার ইচ্ছা।

এটার পরই একটা গেরুয়া রং-এর তাঁবু। সেটার বাহিরে কিছু লেখা নাই। কিন্তু তাঁবুর মধ্যে অনবরত টিং টিং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে।

দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটা লোক চিৎকার করিতেছে— এই ফুরিয়ে গেল। চলে এসো ভাই। এক পয়সা।

তার পরেরটায় ইংরাজিতে লেখা 'ইন্ডিয়ান ...।' তারপর কি অমর তাহা বানান করিল কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারিল না —কি, ইউ ডাব্‌ল জেড, এল, ই।

মণি তখন আবার নাচিতে শুরু করিয়াছে।

— ও দাদা, ও দাদা, নারদ মুনি সায়েব সেজে নাচছে দেখ। অমর ফিরিয়া দেখিল, মণি মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বুড়া নারদ মুনির মতো দেখিতে। তেমনি দাড়ি, তেমনি গোঁফ, আবার ফোকলা মুখের সম্মুখে দুটি নড়বড়ে দাঁত। নারদ মুনি সাহেবের পোশাক পরিয়া বাজনার তালে তালে ঘাড় দোলাইতেছিল আর গোঁফ নাচাইতেছিল। মণি কহিল— চল দাদা, এইটে দেখি ভাই।

অমর তখন পাশের তাঁবুটার সাইন-বোর্ড পড়িতেছিল। 'কাটা মুণ্ডু অফ বোম্বাই।' এক পাশে একটা কবন্ধ, ওপাশে দুইটা মাথাওয়ালা একটা মানুষ, মধ্যে রক্তাক্ত মুণ্ড।

অমরের এই 'কাটামুণ্ডু অফ বোম্বাই' দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু আরও ওপাশে কোথায় ব্যান্ড বাজিয়া উঠিল। মণি অমরের হাত ধরিয়া ওই ব্যান্ডের দিকে টানিয়া কহিল—ওই দাদা ইংরাজি বাজনা বাজছে। আয়, আয়! ওদিকে বড়ো বড়ো বাজি আছে।

পিছন হইতে জনতা সকলকে সম্মুখের দিকে ঠেলিতেছিল। নিবিড় জনতার মধ্যে শিশু দুটি চলিতেছিল ঠিক যেন নদীর স্রোতে অর্ধমগ্ন কুটার মতো। বাজির তাঁবুর সম্মুখে একটি পরিসর জায়গায় তাহারা আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বাঁচিল।

প্রকাণ্ড তাঁবুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। একটা মাচার উপর দুজন ক্লাউন নমুনা হিসাবে রিং-এর খেলা দেখাইতেছিল। আর একজন ক্রমাগত হাঁকিতেছিল—চলো, চলো দো-দো পয়সা! দো-দো পয়সা!

সহসা বাজনা থামিয়া গেল। বড়ো ক্লাউনটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে আরম্ভ করিল —বাবু লো-ক।

—হাঁ—হাঁ। ছোটো ক্লাউনটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। অমর ও মণি হাঁ করিয়া ক্লাউনদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন কী?

—কী ভাবছেন মশা? ঠিক সম্মুখের লোকটির নাকের কাছে ছোটো ক্লাউন হাত নাড়িয়া দিল।

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ছোটো ক্লাউন কহিল—যান ভিতরে যান। দেখুন খেলা শুরু হোয়ে গেল যে!

তাঁবুর সম্মুখের পর্দাটা খুলিয়া গেল। ভিতরে থিয়েটারের রং-চঙে স্টেজ দেখা গেল। দর্শকদল একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমর আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

স্টেজের উপর তখন নর্তকী-বেশী দুটি মেয়ে দেখা দিয়াছে।

ক্লাউন হাঁকিল —হরেক রকম, রকম রকম দেখবেন। ভিতর যান ভিতর যান।

ক'জন ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটা বন্ধ হইয়া গেল। মেয়ে দুটি ভিতরে তখন গান ধরিয়া দিয়াছে।

আবার ক'জন ঢুকিল।

সহসা পিছনের জনতার মধ্যে কোলাহল উঠিয়া পড়িল — সরে যাও, হাতি —হাতি!

ঠং ঠং শব্দে ঘণ্টা দোলাইয়া জমিদারের হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। চঞ্চল জনতা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মণির কাপড় ধরিয়া অমর অনেক দূর পর্যন্ত জনতার চাপে চলিয়া আসিল। একটু খোলা জায়গায় আসিতেই কাপড়ে ঝাঁকি দিয়া কে কহিল— কাপড় ছাড় না হে ছোকরা!

অমর সবিস্ময়ে দেখিল —অপরিচিত একজনের কাপড় সে ধরিয়া আছে। সে কাপড় ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুল হইয়া চারিপাশে চাহিল। কিন্তু কোথায় মণি?

শুধু মণি কোথায় নয়, এতক্ষণে অমরের হুঁশ হইল দিন চলিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে কালো আকাশ তারায় তারায় আচ্ছন্ন। চারিপাশে দোকানে দোকানে উজ্জ্বল আলোয় পণ্যসম্ভার ঝকমক করিতেছে।

অমরের কান্না পাইল। মণি! কোথায় মণি!

অমর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। মেলাটা তখন লোকে লোকারণ্য হইয়া গেছে। নিজের কোলটুকু ছাড়া ছোট্ট অমর আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। ধাক্কায় ধাক্কায় জনতার মধ্যে কোথায় সে আসিয়া পড়িল কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।

আনন্দ-বাজারের অঙ্গনমধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত উচ্ছ্বাস তীব্রতম হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল জনতার মধ্যে একস্থানে নাচগান চলিতেছিল। অমর বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবাক হইয়া গেল।

একজন পুরুষের গলা ধরিয়া সুশ্রী একটি মেয়ে উন্মত্তার মতো নাচিতেছিল। বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাইতেই পুরুষটি মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল। উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাস্যে জনতা উল্লাস প্রকাশ করিল। অমর আর একটা জনতার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে ডাইস খেলা চলিতেছে। পয়সা টাকা জলস্রোতের মতো ঝম্ ঝম্ করিয়া পড়িতেছে। খেলোয়াড় হাঁকিতেছিল—এক টাকা দিলে দু'টাকা, দু'টাকায় চার টাকা!

অমর ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিয়া গেল। আপনার পকেটে হাত দিয়া নাড়িতে আরম্ভ করিল।

কে একজন তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল —খোকা, তুমি জুয়ো খেলতে এসেছ? অমর দেখিল আঠারো-উনিশ বছরের একটি খদ্দর-পরা ছেলে, মাথায় গান্ধি টুপি।

জুয়া খেলোয়াড় চটিয়া গিয়াছিল, সে কহিল— কেন মশায় আপনি এমন করছেন? আমি দেড় হাজার টাকা জমিদারকে গুনে দিয়ে তবে খেলা পেতেছি। ধরে খোকা ধর, এক ঘুঁটিতে ডবল, দু' ঘুঁটিতে চার গুণ, তিনঘুঁটিতে ছ'গুণ পাবে, ধর ধর।

অমর ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ছেলেটি তাহার হাত ধরিয়া কহিল—এসো আমার সঙ্গে এসো। কী, হয়েছে কী তোমার? পিছনে ডাইসওয়ালা তখন হাঁকিতেছিল— চোরি নেহি, ডাকাতি নেই। নসিবকে খেলা হ্যায় ভাই। খোদা দেনেওয়ালা। ধর ভাই ধর।

ভিড়ের বাহিরে আসিয়া ছেলেটি অমরকে জিজ্ঞাসা করিল —কার সঙ্গে এসেছ তুমি? বাড়ি কোথা?

অমর ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল—আমার বোন হারিয়ে গেছে।

সচকিত ভাবে ছেলেটি প্রশ্ন করিল—বোন? কত বড়ো সে? তোমার চেয়ে ছোটো না বড়ো?

—আমার চেয়ে ছোটো। ছ' বছর বয়েস তার।
—গায়ে তার গয়না-টয়না আছে না কি?
—হাতে দুগাছা বালা আছে শুধু।
—কী নাম তার?
—মণি তার নাম। খুব চালাক সে। পিঠে বিনুনি বাঁধা আছে!

আনন্দ-উন্মত্ত যাত্রীর কল-কোলাহলে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নিকটের কথাবার্তা দুই-চারিটা শুধু স্পষ্টভাবে কানে আসিয়া ধরা দেয়। তাহা ব্যতীত যে শব্দ শোনা যায় সে যেন বিরাট একটা মধুচক্রের অগণ্য মধুমক্ষিকার গুঞ্জন।

অমর প্রাণপণ চিৎকারে ডাক দিয়া চালিয়াছিল।

বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে ছোট্ট মেয়েটি লোকের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। বাজিকরের তাঁবুর মধ্যে। সেখানে এদিক ওদিক চাহিয়া মণি দেখিল তাহার দাদা নেই। মণির বড়ো কৌতুক বোধ হইল। দাদা ভাবি ঠকিয়া গিয়াছে। সে ঢুকিতে পারে নাই! থাক্ সে বাহিরে দাঁড়াইয়া! পরক্ষণেই মনটা তাহার কেমন করিয়া উঠিল। আহা— দাদা দেখিতে পাইবে না যে!

মণি দাদাকে ডাকিতে ফিরিল। কিন্তু সে অবসর আর তাহার হইল না। ঠং ঠং শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিল স্টেজের উপর একটা ঘোড়া পিছনের দুপায়ে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে। মণি অবাক হইয়া গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! কুকুরে ডিগবাজি খায়, বাঁদরে ঘোড়া চড়ে, টিয়াপাখিতে বন্দুক ছোড়ে! একটা লোক আবার সং সাজিয়া কত রঙ্গই দেখাইয়া গেল, মণির হাসি আর থামে না।

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া স্টেজের উপর পর্দা পড়িয়া গেল। খেলা শেষ হইল। জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মণি বাহিরে আসিয়া চারিদিক দেখিল, দাদা তো নাই! কয়েক মুহূর্ত মণি হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সে জনতার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ভারি দুষ্টু তাহার দাদাটা!

দূরে নাগরদোলা ঘুরিতেছিল। মণি সেই দিকে চলিল। ওইখানে সে নিশ্চয় আছে। তাহাকে ফাঁকি দিয়া সে নিশ্চয়ই নাগরদোলায় চাপিয়াছে!

পথে একটা দোকানে দোকানি হাঁকিতেছিল—চলে এসো ভাই, চলে এসো। কাবাব রুটি। গোস্ পরেটা! চিংড়ি কাঁকড়া—এই এই, ভিড় ছাড়ো, ভিড় ছাড়ো।

ভিড় কমিল না। লোকটা অকস্মাৎ অতি বিকট চিৎকারে বলিযা উঠিল, এই বড়ো বাঘ!

মণি চমকিয়া উঠিল। আর্তস্বরে সে ডাকিয়া উঠিল — দাদা!

আবার পিছন দিক হইতে রব উঠিল—এই সরো, এই সরো।

কে কহিল— এই সরো'ই বটে রে বাবা— গাড়ি আসছে, গাড়ি আসছে।

জনতা দুইপাশে বিভক্ত হইয়া জমাটভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। ভিড়ের মধ্যে যে কেমন করিয়া কোন দিকে চলিয়াছিল তাহা মণি বুঝিল না। যখন সে হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইল তখন দেখিল তাহার চারিপাশে অন্ধকার আর মেলার বাহিরে একটা খোলা মাঠে সে দাঁড়াইয়া আছে।

পিছনে দোকানের পর্দায় ঢাকা আলোকোজ্জ্বল মেলাটা বিপুল কলরবে গমগম করিতেছে। উপরে নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের নীচে মেলার উৎক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি সাদা কুয়াশার মতো জাগিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে চারিপাশে দূরে দূরে কাহারা চলিয়াছে। কে যেন তাহার দাদার মতো হুইসিল বাঁশি বাজাইতেছে। মণি চিৎকার করিযা উঠিল—দাদা!

দূর মাঠ হইতে কে একজন উত্তর দিল—দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নাইক' ঘরে, দাদা গেছে বউ আনতে ওপারের চরে।

মণি বিষম রাগে তাহাকে গালি দিল— মর, মর মর তুমি। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করিল। সম্মুখেই খড় দিয়া ঘেরা ছোটো ছোটো ঘরের সারি। ঘরগুলার অন্ধকার পিছন দিকটা দেখা যাইতেছিল। ওপাশে সম্মুখের দিক উজ্জ্বল আলোয় আলোকময় হইয়া আছে।

মণি আসিয়া আলোকিত জায়গাটার ভিতরে যাইবার রাস্তা খুঁজিল। রাস্তা নাই। তবে ঘরগুলির পিছন দিকে একটি করিয়া দরজা রহিয়াছে। মণি একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে কে বলিয়া উঠিল— কে? কে?

মণি তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। ঘরের মধ্য হইতে সে আবার বলিল—চোব, চোর নাকি?

মণি এবার কাঁদিয়া ফেলিল। ততক্ষণে ঘরের মেয়েটি বাহির আসিয়া মণির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল — কে রে?

মণি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা দেশালাই জ্বালিয়া সে মণিব মুখের সম্মুখে ধরিল, মণির ফুটফুটে মুখখানি দেখিয়া মেয়েটির মুখচোখ কোমল হইয়া আসিল। মণিরও ভয়ার্ত ভাব যেন কাটিয়া গেল, যে তাহাকে ধরিয়াছিল সেও বড়ো সুন্দর।

মেয়েটি মণিকে জিজ্ঞাসা করিল— কাঁদছ কেন খুকী?

তাহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া মণি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল— আমি যে দাদাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

গভীব স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া মেয়েটি কহিল—ভয় কি? তুমি কেঁদ না। সক্কালেই তোমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দেব।

— বাত হয়ে গেছে যে।

- হোক না, তুমি আমার কাছে থাকবে আজ।

মণিকে বুকে কবিয়া মেয়েটি ঘরেব মধ্যে ঢুকিল। ওদিকেব রুদ্ধ দ্বারেব বাহিরে কে ডাকিতেছিল —কমলমণি, কমলমণি।

আবার একজন কহিল—এ ঘরেব লোক কই গো!

মণিকে বিছানায় বসাইযা দিয়া মেয়েটি কহিল—বসো তো মা একবাব।

তাবপব রুদ্ধদ্বারটা খুলিয়া দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া কহিল —কী? চেঁচাচ্ছ কেন?

কে এক জন কহিল—পুজো করব বলে।

জনতা হো হো কবিয়া হাসিযা উঠিল। মেয়েটি দুযার টানিয়া দিল। বাহির হইতে আবার কে কহিল — শুনচ। কমল।

কমল কহিল - অনেক নরকের দোর তো খোলা বয়েছে, যাও না, আমি পারব না।

একবাব শোনই না!

কমলি কহিল---বেশি উপদ্রব করলে পুলিশ ডাকব আমি।

মণি আবার ভয পাইয়া গিয়াছিল, সে চুপি চুপি কাঁদিতেছিল।

কমলি তাহার গায়ে গভীর স্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল— কেঁদ না খুকি, কেঁদ না।

মণি কান্নার মধ্যেই কহিল, আমার নাম তো খুকি নয়, আমার নাম মণি- -

—মণি। তা হ্যাঁ মা মণি, তোমার খিদে পেয়েছে?

- হ্যাঁ।

ঘবের কোণের একটা হাঁড়ি হইতে কচুরি-মিষ্টি বাহির করিয়া কমল মণির হাতে দিল।

তাহার মুখপানে চাহিয়া মণি কহিল—তোমাকে কী বলে ডাকব?

কমলি যেন অকস্মাৎ বলিযা ফেলিল — মা।

মণি কহিল—না, মা যে আমাব ঘবে আছে.

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি জল গড়াইতে বসিল। মণি কহিল— তোমায় আমি মাসি বলব, কেমন?

জল গড়ানো রাখিয়া দিয়া মেয়েটি মণিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল— হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাসিমা—মাসি মা— ।

মণি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল— আচ্ছা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাসিমার সহিত মণির নিবিড় পরিচয় হইয়া গেল। মায়ের কথা, বাবার কথা, দাদার কথা, বুড়ো দাদুর কথা, ছোটো বোনটির কথা পর্যন্ত বলিতে সে বাকি রাখিল না। এমন কি সেই দুষ্ট দোকানিটার কথা পর্যন্ত বলিতে সে ভুলিল না। এরোপ্লেন, নাগর-দোলা, পুতুল দুটি কত ভালো তাহাও সে বলিল। মখমলের চটিও কেমন তাও অপ্রকাশ রহিল না।

কমলি মণির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানি তাহার বড়ো ভালো লাগিতেছিল।

সহসা সে কহিল —তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাকো তো মণি। আমি একটু ঘুরে আসি। কেঁদ না যেন, বেশ!

মেয়েটি চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ কক্ষে বাহিরের কোলাহল প্রচণ্ড রূপে শিশুর কানে আসিয়া বাজিতেছিল। মণি ভয়ে একখানা কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

পিছনের দরজা ঠেলিয়া কমলি ফিরিয়া আসিল, মৃদুস্বরে ডাকিল—মণি!

মুখ হইতে কম্বলের আবরণটা সরাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া মণি সাড়া দিল — উঁ!

কমলি আঁচল হইতে কতকগুলো জিনিস বাহির করিয়া দিল। মণি সাগ্রহে একেবারে সমস্তগুলো কাছে টানিয়া লইল। এরোপ্লেনটা ঠিক তেমনি, বোধ হয় সেইটাই! নাগরদোলার পুতুলটা কিন্তু সেটার চেয়েও ভালো। মখমলের চটিটা নতুন ধরনের।

কমল জিজ্ঞাসা করিল— পছন্দ হয়েছে মণি?

মণি ঘাড় নাড়িল। কমল সাগ্রহে কহিল—একটি চুমু দাও দেখি তবে।

মণি গাল বাড়াইয়া দিল। চুমা দিয়া মণিকে বুকে ধরিয়া কমলি কহিল —তোমার মা ভালো, না আমি ভালো!

একটুক্ষণ ভাবিয়া মণি উত্তর দিল —মাও ভাল, তুমিও ভাল।

কমলি একটু হাসিল।

মণি সহসা কহিল — তুমি বিড়ি খাও কেন মাসি! মা তো খায় না।

মেয়েটির মুখ যেন কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মণির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারিয়া কহিল—ঘুমোও দেখি দুষ্টু মেয়ে।

মণি কহিল— তুমি শোও।

হাসিয়া কমলি মণিকে বুকে টানিয়া শুইয়া পড়িল।

মণির চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। কমলি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

পিছনের দরজার বাহিরে কে তাহাকে ডাকিল — কমলি!

কমলি উঠিতে উঠিতে আহ্বানকারী আগড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

কমলি কহিল — মাসি!

আগন্তুক মেয়েটি কহিল— হ্যাঁ। ঘরে শুয়ে রয়েছিস যে? কী হয়েছে তোর? এর পর কিন্তু টাকা দিতে পারব না বললে আমি শুনব না। জমিদারের টাকা আমাকে গুনতে হবে।

কমলি কোনো উত্তর দিবার পূর্বেই আবার সে কহিল — ও কে লো? কার মেয়ে?

কমলির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল — জানি না।

—কারুর হারানো মেয়ে বুঝি? কোথায় পেলি?

—ঘরের পেছনে।

— কেউ জানে?

বিবর্ণ মুখে ঘাড় নাড়িয়া কমলি জবাব দিল —না।

— বেশ, তবে ভোরের আগেই ওকে সরিয়ে দিতে হবে। সরকারকে বলে আসি আমি। ভালো করে আগড়টা সরিয়ে দে।

ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধা বাহির হইয়া গেল। কমলি আগড়টা আঁটিয়া দিতে গিয়া আগড়ে হাত রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। মাসি ইঙ্গিতে যে কথার আভাস দিয়া গেল সে কথা সে ভাবিতেও পারে নাই। সে শিহরিয়া উঠিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ওদিকে বাহিরের কোলাহল ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল। দুই একটা উচ্চ, জড়িত কণ্ঠের শব্দ বা কাহারও আহ্বানের শব্দ শুধু শোনা যায়। বাজি, সার্কাসের বাজনা নীরব হইয়া গিয়াছে।

কমলি পিছনের আগড় খুলিয়া একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

অন্ধকার থম থম করিতেছে। পথিকের আনাগোনাও বিরল হইয়া আসিয়াছে।

কমলি আবার ঘরে ঢুকিল। তারপর একমুহূর্ত সে বিলম্ব করিল না। মণিকে সে বুকে তুলিয়া লইল। আঁচলে সেই খেলনাগুলি জড়াইয়া পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সে মাঠের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

দন্ত কৌমুদী



বনফুল

যাহারা পতিতা, যাহারা নিজেদের দেহ বিক্রয় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, তাহাদের ঘৃণা করা উচিত — সুনীতিপরায়ণ সাধু ব্যক্তিদের ইহাই নির্দেশ। তাঁহারা আরও বলেন, তাহাদের সংস্রবও পরিহার্য। প্রথম উপদেশটি এতদিন পালন করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয়টি পারি নাই। কারণ অমি ডাক্তার, রোগিণী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে পতিতা কি সতী এ বিচার করা চলে না, তাহার চিকিৎসায় মন দিতে হয়, সুতরাং সংস্রব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই দ্বিতীয় উপদেশটি পালন করা সম্ভব হয় নাই। আজ দেখিতেছি, প্রথম উপদেশটির মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারিলাম না। চাহনির উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করিতে হইল। সবাই তাহাকে চাউনি বলিয়া ডাকিত। বিহারীরা বলিত, নজরিয়া। আমি নামটাকে একটু শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলাম। চাহনি নামজাদা পতিতা ছিল না, চিত্র-তারকা হইবার সুযোগ সে পায় নাই। তাহার ফি ছিল মাত্র এক টাকা। পথচারিণী ছিল সে।

সে আমার নিকট প্রথম যখন আসিয়াছিল তখন সে সিফিলিসে জর্জরিত। অনেকগুলি ইনজেকশন দিয়া তাহাকে ভালো করিলাম।। আমার ফি দিতে কোনোদিন সে কার্পণ্য করিত না, কেবল শেষের ফিটা সে দিতে পারে নাই, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, এখন হাতে পয়সা নেই ডাক্তারবাবু, পরে দিয়ে যাব। বিশ্বাস করুন আমাকে, নিশ্চয় দিয়ে যাব।

বছরখানেক পরে আবার আসিয়াছিল সে। আমার ফি আনে নাই, নতুন একটা সমস্যা সমাধান করিবার জন্য পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিল।

বলিল, আমার দাঁতগুলো দেখুন তো ডাক্তারবাবু। দেখিলাম, দাঁতগুলি মজবুত আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই কুচকুচে কালো। মিশি, গুল এবং পানদোক্তাই কারণ। বলিলাম, দাঁত তো ভালোই আছে। রঙ অবশ্য কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কী?

চাহনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

এ কালো রঙ উঠিয়ে দেওয়া যায়?

যায়, কিন্তু অনেক হাঙ্গামা। এখানে হবে না। কলকাতা যেতে হবে। থাক না কালো রঙ, ক্ষতি কী?

চাহনি বলিল, আজকাল ঝকঝকে সাদা দাঁত সবাই চায়। আমার খদ্দের অনেক কমে গেছে।

বলিয়া মাথা হেঁট করিল। তারপর বলিল, কলকাতাই চলে যাই তাহলে। রেশমীও এই কথা বলছিল। আপনিও যখন বলছেন তখন সেই ব্যবস্থাই করি।

যাইবার পূর্বে বলিয়া গেল, আপনার ফিয়ের কথা ভুলিনি, পাঠিয়ে দেব পরে। বড়ো টানাটানি চলছে আজকাল।

চলিয়া গেল।

তাহার পর আরও পাঁচ বছর কাটিয়াছে। চাঁহনির কোনো খবর আর পাই নাই। আজ সকালে একটি ঘাড়-ছাঁটা ছোকরা একটি চিঠি এবং একটি সিল-করা কৌটা আমার হাতে দিয়া গেল। বলিল, চাউনি এটা কলকাতা থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

কী আছে কৌটাতে?

তা তো জানি না।

ছোকরা চলিয়া গেল।

চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম। আঁকা-বাঁকা লেখা, অজস্র বানান ভুল। ভাষাতেও গুরু-চণ্ডালি দোষ। সংশোধন করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায় —

শ্রীচরণেষু,

শত সহস্র প্রণামান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, ভগবানের কৃপায় আশা করি আপনি ভালো আছেন। আশা করি এ অভাগীর কথা আপনার মনে আছে। আপনার পরামর্শ অনুসারে আমি কলিকাতায় আসিয়া একজন বড়ো দাঁতের ডাক্তারকে আমার দাঁতগুলি দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সব দাঁতগুলি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লও ' সবগুলি না পার, অন্তত সামনের কয়টি বাঁধাইয়া লও। দেখিতেও ভালো হইবে, দাঁতগুলি অনেকদিন টিকিবেও। আমার যে কয়খানা গহনা ছিল তাহা বেচিয়া সোনা দিয়া দাঁত বাঁধাইয়া লইলাম। ইহাতে ফলও হইয়াছিল। এখানেই নূতন করিয়া আবার ব্যবসা ফাঁদিয়াছিলাম। লোক মন্দ জুটিত না। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার অদৃষ্টই মন্দ। আবার ব্যায়রামে পড়িলাম। এবার যক্ষ্মা। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, বাঁচিবার আশা কম। অনেক টাকা খরচ করিলে কিছুদিন বাঁচিতে পারি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইব না। আমার টাকা আর নাই, চিকিৎসায় এবং বাড়িভাড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আর বাঁচিব না। আপনার সহিত আর আমার দেখাও হইবে না। আপনার কিছু ফি বাকি ছিল, সে কথা আমি ভুলি নাই। আপনার ঋণ শোধ করিবার নয়, তবু ফি বাবদ কিছু পাঠাইতেছি। আমার কাছে নগদ টাকা নাই। আমার সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলিই আপনাকে একটি কৌটায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। পাড়ায় একটি ছোকরা দাঁতের ডাক্তার আছে, সে-ই কোনো পয়সা না লইয়া দাঁতগুলি উপড়াইয়া দিয়াছে। ছেলেটি বড়ো ভাল। রেশমার ছেলে খোনতা এখানে আসিয়াছিল, তাহার হাতেই পাঠাইলাম। আপনি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি—

সেবিকা

চাঁদনি

নীলকর



শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন সন্ধ্যার পর আমরা মাত্র তিনজন সভ্য ক্লাবে উপস্থিত ছিলাম — আমি, বরদা এবং একজন নূতন সভ্য, হিরণ্ময়বাবু। ইনি সম্প্রতি সিগারেট ফ্যাক্টরিতে চাকরি লইয়া এখানে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা কাটাইবার জন্য ক্লাবের সভ্য হইয়াছেন। বেশ মিশুক ও রসিক লোক।

ফাল্গুন মাস। খোলা জানালা দিয়ে বাতাস আসিয়া টেবিলের উপর পাট-করা খবরের কাগজখানাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, মাথার উপর বিদ্যুৎবাতিটা প্রখরভাবে জ্বলিতেছে। আমরা দুই-চারিটা অনাবশ্যক কথা বলিয়া নীরব হইয়া পড়িয়াছি। বরদা কড়িকাঠের দিকে তন্ময় চক্ষু তুলিয়া বোধকরি নূতন ভৌতিক গল্প উদ্ভাবন করিতেছে। হিরণ্ময়বাবু লম্বা একটা হোল্‌ডারে সিগারেট জুড়িয়া টানিতেছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া বরদার দিকে কটাক্ষপাত করিতেছেন। আমি ভাবিতেছি—

হঠাৎ হিরণ্ময়বাবু বলিলেন, 'বরদাবাবু, আপনি নাকি ভূত দেখেছেন?'

চমকিয়া মুখ তুলিলাম। বরদাকে এই প্রশ্ন করা আর পাগলকে সাঁকো নাড়িতে বারণ করা একই কথা। হিরণ্ময়বাবু নূতন লোক, বরদাকে এখনও ভালো করিয়া চেনেন নাই। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম।

বরদা কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইয়া তন্ময় দৃষ্টিতে হিরণ্ময়বাবুর পানে চাহিল। এবং ঠিক এই সময় বিদ্যুৎবাতি নিবিয়া ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। অতর্কিত ঘটনায় হিরণ্ময়বাবু হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ করিলেন।

হিরণ্ময়বাবুর প্রশ্নের সঙ্গে আলো নিবিয়া যাওয়ার কোনো অনৈসর্গিক সংযোগ আছে তাহা মনে করিবার কারণ নাই। কিছুদিন হইতে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, হঠাৎ আলো নিভিয়া সমস্ত পাড়াটাই নিরালোক হইয়া যাইতেছিল। বৈদ্যুতিক কর্তারা বলিতেছিলেন লাইনের দোষ হইয়াছে। কিন্তু দোষ ধরিতে পারিতেছিলেন না। আজও তাহাই হইয়াছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে আলো জ্বলিবে না।

অন্ধকারে বসিয়া আছি। প্রথম কথা কহিল বরদা, তাহার কণ্ঠস্বরে বেশ একটু পরিতৃপ্তির সুর ধরা পড়িল। যেন তাহার গল্পের পরিবেশ রচনার জন্যই আলো নিভিয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'ভূত আমি অনেক দেখেছি, হিরণ্ময়বাবু! দিশি ভূত, বিলিতি ভূত, ভালোমানুষ ভূত, দুর্দান্ত ভূত। মানুষ যেমন হরেক রকমের আছে ভূতও তেমনি। কিন্তু গত পৌষ মাসে যে ভূতটিকে দেখেছিলাম, তার মতো অশ্লীল ভূত জীবনে দেখিনি।'

বরদার গল্প ফাঁদিবার টেকনিক আমাদের জানা আছে। গোড়াতেই চমকপ্রদ একটা কথা বলিয়া শ্রোতাদের হতবুদ্ধি করিয়া দেয়, তারপর শ্রোতারা সামালাইয়া উঠিবার আগেই গল্প শুরু করে। তখন আর তাহাকে থামাইবার উপায় থাকে না। উপরন্তু আজ হিরণ্ময়বাবু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন, বলিলেন, 'অশ্লীল ভূত কী রকম! কাপড়-চোপড় পরে না?'

বরদা বলিল, 'ঠিক ওরকম নয়। ভূতকে অশ্লীল কেন বলছি তা বুঝতে হলে গল্পটা শোনা দরকার। গত পৌষ মাসে আমি মজঃফরপুরে গিয়েছিলাম—'

গল্প আরম্ভ হইয়া গেল। অন্ধকারে হিরণ্ময়বাবুর সিগারেটের অগ্নিবিন্দুটি থাকিয়া থাকিয়া স্ফুরিত হইতেছে, দক্ষিণা বাতাস খবরের কাগজ লইয়া ফর্ ফর্ শব্দে খেলা করিতেছে, তাহার মধ্যে বরদার নিরালম্ব কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিঃ

মজঃফরপুর জেলায় আমাদের সামান্য জমিজমা আছে। জায়গাটার নাম নীলমহল। আগে সাহেবরা নীলের চাষ করত। তারপর নীলের চাষ যখন উঠে গেল তখন আমার ঠাকুরদা ওটা কিনেছিলেন। এখন সেখানে ধান হয়, আখ হয়, আম-লিচুর বাগানও আছে। দু-চার ঘর প্রজা আছে। আমাদের সাবেক নায়েব শিবসদয় দাস সেখানে থেকে সম্পত্তি দেখা-শোনা করেন। দাদা শীতকালে গিয়ে তদারক করে আসেন।

এ বছর দাদা লম্বেগো নিয়ে বিছানায় শুলেন। কী করা যায়? ধান কাটার সময়, আখও তৈরি হয়েছে। এ সময় মালিকদের একবার যাওয়া দরকার। শিবসদয়বাবু অবশ্য লোক ভালোই, বিপত্নীক নিঃসন্তান মানুষ, চুরি-চামারি করেন না। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাড়ি এবং অন্যান্য ব্যাপারে বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছেন, কাজকর্ম ভালো দেখতে পারেন না, প্রজারা লুটেপুটে খায়। সুতরাং আমাকেই যেতে হল।

ছেলেবেলায় দু-একবার নীলমহলে গিয়েছি, তারপর আর যাইনি। মজঃফরপুর শহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে; সাম্পানি নামে একরকম বলদ-টানা গাড়ি আছে, তাতেই চড়ে যেতে হয়। পৌষের মাঝামাঝি একদিন বিকেলবেলা গিয়ে পৌঁছলাম। ওদিকে তখন প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

আগে খবর দিয়ে যাইনি, আগে খবর দিয়ে গেলে জমিদারির প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায় না। কর্মচারীরা ধোঁকার টাটি তৈরি করে রাখে। গিয়ে দেখি কাছারি-বাড়ির সামনে তক্তপোশ পেতে শিবসদয়বাবু রোদ্দুরে বসে বৃহৎতন্ত্রসার পড়ছেন, তাঁর সামনে এক কলসি তাড়ি। রোদ্দুরে তাড়ি গেঁজিয়ে কলসির গা বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

আমাকে দেখে শিবসদয় বড়ো অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, তারপর এসে পায়ের ধুলো নিলেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো, কিন্তু আমি মালিক, তার উপর ব্রাহ্মণ। পায়ের ধুলো নিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, 'আগে খবর দিলেন না কেন? খবর পেলে আমি ইস্টিশনে গিয়ে—'

মনে মনে ভাবলাম, খবর দিলে তাড়ির কলসি দেখতে পেতাম না। ন্যাকা সেজে বললাম, 'দাদা আসতে পারলেন না, তাঁর কোমরে বাত হয়েছে। হঠাৎ আমার আসা স্থির হল।' তারপর কলসির দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী?'

শিবসদয় এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন, বললেন, 'আজ্ঞে, তালের রস। শীতটা চেপে পড়েছে, এ-সময় তালের রসে শরীব গরম থাকে। একটু হবে নাকি?'

বললাম, 'না। অনেকদিন বেহারে আছি কিন্তু তাড়ি এখনও ধরিনি। আমার জন্যে বরং একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন।'

শিবসদয় 'হলধর' বলে হাঁক দিলেন। কাছারি বাড়ির পিছন দিক থেকে হলধর এসে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি আমার পায়ের কাছে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। হলধরকে চিনি, মাঝে মাঝে ধান বিক্রিব টাকা নিয়ে মুঙ্গেরে আসে। বুড়ো লোক, জাতে কাহার কিংবা ধানুক, চোখ দুটো ভাবি ধূর্ত। কাছারিতে চাকরেব কাজ করে আর বিনা খাজনায় দু-তিন বিঘে জমি চাষ করে।

শিবসদয় বললেন, 'ছোটোবাবুর জন্যে চা আর জলখাবার তৈরি কর।'

হলধর বলল, 'চা-জলখাবার! আজ্ঞে —তা —আমি কবুতরীকে এখুনি ডেকে আনছি। সে সব জানে।'

হলধব ব্যস্তসমস্তভাবে বাইরে চলে গেল, বোধহয় গ্রামে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবুতবী কে?''

শিবসদয় একটু থমকে বললেন, 'কবুতরী—হলধরের নাতনি।'

শিবসদয় আমাকে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। কাছারি পাকা বাড়ি নয়, পাশাপাশি তিনটে মেটে ঘর, সামনে টানা বারান্দা, মাথায় খড়ের চাল। ভিত বেশ উঁচু, কিন্তু অনাদরে অবহেলায় মাটি খসে খসে পড়ছে। চালের অবস্থাও তথৈবচ, কতদিন ছাওয়া হয়নি তার ঠিক নেই। তিনটে ঘরের একটাতে দপ্তর, মাঝের ঘরটা শিবসদয়বাবুর শোবার ঘর, তার পাশে রান্নাঘর। তিনটে ঘরের অবস্থাই সমান; মেঝেয় ধুলো উড়ছে, চালে ফুটো। শিবসদয়ের মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। তাড়ি খেয়ে খেয়ে লোকটা একেবারে অপদার্থ হয়ে পড়েছে। নেহাত পুরনো চাকর, নইলে দূর করে দিতাম।

শিবসদয় বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন, কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আমার বড়ো চুক হয়ে গেছে। আপনি আসবেন জানলে সব ফিটফাট করে রাখতাম। নিজের জন্যে কে অত করে! যা হোক, এবার ধান কাটা হলেই চালটা ছাইয়ে ফেলব।'

'মনটা একটু নরম হল। কাছারি থেকে নেমে বললাম, 'চায়ের দেরি আছে, আমি ততক্ষণ চারদিক ঘুরে দেখি। ছেলেবেলায় দেখেছি, ভালো মনে নেই।'

'শিবসদয় বললেন, 'চলুন আমি দেখাচ্ছি।'

'দু-জনে বেরুলাম। সত্তর-আশি বিঘে চাষের জমি, তার মাঝখানে বিঘে চারেক উঁচু জায়গা; এদেশে বলে ভিঠ্‌জমি। এই উঁচু জায়গাটার উপর আমাদের কাছারি। আগে এখানে নীলকর সাহেবদের কুঠি ছিল। মাঝখানে

মস্ত একটা পুকুর; এই পুকুরে নীলের ঝাড় পচিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়ায় সেদ্ধ করে নীলের ক্কাথ বার করত। এখন পুকুর মজে গেছে, যেটুকু জল আছে তা পদ্ম আর কলমির দামে ভরা। পুকুরের উঁচু পাড়ের একধারে সারি সারি সাহেবদের কুঠি ছিল, এখন ইটের স্তূপ। পুকুরের আর এক পাড়ে কাতার দিয়ে একসারি বিরাট উনুন; উনুনের গাঁথুনি পাকা, তাদের ওপরে এখনও কয়েকটা লোহার কড়া বসানো রয়েছে। এই সব কড়ায় নীল সেদ্ধ হত, এখন মরচে ধরে ফুটো হয়ে গেছে। তবু আছে, সাহেবরা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি পড়ে আছে।

এই চার-বিঘে ভগ্নস্তূপের চারদিকে ঝোপঝাড় জন্মেছে। বড়ো বড়ো গাছ গজিয়েছে। একটা বিশাল সূচীপর্ণ ঝাউগাছ হাত-পা মেলে পুকুরের ঈশান কোণটাকে আড়াল করে রেখেছে। বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে মনে হয়, সবুজ সমুদ্রের মাঝখানে পাথুরে দ্বীপের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ধানের খেত, আখের খেত, আম-লিচুর বাগান; বিকালবেলায় পড়ন্ত রৌদ্রে তার উপর বাতাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আম-লিচুর বাগানের কোলে প্রজাদের গ্রাম, মোট কুড়ি-পঁচিশটা খড়ে-ছাওয়া কুঁড়েঘর। বড়ো সুন্দর দেখতে।

''কিন্তু দেখতে যতই সুন্দর হোক, ওখানকার আবহাওয়া ভালো নয়। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নিজের অগোচরেই একটা কাঁটা আমার মনে বিঁধতে লাগল। কোথায় যেন একটা বিকৃত পচা অশুচিতা লুকিয়ে আছে, ঢাকা নর্দমার চাপা দুর্গন্ধের মতো। নীলকর সাহেবরা শুধু অত্যাচারী ছিল না, পাপী ছিল। এমন পাপ নেই যা তাবা করত না। তাদের পাপের ছাপ যেন এখনও ও-জায়গা থেকে মুছে যায়নি। মনে পড়ল, দাদা বলেছিলেন— নীলমহলের বাতাসে ম্যালেরিয়ার চেয়েও সাংঘাতিক বিষ আছে; ওখানে বেশিদিন থাকলে মানুষ অধঃপাতে যায়, অমানুষ হয়ে যায়।

ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ চোখে পড়ল, ঝাউগাছটার আড়ালে একটা পাকা ঘর। আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ওটা কী?'

'শিবসদয় বললেন, 'ওটা কোৎঘর।'

'কোৎঘর। সে কাকে বলে?'

'নীলকরদের আমলের ঘর। প্রজারা বজ্জাতি করলে সাহেবরা তাদের ধরে এনে ওই কোৎঘরে বন্ধ করে রাখত। খুব মজবুত ঘর গড়েছিল, যেন লখীন্দরের লোহার ঘর।'

'চলুন তো দেখি।'

গিয়ে দেখি ঝাউগাছের আওতায় ছোটো একটি ঘর। খুব উঁচু নয়, বেঁটে নিরেট চৌকশ, জগদ্দল পাথরের মতো মজবুত ঘর। চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া দেওয়াল, মোটামোটা গরাদ লাগানো জানলার লোহার কবাট খোলা রয়েছে, দরজার লোহার কবাটও খোলা। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম; ইট কাঠ দরজা জানালা কিছুই নষ্ট হয়নি, ষাট-সত্তর বছর ধবে দিব্যি অটুট রয়েছে।

'মনে হল, কোৎঘর কিনা, তাই অটুট আছে। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে, তার জায়গায় অন্য শাসনতন্ত্র আসে, কিন্তু কারাগাব ঠিক খাড়া থাকে। মানুষ যখন সমাজ গড়েছিল তখন কারাগারও গড়েছিল—যতদিন একটা আছে ততদিন অন্যটাও থাকবে।

দোরের কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি মারলাম। মেঝে শান-বাঁধানো, দেওয়ালের চুনকাম এখনও বোঝা যায়। আমি শিবসদয়কে বললাম, 'ঘরটা তো বেশ ভালো অবস্থাতেই আছে। ব্যবহার করেন না কেন? দরজা জানালা কি জাম হয়ে গেছে?'

'শিবসদয় 'আজ্ঞে —' বলে থেমে গেলেন। আমি দরজার কবাট ধরে টানলাম, মরচে ধরা হাঁসকলে কাঁচ কাঁচ শব্দ হল বটে, কিন্তু বেশ খানিকটা নড়ল। আমি শিবসদয়ের পানে তাকালাম। তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে বললেন, 'সন্ধে হয়ে এল, চলুন এবার ফেরা যাক।'

সূর্যাস্ত হয়েছে কি হয়নি, কিন্তু ঝাউগাছতলায় ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে। কাছারিবাড়ি এখান থেকে বড়ো জোর একশো গজ। আমি দরজা ছেড়ে পা বাড়ালাম। ঠিক এই সময় আমার কানের কাছে কে যেন খিসখিস শব্দ করে হেসে উঠল। আমি চমকে ফিরে তাকালাম। কেউ নেই। উপর দিকে চোখ তুলে দেখলাম, ঝাউগাছের ডালগুলো একটা দমকা হাওয়া লেগে নড়ে উঠেছে। তারই শব্দ। কিন্তু ঠিক মনে হল যেন চাপা গলার হাসি।

পুকুরে পাড় দিয়ে অর্ধেক পথ এসেছি, শিবসদয় একটু কেশে কেশে বললেন, ' কোৎঘরের জানালা দরজা বন্ধ করা যায়, কিন্তু বন্ধ থাকে না। আপনা-আপনি খুলে যায়।'

'তার মানে?' আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'শিবসদয় বললেন, 'সেই জন্যেই ঘরটা ব্যবহার করা যায় না। ওতে সাহেব থাকে।'

'সাহেব থাকে! কোন সাহেব?'

'আজ্ঞে, আছে একজন।' শিবসদয় পিছন দিকে তাকালেন, বললেন, 'এখন চলুন, রাত্রে বলব।'

'একটু বিরক্ত হলাম। লোকটা কি আমাকে ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাতে চায় নাকি! পীরের কাছে মামদোবাজি!

যাহোক, কাছারিতে ফিরে এসে দেখলাম, পূর্ণকুম্ভটি স্থানান্তরিত হয়েছে; তক্তপোশের উপর কম্বলপাতা, তার উপর ফরাস, তার উপর মোটা তাকিয়া। গদিয়ান হয়ে বসলাম। পশ্চিম আকাশে তখনও বেশ আলো রয়েছে, কিন্তু বাতাস ক্রমেই ঠান্ডা হয়ে আসছে। শিবসদয় ঘরে গিয়ে একটা বালাপোশ গায়ে জড়িয়ে চৌকির কোণে এসে বসলেন। বোধ হয় এই ফাঁকে শরীর-গরম করা সঞ্জীবনী-সুধা সেবন করে এলেন।

এই সময় একটা মেয়ে রান্নাঘর থেকে নেমে এল দু' হাতে বড়ো কাঁসার থালার উপর চায়ের পেয়ালা আর জলখাবারের রেকাবি নিয়ে। চলনের ভঙ্গিতে বেশ একটু ঠমক আছে, হিন্দিতে যাকে বলে লচক। উচক্কা বয়স, নিটোল পুরন্ত গড়ন। গায়ের রঙ ময়লা বটে, মুখখানাও সুন্দর বলা চলে না। পুরু ঠোঁট, চোয়ালের হাড় চওড়া, চোখের দৃষ্টি নরম নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা দুরন্ত আকর্ষণ আছে—

হলধরের নাতনি কবুতরী।

আমার সামনে থালা রেখে আমার মুখের পানে চেয়ে হাসল, সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল। সহজ ঘনিষ্ঠ প্রগল্‌ভতার সুরে বললে, 'ছোটো মালিককে এই প্রথম দেখলাম।'

আমি উত্তর দিলাম না। শিবসদয়ের দিকে তাকালাম। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি চা খাবেন না?'

'শিবসদয় অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'আমি খাই না।'

কবুতরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, 'ছোটো মালিক, দেখুন না চায়ে মিষ্টি হয়েছে কি না।' গলায় এতটুকু সঙ্কোচ নেই।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে।'

কবুতরী বলল, 'আর নিমকি? খেয়ে দেখুন না।'

আমি নিমকিতে কামড় দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে।'

কবুতরী তবু দাঁড়িয়ে রইল। আমি তার দিকে একবার তাকালাম, সে আমার পানে অপলক চোখ মেলে চেয়ে আছে। মুখে ঘনিষ্ঠ নির্লজ্জ হাসি।

শিবসদয় তার দিকে না তাকিয়েই একটু অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'কবুতরী, দাঁড়িয়ে থেক না, তাড়াতাড়ি রান্নার কাজ সেরে নাও। বাবু ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়বেন।'

কবুতরী আরও খানিক দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অনিচ্ছাভরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার রান্না কি কবুতরী করে?'

হ্যাঁ।

'ও ঘরে কে কে আছে?'

একটু চুপ করে থেকে শিবসদয় ম্রিয়মাণ স্বরে বললেন, 'ও হলধরের কাছেই থাকে। একটা স্বামী ছিল, বছরখানেক আগে ওকে ত্যাগ করে চলে গেছে।'

শিবসদয়ের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। এতক্ষণ যা চোখে পড়েনি হঠাৎ তাই দেখতে পেলাম। তাঁর শীর্ণ চেহারা, নিষ্প্রভ চোখ, ঝুলে-পড়া আলগা ঠোঁট— তাঁর সাম্প্রতিক জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস যেন ওই মুখে লেখা রয়েছে। বুড়ো বয়সে তিনি শুধু তালরসেরই রসিক হননি, অন্য রসেও মজেছেন। পরকীয়া রস। কবুতরী ছোটো ঘরের স্বৈরিণী মেয়ে, সে তাঁকে গ্রাস করেছে। কিন্তু কবুতরী শিকারি মেয়ে, বড়ো শিকার সামনে পেয়ে

সে ছোটো শিকাবেব পানে তাকাবে কেন? কবুতবীব ভাবভঙ্গি থেকে শিবসদয তা বুঝতে পেবেছেন। তাই তাঁব মনে সুখ নেই।

অথচ যখন বযস কম ছিল, শিবসদয তখন সচ্চবিত্র ছিলেন। লেখাপডা বেশি না জানলেও মনটা ভদ্র ছিল। পাঁচ বছব আগে পর্যন্ত তিনি আমাদেব মুঙ্গেবেব জমিজামা দেখতেন। কাজকর্মে দক্ষতা ছিল, অবৈধ লাভেব লোভ ছিল না। আব আজ নীলমহলে এসে তাঁব এই অবস্থা। এটা কি স্থান-মাহাত্ম্য? ম্যালেবিযাব চেযেও সাংঘাতিক বিষ তাঁব বক্ত দূষিত কবে দিযেছে?

চা জলখাবাব শেষ কবে বললাম, 'চলুন, ভেতবে গিযে বসা যাক। বাইবে হাত-পা ঠান্ডা হযে যাচ্ছে।'

হলধব ঘবে ঘবে লণ্ঠন জ্বেলে দিযেছে। আমবা দপ্তবেব মেঝেয পাতা গদিব ওপব গিযে বসলাম। শিবসদয মচ্ছিভঙ্গ হযে আছেন, মাঝে মাঝে চোখ বেঁকিযে আমাব পানে চাইছেন, বোধ হয বোঝবাব চেষ্টা কবছেন কবুতবীব দিকে কতটা আকৃষ্ট হযেছি

জিজ্ঞেস কবলাম, 'বাত্রে শোবাব ব্যবস্থা কী বকম? আমাব সঙ্গে লেপ বিছানা সব আছে।'

শিবসদয বললেন 'শোবাব ঘবে আপনাব বিছানা পেতে দিযেছি। আমি এই গদিব ওপবেই বাত কাটিযে দেব।

সিগাবেট ধবিযে তাকিযায ঠেস দিযে বসলাম। বললাম, 'এবাব কোৎঘবেব সাহেবেব গল্প বলুন।'

একটু বসুন, আমি বান্নাব খবকটা নিযে আসি। বলে শিবসদয উঠে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পবে আবাব ফিবে এসে বসলেন। গন্ধ পেযে বুঝলুম শুধু বান্না পবিদর্শন নয শীতেব অমোঘ মুষ্টিযোগও বেশ খানিকটা টেনেছেন। তাঁব চোখে মুখে সজীবতা ফিবে এসেছে।

বললেন, 'আপনি কি সাহেবেব কথা কিছু জানেন না?'

'কিছুই না। কেউ কিছু বলেনি।'

শিবসদয তখন আবম্ভ কবলেন আমাবও শোনা কথা। হলধব আব গাঁযেব পাঁচজনেব মুখে যা শুনেছি তাই বলছি। আশি নব্বুই বছব আগেকাব ঘটনা। তখন নীলকব সাহেবদেব ব্যবসা গুটিযে আসছে, জার্মানিব কাবখানায নীল তৈবি হযেছে। সেই সময এখানে যে সব সাহেব থাকত তাদেব মধ্যে একটা ছোঁডা ছিল ভযঙ্কব ... । এখানকাব নীলচাষিবা তাব নাম দিযেছিল 'বিল্লি সাহেব।' প্রজাবা কিছু কবলে তাদেব ধবে এনে হাসতে হাসতে যে সব যন্ত্রণা দিত, তা শুনলে এখনও গা শিউবে ওঠে। গ্রীষ্মকালে হাত পা বেঁধে রোদ্দুবে সাবা দিন ফেলে বেখে দিত শীতেব বাত্তিবে পুকুবে গলা পর্যন্ত ডুবিযে দাঁড কবিযে বাখত। আঙুলেব নখেব উপব পেবেক ঠুকে দিত। আব কমবযেসি মেযেমানুষ দেখলে তো বক্ষে নেই। অন্য সাহেববাও দবকাব হলে প্রজাদেব উপব অত্যাচাব কবত ধবে এনে কোৎঘবে বন্ধ কবে বাখত, কিন্তু বিল্লি সাহেবেব তুলনায সে কিছুই নয। বিল্লিসাহেব বোজ নতুন নতুন যন্ত্রণা দেবাব ফন্দি বাব কবত। অন্য সাহেববা তাকে সামলাবাব চেষ্টা কবত, কিন্তু পেবে উঠত না

একবাব একটা প্রজা দাদনেব টাকা নিযে গা ঢাকা দিযেছিল, সাহেববা তাব সোমত্ত বউকে ধবে এনে কোৎঘবে বন্ধ কবে বেখেছিল। বউটাব উপব অত্যাচাব কবাব মতলব তাদেব ছিল না। প্রজাটাকে জব্দ কবাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু বিল্লি সাহেব মনেমনে অন্য ফন্দি এঁটেছিল। দুপুব বাত্রে অন্য সাহেববা যখন ঘুমিযে পডেছে তখন সে কোৎঘবেব তালা খুলে ঘবে ঢুকল।

বউটাব কাছে ছোবাছুবি ছিল না। কিন্তু তাব দু' হাতে ছিল ভাবী ভাবী রুপোব বালা, এদেশে যাকে বলে কাঙনা। তাই দিযে সে মাবল বিল্লি সাহেবের রগে। সাহেব সেইখানে পডে মবে গেল। বউটা পালাল।

অন্য সাহেববা জেগে উঠেছিল, তাবা ব্যাপাব দেখে ভয পেযে গেল। তখন দীনবন্ধু মিত্রেব নীলদর্পণ বেবিযেছে, লং সাহেব তাব তর্জমা কবে জেলে গেছে, এ সময যদি এই ব্যাপাব জানাজানি হয, তাহলে আব বক্ষে থাকবে না। সাহেবরা সেই বাত্রেই কোৎঘবেব মেঝে খুঁডে বিল্লি সাহেবকে কবব দিলে। তাবপব মেঝে আবাব শান বাঁধিযে ফেললে। বাইবে বটিযে দিলে, বিল্লি সাহেব দেশে ফিবে গেছে।

এই ঘটনাব দু-তিন বছবেব মধ্যেই নীলেব ব্যবসা উঠে গেল, সাহেববা জমিদাবি বিক্রি কবে দেশে চলে গেল। আপনাব ঠাকুবদা কিনলেন।

কোৎঘরটা সেই থেকে পড়ে আছে। শুনেছি, গোড়ার দিকে ঘরটাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, ওর দরজা জানালা বন্ধ রাখা যায় না, যতবার বন্ধ করা হয় ততবার খুলে যায়। এমন কি দরজায় তালা লাগালেও ফল হয় না, তালা আপনা আপনি খুলে যায়। তাই বিল্লি-সাহেব ওখানে আছে।

শিবসদয় চুপ করলেন দেখে আমিও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'বিল্লি সাহেবের ভূতকে কেউ দেখেছে?'

'আজ্ঞে না। কেউ কিছু চোখে দেখেনি।'

'আপনিও দেখেননি?'

'না। কিন্তু অনুভব করেছি। একটা দুষ্ট প্রেতাত্মা আছে।' বলে শিবসদয় চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন।

'আপনি প্রেতাত্মা বিশ্বাস করেন? মানে, ভূত মানেন?'

'আজ্ঞে, সে কী কথা! প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করব না! আত্মা যদি থাকে প্রেতাত্মাও আছে।'

'ও বটে।'

'যারা আত্মার অস্তিত্বই বিশ্বাস করেন না তাঁদের কাছে এ যুক্তির কোনো মূল্য নেই। কিন্তু বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে।'

কোৎঘরের ব্যাপারটা হয়তো একেবারে বাজবকি নয়। ভূতপ্রেত সম্বন্ধে আমার একটু কৌতূহল আছে। ভাবলাম, ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। বিল্লি সাহেব যদি সত্যি থাকে, অজ্ঞ চাষাভূষোর অলীক কুসংস্কার না হয়, তা হলে সেটা জানা দরকার।

রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া সেরে নিলাম। শিবসদয়ও আমার সঙ্গে বসলেন। রান্না বেশি নয়, ফুলকা রুটির সঙ্গে বেগুনপোড়া, হিঙ দিয়ে ঘন অড়র ডাল, মাংস, পুদিনার চাটনি আর ক্ষীর। মাংস কোথায় পেল কে জানে হয়তো আমার জন্যেই পাঁঠা কেটেছিল। কিন্তু কবুতরী মাংসটা বেঁধেছিল বড়ো ভালো। এ দিশি রান্না, একটু ঝাল বেশি, তার সঙ্গে আদা পেঁয়াজ রসুন বাটা আর আস্ত গোলমরিচ। খাওয়া একটু বেশি হয়ে গেল।

খেয়ে উঠে আঁচাতেই শীত ধরে গেল। আর বসলাম না, একেবারে শোবার ঘরে গেলাম। শিবসদয়ও সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

একটা তক্তপোশের উপর পুরু বিছানা পাতা হয়েছে, ঘরের কোণে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। আমি সঙ্গে একটা ইলেকট্রিক টর্চ এনেছিলাম, সেটা সুটকেস থেকে বার করে বালিশের পাশে রাখলাম। তারপর বিছানায় বসে সিগারেট বার করলাম। ঠান্ডায় আঙুলগুলো কালিয়ে গেছে, হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে।

শিবসদয় আমার অবস্থা দেখে একটু হেসে বললেন, 'এখানকার ঠান্ডা আপনার অভ্যেস নেই, লেপে শীত ভাঙবে না। কিন্তু – '

'কিন্তু কী?'

'যদি এক পেয়ালা গরম তালের রস খেয়ে শোন, তা হলে আর শীত করবে না।'

একটু কড়া সুরেই বললাম, 'না।' তারপর সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে আপনার খাতা-পত্তর দেখব।'

শিবসদয় আর কিছু বললেন, না, আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

আমিও আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছি। নানারকম চিন্তা মনে আসছে... শিবসদয় আমাকে তাড়ি ধরাবার চেষ্টা করছেন... কবুতরী চেষ্টা করছে বড়ো শিকার ধরবার... যদি বেশি দিন এখানে থাকি আমার মনের অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে?... বিল্লি-সাহেব—উঃ, নীলকর সাহেবগুলো কী শয়তানই ছিল...

লেপের মধ্যে শরীর গরম হয়ে আসছে, সিগারেট শেষ করে চোখ বুজে শুয়ে আছি। এত তাড়াতাড়ি ঘুমনো অভ্যেস নেই, তবু একটু তন্দ্রা আসছে—

হঠাৎ চোখ খুলে গেল। দেখি, কবুতরী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কমানো লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় তাকে দেখে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে এল, কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে জানতে পারিনি।

আমি চোখ খুলেছি দেখে কবুতরী আমার মুখের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, ছোটো মালিক আপনি জেগে আছেন, আপনার পা টিপে দিই?

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম, 'না, দরকার নেই। তুমি যাও।'

কবুতরী মোটেই অপ্রস্তুত হল না, সহজভাবে বলল, 'আচ্ছা। কাল ভোরে আমি আপনার চা তৈরি করে আনব। এখন ঘুমিয়ে পড়ুন।' সে ছায়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর উঠে দরজা বন্ধ করতে গেলাম। দরজায় হুড়কো থাকবার কথা, কিন্তু হুড়কো নেই। বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কোনও উপায় নেই। কী করা যায়? দরজাটা ভালো করে চেপে দিয়ে এসে শুলাম।

আমি সাধু-সন্নিসি নই, আবার লুচ্চা-লম্পটও নই। নিজেকে ভদ্রলোক বলে মনে করি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। জীবনে প্রলোভন এসেছে, কিন্তু প্রলোভন যে এমন দুর্নিবার হতে পারে তা কখনও কল্পনা করিনি। মনের মধ্যে যে-সব চিন্তা আসতে লাগল সেগুলোকে ভদ্র চিন্তা বলতে পারি না। এ যেন নর্দমার পাঁক নিয়ে নাংবামির হোলিখেলা। সঙ্গে সঙ্গে কবুতরীর ওপর রাগও হতে লাগল, রাগ হতে লাগল তার চুম্বকের মতো আকর্ষণ করবার শক্তির ওপর। ছোটোলোকের মেয়ে! নির্লজ্জ নষ্ট মেয়েমানুষ! পুরুষ-হ্যাংলা রক্তচোষা সূর্পনখার জাত

কণ্ট কশয্যায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল একেবারে শেষরাত্রে। দেখি লেপের মধ্যে ঠান্ডায় জমে গেছি। বাইরে একটা হাড়কাঁপানো হাওয়া উঠেছে; সে হাওয়া কুলকুল করে ঘরে ঢুকছে কোথা দিয়ে? টর্চ জ্বেলে চারদিকে ঘোরালাম। মাথার দিকে একটা ছোটো জানালা আছে বটে, কিন্তু সেটা বন্ধ। দরজাও চাপা রয়েছে। মাটির দেয়ালে আলো ফেলে দেখলাম কোথাও ফুটোফাটা আছে কিনা। কিন্তু নেই। তারপর টর্চের আলো গিয়ে পড়ল চালের নীচে। সেখানে একটি মস্ত ফুটো। শেষরাত্রের হাওয়া সেই ফুটো দিয়ে ঢুকছে।

নিরুপায় চালের ফুটো বন্ধ করা যাবে না। আগাপাশতলা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম; কিন্তু হাড়ের কাঁপুনি গেল না। মনে হল, এই সময় শিবসদয়বাবুর তালের রস পেলে কাজ হত। হাত-ঘড়িটা দেখলাম, পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি আছে। এখনও সকাল হতে দেড় ঘণ্টা। বিছানায় উঠে বসে সিগারেট ধরালাম।

গোটা তিনেক সিগারেট পর-পর টানলাম, কিছু হল না। লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না। ভাবছি এবার কী করব, লণ্ঠনটাকে কোলে নিয়ে বসলে কেমন হয়। এমন সময় দোর ঠেলে কবুতরী ঘরে ঢুকল। তার হাতে চায়ের পেয়ালা ধোঁয়াচ্ছে। বাক্যব্যয় না করে পেয়ালা হাতে নিলাম। এক চুমুক দিতেই জিভটা যেন পুড়ে গেল। কিন্তু শরীরের মধ্যে তৃপ্তি ভরে উঠতে লাগল। বক্ত গরম হওয়ার তৃপ্তি।

কবুতরী হেসে বলল, 'সিগারেটের গন্ধ পেয়ে বুঝলাম, ছোটো মালিকের ঘুম ভেঙেছে।

বলল, 'তুমি কি বাড়ি যাওনি?'

সে বলল, 'না। রান্নাঘরে উনুনের পাশে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছি। নইলে মালিকের চা তৈরি করতাম কী করে?'

'চা শেষ করে পেয়ালা তার হাতে দিলাম, বললাম, 'আর এক পেয়ালা নিয়ে এস।'

সে একগাল হেসে ছুটে চলে গেল। আশ্চর্য মেয়ে! কী অসম্ভব খাটতে পারে, শরীরে ক্লান্তি নেই। ভোরবেলা মালিকের চা তৈরি করে দেবার জন্যে সারা রাত উনুনের পাশে শুয়ে থাকতে পারে। অথচ অন্য দিকে আবার—

দ্বিতীয় পেয়ালা চা এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'যাই, রাত্তিরের এঁটো বাসনগুলো এই বেলা মেজে ফেলি। দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন কিন্তু—অ্যাঁ?' ঘাড় বেঁকিয়ে হেসে কবুতরী চলে গেল।

সেদিন বেলা ন'টার সময় দপ্তরে গিয়ে বসলাম, শিবসদয়কে বললাম, 'ওঘরে আর আমি শোব না। আজ থেকে কোৎঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা করুন।'

শিবসদয় ঘাবড়ে গেলেন: 'কোৎঘরে! কিন্তু —'

'আমি বললাম,'কিন্তু কী? বিল্লি-সাহেব? বিল্লি-সাহেবের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করব, আপনার ভাবনা নেই।'

তারপর প্রায় সারা দিনটাই কাজকর্মে কেটে গেল। হিসেব-নিকেশ, জমা-খরচ, আম-লিচুর বাগান জমা দেওয়ার ব্যবস্থা, ধান কাটা এবং বিক্রির ব্যবস্থা। প্রজারা খবর পেয়েছিল আমি এসেছি, তারা এসে সেলাম করে গেল। কেউ এক টাকা, কেউ আট আনা সেলামি দিলে।

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে আমার নতুন শোবার ঘর তদারক করতে গেলাম। দুপুরের আলোয় জায়গাটা মোটেই ভুতুড়ে বলে মনে হয় না। দিব্যি ঝরঝরে। হলধর ঘরটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে রেখেছে, একটা তক্তপোশ ঢুকিয়েছে। দেখে শুনে ফিরে এলাম। কোৎঘরে ভূত থাকে থাক, ছাদে ফুটো নেই।

বিকেলবেলাটাও কাজে-কর্মে কাটল। যত সন্ধে হয়ে আসতে লাগল, শিবসদয় ততই শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষে রাত্রে খেতে বসে বললেন, 'দেখুন, আমার ভয় করছে। যদি কিছু ঘটে— '

বললাম, 'কিছু ঘটবে না। বরং এ ঘরে শুলেই নিউমোনিয়া ঘটবার সম্ভাবনা আছে।'

কবুতরী পরিবেশন করছিল, খিল খিল করে হেসে উঠল। ও যখন থেকে শুনেছে আমি কোৎঘরে শোব, তখন থেকে ওর মুখে চোখে বিদ্যুৎ খেলছে। মনে মনে কী বুঝেছে কে জানে! কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ভূত টুত ও বিশ্বাস করে না। হয়তো ভেবেছে—

শিবসদয় কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'মালিকের সামনে হাসছিস! তোর সহবৎ নেই?'

কবুতরী হাসি থামাল বটে, কিন্তু তার চোখে-মুখে চাপা কৌতুক উপছে পড়তে লাগল।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় কাছারি-বাড়ি থেকে বেরুলাম। কবুতরী দাঁড়িয়ে রইল, শিবসদয় লণ্ঠন নিয়ে আমার আগে আগে চললেন, হলধর আর একটি লণ্ঠন নিয়ে পিছনে চলল। আকাশে একফালি চাঁদ আছে। কনকনে ঠান্ডা, কিন্তু হাওয়া নেই।

কোৎঘরে পৌঁছলাম। দরজা জানালা খোলা রয়েছে; ঘরে বোধ হয় ধূপধুনো দিয়েছিল, এখনও একটু গন্ধ লেগে আছে। তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা, লেপ বালিশ সব আছে। এক কোণে গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজো।

হলধর ধূর্ত চোখে আমার পানে চেয়ে বলল, 'সব ঠিক আছে বাবু?' বুড়োটা সব জানে, সব বোঝে, কিন্তু বেশি কথা কয় না।

টর্চ, সিগারেটের টিন, হাত-ঘড়ি বালিশের পাশে রাখলাম, ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে বললাম, 'সব ঠিক আছে। তোমরা এবার যাও। জানালাটা আপাতত খোলা থাক। পরে বন্ধ করব। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যেয়ো।'

শিবসদয় একটু খুঁতখুঁত করলেন, তারপর লণ্ঠন নিয়ে বাইরে গেলেন। হলধর নিজের হাতের লণ্ঠনটি একটু উশকে দিয়ে তক্তপোশের শিয়রের কাছে রাখল, ধূর্ত চোখে আমার পানে চেয়ে ঘাড় হেলিয়ে যেন ইশারা করল, তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে লোহার দরজা ভেজিয়ে দিলে। মরচে-ধরা হাঁসকলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল। আমি একা।

জানালাটা খোলা, তার ভিতর দিয়ে চৌকশ খানিকটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আমি গিয়ে জানালাটা পরীক্ষা করলাম জানালায় ছিটকিনি আছে, ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়। পাল্লা দুটো নেড়ে দেখলাম, সচল আছে, দরকার হলে বন্ধ করা যাবে।

ফিরে এসে বিছানায় বসলাম। তরিবত করে সিগারেট ধরাতে গিয়ে লক্ষ করলাম, আলোটা আস্তে আস্তে নিভে আসছে। তেল ফুরিয়ে গেল নাকি? কিন্তু তা তো হবার কথা নয়, সমস্ত রাত জ্বলবে বলে হলধর লণ্ঠনে তেল ভরে দিয়েছে। তবে—?

আলোটা দপ্ দপ্ করল না, কমতে কমতে নীল হয়ে নিভে গেল, যেন কেউ কল ঘুরিয়ে নিভিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে কেবল বাইরের ফিকে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। আমি মনটাকে শক্ত করে নিয়ে আবার সিগারেট ধরাতে গেলাম। ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল; চোখ তুলে দেখি, লোহার দরজা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।

তারপর কানের কাছে শুনতে পেলাম খিসখিস হাসির শব্দ। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাসি কিন্তু বন্ধ হল না, কানের কাছে খিসখিস শব্দ চলতে লাগল। এবার আর ঝাউপাতার শব্দ বলে ভুল করবার উপায় নেই। হাসিই বটে। একটা অসভ্য অশ্লীল হাসি।

হাসি অনেক রকম আছে। প্রাণখোলা হাসি, বিদ্রূপের প্যাঁচানো হাসি, মুরুব্বিয়ানার গম্ভীর হাসি। কাষ্ঠ

হাসি। এ হাসি ও ধরনের নয়। এ হাসির বর্ণনা করা শক্ত, এ হাসি শুনলে মনে হয় এর পিছনে অকথ্য নোংরামি লুকিয়ে আছে, যে হাসছে তার মনের পাঁক শ্রোতার গায়ে লেগে যায়। গা ঘিনঘিন করে।

আমার গা ঘিনঘিন তো করলই, উপরন্তু শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। কতটা ভয় কতটা ঘেন্না বলতে পারব না। তবে ভূত আছে, বিল্লি-সাহেব চাষাদের অলীক কল্পনা নয়।

ভূতের সঙ্গে গা-শোঁকাশুঁকি আমার নতুন নয়। জানি, ভয় পেলেই বিপদ। আমি জোর করে নিজেকে শক্ত করে নিলাম। তারপর সিগারেট ধরালাম। নিভে-যাওয়া লণ্ঠনটা নেড়ে দেখলাম, তাতে তেল ভরা রয়েছে।

'লণ্ঠন আবার জ্বালালাম। লোহার দরজা টেনে আবার বন্ধ করলাম; তারপর খোলা জানালাটা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। দেখি এবার কী হয়।

ইতিমধ্যে হাসি থেমে গিয়েছিল। আমি বিছানায় এসে বসলাম। লণ্ঠন আর নিভল না। কিছুক্ষণ পরে আর এক রকমের শব্দ কানে আসতে লাগল। এ শব্দও খুব মৃদু, যেন একটা কুকুর নিশ্বাস টেনে টেনে কী শুঁকছে আর ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধঘরে সিগারেটের ধোঁয়া তাল পাকাচ্ছিল, হঠাৎ মনে হল, প্রেতটা সেই গন্ধ শুঁকছে নাকি? হয়তো যখন বেঁচে ছিল খুব সিগারেট খেত --

একটা অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির অতৃপ্ত ক্ষুধিত প্রেতাত্মা এখানে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেতাত্মাদের শরীর ধারণ করবার ক্ষমতা থাকলেও দৈহিক অনিষ্ট করবার ক্ষমতা বেশি নেই। পাশ্চাত্য দেশে poltergeist নামে একরকম বিদেহাত্মার কথা জানা আছে, যারা শূন্য ঘরে বাসনকোসন ভাঙে, টেবিলের উপর থেকে জিনিস ফেলে মাটিতে ফেলে দেয়, আরও নানা রকম ছোটোখাটো উৎপাত করে, কিন্তু এর বেশি কিছু করতে পারে না। বিল্লি সাহেব বোধ হয় সেই জাতের ভূত।

সিগারেট শেষ করে ফেলে দিলাম। ঘড়িতে দেখলাম ন'টা বেজে গেছে। এই পরিবেশের মধ্যে ঘুম যদিও সুদূরপরাহত, তবু লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

হঠাৎ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, জানালার ছিটকিনি খুলে গেছে। পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে খুলছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার কপাটও। উঠে বসলাম অমনি কানের কাছে খিসখিস হাসি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

টর্চ হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে গেলাম। দোরের সামনে পায়চারি করতে লাগলাম। কী করা যায়? জানালা দরজা বন্ধ করে লাভ নেই, যতবার বন্ধ করব ততবার খুলে যাবে। সারা রাত দরজা জানালা খোলা থাকলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া কিংবা প্লুরিসি। ফিরে যাব? কিন্তু ফিরে গেলে শিবসদয় মাথা নেড়ে বললেন, আমি আগেই বলেছিলাম। কবুতরী খিলখিল করে হাসবে। না, তার চেয়ে যেমন করে হোক এই ঘরেই রাত কাটাতে হবে। যাক প্রাণ থাক মান।

ঘরে গিয়ে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে শুলাম। শুয়ে শুয়ে শুনছি, ঘরের মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার খসখস পায়ের শব্দ। কখনও কানের কাছে জঘন্য অশ্লীল হাসি। একবার গব্‌গব্‌ শব্দ শুনে মুণ্ড বার করে দেখি, ঘরের কোণে কুঁজোটা কাত হয়ে পড়েছে, গব্‌গব্‌ শব্দে জল বেরুচ্ছে। আমি আবার লেপ মুড়ি দিলাম

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ভূতের সংসর্গ অনেকটা গা-সওয়া হয়ে এসেছে, এইভাবে যদি রাতটা কেটে যায় মন্দ হবে না। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও এসেছিল, হঠাৎ চমকে উঠলাম।

'ছোটো মালিক!'

'মাথা বার করে দেখি, কবুতরী। এতক্ষণ ভূতের কার্যকলাপ দেখে যা হয়নি এবার তাই হল, বুকটা ধড়াস করে উঠল। আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বললাম : 'তুমি! তোমার এখানে কী দরকার?'

লণ্ঠনের আলোয় কবুতরীর দাঁত ঝকঝক করে উঠল, সে বলল, 'ছোটো মালিককে দেখতে এলাম।'

আমার গলাটা বুজে এল, বললাম, 'তোমার কি ভূতের ভয় নেই?'

কবুতরী খিলখিল করে হাসল। এখানে চাপা সুরে কথা বলার দরকার নেই, বলল, 'মালিক কাছে থাকলে ভূতের ভয় কীসের?'

এই সময় চোখে পড়ল, কবুতরীর পিছনে ঘরের দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ও কী! ও কী!' বলে আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলাম।

তারপর — এক বিশ্রী কাণ্ড।

কবুতরী হঠাৎ চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। আমি সম্মোহিত হয়ে দেখছি, সে ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু উঠতে পারছে না। প্রাণপণে শুধু চেঁচাচ্ছে। যেন একটা অদৃশ্য মূর্তির সঙ্গে সে ধস্তাধস্তি করছে। তার গায়ের কাপড় আলুথালু হয়ে যাচ্ছে।

আমি আর থাকতে পারলাম না। এ অবস্থায় কী করা উচিত ছিল জানি না, কিন্তু আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম। দরজা তখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। পাছে বন্ধ হয়ে যায় এই ভয়েই বোধ হয় পালিয়ে এলাম।

'বাইরে এসে দেখি, একটা লোক ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। হলধর! কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল, কবুতরীর চিৎকার শুনতে পেয়েছে। হলধর এখানে কেন, এ প্রশ্ন তখন মনে আসেনি; পরে বুঝেছিলাম, হলধর কবুতরীকে কোৎঘরে পৌঁছে দিতে এসেছিল, তারপর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাছে বসে অপেক্ষা করছিল

'কী হয়েছে - কী হয়েছে বাবু?' হলধর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল। আমি কী বলব, দরজার দিকে শুধু আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'কবুতরী।'

দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতর থেকে কবুতরীর চিৎকার আর গোঙানির শব্দ আসছে।

হলধর দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিও গেলাম। যে দরজা বন্ধ রাখা যেত না, সে দরজা এখন আর খোলা যায় না। দু'জনে ধরে টানতে লাগলাম; অতি কষ্টে একটু একটু করে দরজা খুলল। দেখি লণ্ঠনটা উলটে গিয়ে দপ্‌দপ্ করছে। কবুতরী লণ্ঠনের কাছে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। আমরা ঢুকতেই সে যেন ছাড়া পেল তার চুল এলোমেলো, কাপড় ছিঁড়ে গেছে, পাগলের মতো চেহারা। সে উঠে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। হলধর তার পিছনে পিছনে ছুটল। আমি কী করব ভাবছি, কানের কাছে সেই অসভ্য বেয়াড়া হাসি শুনতে পেলাম। আমিও ছুটলাম - -

এই সময় ইলেকট্রিক বাতি কয়েকবার চিড়িক মারিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এতক্ষণ অন্ধকারের পর তীব্র আলোকে বরদার মুখ ফ্যাকাশে দেখাইল। সে আলোর দিকে একবার চোখ তুলিয়া নীরস স্বরে বলিল, 'এই গল্প। দু'দিন পরে আমি নীলমহল থেকে চলে এলাম। বেশি দিন থাকতে সাহস হল না। নীলকর সাহেবরা গিয়েও যায়নি, তাদের মনের পাপ প্রেতমূর্তি ধরে এখনও সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবুতরী সেই যে কোৎঘর থেকে পালিয়েছিল আর তাকে দেখিনি, সে-রাত্রে সে কী অনুভব করেছিল তা জানা হয়নি। তবে যতটুকু চোখে দেখেছিলাম ও থেকে অনুমান করা শক্ত নয়।' হিরণ্ময়বাবুর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল, 'অশ্লীল ভূত কেন বলেছিলাম বুঝতে পেরেছেন?'

হিরণ্ময়বাবু আমাদের একটি করিয়া সিগারেট দিলেন, নিজে একটি ধরাইলেন। বলিলেন, 'খাসা গল্প। শুধু ভূত নয় রসও আছে। তবে আলো নিভে না গেলে এতটা জমত কি না বলা যায় না।' বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাঙাগলি



মনোজ বসু

সত্যব্রত দেব এক ধাপধাড়া মহকুমায় বদলি হয়েছেন। গৃহিণী মীরা দেবী পুত্র-কন্যা, ঝি চাকর ও লট-বহর সহ আগের দিন পৌঁছে গেছেন। শোনা যাচ্ছে বেশ গোলমেলে জায়গা। আগেকার এস ডি ও ইন্দুভূষণ চৌধুরি এখনো সদরে — তার সঙ্গে দেখা করে সত্যব্রত খুঁটিনাটি জেনে এলেন। সেই জন্য তাঁর একটা দিন দেরি।

জংশন স্টেশন নামকরা গঞ্জ — সত্যব্রতর এলাকার মধ্যেই জায়গাটা। সাড়ে ছটায় সেখানে নামিয়ে দিল। আকাশ মেঘে থমথম করছে — সন্ধ্যেবেলা এখনই রীতিমতো অন্ধকার। মিটার গেজে আরও ঘণ্টা দুয়ের পথ এখান থেকে। নীল পোশাক-পরা পয়েন্টসম্যানকে শুধাল, ছোটো গাড়ি কখন ছাড়বে?

লোকটা আমল দিল না ঃ ছোটো স্টেশনকে জিজ্ঞাসা করুন গে। বড়ো লাইনের আমরা ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি নে।

কোন দিকে সেটা?

হাত ঘুরিয়ে দিয়ে লোকটা সরে গেল। সেই হাতের নিশানা অনুসরণ করে সত্যব্রত চললেন ছোটো স্টেশনের দিকে। রাস্তার উলটোদিকে চায়ের দোকান, হেরিকেন টাঙানো সামনেটায়। তার পাশে সর্বজনীন পুজোর প্যান্ডেল। পুজো আসন্ন, কুম্ভকার মশায়রা টেমি ধরে প্রতিমায় কাদা মারছেন। এই দুটো ছাড়া আলো নেই। হোঁচট খেয়ে খেয়ে সত্যব্রত পৌঁছলেন অবশেষে ছোটো স্টেশনে।

মাটিতে কিছু খোয়া বিছিয়ে প্লাটফরম বানিয়েছে। টিনের চালা অদূরে, তারই একটা কামরা নিয়ে অফিস। অফিসঘর তালাবন্ধ। এখানে একটি আলো — কেরোসিনের দেয়ালগিরি। আলোর নিচের দিকটায় টাইম টেবল সাঁটা। পরের গাড়ি সাতটা পঁচিশে, কষ্টেসৃষ্টে পড়া গেল। অথচ কী আশ্চর্য, জনশূন্য স্টেশন ভূতের বাড়ির মতন হয়ে আছে।

খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল অবশেষে। গোড়ায় ভেবেছিলেন, ওজন কলের উপর কোনো প্যাসেঞ্জার মালের বস্তা চাপিয়ে রেখে গেছে — তা নয়, মানুষই একটা গুটিসুটি হয়ে বস্তা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ডাকাডাকিতে হল না — গায়ে ধাক্কা মারতে চোখ মুছতে মুছতে তবে সে উঠল।

কী বলছ?

মহকুমার খোদ মালিককে 'তুমি' বলে সম্বোধন। অন্ধকারে মানুষ চিনতে পারেনি বেচারি। অতএব মার্জনা করা গেল।

সত্যব্রত বলেন, প্লাটফরমে গাড়ি দেবে কখন?

কাঁচা ঘুম ভাঙায় লোকটা ক্রুদ্ধ হয়েছে। বলে, গাড়ি সূচ নয়, সরষেদানাও নয়। যখন দেবে চোখেই দেখতে পাবে। এর জন্যে খামোকা আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে?

সত্যব্রত বলেন, ভর সন্ধেবেলা ঘুমুচ্ছ কেন?

কী মজার ঠান্ডা পড়েছে, চোখ আপনি ভেঙে আসে। সন্ধে সকাল বুঝিনে, কাজ না থাকলে আলবত ঘুমোব।

হাকিমকে কেউ এই ধরনের কথা বলে না। তবু রাগ নয়, মজা লাগছে সত্যব্রতর। কথা বাড়িয়ে চলেছেন ঃ মিনিট কুড়ি বাদে ট্রেন ছাড়বে। কাজ নেই — কী বলছ তুমি।

ছাড়ে তো উঠে পোড়ো তখন।

হাই তুলে তুড়ি দিল তিনবার, পুনরায় শুয়ে পড়বার উদ্যোগ। বলে, আমরা কিন্তু জানি সকাল হবে রোদ্দুর উঠবে, প্যাসেঞ্জার বাবুরা চায়ে চুমুক দিয়ে তবে গাড়ি চাপবে। আজ সকালে তাই হয়েছে, কালও হয়েছিল সন্ধেবেলা, দেখ, আজ আলাদা কিছু যদি হয়।

সত্যব্রত বললেন, গাড়ি না ছাড়বে তো টাইম টেবলে ছেপে দিয়েছে কেন?

লোকটা বলে, যারা ছাপে এ-দিগ এসেছেন কোনো দিন তারা? বৃষ্টি তিন দিন এক নাগাড়ে চলল, রসের হাঁড়ির রসগোল্লার মতো লাইন টসটস করছে, কখন কোন্‌দিকে ছিটকে পড়ে ঠিক-ঠিকানা নেই। দিনের গাড়ি দেখেশুনে সামাল হয়ে যেতে পারে। আর দিনে গেলেও যাওয়া যাবে, রাতে গেলেও তাই। ঘুরঘুট্টি রাতে ইচ্ছাসুখে মরণের মুখে পা দিতে যাবে কেন?

কথা মিছা নয়। গাড়ি যাবার হলে প্লাটফরমে এসে দাঁড়াত এতক্ষণে, কমবেশি মানুষ কিছু থাকত। এদিক-ওদিক চেয়ে সত্যব্রত বলে, বসি কোথায় বল তো—

যেখানে খুশি। কাঁথা সতরঞ্চি যা থাকে, নাও বিছিয়ে। কেউ মানা করতে যাবে না। বসবেই বা কেন, টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ো।

সত্যব্রত বলেন, কাঁথা-সতরঞ্চি নেই. ফার্স্টক্লাস ওয়েটিংরুমটা খুলে দাও না বাপু।

শোনো আবদার! কাঁথা নেই তো ঘর খুলে দাও! শুধুই ঘর—বলি, পালঙ্ক সাজিয়ে গদিটদি পেতে দিতে হবে না?

ফার্স্টক্লাসের টিকিট আমার—

লোকটা বিশ্বাস করে না ঃ রাত্তিরে শোবার গরজে কতজনে অমন ফার্স্টক্লাস কপচায়। আমাদের লাইনের গাড়ি জগন্নাথক্ষেত্তোর—জায়গা থাকলেই উঠে পড়বে, কোন ক্লাস কেউ দেখতে যাবে না। কোন্ আহাম্মক এখানে বেশি পয়সা দিয়ে ফার্স্টক্লাস কাটতে যাবে?

সত্যব্রত বলেন, কেটেছি তাই সত্যি।

তা হলেও হবে না, ঘরের চাবি গায়েব। পুরানো হাকিম সাব সদরে যাচ্ছিলেন - সেই একদিন ঘর খুলতে হয়েছিল। তালা বন্ধ করে চাবি রাখা হল—চাবির তারপর থেকে পাত্তা নেই, পাখনা মেলে যেন উড়ে চলে গেছে। তালা ভেঙে তবে ঘর খুলতে হবে, সে হাঙ্গামা রাত্তিরে হবে না। থেকে যাও তো কাল দিনমানে না-হয় দেখা যাবে।

টুপ করে শুয়ে পড়ে যথাপূর্ব সে বস্তামুড়ি দিল, বাক্যব্যয়ে সময়ক্ষেপ করবে না আর। হাকিম সাব অর্থাৎ ইন্দু চৌধুরির জন্য ওয়েটিংরুম খুলে দিয়েছিল আর হেলাফেলা সত্যব্রতকে নিয়ে। অথচ তিনি ঠিক সেই বস্তু। চৌধুরি বরঞ্চ বিদায়ী হাকিম, আমি নবীন আগন্তুক, বিস্তরকাল ধরে জ্বালাব—বেশি খাতির আমারই তো। পরিচয় দিলে চক্ষু চড়কগাছ হবে, ঘুমটুম চলে যাবে কোথায়। কাজ নেই। হারুন-অল-রশিদ ছদ্মবেশে রাজ্য দেখে বেড়াতেন, এখানেও পাকেচক্রে সেই অবস্থা। চলুক তাই মন্দ কী!

ফিরে চললেন বড়ো-স্টেশনের দিকে, সেখানে ওয়েটিংরুমে রাত কাটানো যাবে। কাছাকাছি এসে কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন— দেখেন, এদিকে আর ওদিকে প্যান্ডেলে টেমি ধরে কাজ হচ্ছিল, কাজ বন্ধ করে কারিগর চলে গেছে অন্ধকারে ডুবে আছেন দুর্গাপ্রতিমা। চাখানাতেও প্রায় তাই —হেরিকেনটা ঝুলছে বটে, কিন্তু ধোঁয়ায় কালিতে চিমনি ঢেকে গিয়ে আলো বেরুনোর অবস্থা নেই। আর জংশন স্টেশনে আলোর বাহার দেখ একবার! আলোগুলো স্টেশন থেকে অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাইরেটা আরো যেন থকথকে ঘন করে দিয়েছে।

হুঁশ হল, বিকেলের চা বাদ পড়ে গিয়েছে - এক কাপ চা হলে মন্দ হয় না। বড়ো-স্টেশনে চায়ের স্টল আছে, কিন্তু আলোয় গিয়ে বসতে মন চায় না অন্ধকার টানছে নিদারুণ ভাবে। অভ্যাসও আছে—প্রথম জীবনে ষোলআনা গাঁয়ের মানুষ ছিলেন সত্যব্রত, অন্ধকারে ডর লাগে না। এই গঞ্জের কথা ইন্দু চৌধুরি বিশেষ করে বলছিলেন ঃ বড়োনদীর কূলে বন্দর জায়গা - কাঁচা পয়সায় অঢেল চলাচল, পাপ-অনাচার বেশি। বড়ো বড়ো মহাজনী নৌকা দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভেসে আসে, ভাসতে ভাসতে ঘাঁটি পেয়ে যায় ঘণ্টা কয়েকের জন্য। উত্তপ্ত জীবন ভোগের জন্য ছুটোছুটি পড়ে যায় তখন। অজ্ঞাতপরিচয় হারুন-অল-রশিদ আন্দাজ নিন না এদিক-সেদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে।

আধো-অন্ধকার চাখানায় ঢুকে গেলেন। সরগরম ছিল এতক্ষণ, চায়ের বাটি হাতে নিয়ে বাজা-মারি উজির মারি গল্প চলছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! পা ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক ঠান্ডা—ধ্যানে বসে গেল যেন সবাই। একটা দুটো দরকারি কথাবার্তা, তাও মোলায়েম সুরে ভদ্র ঢঙে। হায় বিধাতা, মুখের উপর জ্বলজ্বল অক্ষরে আভিজাত্য লিখে দিয়েছ, কালি-মাখা চিমনির আলোতেও সে জিনিস নজর এড়ায় না। তবে আর কী হল ঘোড়ার ডিম—স্টেশনের স্টল তবে কী দোষ করেছিল।

ঢকঢক কবে খানিকটা চা গলায ঢেলে সত্যব্রত বেবিয়ে এলেন।

অন্ধকাব যেন কালি-গোলা সমুদ্র। মন চনমন কবে ঝাঁপিয়ে পডবাব জন্য— পাকা সাঁতাকব যেমনধাবা হয়। অন্ধকাবে তলিয়ে গিয়ে ডুবসাঁতাব কেটে বেডাবেন খানিকক্ষণ। গাডিব গোলমালে একটা বাত্রিব ছুটি— কাল দুপুবেব আগেই তো ডেবায গিয়ে উঠবেন। তখন থেকে বেহাই নেই লহমাব তবে। ছোটো মহকুমা শহবেব বৃহৎ হাকিম—দেবতাগোঁসাই পীব পযগম্ববেব সামিল। কমপক্ষে পাঁচ-সাত গণ্ডা চোখ উদ্যত সর্বক্ষণ। খেযালেব বশে কোনো-একদিন হযতো পথ বদল কবে কোযার্টাবে ফিবলেন—ছোটো শহবে সেটাও মস্ত বডো খবব।

আব কোযার্টাবে ঢুকে গেলেন তো ভিন্ন এক বাজত্ব। মীবা দেবী সে বাজ্যেব সর্বমযী প্রবলপ্রতাপ হাকিম— সাব বিনীত বশংবদ প্রজা মাত্র। দুই ছেলে এক মেয়ে—সেই তিন নাবালকেব সঙ্গে সত্যব্রতও অতিবিক্ত একটি। তিন সন্তানেব চেয়েও তাঁকে নিয়ে মীবাব অধিক সতর্কতা। তিল-প্রমাণ বেচাল ঘটাতে না পাবেন। চিঠিখানা পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ না পডে তাঁব হাতে দেন না।

অতএব ভাগ্যবশে যখন ছুটি মিলেছে, এই দুর্লভ বাত্রি ওয়েটিংরুমেব আবামচেযাবে আধশোযা হয়ে থ্রিলাব পডে কাটাবেন না। যাবতীয মালপত্র মীবাব সঙ্গে চলে গেছে — হাতে শুধু ফোলিওব্যাগ। স্টেশনমাস্টাবেব ঘবে বেখে বলেন ব্যাগটা বইল— ঘুবে আসি একটু। সানগ্লাস ব্যাগেব ভিতবে, দু পা গিয়ে মনে পডল। ফিবে এসে সেটা নিয়ে নিলেন। এই অন্ধকাব, তাব চোখে ঠুলি— বিধাতাপুকষ স্বযং মুখোমুখি পডলেও চিনতে পাববেন না।

সদব বাস্তা এডিয়ে গলিতে ঢুকলেন। কাদায মাখামাখি জুতো, কাদাজল ছিটকে উঠে কাপড জামায মাখামাখি হচ্ছে। ক্ষতি নেই, ব্যাগেব ভিতব আলাদা একপ্রস্থ বয়েছে, স্টেশনে ফিবে মোটামুটি ভদ্র হওযা যাবে। এ গলি সে গলি ঘুবে— হাঁ সেই। বাঙাগলি। ইন্দু চৌধুবি বলেছিলেন, কাঁচা পযসা গাঁটে নিয়ে বন্দবেব যত উটকো মানুষ পাগল হয়ে বাঙাগলিতে ছোটে -

বলেছিলেন, যত পাপ বাসা বেঁধে আছে। বাঙাগলিব বঙ্গিণীদেব টিট্ কবে ছাডতাম, খুব বেশিদিন লাগত না আচমকা সবিয়ে দিল আমায। বাঘা বাঘা পেট্রন ওদেব, তাদেবই তদ্বিব কিনা বলতে পাবি না। মোটেব উপব লডাই শুরু কবে এসেছি -- আপনাকে জিতে আসতে হবে, সঙ্কল্প নিয়ে যান।

সেই বাঙাগলি —এ জিনিস বলে দিতে হয না। টিনেব বাডি আব একতলা পাকাবাডি গায়ে গায়ে ঠাসা। দবাব ভেজানো, দু কপাটে তবু একটু ফাঁক— আলোব বেখা বেবিয়ে আসে। আলোব সঙ্গে ঠাহব কবা যায প্রতীক্ষমান চক্ষুও একজোডা। এবং চক্ষুবাবী মানুষ মেয়েমানুষ। খুক খুক খিলখিল হাসিব লহব এদিক সেদিক। কদাচিৎ বা গানেব কলি, একটুকু বাজনা। এত ঢাকাঢাকি আগে ছিল না, চালু হয়েছে ইন্দু চৌধুবিব আমলে। মেয়েমানুষেব দবজায দাঁডানো মানা, বাস্তায ঘোবাঘুবি ঘোবতব বে-আইনি। ইচ্ছাসুখে যে মানুষ পাঁকে পডতে চায, তাব সম্বন্ধে বলাব কিছু নেই —কিন্তু ছলাকলায় কাউকে ভোলানো চলবে না।

তা দেখা যাচ্ছে, পাঁকে পডবাব লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ কিলবিল কবে বেডাচ্ছে। ভিড ঠেলে কূল পাওযা যায না ঘুবছেন সত্যব্রত এ গলি থেকে সে গলি - হঠাৎ এক সময খেযাল হল, সেই আগেব জাযগায ফিবে চলে এসেছেন। বাঙাগলি যেন গোলকধাঁধা, বেবিয়ে পডা দায। ইন্দু চৌধুবি চলে গিয়ে নতুন সেনাপতি এবাব সত্যব্রত। ভালোই হল— সেনাপতিব নিজ চক্ষে বণক্ষেত্র পবিদর্শন হয়ে যাচ্ছে। সংগ্রামেব সুবিধা হবে।

আবও হল— পিছন দিক থেকে বিষম লম্বা এক হাত এসে গলা জডিয়ে ধবল আচমকা। অন্ধকাবেব খানিকটা যেন নিবেট হয়ে জোঁকেব মতো জডিযে ধবেছে। সত্যব্রতব সবদেহ ঘেমে উঠেছে—কী না জানি মতলব। খুন টুন কববে না হাকিম বলে চিনে ফেলেছে?—দুটোই সমান বিপজ্জনক।

কিছুই না দল বেঁধে এবা উপকাব কবে বেডায—উপকাবে লাগতে এসেছে। বলে, ছোক ছোঁক কবে বেডাচ্ছ ইযাব, লাইনে নতুন বুঝি? চলে এসো, ঠিকানায তুলে দিচ্ছি।

পা দিয়ে বডো চলতে হল না, বগলদাবা কবে নিয়ে চলল। এক দবজায গিয়ে ডাকে : ওবে মঞ্জু, খালি আছিস? কে এসেছে দেখ—ভাবি দবেব মানুষ। ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয ভিতবে। আলোব জোব বাডিয়ে মঞ্জু মেয়েটা আপাদ-মস্তক নিবিখ কবে দেখে, তাবপব একটানে চোখেব গগল্স খুলে নেয : ঘবেব মধ্যে এসব কেন? ভয কবে আমাব —কী জানি, মানুষ এল না ভূত-বেম্মদত্যি? ঠুলি খুলে মানুষ কিনা পবখ কবলাম।

ছোটো ঘব, উঁচু গদিব প্রকাণ্ড খাটে অর্ধেকেব বেশি জুডে আছে। খান দুই চেযাব। কাচেব আলমাবি — কাঁসাব বাসনপত্র ঝমমক কবছে আলমাবিব ভিতরে। দেযালে ঠাকুবদেবতার পট। আবও কী কী আছে, দেখবাব অবস্থা নেই সত্যব্রতব। গায়ে কাঁটা দিয়েছে। নতুন এসেছেন এক অজ্ঞাত ভুবনে — অপবিচিত মেয়েব মুখোমুখি। ইস্কুল-কলেজেব নামকবা ভালো ছেলে—পাস কবাব অনতিপবেই উৎকৃষ্ট চাকবি। হাকিমেব চাকবি — অনাচাব

উচ্ছেদ কাজ যাঁদেব। এদেব সম্বন্ধে যা-কিছু— বইয়ে পড়ে জেনেছেন। বন্ধুরাও একেবারে নিখাদ ভালো— এমন একটি দুশ্চবিত্র অন্তবঙ্গ নেই, যাব বসেব আলোচনায যাচাই করে নিতে পাবেন। দবজাব গায়ে থ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হাত ধবে মঞ্জু টেনে আনে ঃ জুতো খুলে ভালো হয়ে বসুন বাবু। খুলে দেব জুতো? কথাবার্তা বলুন, পাথব হয়ে আছেন যে।

তবে তো বলতে হয কথা। না বললে বেহায়া দুশ্চাবিণী কী কাণ্ড কবে বসে, ঠিক নেই। যা মুখে আসে দু-চাব কথা বলে দক্ষিণান্ত সেবে কেটে পডা তাডাতাডি।

নাম কী তোমাব?

নাম ধবে ডেকেই তো জটিবাম আপনাকে ঘবে তুলে দিয়ে গেল। আবাব শুনবেন? মঞ্জু —মঞ্জুলতা দাসী—

তাকায সত্যব্রতব দিকে আব মুখ টিপে টিপে হাসে ঃ জটে বলে গেল, ভাবি দবেব মানুষ নাকি আপনি যাকে আগে তাব নামেই বলা যায — বাঁধা বুলি ওটা। আমাদেব যাবা খদ্দেব হয়ে আসে, দবেব বই তাবা সস্তাব হয না কখনো। আজকে জটে কিন্তু খাঁটি সত্যি বলে গেল।

সর্বনাশ, মুখেব লেখাব পাঠোদ্ধাবে লেগে গেছে তবে। এগুতে না দিয়ে সত্যব্রত তাডাতাডি ভিন্ন কথ তোলেন ভুলিয়ে দেবাব কথা ঃ ভালো ঘবেব মেয়ে তুমি, মনে হচ্ছে। শিক্ষাদীক্ষাও কিছু আছে—

তা ও শুনবেন? পুবনো পচা কথা—অন্য কেউ হলে হাঁকিয়ে দিতাম। আপনাব কাছে বলতে পাবি।

ফোঁস কবে একটা নিশ্বাস ফেলে মুহূর্তকাল চুপ করে বইল। বলে, গৃহস্থ ঘবেব বউ ছিলাম আমি। ববে নিল না, আবাব বিয়ে কবেছে। দাগা পেয়ে পথে বেবিয়েছি বাবু।

সত্যব্রত বলেন কেন? চেহাবা ভালো তোমাব, স্বাস্থ্য ভালো, কথাবার্তাও বেশ ভালো

ভালো বাবু অন্যলোকেব কাছে। আপনাদেব কাছে। নতুন সংসাব নিয়ে বব বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে

(এবাবে সত্যব্রতব বুঝি নিঃশ্বাস ফেলাব পালা ঃ আমি যেমন সুখেস্বচ্ছন্দে আছি মীবাকে নিয়ে। কল্যাণীব খবব কতকাল জানি নে। জানতে গেলে বক্ষে বাখবে না মীবা।)

মঞ্জু সহসা প্রগলভ হয়ে খিক খিক কবে হাসতে লাগল ' বেবিয়ে পড়েছি বলেই তো আপনাদেব চবণধূলো পাচ্ছি নইলে তো শুধু মাব গুতোন আমাবও ভালো ভালো গুণ আছে কানে শুনতাম না কোনোদিন। তা বাবু ভাগ্য দেখুন, আমাব বব না পাওযাব দুঃখ ছিল, এখন ঝাঁকে ঝাঁকে বব।

(কল্যাণীই কি বলে যাচ্ছে এত সব? কোথায় সে, কে বলবে। আমাব গবিব বাবা গবিব ঘব থেকে মেয়ে জোটালেন। তখন কেউ স্বপ্নেও জানে না, পবীক্ষাব পব পবীক্ষায চমক দেখিয়ে একদিন ভাবী দবেব মানুষ হয়ে দাঁড়াব। এবং ধনী কন্যা মীবাকে বিয়ে কবব। সে এমন অবস্থা, বিয়ে ছাড়া উপায ছিল না। সেই জন্যেই বুঝি সন্দেহবাতিক এমন মীবাব।)

মঞ্জু ওদিকে বলে যাচ্ছে, ঝাঁকে ঝাঁকে বব এখন, পঙ্গপালেব মতো। দবজা ভেজিয়ে বাখি তা ও এসে ঢুকে পড়ে।

বলে, আব খিকখিক খিলখিল কবে হাসে। হাসিব তোড়ে দুমড়ে ভেঙে শতখণ্ড হয়ে লুটোপুটি খায। সত্যব্রত বাদ বা থাকতেন দু পাঁচ মিনিট, এমন হাসি অসহ্য। চেযাব ছেড়ে লাফিয়ে উঠে একটা দশ টাকাব নোট মেয়েটাব হাতে দিয়ে বললেন, যাচ্ছি তবে—

চকিতে হাসি থামিয়ে মঞ্জু দবজায চলে এল। খবচা কবে মানুষ প্রণয কিনতে আসে, কত বকম বাযনাক্কা — পুলকে গলে গলে পড়তে হয তাদেব সঙ্গে। আব এ লোক ঋষিতপস্বী—পথ ভুলে হঠাৎ এ পাড়ায?

সত্যব্রতব দম আটকে আসে, বেরুতে পারলে বাঁচেন। অধীব হয়ে বলেন, পথ আটকে কেন দাঁড়ালে?

সন্দেহ হল, পাওনাটা কম হয়ে যাচ্ছে বোধহয। আবাব একটা পাঁচ টাকাব নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন, সবে যাও—

না —। মেয়েটা গর্জে উঠল। বলে, পাঁচটা টাকাও কেউ দিতে চায না, কী জন্যে আপনি এত দেবেন? বড়োলোক আপনি—পবিচয শুনে কষ্ট হয়েছে, ভিক্ষে দিচ্ছেন আমায? ভিক্ষে আমি নিই না।

তাজ্জব সত্যব্রত। বইয়ে যন্ত কিছু পড়ে এসেছেন, মিলছে কই এর সঙ্গে? আত্মসম্মান নামক মনের বস্তু এবং টাকা ফিবিয়ে দেবাব মতন দবাজ হাত এ পাড়াতে আছে তবে? মঞ্জুব বোষবক্ত মুখের দিকে চেয়ে লঘুকণ্ঠে বললেন, শোন, পকেট থেকে যা একবাব বেবোয তাব আর ফেবত হয় না। আমাব এই নিয়ম। ভিক্ষেব কথা উঠল কেন মনে? ভিক্ষে নয—

নরকে এসে পড়েছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত?

সত্যব্রত হাতে নিচ্ছেন না তো নোট দুটো তাঁর গায়ে ছুঁড়ে মঞ্জু দড়াম করে দরজার দুই কপাট খুলে দিল ঃ যান, চলে যান, আপনি —

হাতের না-ই হোক, কথার ঘাড়ধাক্কা খেয়ে হাকিম সার হন হন করে যাচ্ছেন—যাচ্ছেন—বাহুবেষ্টনে আবার আটক। সেই জটিরাম—আগে একবার গলা জড়িয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

দু-পাটি দাঁতে হাসি বিকীর্ণ করে জটিরাম বলে, যাচ্ছ কোথা মানিক? আমাদের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে যাও।

কীসের পাওনা—অ্যাঁ? সত্যব্রতর মুখ শুকিয়ে এতটুকু। ইন্দু চৌধুরির কথাগুলো মনে আসে ঃ গুণ্ডামি বাহাজানি গঞ্জের অলিগলিতে, কটা মাস সময় পেলে টিট করে আসতাম। সেই ভাব আপনার উপর —

তাকিয়ে দেখেন, জটিরাম একা নয়— অদূরে আরও সব ছায়ামূর্তি। হাত এড়িয়ে কোনো রকমে বেরুতে পারলে হয় আপাতত - -মহকুমায় চেপে বসে তারপর শোধ তুলবেন। তর্কাতর্কি ''' করে পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন— মঞ্জু দেখতে পেয়েছে, ঘর থেকে তিন লাফে এসে আগলে দাঁড়াল ঃ না একটি পয়সাও নয়। ছ্যাঁচড়ামির জায়গা পাসনি জটে?

জটিরাম বলে, তোর কী? নিজের পাওনাগণ্ডা নিয়ে নিয়েছিস, তোকে দিতে হচ্ছে না। নতুন মানুষ পথ হাতড়াচ্ছিল— জায়গায় তুলে দিলাম। খুশি হয়ে দশ-বিশ টাকা বকশিশ করবে, তুই তাতে কী জন্যে বাগড়া দিবি?

হাসে ফ্যা ফ্যা করে ঃ পিরিতের ভারি যে আঠা! হবে না, হবে না - -জমাতে পারবিনে। উড়োপাখি একদিনের তরে ছিটকে এসেছে, কক্ষনো আর এ-মুখে হবে না। ভাব দেখে বোঝা যায়।

বচসার মধ্যে সত্যব্রত সরে পড়বার তালে ছিলেন, জটিরাম খপ করে হাত এঁটে ধরল। মাইরি আর কি! ব্যাগটা দিয়ে বেরিয়ে পড়ো— কেউ কিছু বলবে না। নইলে রাঙাগলির ব্যাপার বোঝ তো- - বেইজ্জতির পার থাকবে না।

লহমার মধ্যে কী হল মঞ্জুলতার—লিকলিকে রোগা মেয়েটা চটাস করে চড় মারল দৈত্যসম লোকটার গালে। এক ঝটকায় সত্যব্রতর হাত ছাড়িয়ে দিয়ে গর্জন করে ওঠে ঃ শুনে রাখ, আমায় একেবারে শেষ না করে বাবুর গা ছুঁতে পাবিনে। এই আমি নিয়ে চললাম। আটকে রাখ, যদি পাবিস।

চড় খেয়ে জটিরাম হতভম্ব। অন্ধকারের ভিতর থেকে কে একজন ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, যাসনে মঞ্জু, ঘরে ঢুকে পড়। হল্লা বেরিয়েছে, রাস্তায় গেলে মারা পড়বি।

মঞ্জু কানেও নিল না- -হাত ধরে সত্যব্রতকে গলির বাইরে নিয়ে চলল। হল্লা অর্থাৎ পুলিশ কনস্টেবলের নামে সত্যব্রতর রীতিমতো কাঁপন ধরেছে। তারা যদি দেখতে পায়, তাদের কবলে যদি পড়ে যান, যদি তাঁকে টানতে টানতে থানায় নিয়ে তোলে —

কানের কাছে ফিসফিস করে মঞ্জু বারংবার অভয় দিচ্ছে ঃ কিছু হবে না বাবু, চলুন — চলুন — আমি রয়েছি, কে কী করবে? আমায় মেরে ফেলুক, তার পারে। অতদূর কেউ করতে যাবে না।

রাস্তায় এসে পড়লেন, দুর্গাপূজার প্যান্ডেলের পাশটিতে। জংশন-স্টেশনের ঝলমলে আলো ওই। আর ভয় নেই, সত্যব্রত সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন এতক্ষণে। একটা কোনো কৃতজ্ঞতার কথা বলবেন—তাকিয়ে দেখেন মঞ্জু নেই, পৌঁছে দিয়েই সরে পড়েছে। বারবনিতা নয়—দশ প্রহরণধারিণী দুর্গাই যেন মা-জননী হয়ে গলিপথ আগলে নিয়ে এসেছেন। বরদান করে দেবদেবীরা পলকে অন্তর্ধান করেন — ঠিক সেই জিনিস।

গল্পের সামান্য একটু বাকি।

একদিন এজলাসে বসে সত্যব্রত দেখলেন, এক গাদা মেয়ের ভিড়। কাঠগড়ায় এত জনের ঠাঁই হয়নি, বাইরে দাঁড়াতে হয়েছে। রাস্তায় বেলেল্লাপনার জন্য পুলিশে গ্রেপ্তার করে এনেছে।

কড়া নিয়ম ইন্দু চৌধুরি চালু করে গেছেন — দুর্নীতি ও অনাচারের বিপক্ষে পাইকারি অভিযান। শাস্তিরও বাঁধা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে — পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে জেল। শাস্তিটা বলে দিয়ে সত্যব্রত আসামিদের নাম-ঠিকানা পড়ে যাচ্ছেন। একটা নামে এসে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে যান—রাঙাগলির মঞ্জুলতা দাসী। সেদিনের তারিখটাও ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

আসামির দিকে চোখ তুলতে সাহস হয় না। হুকুমেরও অন্যথা হবার নয়। যা একবার বেরিয়ে যায় তার আর ফেরত হয় না। পকেট থেকে নোট বেরুলে যেমন, কলম থেকে রায় বেরুলেও তেমনি। হাকিম সত্যব্রতর নিয়ম।



সিতারা

আবুল ফজল

আশ্চর্য, ঢাকায়ও সব কথা ঢাকা থাকে না।

ভাগ্যে খানবাহাদুর ছিলেন বিপত্নীক, না হলে অন্দরমহলে কুরুক্ষেত্র ও কারবালা দু-ই হয়তো একসঙ্গেই শুরু হয়ে যেত।

খানবাহাদুর জনাব এম মতিনের বয়স পঞ্চাশের কিছু উপরে। দেহগঠন তাঁর বেশ বলিষ্ঠ ও ঋজু — ফর্সামুখে কাঁচাপাকা দাড়ির প্রাচুর্য ও দৈর্ঘ্য বেশ নজরে পড়ার মতো। দিনের বরাদ্দ পাঁচ ওয়াক্ত নমাজের চার ওয়াক্তই তিনি তাঁর বাড়ির সংলগ্ন মসজিদে আদায় করেন। শুধু এ'শার সময় থাকেন গরহাজির। প্রথম প্রথম এজন্য পরিচিত ও নিয়মিত মুসল্লীরা চোখ চাওয়াচায়ি করত — পরে মনকে চোখ ঠাওরাতো। এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

মগরিবের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে তিনি পটুয়াটুলী-ইসলামপুর বাবু বাজার রাস্তায় পায়চারি করেন নিয়মিত — তখন তাঁর হাতে থাকে হাজার দানার তসবিহ। খানবাহাদুরের দু'পকেটে থাকে দু'টি রুমাল — একটি আতর আর একটি এসেন্স মাখানো। হয়তো এ তাঁর নেহাত শখমাত্র। যতক্ষণ মসজিদে থাকেন ততক্ষণ তিনি আতর মাখানো রুমালটিই ব্যবহার করেন। রাস্তায় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ একবার চারদিক চেয়ে নিয়ে এই চাওয়াটাও হয়তো অভ্যাস, বিশেষ এক গলিতে তিনি ঢুকে পড়েন। তখন বাঁ পকেট থেকে এসেন্স মাখানো রুমালখানি বের করে নাকে ধরেন। নর্দমার বদবু-র সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে হয়তো নিজের পরিচয়টুকুও কিঞ্চিৎ ঢাকতে চান খান বাহাদুর মতিন সাহেব। রাত এগারোটায় তিনি এই গলি থেকে বের হন। এই তাঁর বাঁধাধরা নিয়ম। তাঁর কাপড় চোপড় বাবুর বাজারের হোসেন খলিফাই সেলাই করে। কোনো কোনোদিন যাওয়া আসার পথে খান বাহাদুর খলিফার দোকানে ঢুকে চেয়ার টেনে বসে পড়েন। নিজের রুপালি সিগারেট কেস খুলে বুড়া খলিফার দিকেও একটি বাড়িয়ে দেন এবং নিজে একটি জ্বালিয়ে নিয়ে টানতে টানতে খানিকক্ষণ বেশ খোশগল্প করে কাটান। খানবাহাদুরকে দেখলেই কিন্তু হোসেন মুচকি হাসে! সেই হাসির অর্থ খানবাহাদুরও হয়তো বোঝেন। যেদিন তার দোকানে খানবাহাদুর বসেন না সেদিনও তাঁকে রাস্তায় পায়চারি করতে দেখে হোসেন মুখ টিপে টিপে হাসে। আর বেশ কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে দেখে তাঁর হাতের তসবি'র-দানার দ্রুতগতির দিকে। বেশি কাজ থাকলে কোনো কোনোদিন রাত এগারোটায়ও হোসেনের দোকান খোলা থাকে। তখন কিন্তু অন্য দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায় — রাস্তা হয়ে ওঠে নিরালা, নিঝুম ও নিস্তব্ধ। ফিরতি পথে খানবাহাদুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক-একদিন হোসেনের দিকে বেশ বদান্যতার সঙ্গে একটা গোল্ডপেল্যাক ছুঁড়ে দিয়ে বলেন ঃ খাও বুড়ামিয়াঁ, ভালো ঘুম হবে।

হোসেন বলেন উঠে ঃ বসবেন না, হুজুর?

না। অনেক রাত হল। যাই।

হোসেন এবার তার অভ্যস্ত প্রশ্ন করে বসে ঃ খানবাহাদুর সা'ব, কবে হজ্বে যাচ্ছেন?

ইন্‌শা'আল্লাহ্, আগামীবার। এইটিও খানবাহাদুরের অভ্যস্ত উত্তর।

হোসেনও নাকে মুখে ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উৎসাহভরে বলে ওঠে ঃ ইন্‌শাআল্লাহ তো বটেই হুজুর। বলে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। অর্থপূর্ণ হাসি। খানবাহাদুর সেই হাসির অর্থ বোঝেন। তাই হয়তো বলে ওঠেন ঃ যখন যাই তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

হোসেন বলে ঃ আমি গরিব মানুষ, হজ্ব তো আমার উপর ফরজ হয়নি হুজুর। আর তেমন গোনাহ্‌ও

আমি ...। অর্ধসমাপ্ত বাক্যের মাঝে হোসেনের বিলম্বিত ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। খানবাহাদুর তখন হোসেনের মুখের উপর একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে আর একটা সিগারেট ছুঁড়ে মেরে পথ চলতে শুরু করেন। এবার ডান পকেট থেকে আতর-মাখানো রুমালটি বের করে নাকে দেন এবং আতরের মৃদু খোশবু শুঁকতে শুঁকতে তিনি বাড়ির দিকে পা বাড়ান।

খানবাহাদুরের গ্রাম-দেশে আছে কিছু জমিদারি আর শহরে আছে কিছু ভাড়াটিয়ে ঘর। কাজেই জীবিকার জন্য তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়নি কোনোদিন। একটি মাত্র মেয়ে তারও বিয়ে হয়েছে মাস ছয় আগে। এই মেয়ে সম্বন্ধেও আত্মীয়মহলে নানা গুজব ও কানাঘুষা আছে। খান বাহাদুরের বিবি দিলারা বেগম মারা গেছেন সে প্রায় বছর পাঁচেক আগে—নিঃসন্তান অবস্থায়। বিবির এন্তেকালের বছর তিনেক আগে হঠাৎ একদিন খানবাহাদুর সাহেব কলকাতা থেকে দশ বছরের একটি মেয়ে নিয়ে এসে হাজির। বাড়ি ঢুকেই তিনি ঘোষণা করলেন —এই তাঁর মেয়ে সিতারা। এই বিবির ঘরে কোনো ছেলেপুলে হচ্ছে না বলে অনেকদিন আগে তিনি কলকাতায় এক শাদি করেছিলেন। পারিবারিক অশান্তির আশঙ্কায় এই খবর তিনি জানান নি কাউকে —জাহির করেন নি কোথাও। সম্প্রতি সিতারার মা হঠাৎ কলেরা হয়ে মারা গিয়েছে, তাই মেয়েকে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে আসতে হল। প্রকাশ্যে সবার মুখ বন্ধ হল বটে, কিন্তু মনে মনে রয়ে গেল সন্দেহ। আত্মীয়দের অনেকে, বিশেষ করে যারা নিঃসন্তান খানবাহাদুরের সম্পত্তির ওয়ারিশ হওয়ার আশায় ছিলেন এদ্দিন —তাঁরা ভাবলেন আগাগোড়া কাহিনিটা খানবাহাদুরেরই নিজের রচনা। হক্ ওয়ারিশদের মাহ্‌রুম করার মতলবে শুধু না-হক্ তিনি কোথা থেকে একটা মেয়ে আমদানি করে বসেছেন। এ আর কিছু নয়, তাদের ঠকাবার একটা ফন্দিমাত্র।

পরে ব্যাপারটি আরো রহস্যময় হয়ে উঠল, সিতারা যখন নিজেই কারো কারো গোপন ফুসলানো প্রশ্নের উত্তরে নাকি বলেছিল —তার মা মরেনি, বেঁচেই আছে। এই নিয়ে দিলারা বেগম স্বামীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন মুখ ভার করেছিলেন। রাগারাগি করে পৃথক ঘরেও শুয়েছেন মাস দুই। পরে অবশ্য নিঃসন্তান দিলারা বেগমের পক্ষে এইসব সন্দেহ মন থেকে মুছে ফেলে সিতারাকে মেয়ে বলে গ্রহণ করতে বাধেনি। সে যখন এই ঘর করতে আসছে না, তখন মরলেই বা কি আর বাঁচলেই বা কি, শেষ পর্যন্ত এই হয়তো তিনি ভাবলেন। বিশেষত মন ছিল তাঁর সন্তানের জন্য বুভুক্ষু। কাজেই অল্পদিনের মধ্যে দিলারা বেগম হয়ে পড়লেন সিতারার আম্মাজান।

কালক্রমে সিতারা শুধু খানবাহাদুরের নয় দিলারা বেগমেরও হয়ে উঠল নয়নপুত্তলি। সবাই জানল সিতারাই খানবাহাদুর এম এ মতিনের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

শরাফতি বজায় রেখে যতটুকু লেখাপড়া শিখানো সম্ভব, সিতারার বেলায় তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। খানবাহাদুর তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতে শিক্ষয়িত্রী রেখে বিয়ের আগ পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়েছেন তাকে বেশ ভালো করেই।

সিতারা দেখতে মন্দ নয়, রঙ খুব ফর্সা না হলেও তার দেহ গঠন ও মুখের গড়ন অপূর্ব। আয়ত চক্ষু দু'টি কোমল মাধুর্যমণ্ডিত। সবচেয়ে মধুর তার গলার স্বর-- মধুকণ্ঠি একমাত্র ওকেই বলা যায়। মনে হয় ওই কণ্ঠ যেন একমাত্র গানের জন্যই তৈরি হয়েছে। কিন্তু খানবাহাদুর তাকে গান শিখতে দেন নি, তবে মাঝে মাঝে দিলারা বেগমকে বলতেন ঃ সিতারা তার মার গলাই পেয়েছে।

মরা কুকুর কেন, মরা বাঘেও কামড়ায় না। শুনে দিলারা বেগম ঈর্ষান্বিত হতেন না। বরং জিজ্ঞাসা করতেন ঃ ভালো গান গাইতে পারতেন বুঝি?

খান বাহাদুর কেমন আনমনা হয়ে যান। বলেন ঃ গান, না, কলকাতার মেয়ে গজল গাইতে পারতেন খুব ভালো।

তাতেই বুঝি আপনার মন মজেছিল? —বলে দিলারা বেগম একটু চাপা হাসি হাসতেন। আশ্চর্য, খানবাহাদুর কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ হাসির উত্তর না দিয়ে নিরুত্তরেই উঠে পড়তেন—পাছে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে হয়তো এই ভয়ে।

যাক, সিতারার যখন বিয়ের বয়স হল তখন খানবাহাদুরের একমাত্র উত্তরাধিকারীর জন্য প্রার্থীর কোনো অভাব হল না। খান-বাহাদুর কিন্তু চাকুরিজীবীদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না—বরাদ্দ মাইনের টাকায় শরাফতি রক্ষা করে একটু ভালো খাওয়া-পরা পর্যন্ত ওদের চলে না। বিশেষত অধিকাংশ চাকুরিজীবী শরা-শরিয়াতের ধার ধারেনা—না রাখে দাড়ি, না পড়ে নমাজ। এইসব কারণে চাকুরিজীবী বি.এ.এম. এদের প্রত্যাখ্যান করে

তিনি ম্যাট্রিকের চৌকাঠে তিন তিন বার হোঁচট-খাওয়া সৈয়দাবাদের জমিদার নন্দনটিকেই জামাতা হিসেবে পছন্দ করলেন। সৈয়দ আরশাদ হোসেনের শরীরের পরিধি দেখলেই বোঝা যায়, খাওয়া-পরার অভাব কাকে বলে তা তার চৌদ্দপুরুষ থেকে অজানা। আবার এরি মধ্যে তার মুখমণ্ডলে দাড়ি-গোঁফের যে ঐশ্বর্য, দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শ্বশুরের সম্পত্তির শুধু নয় তাঁর দাড়ি-গোঁফেরও সে যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে। বিয়ের দিন কেউ কেউ সে টিপ্পনী কাটতেও ছাড়ল না।

শুভদৃষ্টির সময় নওশা-বেশে আরশাদকে দেখে সিতারার মনে যেটুকু উৎসাহ-ঔৎসুক্য জেগেছিল, শ্বশুরবাড়ি এসে স্বামীর হালচাল দেখে, দু'দিনেই তা গেল উবে। নিষ্কর্মার ঢেঁকি নিয়ে হয়তো ঘর করা যায়, দুষ্কর্মের ষাঁড়কে সামলাবে সে কী করে? মনে মনে ভাবলে সে। বাড়ির যুবতি চাকরানি মতিজানের প্রতিই আরশাদের যত সব ফাই-ফরমাস। আরশাদকে পান-তামাকটা দিতে মতিরও যেন আগ্রহটা কিছু বেশি। সিতারার চোখে এইসব শুধু অশোভন দৃষ্টিকটু নয়, অন্যায়ও। এখন থেকে এই সব ভার সে নিজের হাতেই নিলে। কিন্তু ফল হল হিতে বিপরীত। আরশাদ এখন বাইর-বাড়ি থেকেই পান চেয়ে পাঠায় এবং তামাক সেজে হুঁকা দিয়ে যেতে মতিকেই করে হুকুম। নেশার প্রতিও যে আরশাদের টান ও অভ্যাস আছে তা টের পেতেও সিতারার বেশি দেরি লাগল না।

সিতারার মুখে এইসব সম্বন্ধে আপত্তি শুনে আরশাদ তেলে-বেগুনে জ্বলে ধমকে উঠল একদিন ঃ কারো বাপের টাকায় খাই?

বিয়ের পর প্রথমবার যখন বাপের বাড়ি এল ইশারায় বাপের কানে আরশাদের হালচাল সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দিয়ে দেখেছে সিতারা বাপ শুধু গম্ভীর মুখ অধিকতর গম্ভীর করে বললেন ঃ বড়োলোকের ছেলেদের ওই রকম এক-আধটু স্বভাব দোষ থাকে বইকি, মা। ধীরে সুস্থে সেরে যাবে আপনি।

সিতারার মন কিন্তু কিছুমাত্র সান্ত্বনা পেল না ও কথায়। মনে মনে রাগও হল কিছুটা - ভাবলে পুরুষমাত্রই বোধ করি এ রকম!

মাস ছয় পরে সিতারা আবার স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ি এল। ইচ্ছা, মাস দুই এখানে স্বামীকে চোখে চোখে রেখে শোধরাবার চেষ্টা দেখবে।

মেয়ে জামাই আসার পর থেকে খানবাহাদুর কিন্তু রাত্রে রোজ ন'টা দশটার মধ্যেই বাড়ি ফিরতে লাগলেন জামাই প্রথম দু'চারদিন সকাল সকাল ফিরত বটে, কিন্তু ক্রমশ ফেরার সময় তার বিলম্বিত হতে হতে বারোটা, একটা, কোনোদিন দু'টো তিনটাও হতে লাগল। আবার কোনো কোনোদিন ফিরতে লাগল নেশায় বুদ হয়ে। সিতারা যেন জীবনের কোনো কূল-কিনারাই দেখতে পায় না এবার। মা নেই যে মাকে মনের দুঃখের কথা বলে, চোখের জল ফেলে একটু সান্ত্বনা পাবে। বাপ পুরুষ মানুষ, গম্ভীর প্রকৃতির লোক। দূরে দূরেই থাকেন। বললে হয়তো আগের মতোই বলবেন ঃ বড়োলোকদের ছেলের স্বভাব এরকমই হয়ে থাকে, মা।

বহুকণ্ঠমুখরিত সেই বিশেষ গলিটি। যে গলিতে খানবাহাদুর প্রায় রোজই মগরেবের পর ঢোকেন — এসেন্স-মাখানো রুমালখানি নাকে দিয়ে। ধবধবে বিছানায় মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে খানবাহাদুর বসেছেন। মাঝে মাঝে টান দিচ্ছেন গুড়গুড়ির সুদীর্ঘ নলে। বিছানার একপাশে বসে গৃহকর্ত্রী মনুজান সুললিত কণ্ঠে হারমোনিয়ামের সুরে সুরে গেয়ে চলেছে উর্দু গজল। মনুজান প্রায় প্রৌঢ়া, বয়স বোধ করি চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু কণ্ঠ তার মধুবর্ষী- -সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে তার কণ্ঠের মাধুর্য যেন দূরদিগন্তে ভেসে চলেছে। খানবাহাদুর প্রায় তন্ময়, মাঝে মাঝে হাতের নলে টান দিতেও ভুলে যান।

গান থামতেই খানবাহাদুর ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে পড়লেন।

মনুজান বলে উঠল ঃ আজ এত সকাল সকাল যে?

মেয়ে-জামাই এসেছে এখন সকাল সকালই ফিরতে হবে।

জামাই এসেছে? আমাকে একবার জামাই দেখাবেন না? খুশি ও উৎসাহে চোখমুখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল।

কী করে দেখাই! জামাইকে তো আর এখানে আনা যায় না, আর তোমাকেও বা সেখানে নিয়ে যাই কী করে?

তাই তো! দমে গেল মনুজান। মুহূর্তে নিভে গেল তার চোখমুখের আলো।

আচ্ছা যদি ...। মনুজানের মনে কী একটা সঙ্কল্প যেন আনাগোনা করছে।

কি?— খানবাহাদুর জানতে চাইল উদাস কণ্ঠে।

জামাইকেও আমার কিছু দেওয়া উচিত। আমার খুব আরজ। বিয়ের সময় আমাকে তো নিয়ে রেখে আসলেন কলকাতায়।

সাবধানের মার নেই। তখন কিছু জানাজানি হয়ে গেলে বিয়েটাই হয়তো পণ্ড হয়ে যেত।

যাক এখন আমি কিছু দেবই।

কী দেবে?

এই ঘড়ি, চেন সোনার বোতাম, ফাউন্টেনপেন, আর কিছু জামাকাপড় যা হয়..।

তা বেশ জোগাড় করে রাখ সব। একদিন নিয়ে গিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। বললেন খানবাহাদুর।

তা কী বলে দেবেন? কে দিয়েছে বলবেন?

বলব একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় দিয়েছে। বিয়ের সময় দিতে পারেন নি বলে এখন পাঠিয়েছেন।

মনুজান বললে: তার চেয়ে বরং বলবেন, তোমার শাশুড়ি মরবার সময় কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন, জামাইকে কিছু জিনিসপত্র দেওয়ার জন্য, তা দিয়েই এগুলো কেনা হয়েছে, এতদিন ভুলে কেনা হয়নি।

বেশ তাই না হয় বলা যাবে। জীবিত লোকের মৃত্যু-সংবাদ রটালে তার নাকি আয়ু বেড়ে যায় অনেক। খানবাহাদুরের গম্ভীর মুখেও হাসি ফুটে উঠল।

আয়ু আর চাই না। মরণ হলেই এখন বাঁচি। নিজের মেয়ে জামাইর কাছেও যে পরিচয় দিতে পারে না তার বেঁচে থেকে লাভ? বিমর্ষমুখে মনুজান বললে।

খানবাহাদুর হালকা হতে চাইলেন: দিলারা চলে গেছে বহু আগে, তুমিও যদি চলে যাও, তা হলে এ বেচারা থাকে কী করে? বলেই দাড়ির ফাঁকে হাসি ফুটিয়ে তুললেন আর একবার।

কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে মনুজান বললে: আর একটা মনোহারা জুটতে দেরি লাগবে না।

তেমনি হালকা সুরেই খানবাহাদুর বললেন: শুনেছি মনোয়াবাই তো মনুজান হয়েছে।

কথাটা সত্য বলেই হয়তো মনুজান কোনো উত্তর দিতে পারলে না। ততক্ষণে খানবাহাদুর নেমে পড়েছেন সদর রাস্তায়।

এ সেখানেক পরের কথা।

খানবাহাদুর বিদায় হয়েছেন অনেকক্ষণ। রাত প্রায় এগারোটা। গরমের দিন, তাই মনুজান হাওয়ার আশায় দরজাটা খুলে রেখেছে। হঠাৎ এক অপরিচিত যুবক এসে ঘরে ঢুকল। দেখলেই মনে হয়, নেশা করেছে। পা টলছে, মুখের কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, টলতে টলতে আউড়াচ্ছে: বাইজি, গানা গাও। বাইজি গানা গাও..।

এই সব দৃশ্য মনুজানের অদেখা নয়, নয় অজানা এবং কিছুমাত্র অঘটন নয় এসব পাড়ায়। কিন্তু সে চমকে উঠল ছোকরার হাতের ঘড়িটা দেখে। পাঞ্জাবির সোনার বোতামগুলোও তো অবিকল একই প্যাটার্নের, আংটিটাও তো তাই মনে হচ্ছে। জামাইর জিনিস-পত্র চুরি হয়েছে বলে তো শোনেনি কোনোদিন খানবাহাদুরের মুখে। তবে সত্যিই কি চুরি হয়েছে! সন্দেহ-দোলায় দুলতে লাগল তার মন।

জামাই দেখতে কেমন। চেহারা কেমন এসব বহুদিন খানবাহাদুরের কাছে সে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করেছে। যে রকম শুনেছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই তার মন শঙ্কিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। লজ্জায় সঙ্কোচে তার মরে যেতে ইচ্ছে হল। সমস্ত দেহ-মন যেন বলতে লাগল, ধরণী দ্বিধা হও, ধরণী দ্বিধা হও।

এদিকে মাতালটা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে আর বলে চলেছে: বাইজি গানা গাও, বাইজি গানা গাও।

মনুজান যতই সরে যায়, মাতালটা ততই তার দিকে এগোয়।

অগত্যা ঝিকে ডেকে নিয়ে বললে: এঁকে হাতমুখ ধোয়ার পানি দাও। মাতালকে বললে: বাবা চেয়ারটায় বস, হাত-মুখ ধোও, কিছু খাও, আমি এক্ষুনি গান শোনাচ্ছি। বলেই সে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ঝি মাতালটাকে গোসলখানায় নিয়ে গিয়ে ভালো করে মাথা ও হাত-মুখ ধুইয়ে খানিকটা প্রকৃতিস্থ করে তুললে।

মনুজান এক হাতে গ্লাস ও অন্য হাতে একথালা মিষ্টি নিয়ে মাতালটার সামনে রেখে বললে ঃ খাও বাবা, খাও। এরা পাশে দাঁড়িয়ে একখানা হাতপাখা দিয়ে পাখা করতে লাগল তার মাথায়।

যুবকটি তবুও ইতস্তত করছে দেখে মনুজান অনুনয় বিনয় করে বললে ঃ বাবা খাও, খেয়ে একটু ঠান্ডা হও, বাবা। ভালো আছ তো বাবা?

তার ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সাহস হয় না, যদি খপ করে হাতটা ধরে বসে। সে দাঁতে জিব কাটল।

যুবক কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল ঃ বাবা, বাবা করছ কেন? গান শুনতে এসেছি গান শোনাও, বোতল টোতল থাকে তো বের কর; মিষ্টি খায় তো শিশুরা আর শরবত খায় তো মেয়েরা। শুনি, তুমি নাকি এ'পাড়ার সেরা গাইয়ে, শোনাও দেখি... বলতে বলতে দশ টাকার নোট একটা ছুঁড়ে মারলে মনুজানের দিকে।

মনুজান নোটটা টেবিলের উপর তুলে রেখে বললে ঃ সব দেব বাবা, গানও শোনাব, আগে কিন্তু একটু মিষ্টি-মুখ করতে হয়। খাও বাবা একটু শরবত খাও, ভালো লাগবে।

যুবকের নেশার ঘোর বুঝি এরই মধ্যে কমতে শুরু হয়েছে। সেও এবার কিছুটা অবাক হল বইকি। হয়তো ভাবলে দেখাই যাক না। কাজেই ধীরে ধীরে মিষ্টির থালাটা শেষ করলে। আশ্চর্য, শরবতটাও কিন্তু বাদ দিলে না। ঝি পান ও সিগারেট দিয়ে গেল একটি ছোট্ট প্লেটে করে। কী খেয়াল হল কে জানে, মনুজান ড্রয়ার খুলে সেই প্লেটের উপর রাখলে দু'টি গিনি।

এবার আরশাদের আরো অবাক হবার পালা। মাথামুণ্ডু সে কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু একটি ব্যাপার লক্ষ করে বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। এই প্রৌঢ়ার চিবুক ও নাকের সঙ্গে সিতারার আশ্চর্য মিল রয়েছে - চলার ভঙ্গিটাও প্রায় একই রকম। গলার গড়নে শুধু নয়, স্বরেও অদ্ভুত মিল। এই বয়সে সিতারা নিশ্চয়ই দেখতে এ'রকমই হবে, সিতারার বয়সে এ বোধ করি অবিকল সিতারার মতোই ছিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে রইল মনুজানের দিকে।

হঠাৎ মনুজান গিনি দু'টি তার হাতে তুলে দিয়ে বললে ঃ নাও, বাবা, তোমাকে দেখে আমার চোখ জুড়োল আজ।

বিস্মিত আরশাদ বলে উঠল ঃ তুমি, তুমি, আপনি কে?

আমি আমি আমি মনুজান বাইজি।

না। সত্যি করে বল, সত্যি করে বলুন।

আজ নয়, বাবা, পরে বলব। ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে মনুজান বললে।

না, আজই বলতে হবে। উঠে দাঁড়াল উত্তেজিত আরশাদ।

না, বাবা আজ শুনতে চেয়ো না, আর একদিন বলব। আমি তোমার পর নই, আজ শুধু এইটুকু জেনে রাখ।

না, এক্ষুনি বলতে হবে সিতারা আপনার কে?

সিতারা! সিতারা! সিতারা আমার কে? কেউ না। মনুজানের কম্পিত-কণ্ঠ থেকে নির্গত হল।

নিশ্চয় কেউ। উত্তেজনায় আরশাদের সর্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। হঠাৎ টেবিলের উপর থেকে রুটি কাটা ছুরিখানা তুলে নিয়ে সে চিৎকার করে উঠল ঃ না বল তো ...। সে ছুরিখানা বাগিয়ে ধরল।

সিতারা আমার মেয়ে বাবা। অজ্ঞাতসারেই যেন মনুজানের ভীত কম্পিত কণ্ঠ থেকে কথা কটি বের হয়ে পড়ল।

সিতারা তোমার মেয়ে। বেশ্যার মেয়ে...!! ছুরিখানা ছুঁড়ে ফেলে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে মনুজানের কণ্ঠ শোনা গেল ঃ আমি কী করলাম। খোদা আমি কি করলাম?

মনুজান মূর্ছিত হয়ে পড়ল কি?

সিতারা ঘুমিয়ে পড়েছিল অনেকক্ষণ। রাত একটা কি দু'টো হবে বোধ করি, হঠাৎ কী একটা শব্দে তার ঘুম গেল ছুটে। কোথায় যেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে তর্ক ও বাদানুবাদ হচ্ছে। সে উঠে বসল। আরশাদ বিছানায় নেই, হয়তো ফেরেনি এখনো উত্তেজিত ও চাপা কণ্ঠের শব্দ যেন তার আব্বার ঘর থেকেই আসছে। সে ছুটে গেল বাপের

ঘরের দিকে। হতবুদ্ধি সিতারা শুনতে পেল, উত্তেজিত কণ্ঠ আরশাদের। রুদ্ধনিশ্বাসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শ্বশুর-জামাইয়ের তর্ক সে কিছুক্ষণ ধরে শুনল।

আরশাদ উত্তেজিত কণ্ঠে শ্বশুরকে ধমকাচ্ছে ঃ তুমি একটা বেশ্যার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ, আমি কালই থানায় খবর দেব। ফউজদারি করব, খবরের কাগজে তুলে দেব তোমার সব কীর্তি-কাহিনি।

খানবাহাদুর অনুনয়-বিনয় করছে ঃ এইসব বাবা, ঘরের কথা বাইরে জাহির করে কী লাভ ? তোমাকে আমি যত টাকা চাও দিচ্ছি, আর আমার সব বিষয়-সম্পত্তি সিতারাই তো পাবে, বলতো এখন তাকে সব লিখে দিই।

আরশাদ উত্তেজিত ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে গর্জন করে উঠল ঃ এক্ষুনি আমাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। আর সিতারার নামে নয়, আমার নামেই সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে হবে।

অসম্মানভয়ে ভীত খানবাহাদুর তাতেই যেন রাজি। তক্ষুনি উঠে গিয়ে লোহার সিন্দুক খুলে পাঁচ হাজার টাকার নোট গুনে টেবিলের উপর রাখলেন। বললেন ঃ কাল উকিল ডেকে দলিল করিয়ে দেব।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সিতারা সবই শুনল। এবার ঝটিতি ঘরে ঢুকে বাবাকে লক্ষ করে সে বলে উঠল ঃ আব্বা, আমি তোমার মেয়ে তো?

নিশ্চয়ই। হতভম্ব খানবাহাদুরের কণ্ঠ থেকে সজোরে নির্গত হল।

আমার এক মা মারা গেছেন আর এক মা বেঁচে আছেন, এ তো সুখেরই কথা আব্বা, কে কী বলল তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি যখন আমার বাবা, আর আমি যখন তোমার মেয়ে, তখন তোমার সমস্ত টাকা-পয়সা ও সম্পত্তির আমিই তো একমাত্র মালিক। আমার কথা ছাড়া এর এক পাই পয়সাও তুমি কাউকে দিতে পারবে না। বলেই টেবিলের উপর থেকে নোটগুলি সব নিজের হাতে তুলে নিলে। এইবার আরশাদকে লক্ষ করে বললে ঃ মনুজান বাইজির কাছে যখন গিয়েছিলে, শাশুড়ি ভেবে বা স্ত্রী মনে করে তো যাওনি, বেশ্যা ভেবেই তো গিয়েছিলে? তবে বেশ্যার মেয়ের প্রতি এত ঘৃণা যে? অথচ বেশ্যার মেয়ের টাকার প্রতি লোভ তো এতটুকুও কম নয়? বেশ্যার মেয়ের টাকা চাও নাকি? চাইলেই পাবে, তোমার মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নিতে চাই না। ঠোঁটে তার বিদ্রূপের বাঁকা রেখা।

আব্বা, এই দু'মাসে আমার বিয়ের সাধ মিটে গেছে। আমি আর এরকম অপদার্থ বড়োলোকের ছেলেকে নিয়ে ঘর করতে পারব না। কেন তুমি একটা শিক্ষিত ছেলের-হাতে আমাকে দিলে না— হোক না গরিব?

আরশাদকে লক্ষ করে ফের বলে উঠল ঃ সত্যি এই টাকা চাও নাকি তুমি? চাইলে শরিয়তমতো আমাকে তিন তালাক দিয়ে দাও, এক্ষুনি সব টাকা দিয়ে দিচ্ছি। বলো — তিন তালাক।

দুর্দান্ত জমিদার-নন্দটি তক্ষুনি সুবোধ বালকের মতো আউড়ালে ঃ তিন তালাক। সিতারা নোটগুলি সব আরশাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে সেন্ডেলের পটাপট শব্দ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আরশাদ উপুড় হয়ে ঘরময় ইতস্তত ছড়িয়ে-পড়া নোটগুলি এক-এক করে গুনে গুনে কুড়িয়ে নিতে লাগল।

.... আশ্চর্য একদিন যেতে না যেতে দেখা গেল শহরের সব দৈনিক কাগজে 'খান বাহাদুরের কেলেঙ্কারি' এই শিরোনামায় সব কথাই বেশ পল্লবিত ও মুখরোচক করে পরিবেশন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, তার জন্য যা কিছু ব্যয়িত হল, তাও খানবাহাদুরেরই টাকা।

তাই বলছিলাম ঃ ঢাকায়ও সব কথা ঢাকা থাকে না।

খট্টাঙ্গ পুরাণ



শিবরাম চক্রবর্তী

বহুদিন পরে আবার ভাই দুটিকে দেখা গেল। আবির্ভাবের মতোই দেখতে পেলাম। গোলদিঘি কফি হাউসের কোণ ঠেসে বসে।

আমিও ওদের কোল ঘেঁষে পাশের টেবিলে গিয়ে বসেছি। আমাকে দেখে হর্ষবর্ধন—ঠিক হর্ষধ্বনি নয়—অর্ধপরিচিতের মতোই অভ্যর্থনা করল—এই যে!

বলেই আবার ভাইয়ের সঙ্গে মশগুল হয়ে গেল গল্পে।

অনেকদিন পরে দেখা। মনে হল, হয়তো আমায় চিনতে পারেনি ঠিক। কিংবা হয়তো হাড়ে হাড়ে চিনেই-? নইলে শুধু এই যে- এই শুষ্ক সম্ভাষণ— এত কম ভাষণ নিতান্তই হর্ষবর্ধন-বিরুদ্ধ, কিন্তু ও নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে নিজের কফির পেয়ালায় মন দিলাম। আর কান দিলাম ওদের কথায়...।

'বুঝলি গোবরা, এরকমের আরেকটা কফিহাউস আছে চৌরঙ্গির কাছে। কিন্তু সাবধান, সেখানে যেন ভুলেও কখনো যাসনে—।'

'কেন, যাব না কেন?' কান খাড়া করা ভাই মাথা চাড়া দিয়েছে : 'কী হয় গেলে?'

'গেছিস কি মরেছিস। এ কফি হাউস তো ভালো। এখানে তো খালি বাঙালি। বাঙালির ছেলে-মেয়েরাই আসে কেবল। নিতান্ত নিবাপদ। কিন্তু সেখানে—বাবা, যা মারাত্মক!'

বলে ভারাত্মক মুখখানা ভাইয়ের চোখের ওপর তিনি রাখেন।

'মারাত্মকটা কী শুনি?'

'মেমরা আসে সেখানে।' হর্ষবর্ধন বিশদ হন— 'মেমরা দেখা দেয়।'

'দিলেই বা! মেম তো আর বাঘ নয় যে গিলে ফেলবে!'

'বাঘের বেশি। না গিলেই হজম করে ফেলতে পারে। তবে আর বলছি কী!.... সেদিন একটা মেমের পাল্লায় পড়েছিলাম। ধরেছিল আমায়।'

'কী করেছিলে তুমি?'

'কিচ্ছু না। সবেমাত্র সেখানে ঢুকে একটা খালি জায়গা পেয়ে বসেছি। অত বড়ো হলটা গিস্ গিস্ করছে মানুষে। বাঙালি, পাঞ্জাবি, চিনেম্যান, সাহেব মেমে ভর্তি। হলের মাঝামাঝি একটা থাম ঘেঁষে শুধু দুটিমাত্র চেয়ার খালি। একটি ছোট্ট টেবিল নিয়ে—তারই একটিতে গিয়ে আমি বসেছি। একটু পরেই একটা মেম এসে অন্য চেয়ারটায় বসল।'

'ও এই ধরা! সে তোমাকে ধরবার জন্যে নয় গো দাদা, বসবার আর জায়গা ছিল না বলেই—' বলতে যায় গোবর্ধন। নিজের দাদাকে সে ধর্তব্যের মধ্যেই ধরে না।

'শোন্ না আগে। সবটা শোন্ তো।' হর্ষবর্ধন বাধা দেন— 'মেমটা বসেই না আমাকে বলল— 'গুড ইভনিং মিস্টার।' আমি তার জবাব দিলুম— 'গুড্ নাইট মিসেস!'

'তুমি গুড্ নাইট বলতে গেলে কেন? গুড্ নাইট তো বলে লোকে বিদায় নেবার সময়।'

'তখন কি আর ইভনিং ছিল রে? সন্ধ্যে উতরে গেছে কতক্ষণ! আটটা বাজে প্রায়। আমি শুধু মেমটার ভুল শুধরে দিয়েছি। কিন্তু বলতে কি, আমি অবাক হয়েছি বেশ। মেমরাও ইংরেজিতে ভুল করে তাহলে? আশ্চয্যি!'

'তারপর? তারপর?'

'তারপর মেমটা কী যেন বলল ইংরেজিতে, তার একটা কথাও যদি আমি বুঝতে পেরেছি—!'

'নিশ্চয় খুব ভুল ইংবিজি?'

'ক্যা জানে। তাবপরে কবল কী মেয়েটা। তাব ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা নোটবই বেব করল আব ছোট্ট একটা পেনসিল। কী যেন লিখল কিছুক্ষণ ধবে, তারপবে দেখাল সেটা আমায়।'

'তুমি পড়তে পাবলে?'

'পাবব না কেন, ইংরিজি তো নয়। পেয়ালা।'

'পেয়ালা? পেয়ালা আবাব কোন দেশি ভাষা দাদা?'

'এই পেয়ালাবে বোকা।' হর্ষবর্ধন কফিব পাত্রটা তুলে ধবেন — এই বাংলা কাপ ডিশ। এই না এঁকে মেয়েটা আমাব দিকে তাকিয়ে বইল। যাকে বলে সপ্রশ্ন নেত্রে।'

'তুমি কী কবলে?'

'আমি বুঝলাম মেমটা এক পেয়ালা কফি খেতে চাইছে। আমিও আব দ্বিরুক্তি না কবে বেয়াবাকে কফি আনতে বললাম - দু পাত্তব। আমাদেব দুজনেব জন্যে।'

'মেমটা দেখতে কেমন?'

মেম – মেম। আবাব কেমন? মেমবা যেমন হয়ে থাকে। তবে বয়েস বেশি নয়, এই পঁচিশ কি ছাব্বিশ। বাঙালিব মেয়েব মতো অত সুন্দব না হলেও দেখতে ভালোই বলতে হবে।'

'তাই বলো।' গোবধন সমঝদাবেব মতন ঘাড় নাড়ে : 'প্রেম কবাব মতো মেম? তা বলতে হয়।'

কী যে বলিস। তোব বউদি যদি জানতে পায় । তাবপব শোন। আমি ভাবলাম একটা মেয়েকে কি শুধু কফি খাওয়ানো ঠিক হবে? সেটা যেন কেমন দেখায়। তাই আমি ওব খাতাটা নিয়ে একটা পাতায় টোস্টেব মতন কতকগুলো আকলাম। একে দেখালাম ওকে। দেখে সে বলল —ইয়েসিয়েস্। থ্যাঙ্কু।'

'ইয়েসিয়েস মানে?' গোববা জানতে চায়।

মানে, তুই যা কবেছিস এখন। হাঁ।' দাদা জানায় — 'ইয়েস মানে জানিসনে বোকা? তাবি ডবোল, বুঝেচিস এখন? আব থ্যাঙ্কু মানে -

জানি জানি বলতে হবে না আব। তাহলে মেমটা তোমাব কথায় হাঁ হাঁ কবে উঠল বলো?'

কবল না। তাবপব মেমটা কবল কী, এক জোড়া ডিম এঁকে দেখাল আমায়। বুঝলাম যে টোসটেব সঙ্গে ডিমসেদ্ধ চাইছে। তাও তখন আনতে বললাম বেয়াবাকে।'

'বাঃ বেশ তো।' বলে গোবধা সুরুত কবে জিভেব ঝোল টানে।

'মেমেব কথা শুনে যে তোব জিভ দিয়ে জল পড়ছে দেখছি।'

'মেম নয়। মেমলেটেব কথা ভেবে দাদা। মেমটা মেমলেট খেতে চাইল না?'

'ওব ডিম পাড়বাব পব তাবপব আমি খাতাটা নিলাম। নিয়ে এক প্লেট কাজুবাদাম আকলাম। আব ও আঁকল - কতকগুলো চ্যাপটা চ্যাপটা কী যেন। মনে হল পাঁপড়ভাজা। কিন্তু বেয়াবাকে জিজ্ঞেস কবায় সে বললে পাঁপড়ভাজা সেখানে মেলে না। আলুভাজা হতে পাবে। সে আলুভাজা নিয়ে এল। আব কাজুবাদামও। আলুভাজা পেয়ে মেয়েটাকে খুশি হতে দেখে তখন বুঝলাম যে সে আলুভাজাই চেয়েছিল।'

আলুভাজা আব পাঁপড়ভাজাব কি এক চেহাবা?' গোবধা নিখুঁত চিত্র সমালোচকেব ন্যায় খুঁত খুঁত কবে। দুটোব আকাব কি একবকম?'

'তা কি হযবে? কিন্তু ছবি দেখে কিচ্ছু বোঝবাব জো নেই। এই যে মশাই, আপনাকেই বলছি— হর্ষবর্ধন সম্বোধন কবেন আমায়—আঁকাব বিষয়ে আপনি কিছু জানেন? বলুন তো, আঁকতে গেলে এমনটা হয় কেন? পাঁপড়ভাজাব সঙ্গে আলুভাজা এমন মিলে যায় কেন?'

আঁকেব বেলায় যেমন এককে সময় মিলে যায় না? তেমনি আব কি। আবাব আঁকেব মতোই অনেক সময় মেলেও না ফেব। ভালো আঁকিয়ে হলে তবেই মেলাতে পাবে। এমন ইঁদুব আঁকবে যে মনে হবে যেন হাতি। আবাব উটপাখিকে মনে হবে মুবগি— ওইখানেই আঁকাব বাহাদুবি।'

'কী কবে তা হয়ে থাকে?' দুই ভাই একসঙ্গে শুধায়। দুজনেব মুখে ডবোল ইয়েস্ দেখা দেয়।

'ব্রকেব কেবামতি মশাই। আঁকা তো কিছুই না। আঁকিয়ে তো একটুকবো কাগজে ছোট্ট কবে একটুখানি

আঁকে। যারা ব্লক করে তারাই হচ্ছে ওস্তাদ। তারাই মাথা খাটিয়ে দরকার মাফিক সেইটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে যে ছবিটি চাই তার মতন ব্লক বানিয়ে দেয়। ধরুন, আপনি লিচু এঁকেছেন। কিন্তু আপনার দরকার কাঁঠালের। ব্লকমেকার সেই লিচুকেই বড়ো করে বাড়িয়ে কাঁঠাল বানিয়ে তার ব্লকে আনতে পারে। একই আঁকুনি ছোটো করলেই লিচু আর বড়ো করলেই কাঁঠাল।'

'ছোটো করলেই লিচু আর বড়ো করলে কাঁঠাল? বারে!' — গোবরা অবাক হয়।

'তাহলে আমি যে কাজুবাদাম এঁকেছিলাম, ব্লকওয়ালা ইচ্ছে করলে সেই ছবির থেকেই কুমড়োর ঝুড়ি বানাতে পারত?'

'পারতই তো।'

'যাকগে,' আমাদের শিল্প-তাত্ত্বিক আলোচনায় গোবর্ধন বাধা দেয়।— 'তারপর কী হল বলো না দাদা।'

'তারপর অনেক কিছুই খেলাম আমরা—একটিও কথা না বলে—শুধু কেবল ছবি চালিয়ে। প্রায় টাকা পনেরোর মতো খাওয়া হল। তারপর বেয়ারা বিল নিয়ে এলে আমি একটা একশো টাকার নোট দিয়েছি আর সে ভাঙিয়ে আনতে গেছে এমন সময় দেখলাম কী— মেয়েটা একমনে কী যেন আঁকছে তখনো!'

'তোমার চেহারা বুঝি?' গোবরার মুখে বেয়াড়া হাসি দেখা দেয়।

'এই চেহারা আঁকা কোনো মেয়ের কম্মো না। ছোট্ট একটু খাতার পাতায়। তোর মতো রোগা-পাতলা হলেও হয়তো হত।... আঁকা শেষ করে ছবিখানা সে আমার হাতে দিল। দিয়ে একটুখানি —যাকে বলে সলজ্জ হাসি— হাসল।'

'ওর নিজের ছবি বুঝি?'

'না, দেখলাম একটা খাট এঁকেছে সে।'

'খাট? খাট কেন? খাট কি কোনো খাবার জিনিস? শোবার তো জানি!' গোবরা অবাক হয়, 'ও বুঝেছি, তোমাকে আরো খাটাবার মতলব ছিল মেয়েটার।'

'আমি কি মশারি যে আমায় খাটাবে? অত সোজা নয়।' হর্ষবর্ধন আপত্তি করেন। 'কিন্তু কেন যে সে খাট আঁকল তাই আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম।'

'কীরকম খাট? দুগ্ধফেননিভ?' আমি শুধাই।

'বেশ বড়ো খাট। খাট যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু সেজন্যে না, আমার তাক্ লাগল এই ভেবে যে, আমি যে খাটের জন্মদাতা, কাঠের ব্যবসা যে আমাদের, তা সেই মেয়েটা টের পেলে কী করে? এর রহস্য আমি ভাই এখনো অব্দি বুঝতে পারিনি। থ হয়ে রয়েছি সেই থেকে—রহস্যের থই না পেয়ে, বুঝচেন মশাই!'



ইতি



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দেশলাইয়ের বাক্স কাঠি ছিল না, তাই মুখের নিবন্ত চুরুটটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য গোটা চার-পাঁচ টান দিয়ে রমেশ শুধোল, 'এখন কী উপায়, কৃতার্থ?'

কৃতার্থ ঠোঁট উলটে বললে, 'উপায় একটা হবেই—'

রমেশ ঘাড় নেড়ে বললে, 'কিন্তু গোঁফ-কামানো ছেলে আমি নামাতে পারব না বলে রাখছি।'

কৃতার্থ বললে, 'তা আমি জোগাড় করে দেবই। এ-জায়গাটায় বহু বছর আগে একবার এসেছিলাম। সামনের ওই বাবলা গাছটার ধার দিয়ে যে-পথটা খালের দিকে এগিয়ে গেছে— ওই পথটা ভারী চেনা-চেনা। আপনি ঘাবড়াবেন না।'

চুরুটের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রমেশ বললে, 'না ঘাবড়েই বা কী করি! জোগাড় করে আনো একটি। এ বিষয়ে তো তোমার হাত আছে। কিন্তু খালি জোটালেই তো চলবে না, টালও সামলাতে হবে —'

'আচ্ছা দেখি।' বলে কৃতার্থময় চাদরটা কাঁধে ফেলেই তক্ষুনি বেরিয়ে গেল।

একটি অখ্যাত ছোটো শহর— আশেপাশে দু-দশখানি গ্রাম— ম্যালেরিয়ায় ঠাসা।

বড়োদিনের ছুটিতে বড়ো শহর থেকে এক থিয়েটার পার্টি এসেছে— বিনা নিমন্ত্রণেই। দুরাত্রি থিয়েটার হবে বলে আগেই রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল— 'মালতীঃ শ্রীমতী চমৎকারিণী দাসী।' — মানে, মেয়ের পার্টে যিনি নামবেন তিনি মেয়েই।

এ-খবরে সারা শহরে ও গাঁয়ে হই-চই পড়ে গেছল— স্টেজে দাঁড়িয়ে মেয়ে-মানুষ বইয়ের কথা গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাবে— এ আশেপাশের গাঁয়ের লোকের কাছে একেবারে অবাক কাণ্ড; কিন্তু শহরের যাঁরা মাথা, মানে যাঁরা টাক ও টিকি, তাঁদের কেউ কেউ এ নিয়ে মহা গোল পাকিয়ে তুলছেন— বলছেন, ' ছেলেরা যাবে বিগড়ে, মেয়েদের মন যাবে বিষিয়ে। বন্ধ করে দাও।'

রমেশবাবু বললে, 'আপনিই হয় তো বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাদের যা দেশ, মশায়ই মশগুল। আসতে-আসতেই আমাদেব চমৎকারিণী দাসীর জ্বর—চমৎকার হয়েছে। আমরা নিজেরাই পাল গুটোব।'

শহরের উকিল বগলাবাবু বললেন, 'তাই গুটোন মশায়— হাওয়া উত্তুরে। মেয়েমানুষ নাবালে এক পয়সাও মিলবে না আপনাদের, চমৎকারিণীর ওষুধের খরচটি পর্যন্ত নয়। আমাদের এখানে বনের মশা আছে থাক— বিলাসের মশাল চাইনে। অভিনয় আমরা চাই বটে, কিন্তু অবিনয় নয়।'

বগলাবাবুর আর যাই থাক, গলা আছে বটে— দেখতে ও শুনতে।

বগলাবাবু যেতে-না-যেতেই একখানা ছ্যাক্‌ড়াগাড়ি এসে দাঁড়াল। দোর খুলে কৃতার্থ নামছে। পেছনে একটি মেয়ে।

কৃতার্থ ঘরে ঢুকেই বললে, 'এনেছি মশাই, দেখুন বাজিয়ে এবার।'

মেয়েটি ভারি ভীরু, ঘোমটাটি একটু টেনে দেয়ালের সঙ্গে মিশে রইল। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একটু কোমলতা আছে। প্লে-তে মালতীকে এমনি একবার দাঁড়াতে হবে— রমেশবাবুর পছন্দই হল হয়তো।

বললে, 'তুমি যে আমাকে কৃতার্থ করলে হে। ব্যাপার?'

বুক চাপড়ে কৃতার্থ বললে, 'খালের পারে যে এমন কলি ফোটে কলিকালের পক্ষে এ একটা সৌভাগ্য, রমেশবাবু। বাতচিৎ করে হাল-চাল সমঝে নিন। চলবে? এবার এক পেগ পেটে যাওয়ার মতো একটু ঘোর-ঘোর লাগছে না?'

মেয়েটি ততই যেন মিইয়ে যেতে থাকে।

রমেশ শুধোল, 'তোমার নাম কী?'

মেয়েটি ঘোমটার ফাঁক থেকে জবাব দিল, 'সরলা।'

স্বরটা একটু ভীতু বটে, একটু জোলো— কিন্তু ভাবী স্পষ্ট।

কৃতার্থ বললে, 'ঘোমটাটা একটু কমিয়েই আন না, দিনের আলোয় এত ভয় কীসের?'

নিবিড় অন্ধকারের মতোই কালো দুটি চোখ— সরলা ঘোমটা একেবারে মাথার ওপর তুলে আনলে— কিন্তু দুটি চোখেই যেন অন্ধকারের অগাধ স্নেহমাখা। সমস্ত মুখে একটি ভারী মিষ্টি কমনীয়তা আছে, পাতলা ঠোঁট দুটি পরস্পরের সঙ্গে ভারী আলগোছে ছোঁয়াছুঁয়ি করে আছে, একটুখানি কপাল— রমেশের মনে হচ্ছিল মাপলে হয়তো দু আঙুলের বেশি হবে না, চিবুকটি একটু চ্যাপটা হয়ে গালের দুদিকে ছড়িয়ে পড়াতেই মুখখানিতে এমন একটি পেলবতা এসেছে।

মেয়েটি একটি লাবণ্যের নদী। খুব স্রোত নেই, যেন বিকেলের আলোয় টলটল করছে।

নাটকের নায়িকার সঙ্গে কল্পনায় যতবার রমেশের সম্ভাষণ হয়েছে— অমনি তার মুখের ডৌলটি, ভাসা ভাসা দুটি চোখে অমনি একটি সস্নেহ কুণ্ঠা, শুধু দাঁড়ানোটিতেই অমনি একটি সুষমা! মেয়েটি বেশ।

রমেশ ঢোক গিলে বললে, 'তুমি পড়তে জানো তো?'

সরলা বললে, 'জানি একটু-একটু। তবে কয়েকবার শুনলেই মনে করে রাখতে পারি।'

রমেশ হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস রে, নিমাই? দে ওই চেয়ারখানা সরলাকে এগিয়ে।'

তিন চারখানা হাত বেরিয়ে এল একসঙ্গে।

চেয়ারের দরকার হল না। সরলা মাটিতেই বসল।

রমেশ জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি আমাদের সঙ্গে প্লে করবে? প্লে মানে খেলা নয়, নাটক।'

কৃতার্থ ভুরু কুঁচকে বললে, 'ও, তা খেলা ই। কী বলো হে -'

ঠোঁটে হাসি ফুটতে না দিয়েই সরলা বিজ্ঞের মতো বললে, 'সংসারটাই তো খেলা শুনেছি।'

কৃতার্থ হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'কেয়াবাৎ। সরলা শুধু আমাদের দর্শন দেনই না, শেখানও।'

রমেশ বললে, 'পারবে করতে?'

সরলা বললে, 'শিখিয়ে দিলে কেন পারব না? আমাদের শুধু পাখা নেই, নইলে তো আমরা পাখিই।'

কৃতার্থ ফের ভুরু কোঁচকাল। বললে, 'পাখা নেই, কিন্তু উড়তে জানো খুব। তোমরা পোকাও।'

সরলা বললে, 'আগুন দেখলেই উড়ে পড়ি। তাতে আগুন নেভে না, পাখাই পোড়ে।'

মেয়েটি দেখতে ভীতু, কিন্তু কথায় জিলিপি!

রমেশ বললে, 'ছোট্ট একটুখানি পার্ট, কিন্তু ভারী শক্ত। দু-তিন দিনে তৈরি করে দিতে হবে। আমরা আসচে শনিবারেই নামিয়ে দিতে চাই, আজ মঙ্গলবার। —পারবে তো? মোটে তিনটি সিন।'

সরলা ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে দিলে।

'আজ দুপুরেই তাহলে তোমাকে নিয়ে আসব। যার এই পার্ট করবার কথা ছিল, সে পড়েছে অসুখে— তাই মুশকিল যেমন মারাত্মক, তাড়াও তেমনি। কেননা আসচে হপ্তায় বগুড়ায় একটা বায়না আছে, আগাম টাকা নিয়ে বসে আছি। খেয়ে দেয়ে দুপুরে আসবে তো? বাড়ির ভিড় এ দুদিন একটু সরিয়ে দাও— এই নাও।'

বলে রমেশ মনিব্যাগ খুলে একখানা দশ টাকার নোট সরলার দিকে প্রসারিত করে দিল। সরলা আঁচলের খুঁটে নোটটি বেঁধে কোমরে ভালো করে গুঁজে নিলে। ওর দুই চোখ খুশিতে উছলে উঠেছে।

রমেশ বললে, 'গাড়ি করে ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো, কৃতার্থ।'

সরলা বললে, 'গাড়ি কী হবে? কতটুকুই বা পথ— দুকদম। হেঁটেই যাচ্ছি।'

রমেশ ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তবে যা নিমাই, ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।'

নিমাই পা বাড়াচ্ছিল, সরলা পেছন না চেয়েই বললে, 'দিনের বেলা লোক লাগবে কেন? একলাই তো যাওয়া-আসা করি— আমি খুব যেতে পারব। আসব দুপুরে।'

সরলার চলাটিও বেশ— একমুঠো ঝিরঝিরে বাতাসের মতো, বেশ জিরিয়ে জিরিয়ে চলে। বাবলা গাছের গোড়া থেকেই পথটা বাঁক নিয়েছে। আর দেখা যায় না।

কীসের গাড়ি— কীসের লোক!

সরলার সঙ্গে পৃথিবীর আজ নতুন করে শুভদৃষ্টি— মগ-ডালের লাজুক হলদে ফুলটির পর্যন্ত। খালে জেলেরা জাল ফেলেছে নৌকোর গলুই-এ দাঁড়িয়ে, পায়ে কারা বেত চাঁচছে, রৌদ্রে খোলা পিঠ পেতে কাদের বাড়ির বউ কলার পাতায় তেল মেখে বড়ি দিচ্ছে — সরলার ইচ্ছা করে সবাইর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়। ওদের ছায়া মাড়ালে স্নান করে— ওই যে পুরুতঠাকুর আসছেন, তাঁকে দূর থেকে একটা সাষ্টাঙ্গ করে বসে; কাউকে খামোকা জিজ্ঞেস করে, 'বাবুইহাটির এ-রাস্তা দিয়ে নাক-বরাবর বেরিয়ে গেলে কত দূরে ওই সবুজ মেঘটাকে মুঠির মধ্যে ধরা যায়—'

সরলা ট্যাঁকে-গোঁজা নোটটা বারে-বারে অনুভব করতে-করতে বাড়ি চলে।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই সরলা ডাক ছাড়ে, 'ওলো ও ভুতি, কী করছিস? দেখে যা শিগগির— আমি থেটার করব। খোদ ফরিদপুর থেকে থেটারের দল এসেছে— আমাকে পার্ট দিয়েছে। আমি রানি সাজব— মাথায় মুকুট, গলায় মটরমালা, পায়ে সেই জুতো— ওই যে ঘোড়ায় চড়ে ছোটোলাট এসেছিল, তার বিবির সেই খুর-তোলা জুতো দেখেছিলি, তেমনি। রাজা আমার পায়ের কাছে পড়ে কত কাঁদবে, কপাল কুটবে— আমি ঘাড়টা এমনি করে থাকব—'

সরলা ঘাড়টা তেমনি করে দেখাল।

ভুতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সরলার এ অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে একেবারে থ হয়ে গেছল। বললে, 'কি লো, ঘোড়দৌড় দেখে এলি নাকি?'

সরলা বলতে থাকে, 'এই দ্যাখ বায়না দিয়েছে দশ টাকা। দশ পয়সার বেপারি— দেখেছিস এমনি কাগজ— সবুজ নীল কালো কালি — পড়তে পারিস? দশ রুপেয়া! ক'আনা জানিস? এক টাকায় ষোলো আনা —দশ টাকায়?'

এবার সত্যিই ভুতির চোখ চড়ক গাছ। দম নিয়ে বললে, 'সত্যি বলছিস, সরি? পথে কুড়িয়ে পেলি নাকি লো? এত ভাগ্যি তোর?'

'পথে আমার জন্যে সব মুক্তো ঢেলে রেখেছে, তোদের জন্যে তেঁতুল-বিচি। পাঁচ মুখে পাঁচ হাটে আমার নাম বিকোয়— কে জানত আগে? কোথা সে ফরিদপুর, সেখান থেকে আমার নাম শুনে এসেছে এই শহরে! আমাকে তাদের দলে ভর্তি করে নেবে। ভারী শক্ত প্লে নিয়ে নেমেছে রে ভুতি— সবচেয়ে শক্ত পার্ট পড়েছে আমার হাতে। কে আর করবে বল? সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটাকে— মুখ দিয়ে একটা রা বেরুল না— আর আমাকে যেই বলা, দিলাম বলে গড়গড় করে : প্রাণনাথ, রাখো তব পদতলে! বাবুদের সে কী তারিফ! বললে — সরলা, তোমার ছাড়া কারু আর সাধ্যি নয়। — বারে বারে হাঁটু গেড়ে বসতে-বসতে পা দুটো ব্যথা হয়ে গেছে।'

কী যে বলবে সরলা ঠিক ঠাহর করতে পারে না। বলে, 'আসছে শনিবার সন্ধ্যায় হবে। তোদের দেখিয়ে দেব মাগনা - পাস পাওয়া যাবে ঢের। দেখবি রানির পোশাকে কী মানায় আমাকে! রাজা— সে সেজেছে নবিগঞ্জের জমিদারের ছেলে— আমার পায়ের কাছে মুক্তো ঢালবে, মাথার মুকুট খুলে রাখবে, রুমাল মুখে পুরে কত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে— আমি ঠায় সিংহাসনে বসে থাকব, মাথা উঁচু করে রাখব।'

বলে সরলা মাথাটা কড়িকাঠের দিকে উঁচু করে ধরে।

ভুতি বলে, 'মাগনা দেখাবি তো সত্যি? ছাপানো কাগজ বিলি হবে না?'

'হবে লো, সব হবে।'

বলে সরলা বারান্দার ওপাশে গিয়ে আবার ডাক ছাড়ল : 'ও বাড়িউলি-দিদি! বড়ো যে সেদিন ঘরভাড়ার পাওনা টাকা নিয়ে তম্বি করছিলে, নাও তোমার টাকা — সাড়ে পাঁচটাকা ফিরিয়ে দাও দিকিন।'

বাড়িউলি নোটটা হাতে পুরে বললে, 'সাড়ে পাঁচ টাকা কী? সেদিন যে তোর অটলবাবু দু'পাঁইট মদ খেয়ে গেল — তার দাম কে দেবে?'

সরলা বললে, 'তা আমি কী জানি? যে গিলেছে তার থেকে নাও গে—'

'তা তো বটেই লো, ছুঁড়ি। কে সে যে তাকে আমি শখ করে মদ দিতে যাব? তোরই পিরিতি পোড়ে বলে না আমি — সে আমি বুঝছিনে বাছা, হাতের কাছে করকরে টাকা পেয়ে আমি ছাড়ছিনে, নিতে হলে তুমি আদায় করে নিয়ো—'

সরলার মোটেই ঝগড়া করবার মন ও অবসর ছিল না; বললে, 'নাও, নাও, ঝামেলা রাখো, যা নেবার নিয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দাও শিগগির; হিসেব-ফিসেব পরে হবে'খন। আমার ঢের কাজ।'

খুচরো টাকা ক'টা নিয়ে যেতে-যেতে সরলা বললে, 'অমন বাবুর মুখে ঝাড়ু।'

বাড়িউলি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মুখ-ঝামটা দিয়ে বললে, 'কার মুখে ঝাড়ু লো, ছুড়ি? লজ্জা করে না বলতে? সেদিন তো ওই বাবুই জুতোর গোড়ালিটা দিয়ে বোঁচা নাকটা থেঁতলে দিয়েছিল! ওই থেঁতলানো নাক নিয়েই তো সেই বমি-মুখো বাবুর সামনে পিকদানি তুলে ধরেছিলি!'

পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'অত ছুটোছুটি ভালো নয় সরি, বাবুর কানে তুলব কিন্তু—'

সরলা বললে, 'তুলো না! সরি এবারে সরে পড়ছে— বাবুর তোয়াক্কা আর সে রাখে না। পায়ের কড়ে আঙুলের ডগায় বেঁধে রাখতে পারি—'

বাড়িউলি চাপা গলায় শুধু বললে, 'আচ্ছা।'

সরলা ঝিকে পাকড়ালে। বললে, 'তোমাকে এক্ষুনি সাজো-ধোপার বাড়ি যেতে হবে, মাসি। পয়সা না পেলে কাপড় দেবে না বলে শাসিয়েছে— এই ছ'টা পয়সা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে দিয়ে এসো তো। বলো — এবার থেকে ছ'টাকা দিয়ে বিলেত থেকে কাপড় কাচিয়ে আনব। ও ভয় দেখায় কী? এক্ষুনি যাও, মাসি— গঙ্গাজলিটা পরে আমায় এক্ষুনি আবার বেরুতে হবে। আর শোনো, এখন আর রাঁধবার সময় হবে না.... দু'পয়সার ফুলুরি নিয়ে এসো— আর, আর দু'পাতা আলতাও কিনে এনো— কতটুকুনই বা হাঁটতে হবে— যাও লক্ষ্মী। মোটমাট দশ পয়সা দিলাম— কিছু ফিরলে আমাকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না, তোমার ছেলে হরির নামে নিয়ো—'

ঝি বলতে-বলতে যাচ্ছিল, 'ফিরবে তোমার মাথা—'

সরলা আর একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'নাও তবে আরেকটা।'

সরলার চোখে নিজের ঘরটাই শুধু আজ বিশ্রী লাগছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে ঘরের সমস্ত কদর্যতা যেন বের করে ফেলেছে। নোংরা বিছানা, ছেঁড়া বালিশ, আ-মাজা বাসন-কোসন, দেয়ালে ঝোলানো মাংসের ও মদের দাগ-লাগা অটলবাবুর চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবিটা। দিনের আলোয় ঘরটাকে যে এত বিরস, এত বেমানান লাগে সরলার তা কোনোদিন চোখে পড়েনি।

সরলা জানলাটা বন্ধ করে খালের পারে এসে দাঁড়াল। রোদ কতটা চড়া হলে ওখানে যাবার মতো দুপুর হবে মনে-মনে ও তারই হিসেব করছিল। ছাই গাড়ি! ওর পা বেতো ঘোড়ার চেয়ে আগে যাবে।

ঝি এসে হিসেব দিলে। মোট এগারো পয়সাই লেগেছে।

বললে, 'দুপয়সার ফুলুরিতে কি লোকের পেট ভরে?'

সরলা বললে, 'তুমি কী বোকা, মাসি! আমি কি পেট ভরে খাবার জন্যে তোমাকে বাজারে পাঠিয়েছি নাকি! আমার যে আজ নেমন্তন্ন থেটারপার্টিতে। আমি রানি সাজছি— সেখানে কত খাবার দেবে'খন। ক'টা না ক'টায় খাওয়া হয়, সেজন্যে খিদেটাকে একটু মেরে রাখবার জন্য দুটো চিবিয়ে যাওয়া। ও আর আমি ছোঁব না মাসি, ও তোমার হরিকে নিবেদন করে দাও গে। আর শোনো— আমি তোমাদের মাগনা থেটার দেখিয়ে দেব'খন। তুমি যেয়ো হরিকে নিয়ে— বাপের বয়সে তোমরা তা কখনো দেখোনি।'

সরলা তাড়াতাড়ি চান করে নিলে। আয়নার কাছে বসে-বসে অনেক কসরত করবার সময় নেই মনে করে তাড়াতাড়ি চুলটা জড়িয়ে নিয়ে, ধোয়া শাড়ি সেমিজ পরে পায়ে টাটকা আলতা আর কপালে কাঁচপোকার টিপ লাগিয়ে না-খেয়েই বেরিয়ে পড়ল। বড়ো রাস্তার উকিলবাবুর বৈঠকখানার ঘড়িটা দেখবার জন্য একটিবার নিচু হয়ে চোখ পেল না। যা হোক গে, একটু আগে যাওয়াই ভালো।

এখন কোচোয়ানরা সব খেতে গেছে, আড়গাড়ার গাড়ি মেলাই ভার হবে। থেটারের বাবুদের শুধু-শুধু কষ্ট দিয়ে লাভ কী। সরলা এমন কী নবাবের বেটি!

পথ যেন সরলার এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে গেল। পায়ের কাঁচা আলতার দাগ তখনো শুকোয়নি, কাঁচা মাটির রাস্তায় ছোটো-ছোটো দাগ লেগেছে।

শহরের এ-বাড়িটা রমেশবাবুরই, এতদিন পড়ে ছিল।

পাশের মাঠে সকাল থেকেই স্টেজ খাটানো চলেছে— এ পাড়ার সমস্ত ঘরামিই লেগে গেছে— হোগলা তেরপল বাঁশ দড়ি পাটাতন বেঞ্চিতে ঠাসা। ময়মনসিং থেকে সিন এসে পৌঁচেছে। কে একজন সিনগুলিকে

তদারক করছে, একটু-একটু মেরামত করছে— ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের ভিড়— একজন ধমকে উঠলেই সবাই ছিটকে পড়ে— আবার গুটি-গুটি এসে জড়ো হয়— কোলাহলে বাতাস যেন টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে!

সরলা এসে দাঁড়াল।

রমেশবাবু তখন ভেতরে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল। শহরের কয়েকটি বয়স্ক ছেলে রমেশকে অভয় দিচ্ছিল, 'বগলাবাবুর গলাবাজিতে ভড়কাবেন না, মশায়। আর যাই হোক, গেঁজেল ছোঁড়াদের হেঁড়ে গলায় 'প্রাণনাথ' ডাক শুনতে কক্ষনো পারব না আমরা — আত্মারাম খাঁচাছাড়া আর কী! চোখ বুজে কানে আঙুল ঢুকিয়ে কতক্ষণ বসে থাকা যাবে?'

রমেশ হেসে বললে, 'সে-ভয় আমার নেই— ঢের ঢের বগলাবাবু দেখেছি।'

ছেলেদের থেকে একজন বললে, 'নিচু ক্লাসের টিকিট চার আনাই করবেন মশাই— তাই জোটাতে আমাদের প্রাণান্ত।'

রমেশ বললে, 'যতই কেন না উনি বগল বাজান, আমাদের চমৎকারিণীকে দেখে ও তার অ্যাকটিং শুনে উনি যদি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে না যান, তো কী বলেছি!'

এমনি সময় নিমাই উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সরলা এসেছে।'

রমেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে ছেলেগুলিকে বিদায় দেবার চেষ্টায় বললে, 'আচ্ছা, তাই কথা রইল। একদিন না-হয় স্টুডেন্টদের হাফ করে দেব।'

'বেশ, বেশ, চমৎকার।' বলে ছেলেরা হাসিমুখে বিদায় নিল।

তেমনি কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠন টেনে সরলা এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোমটার তলা দিয়ে ভিজা চুলগুলি পিঠের দু'দিকে ঝাঁপে পড়েছে, — ফিনফিনে শাড়িটি পরাতে সরলাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে— সরলার কটিটি যেন মুঠির মধ্যে ধরে নেওয়া যায়— এমনি হালকা! সমস্ত মুখে বিষাদের একটি স্তিমিত অপূর্ব শ্রী!

রমেশ খুশি হয়ে বললে, 'তুমি এসেছ, সরলা? বেশ, বেশ। খেয়ে এসেছ তো?'

সরলা ঘোমটাটা আলগোছে একটু কমিয়ে আনলে; বললে, 'খেয়েই এসেছি!'

'তবে তুমি ওখানে একটু বোসো, আমরা চান করে খেয়ে নিই, পরে মহড়া শুরু হবে। ও নিমাই, সরলাকে একখানা বই এনে দে তো। তুমি তো পড়তে পার একটু-একটু — এখন একটু চোখ বুলিয়ে নাও— পরে হাত-পা-নাড়া সব আমি শিখিয়ে দেব। মোটে তিনটি সিন তোমার, — লাস্ট সিনটার সমস্তই তোমার ওপর নির্ভর করছে – তুমি বেঁকলেই সমস্ত বই বেফাস। ওইটেই বেশ ভালো করে করতে হবে। পার্টে তোমার নাম মালতীমালা— জলন্ধরের রাজার একমাত্র মেয়ে। তুমি রাজকুমারী।'

সরলা অবাক হয়ে রমেশের মুখের দিকে তাকিয়েছিল— গলা যেন শুকিয়ে আসছে। জেগে-জেগে রোদ্দুরের দিকে চেয়ে চেয়ে ও স্বপ্ন দেখছে। ওর সমস্ত জীবনের সঙ্গে বেখাপ্পা এই মুহূর্ত ক'টি যেন সুমধুর মদিরায় ভিজে গেছে। ও রাজকুমারী!

রমেশ একটু হেসে পাশের ঘরে চলে গেল।

সরলা চেয়ারে না বসে ঘরের একটি কোণে মাটির ওপর তেমনি বসেছে— দেয়ালে পিঠ রেখে। নিমাই বই নিয়ে এল। পাতাগুলি উলটোতে উলটোতে কাছে এসে বললে, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তোমার প্রথম আবির্ভাব – স্টেজে তুমি আর আমি। দুজনে প্রগাঢ় প্রেম হচ্ছে। মাঝের দৃশ্যটাতে তুমি আমার প্রেমে সন্দিহান হবে— শেষ দৃশ্যে একেবারে খেপে গিয়ে ছুরি নিয়ে মারতে আসবে— কিন্তু—'

ও-ঘর থেকে রমেশ হেঁকে উঠল, 'নিমাই!'

নিমাই বললে, 'যাই.... কিন্তু আমাকে, আমাকে কী করে মারবে তুমি? কে আমার নাগাল পায়? তোমাকে পেয়ে সরলা, সত্যিই আমার অ্যাক্‌টিং খুলে যাবে, পিপের মতো মোটা চমৎকারিণীর সঙ্গে স্টেজে প্রেম করাও একটা প্রকাণ্ড দুর্ভোগ। ওর দু'পল্লা গলার চামড়া দেখলে ভয়েই আমার গলা কাঠ হয়ে আসে— প্রেমের বুলি বেরুবে কী ছাই। তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে। এমনি একটি মেয়েই আমি চেয়েছিলাম— দুটি চোখে এমনি একটা লজ্জা— তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে সমস্তগুলি সিন যেন একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠবে— গানের মতো, ছবির মতো!'

সরলার দু চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে এসেছে— নিমাই-এর প্রতি অনির্বচনীয় শ্রদ্ধায় ও স্নেহে ওর মুখের সমস্ত

রেখাগুলি কোমল, কমনীয় হয়ে এল। কিছুই বলতে পারল না, খালি একটি সপ্রেম কুণ্ঠায় নিমাই-এর মুখের দিকে চেয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

ও ঘর থেকে রমেশবাবুর আরেকটা বিকট আওয়াজ আসতেই নিমাই তাড়াতাড়ি বইখানা সরলার কোলের ওপর ফেলে পিঠ দেখাল।

চমৎকার ছেলে এই নিমাই! উনিশ-কুড়ির বেশি হবে না। ছিপছিপে পাতলা চেহারাটা, টানা-টানা চোখ; কথায় যেন মধু ঢালা। এর সঙ্গে প্রেম করবার সময় স্টেজে দাঁড়িয়ে কী-কী কইতে হবে জানবার জন্য সরলা তাড়াতাড়ি বইয়ের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য খুলে বসল। একটু কষ্ট করে-করে পড়তে লাগল— চমৎকার!

প্রথমেই মালতী অর্থাৎ সরলা বলবে ঃ 'কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে— জ্যোৎস্নায় আকাশ ধুয়ে যাচ্ছে। পিকগণ কলরব করছে— ফুলের গন্ধে, আকাশের নীলিমায় এত মধু! চলো উদ্যানে যাই।'

তারপর হিরণকুমার ওরফে নিমাই বলবে ঃ 'উদ্যান? ছাড় উদ্যান— এই গৃহই আমার আকাশ, আমার স্বর্গ, মালতী! তোমার মুখখানি আমার চাঁদ, তোমার কণ্ঠস্বরে লক্ষ পিকের কুহরণ, তোমার দুটি পরিপূর্ণ অধরের রঙিন পেয়ালায় রঙিন মদিরা!...'

সরলা আর পড়তে পারে না, আবেশে সমস্ত গা অবশ হয়ে আসে। কে যেন ওর দিকে দুটি সকম্প সাগ্রহ বাহু বিস্তার করে দিয়েছে— কার কণ্ঠস্বরে যেন স্নেহপূর্ণ কাতর কাকুতি! শুধু কথার মধ্যে যে এত মাদকতা থাকতে পারে সরলা কি তা জানত? নিমাই— নিমাই ওকে এই সব বলবে?

তারপরে—

খাওয়া-দাওয়ার পর রিহার্সেল শুরু হল।

দি ইয়ং ইন্ডিয়া থিয়েট্রিক্যাল পার্টির প্রোপ্রাইটার, ম্যানেজার ও প্রধান অ্যাক্টর— সমস্তই রমেশবাবু। এমন কি জালন্ধর পতন নাটকের লেখকও স্বয়ং উনিই। লোকটি চৌকশ।

যাই হোক, শুরু হল রিহার্সেল। সবারই পার্ট তৈরি— দু বছর নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে জালন্ধর-পতনেরই অভিনয় চলেছে। তাই সমস্ত দিন-রাত্রি ভরে শুধু সরলার পার্টেরই মহড়া দিতে হবে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য ঃ সরলা আর নিমাই। দূরে চাঁদ, কাছে নদী— দৃশ্যের পৃষ্ঠপট।

সমস্ত রাজ্যের লজ্জা এসে সরলাকে গ্রাস করেছে। দুবার তিনবার চেষ্টা করে সরলা যা বললে তার আর তুলনা হয় না। স্বাভাবিক লজ্জায় ওর কণ্ঠস্বরে একটি অস্ফুট কোমলতা এসেছে, তা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সমবেত অভিনেতার তারিফ শুনে সরলার মন গভীর আনন্দে স্নান করে উঠল— জীবনের এই আনন্দের আস্বাদ যিনি ওকে প্রথম দিলেন, ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে সেই কৃতার্থবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নেয়— রমেশবাবু, নিমাইবাবুরও।

আর নিমাই! এই দু বছরের মধ্যে নিমাই আর কখনো এত ভালো অভিনয় করেনি।

রমেশ সরলাকে মোশন দেখিয়ে দেয়, উচ্চারণের তারতম্য শেখায়, স্টেজে চলাফেরার ভঙ্গিতে সড়গড় করবার চেষ্টা করে। সরলা ঠিক-ঠিক শিখে নেয় — যেখানে যেটুকু ভুল করে সেই ভুলটুকুই যেন সবার চোখে সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

কৃতার্থ বলে, 'কেয়াবাৎ! এই ঠিক।'

একেবারে একটি আনকোরা মেয়ের পক্ষে এমন স্টেজ-ফ্রি হয়ে অভিনয় করে যাওয়া— সবাই প্রশংসাসূচক বলাবলি করে। ততই সরলার মনে একটা আত্মবিশ্বাস আসে, তেজ আসে। নিমাই-এর প্রতি ওর সত্যিকার স্নেহ যেন ততই একটা প্রকাশ পাবার আশা করতে থাকে।

এই এক সিনেই সরলা দাঁড়িয়ে গেছে!

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আবার সরলার অভ্যুদয়; এবারে অন্য প্রকার মনোভাব নিয়ে। মালকানা-নগরের রাজপুত্রীর সঙ্গে হিরণকুমারের প্রেম হয়েছে মনে করে মালতীর ক্রূর সন্দেহ, আহত অভিমান।

মালকানা-নগরের রাজপুত্রীর ভূমিকায় যে নেমেছে সে রোগা, চিমসে— তার দিকে তাকালে সরলার রাগের চেয়ে করুণাই বেশি হয়।

সে সিনটাও কোনো রকমে উতরে গেল— চলনসই।

এবারে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য। রমেশবাবু কলমের খোঁচা মেরে এই দৃশ্যটিকে একেবারে জমজমাট করে তুলেছেন— সব দৃশ্যকে টেক্কা মেরেছে এ।

কিন্তু এই সিনটিতে এসে সরলা হাঁপিয়ে পড়ল। কিছুতেই পারল না ফোটাতে।

এই সিন-এ মালতী হিরণকুমারকে হত্যা করবার জন্য হাতে বিষাক্ত ছুরিকা নিয়ে প্রবেশ করবে— চোখে জ্বলবে দীপ্তি, অধরে কুটিল হিংসা, ক্রোধে সমস্ত দেহ যেন একটি লালায়িত বহ্নিশিখা! সরলা কিছুতেই মুখে চোখে সেই দৃপ্তভাব আনতে পারবে না, মুখখানি তেমনি সুকোমল ও সুকুমারই থেকে যায়।

ছুরি তোলাটিও ঠিক হয় না।

কৃতার্থ অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে বলে, 'না, হল না। আমাদের চমৎকারিণী এ-জায়গাটা কী চমৎকার করত!'

নিমাই প্রতিবাদ করে, 'প্রথম দিনে চমৎকারিণীর সাধ্যি ছিল না এমন উতরোয়। দু-পাঁচবার দেখিয়ে দিলে সরলা চমৎকারিণীর ওপর ডবল প্রমোশন পাবে।'

রমেশবাবু সরলাকে দেখিয়ে দেয়, গোঁফ জোড়া ফুলিয়ে মুখে একটা বিকটতা আনে, কণ্ঠস্বরকে হেঁড়ে করে তোলে--- সরলা অনুকরণ করে বটে, কিন্তু মুখে কিছুতেই সে দৃঢ়তা আসে না। ওর নিটোল চিবুকটিই ওর মুখের এই কৃত্রিম অমানুষিক বন্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, -- ওর দুটি চোখের সেই ব্রীড়ার কুয়াশা কিছুতেই কাটে না, কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ হয় বটে, কিন্তু তার মৃদুতা ঘোচে না। হাতে ছুরি নয়, যেন ফুলের মালা নিয়ে এসেছে।

কৃতার্থ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'হবে না। কিন্তু এ-সিনটাই সব— একে মার্ডার হতে দিলে প্লে'ই ফক্কা। এখানে চমৎকারিণীর কী আশ্চর্য রকম ডেলিভারি ছিল।'

রমেশও হাল ছেড়ে দেয়। সরলার মুখ এতটুকু হয়ে আসে।

সরলা ঢোক গিলে বলে, 'একদিনেই কি আর হয়? অভ্যেস তো নেই— কালকেই দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে।'

নিমাই সায় দিয়ে ওঠে, 'নিশ্চয়ই। একদিনে ওর পার্টসের যা প্রমাণ পাওয়া গেল, কোচিং পেলে চমৎকারিণী তো ছার, প্রভা ওর কাছে ঘেঁষতে পারবে না। আচ্ছা, তার পরেরটুকু হোক।'

সরলা উৎসুক হয়ে প্রম্পট শুনতে লাগল -- এর পরে কী আছে!

মালতীমালা প্রথমে তো ছুরি উঁচিয়ে হিরণকুমারকে খুন করতে এল— এসে খুব খানিকটা স্বগত উক্তি করে যেই সত্যি সত্যি ঘুমন্ত হিরণকুমারকে বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে যাবে, দেখবে - হিরণকুমার আগেভাগেই বিষ খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! তখন মালতীর কী সে অনুশোচনা! — ছুরি ফেলে দিয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে কী কান্না সে — হিরণকুমারের বুকের ওপর লুটিয়ে-লুটিয়ে।

সেই কান্নার মধ্যেই যবনিকা-পতন।

নিমাইর মাথাটা কোলের কাছে টেনে এনে সরলা সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেললে— চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিমাইর কোঁকড়ানো চুলগুলি নিয়ে ওর শীর্ণ আঙুল ক'টির কী সে আদর, যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো সমস্ত হৃদয় গলে পড়ছে!

নিমাই চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে সরলার কোলের কাছে মাথাটা রেখে মড়ার মতো পড়ে আছে। সরলার কান্না শুনে ওর নিজেরও চোখ ভিজে উঠেছে। খালি ওর সেই দিদির কথা মনে পড়ে, যিনি ওর অসুখের সময় প্রাণপণ সেবা করেছিলেন সেবার।

সরলার কান্না ও কাকুতি শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। একজন বললে, 'অডিয়েন্স-এর বুক ফেটে যাবে।'

খালি কৃতার্থই সর্বান্তঃকরণে মানতে চায় না। বলে, 'বুক তো ফাটবে, কিন্তু এর খানিক আগে যে ছুরি-হাতে দেখে হেসেই বুক ফেটে গেছে। ফাটা বুক আবার ফাটে কী করে?'

সেই লোকটা বললে, 'তবে ফাটা বুক জোড়া লাগবে, কৃতার্থবাবু।'

প্রম্পট্ করতে করতে রমেশ এতক্ষণ ভাবছিল— জালন্ধর-রাজের পার্ট ছেড়ে হিরণকুমারের পার্টেই নেমে যাবে কি না! বললে, 'কিন্তু এই দেখো চমৎকার মানিয়ে যাবে, কৃতার্থ!'

'তা মানিয়ে নিতেই হবে এক রকম করে। কিন্তু চমৎকারিণী কী সুন্দর করে যে কনট্রাস্টটা ফুটিয়ে তুলত! পড়ল জ্বরে—'

রমেশ তাড়াতাড়ি বললে, 'ওকে ওষুধ-পথ্য দিয়েছিস তো রে নেমা! সন্ধে হয়ে গেছে যে।'

নিমাই ওষুধ-পথ্য নিয়ে ও-ঘরে গেল। চমৎকারিণী বিছানায় শুয়ে ককাচ্ছে। জ্বরটা একটু কমেছে বিকেলের দিকে। উঠে বসে কান খাড়া করে সবলার রিহার্সেল শুনছিল।

বললে, 'কে নিয়েছে মালতীর পার্ট?'

নিমাই উদাসীনের মতো বললে, 'চিনি না।'

চমৎকারিণী বললে, 'পারছে না বুঝি! বোকার মতো হাপুস-হুপুস কী রকম কাঁদছিল, একলা হাসতে-হাসতে আমার কোমরে ব্যথা ধরে গেছে—'

নিমাই চটে উঠে বললে, 'তোমার চেয়ে ঢের ঢের ভালো করে। ওকে পেয়ে আমি বর্তে গেছি। হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছি—'

'বটে? হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছ? খাব না আমি ওষুধ, ডাকো রমেশবাবুকে।'

'ডাকছি।' বলে নিমাই সরে পড়ল।

রাত বাড়ছে।

এক-থালা খাবার ও এক-পেয়ালা চা দু হাতে করে নিমাই সরলার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, খেয়ে নাও খানিকটা।'

সরলা অল্প একটু হেসে বললে, 'আপনার মুখও তো শুকনো, আপনিও খান।'

'আমি খাব'খন।'

'আপনি না খেলে আমি খাব না।'

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দুজনে খাবারের থালাটা শেষ করল।

রমেশ ডাকলে, 'নিমাই!'

নিমাই তাড়াতাড়ি চায়ের পেযালাটা সরলার হাতে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'যাই।'

রমেশ সরলার হাতে আবার একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলে। বললে, 'গাড়ি ডেকে দি?'•

সরলা বললে, 'দরকার হবে না।'

'কালকে ঘুম থেকে উঠেই এসো। এখানেই খাবে-দাবে। বুঝলে?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে সরলা একা পথে বেরিয়ে পড়ল।

বাবলা গাছটার বাঁক ঘুরতেই সরলা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে সামনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিমাই। বললে, 'গাড়িতে উঠে এসো, সরলা।'

সরলা আপত্তি করল না। গাড়ি খালের দিকে গড়াল।

দুজনে মুখোমুখি বসেছে। নিমাই বললে, 'তোমার দিকে টেনেছিলাম বলে চমৎকারিণী ফণা তুলে আছে। কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি সরলা, তুমি না থাকলে আমি কক্ষনোই এবারে প্লে করব না; ডাঙার কাছে নৌকো এনে ডুবিয়ে মারব ওদের।'

সরলা যেন সমুদ্রের কূল দেখে; গর্বে, সুখে ওর বুক ডগমগ করে ওঠে!

নিমাই পকেট থেকে সিগারেট বার করে বলে, 'খাবে?'

সরলা সিগারেটটাই খায়; তবু বলে, 'না।' নিমাইর সামনে ওর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে না।

নিমাইও খায় না। বলে, 'ওই সিনটাতে খুন করতে আসাটাই বড়ো নয়, ভালোবাসার লোককে মরে গেছে দেখে ছুরি ফেলে আর্তনাদ করাটাই বড়ো কথা। কার্টেন্ পড়বার সময় লোকের মনে খালি তোমার ওই কান্নাই ঘুরে বেড়াবে— চোখের জলে ভেজা তোমার মুখখানিই তাদের চোখের তারায় আঁকা থাকবে।'

সরলা বলে, 'আপনি, পৃথিবীতে আর নেই, এ-কথা মিথ্যি-মিথ্যি করে ভাবলেও আমার কান্না পায়।'

কিন্তু কথাটা শেষ করতে না করতেই সরলার ভারি লজ্জা পেল।

নিমাই ভাবে— সরলার ওই আঙুল কটি আবার নিজের চুলের মধ্যে রাখে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরবার পর্যন্ত সাহস হয় না। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে।

খালের কাছে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। সরলা নিজেই কবাট খুলে নেমে পড়ে। বলে, 'আসবেন?' কিন্তু বলেই মনে মনে পীড়িত হয়ে ওঠে।

নিমাই বলে, 'কৃতার্থবাবু ওরা তোমাকে অপমান করেছে, কিন্তু তার শোধ আমি নেব। আচ্ছা, যাই—'

নিমাই গাড়োয়ানকে বললে, 'শহরটার খানিক এদিক-ওদিক ঘোরো। ডবল ভাড়া পাবে।'

এবারে সিগারেট ধরায়।

সরলা ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে, — গাড়িটা যে অদৃশ্য হয়ে গেছে তার পর্যন্ত হুঁশ নেই।

ভেতরের দাওয়ায় পা দিতেই বাড়িউলি খ্যা খ্যা করে উঠল, 'বলি, সরি এসেছিস? তুই কেমনতরো মানুষ লো, ছুঁড়ি! সারা দুপুর-সন্দে টো টো করে বেড়াবি, আর এখেনে যত রাজ্যের লোক এসে মুখ-খারাপ করে যাবে?'

সরলা যেন গাড়ি থেকে এবারেই সত্যি নেমে আসে। ওর গতানুগতিক কদর্য বিরস জীবন ওর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। ফুলশয্যার ওপর কে যেন এক বোতল মদ ঢেলে দেয়,— ওর গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

বলে, 'কী হল বাড়িউলি দিদি?'

'কী হল? সেই অটল ছোঁড়া বিকেলের দিকে এসেছিল কতকগুলো চেলা জুটিয়ে। তোকে ঘরে না-দেখে কী কেলেঙ্কারিটাই না করে গেল! আমার থেকে তিন-চার পাঁইট করে দিশি-বিলিতি চেয়ে নিয়ে খেয়ে বমি করে, গালাগালি দিয়ে জিনিসপত্র ছরকট করে লম্বা দিলে— একটি পয়সা দিয়ে গেল না। বললে, সরি দেবে।'

সরলা খেপে ওঠে, 'হ্যাঁ, সরিই তো দেবে! কেন? সরি কি ওর জুতোর শুকতলা নাকি? খালি-বোতলগুলো ওর মুখের ওপর ছুড়ে মারতে পারলে না? এবারে আসুক না, ঝাঁটাপেটা করে যদি না তাড়াই তো আমি বামুনের মেয়ে নই।'

বাড়িউলি বলে, 'বামুনের মেয়ে বলে আর দেমাক করিসনি ছুঁড়ি। কেন বাড়ি থাকবিনে শুনি? বাঁধা লোকের টাকা খেয়ে আবার তার ওপরে চালবাজি! কেন সে গালাগাল করবে না?'

সরলা বলে, 'রেখে দাও, অমন লোক বাজারে কানা-কড়িতে বিকোয়। ও রকম বাবু আমার চাইনে। আমি কালই এ বাড়ি থেকে খসে পড়ব।'

'থেটার-ফেটারের কথা সব তার কানে উঠেছে। বলেছে,— থেটারে আগুন লাগিয়ে দেবে, আর তোর মুণ্ডুটা আস্ত রাখবে না।'

'তার হয়ে তুমি লড়তে এসো না, বাড়িউলি-দিদি। আসুক সে, দেখি তার বাপের ঘাড়ে কটা মাথা! তার মুখে যদি নোড়াটা আমি না ঘষি তো কী বলেছি! কত টাকার মদ খেয়েছে সে? কত টাকা পেলে তুমি গলা থামাবে?' বলে সরলা আঁচলের খুঁট থেকে নোটটা বাড়িউলির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

সব ঘর নোংরা, জিনিসপত্র এলোমেলো, কাচের জাগ গ্লাস ভাঙা, ট্রে-টা উলটানো; কোথা থেকে একটা উৎকট গন্ধ আসছে। সরলা অন্ধকারে থমকে রইল— দেশলাই জ্বালাবার পর্যন্ত যেন সামর্থ্য নেই।

বুকের মধ্যে সরলা যে গানের সুরটি নিয়ে এসেছিল, টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। ও যেন আবার নরককুণ্ডে এসে পড়েছে, যেখানে সেই অটল আর সরলা; যেখানে না আছে মালতী, না হিরণকুমার!

সরলা ঘর থেকে বেরিয়ে খালের পারে এসে দাঁড়াল।

পরে কী ভেবে আবার ঘরে গেল, ল্যাম্প জ্বালাল-- কোমরে কাপড় জড়িয়ে বালতি করে জল এনে ঘর সাফ করতে বসল।

পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে নিমাই-এর মাথাটি কোলে নিয়ে যে-হাত দিয়ে ওর কপালে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে, সেই হাতে ঘৃণ্য অটলের বমি নিকোতে হচ্ছে ভেবে ওর চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগল। ও সত্যিই আর এখানে থাকবে না, থিয়েটারে ভিড়ে যাবে— যে-থিয়েটারে হিরণকুমার আছে, যে-থিয়েটারে মৃত বন্ধুর উদ্দেশে কৃত্রিম শোক করতে গিয়ে সত্যি-সত্যিই কান্না পায়।

ভুতি ঘরে এল। বললে, 'আজ কী হল রে, সরলা?'

সরলা বললে, 'কত! কত বড়ো শক্ত পার্ট যে হাতে নিয়েছি, সে দেখবি গিয়ে। স্টেজে খুন করতে হবে—'

ভুতি ভয়ে আঁতকে ওঠে, সরলাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'বলিস কী লো!'

সরলা হেসে অভয় দিয়ে বলে, 'সত্যি-সত্যিই কি আর খুন করব নাকি বোকা মেয়ে! পুলিশ নেই? খুন করতে যাব খাঁড়া উঁচিয়ে, এমনি করে — চেয়ে দ্যাখ, এমনি দাঁত খিঁচিয়ে— দ্যাখ তো ঠিকমতো হচ্ছে কি না—'

ভুতি অত-শত বোঝে না, বলে 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে — তার পর কী হবে?'

রসবোধের চেয়ে ভুতির কৌতূহল বেশি।

'তারপর যেই খাঁড়া চালাতে যাব, দেখব হিরণকুমার আগেই বিষ খেয়ে ভবলীলা ঘুচিয়েছে। তারপরে অস্তর ফেলে দিয়ে তার মাথাটা কোলে নিয়ে কাঁদব।' বলতে-বলতে সরলার চোখে ব্যথার কুয়াশা ঘনিয়ে আসে।

সরলা ভূতিকে ফের অভয় দেয়, 'সেই হিরণকুমার সত্যিই বিষ খাবেনা রে, পরে পর্দা পড়ে গেলে জেগে উঠবে। .... আমাকে খাবার খাইয়ে দিলে, গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিলে,— ভারি সুন্দর ছেলেটি, ভাই। মনের মতো। দেখিস এখন।'

দোরগোড়ায় কে একটি ছোটো ছেলে এসে দাঁড়াল, —ঝি-মাসির ছেলে, হরি। হরি বললে, 'আমাকে আর মাকে সত্যি-সত্যি মাগনা থেটার দেখাবে, সরলা-দি?'

সরলা হাসিমুখে বললে, 'দেখাব। যাস তোরা।'

হরি খুশিতে উছলে পড়ে বললে, 'তোমাদের হয়ে গেলে দেখো আমরাও একটা থেটার করব বাবুতলার মাঠে। কাগজ দিয়ে সব ভীমের গদা বানিয়েছি, বাঁশের ধনুক। সেদিন তোমাদের নিয়ে যাব। দেখবে—'

ছুটতে-ছুটতে চলে গেল।

ওই সামান্য দু'টি মিষ্টি খেয়েই সরলার পেট ভরে আছে। ঝিকে বিদায় করে দিল।

পাড়াটা নিরিবিলি হয়ে এসেছে। সরলা দোর বন্ধ করে দিয়ে ওর ছোট্ট আয়নাখানি বেড়ার গায়ে মানানসই করে লাগিয়ে ছুরির অভাবে চিরুনিটাই ছুরির মতো বাগিয়ে নিজের মনে শেষ দৃশ্যের মহড়া দেয়। আয়নায় সমস্ত মুখের ছায়া পড়ে না দূর থেকে, যেটুকু পড়ে তাতেই ও ওর মুখের চেহারার আন্দাজ নিতে পারে। যতই ও ওর মুখ রুক্ষ কর্কশ বলদৃপ্ত করতে চায়, ততই ওর মুখের শীর্ণতা বীভৎসতব হয়ে উঠতে থাকে! গাম্ভীর্যের সঙ্গে হিংসার কাঠিন্য মেশাতে পারে না— তাই দেখায় কুৎসিত, হাস্যকর!

কী করে যে মানিয়ে নেবে ভেবে উঠতে পারে না।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে একটা ছেঁড়া বালিশ কোলে নিয়ে পার্টের বাকি অংশটুকুর মহড়া দেয় •বালিশকে ভাবে হিরণকুমার; তার জন্য রাত কবে সরলা অনর্থক অশ্রুবর্ষণ করে।

এমন সুন্দর করে সরলার জীবনে ভোর হয়নি! ভোরবেলাটি ওর কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন লাগছে।

ঘুম থেকে উঠে সবলা ভাবছে, কে যেন ওর কাছে আসবে আজ। নিমাইকে তো ও আসতে বলে দেয়নি। কিন্তু না বলে দিলে কি আসতে নেই? অটলকে তাড়িয়ে দিলেও তো সে আসে।

বেলা বেড়ে চলে, কিন্তু সরলার ভারি খালি-খালি লাগে। অদূরে রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ পেলেই ওর বুক আশায় দুলে ওঠে। কিন্তু পবে ভাবে,— ওর কাছে আসবার এই একটিই তো সদর রাস্তা নয়, - শুধু গাড়িই তো তাব বাহন নয়,— সে এসেছে তার ঘুমের মধ্যে, অজানতে ঘুম ভাঙার মধ্যে, মনের গোপন খিড়কির দুয়ার দিয়ে।

যে আসবে না, তার জন্যে এমনি অনর্থক প্রতীক্ষা করে থাকবার মধ্যে যে দুঃসহ সুখ আছে, সরলা কোনোদিন তা জানত না।

রোদ উঠতে না উঠতেই সরলা বেরিয়ে পড়ল।

নিমাইকে কাছে পেয়ে সরলা শুধোল, 'ভেবেছিলাম সকালবেলা আসবেন।'

নিমাই বললে, 'ম্যানেজারের হুকুম তামিল করতে-করতেই সব গরমিল হয়ে যায়। আজ থেকেই স্টেজ-রিহার্সেল শুরু হবে। তোমার প্রবেশ-প্রস্থানগুলি ঠিক করে নিতে হবে। মুখস্থ হয়েছে?'

সরলা বললে, 'একটু-একটু হয়েছে।'

'ম্যানেজার বলেছিল, পার্টটা তোমাকে লিখে দিতে, — আমার হাতের লেখা তো আর বুঝবে না ছাই, তাই আমার বইখানাই তুমি নাও।'

বলে নিমাই পকেট থেকে ছেঁড়া জালন্ধর-পতন বইখানি সরলার হাতে গুঁজে দিল।

নিমাই বললে, 'দেখো, আজ আরো ভালো হবে। তোমার হাতের আদর পাবার জন্য আমার কপালটা নিশপিশ করছে। তোমার কান্না শুনলে আমার মন কেমন করে ওঠে।'

সরলার ঠোঁট দুটি শুধু একটু কাঁপে।

স্টেজ বাঁধা হয়ে গেছে,— বেড়া ও টিন দিয়ে চারিদিকে ঘেরা, পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো ফুটো করে উঁকি

দিতে চায়, আর কে ওদের সব ভাগিয়ে দিতে থাকে। ওইখানে গানের আর নাচের মহড়া চলেছে, — এ পারে অ্যাকটিং— ওইখানে সিন পেন্টিং, সিন শিফটিং চলেছে।

সমস্ত বাড়িটা হইহই করছে, যেন একটা উৎসব!

সরলা সব ভুলে যায়— খালপারে সেই নোংরা ঘর, সেই শীতকালে রাত বারোটা পর্যন্ত ফাঁকে জবুথবু হয়ে বসে থাকা, সেই একঘেয়ে বিশ্রী কথাবার্তা, সেই অটলবাবুর বীভৎস মুখ! ওর বন্দি পৃথিবী যেন হঠাৎ একটা অপরিমিত পরিধি লাভ করে। আকাশকে আজ ওর খুব বড়ো লাগে, —সমস্ত অবকাশ পূজার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাবে, ও সত্যিই অটলের রক্ষিতা ক্রীতদাসী নয়, ও সত্যই রাজকুমারী! ওর ভালোবাসা, প্রেমিককে হারিয়ে ও বৈরাগিনী হয়েছে, — ওর দারিদ্র্য, ওর বিরহের কী সুন্দর ব্যাখ্যা! সরলা সব ভুলে যায়, মিথ্যার মাদকতা ওর ক্লান্তি ঘুচোয়— ও নতুন করে পৃথিবীতে জন্মলাভ করে।

শুধু দুটি দিনের জন্যেই। তা হোক।

আজ ভোরে চমৎকারিণীর জ্বর ছেড়েছে। শরীর দুর্বল বটে, কিন্তু অচল নয়— গড়াতে-গড়াতে এসে একটা চেয়ার নিয়ে বসল। অভিনয় সম্বন্ধে টিপ্পনীর তার আর শেষ নেই। কৃতার্থময় পেছনে দাঁড়িয়ে চমৎকারিণীর টিপ্পনীরই তারিফ করে।

রমেশ বলে, 'তুমিই আজ থেকে প্রম্প্‌ট করো হে, মধুসূদন। তোমারই তো কাজ।'

মধুসূদন বই হাতে করে।

আজকে একেবারে গোড়াগুড়ি থেকে। তৃতীয় অঙ্কে পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় বারোটা বাজে।

শুরু হল তৃতীয় অঙ্ক। সরলা মাত করে দিল।

কিন্তু শেষ দৃশ্য আসতেই সরলার আর হয়ে ওঠে না; মারবার সময় এমন একটা ভাব হয়, যেন খুব শক্ত একটা দড়ির গেরো খুলছে মাত্র— খুন করতে আসছে না। মুখ কিছুতেই কুঞ্চিত কর্কশরেখাসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে না। একটা বিশীর্ণ দৈন্য ফুটে ওঠে শুধু।

চমৎকারিণী মুখ টিপে-টিপে হাসে। কৃতার্থ তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাসির সুর সপ্তম গ্রামে তুলে দেয়। বলে, 'হবে না রমেশবাবু। লুডিক্রাস্‌!'

রমেশ বলে, 'হবে না বললেই তো হয় না। এ নিয়েই চালিয়ে দিতে হবে আপাতত।'

চমৎকারিণীর হাসি কিছুতেই থামে না। যেন মদের পিপের মুখ ছুটে গেছে, তার থেকে ফেনিল উচ্ছ্বাস উঠছে

নিমাই একেবারে রুখে ওঠে; বলে, 'চোখের সামনে অমনি হাসলে কে পার্ট করতে পারে? রইল আপনার থিয়েটার। চলে এসো, সরলা!'

সরলা আয়ত চোখ মেলে নিমাইর দিকে তাকায়। ওর অপমানের বেদনা স্নেহে সুশীতল হয়ে ওঠে।

রমেশ হাঁকে, 'নিমাই! এ কী অন্যায় কথা তোর! পরের সমালোচনা কী করে বন্ধ করবি? এগিয়ে এসো সরলা, আবার চেষ্টা করো। অমন হাসাহাসি কোরো না, চমৎ! আমাদের এ-ই চালিয়ে নিতে হবে। জ্বরে পড়ে তো তুমি সব বিতিকিচ্ছি করে দিলে।'

'বিতিকিচ্ছি?' নিমাই ফের প্রতিবাদ করে : 'সরলার সমস্ত শরীরে প্রেমের যে একটি সহজ লীলা ও পেলবতা আছে তা চমৎকারিণীর কোথায়? ওর স্বরে আপনি-থেকে একটি স্নেহের সুর আছে, -- কেমন চমৎকার মানায় ওকে! চমৎকারিণীকে খুনের পার্টেই বেশি খোলে, কিন্তু সরলা যেন মূর্তিমতী সরলা! আপনার বই থেকে ওই খুনের অংশটুকু কাটা-প্রুফের মতো বাদ দিন!'

রমেশ এ-সব কথা কানেই তোলে না। আবার পার্ট চলে। সরলা আবার ব্যর্থ হয়ে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

পরেরটুকু আর আসে না। নিমাই বলে, 'ও যেমনি হচ্ছে হোক, বাকিটুকুতে কেঁদে সরলা আগের সমস্ত ত্রুটি ধুয়ে নিয়ে যাবে। দেখেছেন, একদিনে কেমন মুখস্থ করে ফেলেছে? চমৎকারিণীর লেগেছিল পুরো একটি বছর।'

চমৎকারিণী চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমাকে এমনিধারা অপমান করলে আমি আজই চললাম কলকাতায় ফিরে।'

কৃতার্থ চেঁচিয়ে ওঠে, 'মুখ সামলে, নিমাই!'

ঝগড়ার সম্ভাবনাটা কাটিয়ে ওঠবার জন্য রিহার্সেলটা খানিকক্ষণ বন্ধ থাকে।

রাত্রে সরলাকে গাড়ি করে এগিয়ে দিতে-দিতে নিমাই বললে, 'আমার যদি অনেকগুলি টাকা থাকত, তবে তোমাকে নিয়ে নতুন একটা থিয়েটার খুলতাম। তোমাকে অ্যাক্ট্রেস্ পেয়ে সত্যিই আমার ভেতরে একটা আবেগ আসে,— কাউকে দিয়ে খুব মিষ্টি করে একটা প্রেমের গল্প লিখিয়ে নিতাম!'

সরলা হেসে বলে, 'আপনি নিজেই তো পারেন। পরকে খোশামোদের দরকার হয় না।'

একটুখানি মাত্র পথ— এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে যায়। সরলার ইচ্ছা করে নিমাইকে ঘরে নিয়ে যায়, নিজ হাতে রেঁধে ওকে কিছু খাওয়ায়, ফরসা চাদর বের করে ওর জন্য নিজ হাতে নতুন একটি বিছানা পেতে দেয়, ও ঘুমিয়ে পড়লে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মতো ওর চুলগুলিতে আঙুল বুলিয়ে দিতে-দিতে দুটি-ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

সরলা মুখ ফুটে নিমন্ত্রণ করতে পারে না।

ভাবে, এই বন্ধ গাড়ির মধ্যেই শুধু দুটি মুহূর্তের জন্য ওর ওই ছোট্ট ক্ষণিক সংসার— নিমাই-এর সঙ্গে। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন মালতী আর হিরণকুমার!

গাড়িটা থামলে সরলা নামে, নিমাই হঠাৎ ওর আলোয়ানটা সরলার গায়ে জড়িয়ে দেয়; বলে, 'তোমার শীত করবে না-হলে!'

সরলা আপত্তি করে না, আলোয়ানটি আরো নিবিড় করে জড়িয়ে পরিচিত ঘরে এসে ঢোকে। আজ আর কারুর সঙ্গে কথা কয় না, ভুতির সঙ্গেও না। আলোয়ানটা গায়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

সরলার জীবনে আরেকটি পরিচ্ছন্ন রাত্রি কাটে, ঘুম থেকে জেগে পবিত্র প্রভাতকে মনে-মনে অভিবাদন করে।

শুক্রবার। কাল প্লে। আজ ড্রেস রিহার্সেল।

পার্ট সরলার মুখস্থ হয়ে গেছে। ওর একাগ্র মনোযোগের দরুনই তা সম্ভব হল। ছুরি-মারার ভঙ্গিটিও এক রকম চলনসই করে এনেছে।

ও এর মধ্যে নিজের ত্রুটির ব্যাখ্যা পর্যন্ত বের করে ফেলেছে; বুঝিয়ে বলে, 'এই অবস্থায় মালতীর মুখে খুব একটা হিংস্রতা আসতেই পারে না, সেই হিংসা ও ক্রোধের সঙ্গে যে ওর একটি মমতা ও শোক মেশানো আছে— তাই তার মুখে কোমলতাটা স্বভাববিরুদ্ধ নয়।'

বলাবাহুল্য ভাষ্যকার স্বয়ং নিমাই।

সকালবেলা ছুটতে-ছুটতে হরি এসে হাজির, হাতে একখানা ছাপানো কাগজ। সরলার দোরগোড়ায় এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'গাড়িতে করে কাগজ বিলি হচ্ছে, সরলা-দি। আমাকে কি দেয়? বললাম—আমার সরলা-দি থেটার করবে, তখন দিলে। গাড়ির ছাতে বসে সানাই বাজাচ্ছে, আর কত লোক যে গাড়ির সঙ্গে ছুটছে, সরলা-দি! রামু তো চাকার তলায়ই পড়ে গেছল আরেকটু হলে!'

গর্বে আনন্দে সরলার বুক দুলে ওঠে। এত বড়ো একটা আনন্দব্যাপারে ওর কিছু অংশ আছে ভেবে ও ধন্য হয়ে যায়।

ভুতি কৌতূহলী হয়ে কাছে আসে। সরলা হরির হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দেয়। মাঝখানে একটা ছবি আছে— তার অর্থ করে।

বলে, 'এই হিরণকুমার বিষ খেয়ে শুয়ে আছে, আর আমি এমনি ছুরি নিয়ে মারতে আসছি।'

সমস্ত নাটকের মধ্যে এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে রোমহর্ষক বলে তারই ছবি ব্লক করে বিজ্ঞাপনে ছেপে দেওয়া হয়েছে।

ভুতি ও আর-সব মেয়েরা ঈর্ষায় জর্জর হয়ে সরলার পানে তাকায়। ভুতি বলে, 'কিন্তু এ তো তোর ছবি নয়—'

সরলা তা জানে। এ চমৎকারিণীর ছবি। যেন নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা; হিরণকুমারকে ও কোনোদিন ভালোবেসেছিল তার কোনো প্রমাণই তাতে পাওয়া যায় না— যেন বরাবরই ও একটা শাঁকচুন্নি। আর শুয়ে আছে নিমাই— রুখু চুল, চোখের পাতা বোজা, একখানি হাত মাটির দিকে ঝুলে পড়েছে।

সরলা হেসে জবাব দেয়, 'আমার ছবি কোথায় আর পাবে বলো। এমনি একটা এঁকে দিয়েছে। আমার অমনি মোটা হলেই হয়েছিল আর কী! পার্ট থেকে নাকচ করে দিত।'

কিন্তু নিজের মনকে এই বলে বোঝায়.— অনেক দিন আগে থেকেই এগুলি ছাপা বলে মালতীর ভূমিকায় সবলার নামটা আর হয়ে ওঠেনি।

সরলা বলে, 'আজ সব পোশাক পরে রিহার্সেল হবে, এখুনি যেতে হবে।'

হরি মিনতি করে বলে. 'আমাকে টুপ করে কোনোখান দিয়ে আজ ঢুকিয়ে দিতে পারবে না. সরলা-দি? তোমাদের পোশাক-পরা নাটক দেখব।'

সরলা হেসে ওকে প্রবোধ দেয়. 'আজ কী, কালই তো দেখবি। খুব ভালো জায়গায় বসিযে দেবখন। মাকে নিয়ে যাস।'

হরির যেন ত্বর সয় না; বলে. 'খুব ভালো জায়গা দেব? বাঃ, কেয়া মজা! রামু ওরা তো জায়গাই পাবে না।'

হরি নাচতে-নাচতে বেরিয়ে গেল।

সরলাকে এখুনিই বেরুতে হবে। ঘরে যেটুকু সময় থাকে— স্নান করা. একটু খাওয়া কি না-খাওয়া— সব সময়েই অস্ফুটস্বরে পার্ট আওড়ায়। ও এই নিয়েই আছে। ওর তিনদিন আগেকার অতীত জীবনের সঙ্গে যেন ওর কোনোই সম্পর্ক নেই— তাকে ও চেনেই না।

ড্রেস-রিহার্সেল শুরু। সবুজ রঙের শাড়ি পরে জালন্ধর-রাজকুমারী শ্রীমতী মালতীমালা ওরফে সরলাসুন্দরী যেন সবুজ মেঘের পরির মতো পাখা মেলে এই শহরের মাটিতে নেমে এসেছে।

সরলার দিকে চেয়ে কে বলবে ও সত্যিই একগাছি মালতীর মালা নয়!

পিঠে কালো পবচুল মাটি ছোয ছোঁয়, শাড়ি-পরার ভঙ্গিটিতে কী আশ্চর্য সুষমা। হাতে আভরণ। গলায় পুষ্পহার।

আর সম্মুখে হিরণকুমার. — রাজপুত্রের বেশে। মাথায় সোনার মুকুট, তাতে পাখির পালক গোঁজা।

সমস্ত স্টেজ গমগম করে ওঠে, -- ডে লাইটের সুতীব্র আলোতে পরস্পরের চোখে একটি বিহ্বল মুগ্ধতা আবিষ্কার করে দুজনে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। অভিনয় শুনে সবাই তর হয়ে যায়।

কিন্তু শেষ দৃশ্য আবার তেমনি জোলো হয়ে আসে। কৃতার্থময় কিছুতেই সায় দেয় না, দুর্বল বলে উচ্চহাস্য থেকে বঞ্চিত হয়ে চমৎকারিণী একটা বীভৎস কটু আওয়াজ করে।

নিমাই বলে. 'আর-আরদের অভিনয়ের প্যাঁচে কত যে গলদ থাকে তার কেউ খোঁজ করে না. এ বেচারির ছবি ধরা ঠিকমতো হয় না বলেই যত ঠাট্টা! আপনারা তো ছাই সমঝদার. দেখবেন লোকে কী রকম নেয়।'

কৃতার্থ বলে. 'লোকে তো আর তোমার মতো গাড়োল নয়. তাদের রসবোধ বলে একটা জিনিস আছে।'

রমেশ মীমাংসার সুরে বলে. 'না না — এই আমাদের চালিয়ে নিতে হবে। বেশ হবে, সরলা। তুমি একটুও ঘাবড়িয়ো না।'

রিহার্সেলের শেষে সরলা দামি পোশাক ছেড়ে তার আটপৌরে শাড়িখানি পরলে। সরলা যেন নিমাই এর চোখে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

নিমাই বললে, 'দেখবে কী রকম ভিড় হবে. হাততালিতে প্রত্যেকটি কথা ডুবে যাবে দেখো।'

সরলা মনে মনে ছবি আঁকে, — বিপুল জনসমারোহের কূল-কিনারা করতে পারে না।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে সরলা কারুর দেখা পায় না। গাড়ি নিয়ে কেউই বাবলা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নেই। সরলা ভাবে. হয়তো গাড়ি আনতে গিয়ে দেরি হচ্ছে; একটু অপেক্ষা করে, কেউ আবার পাছে কিছু সন্দেহ করে এই ভয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও পারে না। অন্ধকারে গা ছমছম করে। এ কেমনতরো লোক, একটুও ভাবনা নেই? সরলা বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ভাবে, দোরের বন্ধ তালাটা খুলতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

নিমাই-এর র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। ভাবে, হয়তো তক্ষুনিই নিমাই গাড়ি নিয়ে এসে ঘুরে গেছে।

রাতের মতো রাত একটা, আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা। ওর চোখের সমুখে রাশীকৃত লোক—সবাই হাততালি দিচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে ওর মুখের ওর পোশাকের দিকে চেয়ে আছে। অটল যদি যায়, সেও হাঁ হয়ে যাবে, চিনতেই পারবে না। কেউ দিস্তাখানেক নোট নিয়েও আসতে পারে, ও তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে— ও হিরণকুমারের বাসনাবাসিনী প্রিয়া! তার জন্যেই ও গেরুয়া পরবে।

শনিবার। দিনের মতো দিন। পাঁজিতে এ-দিনটি যেন সবলার জন্য রিজার্ভড্ ছিল।

চোখ-মুখ ধুয়েই নিমাই-এর ব্যাপারটি গায়ে জড়িয়ে সবলা রওনা হল থেটার-বাড়ি।

যাবার সময় ভূতিকে বলে গেল, 'দুপুরে একবার এসে পাস দিয়ে যাব তোদের।'

সবলার সুখের আজ অন্ত নেই। ওর মধ্যে এত বড়ো শক্তি প্রসুপ্ত ছিল, এত বড়ো কাজের যোগ্যতা ছিল জানতে পেরে ও গর্বে একেবারে ফুলে উঠেছে। নিজেকে আবিষ্কার করবার মতো অহঙ্কার বোধকরি আর কিছু নেই। ও এ'কদিন একটা মাতালেরও মুখ দেখেনি, ওর সমস্ত আচরণে একটি ভদ্রতা এসেছে— মনে একটি বিশ্রামের সঙ্গে প্রশান্তির স্বাদ পাচ্ছে। কত ভালো লাগছে ওর-- জীবনের বৃহৎ বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেয়ে ও ধন্য হয়েছে।

সত্যিই, আজ ও মালতীমালার মতো সন্ন্যাসিনী হয়েও যেতে পারে।

সবলা এসে পৌঁছুল। সব ফিটফাট। সব সিজিল্ মিছিল্ হয়ে গেছে। কিন্তু সবাই কেমন উদাসীন। সবলাকে দেখে কার ঔৎসুক্য নেই। নিমাই কই?

রমেশবাবুকে বললে, 'আজ রিহার্সেল হবে না?'

রমেশ বললে, 'হ্যাঁ দুপুরের পরে একবার হবে- কয়েকটি সিন।'

সবলা কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

রমেশ আর যাই হোক মুখচোরা নয়, বুঝিয়ে দেয়। বলে, তোমাকে আর আমাদের প্লে-তে লাগবে না। চমৎকারিণী সেরে উঠেছে, সে ই মালতীর পার্টে নামবে।'

সবলা বসে পড়ল। ওর তাসের ঘর দমকা হাওয়ায় ছত্রখান হয়ে গেল।

রমেশ আরো খুলে বললে, 'মার্ডারের সিনটা তোমাকে দিয়ে কিছুতেই হল না, -- কৃতার্থ ওরা কিছুতেই রাজি হয় না। তা ছাড়া চমৎকারিণী ভালো হয়ে এই পার্টটা এখানে আবার করবার জন্য ভারি ঝুঁকে পড়েছে জানই তো, ও আমাদের দলের সেরা অ্যাকট্রেস। ওকে তো আর চটাতে পারি না।'

সবলা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ছেলেমানুষের মতো। এক মুহূর্তে ও যেন একেবারে ফুরিয়ে গেছে।

রমেশ বৃথা প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে 'তুমি কিছু মনে করো না, সবলা। বিকেলে তুমি এসো থিয়েটার দেখতে। তোমাকে আর কয়েকটা টাকা দেবখন, থিয়েটারের পরে কিংবা কাল সকালে এসে নিয়ে যেয়ো।'

রমেশ চলে গেল

সবলা কোথায় গিয়ে যে ওর এই কান্না লুকোবে, জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। ওর কাছে পৃথিবী যেন আর সমস্ত জায়গা খুইয়ে বসেছে।

খানিকক্ষণ এ দিক ও দিক নিমাই এর খোঁজ করলে, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে পোশাকের ঘরে এল, সেখানেও নিমাই নেই। মধুসূদন বাক্স থেকে পোশাক আর চুল খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখছে। কাল রাত্রে সবলা ওই সবুজ শাড়িটা পরেছিল, আর নিমাই ওই মুকুটটা।

একজনকে জিজ্ঞেস করলে, 'নিমাইবাবু কোথায় বলতে পারেন?'

লোকটা কী কাজে ব্যস্ত ছিল, বললে, 'জানি না।'

চট করে একটা কথা সবলার মনে পড়ে গেল,— বোধ হয় নিমাই পালিয়েছে। নিমাই ওকে বলেছিল, যদি সবলাকে শেষ পর্যন্ত না নামায়, তবে ও বেঁকে বসবে, পালিয়ে যাবে, পারের কাছে নৌকো এনে ডুবিয়ে মারবে।

ঠিক তাই। সবলাকে নামাবে না জেনে অভিমানে বেদনায় নিমাই বিবাগী হয়েছে।

সবলার মনে বল এল, —ধর্মের জয় আছেই। এই প্রবঞ্চকদের সমুচিত শাস্তি দরকার! বেশ হবে। নিমাই না থাকলে থিয়েটারই হতে পাবে না, হিরণকুমারের পার্টে আর কেউ তৈরি নেই।

নিমাই-এর প্রতি শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় সবলার মন ভরে ওঠে।

সবলা বিমর্ষ মুখে থিয়েটার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। বাবলা গাছটার তলায় বসে ও চোখের জল আর চেপে রাখতে পারে না। জীবনে ঢের কেঁদেছে, এর চেয়ে ঢের বড়ো বেদনায়; কিন্তু আজকের মতো নিজেকে কোনোদিন এমন ব্যর্থ মনে করেনি। ওর চোখের থেকে দিনের আলো যেন কে শুষে নিয়েছে।

কিন্তু নিমাইকে আজ ওর চাই— একান্ত করে চাই। এ সংসারে ও-ই সরলার একমাত্র বন্ধু, খালি ওকেই

সরলার অপমান স্পর্শ করেছে। নিমাইকে আজ সরলা তার ছোটো ঘরটিতে নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর নাগালের থেকে আড়াল করে রাখবে।

নিমাইকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে! বাজার, গাড়ির আড্ডা, অলি গলি কোথাও নিমাই নেই। নিমাই নেই। নিমাই দেশ-ছাড়া হয়নি তো!

হঠাৎ মনে হল, নিমাই হয়তো ওরই বাড়ি গিয়ে বসে আছে, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য। সরলার সমস্ত শরীর আনন্দে শিউরে উঠল।

সরলা তখুনি বাড়ি গেল। রোদ তখন বেশ চড়া হয়েছে। সরলার ঘরে কেউ আসেনি, কেউ ওর খোঁজও করেনি।

বাড়িউলি ঠাট্টা করে, 'আজ যে লোকের ওপর ভারি দবদ--'

ভূতি তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, সরলার চেহারা দেখে থমকে যায়। বলে, 'তোর কী হয়েছে, সরলা? কাঁদছিস কেন?'

সরলা বলে, 'এই মাত্র পার্ট করে আসছি। আমার যে কাঁদবারই পার্ট।'

মুখে টেনকো হাসি ফুটোবার চেষ্টা করে বলে, 'সেই তখন থেকেই কাঁদছি। নিজে কেঁদে পরকে কাঁদাব, -- তাই বড়ো শক্ত রে। হ্যাঁ রে ভূতি, আমার কাছে কেউ আসেনি, - ঢ্যাঙাপনা ফরসাপনা একটি ছেলে, গায়ে ফ্লানেলের পাঞ্জাবি? আসেনি? কেউ না?'

সরলা ভগ্নোৎসাহ হয়ে বলে, 'তবে যাই ফের থেটার বাড়ি। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না — তার-সঙ্গেই আমার পার্ট। তাকে কোথাও না দেখে সবাই ভাবি ভড়কে গেছে। কোথায় যে গেল!'

বলে সরলা ফের বেরিয়ে পড়ল থিয়েটার বাড়ির দিকে।

ভূতি বললে, 'আমাদের পাস কই সরলা?'

সরলা বলতে বলতে গেল, 'দরজায় গিয়ে আমার নাম করলেই ছেড়ে দেবে, - ভাবিসনে।'

সেখানে গিয়ে ফের নিমাই এর খোঁজ নিলে. কেউ কিছু জানে না। কিন্তু কারু মুখে লেশমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন নেই। স্বয়ং রমেশবাবুও হাসিমুখে গল্পগুজব করতে করতে তদারক করে বেড়াচ্ছে,— সরলার দিকে চেয়েও দেখছে না।

ঠিক উচিত প্রতিশোধ নেওয়া হবে। হিরণকুমার মালতীর অপমান সইতে পারেনি, তার দণ্ড দিয়ে গেছে।

একজন বললে, 'নিমাই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়িতে বাড়িতে উঁচু ক্লাসের টিকিট বেচতে গেছে।'

টিকিট বেচতে গেছে? অসম্ভব!

অসম্ভবই বা কেন? হয়ত এই অন্যায় পরিবর্তনের খবর এখনো নিমাই-এর কানে ওঠেনি। তাই সরলার অভিনয় সবাইকে দেখাবার জন্য টিকিট বেচতে নিমাই-এর এত আগ্রহ। নইলে নিজে গা করে টিকিট বেচবার মতো ছেলেই নয় সে।

সরলা যেন নিমাই-এর মনের সমস্ত গলি ঘুঁজি চিনে ফেলেছে।

চলল ফের শহরের দিকে। যদি রাস্তায় দেখা হয়।

ক্ষুধায় শরীর টা টা করছে, — সরলার হুঁশ নেই। ও এই অবিচারের প্রতিবিধান চায়— যে তার প্রেমিক, যে তার সর্বস্ব— তার কাছে।

কোথাও নিমাই-এর দেখা নেই। যদি গেলই, সরলাকে কেন সঙ্গে নিয়ে গেল না?

•

সন্ধ্যা হতে না হতেই হরি আর তার মা সরলাদের বাড়ি এসেছে।

হরি বললে, 'আমাদের জন্য পাস রেখে গেছে, ভূতি দি?'

হরি নতুন জামা-কাপড় পরে এসেছে, হাতে একটা খেলনা রিস্ট-ওয়াচ্ বাঁধা, মাথায় দিব্যি টেড়ি-বাগানো। হরির মা-ও কাপড় কেচে শুকিয়ে পরে এসেছে।

ভূতি বললে, 'পাস রেখে যায়নি। বলেছে, টিকিট নিতে দরজায় যে থাকবে তাকে সরলার নাম করলেই বসবার জায়গা করে দেবে।'

হরি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তবে আগে-ভাগে চলো ভূতি দি, জায়গা পাওয়া যাবে না। বেজায় ভিড় হয়ে যাবে। আর কাপড় বাছতে হবে না, একখানা এমনি পরে চলো।'

ভূতি ধমক দিয়ে উঠল, 'এখনো আরম্ভ হতে দু ঘণ্টা বাকি—'

ভূতিও তার সাধ্যমতো সেজে নিল। তিনজনে বেরিয়ে পড়ল, — হরি আগে-আগে, লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাত দুলিয়ে-দুলিয়ে। পথঘাট ওর নখদর্পণে।

দারুণ শোরগোল, লোকে গিসগিস করছে। বগলাবাবুর ভবিষ্যদ্‌বাণী আংশিক রূপেও সফল হয়নি। হরি বললে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে ভূতি দি। জায়গা পেলে হয়। মেয়েমানুষগুলো চলতেই পারে না, কাপড় পরতেই তিন-ঘণ্টা।'

থিয়েটার আরম্ভ হতে এখনো কিছু দেরি আছে। হরি দরজার সামনের লোকটিকে গিয়ে গম্ভীরভাবে বেমালুম বললে, 'সরলা দিকে ডেকে দাও তো?'

লোকটি বললে, 'কে সরলা দি?'

হরি অবাক হবার ভান করে বললে, 'কে সরলা-দি? বাঃ — তুমি নতুন লোক বুঝি? সরলা-দি, যে অ্যাক্টো করছে, কাগজে কাগজে যার ছবি উঠেছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সেই যে একটা মরা মানুষ খুন করতে ছুরি নিয়ে ছুটেছে — সেই সরলা-দি!'

ভূতি বুঝিয়ে বলে, 'এই নাটকে মালতীর পার্ট নিয়ে যে নামবে আজ।'

লোকটি বিরক্ত হয়ে বললে, 'সরলা ফরলা বলে এখানে কেউ নেই। মালতীর পার্টে যে নামছে তার নাম চমৎকারিণী দাসী। সরলা আবার কে?'

'বাঃ, আমাদের বলেছে গেটে এসে তার নাম বললেই আমাদের ছেড়ে দেবে, ভেতরে জায়গা করে দেবে, তার নাম সবাইর মুখে মুখে।'

লোকটি বললে, 'তোমাদের সরলা দিটি ভারি শৌখিন দেখছি। যাও, জায়গা ছাড়ো, অন্য লোকদের পথ করে দাও।'

হরি বিমর্ষ হয়ে বললে, 'ঢুকতে দেবে না? দেখো না ভেতরে গিয়ে, সরলা দি বসে আছে, হয়তো সাজছে। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, ভদ্রলোক, আমাদের ছেড়ে দাও।'

ভদ্রলোক কথা গ্রাহ্য করে না।

ওদিকে ঘণ্টা পড়ে, সিন ওঠে, অ্যাকটিং শুরু হয়।

হরি এবার গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে। হরির মা বলে, 'কী দারুণ মিথ্যুক এই ছুঁচো হারামজাদি,— কী ভীষণ চালবাজ। এ যে ধাপ্পাবাজ ডাকাত বাবা, — একে পুলিশে দিতে হয়।'

ভূতি দুম দুম করে পা ফেলতে ফেলতে বলে, 'ফিরুক ও বাড়ি। ওর দেমাক আমি ভাঙচি অটলবাবুকে দিয়ে।'

হরি কিছুতেই আসবে না, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে ও কী দেখছে, ও-ই জানে। মা যত টানে ও ততই বেড়া আঁকড়ে থাকে। শেষে মার হাতের চার পাঁচটা কিল খেয়ে হরি হেরে যায়। হরির চিৎকারে বাইরের অন্ধকার বিদীর্ণ হতে থাকে।

সরলা আরেক প্রতিবেশিনীর ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল, যখন ঘুম ভাঙে তখন থিয়েটার আরম্ভ হবার সময় কাবার হয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই এখনো নিমাই ফেরেনি— রমেশবাবুর উদ্বেগ অশান্তির সীমা নেই। চমৎকারিণী খুব জব্দ হয়েছে। কৃতার্থের ফুটুনি ঘুচেছে। খুব মজা। নিশ্চয়ই থিয়েটার আর হয়নি, লোকেরা খুব গালাগাল করছে, রমেশবাবুকে বাধ্য হয়ে পয়সা ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

মজা দেখতেই হয়তো সরলা ও-দিকে পা চালাল। কিন্তু একটু কাছে আসতেই ওর সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে ভারি শীত করলে লাগল, এত শীতেও পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে এল। দূরে ডে-লাইট দেখা যাচ্ছে। থিয়েটার হচ্ছে বইকী।

সরলা গেল এগিয়ে। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ছুটে গিয়ে দরজার লোকটিকে বললে, 'নিমাইবাবু এসেছেন?'

'সে কখন—'

'তাকে একটু ডেকে দিতে পারেন?'

'বাঃ, এই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হচ্ছে। উনি অ্যাক্ট করছেন যে—'

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য! সবলার চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল। সমস্ত দৃশ্যটি সবলার মুখস্থ। সেই সব কথাগুলি নিমাইকে আবার চমৎকারিণী বলছে— সবলা যা বলেছিল আগে! কণ্ঠস্বরে সেই আবেগ, স্পর্শে সেই উত্তাপ! তার মনের কথাগুলি যা বইয়ের আখরে সবলার অজানতে প্রকাশ পেয়েছিল, তা চমৎকারিণীর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে!

তবু নিমাই বলেছিল— তোমাকে পেয়ে সবলা, আমার মনে ভাবের জোয়ার আসে তোমাকে না নামালে আমি ওদের ডুবিয়ে মারব।

ঈর্ষার অভিমানে কেঁদে সবলা ধুলার সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

কানে কিছুই আসে না বটে, কিন্তু সবলা চোখের সামনে সমস্ত হাব ভাব আঁকা দেখতে পায়। সেই মোটা বটে চমৎকারিণী তার মৃত নিমাইকে কোলে নিয়ে আদর করবে ভেবে সবলা নিজে নিজের চুল ছেঁড়ে, হাত কামড়ায়, কপালে করাঘাত করে।

ইচ্ছা করে একটা ক্ষুধিত আর্তনাদের মতো স্টেজের ওপর গিয়ে ফেটে পড়ে। বিকট চিৎকার করে অভিনয়ের সমস্ত লজ্জা ঢেকে দেয়।

ক্ষুধায় সমস্ত গা অবশ, নিমাই এর খোঁজে হেঁটে হেঁটে পা একেবারে ভেঙে পড়তে চাইছে।

আস্তে আস্তে থিয়েটার ভেঙে যায়। কোলাহল করতে করতে লোক সরে পড়তে থাকে। ততক্ষণ সবলা ন্যাপার মুড়ি দিয়ে চুপ করে বসে থাকে

সবাই চমৎকারিণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বাড়ি ফেরে। প্রত্যেকটি কথা সবলার কানে আসে।

'খুনের সিনটা কী রকম করলে! ওয়ান্ডারফুল!'

'কী সুন্দর! অথচ কী ভীষণ! ভয় লাগে, ভালোও লাগে! পয়সা সার্থক, ভাই।'

সবলা আর বসে না, বাড়ি চলে। চলতে আর পারে না, কেঁদে-কেঁদে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

নিঝুম পাড়া সবাই ঘুমিয়েছে! ভূতিও হয়তো। সদর খোলা ছিল।

ওর ঘরে এসে দেখে মিটমিট আলো জ্বলছে। ভেতরে অটল একা বসে মদ খাচ্ছে। সবলার সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে এল।

অটল তখনো বেহুঁশ হয়ে পড়েনি, সবলাকে দেখেই ওর রক্ত ফুটে উঠল। হাতের মুঠিতে ধরা ছিল মদের গ্লাসটা তাই মারল ছুঁড়ে সবলার মাথা লক্ষ্য করে।

বললে, 'শালির আমার থেটার করা হচ্ছে। তিন দিন ধরে ঘুরে-ঘুরে আমি হয়রান হয়ে পড়েছি- -'

সবলা 'বাবা গো' বলে ঘুরে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

এতেও অটলের তৃপ্তি হয় না, জুতোটা দিয়ে সবলার পিঠের খাল ছিঁড়ে দেয়। বলে, 'বলে কিনা থেটারের দলে ভিড়ে যাব, মদের দাম দেবে না, বাড়ির বেলা বাড়ি আসার নাম নেই'

বলে আর লাথি জুতো চলতে থাকে।

সবলা অটলের পায়ের নীচে পড়ে একেবারে ভেঙে গেছে। বাড়িউলি প্রথম মনে-মনে মজা দেখে, পরে অটলকে থামাতে আসে। ভূতিই মাথায় ব্যান্ডেজ করে দেয়।

ভোরবেলা সবলার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সারা গায়ে বিষম ব্যথা, জ্বর, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে— যেন সারা বছর ও কিছু খায়নি। পায়ের কাছে জানলা দিয়ে সূর্যোদয় দেখা যাচ্ছে।

এত দুঃখেও ওর স্বপ্ন কাটেনি। ভোরের আলোয় মনে হচ্ছে যেন ওর কাছে ওর হিরণকুমার আসছে— মাথায় তার সোনার মুকুট, তাতে পাখির পালক গোঁজা।



মহানগর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমার সঙ্গে চলো মহানগরে, যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে আর চূড়ায় আর অভ্রভেদী প্রাসাদ শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।

আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে পথ জটিল, দুর্বল মানুষের জীবনধারার মতো যে পথ অন্ধকার মানুষের মনের অরণ্যের মতো, আর যে পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মতো।

এ মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত, ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত।

তার পটভূমিতে যন্ত্রের নির্ঘোষ, উর্ধ্বমুখ কলের শঙ্খনাদ সমস্ত পথের সমস্ত চাকার ঘর্ঘর, শিকলের ঝনৎকার ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের আর্তনাদ। শব্দের এই পটভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বিসর্পিল সুরের পথ, প্রিয়ার মতো যে নদী শুয়ে আছে মহানগরের কোলে তার জলের ঢেউয়ের সুর, আর নগরের ছায়াবীথির ওপর দিয়ে যে হাওয়া বয় তার, নির্জন ঘরে প্রেমিকেরা অর্ধস্ফুট যে কথা বলে তারো। সে সংগীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি, শব্দের বন্যার মতো, আর থাকবে ক্লান্ত পথিকের পথের ওপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ, মধ্যরাতে যে পথিক চলেছে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে।

কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমে লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সূচীচিত্র। যেখানে কেউ যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে, উঠছে জড়িয়ে নতুন সুতোর সঙ্গে অকস্মাৎ — সহসা যাচ্ছে ছিঁড়ে সেই বিশাল দুর্বোধ চিত্রের অনুবাদ থাকবে সে সংগীতে।

এ সংগীত রচনা করার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনির সমুদ্রের দু'একটি ঢেউ, মহাসংগীতের স্বাদ তাতে মিলবে না,— তৃষ্ণা তাতে মেটবার নয়, জানি।

সঙ্কুচিত আড়ষ্টভাবে নদীর যে শাখাটি ঢুকেছে নগরের ভেতর, তারই অগভীর জলের মন্থর স্রোতে ভেসে আমরা গিয়ে উঠব নড়ালের পোলের তলায় ফুটন্ত কদমগাছের নিশান দেওয়া সেই পুরনো পোনাঘাটে। আমরা পেরিয়ে যাব পুরনো সব ভাঙা ঘাট, পেরিয়ে যাব ন্যাড়াশিবের মন্দির, পেরিয়ে যাব ইটখোলা আর চালের আড়ত আর পাঁজা করা টালি ও ইট আর সুরকি বালির গাদা। আমরা চলেছি পোনার নৌকায়। আমাদের নৌকার খোলে টই টম্বুর জল আর তাতে কিলবিল করছে মাছের ছানা। সেই পোনার চারা বিক্রি হবে কুনকে হিসেবে পোনাঘাটে।

আষাঢ় মাসের ভোরবেলা। বৃষ্টি নেই, কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। সূর্য হয়তো উঠেছে পুবের বাঁকা নগর শিখর রেখার পেছনে, আমরা পেয়েছি মাত্র মেঘ থেকে চোয়ান স্তিমিত একটু আলো। সে আলোয় এ দিকের দারিদ্র শহরতলিকে আরো যেন জীর্ণ দেখাচ্ছে। ভাঙাঘাটে এখনও স্নানে বড়ো কেউ আসেনি, গোলাগুলি ফাঁকা ধানের আড়তের ধারে শূন্য সব শালতি বাঁধা। সব খাঁ খাঁ করছে।

জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে নৌকা। মাঝিরা বড়ো নদীতে বরাবর এসেছিল দাঁড় টেনে। এখন তার ছইয়ের ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। শুধু হালে বসে আছে মুকুন্দ, আর তার কাছে কখন থেকে চুপটি করে গিয়ে বসেছে যে রতন তা কেউ জানে না, - - সেই বুঝি রাত না পোহাতেই। নৌকা তখন মাঝনদীতে। বাদলা রাতে আকাশে নেই তারা। রতনের মনে হয়েছে সব তারা যেন নেমেছে জলের ওপর, নদী তখন মহানগরের নাগাল পেয়েছে, দুধারে জাহাজ আর স্টিমার, গাধাবোট আর বড়ো বড়ো কারখানার সব জেটি। অন্ধকারে তাদের কপ

দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু গায়ে আলোর ফোটা, অগুন্তি ফোঁটা, কালো জলের এপার থেকে ওপারে। মেঘলা আকাশ ছেড়ে তারারাই তো নেমেছে নদীর ওপর।

রতন ভয়ে ভয়ে এসে বসেছে নিঃসাড়ে হালের কাছে। কে জানে বাবা বকবে কিনা? হয়তো ধমকে আবার দেবে পাঠিয়ে ছইয়ের ভেতর। কিন্তু সে কি থাকতে পারে এমন সময় ছইয়ের ভেতর, - - নৌকা যখন পেয়েছে মহানগরের নাগাল, আকাশের তারা যখন জলের ওপর নেমেছে! তার যে কতদিনের সাধ, কতদিনের স্বপ্ন! রতন দু-চোখ দিয়ে পান করেছে আলো ছিটান এই নগরের অন্ধকার আর নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলেছে সাবধানে, পাছে বাবা টের পায়, পাছে দেয় তাকে ধমকে ভেতরে পাঠিয়ে। কিছুই তো বিশ্বাস নেই। বাবা তো তাকে আনতেই চায়নি বাড়ি থেকে। ছেলেমানুষ আবার শহরে যায় নাকি! আর নৌকায় এতখানি পথ যাওয়া কি সোজা কথা! কী করবে সে সেখানে গিয়ে? কত কাকুতি মিনতি করে, কেঁদেকেটে, না, রতন শেষ পর্যন্ত বাবাকে নিমরাজি করিয়েছে। তবু নৌকোয় তুলে বাবা তাকে শাসিয়ে দিয়েছে, খবরদার, পথে দুষ্টুমি করলে আর রক্ষা থাকবে না। না, দুষ্টুমি সে করবে না, কাউকে বিরক্তও না। তাকে যা বলা হবে তাই করতে সে রাজি। সে শুধু একবার শহর দেখতে চায়- - রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কিন্তু শুধু তাই জানে। কি শহরে আসবার এই ব্যাকুলতা রতনের? আচ্ছা সে কথা এখন থাক।

কিন্তু রতনকে কেউ লক্ষ করে না কিম্বা লক্ষ করেও কেয়ার করে না। রতন বসে আছে নিঃসাড়ে, শুধু সমস্ত শরীর রেখায় ফুটে উঠেছে তার ব্যগ্রতার প্রখরতা।

ধীরে ধীরে অন্ধকার এল ফিকে হয়ে। এবার নদী রূপে রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রথম ছিল চারিধারে আবছা কুয়াশা। প্রকৃতির পটের ওপর যেন রঙের এলোমেলো ছোপ, কোথাও একটু ঘন কোথাও হালকা, সে রঙের ছাপ এখনও নির্দিষ্ট রূপ নেয়নি। নীহারিকার মতো আকারহীন সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে তরল তা থেকে রতনের চোখের ওপরেই কে যেন এইমাত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে তুলছে। আকাশের গায়ে কালো খানিকটা তুলির পোঁচ দেখতে দেখতে হয়ে উঠল প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, তার জটিল মাস্তুলগুলি উঠেছে ছোটোখাটো অরণ্যের মতো মেঘলা আকাশে, তার নোঙরের শেকল নেমেছে অতিকায় অজগরের মতো জলের ভেতর। রতনদের নৌকা যে দানবের ভ্রূকুটির তলা দিয়ে ভয়ে ভয়ে পার হয়ে যায় ছোটো সোলার খেলনার মতো। জলের আরেক ধারে বিছান ছিল খানিকটা তরল গাঢ় রঙের কয়াশা। সে কুয়াশা জমাট বেঁধে হয়ে গেল অনেকগুলো গাধাবোটের দেল একটি জেটির চারিধারে তারা ভিড় করে আছে। দূর থেকে মনে হয় ওরা যেন কোনো বিশাল জলচরের শাবক — মায়ের কোল ঘেঁসে তাল পাকিয়ে আছে ঘুমিয়ে। নদীর ওপরকার পর্দা আরো গেল সরে। কলকারখানার বিশাল সব দেহ উঠল জেগে নদীর দুপারে। জলের ওপর তাদের লৌহবাহু তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঁধান পাড় থেকে বড়ো বড়ো ক্রেন উঠেছে গলা বাড়িয়ে, দুই তীরে সদাগরি জাহাজের আশেপাশে জেলেডিঙি আর খেয়া নৌকো স্টিমার আর লঞ্চ ভিড় করে আছে। এই মহানগর! ভয়ে বিস্ময়ে ব্যাকুলতায় অভিভূত হয়ে রতন প্রথম তার রূপ দেখলে।

তারপর তাদের নৌকা বাঁক নিয়ে ঢুকেছে এই শাখার ভেতর চলেছে পুরোনো শহরতলির ভেতর দিয়ে, বড়ো নদীতে মহানগরের রূপ দেখে রতন সত্যি ভয় পেয়েছিল। হতাশ হয়েছিল আরো বেশি। কিন্তু এই পুরোনো জীর্ণ শহরগুলি দেখে তার যেন একটু আশা হয়। কেন আশা হয়? আচ্ছা সে কথা এখন থাক।

নদীর আরেকটা বাঁক ঘুরেই দেখা যায় নড়ালের পোল। আগে থাকতে পোনার সব নৌকা এসে উঠেছে পোনাঘাটে। মুকুন্দ হাঁক দিয়ে এবার সবাইকে তোলে। লক্ষ্মণ উঠে তার কুনকে ঠিক করে। মাঝিরা গা মোড়া দিয়ে ওঠে। আর রতন বসে থাকে উত্তেজনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে। তার চাপা দুটি পাতলা ছোটো ঠোঁটের নীচে কী সঙ্কল্প আছে জানে কি কেউ? বড়ো বড়ো দুটি চোখে তার কীসের ব্যগ্রতা? শুধু শহর দেখার কৌতূহল তো এ নয়! কিন্তু সে কথা এখানে থাক।

পোনাঘাটে নৌকা লাগে। পোনাঘাটে আর জায়গা কই দাঁড়াবার। এরই মধ্যে মাটির হাঁড়ি দুধারে ঝুলিয়ে ভারীরা এসেছে দূর-দূরান্তর থেকে পোনার চারা নিয়ে যেতে। তাদের ভিড়ের ভেতর পাড়ের কাদার ওপর কারা দোকান পেতে বসেছে পান, বিড়ি আর তেলেভাজা খাবারের। সরকারি লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পাওনা আদায় করতে। দালালেরা ঘুরছে হাঁকডাক করে।

পাড়ে আর জায়গা নেই, তবু মুকুন্দ দাসের খাস নৌকার একটু নোঙর ফেলবার ঠাঁই মেলে। মুকুন্দ তো আর যে-সে লোক নয়। বর্ষার কটা মাসে তার গোটা ছয়েক পোনার নৌকা আনাগোনা করে এই পথে।

মাঝিরা এর মধ্যেই নৌকার খোল থেকে জল ছেঁচে ফেলতে শুরু করেছে একটু-আধটু। লক্ষ্মণ কুনকে পরখ করছে — মাছ মেপে দেবার সময় খানিকটা জল রেখে হাতসাফাই করতে সে ওস্তাদ। মুকুন্দ দাস নৌকো থেকে জলে নেমে ডাঙায় ওঠে। পেছন দিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় ধমক দিয়ে বলে, "তুই নামলি যে বড়ো!"

রতন বাবার দিকে কাতরভাবে তাকায়। মুকুন্দ একটু নরম হয়ে বলে, "আচ্ছা কোথাও যাসনি যেন, ওই কদমগাছের তলায় দাঁড়াগে যা।"

রতন তাই করে, কদমগাছ থেকে অসংখ্য ফোটা ফুল ঝরে পড়েছে মাটিতে। কাদায় মানুষের পায়ের চাপে রেণুগুলো থেঁতলে নোংরা হয়ে গেছে। পোনা চারার হাটে কদমফুলের কদর নেই!

রতনের চারিধারে হট্টগোল।

"চাপড়াও না হে, নইলে বাড়ি গিয়ে মাছচচ্চড়ি খেতে হবে যে।"

"একটা নতুন হাঁড়িও জোটেনি' ভাতের তিজেলটাই এনেছ বুঝি টেনে। তারপর মাছ যখন ঘেমে উঠবে তখন হবে দালাল বেটার দোষ।"

ভারীরা কেউ এসেছে খালি হাঁড়ি নিয়ে, কারুর কেনা প্রায় সাঙ্গ হল। বসে বসে তারা হাঁড়ির জল চাপড়ায়, মরা মাছ ছেঁকে ফেলে। নদীব ধারের কাদায় মরা মাছ আর কদমরেণু মিশে গেছে। রতন কিন্তু কদমতলায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে না। এখানে থাকবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করে সে তো শহরে আসেনি। সারা পথ সে মনের কথা মনেই চেপে এসেছে, মুখ ফুটে একবার বুঝি লক্ষ্মণকে গোপনে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল, "হ্যাঁ কাকা, পোনাঘাটেব কাছেই উল্টোডিঙি না?"

লক্ষ্মণ বাঁকা হেসে বলেছে, "দূর পাগলা, উল্টোডিঙি কি সেথা? সে হল কত দূর!" তার পর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, "কেন রে, উল্টোডিঙির খোঁজ কেন? উল্টোডিঙি তুই শুনলি কোথা?"

কিন্তু রতন তারপর একেবারে চুপ। আর তার পেটের কথা বার করে কার সাধ্য।

কদমতলায় দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে রতন চারিদিকে তাকায়। তার বাবা কাজে ব্যস্ত, রতনের দিকে তাকাবার তাব সময় নেই। সুবিধে বুঝে ক'পা ক'পা করে রতন এক সময়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এখানে তার সাহস হয় না। একটা দিক খেয়ালমতো ধরে সে এগিয়ে যায়।

মহানগরের বিশাল অরণ্যে কত মানুষ আসে কত কিছুর খোঁজে — কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বা বিস্মৃতি। মৃত্তিকার স্নেহের মতো শ্যামল একটি অসহায় ছেলে সেখানে এসেছে কীসের খোঁজে? এই অরণ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষিতকে সে খুঁজে পাবার আশা রাখে — তার দুঃসাহস তো কম নয়!

অনেক দূর গিয়ে রতন সাহস করে একজনকে পথ জিজ্ঞাসা করে। লোকটি অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়, বলে "এ তো উল্টোদিকে এসেছ ভাই, উল্টোডিঙি ওই দিকে, আর সেতো অনেক দূর!'

– অনেক দূর' তা হোক, অনেক দূরকে রতন ভয় করে না। রতন অন্য দিকে ফেরে। লোকটি কী ভেবে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি একলা যাচ্ছ অত দূর! তোমার সঙ্গে কেউ নেই?"

রতন সঙ্কুচিতভাবে বলে, "না।"

লোকটির কী মনে হয়, একটু শক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করে, "বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছ না তো? উল্টোডিঙিতে কার কাছে যাচ্ছ?"

রতন ভয়ে ভয়ে বলে ফেলে, "সেখানে আমার দিদি থাকে।" তারপর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়। লোকটা যদি আরো কিছু জিজ্ঞাসা করে, যদি ধরে নিয়ে যায় আবার তার বাবার কাছে।

তাহলে এবার বলি। রতন এসেছে দিদিকে খুঁজতে। যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায় না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে খুঁজে বার করবে। শহর মানে দিদি। বাড়িতে থাকতে সে ভেবেছে শহরে গেলেই বুঝি দিদিকে পাওয়া যায়। মহানগরের বিরাট রূপ তার সে ধারণাকে উপহাস করেছে; কিন্তু তবু সে হতাশ হয়নি। দিদিকে খুঁজে সে পাবেই। শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাসের কি সীমা আছে?

কিন্তু দিদিকে খোঁজার কথা তো কাউকে বলতে নেই। দিদির নাম করাও যে বাড়িতে মানা তা কি সে জানে

না। কেন যে মানা তা অবশ্য সে বুঝতে পারে না। কিন্তু অনুচ্চারিত কোনো নিষেধ তার শিশু-মনের ব্যাকুলতাকে মূক করে রেখে দেয়।

তাই সে সারা পথ এসেছে মনের কথা মনে চেপে। তাই সে একা বেরিয়েছে দিদির সন্ধানে।

দিদিকে যে তার খুঁজে বার করতেই হবে। দিদি না হলে তার যে কিছু ভালো লাগে না। ছেলেবেলা থেকে সে তো মাকে দেখেনি, জেনেছে শুধু দিদিকে। দিদি তার মা, দিদিই তার খেলার সাথী। বিয়ে হয়ে দিদি গেছল শ্বশুরবাড়ি। তবুও তাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। কাছাকাছি দুটি গাঁ, রতন নিজেই যখন-তখন পালিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে দিদির কাছে। তারপর দিদির কাছ থেকে তাকে নিয়ে আসা সোজা ব্যাপার নয়। দিদি যেখানে থাকতে পারে দিনের পর দিন, সেখানে তার বেশি দিন থাকা কেন যে দোষের তা সে কেমন করে বুঝবে।

তারপর কী যে হল কে জানে। একদিন তাদের বাড়িতে বিষম গণ্ডগোল। দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে ভিড় করে, ভিড় করে এসেছে গাঁয়ের লোক। থানা থেকে চৌকিদার পর্যন্ত এসেছে। ছেলেমানুষ বলে তাকে কেউ কাছে ঘেঁসতে দেয় না। তবু সে শুনেছে — দিদিকে কারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে। শুনে সে অবাক হয়ে গেছে — গেলই বা দিদিকে ধরে নিয়ে — তাকে আবার কেড়ে আনলেই তো হয়। কেন যে কেউ যাচ্ছে না তাই ভেবে তার রাগ হয়েছে। তারপর সে আরো কিছু শুনেছে; শিশুর মন অনেক বেশি সজাগ। দিদিকে কোথায় ধরে নিয়ে গেছে কেউ নাকি জানে না।

এইবার সে কেঁদেছে। কে জানে কারা নিয়ে গেছে দিদিকে ধরে! তারা হয়তো দিদিকে মারছে, হয়তো দিচ্ছে না খেতে। দিদি হয়তো রতনকে দেখবার জন্যে কাঁদছে। এ কথা ভেবে তার যেন আরো কান্না পায়।

বাবা তাকে আদর করেছেন কান্না দেখে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন, "কান্না কেন বাবা?"

চুপি চুপি রতন বলেছে, "দিদি যে আসছে না বাবা।"

মুকুন্দ শিশুর সজাগ মনের রহস্য না জেনে বলেছে, "আসবে বইকি বাবা, শ্বশুরবাড়ি থেকে কি রোজ রোজ আসতে আছে?"

রতন আর কিছু বলেনি। কিন্তু বাবা তার কাছে কেন লুকোতে চান বুঝতে না পেরে তার অত্যন্ত ভয় হয়েছে।

তারপর একদিন সে শুনেছে যে দিদিকে নাকি পাওয়া গেছে। দারোগাসাহেব পুলিশ নিয়ে গিয়ে তাকে নাকি কোন দূর দেশ থেকে খুঁজে বার করেছেন। দিদিকে খুঁজে পাওয়া গেছে। রতনের আনন্দ আর ধরে না। দিদি এতদিন বাদে তাহলে আসছে।

কিন্তু কোথায় দিদি! একদিন দুদিন ব্যাকুলভাবে রতন অপেক্ষা করে, কিন্তু দিদি আসে না। দিদিকে ফিরে পাওয়া গেছে তবু দিদি কেন আসে না রতন বুঝতে পারে না। দিদির ওপর তার রাগ হয়। কতদিন রতন তাকে দেখেনি তা কি তার মনে নেই! দিদি নিজে চলে আসতে পারে না? আর বাবাই বা কেমন, দিদিকে নিয়ে আসছে না কেন! রতনের সকলের ওপর অভিমান হয়েছে।

হয়তো দিদি চুপি চুপি শ্বশুরবাড়ি গেছে ভেবে একদিন সকালে রতন সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু সেখানে তো দিদি নেই। সেখানে কেউ তার সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত কয় না; দাদাবাবু তাকে দেখতে পেয়েও দূর থেকে না ডেকে চলে যান। মুখখানি কাঁদ কাঁদ করে রতন সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছে।

ফিরে এসে বাবার কাছে কেঁদে সে আবদার করেছে, "দিদিকে আনছ না কেন বাবা?"

সেই দিন মুকুন্দ তাকে ধমকে দিয়েছে।

তারপর থেকে দিদি আর আসেনি। দিদি নাকি আর আসবে না।

কিন্তু রতন মনে মনে জানে তাকে কেউ ডাকতে যায়নি বলেই অভিমান করে দিদি আসেনি।

রতন যে জানে না দিদি কোথায় থাকে, না হলে সে নিজেই গিয়ে দিদিকে ডেকে আনত।

কিন্তু কেমন করে সে জানবে দিদি কোথায় আছে! কেউ যে তাকে দিদির কথা বলে না। দিদির কথাই বলতে নেই। রাত্রে সে চুপি চুপি শুধু দিদির জন্যে কাঁদে, দিদি কেমন করে তাকে ভুলে আছে ভেবে সে মনে মনে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। দিদি কোথায় থাকে সে জানে না।

কিন্তু শিশুর মন আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশি সজাগ।

শিশু অনেক কিছু শুনতে পায়, অনেক কিছু বোঝে। কোথা থেকে সে শুনেছে কে জানে যে, দিদি থাকে

শহরে, রূপকথার চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কোথা থেকে কার মুখে শুনেছে — উল্টোডিঙির নাম। বাতাসে কথা ভেসে ভেসে আসে। বিনিদ্র ভালোবাসা কান পেতে থাকে, শুনতে পায়।

তাই সে কাকুতি মিনতি করে এসেছে মহানগরে, তাই সে চলেছে সন্ধানে।

দিদিকে সে খুঁজে বার করবে, সে জানে দিদির সামনে একবার গিয়ে দাঁড়ালে সে আর না এসে থাকতে কিছুতেই পারবে না। এমনি তার গভীর বিশ্বাস।

রতনকে আমরা এইখানে ছেড়ে দিতে পারি। মহানগরে অনেকেই আসে, অনেক কিছু খোঁজে — কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি, কেউ আরো বড়ো কিছু। সবাই কি সব পায়? পথের অরণ্যে তারা হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন দেয় মুছে। রতনও তেমনি যাবে হারিয়ে ভেবে আমরা তাকে ছেড়ে দিতে পারি।

কিন্তু তা যাবে না। পৃথিবীতে কী সম্ভব কী অসম্ভব কে বলতে পারে? রতন সত্যি দিদির খোঁজ পায়। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে। আষাঢ় মাসের আকাশ মেঘে ঢাকা বলে বেলা বোঝা যায় না। ক্লান্তপদে শুকনো কাতর মুখে একটি ছেলে গিয়ে দাঁড়ায় খোলায় ছাওয়া একটি মেটে বাড়ির দরজায়। একটি মেয়ে তাকে রাস্তা থেকে এনেছে সঙ্গে করে।

রতন অনেক পথ ঘুরেছে, অনেককে জিজ্ঞাসা করেছে পথ, শেষে সে সন্ধান পেয়েছে। ভালোবাসা কী না পারে।

খানিক আগে হয়রান হয়ে খোঁজ করতে করতে রতন দূরে একটি মেয়েকে দেখতে পায়, উৎসাহভরে সে চিৎকার করে ডাকে, "দিদি।"

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াতেই রতন হতাশ হয়ে যায়। তার দিদি তো অমন নয়। কুণ্ঠিতভাবে সে অন্য দিকে চলে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটি তাকে ডেকে বলে, "শোনো।"

কাছে গেলে তার ক্লান্ত শুকনো মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে খুঁজছ ভাই?'

রতন লজ্জিত ভাবে তার দিদির নাম বলে। মেয়েটি হেসে বলে, "তোমার দিদির বাড়ি বুঝি চেন না? চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মেটে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এখন মেয়েটি ডাকে, "ও চপলা, তোকে খুঁজতে কে এসেছে দেখে যা।"

ভেতর থেকে চপলাই বুঝি রুক্ষস্বরে বলে, "কে আবার এল এখন?"

"দেখেই যা না একবার।"

চপলা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। রতনের মুখেও কথা ফোটে না। দিদিকে চিনতেই তার কষ্ট হয়। দিদি যেন কেমন হয়ে গেছে।

দুজনেই খানিকক্ষণ থাকে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। যে মেয়েটি রতনকে সঙ্গে করে এনেছে সে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বলে, "তোর নাম করে খুঁজছিল, তাই তোর ভাই ভেবে বাড়ি দেখাতে নিয়ে এলাম। তোর ভাই নয়?"

উত্তর না দিয়ে চপলা হঠাৎ ছুটে এসে রতনকে বুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে ধরা গলায় বলে, "তুই একা এসেছিস?"

রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে, কিছু বলে না।

মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখনো কখনো পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব কিছুকে দাগী করে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।

চপলা রতনকে ঘরে নিয়ে যায়। সে ঘর দেখে রতন অবাক। মাটির ঘর এমন করে সাজানো হতে পারে, এত সুন্দর জিনিস সেখানে থাকতে পারে রতন তা কেমন করে জানবে? এত জিনিস দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে প্রথম, "এ সব তোমার দিদি!"

চপলার অকারণ চোখের জল তখনও শুকোয়নি, একটু হেসে সে বলে, "হ্যাঁ ভাই।"

কিন্তু দিদির ঘর যেমনই হোক তা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না তো। আসল কথা রতন ভোলেনি। সে হঠাৎ বলে, "তোমায় বাড়ি যেতে হবে দিদি।"

চপলা ম্লান ভাবে এবার বলে, "আচ্ছা যাব ভাই, এখন তো তুই একটু জিরিয়ে নে।"

"কিন্তু জিরিয়ে নিয়েই যেতে হবে। আমাদের নৌকা কাল সকালেই ছাড়বে কিনা! এসব জিনিস কেমন করে নেব দিদি?"

এবার চপলা চুপ করে থাকে।

হঠাৎ কেন বলা যায় না একটু ভীত হয়ে রতন জিজ্ঞাসা করে, "একটু জিরিয়ে নিয়েই যাবে তো দিদি?"

দিদির মুখে তবু কথা নেই। দিদি জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ভাবনাতেই হয়তো রাজি হচ্ছে না ভেবে রতন তাড়াতাড়ি বলে, "এসব জিনিস একটা গোরুর গাড়ি ডেকে তুলে নেব, কেমন দিদি?"

চপলা কাতর মুখে বলে ফেলে, "আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই।"

যাবার উপায় নেই! রতনের মুখের সব দীপ্তি হঠাৎ নিভে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় বাবার রাগ, মনে পড়ে বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত উচ্চারণ নিষেধ। সত্যিই বুঝি দিদির সেখানে যাবার উপায় নেই! বৃথাই এসেছে সে দিদিকে খুঁজতে, দিদিকে খুঁজে পেয়েও তার লাভ নেই।

তারপর হঠাৎ আবার তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, "আমিও তাহলে যাব না দিদি।"

"কোথায় থাকবি?"

"বাঃ তোমার কাছে তো!" বলে রতন হাসে, কিন্তু চপলার মুখ যে আরো ম্লান হয়ে এসেছে তা সে দেখতে পায় না।

তারপর খেয়েদেয়ে সারা বিকাল দুই ভাই-বোনের গল্প হয়। কত কথাই তাদের আছে বলবার, জিজ্ঞাসা করবার। কিন্তু সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসে তত চপলা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। একবার সে বলে, "তুই যে চলে এলি একলা, বাবা হয়তো খুব ভাবছে!"

দিদির প্রতি অবিচারের জন্য বাবার ওপর রতনের একটু রাগই হয়েছে, সে তাচ্ছিল্য করে বলে, "ভাবুক গে।"

খানিক বাদে চপলা আবার বলে, "এখান থেকে নড়ালের পোল অনেকখানি পথ, না রতন?"

রতন এ পথ পার হয়ে তো এসেছে। গর্বভরে বলে, "ওরে বাবা, সে বলে কোথায়?"

"পয়সা নিয়ে তুই ট্রামে করে, না হয় বাসে, যেতে পারিস না?"

"বাঃ আমি কি যাচ্ছি নাকি?" দিদির মুখের দিকে চেয়ে সে থমকে যায়! দিদির চোখে জল।

মাথা নিচু করে চপলা ধরা গলায় বলে, "এখানে যে তোমায় থাকতে নেই ভাই!"

রতন কিছুই বুঝতে পারে না; কিন্তু এবার তার অত্যন্ত অভিমান হয়। দিদি সেখানেও যেতে পারবে না, আবার এখানেও বলবে তাকে থাকতে নেই! আচ্ছা, সে চলেই যাবে। কখখনো, কখখনো আর দিদির নাম করবে না, বাবার মতো। ধীরে ধীরে সে বলে, "আচ্ছা আমি যাব।"

মেঘলা আকাশে একটু আগে থাকতেই আলো এসেছে ম্লান হয়ে। চপলা উঠে তার আলমারি থেকে চারটে টাকা বার করে রতনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, "তুই খাবার খাস।"

চার টাকায় অনেক অনেক পয়সা, তবু আপত্তি করবার কথাও আর রতনের মনে নেই। দিদি যে এক্ষুনি তাকে চলে যেতে বলছে তা বুঝে সে যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে। তার সমস্ত বুক গেছে ভেঙে।

রতন আর ঘরে দাঁড়ায় না, আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে।

দিদির মুখের দিকেও আর না চেয়ে গলি দিয়ে সে সোজা বড়ো রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। মুখের দিকে চাইলেও হয়তো দিদির অবিশ্রান্ত চোখের জলের মানে সে বুঝতে পারত না।

চপলা পেছন থেকে ধরা গলায় বলে, " বাসে করে যাস রতন, হেঁটে যাসনি!"

রতন সে কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে, কিন্তু বড়ো রাস্তার কাছ থেকে হঠাৎ আবার সে ফিরে আসে। তার মুখ আবার গেছে বদলে। এইটুকু পথ যেতে কী সে ভেবেছে কে জানে।

চপলা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে, "বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি! কারুর কথা শুনব না!"

বলেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গি পর্যন্ত সবল, এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই। দেখতে দেখতে গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।



দু'কানকাটা

অন্নদাশঙ্কর রায়

॥ এক ॥

সেই সব সুন্দর ছেলেরা আজ কোথায়, যাদের নিয়ে আমার কৈশোর সুন্দর হয়েছিল? মাঝে মাঝে ভাবি আর মন কেমন করে।

একজনকে মনে পড়ে। তার নাম সুকুমার। গৌরবর্ণ সুঠাম তনু, একটুও অনাবশ্যক মেদ নেই অথচ প্রতি অঙ্গে লালিত্য। চাঁদের পিছনে যেমন রাহু তেমনি চাঁদপানা ছেলেদের পিছনে রাহুর দল ঘুরত। তাদের কামনার ভাষা যেমন অশ্লীল তেমনি স্থূল। তাদের স্থূল হস্তাবলেপে সুকুর গায়ে আঁচড় লাগত। তা দেখে যাদের বুকে বাজত তাদের জনকয়েক মিলে একটা দেহরক্ষা বাহিনী গড়েছিল। আমাদের কাজ ছিল তাকে বাড়ি থেকে ইস্কুল ও ইস্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। আমরা নিঃস্বার্থ ছিলুম না। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। সুকু জানত, তাই আমাদের প্রশ্রয় দিত না। তার দরুন আমার অভিমান ছিল। থাকবে না? রাহুদের একজন আমার ডান হাতে এমন মোচড় দিয়েছিল যে আর একটু হলে হাতটা যেত। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর!

কচিৎ তাকে একা পেতুম। পেলেই আমার বুকভরা মধু তার কানে ঢালতে ব্যগ্র হতুম, কিন্তু তার আগেই সে পাশ কাটিয়ে যেত। সে যে আমার প্রকৃত পরিচয় জানল না, এ কথা ভেবে আমার চোখে জল আসত। সময়ে অসময়ে তাই তাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরতুম। ভিতরে ঢুকতে ভরসা হত না। কারণ সুকু একদিন আমাকে বলেছিল, 'তুই আমাদের বাড়ি অতবার আসিসনে খোকন।'

তখন ঠিক বুঝতে পারিনি কেন এত রূঢ়তা। পরে বুঝেছি ওটা রূঢ়তা নয়। সুকুর বাবা মফসসলে গেলে তার মা'র সঙ্গে তার ঠাকুরমা'র বচসা বাধত। খোঁপা আর এলোচুলের সেই বচসা শুনে পাড়ার লোক জুটত তামাশা দেখতে। এতে সুকুর মাথা কাটা যেত। তার বাবা যখন ফিরতেন মা'র কথায় কান দিতেন না, ঠাকুরমা'র কাহিনি বিশ্বাস করতেন, মাকে দিতেন মার। তা দেখে সুকুর ভাইবোন বাবার পা জড়িয়ে ধরত, কিন্তু সুকু এত লাজুক যে লুকিয়ে কাঁদত। প্রতিদিন মা ঘোষণা করতেন তিনি বাপের বাড়ি যাচ্ছেন, বাক্স বিছানা নিয়ে সত্যি সত্যি বাইরের বারান্দায় দাঁড়াতেন। পাড়ার লোক জড়ো হত তাঁকে দেখতে ও তার সঙ্গে আলাপ করতে। এতে সুকুর বাবার মাথা কাটা যেত, সুকুরও। চাকর এসে বলত, 'মা, একখানাও ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না।' তা শুনে ঝি বলত, 'আর একটা দিন থেকে যাও মা।' সেদিনকার মতো মা যাওয়া মুলতুবি রাখতেন। প্রতি মাসেই এই ব্যাপার। দুজনেই সমান মুখরা, যেমন মা তেমনি ঠাকুমা। একদিন সুকুর মা এমন মার খেলেন যে গাড়ির অভাবে পেছপাও হলেন না, দুনিয়ার লোকের উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন ও পায়ে হেঁটে রেল স্টেশনে গেলেন।

সুকুর ভাইবোন লোকলজ্জায় তার সাথী হল না, কিন্তু সব চেয়ে লাজুক যে সুকু সেই তাঁর হাত ধরে পথ দেখানোর ভার নিল। কাজটা সুকুর মা ভালো করলেন না। সুকুর বাবার মাথা হেঁট হল। তিনি সেই হেঁট মাথায় টোপর পরে শোধ তুললেন। খবরটা যখন সুকুর মা'র কানে পড়ল তিনি কুয়োয় ঝাঁপ দিতে গেলেন। সবাই মিলে তাঁকে ধরে এনে ঘরে বন্ধ করে রাখল। তখন থেকে তিনি নজরবন্দি।

মামারা সুকুকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইস্কুলে যাবার নাম করে সেই যে বেরোত ফিরত রাত করে। কেউ তাকে বকতে সাহস করত না, পাছে সে আত্মঘাতী হয়। শিবপুরহাটের তিন দিকে নদী। যে দিকে দু'চোখ যায় সে দিকে গেলে প্রায়ই নদীর ধারে পা আটকে যায়। সুকু পা ছড়িয়ে বসে, গা ঢেলে দেয়। কত নৌকো স্রোতের মুখে ভাসছে, উজান বেয়ে আসছে। কোনোটাতে চালের বস্তা, কোনোটাতে নতুন হাঁড়িকলসি, কোনোটাতে

ঝুনো নারকেল। ছইয়ের চার কোণে মাকাল ফল দুলছে, ছইয়ের ভিতর ডাবা হুঁকো ঝুলছে। নৌকোর গায়ে কত রকম নকশা। নকশার কত রকম রং। নৌকোও কত রকম। জেলেদের ডিঙি, বারোমেসেদের নাও, গয়নার বোট, আরো কত কী। বাংলার প্রাণ নদী, নদীর প্রাণ নৌকো, নৌকোর প্রাণ মাঝি, মাঝির প্রাণ গান। সুকু এক মনে গান শোনে, আর গুনগুন করে সুর সাধে। এতেই তার শান্তি, এই তার সান্ত্বনা।

একদিন মেলা লোক যাচ্ছিল মেলা দেখতে। রঘুনাথপুরে রামনবমীর মেলা। তা বলে শুধু রামায়েৎ বৈষ্ণবরা নয়, নিমাইৎ বৈষ্ণবরাও আসে। নানা দিগ্‌দেশ থেকে জমায়েত হয় আউল বাউল দরবেশরাও। এক দল কীর্তনিয়া গান করতে যাচ্ছে দেখে সুকুও তাদের নৌকোয় উঠে বসল। মেলায় গিয়ে সে দলছাড়া হল না, সে যদি বা ছাড়তে চায় দলের লোক ছাড়ে না! তারা একটা গাছতলা দেখে আস্তানা গাড়ল। সেখানে জোল কেটে বড়ো বড়ো হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। কুটনো কুটতে বসল দলের মেয়ে ছেলেরা। বলতে ভুলে গেছি দলের কর্তা যিনি তিনি পুরুষ নন, নারী। তাঁর নাম হরিদাসী। হরিদাসী নাম শুনে সুকু ধরে নিয়েছিল হিন্দু, আপনারাও সে ভুল করতে পারেন। তাই বলে রাখছি তিনি মুসলমান দরবেশ। তাঁর দলের পুরুষদের নাম শুনে মালুম হয় না মুসলমান না হিন্দু। ইসব শা-ও আছে, আবার মনু শা-ও আছে। সুকু ধরে নিয়েছিল ওরা সকলেই হিন্দু। তাই আহার সম্বন্ধে দু'বার ভাবেনি। কেবল পানের সময় 'পানি' কথাটা শুনে একটু খটকা বেধেছিল।

হরিদাসীরা মউজ করে রাঁধে বাড়ে খায় আর গান করে। সুকুও তাদের শরিক। তার গলা শুনে হরিদাসী তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তোর হবে।' এতদিন জীবন বিস্বাদ লাগত, এতদিনে স্বাদ ফিরল! সুকুর চোখে পৃথিবীর রূপ গেল বদলে। যেদিকে তাকায় সেদিকে রূপের সায়র। কানে ঢেউ তোলে হরিদাসীর কণ্ঠধ্বনি—

'এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।
আমি নামি নামি মনে করি মরণ ভয়ে নামলাম না।'

মেলা ভাঙল। সুকুরও ভয় ভাঙল। মামারা যদি তাড়িয়েই দেন তবে তার আশ্রয়ের অভাব হবে না। তখনো সে জানত না যে ওরা মুসলমান। জানল শিবপুরহাটে অন্যের মুখে। তখন তার আরো একটা ভয় ভাঙল। জাতের ভয়। সে মনে মনে বলল, আমার জাত যখন গেছেই তখন দুঃখু করে কী হবে। যার জাত নেই তার সব জাতই স্বজাত। ওরা আমার আপনার লোক, আমিও ওদের।

॥ দুই ॥

অনুমতি না নিয়ে মেলায় যাওয়া, সেখানে মুসলমানের ভাত খাওয়া, এসব অপরাধের মার্জনা নেই। মামারা মারলেন না, বকলেন না, কিন্তু থালাবাসন আলাদা করে দিলেন। সে সব মাজতে হল সুকুকেই। তাতে তার আপত্তি ছিল না। বরং দেখা গেল তাতেই তার উৎসাহ। মামিমাদের কাছ থেকে সিধা চেয়ে নিয়ে সে নিজেই শুরু করে দিল রাঁধতে। কলাপাতা কেটে নিয়ে এসে উঠানের এক কোণে খেতে বসে। কেউ কাছে গেলে সরিয়ে বলে, 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, জাত যাবে।' তার দশা দেখে তার মা দু'বেলা কাঁদেন। একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না করলেই নয়, মামারা স্বীকার করলেন। তা শুনে সুকু বেঁকে বসল। বলল, 'মুসলমানের ভাত আরো কতবার খেতে হবে। ক'বার প্রায়শ্চিত্ত করব? গোবর কি এত মিষ্টি যে বার বার খেতে হবে।'

মামাবাড়ি থেকে চিঠি গেল বাবার কাছে। ইতিমধ্যে সৎমা'র হয়েছিল যক্ষ্মা, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। সুকুর বাবা একটা ছল খুঁজছিলেন সুকুর মা'কে ফিরিয়ে আনবার। চিঠি পেয়ে আপনি হাজির হলেন। সুকুকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।' স্ত্রীকে বললেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে। এসো আমার সঙ্গে।'

আবার সুকুদের বাড়িতে আনন্দের হাট বসল। আমরা তার পুরনো বন্ধুরা তাদের ওখানে দিন রাত আসর জমালুম! এবার সে আমাদের বারণ করে না, করলেও আমরা মানতুম না। এ বলে, আমার সুকু। ও বলে, আমার সুকু। সুকু যেন প্রত্যেকের একান্ত আপন। ওর বাবা যদি ওকে ইস্কুলে ভর্তি না করে দিতেন আমরা রোজ রোজ ইস্কুল কামাই করে বিপদে পড়তুম।

শিবপুরহাটের সেই যে অভ্যাস সুকু সে অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারল না। কখন এক সময় ক্লাস থেকে পালায়, আমরা চেয়ে দেখি সে নেই। আমাদের মহকুমা শহরে নদী আছে নিশ্চয়, কিন্তু নদীর ধারে ঘন বসতি, সুকুর তাতে অরুচি। সে যায় আউল দরবেশ বৈষ্ণবের সন্ধানে। ফকির দেখলেই সঙ্গ নেয়। তাদের সঙ্গে ঘুরে-

ফিরে সন্ধ্যার পরে বাড়ি আসে। আমরা ততক্ষণ তার জন্যে ভেবে আকুল। তার খোঁজ নিতে এক এক জন এক এক দিকে বেরোয়, পেলেও তাকে ডেকে সাড়া মেলে না। আমরা যেন তার আপনার লোক নই, যত বাজের ফেরার আসামি ভেক নিয়েছে বলে ওরাই হয়েছে তার আপনার। সুকু যে ওদের মধ্যে কী মধু পায় আমরা তো বুঝিনে। যত সব সিঁদেল চোর আর জাঁহাবাজ চোরনি গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায় কার কী সম্পত্তি আছে সেই খবরটি জানতে। তার পরে একদিন নিশীথ রাতে গৃহস্থের সর্বস্ব চুরি যায়।

সুকুকে আমরা সাবধান করে দিই যে কোনো দিন চোর বলে সন্দেহ করে পুলিশ তার হাতে হাতকড়ি পরাবে। সে বলে, 'সন্দেহ মিটলে খুলেও দেবে।' আমরা বলি, 'কিন্তু কলঙ্ক তো ঘুচবে না। মুখ দেখাবি কী করে?' সে বলে, 'ওরা যেমন করে দেখায়।' ওরা মানে বাউল বোষ্টমরা।

সুকুর জন্যে আমাদের লজ্জার সীমা রইল না, দেখা গেল আমরাই ওর চেয়ে সলাজ। ওর সঙ্গে মিশতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হল। প্রকাশ্যে মেলামেশা বন্ধ হয়ে এল, গোপনে মেলামেশা চলল।

হেডমাস্টার মশাই ছিলেন সুকুর বাবার বন্ধু। তিনি পরামর্শ দিলেন ওকে বোর্ডিং এ রাখতে। ওর বাবা একদিন ওকে বোর্ডিং-এ রেখে এলেন। ওর তাতে আপত্তি নেই, বরং ছত্রিশ জাতের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজনের আশা। আমরা কিন্তু হতাশ হলুম। বোর্ডিং-এর পাশেই হেডমাস্টার মশায়ের কোয়ার্টার। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে যে সুকুর কাছে যাওয়া-আসা করব সে সাহস ছিল না।

কিছুদিন পরে এক মজার ব্যাপার ঘটল। হেডমাস্টার মশাই একদিন স্বকর্ণে শুনলেন দুটি বালখিল্য বালক ফূর্তিসে গান করছে -

'যৌবন জ্বালা বড়োই জ্বালা সইতে না পারি
যৌবন জ্বালা তেজ্য করে গলায় দিব দড়ি।
দুঃখ রে যৌবন প্রাণের বৈরী।'

মশাই তো দুই হাতে দুজনের কান ধরে টেনে তুললেন। অন্তরীক্ষে দোদুল্যমান ওই দুটি প্রাণী অবিলম্বে কবুল করল যে সুকুই ওদের ও গান শিখিয়েছে। তখন তিনি সুকুকে তলব করলেন। সুকু বলল, 'সব সত্যি। দোষ ওদের নয়, আমার।'

মশাই বললেন 'গোল্লায় যদি যেতে হয় তবে সদলবলে কেন? তুমি একা যাও।' এই বলে একটা গাড়ি ডেকে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

সেও বাঁচল আমরাও বাঁচলুম। তার বাবা কিন্তু তাকে নিয়ে মুশকিলে পড়লেন। ঘরে আটক করে রাখলে পড়াশোনা মাটি। ইস্কুলে যেতে দিলে সে ঠিকানা হারিয়ে ফেলে। যাদের কাছে পাঠ নেয় তারা মাস্টার নয়, বাউল ফকির। কিছুদিন তিনি নিজেই তাকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেন, সেখানে তার উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হল। কিন্তু সে অঙ্কের খাতায় ইতিহাস ও ইতিহাসের খাতায় সংস্কৃত লিখে শিক্ষকদের উত্যক্ত করে তুলল। এটা যে তার ইচ্ছাকৃত তা নয়। সে নিজেই বুঝতে পারে না কেন এমন হয়। আসলে তার মন ছিল না পাঠে।

সুকুর মা তার বাবাকে বললেন, 'জানি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সেকালে কর্তারা এরকম স্থলে গিন্নিদের উপদেশ নিতেন।'

'শুনি তোমার উপদেশটা কী।'

'আমার ঠাকুরদার বিয়ে হয়েছিল ষোলো বছর বয়সে। সুকুর বয়স পনেরো হলেও ওর যেমন বাড়ন্ত গড়ন—'

সুকুর বাবা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

॥ তিন ॥

ম্যাট্রিকে সুকু ফেল করল। আমি পাস। বাধ্য হয়ে আমাকে বড়ো শহরে যেতে হল, ভর্তি হলুম কলেজে। চিঠি লিখে সুকুর সাড়া পেতুম না। ওর সঙ্গে দেখা হত ছুটিতে।

দিন দিন ব্যবধান বাড়তে থাকে। আমি যদি বলি 'তুই', সুকু বলে 'তুমি'। আমার কষ্ট হয়। ডাকলে আসে, না

ডাকলে খোঁজ করে না। গেলে দেখা দেয়, কিন্তু প্রাণ খুলে কথা কয় না। একদিন আমি কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলুম, ‘সুকু, আমি কি তোর পর?’ সে উত্তর দিয়েছিল, ‘তা নয়। আমি হলুম ফেল করা ছেলে। আর তুমি —’

আমি তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলুম, ‘তোর জন্যে আমার সব-সময় দুঃখ হয়।’

‘কিন্তু আমি তো মনে করি আমার মতো সুখী আর কেউ নেই। যেখানে যাই সেখানেই আমার ঘর, সেখানেই আমার আপনার লোক।’

বাউল ফকির দরবেশদের ও বলত আপনার লোক। ওরাও ওকে দলে টানত। রতনে রতন চেনে। আমাদের চোখে সুকু একটা ফেল করা ছেলে, ওর পরকালটি ঝরঝরে। ওদের চোখে সুকু একজন ভক্ত। গুরুর কৃপা হলে একদিন পরমার্থ পাবে। আমাদের হিতৈষীপনার চেয়ে ওদের হিতৈষিতাই ছিল ওর পছন্দ।

হাজার হলেও আমি ওর পুরনো বন্ধু। বোধহয় তার চেয়েও বেশি। সুকু সেটা জানত, তাই আমাকে যত কথা বলত আর কাউকে তত নয়। তাকে দিয়ে কথা বলানো একটা তপস্যা। গান করতে বললে দেরি করে না, কিন্তু মনের কথা জানাতে বললে দশবার ঘোরায়।

সুকু নিজেকে সকলের চেয়ে সুখী বলে দাবি করলেও আমার অগোচর ছিল না যে ওর ভিতরে আগুন জ্বলছে আর সে-আগুনে ও পুড়ে খাক হচ্ছে। কাকে যে ভালোবেসেছে, কে যে সেই ভাগ্যবতী তা আমাকে জানতে দিত না। আমি অবশ্য অনুমান করতুম কিন্তু পরে বুঝেছিলুম সে সব অনুমান ভুল।

নায়িকা-সাধন বলে ওদের একটা সাধনা আছে। সুকু নিয়েছিল ওই সাধনা। প্রত্যেক নারীর মধ্যে রাধাশক্তি সুপ্ত রয়েছে। সেই শক্তি যখন জাগবে তখন প্রতি নারীই রাধা। যে কোনো নারীকে অবলম্বন করে রাধাতত্ত্বে পৌঁছনো যায়। কিন্তু সে নারীর সম্মতি পাওয়া চাই। সুকু একজনের সম্মতি পেয়েছে এইখানেই তার গর্ব। এই জন্যেই সে বলে তার মতো সুখী আর কেউ নয়। অথচ তার মতো দুঃখী আর কেউ নয়। ভদ্রলোকের ছেলে ছোটোলোকদের সঙ্গে খায় দায়, গায় বাজায়, শোয়া বসা করে। ওকে নৌকো বাইতে, গোরুর গাড়ি চালাতে, ঘর ছাইতে দেখা গেছে। ওর বাবা সম্মানী ব্যক্তি। তাঁর মাথা হেঁট। তিনি কিছু বলতে পারেন না এই ভেবে যে ইতিমধ্যে তাঁর ছোটোবউ মরেছেন, ছেলেকে শাসন করলে যদি বড়োবউ আবার বাপের বাড়ি যান তবে আর একবার টোপর পরার মতো বল, বয়স নেই। মুখে বলেন, ‘ওটাকে ত্যাজ্যপুত্র করতে হবে দেখছি।’ কিন্তু ভালো করেই জানেন যে সুকু তাঁর সম্পত্তির জন্যে লালায়িত নয়। সুকুর মা ওকে বকেন। কিন্তু বকলে সুকু বাইরে রাত কাটায়। তখন তিনিই ওকে আনতে পাঠান।

মদন ফকির ওর গুরু। গুরুর উক্তি ও সুকুর প্রত্যুক্তি কতকটা এই রকম- -

‘বাবা, কাদতে জনম গেল। যদি সুখের পিত্যেশ পুষে থাক তবে আমার লগে আইসো না। আমি তোমায় সুখের নাগাল দিতে নারব।’

‘আমি চোখের জলে মানুষ হয়েছি। কাঁদতে কি ডরাই?’

‘সারা জনম কাঁদতে রাজি আছ?’

‘আছি।’

‘আমায় দুষবে না?’

‘না, হুজুর।’

‘তবে তুমি সুখের সন্ধান ছেড়ে রাধার সন্ধানে যাও। সে যদি সুখ দেয় নিয়ো। যদি দুখ দেয় নিয়ো। কিছুতেই ‘না’ বোলো না। তার ছলকলার অন্ত নেই। তেঁই তোমায় বলি, কাঁদতে জনম গেল রে মোর কাঁদতে জনম গেল।’

সুকু সেই যে ফেল করল তার পরে আর পরীক্ষা দিল না। তার পড়াশুনা সেইখানেই সাঙ্গ হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে পরীক্ষা দিতে হল, সে পরীক্ষা মাত্র একজনের কাছে। সে একজন তার নায়িকা। তার গুরুই তাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন, এইটুকু আমি জানি, এর বেশি জানিনে। আর যা জানি তা লোকমুখে শোনা, লোকের কথা আমি বিশ্বাস করিনে, যদিও ল্যাটিন ভাষায় প্রবাদ আছে লোকের কথাই ভগবানের কথা।

একবার ছুটিতে বাড়ি এসে শুনি সুকু নিরুদ্দেশ। লোকে বলাবলি করছে সারী বোষ্টমী ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। মেয়েটি নাকি প্রথমে ছিল মোদকদের বউ। অল্প বয়সে বিধবা হয়। পরে এক বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবনে যায়, সেখানে বেশ কিছুকাল থেকে চালাক চতুর হয়। বৈষ্ণবটির কৃষ্ণপ্রাপ্তি হলে দেশে ফিরে সারী তার

বিষয়বাড়ি ভোগদখল করে। তারপর থেকে সুন্দর ছেলে দেখলেই সে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, সর্বনাশ করে ছেড়ে দেয়। গুণের মধ্যে সে গাইতে পারে অসাধারণ। গান দিয়েই প্রাণ মজায়। ছেলেদের অভিভাবকেরা অবশেষে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করেন। তখন জায়গাজমি বিক্রি করে বৈষ্ণবী একদিন নিখোঁজ হয়। তার সঙ্গে সুকুও। সুকুর বাবা থানা-পুলিশ করেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তার মা কাতর হয়ে পড়েন।

সুকুর বাবা বললেন, 'খোকন, তুমি তো পাস করলে, জলপানি পেলে, আমার ছেলেটি কেন অমন উচ্ছন্ন গেল! ছি ছি, একটা নষ্ট মেয়েমানুষের—' তিনি মাথা হেঁট করলেন। রুমালে চোখ মুছলেন।

সুকুর মা বললেন, 'যে ছেলে মা'র সঙ্গে বনবাসী হয় সে কি তেমন ছেলে! আমার মন বলে সুকু আমার কোনো কুকাজ করেনি। ওর সবটাই সু। কিন্তু কেন আমাকে বলে গেল না? আর কি ফিরবে!'

॥ চার ॥

পরবর্তীকালে সুকুর মুখে প্রকৃত বিবরণ শুনেছি। সব মনে নেই, যেটুকু মনে আছে লিখছি। সুকু, এ লেখা যদি কোনো দিন তোমার চোখে পড়ে, যদি এতে কোনো ভুলচুক থাকে, তবে মাফ কোরো।

ওর নাম সারী, তাই ও সুকুকে শুক বলে ডাকত। শুক দেখতে সুন্দর, সারী তেমন নয়। কিন্তু সারী রসের ঝারী, শুক শুকনো কাঠ। বৃন্দাবনে থাকতে সারী হিন্দি বলতে শিখেছিল, যাত্রীদের সঙ্গে মিশে দু'চারটে ইংরেজি বুক্‌নিও। হিন্দি ও বাংলা গান যখন যেটা শুনত তখন সেটা কণ্ঠসাৎ করত। এমন একটি গায়িকা নায়িকা পেয়ে সুকু ধন্য হয়েছিল। সারী ও শুকের মতো দুজন দুজনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে গানের সুধা পান করত। সুকুও জানত কত বাউল ফকিরের গান। সারীকে শোনাত।

সুকুর মতো আরো অনেকে আসত সারীর কাছে, তারাও আশা করত সারী তাদের আদর করবে। করত আদর, কিন্তু সে আদর নিতান্তই মৌখিক। রসের কথা বলে সারী তাদের ভোলাত। যাকে বলে সর্বনাশ সেটা অতিরঞ্জিত। এমনকি সুকুর বেলাও।

সারীর নামে যারা নালিশ করেছিল তাদের লোভ ছিল জমিখানার উপরে। কারো কারো লালসা ছিল নারীর প্রতিও। হতাশ লোলুপের দল অভিভাবকদের সামনে রেখে হাকিমের এজলাসে দাঁড়ায়। তখন সারীকে সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে শহর ছেড়ে যেতে হয়। সুকুর মতো আর যারা আসত তারা সেই দুর্দিনে তার সহায় হল না, যে যার পথ দেখল। কিন্তু সুকু তাকে ছাড়ল না, হাতে হাত রেখে বলল, 'একদিন মা'র সঙ্গে গেছলুম, আজ তোর সঙ্গে যাব।'

সারী বলল, 'আমি কি তোর মা!'

সুকু বলল, 'মাকে যেমন ভালোবাসতুম তোকেও তেমনি ভালোবাসি।'

সারী রসিয়ে বলল, 'তেমনি?'

সুকু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'দূর! তেমনি মানে কি তেমনি?'

'তবে কেমনি?' সারী রঙ্গ করল।

'এমনি।' বলে সুকু বুঝিয়ে দিল।

তখন তারা পরস্পরের কানে মুখ রেখে একসঙ্গে গান ধরল—

'আশা করি বান্ধিলাম বাসা,
সে আশা হৈল নিরাশা,
মনের আশা।
ও দরদী, তোর মনে কি এই সাধ ছিল!'

তার পরে রাত থাকতে পথে বেরিয়ে পড়ল।

সারীর এক সই ছিল, বিনোদা গোপিনী। গ্রামে তার বাড়ি। সারী ও শুক সেইখানে নীড় বাঁধল।

বিনোদা বলে, 'সই, তোর সঙ্গে কি ওকে মানায়! ও যে তোর ছোট ভাইয়ের বয়েসি।'

সারী বলে, 'গোপালও ছিল গোপীদের ছোটো ভাইয়ের বয়সি। কারো কারো ছোটো ছেলের বয়সি।'

বিনোদা মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'আ মর! কার সঙ্গে কার তুলনা।'

সারী মাথা দুলিয়ে বলে, 'যা বলেছিস। তোর বরের সঙ্গে আমার বরের তুলনা।'

আসলে সারীর বয়স অত বেশি নয়, ওটা বিনোদার বাড়াবাড়ি। বিনির মনে কী ছিল তা কিছুদিন পরে বোঝা গেল। সে চেয়েছিল তার দেওরের সঙ্গে সারীর কণ্ঠিবদল ঘটাতে।

সারী অবশ্য ও প্রস্তাব কানে তুলল না। ফলে বিনোদার আশ্রয় দিন দিন তিক্ত হয়ে উঠল। একদিন শুক সারী নীড় ভেঙে উড়ে গেল।

এবার গেল ওরা সুকুর চেনা এক দরবেশের বাড়ি। আহার সম্বন্ধে সুকুর বাছবিচার ছিল না, সারীর ছিল। ওরা আলাদা বাঁধে খায়, শুধু ফটিকচাঁদের আখড়ায় থাকে।

দরবেশ অতি সজ্জন। তার ওখানে যারা আসে তারাও লোক ভালো, কী জানি কেন সারীর সন্দেহ জাগল সুকু তাদের একটি মেয়ের প্রীতিমুগ্ধ। সুকু সুপুরুষ বলে সারী তাকে সযত্নে পাহারা দিত। অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেখলে চোখা চোখা বাণ হানত।

তখন সুকুই অনুনয় করল 'চল, আমরা এখান থেকে যাই।'

সারী অভিমানের সুরে বলল, 'কেন? আমি কি যেতে বলেছি?'

না, তুই বলবি কেন? আমিই বলছি। এক জায়গায় বেশিদিন থাকলে টান পড়ে যায়। সেটা কি ভালো।'

কীসের [illegible] টান? জায়গার না মানুষের?'

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে সুকুর মনে লাগে। সে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে যে সে দুর্বল। তখন সারী তাকে সানন্দে বরণ দেয়।

এমনি করে তারা কত গ্রাম ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে তাদের পুঁজি এল ফুরিয়ে। কারো কাছে তারা কিছু চায়ও না পায়ও না দিলে বড়ো জোর চালটা আলুটা জ্বালানির কাঠটা নেয়। সারী শৌখিন মানুষ, হাটে কিংবা মেলায় গেলেই তার কিছু খরচ হয়ে যায়। পুঁজি ভাঙতে হয়।

সারী বলে 'চল আমরা শহরে যাই।'

সুকু বলে 'শহরে।' বলতে পারে না যে, শহরে আত্মগোপনের সুবিধা নেই, লোকে বংশপরিচয় শুধাবে, পরিচয় দিলে কেউ না কেউ চিনবে সে কাদের কুলতিলক।

॥ পাঁচ ॥

যে শহরে তারা গেল সেটা উত্তরবঙ্গের একটা মহকুমা শহর। পশ্চিমের মতো তাদের সেখানে টমটম বা এক্কা গাড়ি চলে। টমটমওয়ালারা পশ্চিমা দোসাদ।

টমটম পাড়ার একধারে পশুডাক্তারখানা। ডাক্তারটি পশুচিকিৎসায় যত না পারদর্শী তার চেয়ে ওস্তাদ গানবাজনায় ও থিয়েটার করায়। সুকুর চেহারা দেখে ও গান শুনে তিনি তাকে তাঁর ছেলেদের মাস্টার রাখলেন। মাস দু এক পরে যখন পশুদের ড্রেসার চাকরি খালি হল তখন তিনি সাময়িকভাবে সুকুকেই বাহাল করলেন।

সুকর সারাদিনের কাজ হল টমটমের ঘোড়া, চাষিদের গরু ও বাবুদের কুকুরের ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগানো ও ব্যান্ডেজ বাঁধা। বেচারিদের করুণ চিৎকারে তার কান ঝালাপালা হলে প্রাণ পালাই পালাই করে, কিন্তু পালাবে কোথায়। সে যা রোজগার করে তাই দিয়ে সারী সংসার চালায়। মাঝে মাঝে গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে সারীও কিছু কিছু পায়। তা দিয়ে কেনা হয় শখের জিনিস।

বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ডাক্তারবাবুর বদলির হুকুম এল। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুকুকে সঙ্গে নিতে, কিন্তু সুকু তো একা নয়। অগত্যা সুকুর যাওয়া হল না। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তিনি গানবাজনার যম। সুকুর কাছে কাজ আদায় করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সে আনাড়ি। তাঁর একটি শালা বেকার বসেছিল, সুতরাং এক কথায় সুকুর চাকরি গেল।

ইতিমধ্যে টমটমওয়ালাদের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। তারা তার জন্যে দল বেঁধে দরবার করল। তাতে কোনো ফল হল না, কারণ সুকুর না ছিল যোগ্যতা, না অভিজ্ঞতা, না মুরুব্বির জোর। যা ছিল তা দুর্নাম। তখন টমটমওয়ালারা বলল, আমরাই চাঁদা করে তোমাকে খাওয়াব, তুমি আমাদের গান গেয়ে শোনাবে।

একদিন দেখা গেল সুকু টমটম পাড়ার সভাগায়ক হয়েছে। তার সভাসদ হাড়ি, ডোম, মুচি, দোসাদ, জেলে, মালী প্রভৃতি ইংরেজি শিক্ষায় বঞ্চিত জনগণ। সুকু শুধু গান গায় না, গান ধরিয়ে দেয়। ছত্রিশ জাতের ঐকতান

সংগীতে পল্লি মুখর হয়। জলসা চলে রাত একটা অবধি, তারপর সুকু বাসায় ফিরে সারীর পায়ে সঁপে দেয় আধলা পয়সা ডবল পয়সা।

সুকু তার পরিচয় গোপন করেছিল। ভেবেছিল কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু টমটম পাড়ার সভাকবি হবার পরে সে এত দূর কুখ্যাত হল যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল দূর থেকে তার জন্যে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে এক দিন সে ধরা পড়ে গেল। খবরটা ক্রমে তার বাবার কানে পৌঁছল। বাবা এলেন না, কাকা এলেন তাকে নিতে।

কাকা এসেই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়ি গেয়ে বেড়ালেন ভাইপোর কীর্তি। গণ্যমান্যরা শিউরে উঠলেন ছি ছি! মেয়েমানুষ নিয়ে ভেগেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু ছোটোলোকদের সঙ্গে ছোটোলোক হয়েছে। ছি ছি।

সুকু কাকার কথা শুনল না। ভালো ছেলে হল না। তিনি অনেক করে বোঝালেন, লোভ দেখালেন, ভয় দেখালেন। যাবার সময় এমন একটা চাল চেলে গেলেন যার দরুন সুকুকে তুষের আগুনে পুড়তে হল।

সারীর বড়ো গয়নার শখ। কিন্তু কোথায় টাকা যে গয়না গড়াবে। খেতেই কুলোয় না। সারী বোঝে সব, কিন্তু থেকে থেকে অবুঝ হয়। সুকু মনে আঘাত পায়, ব্যথার ব্যথী বলে দ্বিগুণ লাগে। গানের প্রলেপ দিয়ে বুকের বেদনা ঢেকে রাখে। দিন কাটে।

এক দিন টমটমওয়ালাদের সভা থেকে সুকু সকাল সকাল ছুটি পেল। সারী যে তাকে দেখে কত খুশি হবে এ কথা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরল। বাসায় ফিরে তার মনে একটু খটকা বাধল। সে ঠেলা দিয়ে দেখল ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ। ডাকল, 'সারী। ও সারী।'

মিনিট পাঁচ সাত ডাকাডাকির পর দ্বার যদি বা খুলল কোথায় সারী! সারীর বদলে কে একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং ঘোমটায় মুখ ঢেকে হন হন করে চলে গেল। চলনটা মেয়েলি নয় মোটেই! সুকু ভেঙে পড়ল। তার মনে হল সে মরে যাবে, বাঁচবে না। মড়ার মতো কতক্ষণ পড়ে থাকল জানে না। যখন জ্ঞান হল দেখল সারী থরথর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে তার পা ছুঁতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। সুকু পা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসল।

সে একটা রাত। দুজনের একজনেরও চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। বুকে দুর্জয় রোদন। দুজনেই নিস্তব্ধ, নিশ্চল।

পরের দিন সারীই প্রথম কথা কইল। 'তা হলে এখন তুমি কী করবে?'

সারী তাকে এই প্রথম 'তুমি' বলল।

সুকু বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

'বাড়ি ফিরে যাবে, না এখানে থাকবে?'

সুকু ভেবে বলল, 'যেখানে তুমি সেইখানেই আমার বাড়ি।'

'কিন্তু দেখলে না? আমি যে বেশ্যা।'

'তুমি কে তাই যদি জানি তো সব জানলুম। তুমি কী তা তো জানতে চাইনে।'

'আমি কে?'

'তুমি রাধা।'

এ উত্তর শুনে সারী স্তম্ভিত হল। এবার ভেঙে পড়বার পালা তার। সে এমন কান্না কাঁদল যে সুকুর মনে হল তার সর্বস্ব চুরি গেছে। অথচ তখনো তার গলায় দুলছিল এক ছড়া সোনার হার, সদ্য নির্মিত।

॥ ছয় ॥

কাকার চাল ব্যর্থ হল। কিন্তু সারীর নামে যে সব কথা রটল তা কানে শোনা যায় না। সুকুর পক্ষে মুখ দেখানো দায় হল। কিন্তু নিরুপায়। টমটমপাড়ার টিটকারি সে গায়ে মাখে না, ছোটোলোকের রসিকতা মাথা পেতে নেয়।

এমন করে তাদের বেশি দিন চলত না। দৈবক্রমে সে শহরে এলেন এক ইউরোপীয় পর্যটক, তাঁর সঙ্গে গান রেকর্ড করবার যন্ত্র। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংগীত সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর সামনে সারী ও শুক

উভয়েরই ডাক পড়ল। সারীর গলা তাঁর এত ভালো লাগল যে তিনি তার সাত আটখানি গান রেকর্ড করলেন। তারপর সে সব রেকর্ড কলকাতার বন্ধুমহলে বাজিয়ে শোনালেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন এক রেকর্ড ব্যবসায়ী। তিনি সরাসরি সারীকে লিখলেন কলকাতা আসতে।

সারী এল, তার গান নেওয়া হল। সে সব গানের আশাতীত আদর হল। সাহেবের সার্টিফিকেট না হলে এ দেশে বাংলা বইও বিক্রি হয় না। সারীর বরাতে জুটল সাহেবমহলের সুপারিশ। রেকর্ডের পর রেকর্ড করিয়ে সারী স্বনামধন্য হল। তখন তাকে বাস উঠিয়ে আনতে হল কলকাতায়। বলা বাহুল্য, সুকু রইল সঙ্গে। তার গান কিন্তু কেউ রেকর্ড করতে চায় না, সাহেবের সুপারিশ নেই।

তারপরে সারী পড়ল এক ফিল্মব্যবসায়ীর সুনজরে। তার রূপের জৌলুস ছিল না, কিন্তু রসের চেকনাই ছিল। ভালো করে মেক্-আপ করলে তাকে লোভনীয় দেখায়। যারা ফিল্ম দেখতে যায় তারা লোভনকে শোভন বলে ভুল করে। সে ভুলের পুরো সুযোগ পেল সারী। ডিরেক্টর তাকে পরামর্শ দিলেন ফিল্মী-গান শিখতে। লোকসংগীত ছেড়ে সে 'আধুনিক' সংগীত শিখল। কণ্ঠের কৃপায় সে তাতেও নাম করল। ধীরে ধীরে সারী তারা হয়ে জ্বলল। চার পাঁচ বছর পরে যারা তার ফিল্ম দেখল তারা জানল না তার অতীত ইতিহাস।

অবশেষে একদিন শুভলগ্নে সারীর বিয়ে হয়ে গেল কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে। কেউ আশ্চর্য হল না, কারণ সারীর আয় তখন হাজারের কোঠায়।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি চেঞ্জ থেকে ফিরছি। ট্রেনে ভয়ানক ভিড়। কোনোখানে একটিও বার্থ খালি নেই। বারকয়েক ঘোবাঘুরি করে আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছি এমন সময় একটা সার্ভেন্ট কামরা থেকে কে যেন আমাকে ডাক দিল, 'খোকা? খোকা না?' আমি পিছন ফিরে দেখি সুকু।

ওর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখে এক রাশ গোঁফ দাড়ি, গলায় একটা কালো কাঠের কি কালো কাচের মালা। ফিটফাট বেহারা চাপরাশির মেলায় ও নেহাত বেমানান। হাতে একটা একতারা না আনন্দলহরী ছিল, সেটা বাজিয়ে মোটা গলায় গান করছিল একটু আগে—

'প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।
প্রেম করা কি কথার কথা রে গুরু ধরো চিনে।'

আমাকে পিছন ফিরতে দেখে সুকু কামরা থেকে নামল। নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? জায়গা মিলছে না?'

আমি বললুম, 'এত রাত্রে কে আমার জন্যে জায়গা ছাড়বে!'

সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ফার্স্ট ক্লাসে, যদিও আমার টিকিট সেকেন্ড ক্লাসের। দরজায় ধাক্কা মেরে বলল, 'ও সারী। একবার খুলবে?'

সারীর বদলে সারীর স্বামী দরজা খুললেন। তখন সুকু আমার পরিচয় দিয়ে বলল, 'একটু কষ্ট করতে হবে এর জন্যে। আমার বাল্যবন্ধু।'

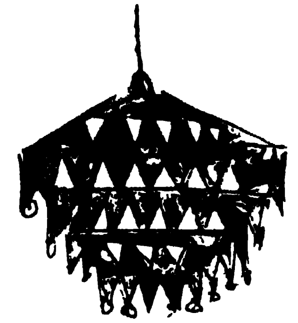
ভদ্রলোকের মুখে পাইপ, হাতে ডিটেকটিভ নভেল ও পরনে সিল্কের স্লিপিং স্যুট। ভদ্রমহিলার পরনেও তাই, উপরন্তু রঙচঙে ড্রেসিং গাউন। তাঁরা বোধ হয় শয়নের উদ্যোগ করছিলেন।

সে রাত্রে আর কথাবার্তা হল না। আমি উপরের বার্থে সসংকোচে নিদ্রার ভান করে পড়ে রইলুম। কিছুতেই ঘুম আসে না। ভোরবেলা আসানসোল স্টেশনে সুকু এসে আমার খোঁজ করল। তার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে তার কাহিনি শুনলুম। বাকিটুকু বর্ধমানে ও ব্যান্ডেলে।

হাওড়ায় শেষ দেখা। বিদায়ের আগে সুকুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'তোর পৌরুষ বিদ্রোহী হয় না? তোর আত্মসম্মান নেই?'

সুকু উত্তর দিয়েছিল, 'ও যে রাধা!'

চাচা কাহিনী



সৈয়দ মুজতবা আলী

অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল প্যারিসে। কিন্তু এ রকম ধারা ব্যাপার বার্লিন, ভিয়েনা, লন্ডন, প্রাগ যে-কোনো জায়গায় ঘটতে পারত।

প্যারিসে আমার পরিচিত যে কয়টি লোক ছিলেন তাঁরা সবাই গ্রীষ্মের অন্তিম নিশ্বাসের দিনগুলো গ্রামাঞ্চল অথবা সমুদ্র তীরে কাটাতে চলে গিয়েছেন। বড্ড একা পড়েছি।

ন্যাশানাল লাইব্রেরি আর গিমে ম্যুজিয়মে সমস্ত সময় কাটানো যায় না-- প্যারিসের ফুর্তিফার্তি রঙ্গরস কথা হয়ে গিয়েছে, তার পুনরাবৃত্তিতে আর কোনো নতুন তত্ত্ব নেই। এসব কথা ভাবছি আর প্লাস দ্য লা মাদলেনের জনতরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে সমুখপানে এগিয়ে চলেছি এমন সময় শুনি, 'বঁ সোয়ার মসিয়ো লা দক্‌তর।' তাকিয়ে দেখি ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ সুন্দরী যুবতিদের একজন। চেনা চেনা মনে হল কিন্তু চেষ্টা করেও নামটা স্মরণ করতে পারলুম না। অনেকখানি অভিমান মাখিয়ে সুন্দরী অনুযোগ করলেন, 'চিনতেই পারলেন না, অথচ প্যারিসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেও আপনি আমাকে চিনতেন।' ঠাস করে মাস্টারমশায় চড় মারলে ছেলেবেলা যে রকম মন্টেনিগ্রোর রাজধানীর নাম আচম্বিতে মনে পড়ে যেত ঠিক সেই রকম এক ঝলকে মনে পড়ে গেল, দেশ থেকে মার্সেই হয়ে প্যারিস আসার সময় ট্রেনে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হ্যাট পূর্বেই তুলেছিলুম, এবারে বাও করে বললুম, 'হাজার অনুশোচনা, মনস্তাপ এবং ক্ষমা-ভিক্ষা, মাদমোয়াজেল শাতিয়োঁ।' কায়দাকানুন ব্যাপারে প্যারিস লক্ষ্ণৌ এ বিস্তর মিল আছে। বিপাকে যদি প্যারিসের এটিকেট সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হন তবে নির্ভয়ে লক্ষ্ণৌ চালাবেন। পস্তাতে হবে না। ইতর ব্যাপারে 'যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট' হতে পারে, কিন্তু ভদ্রতার ব্যাপারে 'আধিক্যে দোষ নেই।'

মাদমোয়াজেল ক্ষমাশীলা। 'আঁশাঁতে (enchanted)', বলে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি দস্তানা পরা হাত ঠোঁটের কাছে ধরলুম — শাস্ত্রে বলে চুমো খাবে, কিন্তু অল্প পরিচয়ে 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' সূত্রই প্রযোজ্য। মাদমোয়াজেল বললেন, 'মা-হারা শিশুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে?' আমি বললুম, 'ললাটস্থ লিখন'। তিনি বললেন, 'চলুন, আমার সঙ্গে সিনেমায়।'

খেয়েছে! একে তো সিনেমা জিনিসটার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা, তার উপর ঈষৎ অনটনে দিন কাটাচ্ছি। একেবারে যে দরিয়ায় পড়েছি তা নয়, কিন্তু এতটুকুখানি ইয়ে — অর্থাৎ কি না দু'দণ্ড জলে গা ভাসাতে হলে যে গামছার প্রয়োজন মা-গঙ্গাই জানেন তার অভাব কিছুদিন ধরে যাচ্ছে। আনিটা সিকিটা করব আর ফুর্তিও হবে এমন ইসিবিসি ব্যসনে আমি বিশ্বাস করিনে। তাই আমার গড়িমসি ভাব দেখে মাদমোয়াজেল বললেন, 'আমার কাছে দু'খানা টিকিট আছে— 'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ' বইখানার প্রশংসা শুনেছি।' আর এড়াবার পথ রইল না।

মাদমোয়াজেল বললেন, 'এখনো তো ঘণ্টাখানেক বাকি। চলুন একটা কাফেতে।'

'চলুন।'

ক্লের বিবি যে পানীয়ের ফরমাইস দিলেন তার নাম আমি কখনো শুনিনি, ওয়েটারটা পর্যন্ত প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। আনতেও অনেক দেরি হল। সে পানীয় এলেনও অদ্ভুত কায়দায়। প্রকাণ্ড গম্বুজের মতো গেলাসের তলাতে আধ ইঞ্চিটাক ফিকে হলদে, খোদায় মালুম কী চিজ। আমি কফির অর্ডার দিলুম।

ক্লের দশ মিনিটেই সেই খোদায়-মালুম-কি শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন বড্ড গরম, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' তখন ওয়েটার এসে আমাকেই বলল, 'চল্লিশ ফ্রাঁ' অর্থাৎ চারটাকার কাছাকাছি বলে কী? ওই তিন ফোঁটা — যাকগে। ক্লের তখন ব্যাগ থেকে রুমাল বের করছিলেন, ব্যাগ বন্ধ করতে করতে বললেন, 'আপনিই দেবেন, সে কি?' আমি বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়, আনন্দের কথা, হেঁ, হেঁ।'

বেরিয়ে এসে ক্রের প্যারিসের পোড়া পেট্রলভরা বাতাসে লম্বা দম নিয়ে বললেন, 'বাঁচলুম। কিন্তু এখনো তো অনেক সময় বাকি। কোথায় যাই বলুন তো?'

দেশে থাকতে আমি ম্যালেরিয়ায় ভুগতুম। সব সময় সব কথা শুনতে পাইনে।

ক্রের বললেন, 'ঠিক, ঠিক, মনে পড়েছে। সিনেমার কাছেই খোলা হাওয়ায় একটা রেস্তোরাঁ আছে। আপনার ডিনার হয়ে যায়নি তো?'

বাঙালির বদ অভ্যাস আমারও আছে। ডিনার দেরিতে খাই। তবু ফাঁড়া কাটাবার জন্য বললুম, 'আমি ডিনার বড়ো একটা —'

বাধা দিয়ে ক্রের বললেন, 'আমিও ঠিক তাই। মাত্র এক কোর্স খাই। সুপ না, পুডিং না। রাত্রে বেশি খাওয়া ভারি খারাপ। অগস্টের প্যারিস ভয়ঙ্কর জায়গা।'

ততক্ষণে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালারা ফুটপাথে মেয়েদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে গ্রাহক কি না ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।

জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারলুম রবীন্দ্রনাথ কত বেদনা পেয়ে লিখেছিলেন:

'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।'

নিশ্চয়ই ট্যাক্সি চড়ে গিয়েছিলেন, মিটার খারাপ ছিল এবং ভাড়াও আপন ট্যাঁক থেকে দিতে হয়েছিল। না হলে গানটার কোনো মানেই হয় না। পায়ে হেঁটে গেলে দু'মাইল চলতে যা খরচা, দু'লক্ষ মাইল চলতেও তাই।

বাহারে রেস্তোরাঁ। কুঞ্জে কুঞ্জে টেবিল। টেবিলে টেবিলে ঘন সবুজ প্রদীপ। বাদ্যিবাজনা, শ্যাম্পেন, সুন্দরী, হিরেব আংটি আর উজির-নাজির-কোটাল। আমার পরনে গ্রে ব্যাগ আর ব্লু ব্লেজার। মহা অস্বস্তি অনুভব করলুম।

ক্রের ওয়েটারকে বললেন, 'কিছু না, শুদ্ধু 'অর দ্য ভর্'।'

'অর দ্য ভর' এল। বিরাট বারকোষে ডজনখানেক ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যে খোপে-খোপে সাজানো। সামোন মাছ, রাশান স্যালাদ, টুকরো টুকরো ফ্রাঙ্কফুটার, টোস্ট-সওয়ার কাভিয়ার, ইয়োগুর্ৎ (দই), চিংড়ি, স্টাফ্‌ড অলিভ, সিরকার পেঁয়াজ— এক কথায় আমাদের দেশের সাড়ে বত্রিশ ভাজা। তবে দাম হয়তো সাড়ে বত্রিশ শ' গুণেরও বেশি হতে পারে।

একেই বলে 'এক কোর্স খাওয়া!' কোথায় যেন পড়েছি মোতি-লালজী সাদাসিদে কুটির বানাতে গিয়ে লাখ টাকার বেশি খরচা করেছিলেন। তালিমটা নিশ্চয়ই প্যারিসের 'এক কোর্স খাওয়া' থেকে পেয়েছিলেন।

ওয়েটার শুধাল, 'পানীয়?'

ক্রের ঘাড় বাঁদিকে কাত করে বললেন, 'নো', তারপর ডান দিকে কাত করে বললেন, 'উয়ি', ফের বাঁদিকে 'নো', ফের ডান দিকে 'উয়ি' —

আমার 'দোলাতে দোলে মন', ফাঁসি না কালাপানি?

কালাপানি নয়, শেষ দোলা ডান দিকে নড়ল, অর্থাৎ লাল পানি।

ক্রের দু'ফোঁটা ইংরাজিও জানেন। যে পানীয় অর্ডার দিলেন তার গুণকীর্তন করতে গিয়ে আমাকে বুঝিয়ে বললেন, —'ইৎ ইজ নৎ এ ড্রীন্‌ক বাৎ এ ড্রীম (স্বপ্ন) মসিয়ো, এ জিনিস ফ্রান্সের গৌরব, রসিকজনের মোক্ষ, পাপীতাপীর জর্দন-জল।'

নিশ্চই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক বাউলকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'যেজন ডুবলো, সখী, তার কি আছে বাকি গো?'

তারপর সেই এক কোর্স খাওয়া শেষ হতে না হতেই ওয়েটার এসে আমাদের বলল হঠাৎ এক চালান তাজা শুক্তি এসে পৌঁচেছে। সমস্ত রেস্তোরাঁয় আমরাই যে সবচেয়ে দামি দামি ফিন্‌সি খাদ্য খাবার জন্য এসেছি, এ তত্ত্বটা সে কী করে বুঝতে পেরেছিল, জানি নে। মৃদঙ্গের তাল পেলে নাচিয়ে বুড়িকে ঠেকানো যায় না, এ সত্যও আমি জানি, কাজেই ক্রের যখন ফরাসি শুক্তির উচ্ছ্বাসে গেয়ে তার এক ডজন অর্ডার দিলেন তখন আমি এইটুকু আশা আঁকড়ে ধরলুম যে, যদি কোনো শুক্তির ভেতর থেকে মুক্তো বেরোয় তবে তাই দিয়ে বিল শোধ করব।

ক্রের ঢেকুর তোলেন নি। না জানি কত যুগ ধরে তপস্যা করার ফলে ফরাসি জাতি এক ডজন শুক্তি বিনা ঢেকুরে খেতে শিখেছে। ফরাসি সভ্যতাকে বারম্বার নমস্কার।

প্রায় শেষ কপর্দক দিয়ে বিল্ শোধ করলুম।

সে রাত্রে সিনেমায়ও গিয়েছিলুম। পাঁচ সিকের সিটে বসে 'অল কোয়াটের' বন্দুক কামানের শব্দের মাঝখানেও ক্রেরের ঘুমের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। 'নাক ডাকা'টা বললুম না, গ্রাম্য শোনায় আর ফরাসি সভ্যতার দায় যতক্ষণ সে জাগ্রত জাগ্রত আছে।

রাত এগারোটায় সিনেমা শেষে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালুম, তখন ক্রের বললেন, 'কোথায় যাই বলুন তো, আমার সর্বাঙ্গ উচ্চাঙ্গ সংগীতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'নৎর্‌দামের গির্জেয়। সেই একমাত্র জায়গা যেখানে পয়সা খরচা না করেও বসা যায়', কিন্তু চেপে গেলুম। বললুম, 'আমাকে এই বেলা মাফ করতে হচ্ছে মাদমোয়াজেল শাতিয়ো। কাল আমার মেলা কাজ, তাড়াতাড়ি না শুলে সকালে উঠতে পারব না।'

ক্রের কী বললেন আমি শুনতে পাই নি। ভদ্রতার শেষরক্ষা করতে পারলুম না বলে একটু দুঃখ হল। ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দশমীর বিসর্জনের মতো দেবীপূজার শেষ অঙ্গ। এত খরচার পর সব কিছু 'এটুকু বাধায় গেল ঠেকি?' চাবুক কেনার পয়সা ছিল না বলে দামি ঘোড়াটাকে শুধু দানাপানিই খাওয়ালুম, জিনটা পর্যন্ত লাগানো গেল না!

বাস-ভাড়া দিয়ে দেখি আমার কাছে আছে তিনটে কফি, একখানা সেনউইচ, আর পাঁচটি সিগারেটের দাম।

আমার কপাল— বাসের টায়ার ফাটল। আধ মাইল পথ হাঁটতে হবে।

প্যারিসের হোটেলগুলো বেশির ভাগ সংযমী মহল্লায় অবস্থিত। সংযমীর বর্ণনায় গীতা বলেছেন সর্বভূতের পক্ষে যাহা নিশা সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন। তারপর সংযমী সেই নিশাতে কী করেন তার বর্ণনা গীতাতে নেই। আমার ডাইনে বাঁয়ে যে জনতরঙ্গ বয়ে চলেছে, তাদের চেহারা দেখে তো মনে হল না তাঁরা পরমার্থের সন্ধানে চলেছেন। তবে হয়তো এরা অমৃতের সন্তান— অমৃতের সন্ধানে বেরিয়েছেন আর অমৃতের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক ঋষি বলেছেন, 'অমৃতাস্তি সুরালয়েষু' অথবা 'বনিতাধরপল্লবেষু'।

ভারতবর্ষের হিন্দু মূর্খ, সে কাশী যায়, মুসলমান মূর্খ, সে মক্কা যায়। ইয়োরোপীয় সংযমী মাত্রই অমৃতের সন্ধানে প্যারিস যায়।

প্যারিসে নিশাভাগে নারীবর্জিতাবস্থায় চলনে পদে পদে বনিতাধরপল্লব থেকে আপনার কর্ণকুহরে অমৃত প্রবেশ করবে 'বঁ সোয়ার মসিয়ো —আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক।' আপনি যদি সে ডাকে সাড়া দেন তবে — তবে কী হয় না হয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নেই, প্রয়োজনও নেই, এমিল জোলার মল্লিনাথও আমি হতে চাই নে। শরৎ চাটুয্যে যা লিখেছেন, তা আমার এখনও হজম হয় নি।

হোটেল আর বেশি দূরে নয় — মহল্লাটা ঈষৎ নির্জন হয়ে আসছে। হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিলুম, তাই আপন অজানাতে একটা 'বঁ সোয়ারের' উত্তর দিয়েই বুঝতে পারলুম ভুল করে ফেলেছি। এক সন্ধ্যায় দুই সুন্দরী সামলানো আমার কর্ম নয়। আমার পূর্বপুরুষগণ একসঙ্গে চার সুন্দরী সামলাতে পারতেন। হায়, আমার অধঃপাত কতই গগনচুম্বী থেকে কতই অতলস্পর্শী।

নাঃ, এঁর বেশভূষা দেখে মনে তো হচ্ছে না ইনি 'বসন্তসেনার' সহোদরা, যদিও 'দরিদ্র চারু দত্ত' আমি নিশ্চয়ই বটি। এ রকম নিখুঁত সুন্দরী রাস্তায় বেরুবে কেন? তবে হাঁ, তুলসীদাস বলেছেন, সংসার কী অদ্ভুত রীতিতে চলে দেখ, শুঁড়ি দোকানে বসে বসে মদ বিক্রয় করে, সেখানে ভিড়ের অন্ত নেই, আর বেচারি দুধওলাকে ঘরে ঘরে ফেরি দিয়ে দিয়ে দুধ বিক্রয় করতে হয়।' কিন্তু এ নীতি তো হেথায় খাটে না।

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না; কিন্তু আপনাকে ঠিক প্লেস করতে পারছি নে।'

সুন্দরী স্মিত হাস্য করলেন, বীণার পয়লা পিড়িঙের মতো একটা ধ্বনিও বেরুল। সে হাসি এতই লাজুক আর মিঠা যে তকখুনি চিনতে পারলুম যে এঁকে আমি চিনি নে। এরকম হাসি অতি বড়ো অরসিকও একবার দেখলে ভুলতে পারে না।

কী করি, এ যে আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। এ-সুহাসিনী রসের হাটের বসন্তসেনা নিশ্চয়ই নয়, তবে এরকম গায়ে পড়ে আলাপ করল কেন? আর ভালোমন্দ কোনো কিছু বলছেই না কেন? এ কী রহস্য। নাঃ, কালই প্যারিস ছাড়ব। ক্রসওয়ার্ড আমি কাগজেই পছন্দ করি, জীবনে নয়।

হঠাৎ হোঁচট খেয়ে বেচারি পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরলুম। শুধালুম, 'কী হয়েছে?' বলল, 'রাস্তার দোষ নয়, আমি বড্ড ক্লান্ত।'

আমি জানি আমার পাঠকরা আমাকে আর ক্ষমা করবেন না, বলবেন, 'ওরে হস্তীমূর্খ এক সন্ধ্যায় দু' দু'বার ইত্যাদি।' তবু স্বীকার করছি আমি আবার সেই আহাম্মুখিই করলুম। কিন্তু এবার সোজাসুজি, প্যারিস-লক্ষ্ণৌকে তিন-তালাক দিয়ে। বললুম, 'আমার কাছে তিনটে কফি, একটা স্যানউইচ আর পাঁচটি সিগরেটের দাম। কোনো কাফেতে গিয়ে একটু জিরোবেন?

বলল, 'আমি শুধু কফি খাব।'

কাফেতে বসিয়ে বললুম, 'কফি স্যানউইচ খেয়ে বাড়ি যান।'

কিছু বলল না, আপত্তিও জানাল না।

কাফেতে কড়া আলোতে মেয়েটির চেহারা দেখে মনে হল এর দুর্বলতা না খেতে পেয়ে।

প্রেম অন্ধ কিন্তু প্যারিস তো প্রেমিক নয়। তবে সে এ-সুন্দরীকে উপোস করতে দিচ্ছে কেন? কিন্তু সে রহস্য সমাধানের জন্য একে প্রশ্ন করা বর্বরতা তো বটেই, তাই নিয়ে আপন মনে তোলপাড় করা অনুচিত। পৃথিবীর অনাহার ঘোচাবার দাওয়াই যখন আমার হাতে নেই তখন রোগের কারণ জেনে কী হবে?

হঠাৎ মেয়েটি বলল, 'তুমি ভুল বুঝেছ, আমি বে —'

আমি বললুম, 'চুপ, আমি কিছু শুনতে চাইনে।'

বলল, 'তাই ,,,,, (আপনি) না বলে ,,, (তুমি) বললুম। তবে নতুন নেবেছি। কাল রাত্রে প্রথম। কিন্তু কেউ আমার কাছে ঘেঁষল না সাহস করে, আমার চেহারা তো ওরকম নয় আমি জানি। আমিও কাউকে সাহস করে 'বঁ সোয়ার' বলে নিমন্ত্রণ করতে পারিনি।'

মানুষের দম্ভের সীমা নেই। স্থির করেছিলুম, কোনো প্রশ্ন শুধাব না তবু নিজের কথা জানতে ইচ্ছে করল। বললুম, 'আজ আমাকেই কেন 'বঁ সোয়ার' বললেন?

'বোধ হয় বিদেশি — না, কী জানি কেন। ঠিক বলতে পারব না।'

আমি বললুম, 'থাক্, আমি সত্যি কিছু শুনতে চাইনে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আজ রাত্রে যে করেই হোক আমাকে খদ্দের জোগাড় করতেই হবে। আজ সকালেই ল্যান্ডলেডি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল।'

রাত ঘনিয়ে আসছে, আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'আপনি বাড়ি যান আর নাই যান, আমার সঙ্গে বসে থাকলে তো আপনার —। জানেন তো, পুরুষের সঙ্গে বসে আছেন দেখলে কেউ আপনার কাছে আসবে না। রাতও অনেক হয়েছে। এখন মাতালের সংখ্যা বেড়েই চলবে।'

কেঁপে ওঠেনি, কিন্তু তার মুখখানি একটু বিকৃত হল।

কোনো কথা কয় না। বড়ো বিপদে পড়লুম, বললুম, 'আমি তা হলে উঠি?' বলল, 'কেন? আমার সঙ্গে বসতে চাও না?'

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চেয়ে বললুম 'না, না, তা নয়। আপনাকে সত্যি বলছি। কিন্তু আমার সঙ্গে বসে থাকলে আপনার সময় যে বৃথায় যাবে।'

বলল, 'তুমি আমাকে কফি খাওয়ালে।'

কাতর হয়ে বললুম, 'প্লিজ, জিনিসটা ওরকম ধারা নেবেন না।'

'তা হলে তুমি আমাকে কফি খাওয়ালে কেন?'

আমি বললুম, 'প্লিজ, প্লিজ, এসব কথা বাদ দিন।'

বলল, 'কেউ তো খাওয়ায় না। না, তুমি বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার সত্যি ভালো লাগছে।'

এই দুঃখ-বেদনার মাঝখানেও এর সাহচর্য, সৌন্দর্য যে আমাকে টানছিল সে-কথা অস্বীকার করে আপন দাম বাড়াতে চাইনে।

বলল, 'আর জানো, তুমি চলে গেলেই আমাকে 'বঁ সোয়ারের' পাত্র খুঁজতে বেরুতে হবে। আমি আর সাহস পাচ্ছি নে।'

হায় অরক্ষণীয়া, তুমি কী করে জানলে প্যারিস কত রূঢ় কত নিষ্ঠুর।

বললুম, 'আজ তা হলে থাক্‌না। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি। কোথায় থাকেন বলুন তো?'

'কাছেই, লাভনীর হোটেলের পাশের গলিতে।'

খুশি হয়ে বললুম, 'তা হলে চলুন, আমি লাভনীরেই থাকি।'

রাস্তায় চলতে চলতে সে আমার বাহু চেপে ধরল। হাতের আঙুল কোনো ভাষায় কথা বলে না বলেই সে অনেক কথা বলতে পারে। তার কিছুটা বুঝলুম, কিছুটা বুঝেও বুঝতে চাইলুম না। হঠাৎ মেয়েটার কেমন যেন মুখ খুলে গেল। বোধহয় সেরাত্রে 'বঁ সোয়ার' বলার বিভীষিকা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে বলে। বলতে লাগল, পয়সা রোজকারেব কত চেষ্টা সে করেছে, কত চাকরি সে পেয়েছে, তারপর যারা চাকরি দিয়েছে তারা কী চেয়েছে, কী রকম জোর করেছে, সে পালিয়েছে, আরো কত কী?

আর কী অদ্ভুত সুন্দর ফরাসি ভাষা। থাকতে না পেরে বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি এত সুন্দর ফরাসি বলেন।'

ভারি খুশি হয়ে গর্ব করে বলল, 'বাঃ। দোদে পরিবারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল যে।'

তাই বলো। আলফঁস দোদের মতো ক'টা লোক ফরাসি লিখতে পেরেছে।

হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে সে অনেক কথা বলে ফেলল।

হোটেল পেরিয়ে মেয়েটির বাড়ি যেতে হয়। দরজার সামনে সে দাঁড়াল। আমি বললুম, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি।' বলল, 'না।' আমি বললুম 'সে কি?' উত্তর না পেয়ে বললুম, 'তা হলে বঁ ন্যুই, — শুভরাত্রি —তুমি এইটুকু একাই যেতে পারবে।'

শেকহ্যান্ড কবার জন্য তার হাত ধরেছিলুম। সে হাত ছাড়ল না। মাথা নিচু করে বলল, 'তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো।'

আমাকে বোকা বলুন, মেয়েটিকে ফন্দিবাজ বলুন, যা আপনাদের খুশি, কিন্তু আমার ধর্মসাক্ষী আমি তাকে খারাপ বলে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারলুম না। বললুম, 'আমার সামর্থ্য নেই যে তোমাকে সত্যিকার সাহায্য কবতে পারি, কিন্তু তোমাকে ভগবান যে সৌন্দর্য দিয়েছেন তাকে বাঁচাতে পারলে যে-কোনো লোক ধন্য হবে।' 'ভগবান' শব্দটা প্যারিসের পথে বড়ো বেখাপ্পা শোনাল।

মেয়েটি মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, 'কী হবে বৃথা উপদেশ দিয়ে। তুমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।'

আমাব দিকে মুখ তুলে তাকাল। ডাগর ডাগর দু'চোখ আমাকে কী বলল সে কথা আজও ভুলিনি। আমার দিকে ও-রকম করে আর কেউ কখনো তাকায় নি।

তারপব আস্তে আস্তে সে আপন বাড়ির দিকে রওয়ানা হল।

আমি মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখলুম, তার সমস্ত দেহটি আপন অসীম সৌন্দর্য বহন করে চলেছে রাজরানির মতো সোজা হয়ে, আর মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে বেদনা আর ক্লান্তির ভারে।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই মনে হল, ভুল করেছি। মানুষ সাহায্য করতে চাইলে সর্বাবস্থায়ই সাহায্য করতে পারে। নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল, এত সোজা কথাটা কাল রাত্রে বুঝতে পারলুম না কেন।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে মেয়েটির — কী মূর্খ আমি নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞেস করিনি— সন্ধানে বেরুতে যাবার মুখে হোটেলের পোর্টার আমাকে একটি ছোটো পুলিন্দা দিল।

খুলতেই একখানা চিঠি পেলুম;

'বন্ধু, তোমার কথাই মেনে নিলুম। আজ পাঁচটার ট্রেনে আমি গ্রামে চললুম। সেখানেও আমার কেউ নেই। তবু উপবাসে মরা প্যারিসের চেয়ে সেখানেই সহজ হবে। বিনা টিকিটেই যাচ্ছি।

তোমাকে দেবার মতো আমার কিছু নেই, এই সুয়েটারটি ছাড়া। ভগবানেরই দয়া, তোমার গায়ে এটা হবে।

জুলি।'

শিকার



প্রবোধকুমার সান্যাল

ছেলেমানুষের মনে যে-দাগ পড়ে সেই দাগ কোনোদিন মোছে না। মার খেলেও যে-দাগ, ভালোবাসা পেলেও সেই দাগ। ও-দুটো সমানভাবেই গাঁথা থাকে।

তরুদিদির বাঁকা চোখে থাকত খরদৃষ্টি — কিশোর বালক আন্দুর নীরোগ স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে সেই দৃষ্টি ভরে উঠত ঈর্ষায়। আন্দুর গা ছমছম করে উঠত ভয়ে। সে যেন কুঁকড়ে ছোটো হয়ে যেত এই দূর-সম্পর্কীয়া দিদির সামনে।

চিরকালের জন্য এই দাগ বসে গেছে।

তরুদিদি জমিদারের বউ। বাপের বাড়িটি হল গরিবের ঘর — বিধবা মা শুধু আছেন। বছরের মধ্যে তিন চার বার তরুদিদি তাঁর রুগ্ণ এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে উঠতেন ডাক্তারি চিকিৎসার জন্য। ওদের মধ্যে একটি মেয়ের আবাল্য মৃগীরোগ, এবং কোলের ছেলেটির আজন্ম পুঁয়ে রোগ। সুস্থ সন্তান কাকে বলে, তরুদিদি সেটি জানতেন না। রূপ এবং স্বাস্থ্য ছাড়া তাঁর জমিদারিতে আর সবই ছিল।

কিন্তু এই দুটি অভাবের একটি পরোক্ষ ক্ষতিপূরণ ছিল তাঁর নিজেরই সর্বাঙ্গে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গে এবং একথা বলা চলে প্রত্যঙ্গেও, ভারী ভারী অলঙ্কার কম-বেশি দুই সের সোনারুপোয় ভরা থাকত এবং রাত্রের দিকে কোলের শিশুটি কেঁদে উঠত বার বার তাঁর সোনার গহনার খোঁচায়। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক কী প্রকার, সেটি খুব স্পষ্ট নয়।

গহনার ভারে তিনি হাঁপাতেন -- কেন না মানুষটি হলেন স্থূলাঙ্গ ও খর্বকায়া — আর তাই দেখে দরিদ্র পরিবারের সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকত।

সেবার অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তিনি বাপের বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে কঠোর সম্ভাষণ করলেন তাঁর বিধবা ও নিরুপায় জননীকে — এতটুকু বিবেচনা নেই তোমাদের ঘটে? আমার যে চর্বির ব্যামো, মনে নেই তোমাদের? একজন লোক পাঠাতে পারনি ইস্টিশানে? বাড়িসুদ্ধ আক্কেলের মাথা খেয়েছ?

মা বললেন, তেমন তো কেউ নেই, কে যাবে মা?

কে যাবে! মরেছে বুঝি সব? আগে বললেই পারতে! আমি না হয় নাই আসতুম।

ম্লান হাসি হেসে মা চুপ করে গেলেন। কিন্তু তরুদিদির এই উগ্র কঠোর প্রথম সম্ভাষণে বাড়িসুদ্ধ সবাই হতবাক।

এবারেও তাঁর সঙ্গে আছে সেই ঝিয়ের মেয়েটা। ওর নাম হিমি। এ বাড়ির ছেলেমেয়ে মহলে সে খুব পরিচিত। মেয়েটা তরুদিদির দু চোখের বিষ হলেও বার বার সঙ্গে আসে এবং তারই জন্য তরুদিদির অবস্থানকালটি বেশ সরগরম থাকে। হিমি হল ওঁদের গাঁয়ের এক প্রজার মেয়ে, বছর এগারো বারো বয়স এবং অতিশয় স্বাস্থ্যবতী। বস্তুত, ওর স্বাস্থ্যের কাঠিন্যই হল যেন ওর অপরাধ। হিমি এসে পৌঁছলেই ছেলেমেয়েরা ওর সঙ্গে মিলে যায় এবং তরুদিদি ক্রুদ্ধ বিদ্বেষে সেটি পর্যবেক্ষণ করেন। মেয়েটা বিশেষ কারো অপ্রিয় ছিল না।

তরুদিদির ছেলেমেয়েদের চেহারায় জমিদার-গোষ্ঠীসুলভ কোনো ছাপ নেই। সবগুলিই কৃষ্ণবর্ণ কঙ্কাল ও হতশ্রী। প্রথমেই খাবার জন্য তারা বাহানা ধরল — কেউ শুয়ে পড়ল আনাগোনার পথে, কেউ ঢুকল রান্না-ভাঁড়ার ঘরে, কেউবা নোংরা করে বসল একেবারে সকলের মাঝখানে। কিন্তু সেই হট্টগোলের মধ্যে প্রথমেই ছুটে এসে তরুদিদি হিমির গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলেন — হারামজাদি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস? ওদের সামলাতে পারিসনে?

আন্দু বলে উঠল, ওর কোনো দোষ নেই, তরুদিদি।

থাম্‌, ছোটো মুখে বড়ো কথা কসনে। তরুদিদি কঠোর কণ্ঠে এক হাঁক দিলেন। আন্দু কাঁচুমাচু হয়ে সেখান থেকে সরে গেল।

মেয়েটাই যে কেবল বিনা দোষে মার খেলে তাই নয়, ওই চপেটাঘাত পড়ল সমস্ত বাড়িখানারই গালে — অন্তত ওর প্রতিধ্বনি সেই কথাটাই প্রকাশ করল। সেই কারণে হিমির উপরে এই নির্বিচার লাঞ্ছনাটা সবাই যেন একটি মুহূর্তে নিজেদের মধ্যেই ভাগ করে নিল।

হিমি কিন্তু একটু অন্য ধরনের। মার খেলে সে ভ্রুক্ষেপ করে না এতটুকু। বিড়ালকে মারলে বিড়াল সরে যায় বটে, কিন্তু নিজের হাতে লাগে। হিমির দেহ পাথরের মতো শক্ত আর নিরেট। এর আগে দেখতে পাওয়া গেছে ঠান্ডায় বর্ষায় ওর কিছু হয় না। অযত্নেই মেয়েটা সুস্থ থাকে। আধ সের চালের পান্তা ভাত খায় এক খাবল নুন আর তেঁতুল দিয়ে। যেখানে সেখানে পড়ে লোহার মতো ঘুমোয়। ডাকলে বরং পাড়ার লোক জাগে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না।

মনিবের পায়ে পায়ে জড়িয়ে থেকে তাঁকে তুষ্ট রাখাই ভৃত্যের কর্তব্য —কিন্তু হিমি ছিল অন্যরকম, এটি তরুদিদি অনুভব করতেন। তাঁর মনে হত, হিমি তাঁকে গ্রাহ্য করে না। রাগও ছিল সেইখানে।

কোলের ছেলেটার পুঁয়ে রোগ, কিন্তু তাকে ভুলিয়ে শান্ত রাখা ছিল শিবেরও অসাধ্য। তবু ওই কাজটিই ছিল হিমির। আড়াল থেকে আন্দু সকৌতুকে দেখত, কাঁদুনে ছেলেটাকে দূরে নিয়ে গিয়ে হিমি তাকে কাঁদাচ্ছে আরো বেশি এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেটাকে টিপে টিপে দু-এক ঘা বসিয়েও দিচ্ছে, আবার চেঁচালেও মুখ টিপে ধরছে! একসময় ছুটতে ছুটতে আসেন তরুদিদি। চিৎকার করে বলেন, আমাকে ভাত তুলতে দিবিনে মুখে? কেন তুই ওকে ভুলিয়ে রাখতে পারিসনে? বদমাইস নচ্ছার —।

হিমি গোঁজ গোঁজ করে, অত কাঁদলে আমি কী করব?

ফের আমার মুখের ওপর কথা। — তৎক্ষণাৎ তরুদিদি রাগে অন্ধ হয়ে যান এবং পলকের মধ্যে একপাটি জুতো এনে হিমির পিঠে সজোরে বসিয়ে দেন।

হিমি একটুও নড়ে না, কাঠের মতো বসে থাকে। ছেলেটা আবার চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। আন্দু গা ঢাকা দিয়ে চলে যায়।

তরুদিদির উচ্চকণ্ঠের দাপটে বাড়িসুদ্ধ সবাই তটস্থ।

ওরই মধ্যে হিমি আবার একটু খামখেয়ালিও বটে। কাজ করে যখন, তখন সে অক্লান্ত। বাজার করে, ওষুধ আনে, নোংরা কাঁথা কাচে, বাসন মাজে, এঁটো পাড়ে, জল তোলে, রান্নাবান্নার জোগাড় দেয়, ঘরদোর ঝাঁটায়। কিন্তু তার মেজাজ যদি ভালো না থাকে, তাহলে সেদিন আর রক্ষা নেই। বাজার থেকে পচা মাছ কিনে আনবে, ওষুধের শিশি ভেঙে আসবে, বাসনপত্র ফেলবে ঝনঝনিয়ে, জলের বালতি কাত করবে শোবার ঘরে, রান্নাঘরের এঁটোকাঁটা ফেলে রাখবে — সেদিন ওকে দিয়ে আর কোনো কাজ করাবার উপায় থাকবে না। ছোটো ছেলেটা যদি সেদিন কেঁদে কেঁদে ককিয়েও যায়, হিমি ভ্রুক্ষেপও করবে না, বরং নিজে একসময় ছাদের চিলেকোঠায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে। আর নয়তো সেদিন এমন ঘুম ঘুমোবে যে, একেবারে পাথরের ডেলা। সকালের দিকে শোবে, বিকেলেও তার ঘুম ভাঙবে না।

কিন্তু আশ্রিত-অনাথা ঝিয়ের এই স্পর্ধা তরুদিদি বরদাস্ত করবেন, তেমন মানুষ তিনি নন। কাঠের চেলা নিয়ে তিনি একসময় উঠে যেতেন সেই চিলেকোঠায় এবং কোনো বিচার বিবেচনা করে দেখার আগেই তিনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে মেয়েটাকে শায়েস্তা করতে আরম্ভ করতেন। হিমি অনড় হয়ে মার খেত।

আন্দু চুপ করে একান্তে দাঁড়িয়ে থাকত। আশ্চর্য, এত মারধর, কিন্তু মেয়েটা কোনোদিন কাঁদল না। লোহার মতো কঠিন নিশ্চল হয়ে থাকত, আর পিঠের ওপর দিয়ে গাছ-পাথর চলে যেত। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে তরুদিদির ত্রিসীমানা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করত, অন্ধ আক্রোশে তরুদিদির চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছে। অমনি এক উত্তেজনার কালে একদিন আন্দু পড়ে গিয়েছিল তরুদিদির মুখোমুখি। তরুদিদি কেমন একপ্রকার তীব্র হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দূর-সম্পর্কের ছোটো ভাইটিকে প্রশ্ন করলেন, তোর অসুখ করে না কেন? কী খাস তুই? কী জন্যে ভালো থাকিস?

সুস্থ থাকাটাই যেন অপরাধজনক। ভয় পেয়ে থতিয়ে মুখখানা লুকিয়ে আন্দু সেখান থেকে সরে গেল।

রোষে ক্ষোভে উত্তেজনায় তরুদিদি ফোঁস ফোঁস করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে আবাল্য ভুগছে ম্যালেরিয়ায়। একটি মেয়ের মৃগীরোগ, কথায় কথায় সে বেঁকেচুরে যায়। পরের ছেলেটি জ্বর আর আমাশয়ে শয্যাগত। শান্তি ছিল না তাঁর। অথচ কী পরিমাণ অলঙ্কার সর্বাঙ্গে। তরুদিদির ওই ক্রুদ্ধ চলাফেরার মধ্যে তাঁর সর্বাঙ্গের গহনাগুলি ঝমর ঝমর করে বেজে ওঠে। গহনাগাঁটি খুলে রাখা জমিদারের স্ত্রীর পক্ষে নাকি সম্মানজনক নয়। তাঁরা পুবদেশের মস্ত জমিদার।

মাঝরাত্রে সহসা একদিন চিৎকার করে উঠলেন তরুদিদি। রাত তখন বোধহয় বারোটা। মা এলেন ছুটে, বুড়ো দাদুর ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা সামান্য। তরুদিদির মাথা ধরেছিল সন্ধ্যাবেলা থেকে। হিমির ওপর হুকুম হয়েছিল, সে মাথার কাছে বসে তরুদিদির মাথা টিপে দেবে। ছেলেমানুষ মেয়ে, মাথা টিপতে টিপতে একসময় তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছে। তরুদিদি তৎক্ষণাৎ বাঘিনীর মতো উঠে দাঁড়ান এবং সেই অন্ধকারে হিমির শরীরের কোথায় যেন কীভাবে আঘাত করেন, মেয়েটা নিজের পেটটা দুই হাতে চেপে ঘুমের ঘোরে এক প্রকার আর্তনাদ করতে থাকে। চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এল। তরুদিদি তারই ওপর হিমিকে এর মধ্যে দু'ঘা বসিয়ে দিয়েছেন। তরুদিদির মা মেয়েটাকে টানতে টানতে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আন্দু ঠাহর করে দেখল, হিমি মুখের আওয়াজ করছে বটে, কিন্তু চোখে তার এক ফোঁটাও জল নেই। আশ্চর্য, মেয়েটাকে কোনোমতেই কাঁদানো যায় না! কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্য সে-রাত্রে সবাই মিলে তরুদিদিরই সেবা করতে লাগল।

একদিন হিমি আবার এক অপাট করে বসল। তরুদিদির নতুন পছন্দসই শাড়িখানা কাচতে গিয়ে বালতির খোঁচায় ছিঁড়ে ফালা দিয়ে শুকোতে দিল। ঘটনাটা তখন ঠিক টের পাওয়া যায়নি, কিন্তু বিকেলে গা ধুয়ে এসে শাড়িখানা জড়াতে গিয়ে তরুদিদি একেবারে শিউরে উঠলেন। এ কাজ হিমি ছাড়া আর কারো নয়। তিনি বললেন, দাঁড়া, এবার তোর তেজ আমি ঘোচাব।

বাড়িসুদ্ধ থরহরিকম্প। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, হিমির কোনো গ্রাহ্যও নেই। একটি বালিকার জীবনে মারপিট যেন সয়ে গেছে—ওটাকে অনিবার্য বলে জীবনের সঙ্গে সে মিলিয়ে নিয়েছে। কোনো লাঞ্ছনাতেই তার ভয় অথবা উদ্বেগ—কোনোটাই নেই।

একটি ছোটো সুস্থ ও সবল মেয়ের 'তেজ ঘোচাবার' জন্য সকলের বড়ো অস্ত্র হল, তাকে সম্পূর্ণ উপবাসে রাখা। তরুদিদি সেই ব্যবস্থাই করলেন। তাঁর হুকুম এ বাড়িতে অলঙ্ঘনীয়। সেইদিনই সন্ধ্যা থেকে হিমির আহারাদি সম্পূর্ণ বন্ধ হল। শুধু তাই নয়, সেই শীতের সন্ধ্যায় নিজে এসে তরুদিদি হিমির কাঁথাকুঁথি নিয়ে চলে গেলেন। তিনি নামজাদা জমিদারের স্ত্রী —অবাধ্য এবং দুঃশীল প্রজাকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়, তাঁর জানা আছে বৈকি! তাঁর চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে হিমি এল, এবং এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে দেখল তার বিছানার পুঁটলিটি পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে। দেখে-শুনে তারও মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে সটান গিয়ে দাঁড়াল তরুদিদির সামনে। বললে, আমার বিছানা কই?

তরুদিদি চুপ। তিনি সেদিন কিছু অসুস্থ, তাঁর হার্টের অবস্থা সেদিন ভালো ছিল না। উত্তেজনা ঘটলে অসুখ বাড়তে পারে।

হিমি পুনরায় বললে, আমি বুঝি আজ থেকে খাব না কিছু? সবাই খাবে, আর আমি খাব না কী জন্যে?

তরুদিদির পক্ষ থেকে কোনো জবাব নেই।

হিমি বললে, আমিও বলে রাখলুম, খেতে না দিলে আমিও কোনো কাজ করতে পারব না।

হিমি চলে গেল। লেপ ঢাকা দিয়ে তরুদিদি নিঃশব্দে পড়ে রইলেন।

দুদিন পরে ব্যাপারটা একটু রহস্যময়ই মনে হচ্ছিল। এক কাঁসি ভাতের কমে যে মেয়ের পেট ভরে না, তার সম্পূর্ণ উপবাস চলছে। হিমি খাচ্ছে না একবারও, সেদিকে তার চেষ্টাও নেই। সে ছটফট করবে, পায়ে ধরে কাঁদবে এবং তার বদলে তাকে আরও উৎপীড়ন করা হবে—এই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু হিমি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, তার ভ্রূক্ষেপও নেই কোনো দিকে। ডাকলে সে কাছে আসে না, এবং— বিস্ময়ের কথা —খাদ্যের প্রতি তার কিছুমাত্র ঔৎসুক্যও দেখা যায় না। বাড়ির সবাই ওই মেয়েটার দুর্ভাগ্যের দিকে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে থাকে। ক্ষুধার্ত মেয়েটার চেহারা মনে করে কারো কারো মুখে অন্নও রোচে না। কিন্তু তরুদিদির সেদিকে এতটুকু গ্রাহ্য নেই। তাঁর জিদ

বেড়ে গেছে। তিনি এবার ওই অবাধ্য মেয়েটার সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত চান। দেখা যাচ্ছে তাঁর হার্টের ব্যামোর কথা ভুলে গিয়ে তিনি কেমন যেন একপ্রকার প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং রুগ্ণ ছেলে-মেয়েদের ফেলে রেখে তিনি গোয়েন্দার মতো এদিক ওদিক ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে আসেন, কথায় কথায় সকলকে সাবধান করে দেন কঠিন কণ্ঠে—খবরদার, কেউ ওকে খেতে দেবে না! আমি এর শোধ তুলব।

দিন চারেক হতে চলল, হিমির মুখে অন্নজল নেই। অবাক করে দিল মেয়েটা সকলকে। সে পরম নিশ্চিন্তে একপাশে পড়ে থাকে এবং আহারাদি সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। পরনের সেই নয়হাতি ধুতিখানার একপ্রান্ত মেঝের উপর বিছিয়ে রাত্রে সে অকাতরে ঘুমোয়। তরুদিদির মনে পরাজয়বোধ জেগে ওঠে। তিনি চান কেউ ওকে গোপনে খেতে দিক এবং তিনি আহত সর্পের মতো তাকে ছোবল মারুন। কিন্তু এমন ভুল কেউ করে না। তরুদিদি তখন দাঁতের ওপর দাঁত ঘষতে ঘষতে রাত্রের দিকে এক একবার হিমিকে পাহারা দিয়ে আসেন। দেখা যায়, হিমি পবম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে। তার নিটোল কঠিন দেহের কোথাও অনশনের কৃশতা নেই। বলিষ্ঠকায়া স্বাস্থ্যোন্নতা কিশোরী মেয়েটার দিকে চেয়ে তরুদিদির দুই হিংস্র চক্ষু দপদপ করে যেন অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। অতঃপর আপন বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস চেপে তিনি ফিরে এসে লেপের মধ্যে ঢোকেন। নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে চিৎকার করে সারারাত সবাইকে গালি দিতে পারলে হয়তো তিনি কতকটা স্বস্তিবোধ করতেন।

সেই নিঃসাড় এবং নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ও-মহলের বিছানার ভিতর থেকে আন্দু এবার আস্তে মাথা তুলে তাকায়। না, কেউ কোথাও জেগে নেই। শেষবারের মতো টহল দিয়ে তরুদিদি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছেন, আর তিনি উঠবেন না।

আন্দু পা টিপে টিপে ওঠে। তারপর কুলুঙ্গি থেকে একটি কাগজের বাক্স নিয়ে চলে যায় দালান পেরিয়ে সেই ছোটো ছাদের পাশে। সন্তর্পণে গিয়ে হেঁট হয়ে হিমির কানে কানে সে ডাকে। হিমি জেগেই থাকে আগের থেকে। আন্দু চাপা গলায় বলে, বাক্সের মধ্যে ভাত-চচ্চড়ি আছে। চৌবাচ্চা থেকে জল খেয়ে নিস।

তেমনি পা টিপে-টিপে আন্দু নিঃসাড়ে পালায়। মেয়েটা খাবার আগে ওর দিকে তাকিয়ে একবার হাসে

পিত্রালয়ে তরুদিদির বসবাস এইভাবেই একদিন শেষ হয়ে আসত। সকলের অশ্রদ্ধা কুড়োতেন তিনি, সকলকে পরোক্ষ-ভাবে অপমানও করতেন। যারা তাঁর পায়ের তলায় দলিত হত, তাদেরই কাছে তিনি পূজা প্রত্যাশা করতেন। তাঁর ঘৃণার পাত্র ছিল সবাই। তিনি নিজে ছিলেন যেহেতু খর্বকায় ও স্থূলাঙ্গ, সেজন্য কারো মাথা উঁচু হোক—এ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। আন্দুকে কাছাকাছি দেখলে তিনি চাপা উত্তেজনায় ফুলে উঠতেন।

তাঁর যাবার আগের দিন হিমি আবার একটা ভীষণ অপরাধ করে বসল। বোধ হয় মাসিমাই কাপড় শুকোতে দেবার জন্য ছাদে উঠছিলেন। সিঁড়ির ঘরের পাশে চোখ পড়তেই তিনি দেখলেন, খেজুর গুড়ের একটি নাগরির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হিমি গোপনে টাউ-টাউ করে গুড় খাচ্ছে। প্রায় আধখানা নাগ্‌রি সে তখন শেষ করে এনেছে

খবরটা মাসিমা কোনোমতেই চাপতে পারলেন না। উঠে পালাতে গিয়ে হিমি সিঁড়ির উপরেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল কাপড়ে বেধে। খবর পেয়ে তরুদিদি ছুটে এলেন। তাঁর ঝি চুরি করে খাচ্ছিল, এ তো তাঁরই পক্ষে অপমান! দ্রুতপদে তিনি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে একখানা বঁটি নিয়ে ছুটে এলেন। অমন মেয়েকে আজ তিনি কেটেই ফেলবেন। অনেকের ধারণা, সবাই মিলে তরুদিদির হাত থেকে বঁটিখানা সময়মতো সেদিন কেড়ে না নিলে তিনি মেয়েটাকে সত্যিই হয়তো কেটে ফেলতেন। তাঁরা বড়ো জমিদার —বছরে দশ বিশটে দেওয়ানি আর ফৌজদারি মামলা তাঁদের নামে আলিপুর কোর্টে ঝুলেই থাকে। ওর ওপর না হয় আর একটা বাড়ত—এই যা। কিন্তু বঁটিখানা হাত থেকে কেড়ে নিলেও তরুদিদিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়ে কারও উপায় ছিল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে একবার হাঁক দিলেন, সবাই সামনে থেকে সরে যাও বলছি। ও আমার ঝি, আমার ভাত-কাপড়ে মানুষ, ওর ব্যবস্থা আমার হাতে। তোমাদের কোনো এক্তিয়ার নেই। — বলতে বলতে তিনি একগাছা বাঁকারি নিয়ে দৌড়ে এলেন।

সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে হিমির বেশ চোট লেগেছিল। হাঁটু কেটে গেছে, কোমরে আঘাত লেগেছে। সুতরাং ওই সিঁড়ি থেকে মেয়েটা আর উঠতে পারেনি। কিন্তু তারই ওপর যখন সপাসপ বাঁকারির ঘা পড়তে লাগল—অদূরে দাঁড়িয়ে আন্দুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল আর্ত কান্নার আওয়াজ। দাঁতের উপর দাঁত রেখে হিমি বসে আছে মাথা নিচু করে—পিঠে আর মাথায় আর পায়ে পড়ছে বাঁকারির ঘা। রক্ত ফেটে পড়ছে তার চামড়া দিয়ে।

কিন্তু কেবল হিমিই মার খাচ্ছে না, মার খাচ্ছে আন্দুও। সংসারে এক-একটি প্রাণী এমন জন্মায়। মার খায় একজন, মুখ বুজে আঘাত খেয়ে কাঁদে অন্যজন। আন্দু ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে—তরুদিদি রোষকষায়িত চক্ষে তার দিকে তাকান।

এতদিন পরে তরুদিদির মা এবার চেঁচিয়ে ওঠেন—ও ছাড়া তুই কি আর ঝি খুঁজে পাসনি তরু? এবার যখন আসবি, ওকে যেন আর এ বাড়িতে আনিসনে। মরণ হলেই মেয়েটার মুক্তি হয়!

তরুদিদির মা কেঁদে ফেললেন। হিমির মুখ দিয়ে আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল।

কিন্তু কান্নাকাটি সবই মিথ্যে হল। একটি দিনের মধ্যেই হিমি দিব্যি গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। গায়ে পিঠে তার দড়া দড়া দাগ, হাঁটুব কাছে কালশিরে, বাঁকারির ঘায়ে কপাল ফোলা—কিন্তু সে সুস্থ। লোহা পুড়ে পুড়ে ইস্পাতে পরিণত হয়েছে।

যাবার সময় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সকলেব সঙ্গে হিমি গাড়িতে গিয়ে উঠল হাসিমুখে। গাড়ি ছেড়ে দিল। অবাক হয়ে তার পথের দিকে আন্দু চেয়ে রইল।

এরপর তরুদিদি বাপের বাড়িতে এসেছেন অনেকবার। বছরের পব বছর। কিন্তু হিমি আর একটিবারও আসেনি সঙ্গে। সে গ্রামের মেয়ে। গ্রাম থেকেই মায়ের সঙ্গে যেন কোথায় ভেসে গেছে। তার জন্য তরুদিদির কোনো উদ্বেগ নেই। হিমিকে ভুলে গেছে সবাই।

অনেক বছব চলে গেছে তারপর।

সে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। মাসিমা মারা গেছেন অনেক কাল আগে। তরুদিদিদেরও আর কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায় না। ছড়িয়ে পড়েছে সবাই নানাদিকে।

আন্দু হয়েছে এখন আনন্দমোহন। বিয়ে করে সে ঘরসংসাব পেতেছে অন্যত্র। সে এখন ইলেকট্রিক আপিসে চাকরি করে। কোটপ্যান্ট পরে একখানা খাতা হাতে নিয়ে সে পাড়ায় পাড়ায় লোকের বাড়ির মেন ইলেকট্রিক মিটাব পরীক্ষা করে খাতায় টুকে নেয়। সাইকেল চড়ে তাকে আনাগোনা করতে হয়।

মাঝে মাঝে তাকে যেতে হয অনেক অলিগলিতে। হয়তো বা অনেক নোংরা পল্লিব আনাচে-কানাচেও কাজের জন্য ঢুকতে হয়। ইতব ভদ্র মানতে গেলে অফিসের কাজ চলে না। তবে কিনা কাজ হল তাব মাত্র দুমিনিটের। মিটারেব নম্বর মেলানো, আর কারেন্ট খরচের পরিমাণ পাঠ করে খাতায় টুকে নেওয়া—ব্যস, ছুটি।

হঠাৎ একদিন কিন্তু দু মিনিটে ছুটি পাওয়া গেল না। পিছনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়েছেলে প্রশ্ন করল, কত উঠল এবার?

খাতায় টুকতে টুকতে আনন্দমোহন জবাব দিল, আশি ইউনিট।

কথাটা শুনেও স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে রইল। আনন্দমোহনের সময় কম, এখনও বহু বাড়ি বাকি। খাতা বন্ধ করে সাইকেলখানার দিকে হাত বাড়াবার সময় স্ত্রীলোকটির দিকে তার চোখ পড়ল। সে একটু থতিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটিব মুখে মধুর হাসি, দুই কানে হিরের ফুল, গলায় জড়োয়া হার। যৌবনের লাবণ্য ঠিকরে পড়ছে!

চেনো?

আনন্দমোহন ঢোক গিলে বললে, হিমি না?

না—হেমাঙ্গিনী! চিনতে পেরেছ দেখছি! ষোল-আঠারো বছর হতে চলল, না?

হ্যাঁ, তা হবে বৈকি। কতকালের কথা!—আনন্দমোহন ভদ্র কণ্ঠে জবাব দিয়ে একবার সাইকেলখানার দিকে তাকাল।

তোমার সেই তরুদিদির কী খবর? সেই জমিদারেব গিন্নি?

আছেন তিনি এক রকম! দেশেই আছেন! তবে আমার ভগ্নিপতিটি মারা গেছেন বছর কয়েক হল।

হেমাঙ্গিনী একটু হাসল। তারপর বললে, তোমার সেই বোন আমাকে উপোস করিয়ে রাখত, আর তুমি ভাত চুরি করে অর্ধেক রাত্রে আমাকে খাওয়াতে—মনে পড়ে?

কাষ্ঠহাসি হেসে আনন্দ জবাব দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, কত ছেলেমানুষিই করা গেছে!—বারোটা বেজে গেল, এবার যাই!

ও কী কথা—হেমাঙ্গিনী বললে এতকাল পরে দেখা, সেই ভাতের দাম আজ শুধব বৈকি।

আনন্দ মুখ তুলে তাকাল।—বিলক্ষণ! সেসব পুরনো কাসুন্দি। সেসব কি আর মনে করতে আছে? এবার আমি যাই। বেশ তো, অন্যসময়ে আবার দেখা হবে।

কঠিন হাসি হেসে হেমাঙ্গিনী বললে, না গো না, দেখা যখন পেয়েছি, সে-দেনা এখনই শোধ করব। ভেতরে এসো।—বলতে বলতে হঠাৎ আনন্দের হাত থেকে খাতাখানা সে কেড়ে নিয়ে পুনরায় বললে, ঘরে না এলে এ খাতা এখনই ছিঁড়ে ফেলব।

আনন্দ বললে, এমন করলে আমার চাকরি যাবে, তা জান?

যাক্, আমি তোমায় এ পাড়ায় ভালো চাকরি দেব। আমাকে দেখিয়ে অনেক রোজগার করতে পারবে।

আনন্দ বললে, একজনের ওপর রাগ আছে তোমার অনেক কাল আগে, তাই বলে আমাকে এসব অপমানের কথা বলছ কেন?

অপমান? হেমাঙ্গিনী হেসে বললে, ঠিক জান এটা অপমান? যদি বলি এটা ভালোবাসা?

কিন্তু আনন্দকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ঝপ্ করে তার একখানা হাত ধরে হেমাঙ্গিনী তাকে উঠোন থেকে ঘরে তুলে আনল।

অদূরে কয়েকটি মেয়েছেলে জোট পাকিয়ে বসে ছিল, এবার খিলখিলিয়ে বলে উঠল, দেখো! দিনদুপুরে মাগির কাণ্ড দেখো!

ভিতরে এসে আনন্দ প্রতিবাদ জানাল—আরে আরে, শোন, বারোটার মধ্যে আমাকে আপিসে পৌঁছতে হবে। আঃ কী হচ্ছে এসব? সাইকেলখানা বাইরে পড়ে—চুরি যেতে পারে। ছাড়ো, ছাড়ো—

হেমাঙ্গিনী উল্লসিত কণ্ঠে বললে, সাইকেল গেলে আমিই তোমাকে আবার সাইকেল কিনে দেব! কিন্তু তুমি হারালে আর যে তোমাকে পাব না!

আনন্দ বললে, তোমার মতলব কী? তুমি যা ভাবছ আমি তা নই। সরো, যেতে দাও আমাকে।

কোনো কথায় কান না দিয়ে হেমাঙ্গিনী ভিতর থেকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, যাবে বৈকি, তুমি কি আর থাকতে এসেছ? তবে ঘণ্টাখানেক বাদে যাবে।

আমার কিন্তু এসব ভালো লাগছে না!

খিলখিল করে হেমাঙ্গিনী হেসে উঠল—লাগবে, একটু সবুর করো—চোখ বুজে আসবে ভালো লেগে! দাঁড়াও, আগে পুতুলটিকে সযত্নে কোলে নিয়ে কলঙ্কের কালি মাখাই—দেখবে তখন, দরজা খুলতে আর মন উঠবে না।

বাঘিনী আজ যেন তার শিকারকে ধরেছে। তার কঠিন কামড়ের থেকে পালাবার পথ ছিল না। সেই আবছায়াময় ঘরের গুমোটের মধ্যে হেমাঙ্গিনীর হিংস্র দুই চক্ষু দপদপ করে জ্বলছিল—ঠিক যেমন জ্বলত তরুদিদির দুই চক্ষু! দুই নারীর মধ্যে কোথায় যে একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র এতকাল ধরে থেকে গেছে, সেই কথা তলিয়ে ভাবতে গিয়ে আনন্দ যেন খেই হারিয়ে ফেলছিল।

বিশ্বসংসারের বিলুপ্তি ঘটে যাচ্ছে ততক্ষণে। শিকারটা প্রায় মৃত। ক্ষিপ্তোন্মত্ত জন্তুটা ধীরে ধীরে হৃৎপিণ্ডের রক্তটা লোল-জিহ্বাগ্রে লেহন করছিল। ঘরময় তখন ঘুরছে যেন একটা সুদূর মৃদুকণ্ঠের কান্নাজড়ানো প্রলাপ ঃ মার খেয়ে লাথি খেয়ে যখন আমার পিঠ দুমড়ে যেত, দিনের পর দিন কালশিরে পড়ত সর্বাঙ্গে...তখনও খেয়েছি নেড়িকুকুরের মতন, তোমাদের ভাত..দোরে দাঁড়িয়ে আমার সব অপমান তোমরা সবাই দেখতে..আজ আমার শরীরের থেকে ব্যাধি আর বিষ তুলে নিয়ে যাও। যদি পার তোমাদের ওই জমিদারগুষ্ঠির মধ্যে এই বিষ ছড়িয়ে দিও। বিষ নিয়ে যাও—ছারখার হোক তোমাদের পরিবার!

আনন্দর ততক্ষণে মৃত্যু ঘটে গেছে!

বিষাক্ত প্রেম



মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মনের মিল তো যখন-তখন যেমন-তেমন অবস্থায় যার-তার সঙ্গে অনায়াসেই হতে পারে। সত্য আর সরলার মনের মিল হতেও একমাসের বেশি সময় লাগল না। অপরে যেখানে বাদ সাধে না, মাথা ঘামানোও দরকার মনে করে না, সেখানে সেই মিলন হতে মনের মিলটাই সাধারণত যথেষ্ট, যে-মিলনটা মনের মিলের স্বাভাবিক পরিণতি। মনের মিলই তো প্রেম। কিন্তু সত্য আর সরলার মনের মিলের জন্য প্রয়োজনীয় মিলনটা যেন তারাই নিষ্প্রয়োজনীয় বলে বাতিল করে রেখে দিল। পরস্পরকে না দেখে তাদের মন করতে লাগল কেমন কেমন, কিন্তু তারা কেউ টের পেল না যে একসঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ না করে তাদের আর উপায় নেই।

ঘটনাচক্রে মনের যে তাদের মিল হয়ে গেছে, সরলার চেয়ে এ বিষয়ে সত্যই যেন হয়ে রইল বেশি উদাসীন। একেই তো লোকটা সে একটু চাপা, তার উপর তার ব্যবসা হল চুরি—সরলার ঘরে আসা-যাওয়াও সে আরম্ভ করেছে একদিন সুযোগমতো তার গয়না আর টাকা নিয়ে পালাবার মতলবে। জীবনে কোনো কিছুর অভিব্যক্তি না হওয়াটাই সত্যর পরম কাম্য। যা কিছু হবার গোপনেই হোক, জীবিকার্জন থেকে জীবন-যাপন পর্যন্ত। নিজের মনটা চুরি গিয়েছে জেনে নিজেকে ধন্য মনে করবার মানুষ সত্য নয়।

অবশ্য সরলার ঘরে প্রথম রাত্রে সে এসেছিল প্রচলিত মন-চোরার বেশে। মন-চোরার বেশটা কিছুদিন আগে সংগ্রহ করেছিল এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে। বাড়িতে পর্যন্ত চোরের ভয়ে ব্যবসায়ীরা কেন অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে থাকে তারাই জানে, ব্যবসায়ীটির নিজের ঘরে সত্য সুবিধা করতে পারেনি। তার বিগড়ে-যাওয়া ছেলেটার ঘর থেকে কেবল সংগ্রহ করে এনেছিল রাত্রিচর বাবু সাজবার সরঞ্জাম—ধুতি-পাঞ্জাবি, সোনার ঘড়ি, সোনার বোতাম ইত্যাদি। একজোড়া নতুন জুতো কিন্তু তাকে কিনতে হয়েছিল। তবে জুতো কেনার পয়সাটা জুটেছিল ব্যবসায়ীর বিগড়ে-যাওয়া ছেলেটারই মনিব্যাগে। কিন্তু যতই হোক, এমনিভাবে পরের মনিব্যাগ থেকে পয়সা রোজগার করাটা যখন সত্য জীবিকার্জনের উপায়, হাতে-আসা পয়সা খরচ করে দামি জুতো কিনতে হওয়ায় মনটা তার একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল বইকি। মোটামুটি বলা যায়, জামা কাপড়ের সঙ্গে মানানসই জুতো কেনার শখটাকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনেই সে সরলার ঘাড় ভাঙবার মতলব ঠিক করেছিল। পায়ের জুতোর মৃদু মসমসানি আওয়াজ কানে এলে মনের মধ্যে কেবলি মৃদু আপশোশ আর অস্বস্তি জাগতে থাকবে, এ অবস্থার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে মানুষ কদিন ঠিক থাকতে পারে?

রূপ বলে সরলার কিছু নেই। এ একটা অতি বড়ো সম্পদ সরলার—অতি বড়ো আকর্ষণ। সবাই রূপসি বলবে এমন রূপ যার নেই, কয়েকজন রূপসি বলবে আর কয়েকজন কুরূপা বলবে এমন রূপও যার নেই, রূপ সম্বন্ধে কোনো একটা মতামত ঠিক করে ফেলবার অপরিত্যাজ্য দায়িত্ব যে নারীকে দেখে কোনো পুরুষের পালন করবার প্রয়োজন হয় না, ভীরু পুরুষেরা তাকে ভারি পছন্দ করে। মেয়েমানুষ কেনা যে-সব পুরুষের স্বভাব, তারা বড়ো ভীরু। সরলার গায়ে গয়না আর ঘরে আসবাব আছে তাই অনেক।

তবে গায়ের গয়না অধিকাংশই গিল্‌টি করা, ঘরের আসবাব অধিকাংশই নিলামে-কেনা। সেকেন্ড-হ্যান্ড জিনিস। আসল সোনার গয়নাগুলি সরলা রেখেছে লুকিয়ে, গায়ে রাখার চেয়ে লুকিয়ে রাখলে গয়না যে নিরাপদ থাকে এ খবর জানা থাকায় গায়ের গিল্‌টি-করা গয়নার জন্য তার কোনো আপশোশ নেই। আসবাবগুলি তার আদায়-করা উপহার—আদায়-করা উপহার যে সাধারণত সেকেন্ড-হ্যান্ড জিনিস হয় এ খবরটাও জানা থাকায়, সেকেন্ড-হ্যান্ড আসবাবের জন্যও তার কোনো আপশোশ নেই। তাছাড়া, তিন পুরুষের একটা ভাঙা খাট আর উই-এ ধরা আলমারিতে সাজানো স্বামীর ঘরখানার তুলনায় সাহেববাড়ির নিলামে-কেনা আসবাবে সাজানো ঘরের শোভাই কী কম মনোহর! খাটখানা সরলার নতুন—এই ঘরে মদ খেতে খেতে সাতবছর আগে যে-

লোকটা হার্ট ফেল করে মরে গিয়েছিল, তার স্নেহের দান। সরলার স্বাধীন জীবনে সেই প্রথম স্নেহ, সেই প্রথম আসবাব। তা হোক। সাতবছরে অনেক স্মৃতি উবে যায়, কিন্তু দামি খাট পুরনো হয় না।

এই যে সত্য আর এই যে সরলা, কিছুদিন অযাচিতভাবে তারা পরস্পরকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল যে, একজনের জন্য অপরের মনে ঘৃণা নেই, বিদ্বেষ নেই, বিতৃষ্ণা নেই, বড়ো ভালো তারা, বড়ো সরল, আনন্দের নামে হই-চই করতে তাদের পটুত্ব অসাধারণ, দুজনের মধ্যে মিল যা হয়েছে তার তুলনা নেই।

তারপর দুজনের হল মনের মিল।

কিন্তু কথাটা যতদিন মিথ্যা ছিল ততদিন বিশ্বাস করানো গিয়েছিল সহজেই, এখন কে একথায় বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করিয়ে লাভও নেই, বিশ্বাস করবার উপায়ও নেই। সোজাসুজি মুখে বলে, আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, বড়ো বড়ো প্রতিজ্ঞা করে দেবদেবীর নামে দিব্যি কেটে জানালেও ফল হবে সেই একই। সত্যের লুকানো গয়না আবিষ্কারের ফন্দি-ফিকির ফাঁদের মতো সরলাকে যেমন ফাঁপরে ফেলে রেখেছে তেমনি ফাঁপরেই ফেলে রাখবে, সরলার টাকা আর উপহার আদায়ের চেষ্টা সত্যকে যেমন বিপদগ্রস্ত করে রেখেছে তেমনি বিপদগ্রস্তই করে রাখবে। মনের মিল হোক বা না হোক, কারোর জন্য সোনার মায়া বিসর্জন দেবার ক্ষমতা যে সত্যর নেই, টাকার মায়া বিসর্জন দেবার ক্ষমতা যে সরলার নেই!

সরলা ভাবে, লোকটা যদি চোর না হত! দাবি দাওয়া নিশ্চয় কিছু কমাতাম, আদরযত্নের পরিমাণ নিশ্চয় কিছু বাড়াতাম, বেশি বেশি সময় কাছে রাখবার নিশ্চয় খুব চেষ্টা করতাম। লক্ষ্মীছাড়া যে চোর বদমাস।

সত্য ভাবে, ছুঁড়ি যদি ঝানু না হত! ঘাড় ভাঙার মতলবটা নিশ্চয় বন্ধ রাখতাম, যা রোজগার করি নিশ্চয় সব এনে দিতাম, একটা বোঝাপড়া করে নিশ্চয় এখানে আস্তানা গাড়তাম। বজ্জাত যে পাকা কাবলিওয়ালি'

এইসব ভাবে আর দুজনেরই গা জ্বালা করে।

গা জ্বালা করে আর দুজনেই মনে মনে আপশোশ করে যে, আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি বাবা, ভাবনায় চিন্তায় দেহ গেল।

আপশোশ করে আর সত্য ভাবে, যত শিগগির সম্ভব কাজটা হাসিল করে পালাবে।

আপশোশ করে আর সরলা ভাবে, আদায়ে একটু ভাটা পড়লেই লোকটাকে তাড়াবে।

একদিন বিকাল বিকাল হাজির হয়ে সত্য বলে, 'কতগুলো টাকা পেয়েছি সরলি, আজ একটু ফুর্তি করা যাক, অ্যাঁ?'

সরলা খুশি হয়ে বলে, 'কত টাকা পেয়েছিস? কোথায় পেলি?'

এক চোখ বুজে সত্য মুখের যে ভঙ্গি করে তার তুলনা নেই, 'পেলাম।'

জগতে পাওয়াটাই সত্য। কী উপায়ে কোথায় কী পাওয়া গেল তার বিচার করতে বসে কেবল তার্কিক। সরলা তাই খুশিতে গদ গদ হয়ে বলে, 'জেলে যাবি বাপু তুই একদিন।'

বিপদ মাথায় করে উপার্জন করে এনে পুরুষ যখন হাতে তুলে দেয়, তখনকার মতো দুর্বল মুহূর্ত মেয়েমানুষের জীবনে আর কখন আসে? সরলা গদ-গদ হয়েছে টের পেয়ে সত্যও গদ-গদ হয়ে বলে, 'যাই তো যাব জেলে, তোর জন্য যাব তো?—বয়ে গেল!'

সরলা আরও গদ-গদ হয়ে বলে, 'ইস্!'

শুনে মনটা সত্যর যেন গলে যাবে মনে হয়। বিবেককে জ্ঞান হয়ে অবধি প্রশ্রয় দেয়নি, তবু কী যেন কামড়ায়। কামড়ায় অবশ্য সেই সাপের মতো, যে-সাপ কোনো অঙ্গে ছোবল দিলেই সেই অঙ্গটা হয়ে যায় অবশ।

তাই মুখখানা বিমর্ষ করে সত্য বলে, 'এক কাজ করি আয় আজ, একটা বড়ো বোতল এনে রেখে বায়স্কোপ দেখতে যাই চল—ফিরে এসে ফুর্তি জমানো যাবে। ভালো করে সাজিস কিন্তু, সবাই যেন হাঁ করে চেয়ে থাকে তোর দিকে।'

'আসমানি রঙের শাড়িটা পরব?'

এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে সত্যকে একটু ভাবতে হয়।

'বেগুনিটা পরলে হত না?—আচ্ছা পর, আসমানিটাই পর। বেগুনি আর আসমানি দুটোর যেটাই পরিস, এমন দেখায় তোকে মাইরি—সত্যি যেন তুই কার বউ।'

'ইস্!'

সত্য হাই তুলে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলে, 'গয়নাগুলো বদলাস কিন্তু—গিল্‌টি দেখে লোকে হাসবে, আমার কিন্তু লজ্জা করবে।'

এ সমস্যাটা সত্যসত্যই জটিল। সরলা কিন্তু চোখের পলকে মীমাংসা করে বলে, 'তুই বুঝি ভাবিস গিল্‌টি পরে যেতে আমার লজ্জা হয় না? যা না, টিকিট কেটে আনগে না তুই, আমি এদিকে বোতল-ফোতল আনাই, সেজেগুজে ঠিক হয়ে থাকি।'

সত্য সাত বছরের নতুন খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে বলে, 'টিকিট কাটতে যাব কি, চার আনার টিকিট তো নয়। দুজনে একবারে গিয়ে টিকিট কাটব।'

কিন্তু এ ফিকিরও তার সার্থক হয় না, কখন কোন্ ফাঁকে সরলা আসল সোনার গয়নাগুলি গোপন স্থান থেকে বার করে আনে সত্য টেরও পায় না। মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে যায়।

তবু, সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করে, 'কখন বদলালি গয়না?'

'এই তো মাত্তর।'

সত্যর বিস্ময় যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়।

'এই মাত্তর। — কোথায় ছিল রে?'

আদায়-করা উপহার নিলামে-কেনা সেকেন্ড-হ্যান্ড আলমারিটার দিকে সোজা আঙুল বাড়িয়ে বিনা দ্বিধায় সরলা বলে, 'ওই আলমারিতে, আবার কোথা?'

এমন নিশ্চিন্ত, নির্বিকার তার জবাব দেবার ভঙ্গি এবং এমন স্পষ্ট, জোরালো তার জবাব যে, এক বিষয়ে সত্য নিঃসন্দেহ হতে পারে! সরলার গয়না কোনোদিন আলমারিতে লুকানো ছিল না, ভবিষ্যতেও কোনোদিন থাকবে না।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে ইচ্ছা হয় বলে সত্য দাঁত বার করে হাসে। সরলাকে ধরে মারতে ইচ্ছা করে বলে তাকে বেশিরকম আদর করে। একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই জেনে মনটা যত এ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, রসিকতা করে ততই সে সরলাকে হাসায়। সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে যায় দেশি ফিরিঙ্গি হোটেলে, পচা চপ্ আর দামি বিলাতি মদ খাওয়ায়।

সরলা বলে, 'ঘরেই তো ছিল, আবার এখেনে কেন?'

'আজ একটু প্রাণ ভরে ফুর্তি করতে সাধ যাচ্ছে।'

'কেন, আজ কী?'

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ক্ষীণ একটা সংশয়, মৃদু একটা ভয় ধরা পড়ে। সত্য সাবধান হয়ে বলে, 'অতগুলো টাকা রোজগার করলাম যে আজ?' বলে দাঁত বার করে হাসে না, সরলাকে খুব বেশিরকম আদর করে না, বেশি বেশি রসিকতা করে হাসায় না।

ঘরে ফেরার কিছুক্ষণ পরে সরলা তাই জিজ্ঞাসা করে, 'হঠাৎ যে আবার মুখ ভার হল?'

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ভয় এবং সংশয় স্পষ্টতর প্রকাশ পাওয়ায় সত্য আবার সাবধান হয়ে বলে, 'না, মাইরি না। মুখ ভার হয়নি।'

জবাবটা স্বাভাবিক হওয়ায়, বড়ো রকম কৈফিয়ত না থাকায়, একটু নিশ্চিন্ত হলে সরলা স্ফূর্তি জমানোর আয়োজন করে। বোতলের রসালো বিষে কখন কোন্ ফাঁকে যে সত্য কাগজের মোড়কের খানিকটা গুঁড়ো বিষ মিশিয়ে দেয়, সে টেরও পায় না। সত্যকে ফাঁকি দিয়ে লুকানো গয়না বার করতে সে যেমন পটু, ফাঁকি দিয়ে তাকে বিষ খাইয়ে দিতে সত্যও তার চেয়ে কম পটু নয়।

বিষে বিষক্ষয় হবার নিয়মটা এ ক্ষেত্রে বোধ হয় বাতিল হয়ে যায় এজন্য যে বোতলের বিষকে লোকে সুধা বলে, মনেও করে তাই। মুখ বিকৃত করে সরলা বলে, 'থুঃ, কী খাওয়ালি আমাকে তুই? কী বিচ্ছিরি স্বাদ!'

সত্য অনুযোগ দিয়ে বলে, 'বললাম পচা চপ্ খাস না, তবু তুই খেলি। মর এবার! — নে, পান খা একটা।' বলে সস্নেহে তার মুখে পান গুঁজে দেয়।

তারপর সরলা আরও খানিকটা বিষ পান করে আরও কাতর হয়ে বলে, 'গা কেমন করছে। মাথা ঘুরছে। আর খাব না আমি।'

সত্য আবার অনুযোগ দিয়ে বলে, 'বললাম পান খাস না, তবু তুই খেলি। মর এবার। —আয় মাথাটা টিপে দিই।'

তারপর সত্যর কোলে মাথা রেখে সরলা ছটফট করে, গোঙায়, মুখে গাঁজলা তুলে মরে যাবার উপক্রম করে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে সত্যর মুখের দিকে, দুহাতে সত্যকেই জড়িয়ে ধরে বিষক্রিয়ার হাত থেকে অব্যাহতি খোঁজে, অপমৃত্যুকে জয় করার চেষ্টায় সাহায্য চায়, আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিথিল, অবসন্ন নিঃশব্দে নিশ্চেষ্ট হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেয় সত্যর হাতে, কিছু চেতনা কেবল থাকে চোখে আর চোখ দেখে মনে হয় ভেতরেও যেন একটা অদ্ভুত নির্বোধ চেতনা সৃষ্টি হয়েছে।

একেই বলে জীবনপাত করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা। যার সঙ্গে মনের মিল হয়েছে তাকে মরণাপন্ন করে কিছু গয়না আর টাকা সংগ্রহ করা। বিবর্ণ পাংশু মুখে সত্য একে একে সরলার গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নেয়, সরলার আঁচলে বাঁধা চাবির সাহায্যে লুকানো ও জমানো টাকাগুলি খুঁজে খুঁজে বার করে। কিন্তু সব সংগ্রহ করে পালাবার সময় বিষাক্ত প্রেমের বিষক্রিয়ায় সত্যর পাও যেন অবশ হয়ে আসে, মাথা ঝিম ঝিম করে। বদ্ধ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সরলার পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে কার সাধ্য কল্পনা করে সে পাকা মেয়ে, জবরদস্ত কাবলিওয়ালি। তাড়াতাড়ি পালানোই ভালো, কিন্তু সত্য জানে, সমস্ত রাত এ ঘরে কেউ আসবে না, দরজা বন্ধ থাকলে কাল অনেক বেলা পর্যন্ত সরলার খোঁজ পড়বে না। মুখের গাঁজলা মুছিয়ে মাথায় একটু জল দিতে কতক্ষণ লাগবে?

সরলার আসমানি রঙের শাড়ির আঁচলেই তার মুখ মুছিয়ে, মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে এবং অনেক যত্নে বাঁধা খোঁপা বাঁচিয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে দিলে আর কতটুকু সেবা করা হয়? চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় চোরের পর্যন্ত এইটুকু সেবা করে তৃপ্তি হয় না! এমনি আশ্চর্য সেবা করার নেশা!

পাখা দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করে সত্যর হঠাৎ মনে হয়, মরবার কথা নয় বটে, কিন্তু যদি মরে যায়? সব বিষের ক্রিয়া তো সকলের ওপর সমান হয় না। যে বিষে একজনের কিছুই হয় না, সেই বিষে অন্য একজনের মরে যাওয়া আশ্চর্য কী? আর যদি জ্ঞান না হয়? সরলার অপলক চোখে আর যদি দৃষ্টি না আসে, বক্ষস্পন্দন যদি চিরদিনের জন্য থেমে যায়? অনেকেই জানে সে সরলার সঙ্গে ছিল, খোঁজ তার পড়বেই। সরলাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে পালালে পালাবার সময়টা সে একটু বেশি পাবে বটে, কিন্তু এই অবহেলার জন্য সরলা যদি মরে যায়, চোরের চেয়ে খুনিকে আবিষ্কার করার জন্য পুলিশের মাথাব্যথাও হবে সেই অনুপাতে বেশি। ধরা পড়লে চোরের চেয়ে খুনির শাস্তিটাও চিরদিন বেশিই হয়ে এসেছে।

সত্য জানে সরলার কিছু হবে না, কাল অনেক বেলায় জ্ঞান হয়ে টাকা আর গয়নার শোকে সে যদি হার্টফেল না করে। যে বিষ যতখানি সরলার পেটে গিয়েছে তার তিনগুণ বিষ পেটে গেলেও সরলার কিছু হবে না, কিন্তু যদি হয়? খুব কি দুর্বল নয় সরলা, খুব নির্জীব? আজ পর্যন্ত যত মেয়েমানুষ সে দেখেছে, তাদের সকলের চেয়ে প্রাণশক্তি কি সরলার কম নয়? এমন কোমল এমন অসহায় জীব জগতে আছে?

ভয়ে সত্যর বুকের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে, নিস্পন্দ সরলার দিকে চেয়ে জগতে কারও যে বিষে মরবার কথা নয় সেই বিষটুকু সহ্য করবার মতো শক্ত-সমর্থ সরলা নয় কেন ভেবে ক্ষোভে তার চোখে জল আসে। এত বেশি রাগ হয় যে, সরলার শিথিল অবসন্ন দেহটা বুকে তুলে তাকে পিষেই মেরে ফেলতে ইচ্ছা হয় এতদিনের মতলব যে এমনিভাবে ফাঁস করে দেয়, সেই তার উপযুক্ত শাস্তি। রাগটা খুব বেশি হয় বলে বুকে পিষে মেরে ফেলবার কথাটাই সত্যের মনে আসে, গলা টিপে মেরে ফেলবার সহজ উপায়ের কথাটা খেয়াল হয় না।

একে একে গয়নাগুলি সরলাকে পরিয়ে দিয়ে, তার টাকাগুলি যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে, আঁচলে চাবিটা বেঁধে দিয়ে সে সরলার আরও জোরালো সেবা আরম্ভ করে দেয়। যে অবস্থা ফিরে এলে সে যে বাঁচবেই এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকবে না, সে অবস্থাটা ফিরে আসতে কাল বেলা হবে—মেয়ে কি সহজ ননীর-পুতুল! সত্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এবার আর সুবিধা হল না। যাক, কী আর করা যায়, চুরি করার জন্য খুনি হবার বিপদটা তো ঘাড়ে করা চলে না। পরের বার অন্য ব্যবস্থা করবে—আর বিষটিষ নয়। কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করলে, একদিন কি আর টের পাওয়া যাবে না সরলা গয়নাগুলি কোথায় লুকিয়ে রাখে? যত দিন তা টের না পাওয়া যায়, ততদিন সে এমন ভাব দেখাবে যে সরলাকে ছেড়ে সে একদণ্ড থাকতে পারে না, সরলার প্রেমে হৃদয় তার টইটুম্বুর!

উৎসর্গ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অরুণ তাহার প্রকাশকের নিকট হইতে বাড়ি ফিরিল রাত্রি নয়টার পরে। ক্লান্তপদে তিনতলার সিঁড়ি ভাঙিয়া যখন নিজের ছোটো ফ্ল্যাটটিতে সে চাবি খুলিয়া ঢুকিল, তখন যেন আর আলো জ্বালিবার মতোও দেহের অবস্থা নাই। অবশ্য আলো জ্বালিবার খুব বেশি প্রয়োজনও ছিল না। পূবের জানালায় শুধু শার্শি দেওয়া ছিল, তাহারই মধ্য দিয়া প্রচুর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, ঘরের মধ্যে প্রায় সব কিছুই আবছা দেখা যায়। সে পাঞ্জাবি ও গেঞ্জিটা খুলিয়া আলনায় টাঙাইয়া রাখিল, তাহার পর ঘরের জানালাগুলি সব খুলিয়া দিয়া একটা ক্যাম্বিসের চেয়ারের উপর দেহ এলাইয়া দিল।

নীচে তখনও কর্মমুখর কলিকাতা ঘুমাইয়া পড়ে নাই। তখনও ট্রাম-বাস পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে, দোকান-পাটও সব বন্ধ হয় নাই। শহরের কর্মব্যস্ততার এই মিলিত কোলাহল এতটা উপরে আসিয়া কেমন যেন মধুরই লাগে। নীচেকার উজ্জ্বল আলো এখানের চন্দ্রালোককে ম্লান করিতে পারে না, কিন্তু তাহার একটা রেশ এ পর্যন্ত পৌঁছায়। বেশ লাগে অরুণের এ ব্যাপারটা। সে নিজের একান্ত কাছে কলরব পছন্দ করে না, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নির্জনবাসেও তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। সেইজন্য ইচ্ছা করিয়াই শহরতলিতে যায় নাই, শহরের জনতামুখর এই বিশেষ ব্যস্ত রাজপথটিতেই আসিয়া ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়াছে।

ফ্ল্যাট তো ভারি! মোট দেড়খানা ঘর। ঘর বলিতে ওই একটি, পাশে যে স্থানটি আছে তাহাতে আধখানা ঘর বলিলেও বেশি সম্মান করা হয়—চলন মাত্র, একটি ছোটো টেবিল পড়িলেই আর নড়িবার উপায় থাকে না। অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলি হইতে তিল তিল করিয়া স্থান বাঁচাইয়া এই অদ্ভুত তিলোত্তমা তাহার অদৃষ্টে গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য একপক্ষে তাহা ভালোই হইয়াছে বলিতে হইবে, নহিলে পনেরো টাকা ভাড়ায় একটা পৃথক ফ্ল্যাটই বা মিলিত কোথায়? অরুণের এখন যা মানসিক অবস্থা, মেসের বাসা সে কল্পনাও করিতে পারে না। অথচ শুধু একজন পুরুষকে ঘরও বড়ো একটা কেহ ভাড়া দিতে চায় না। আর যদি পাওয়া যায়, সেও বড়ো গোলমাল।

তাহার চেয়ে এই ই বেশ। পনেরোটি টাকা ভাড়া দেয় আর এই বাড়িরই দারোয়ানকে দেয় সাতটি টাকা। সে-ই দুই বেলা রান্না করিয়া দিয়া যায়। হিন্দুস্থানী দারোয়ান, সুতরাং মাছ-মাংস সে খায় না, দিতেও পারে না। কিন্তু তাহাতে অরুণের বিশেষ অসুবিধা হয় না, নিরামিষই তাহার ভালো লাগে। আর একটি ঠিকা ঝি আছে, সে প্রত্যহ সকালে আসিয়া ঘরের কাজ করিয়া দিয়া যায়। এই তাহার সংসার।

ইহার বেশি আজ আর সে চায়ও না, বরং এইটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বরাবর বজায় থাকিলেই সে খুশি। মাস-ছয়েক আগে এই ব্যবস্থার কথাও সে কল্পনা করিতে পারিত না। দুইটি কি তিনটি গোটা পাঁচ ছয় টাকার টিউশনি সম্বল করিয়া যাহাকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইত মেসের দুই বেলা ভাত এবং কোনোমতে কোথাও একটু মাথা গুঁজিবার স্থান, ওইটুকুই ছিল তাহার পক্ষে বিলাস। ––একেবারে সম্প্রতি, মাত্র ছয় মাস আগে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, চল্লিশটাকা মাহিনার একটা মাস্টারি মিলিয়াছে এবং চাকরিটা টিকিয়া যাইবে বলিয়াই সে আশা করে। অন্তত সেই ভরসাতেই সে মাসতিনেক আগে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া লইয়াছে।

অবশ্য শুধু মাস্টারিই আজ আর তাহার একমাত্র অবলম্বন নয়, প্রায় বছর-দুয়েক আগে, গভীর বেদনা এবং নৈরাশ্যের মধ্যে, উপার্জনের আর একটি পথও হঠাৎ সে খুঁজিয়া পাইয়াছিল। খুব ছোটোবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে সে কবিতা ও গল্প লিখিত। এতদিন পরে মানসিক অবসাদে যখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন সে সেই পুরাতন অভ্যাসের মধ্যেই আবার সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল। এবার আর কবিতা লিখিবার চেষ্টা করে নাই, শুধু গল্প। একে একে দু-একটি সাময়িক-পত্রে সে গল্প ছাপাও হইল, ক্রমে তাহার দরুন পাঁচ টাকা

সাত টাকা দক্ষিণাও মিলিতে লাগিল। সেদিন যাহা ছিল অঙ্কুর, আজ তাহাই মহীরুহে পরিণত হইয়াছে—বাংলা দেশের এক বিখ্যাত প্রকাশক একেবারে তিন শত টাকা দিয়া তাহার একখানি উপন্যাস লইয়াছেন, এবং সেটি ছাপাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ তাহারই শেষ কয় পৃষ্ঠার প্রুফ এবং বাকি এক শত টাকার চেক প্রকাশক দিয়া দিয়াছেন।

অরুণ একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। প্রুফটা দেখিতেই হইবে, আলোটা জ্বালা দরকার। প্রকাশক মোহিতবাবু অনুরোধ করিয়াছেন, ইশকুল যাবার পথেই তো প্রেস পড়বে, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে যাবার পথে প্রুফটা ফেলে দিয়ে গেলে বড্ড ভালো হয়। দশটার আগে পৌঁছলে কাল ছাপা শেষ হয়ে পরশু বইটা বেরিয়ে যেতে পারে।

প্রথম উপন্যাস বাহির হইবে। তাহার নিজের আগ্রহও বড়ো কম নয়। সে আলোটা জ্বালিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল মোহিতবাবুর আর একটা কথা, 'টাইটেলের চার পাতা বাদ দিয়েও আর দুটো পাতা বাঁচছে। উৎসর্গ করবার যদি কাউকে থাকে তো লিখে দিন না। প্রথম বই আপনার, কাকে 'উৎসর্গ' করবেন ভেবে দেখুন।'

কথাটা খুবই সাধারণ। কিন্তু ইহার পিছনে কতখানি অপ্রীতিকর চিন্তা এবং স্মৃতিই না জড়াইয়া আছে!

অরুণ আর আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিল না। নীচে কোলাহলমুখর, আলোকোজ্জ্বল রাজপথের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আবার চেয়ারেই আসিয়া বসিল। তাহার প্রথম বই কাহাকে উৎসর্গ করিবে—এই প্রশ্নটার সামনাসামনি দাঁড়াইয়া আজ এই সত্যটাই সে গভীরভাবে উপলব্ধি করিল যে, পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই। আত্মীয়, বন্ধু, স্নেহভাজন, কোথায়ও এমন কেহ নাই, যাহার হাতে তাহার বহু বিনিদ্র রজনীর ফল, বহু সাধনার বস্তু এই বইখানি তুলিয়া দেওয়া যায়।

অথচ আজ তাহার সবই থাকিবার কথা। মা খুব অল্প বয়সে মারা গিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে অভাব জানিতে দেন নাই কখনোই। অতি যত্নে মানুষ করিয়া বি-এ পাস করাইয়া অফিসেও ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন এবং সংসারে লোকের অভাব বলিয়া অনেক খুঁজিয়া সুন্দরী পুত্রবধূও ঘরে আনিয়াছিলেন। সেদিন কিন্তু জীবনকে বেশ রঙিন বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু একটি বৎসর কাটিতে না কাটিতে কী কাণ্ডটাই না হইয়া গেল! বাবা মারা গেলেন, তাহারই মাস কয়েকের মধ্যে হঠাৎ অফিসটিও উঠিয়া গেল। সেই যে চাকরি গেল—আর কিছুতেই কোথাও কোনো কাজ মিলিল না। এক মাস, দুই মাস করিয়া বৎসর, ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বাবা বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, সুতরাং একে একে নীলিমার গহনাগুলি সব গেল। তাহার পর ঘরের আসবাব-পত্র, সর্বশেষে বাসন-কোসনও আর রহিল না। মধ্যে মধ্যে দুই একটি ছোটোখাটো টিউশনি হয়তো পায় কিন্তু সেও পাঁচ সাত টাকার মাত্র। তাহাতে খাওয়া পরা বাড়ি-ভাড়া সবগুলি চলে না। তাই বাড়ি ছাড়িয়া সে ফ্ল্যাটে আসিল। সেখান হইতে ভাড়াটে-বাড়ির নীচের তলায় একখানা অন্ধকার ঘর, তবু ভাড়া দেওয়া যায় না। অপমানের ভয়টা বড়ো বেশি ছিল বলিয়া বেশি ধার করিতে সে পারিত না। যাহা কিছু সামান্য পাইত কোনো মতে ঘর ভাড়াটা দিয়া দিত, সুতরাং নিজেদের ভাগ্যে দিনের পর দিন চলিত উপবাস।

উঃ, সে দিনের কথা মনে করিলে আজও বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়। শুধু নৈরাশ্য ও তিক্ততা। এতটুকু আশা, এতটুকু আনন্দের আলোও কোথাও নাই। সারাদিনই প্রায় কাজের চেষ্টায় ঘুরিত। গভীর রাত্রে ক্লান্ত দেহ ও মন লইয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিত, হয়তো নীলিমা তখনও শুষ্কমুখে তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আগে আগে সে প্রশ্ন করিত, নয়তো একটু ম্লান হাসিত, ইদানিং তাহাও আর পারিত না। উপর্যুপরি উপবাসে তাহার প্রাণ-শক্তি গিয়াছিল ফুরাইয়া। দিনের পর দিন এই একই ঘটনা ঘটিয়াছে, তবু একটি কুড়ি টাকা মাহিনার চাকরিও সে জোটাইতে পারে নাই।

অরুণের আত্মীয়-স্বজনরা দারিদ্র্য দেখিয়া বহুদিনই ত্যাগ করিয়াছিলেন। নীলিমারও বিশেষ কেহ ছিল না। অসামান্য রূপ দেখিয়া নিতান্ত গরিবের ঘর হইতেই অরুণের বাবা তাহাকে আনিয়াছিলেন। সুতরাং এক বেলা

আশ্রয় দিতে পারে, খাদ্য দিতে পারে, শেষ পর্যন্ত এমন কেহই যখন আর রহিল না, তখন কোনো প্রকার ধার করা বা সাহায্য চাওয়ার চেষ্টাও অরুণ ছাড়িয়া দিল। এরপর চলিতে লাগিল শুধু উপবাস। দুই দিন, তিন দিন অন্তর হয়তো ভাত জোটে, তাও একবেলা।

অবশেষে নীলিমা আর সহিতে পারিল না। আশ্রয় দিবার আত্মীয় ছিল না বটে, কিন্তু রূপ যথেষ্ট ছিল বলিয়া সর্বনাশ করিবার লোকের অভাব ঘটিল না। অরুণের চরম দুর্দিনে, তাহার ভার বহন করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া নীলিমা একদিন চলিয়া গেল। যাইবার সময় শুধু রাখিয়া গেল, একছত্র চিঠি—

'আমি আর সইতে পারলুম না। আমাকে ক্ষমা করো। আমার ভার ঘুচলে তুমিও হয়তো একবেলা খেতে পাবে।'

অরুণ অকস্মাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথা দিয়া তখন যেন আগুন বাহির হইতেছে। সে বাথরুমে গিয়া মাথায় খানিকটা জল থাবড়াইয়া দিল, তাহার পর মুখ-হাত মুছিয়া জোর করিয়া আলোটা জ্বালিয়া প্রুফ দেখিতে বসিল। কাজ সারিতেই হইবে, বৃথা চিন্তা করিবার সময় তাহার নাই।

কিন্তু প্রুফ ছিল সামান্য, শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। আবার সেই উৎসর্গের প্রশ্ন। সামনে কাগজগুলো খোলাই পড়িয়া রহিল, টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা নিঃশব্দে জ্বলিতে লাগিল, সে জানালার মধ্য দিয়া রাস্তার উপরে আর একটা বাড়ির কার্নিশ, যেখানে একফালি চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মন তাহার চলিয়া গিয়াছে তখন কত দূরে, অতীতের এক কুৎসিত কর্দমাক্ত মেঘ-ঘন দিনে। যেখানে আলোর রেখামাত্র নাই, সেদিনের কথা মনে পড়িলে আজও তাহার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে—

সেদিন হয়তো তাহার মরাই উচিত ছিল। নিজের স্ত্রী ভরণ-পোষণের অক্ষমতার জন্য যাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়, সে আবার সেই কালামুখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে কী বলিয়া? কিন্তু মরিতে সে পারে নাই। হয়তো স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু আসিলে সে আদর করিয়াই বরণ করিত, কিন্তু স্বেচ্ছায় জীবনটাকে বাহির করিতে সে পারে নাই, অত দুঃখের পরেও না। বরং গৃহস্থালীর সামান্য যে দুই একটা তৈজস অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বেচিয়া একটা মেসে গিয়া উঠিয়াছিল, এবং নিজের মনেও স্বীকার করিতে আজ তাহার লজ্জা হয়, দুই বেলা ভাত খাইতে পাইয়া সে যেন স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলিয়াছিল। সেই হইতেই সে নিশ্চিন্ত এবং নিঃসঙ্গ।

তাহার পর আবার একটু একটু করিয়া সে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। আজ বরং তাহার অবস্থা সচ্ছলই, কিন্তু, সচ্ছলতা একদিন যাহার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, দুঃখের ঘূর্ণাবর্তে তাহার সেই জীবন-সঙ্গিনীই গিয়াছে হারাইয়া। আজ আর এ স্বাচ্ছন্দ্যের যেন কোনো মূল্যই নাই। কোথায় আছে সে কী জানে, সুখে আছে কি আরও দুঃখে আছে! কাহার আশ্রয়ে আছে তাই বা কে জানে, সে কেমন লোক! হয়তো বা বাঁচিয়াই নাই। দুঃখে, কষ্টে, দারিদ্র্যে—হয়তো অকালেই এ পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে। কথাটা ভাবিতেই অরুণের দুই চোখ অশ্রু-পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বেচারি অত দুঃখই সহিল, আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে হয়তো আর ইহার প্রয়োজন হইত না। আজ এই স্বাচ্ছন্দ্যের সে-ও অংশ লইতে পারিত, আজ আর তাহার প্রথম উপন্যাস কাহাকে উৎসর্গ করিবে, এ প্রশ্ন উঠিত না। সে হয়তো আজও বাঁচিয়া আছে, অথচ এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিতেছে না অরুণ কিছুতেই।

নীলিমাকেই সে উৎসর্গ করিবে নাকি শেষ পর্যন্ত? কুল-ত্যাগিনী স্ত্রীকে?

দোষ কী?

চিন্তাটা মাথায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন অস্থির হইয়া উঠিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করিয়া দিল।

বেচারি নীলিমা, তাহারই বা অপরাধ কী, কী কর্মটাই না করিয়াছে সে! দিনের পর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়াছে, লজ্জা নিবারণের কাপড়টুকু পর্যন্ত জোটে নাই। বহুদিন তাহাকে গামছা পরিয়া একমাত্র ছেঁড়া কাপড় শুকাইয়া লইতে হইয়াছে। তবু—তবু সে গঞ্জনার একটি শব্দও মুখ দিয়া উচ্চারণ করে নাই, কোনো প্রকার অনুযোগ করে নাই, আবার স্বামী খাইবে বলিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। শেষ পর্যন্ত যদি সে একদিন দুর্বল হইয়া পড়িয়াই থাকে তো এমন কিছু অপরাধ নয়।

অরুণ তাহার মনের মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া, আজ বোধ করি প্রথম, লক্ষ করিল যে, সেখানে নীলিমার সম্বন্ধে কোনো অভিমান, কোনো অনুযোগই আর অবশিষ্ট নাই। হয়তো আছে বেদনা-বোধ, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী তাহার নিজেরই অদৃষ্ট। যতদিন নীলিমাকে সে পাইয়াছে, কখনো কোনো অভিযোগের কারণই তো সে ঘটিতে দেয় নাই। স্নেহে, প্রেমে, সেবায়, লীলাচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ তাহার সেই কিশোরী বধূর কথা মনে পড়িলে আজও সারা দেহে রোমাঞ্চ হয়। না, যতদিন সে পাইয়াছে, আশ মিটাইয়াই পাইয়াছে। এমন দুর্ভাগ্য খুব অল্প লোকেরই হয় বটে, কিন্তু এমন সৌভাগ্যও কদাচিৎ দেখা যায়। প্রথম যৌবনের, সেই নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার এক-একটি বিনিদ্র রজনীর যে মধুস্মৃতি তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে, শুধু সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই তো একটা জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে পারে। তবে, তাহার কি কোনো মূল্যই নাই, সেজন্য কোনো কৃতজ্ঞতা নাই? অরুণের নিজের দোষে, অসীম দুঃখের ফলে, একটি মুহূর্তের দুর্বলতায় যদি তাহার পদস্খলনই হইয়া থাকে তো সেইটাই কি সে মনের মধ্যে বড়ো করিয়া রাখিবে আর অতখানি প্রেম, অতখানি নিষ্ঠা সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে? না, মনের এই দুর্বলতা, এই অন্যায় সংস্কারকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না, নীলিমাকেই সে প্রথম বই 'উৎসর্গ' করিবে।

নীচে তখন রাজপথ জনবিরল হইয়া গিয়াছে, দোকান-পাটগুলি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় আলোও হইয়া উঠিয়াছে খুব ম্লান। শহরের অশান্ত বিক্ষুব্ধতার উপরে যেন চমৎকার একটি সুষুপ্তি নামিয়া আসিয়াছে, সমস্তটা মিলিয়া একটা করুণ অথচ মধুর শান্তি।

সে খানিকটা যেন কীসের আশায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের ফ্ল্যাটে তখনও স্বামী-স্ত্রীর আলাপের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে, নীচে কোথায় একটা ছেলে কাঁদিতেছে একটানা সুরে। আর সব শান্ত, স্তব্ধ।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার চেয়ারে বসিল। তাহার পর দৃঢ় হস্তে প্রুফের কাগজগুলো টানিয়া লইয়া উৎসর্গ পৃষ্ঠাটি লিখিয়া দিল। বেশি কিছু নয়, শুধু — "শ্রীমতী নীলিমা দেবী, কল্যাণীয়াসু"।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায়ই বই বাহির হইয়া গেল। প্রকাশক মোহিতবাবু এককপি হাতে করিয়া রাত্রে আসিলেন রক্ষিতার বাড়ি। উপরে উঠিয়া তাহার সামনে বইখানা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এই নাও, তোমার সেই বই বেরিয়েছে।

সে বসিয়া কী একটা বুনিতেছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলি নামাইয়া রাখিয়া সাগ্রহে বইটা তুলিয়া লইল। চমৎকার বাঁধাই, উপরে রঙিন ছবি, তাহারই মধ্যে ঝকঝক করিতেছে বই ও লেখকের নাম! খানিকটা নাড়িয়া চাড়িয়া বইটা বিছানার পাশে একটা টিপয়ের উপর সযত্নে রাখিয়া দিয়া সে উঠিয়া মোহিতবাবুর স্বাচ্ছন্দ্যের তদ্বিরে মন দিল। চাদর ও জামাটা খুলিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে মোহিতবাবু বলিলেন, বাবা বাঁচলাম! যা তাগাদা তোমার, ওই বইটা যেন আমার সতীন হয়ে উঠেছিল।

তাহার পর নীচের ঢালা বিছানাটায় দেহ এলাইয়া দিয়া কহিলেন, রামটহল গেল কোথায়? একটু তামাক দিতে বল। ... বেরুল তো, এখন খরচটা উঠলে বাঁচি। তোমার কথা শুনে একগাদা টাকা দিয়ে বইটা নিলাম, ওর আদ্ধেক টাকাও কেউ দিত না।

ও পক্ষ তখন কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, নিশ্চয়ই উঠবে। অত ভালো লেখা, লোকে নেবে না?

মুখটা বিকৃত করিয়া মোহিত কহিলেন, কে জানে কী লেখা, আমি কি আর কোনোটা পড়েছি ছাই! তুমিই খালি ওঁর নাম করতে গলে পড়ো।

হ্যাঁ গো মশাই, শুধু বুঝি আমি? ভালোই যদি না হবে, তাহলে অতগুলো মাসিক-পত্র ওঁর লেখা ছাপে কেন?

মোহিতবাবু একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, ওদের তো ভারি বুদ্ধি, ওরা যা পায় তাই ছাপে। .... তোমারও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, যতগুলো কাগজ অরুণবাবুর লেখা ছাপে, সবগুলোই তো তুমি নিতে শুরু করেছ দেখছি।

কী করব, একলা সময় কাটে কী করে আমার? তুমি কিছু ভেবো না, নিশ্চয় ভালো বিক্রি হবে। সব কাগজে পাঠিয়ে দাও, দেখবে, ভালো আলোচনা বেরুলেই বিক্রি হতে শুরু হবে।

হলেই বাঁচি। একেবারে নতুন লেখক, ভয় করে বড্ড।

মোহিতবাবু খানিকটা চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। একটু পরে রামটহল তামাক দিয়া যাইতে উঠিয়া বসিয়া গড়গড়ার নলটা হাতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, হ্যাঁ, আর একটা ভারি মজার ব্যাপার বলতে ভুলে গেছি। শুনেছ, ওর বউয়ের নামও নীলিমা।

নীলিমা হেঁট হইয়া জলখাবারের থালা রাখিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার হাতটা কাঁপিয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, কে বলেছে?

মোহিতবাবু জবাব দিলেন, ওই দেখ না বইটা খুলে, উৎসর্গ করেছেন তার নামে।

নীলিমা তাড়াতাড়ি বইটা খুলিয়া উৎসর্গ পৃষ্ঠাটা বাহির করিল। মিনিটখানেক সেদিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু ও যে ওর বউয়ের নাম, তা তুমি কেমন করে জানলে?

মোহিতবাবু মুখ হইতে নলটা সরাইয়া বলিলেন, নামটা দেখে ভারি মজা লাগল। বলতে তো পারি না কিছু। ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে মশাই?

অরুণবাবু জবাব দিলেন, 'আমার স্ত্রী।' অদ্ভুত মিল, না?

নীলিমা কোনো উত্তর দিল না। তখনও তাহার চোখের সামনে সেই উৎসর্গ পৃষ্ঠাটা খোলা, কিন্তু অক্ষরগুলি তখন আর চোখে পড়িতেছিল না, সব যেন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল।

আরও মিনিট দুই পরে বইটা বন্ধ করিয়া সে ঈষৎ রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, বসো, তোমার চা-টা নিয়ে আসি—

কিন্তু তখনই সে নীচে গেল না। ওপাশের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ গলির উপরের একফালি অন্ধকার আকাশের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কে জানে কাহার উদ্দেশে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

মোহিতবাবু ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

চোর! চোর!



বুদ্ধদেব বসু

অন্ধকারে চোখ মেলে ললিতা প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেল না। তবে, একটু আগে, ঘুমের মধ্যে একটা শব্দ সে শুনেছে, তা ঠিক। ঠিক তো? তার ঘুম খুব পাতলা, একটুতেই ভেঙে যায়। আগেকার দিনে—ছেলেবেলায়—সে ভীষণ ঘুমুত। এমন ঘুমুত যে ভূমিকম্পে বাড়ি ভেঙে পড়লেও তার ঘুম ভাঙত না। একবার—সতেরো বছর বয়সে—সে তখন সবে নাম লিখিয়েছে—একটি ছেলে এল তার কাছে, ভারি সুন্দর দেখতে। কত মিষ্টি কথা যে বললে তার হিসেব নেই। ছেলেমানুষ সে, মিষ্টি কথায় ভুলেছিল। ছেলেটিকে থাকতে দিয়েছিল রাত্রে। পরদিন যখন তার ঘুম ভাঙল, ছেলেটি নেই। ললিতার দুহাত ভরা চুড়ি ছিল, তাও নেই। কানে দুল ছিল, তা-ও অদৃশ্য হয়েছে। পাশের ঘরের মালতী বলেছিল—এখনো ললিতার সে-কথা মনে পড়ে—'এখন আর কাঁদাকাটি করে কী হবে, বল। তোর যেমন বুদ্ধি, তেমনি হবে তো! বলি, রাত্তিরে কখনো কোনো বাবুকে ঘরে রাখতে আছে! ফূর্তি করে টাকা গুনে দিয়ে চলে যাও—এর বেশি আবার কার সঙ্গে কী সম্পর্ক! যেমন গিছলি পিরিত করতে, পেলি তো ফল! প্রাণে যে মেরে যায়নি, এই তোর সাত-পুরুষের ভাগ্যি। পুরুষমানুষকে কেউ কখনো বিশ্বেস করে, পোড়ারমুখি! আর কী রাক্ষুসে ঘুমই বা তোর—কান থেকে দুল খসিয়ে নিলে, কিচ্ছু টের পেলিনে। আফিং টাফিং খাইয়েছিল নাকি?...'

পুরুষমানুষকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে! না—তার পর থেকে, সে অন্তত কখনো করেনি। সর্বদা সজাগ, সর্বদা সতর্ক। অতিথির মনোরঞ্জন করতে তাকে হেসে কথা কইতে হয়, গান গাইতে হয়; অলস কটাক্ষ-বিলাসে, উদ্দীপক দেহভঙ্গিতে মোহ-বিস্তার করতে হয়, কিন্তু তার মনের এক কোণে কড়া পাহারা বসে থাকে সব সময়। মদের নেশাতেও তা ঝিমিয়ে পড়ে না, ঘুমের মধ্যেও তা ঘুমোয না। সর্বদা সন্ত্রস্ত, সর্বদা সজাগ। কোথায় খুট করে একটু শব্দ হল, অমনি সে জেগে উঠল। তার ঘরেই শব্দ একটা হয়েছে—ঠিক তো? ললিতা চোখ খুলে রেখে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঝ্রাম।- -উঃ! সঙ্গে সঙ্গে ললিতা হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচ টিপল।

মশারি তুলে বিছানার বাইরে আসতে-আসতেই তার চোখ পড়ল উল্টো দিকের দেয়ালের বড়ো আয়নায়। সেখানে দেখল, ঘরের মাঝখানকার গোল টেবিলের পাশে একটা চেয়ার উল্টে গেছে, আর একটা মনুষ্য-মূর্তি চেয়ারটার পিঠে হাত রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাতেই লোকটির সঙ্গে তার চোখোচোখি হল। ঠিক চোখোচোখি--তার বেশি নয়। কারণ লোকটির মুখ কালো একটা মুখোশে ঢাকা, নাকের দু'পাশে দুটো গর্তের ভিতর দিয়ে কালো একজোড়া চোখ ঝকঝক করছে। লোকটির পরনে—ললিতা একদৃষ্টিতে দেখে নিলে--জিনের একটা হাফপ্যান্ট, অত্যন্ত নোংরা। গায়ে বেখাপ্পা রকম ফর্সা একটা হাত কাটা শার্ট। খালি পা। মাথার চুল যেন আঠা দিয়ে লেপটে উপর দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

নিজের অজান্তে ললিতার বুক থেকে একটা চিৎকার উঠে আসছিল, সচেতন চেষ্টায় সে সেটা রোধ করলে। পুরুষ চরিয়ে যাকে খেতে হয়, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলে তার চলে না। নিতান্ত নিঃসহায় তার জীবন, সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। ঘোর বিপদেও রক্ষা করবার কেউ নেই; অনিষ্ট যে-কেউ করতে পারে। বছরের পর বছর অনেক বিপদে, অনেক দুঃখে, অনেক ক্ষতিতে নিজেকে নিজেই সামলাতে হয়েছে; স্বাধীন আত্ম-রক্ষায় সে অভ্যস্ত। তাই নিস্তব্ধ রাত্রিশেষে একা বন্ধ ঘরে এই আকস্মিক মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল না। ভয়ে তার বুকের ভিতর টিপটিপ করছিল; কিন্তু সে জানত, বাইরের প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ না রাখতে পারলে এ-অবস্থায় উপায় নেই।

একটু সময় উভয় পক্ষই নিঃশব্দ, নিশ্চল; তারপর হঠাৎ যেন মোহ থেকে জেগে উঠে ললিতা পিছন দিকে এক পা বাড়াল।

লোকটি শাঁ করে প্যান্টের পকেট থেকে ছোটো কালো একটা জিনিস বের করে ললিতার দিকে উঁচু করে ধরলে।— 'কোনো দিকে এক পা নড়েছ কি মরেছ!' গম্ভীর, ভীষণ কণ্ঠস্বর নয়; বরং কাঁপছে যেন। ললিতা একটু অবাকই হল। পিস্তলের নলটা একটা হিংস্র নিষ্পলক চোখের মতো তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে, লোকটার তর্জনী একটু যদি নড়ে ওঠে—একটু টান—ভীষণ শব্দ, অনেক ধোঁয়া, খানিকটা আগুন তার বুকের ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে গেল। ললিতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। খুব আস্তে বলল, 'কী চাও তুমি?'

'কী চাই?' মুখোশ ভেদ করে খানিকটা বিকৃত হাসির শব্দ বেরিয়ে এল, 'সবাই যা চায় —টাকা।'

'কিন্তু ঘরে তো কিছু নেই।'

কালো মুখোশের ফাঁকে একজোড়া কালো চোখ হেসে উঠল যেন।— 'বেশ, খুঁজে দেখা যাক, কিছু আছে কি নেই। তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করতে হচ্ছে— কিছু মনে কোরো না। তুমি কি একটু কষ্ট করে চাবিগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে আসবে?' পিস্তলের ঘোড়ার উপর সে যেন আদরে একবার আঙুল বুলোল।

ললিতা মনে-মনে হিসেব করে দেখল যে চিৎকার করে কোনো ফল হবার আশা নেই। চিৎকার করে গলা ভেঙে ফেললেও নীচে ভাঙের ঘুমে অচেতন দরোয়ানজির কানে তা পৌঁছবে না। দোতলার রাসমণি হয়তো ছুটে আসতে পারে, কিন্তু তার আগেই লোকটা হয়তো তর্জনী একটু নাড়বে, আর সঙ্গে-সঙ্গে...। লোকজন ডেকে জড়ো করবার অপেক্ষায় সে থাকবে না, তা ঠিক। ললিতা এক ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে? আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখল, দরজা বন্ধ, খুলতে যে সময় নেবে, তা পোষাবে না। রাস্তার দিকে ছোটো একটা বারান্দায় যাবার দরজা — সে প্রায়ই সেটা খুলে শোয়, আজ কী মনে করে যেন বন্ধ করেছিল। ও বারান্দায় পৌঁছতে পারলেও একরকম হত, এ রাস্তায় গভীর রাতেও দুটো একটা লোক থাকেই, আর উল্টো দিকের পানের দোকানটা তো প্রায় সারা রাতই খোলা। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ হত? সেই নিষ্পলক, হিংস্র দৃষ্টি—তাকে সে কী করে এড়াবে?

'শিগগির, শিগগির -বেশি সময় নেই। ভূতের সঙ্গে আমার মিল এই যে ভোর হবার আগেই আমাকে অদৃশ্য হতে হবে। আর খানিকটা মিল সম্প্রতি চেহারায়—কী বলো?' আবার অস্পষ্ট হাসি শোনা গেল

'কিন্তু সত্যি বলছি- -কিছু নেই। হয়তো রোজকার খরচের দু'দশ টাকা —তাতে তোমার খাটনিও পোষাবে না।'

'কেন- -পুরুষমানুষকে ছাগল বানিয়ে যে মুঠো-মুঠো টাকা বার করে নাও, সে-সব কী হল?'

'এটা বোধ হয় জান যে আজকালকার দিনে সবাই ব্যাঙ্কেই টাকা রাখে?'

'হুঁ' একটু পরে, 'যাক —যা পাওয়া যায়, তা-ই সই। দু'দশ টাকাও মন্দ নয়। তাছাড়া, গয়না টয়নাগুলো—তাও কি ব্যাঙ্কে জমা রেখেছ?'

ললিতার বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। তার আলমারির দেরাজে প্রায় তিরিশ হাজার টাকার অলংকার রয়েছে— সোনা হিরে মুক্তোয় গা-ঘেঁষাঘেঁষি, আলোর এক রাজ্য। তার সমস্ত জীবনের উপার্জন, তার জীবনের আলো ও গুলো যদি নিয়ে যায়— !

'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বার কর চাবি।'

উপায় নেই, কোনো উপায় নেই। ললিতা নড়তে চাইল, কিন্তু তার পা দুটো অসম্ভব ভারী হয়ে উঠেছে।

'আঃ, সময় নষ্ট করো না, বলছি! লক্ষ্মী মেয়ের মতো চাবির গোছাটা আমার হাতে তুলে দেবে, না সেটাও আমাকেই কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হবে?'

উপায় নেই, উপায় নেই। ললিতা চেষ্টা করল নড়তে—কিন্তু তার শরীর পাথরের মতো স্থির। শুধু তার চোখ মশারির হালকা আবরণ ভেদ করে পড়ল গিয়ে তার বিছানায়, প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে, তারপর স্পষ্ট হয়ে বালিশের উপর। কালো মুখোশের নীচে কালো দুই চোখ তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করল।

'আঃ – thank you.' বালিশ তুলতেই তার নীচে চাবির গোছা পাওয়া গেল। 'Thank you'. চাবিগুলোকে লোকটা আঙুল দিয়ে একটু আদর করল—'এবারে তাহলে একটু খুঁজে দেখা যাক—কী বলো?' যেন ললিতারই অনুমতির জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল।

এতক্ষণে ললিতা তার কণ্ঠস্বর ফিরে পেল। 'তুমি কত টাকা চাও বলো আমি দিচ্ছি।'

'বা-বাঃ, এখন যে একেবারে দয়ার অবতার, রানি! কী দেবে? বাজার খরচের দু'দশ টাকা?'

'যা তুমি চাও। এক্ষুনি চেক লিখে দিচ্ছি।'

'চেক?.... বাঃ, আমি ভাঙাতে যাই, আর এদিকে তুমি ব্যাঙ্কে খবর দিয়ে রাখবে—ঠেলবে হাজতে! না, তোমার এ-দয়া নিতে পারলুম না, দুঃখিত।'

'না—সত্যি। আমি মোটেও খবর দেব না ব্যাঙ্কে। সত্যি তোমাকে দিয়ে দেব—ধর, এক হাজার? কাল ঠিক দশটার সময় তুমি কড়কড়ে হাজার টাকা পেয়ে যাবে।

লোকটা যেন একটু ইতস্তত করছে। অমনি ললিতা বললে, 'আচ্ছা, দেড় হাজার! হবে ওতে?'

লোকটা মনে-মনে কী-যেন একটু হিসেব করল, তারপর যেন নিজের মনেই বলে উঠল, 'নাঃ—বেশ্যার কথায় যে বিশ্বাস করে, নরকেও তার জায়গা হয় না।'

'তাহলে আমার কথাটা তুমি রাখলে না?'

'বেশি কথা বোল না—যা বলছি, যা-ই কর।'

'কী করতে হবে, বল।' এতক্ষণে ললিতা তার স্বাভাবিক আত্মস্থতা ফিরে পেয়েছিল।

'এই নাও চাবি—ওই আলমারিটা খোল তো।'

'দাও।' ললিতা হাত পাতল। চাবি দিতে গিয়ে লোকটার আঙুল তার হাতে লেগে গেল।

'বাঃ, বেশ নরম তো তোমার আঙুল।'

'ও সব প্যাঁচ আমার উপর চলবে না, সুন্দরী। যাও—খোল আলমারি।'

'যদি না খুলি?'

'আমাকেই খুলতে হবে তাহলে।'

'যদি বাধা দিই?'

'তাহলে এই যে—' উঁচোনো পিস্তলটায় (এতক্ষণের মধ্যে সে একবারও সেটা নামায়নি) সে একবার ঝাঁকুনি দিলে।

'তাহলে আমাকে সত্যি মেরে ফেলবে?'

'না, মেরে ফেলব কেন? ঠ্যাংটা শুধু একটু খোঁড়া করে দেব, যাতে আমি স্বচ্ছন্দে পালাতে পারি।'

'তারপর বাকি জন্ম আমি খোঁড়া হয়ে থাকব?'

'বোধহয়।'

'না, না, খোঁড়া হয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। সে বড়ো বিশ্রী। তার চেয়ে বরং আমায় মেরে ফেল।'

তা ঠিক জায়গায় লাগলে মরেও যেতে পার।'

'আচ্ছা—তুমি যে আমাকে মেরে ফেলবে, একটু কষ্ট হবে না তোমার?'

'কষ্ট কীসের? তোমার মতো জঘন্য জীবন যত শিগগির শেষ হয়, ততই ভালো।'

'তা হোক, তবু—আচ্ছা, আমার মতো সুন্দর মানুষ কখনো দেখেছ?'

কালো মুখোশের নীচে কালো দুই চোখ মুহূর্তের জন্য ললিতার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়েই আনত হল।—'তোমার সঙ্গে রসালাপ করতে আমি এখানে আসিনি। যা বলছি করো।'

আস্তে-আস্তে ললিতা আলমারির কাছে গেল, লোকটি ঠিক তার পিছনে। আলমারির দরজায় প্রকাণ্ড, ঝকঝকে আয়না। সেখানে ললিতা নিজের ছায়া দেখে একটু স্তব্ধ না-হয়ে পারল না। অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বিচার করলেও মানতে হয় যে সে সুন্দরী। অপরিপূর্ণ ঘুমে ঈষৎ ফোলা-ফোলা তার চোখ—সন্ধ্যাবেলা সে যে সুরমা মেখেছিল তার কালো আভা এখনো দুঃখের চিহ্নের মতো চোখের কোলে লেগে আছে; একরাশ এলো চুল পিঠে ছড়ানো—কালো, এখনো কালো। কিন্তু আর কদিন? দিনে দিনে বয়েস বেড়ে চলে—বয়েস তো কারো কথা শোনে না। তার এমন যে নিটোল মজবুত শরীর—তাও একদিন ভেঙে পড়বে। সময় আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু—অদৃশ্য, অপরাজেয়। তার হাত এড়াতে কেউ পারেনি; ললিতা, তুমিও পারবে না। তবু—যে কদিন হয়। এখনো হয়তো বছর দশেক মেয়াদ আছে। তার ভাগ্য ভালো; অনেক বাঙালি মেয়ের চাইতেই তার যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হল। জ্বালিয়ে যাও, ললিতা, আর যে-কদিন পার, জ্বলে যাও, জ্বালিয়ে যাও। আয়নায় ছায়ার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটল।

'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

ললিতা মুখ ফিরিয়ে সেই কালো মুখোশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'নিজের চেহারা দেখছিলাম। সুন্দর—কী বলো?'

'খোল!' লোকটির স্বর অধীর আগ্রহে কাঁপছে, 'খোল!'

'খুলছি।' চাবি লাগিয়ে ললিতা হঠাৎ আবদারের সুরে বলে উঠল, 'তোমার পিস্তলটা নামাও—আমার বড়ো ভয় করছে।'

'আমার কথা-মতো চলো—কিছু ভয় নেই তোমার।'

ললিতা চাবি ঘুরিয়ে আলমারি খুলল। উপরের তাকগুলো সব শাড়িতে ঠাসা। সেখানে হাত রেখে ললিতা বললে, 'তোমার বউ আছে?'

লোকটি হুমকি দিয়ে উঠল, 'ফাজলেমি!'

ললিতা হতাশভাবে একটু ঘাড় নেড়ে বললে, 'কী মুশকিল! ভালো কথা কইলেও যে চটে যায়—'

'থাক, তোমাকে এখন ভালো কথা কইতে হবে না। কী আছে বের করো দিকি।'

'আছে তো এক বোঝা শাড়ি—মরলে পরে সব চিতেয় যাবে আর কি। মেয়েটাও মরে গেল—নইলে অ্যাদ্দিনে কি আর ওর শাড়ি পরবার বয়েস না হত। বলছিলাম কী—ভালো দেখে একখানা বেছে বউয়ের জন্যে নিয়ে যাও - বউ খুশি হবে। তা তুমি তো চটেই উঠলে। চাও তো আমিই বের করে দিচ্ছি। এই যে, এখানা—' ললিতা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উপরের তাকের তলা থেকে আগুনের রঙের একটা শাড়ি টেনে বের করলে—'পছন্দ হয়? খাঁটি বেনারসি সিল্ক—হাজার টাকা এর দাম।'

'হাজার টাকা?'

'ছিলেন এক জমিদারবাবু—মৈমনসিং জেলায় বাড়ি। বড্ড ভালোবাসতেন আমাকে। তিনি দিয়েছিলেন এখানা। ভদ্দরলোকের দিলটা খুব খোলা ছিল—তা এমন কপাল, অকালে মরে গেলেন। লিভার নাকি পচে গিয়েছিল।' ললিতা শাড়ির ভাঁজ খুলল, মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল খানিকটা—'ভালো জিনিস—একশো বছরেও কিছু হয় না। নিয়ে যাও না এখানা বউয়ের জন্য।'

লোকটা হাত দিয়ে শাড়িখানা একটু নেড়ে-চেড়ে বললে, 'হুঁ। ভালো জিনিস—না? হাজার টাকা দাম। হাজার টাকা দামের আরো শাড়ি আছে তোমার?'

'ক—ত! আরো চাই দু'একখানা?'

'ছাই! বউ-ফউ আছে নাকি যে নিয়ে যাব!'

'ও—তুমি বুঝি বিয়ে করোনি? আহা- কেন গো?'

'তোমার সঙ্গে এখন ঘরোয়া আলাপ করবার সময় আমার নেই। দেরাজগুলো খোল। গয়না কী আছে দেখি।'

'--হ্যাঁ, গয়না দেখছি।' আগুনের রঙের শাড়িটা এলোমেলো হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। ললিতা নিচু হয়ে উপরের দেরাজে চাবি লাগিয়ে বললে, 'পিস্তলটা নামাও না ভাই। বড্ড ভয় করছে আমার।'

'কী ছেলেমানুষের মতো কেবল ভয় করছে! ভয় করছে! আর—দ্যাখো, আমাকে ভাই-টাই বলবে না।'

'ওমা, কেন? একজনকে ভাই বললে কী দোষ?'

'আছে দোষ।'

'কী বলব তাহলে?' ললিতা মুখ ফিরিয়ে চপল হাসি-ভরা চোখ তুলে তাকাল, 'প্রভু?' সঙ্গে-সঙ্গে উপযুক্ত থিয়েটারি মুখ-ভঙ্গি করে— 'নাথ? প্রাণেশ্বর?'

'ফাজলেমি—না?' লোকটা রাগে যেন গর্জাচ্ছে।

'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ কিন্তু।' ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

'দ্যাখো, বাড়াবাড়ি করবে তো মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। খোল শিগগির দেরাজ।'

ললিতা এক টানে দেরাজ খুলে ফেলল। লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ওই বাক্সটা দেখি।' তার নির্দেশমতো ললিতা কুমিরের চামড়ার বেশ বড়ো একটা অ্যাটাশে কেস বার করে পাশের একটা টিপয়ের উপর রাখল। তারপর লোকটা কিছু বলবার আগেই সেটা খুলে ফেলে বললে, 'দেখবে এসো।'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা ঝুঁকে তাকাল। খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। ললিতা তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললে, 'বেশ সুন্দর না?'

'বেশ।' লোকটার গলা দিয়ে স্বর যেন ফুটছে না।

'বেশ! শুধু বেশ! এত সুন্দর জড়োয়া গয়না তুমি দেখেছ কখনো?' লোকটা কোনো কথা বললে না। 'এই সব—' হঠাৎ ললিতার স্বর অত্যন্ত কোমল হয়ে এল, 'স—ব তুমি নিয়ে যাবে?'

'আপত্তি আছে তোমার?'

'আমাকে একেবারে বিধবা করে রেখে যাবে? উঃ, পুরুষের প্রাণ কী নিষ্ঠুর!'

এতক্ষণে লোকটার চোখ অ্যাটাশে কেস থেকে ললিতার দিকে ফিরল। —'থাক, আর ন্যাকামো করতে হবে না।'

'ন্যাকামো! একে তুমি ন্যাকামো বলো!' ললিতার স্বর আবেগে ভারী হয়ে উঠল, 'বলবেই তো! তুমি নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় নেই; তুমি কী করে বুঝবে এই গয়নাগুলোকে আমি কত ভালোবাসি।'

'ইশ— এত মোহ! এ-কথা কখনো ভাবো, তুমি মরে গেলে এ গয়নাগুলোর কী হবে?'

'মরে গেলে কী হবে? যা খুশি তাই হবে। সে-কথা ভেবে কী লাভ? মেয়েটা যদি থাকত তাহলে কি আর কোনো ভাবনা ছিল? কী সুন্দর ছিল দেখতে—মনের সাধ মিটিয়ে ওকে আমি সাজাতে পারতাম। গয়নাগুলোর দিকে যখনই তাকাই, ওর কথাই আমার মনে পড়ে।'

'তোমার মেয়ের কপাল ভালো—তাই সে মরেছে।' লোকটা এক হাতে অ্যাটাশে কেসটা বন্ধ করলে।

'ও কী? ওটা বন্ধ করছ কেন? সত্যিই কি সব নেবে তুমি?'

'কত দাম হবে এগুলোর বল তো? হাজার খানেক—?'

'ওমা, বলে কী!' ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল, 'উঃ, হেসে আর বাঁচিনে!'

'চুপ!' লোকটা হিংস্র স্বরে বলে উঠল। 'বলো—এখানে কত টাকার গয়না আছে?'

ললিতা শান্তভাবে বললে, 'তিরিশ হাজারের একটি পয়সা কম না।'

'কত?'

'তিরিশ হাজার।'

'তি-রি-শ হা-জা র!' পরক্ষণেই স্বর বদলে ঃ 'ও—তিরিশ হাজার। বে—শ। আচ্ছা, এবার তোমার দেরাজের অন্যান্য বাক্সগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক।'

'দেখাচ্ছি। কিন্তু—' করুণ সুরে ললিতা বললে, 'কিন্তু আমার একটা কথা রাখবে?'

'না, রাখব না।'

বেশি কিছু নয়— সামান্য একটা হিরের আংটি; অত জিনিসের মধ্যে টেরও পাবে না তুমি। একজন আমাকে দিয়েছিল।'

'এ-সবই তো তোমাকে কেউ-না-কেউ দিয়েছিল?'

'সেইজন্যেই তো ওগুলোর উপর আমার এত মায়া। সমস্ত জীবন ভরে কত লোকের ভালোবাসা কুড়িয়ে এত-সব জিনিস উপহার পেলাম—আর তুমি হঠাৎ এসে এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ! আর-সব নাও—কিন্তু ওই আংটিটা কি দিয়ে যেতে পার না? ওটা যে দিয়েছিল, তাকে আমি ভারি ভালোবাসতাম।'

'ভালোবাসতাম!' লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। 'ভালোবাসার কথা তোমার মুখেই মানায়!'

'যেন তোমার মুখেই মানায়! কী জানো তুমি ভালোবাসার? কখনো ভালোবেসেছ কাউকে?'

'হয়েছে, এখন থামো।'

'না, কক্ষনো বাসোনি। তাহলে আমার এ-কথাটা তুমি রাখতেই। ওগো—এত করে বললাম—'

'ওগো-টোগো বোলো না, বলছি।'

'থুড়ি—ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, এত জিনিসের মধ্যে সামান্য একটা আংটি রেখে গেলে এমন কী ক্ষতি হত তোমার!'

'নাও—এবার ওই বাক্সটা খোলো তো।'

'কোনটা? ওইটে? ওটা খুলে কী হবে—ওটাতে কিছু নেই।'

'কিছু-নয়টাই দেখা যাক।'

'বেশ।' চন্দনকাঠের একটা বাক্স—চাবিও ছিল না। টানতেই ডালা উঠে এল। 'এটার ভিতর সব চিঠিপত্র! প্রেম-পত্র। এগুলো কি তোমার কোনো কাজে লাগবে?' ললিতা বাক্সটা তুলে এনে টিপয়ের উপর রাখল।

'আঃ—' ভিতরের চিঠিগুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে— 'এগুলো দেখে কত কথাই যে মনে পড়ে! কত বাবু এলেন—চ'রে গেলেন।'

'সবাই তোমাকে চিঠি লিখত?'

'ঝুড়ি-ঝুড়ি। সব কি আর রাখা যায়? যাদের সঙ্গে খুব বেশি প্রণয় ছিল, তাদের চিঠিগুলো সব আছে।'

'কেন রেখেছ?'

'এমনি—মাঝে-মাঝে দেখতে বেশ মজা লাগে।' ললিতা বাক্স থেকে একটা খাম বা'র করল। 'এটা কার?.... ও—' চিঠিটা খুলে চোখের সামনে ধরল ললিতা। লোকটা ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল।

'ওগো, তুমি অত কাছে এসো না। আমার বড্ড ভয় করে।'

'ছি ছি।' বলে লোকটা সরে গেল।

'ছি ছি কেন?'

'কী-সব লিখেছে!'

'এ আর কী! আরো কত সব আছে। ভারি রসিক ছিল ছেলেটা। বড়োলোকের ছেলে, কলেজে পড়ত। দেদার টাকা উড়িয়েছে এখানে। গুণ-যোগ্যতাও ছিল কিছু। গান গাইতে পারত—পদ্য লিখত, কাগজে ছাপা হত সে-সব, আমাকে দেখাত এনে। একবার আমার নামে মুখে-মুখে ছড়া কেটেছিল, এখনো মনে আছে—

ওগো ললিতা—
প্রাণের প্রদীপে মোর
তুমি সলিতা।

তুমি সলিতা—ভারি মজার, না?' ললিতা হেসে উঠল।

'হুঁ, এই হচ্ছে কলেজে পড়া বড়োলোকের ছেলে।'

'এখন ডিপুটি হয়েছে শুনলাম। ওরই আবার এক বন্ধু এসেছিল, কথায় কথা উঠল—বিয়েও করেছে। বি. এ পাস বউ। ভারি মজা লাগে ভাবতে—কত ছেলে যে আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেল—' মুহূর্তের জন্য ললিতা যেন অনেক দূরে চলে গেল। 'তা দ্যাখো', উপস্থিত সময়ে ফিরে এসে ললিতা বলতে লাগল, 'এই চিঠিগুলোও তুমি কাজে লাগাতে পার।

'কী করে?'

'তা ও বুঝতে পারছ না? ধরো, এই চিঠিগুলো যদি তোমাকে দিয়ে দিই— ডেপুটি সাহেব নতুন বিয়ে করেছেন, ব্যাপারটা জানাজানি হোক তিনি তা নিশ্চয়ই চাইবেন না। আর তার জন্য অমন দু-পাঁচশো টাকা কি তোমায় দিয়ে না দেবেন!'

'ছি ছি—আমি বুঝি তা-ই করতে যাব! এ তো blackmailing।'

'তা ইংরিজিতে ওকে যা-ই বলুক, এ করে তুমি পয়সা কিন্তু পেতে পার— যদি পয়সাই চাও।'

'যদি চাই! কে না চায়?'

'তাহলে তোমাকে যখন টাকা দিতে চাইলাম—নিলে না কেন? আমি ভাবলাম তোমার বুঝি গয়নাগুলো দিয়েই বিশেষ কোনো দরকার, তাই তুমি ওগুলো নিচ্ছ।'

'দরকার আর কী! ওগুলো ভাঙিয়ে তিরিশ হাজার টাকা করে নিতে কতক্ষণ!'

'ওমা, তুমি ওগুলো বেচতে যাবে নাকি? বলিহারি বুদ্ধি তোমার!'

'দ্যাখো— মুখ সামলে কথা বোলো।'

'তুমি কি মনে করেছ ওগুলো কোথাও নিয়ে বেচতে পারবে? তুমি কি মনে করেছ আমি পুলিশে খবর দেব না? তুমি কি মনে করেছ যে ও-রকম গয়না সবারই থাকে যে তোমার হাতে তা দেখামাত্র যে-কেউ সন্দেহ করবে না?'

'তুমি কি মনে করেছ তোমার লেকচার শুনতে আমি এখানে এসেছি?'

'শুনলেও ক্ষতি নেই। আমার কাছে তোমার অনেক শেখবার আছে। তোমারই ভালোর জন্য বলছি—তুমি যদি ওর একটি গয়নাও বেচতে যাও, অমনি হাতে-হাতে ধরা পড়বে, আর পত্রপাঠ জেল!'

একটু চুপ করে থেকে লোকটা বললে, 'তা-ই বা মন্দ কী? তবু তো জেলে গেলে খেতে পাব।'

'কেন, এমনিতে তুমি কি খেতে পাও না?'

'ও-সব কথা দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'থাক, থাক,' ললিতা অনুতপ্ত স্বরে বললে, 'তোমার ইচ্ছা না হলে কিছু বোলো না। আহা—যে দিন-কাল পড়েছে— দেশে এমন টানাটানি আর কখনো হয়নি।'

'থাক, তোমাকে আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না। অভাবেব তুমি কী জানো? কত জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে? লাখ-খানেক?'

'পাগল! অত কী করে হবে? তবে অল্প-স্বল্প কিছু যে নেই, তাও নয়।'

'তুমি তো দিব্যি পাপের পয়সা জমিয়ে যাচ্ছ—এদিকে কত লোক যে ভালো করে দু'বেলা খেতে পাচ্ছে না, সে খোঁজ রাখ? বলতে পার, কী অধিকার আছে তোমার একা এত টাকা ভোগ করবার? মরে গেলে শ্মশানে নিয়ে যাবাব লোকও তো তোমার নেই। কী হবে তখন তোমার এত টাকা দিয়ে?'

'সে-কথা যে আমিও না ভেবেছি, তা নয়। একটা ছেলেকে পুষ্যি রাখব ভাবছি, এমন-একটা ছেলে, সংসারে যার কেউ নেই-টেই। সে-রকম কারো খোঁজ দিতে পার?' একটু পরে ললিতাই আবার বলল, 'খোজবার আব দরকার কী। এই তো তুমিই আছ। তুমি—হবে আমার ছেলে?'

'যাওঃ।'

'যাওঃ কেন? হও না।'

'রসিকতা, না?'

ললিতা হেসে উঠল।— 'ওঃ, ছেলেমানুষ! একেবারে ছেলেমানুষ!'

'দ্যাখো, ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ কোরো না বলে দিচ্ছি। তোমার বয়স কত শুনি?'

'ওগো ছেলেমানুষ, এ-ও কি জানো না যে মেয়েমানুষকে কখনো তার বয়স জিগেস করতে নেই?'

'যাও —যাও - তোমার বয়সের বা অন্য-কোনো বৃত্তান্ত জানবাব কৌতূহল আমাব নেই। আমার যে বিষয়ে কৌতূহল আছে, তা হচ্ছে তোমার টাকা। শোনো— ' (খুব গম্ভীরভাবে)—'তুমি তখন যা বলেছিলে, সত্যি?'

'কী বলেছিলাম?'

'সেই চেক লিখে দেবার কথা? সত্যি আমাকে দিয়ে দেবে টাকাটা? খবর দেবে না পুলিশে?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি। তিনবার বললাম। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।' ললিতা লোকটার হাতের উপর হাত রাখল।

ক্ষিপ্রগতিতে হাত সরিয়ে নিয়ে লোকটা বললে, 'তাহলে লেখ শিগগির। পাঁচ হাজার টাকা।'

'পাঁ চ হা জা র?— '

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঁচ হাজার। শিগগির। তোমার গয়না-টয়না সব রইল—ও আমি চাইনে। আমার দরকার টাকার। তোমার পাপের বোঝা খানিকটা হালকা করে দিয়ে যাচ্ছি—ভালোই হল তোমার।'

'আমি করব পাপ, আর তুমি তার পুণ্যফল ভোগ করবে! মন্দ নয় ব্যবস্থা।'

'তোমার হয়ে টাকাগুলো মিছিমিছি পড়ে আছে, আমার হলে সেগুলো কাজে লাগবে। সুতরাং আসলে ও টাকা আমারই। কোথায় তোমার চেক-বই, বার করো।'

'ওই ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজে চেক-বই আর কলম আছে— নিয়ে এসো না।'

'তুমি যেতে পার না, না?'

'বড্ড ভয় করছে যে— তোমার পিস্তলটা—'

'কিছু ভয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব, কিন্তু তোমাকে ছোঁবও না।'

'ছোঁবেও না! একেবারে ভীষ্ম—'

'ফের ফাজলেমি!'

'আর করব না—অভ্যাসের দোষ। কিন্তু তোমার পিস্তলটা একটু নামাও না—যদি ধর কোনোরকমে ছুটে গেল—'

'কী ঘ্যানর-ঘ্যানর করছ! এটা সত্যিকারের পিস্তল কিনা যে ছুটে গিয়ে তোমাকে মেরে ফেলবে!'

খানিকক্ষণ ওলোট-পালোট, অস্ফুট দু'একটা চিৎকার। তারপর ললিতা হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। লোকটা মেঝেতেই বসে আছে; সেই আগুনের রঙের শাড়িটা দিয়ে তার দু'হাত পিঠ-মোড়া করে বাঁধা। একটু দূরে তার পিস্তল আর মুখোশ পড়ে আছে। ভারি কাঁচা মুখ—আঠারোর বেশি বয়স মনে হয় না। ভালো করে যেন দাড়িগোঁফও ওঠেনি। কালো-কালো চোখ। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে দুদিকে ভাগ হয়ে পড়েছে। আশঙ্কায়. হতাশায় বিমর্ষ গম্ভীর মুখ। স্থির দৃষ্টিতে মেঝের দিকে সে তাকিয়ে।

ঘরের এক কোণে একটা টেলিফোন ছিল; ললিতা আস্তে-আস্তে সেখানে গিয়ে মৃদুস্বরে জিগেস করলে, 'এইবার ডাকি তাহলে পুলিশ?'

লোকটা তার কালো-কালো চোখ তুলে একবার ললিতার দিকে তাকাল; কোনো কথা বললে না।

'যদি কিছু মনে না করো—' ললিতা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল।

'না, না' সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা চিৎকার করে উঠল, 'না, না।' দু'পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে টলতে-টলতে সে উঠে দাঁড়াল—তার পিঠ একটু বেঁকে গেছে, মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে—মুহূর্তের মধ্যে সে ললিতার কাছে এসে দাঁড়াল। তার পিছনে মস্ত লম্বা শাড়িটা লাল রঙের প্রকাণ্ড একটা লেজের মতো গড়াচ্ছে।

ললিতার তীব্র চোখ লোকটাকে বিদ্ধ করল।— 'বারণ করছ পুলিশ ডাকতে?'

লোকটি মাথা নিচু করে চুপ।

'নিজেই তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করব তাহলে? কী হবে তোমার শাস্তি?' ললিতা ঠোঁটের এক কোণ কামড়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল।

'তোমার যা খুশি তা-ই করো,' নিষ্প্রাণ স্বরে লোকটি বললে, 'বোকা— আমার মতো বোকা আর হয় না।'

'সে-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই, ভাই,' মিষ্টি হেসে ললিতা বললে, 'পুরুষমানুষ যদি মাঝে মাঝে বোকাই না-বনবে, তাহলে আমাদের চলবে কী করে, বলো।'

লোকটি কথা না বলে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। 'দুঃখের বিষয়', তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ললিতা বললে, 'তোমার পক্ষে এখন পালানো শক্ত। জোর যদি করতে যাও, কিছু লাভ হবে না, বরং চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মতো বসে থাকো। লাফালাফি করতে গেলে হয়তো হাত-পা ভাঙবে। আচ্ছা,' লোকটিকে চুপ দেখে ললিতা জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কী করে ঢুকলে এ-ঘরে?'

'পাইপ বেয়ে।'

'পাইপ বেয়ে! মাগো—ভয় করল না তোমার! যদি পড়ে যেতে!'

'যেতাম তো যেতাম। অত ভাবলে কি আর চলে।'

'তাই বলে পাইপ বেয়ে এই তেতলার ঘরে—তোমার এত সাহস, অথচ পুলিশকে তোমার ভয়!'

'সাহস। সাহসই বটে। অমন দায়ে পড়া সাহস অনেকেরই হয়।'

'দায়ে পড়া কেন?'

'আমি আর কথা বলতে পারছি না, তুমি যা করবার করো—এই আমি বসলাম।' লোকটি কোনোরকম করে একটা চেয়ারে বসল।

'তোমার বসে খুব আরাম হচ্ছে না বোধহয়', ললিতা বললে, 'তা একটু না-হয় কষ্টই হল। এ-ই তো কষ্ট করবার বয়স।'

লোকটি হঠাৎ উত্তেজিতস্বরে বলে উঠল, 'আমার হাত খোলা থাকলে এ-জন্য তোমাকে চড় বসিয়ে দিতে পারতাম।'

'আর সে-জনাই তোমার হাত দুটো খোলা রাখলাম না।'

লোকটির উত্তেজনা যেন আর এক ডিগ্রি চড়ে গেল, 'ও-কথা এত শুনেছি যে কাউকে এখন বলতে শুনলেই মারতে ইচ্ছে করে।'

ললিতা খাটের এক প্রান্তে আলগোছে পা ঝুলিয়ে বসে জিগেস করলে, 'কোন্ কথা?'

'এই কষ্ট সইবার কথা। চাকরির খোঁজ করে-করে হয়রান— কোথাও কিচ্ছু হয় না। বাড়ি-গাড়ি নিয়ে যারা গ্যাঁট হয়ে বসেছে, তাদের কাছে গেলে এই উপদেশ শুনেছি— 'কষ্ট করতে শেখ, ছোকরা, এ-ই তো কষ্ট করবার বয়স।' কষ্ট! কতই যেন জানেন ওঁর কষ্টের! ইচ্ছে করে—' লোকটি হঠাৎ থেমে গেল।

'থামলে কেন? বলো না, কী ইচ্ছে করে তোমার।'

লোকটি যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি ফস করে নিভে গেল। হতাশভাবে মাথা নেড়ে শুধু বললে. 'না, না।' স্বচ্ছন্দভাবে একটু নড়তে গিয়ে তার হাতে চোট লাগল।

—'উঃ!'

'খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার, না? হঠাৎ যেন গরমও হচ্ছে।' ললিতা উঠে গিয়ে পাখাটা ছেড়ে দিলে। হাওয়ায় লোকটার দু-একটা চুল উড়ে-উড়ে তার কপালের উপর এসে পড়তে লাগল।

হঠাৎ ললিতা বললে, 'কী সুন্দর তোমার চুলগুলো! কিন্তু অমন বিশ্রী করে লেপটে উল্টে রেখেছিলে কেন?'

'দ্যাখো, তুমি যদি—' লোকটি খুব চড়া গলায় আরম্ভ করেই থেমে গেল।

'নাঃ, তুমি যেন কেমন! কোনো কথা বলি কি ফোঁস করে জ্বলে ওঠো। মিষ্টি কথা তোমার যেন মুখেই আসে না!'

'তোমার দু-হাত কষে বেঁধে রাখলে দেখতাম, তোমার মুখ দিয়েই কেমন মধু ঝরে!'

'ও, সে-কথা! তা তুমি যখন আমাকে পিস্তল নিয়ে শাসাচ্ছিলে, আমি বলিনি মিষ্টি কথা?'

'বলেছিলে বইকি। মিষ্টি কথা বলেই তো আমাকে পথে বসালে। —উঃ, কী ভীষণ বোকা আমি!'

'যদি বলো তোমার হাত ছেড়ে দিই।'

লোকটি সন্দেহ-ভরা চোখে ললিতার দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে রইল।

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?'

'বিশ্বাস! লজ্জা করে না তোমার ও-কথাটা উচ্চারণ করতে!'

একটু হেসে ললিতা বললে, 'লজ্জা-টজ্জা থাকলে কি আর আমাদের চলে ভাই!'

'সত্যি নেইও।' তীব্র মুখভঙ্গি করে লোকটি বললে।

'তোমার সঙ্গে গল্প করতে কিন্তু মন্দ লাগে না, কিন্তু এমন বিশ্রী তোমার মেজাজ!'

'আর বকতে পারিনে তোমার সঙ্গে।' একটা হাই ছেড়ে লোকটি বললে, 'পুলিশ ডাকতে হয় ডাকো— আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'পুলিশ এসেই তোমার ঘুমের চমৎকার ব্যবস্থা করে দেবে নাকি?'

'বসে-বসে আর বকর-বকর করতে হবে না তো।'

'কিন্তু থানায় নিয়ে গিয়ে যখন দেবে মার—'

'ইস, মারবে কেন? ভদ্রলোককে কখনো মারে?'

'চোর আবার কখনো ভদ্দরলোক হয়?'

'দ্যাখো, চোর-চোর বলো না, বলছি।'

'নিশ্চয়ই বলব। চোরকে চোর বলব না! চোর! চোর!'

'আমি চোর নই! আমি চোর নই!' (চিৎকার করে)

'নাঃ, চোর হবে কেন? রাত চারটের সময় পাইপ বেয়ে এমনি একটু শখ করে আমার ঘরে উঠে এসেছিলে। তবু যদি পিস্তলটা সত্যিকারের হত!'

খোঁচা খেয়ে লোকটা এক লাফে উঠে দাঁড়াল। নানারকম মুখ বিকৃতি সহকারে হাত দুটো খোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে-করতে বলতে লাগল, 'তুমি! তুমি চোর! তুমি যা করো তাও তো চুরি! স্রেফ চুরি!'

ললিতা একটু লাজুক-লাজুক ভাবে বলল, 'আমি মন চুরি করি, আর কিছু না।'

'উঃ, অসহ্য! অসহ্য!'

'ও-রকম ধেই-ধেই করে লাফাচ্ছ কেন? নীচে রাসমণি শোয়— সে হয়তো জেগে উঠবে।'

ললিতার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজায় ভীষণ জোরে ধাক্কা পড়ল। ভীত মেয়েলি গলায় শোনা গেল— 'দিদিমণি, ও দিদিমণি।' মুহূর্তের মধ্যেই ললিতার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। ত্রস্তভাবে সে একবার এদিক ওদিক তাকাল, তারপর চট করে উঠে এসে লোকটার হাত খুলে দিতে-দিতে অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, 'যাও—শিগগির খাটের নীচে ঢোকো গে।'

লোকটা হাত ছাড়া পেয়ে পরম আরামে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দরজার বাইরে থেকে আবার শোনা গেল, 'দিদিমণি, ও দিদিমণি!'

'যাও', ললিতা লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে তীব্রস্বরে বললে, 'শিগগির যাও!'

লোকটা কোনো কথা না বলে তৎক্ষণাৎ হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নীচের অন্ধকারে অদৃশ্য হল। স্তূপীকৃত লাল শাড়িটা লাথি মেরে মেরে ললিতা তার পিছনে পাঠিয়ে দিল. তারপর একবার মুখের উপর হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলে জিগেস করলে, 'কী হয়েছে, বিন্দি? চ্যাচাচ্ছিস কেন?'

'কী হয়েছে, দিদিমণি?'

'কী হয়েছে?' ললিতা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, 'আমিও তো তোকে সে-কথাই জিগেস করছি। তোর হয়েছে কী?'

বিন্দি ঘরের ভিতরে একবার তাকিয়ে বললে, 'তুমি চোর-চোর বলে চ্যাচাচ্ছিলে, না গো?'

'চোর! মাথা-খারাপ হয়েছে নাকি তোব? কী যে বকছিস!'

'ওমা, আমি যে স্বকর্ণে শুনলুম গো। শুনে উঠে এনু। তুমি চ্যাচাচ্ছ -- চোর চোর—আর একজন মোটা গলায় বললে, আমি চোব নই, চোর নই — এ যে পষ্ট শুনলুম।'

'তোর মাথা! ছাইভস্ম কী স্বপ্ন দেখেছিস তার ঠিক নেই, এখন মাঝ-রাত্তিরে উঠে জ্বালাতন করছিস আমাকে।'

বিন্দি একটু দ্বিধার স্বরে বললে. 'না দিদিমণি, স্বপন নয়। আমার বুকটা যে এখনো ধড়াস-ধড়াস করছে গো।'

'যা, যা, আর বকিসনি—শুয়ে থাক গে। ঘুমটা ভাঙালি তো আমার।'

'আমি তোমার ঘুম ভাঙাতে যাব কেন গো? ভালো মনে কবে উঠে এনু। দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে-'

'নে, হয়েছে, কাল সব শুনব। এখন ঘুমোতে দে।'

বিন্দি তবু একটু অপেক্ষা কবল। —'তুমি কিচ্ছু শোননি, দিদিমণি? কিচ্ছু না?'

'কই, না তো। তাবপর অনাবশ্যকভাবে বললে, 'আমি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছিলাম।'

'যাক ভাগ্যিস কিছু নয়, দিদিমণি। একবার ভাবো দিকি— '

'হ্যাঁ ভেবেছি; তুই এখন যা তো,'

দরজাটা আবাব বন্ধ কবে ললিতা খাটেব কাছে গিয়ে ডাকল, 'বেরিয়ে এসো।'

সুড়সুড় করে বেরিয়ে এল লোকটি। —দেখলে তো কাণ্ডটা! ললিতা বললে, 'খুব চ্যাচাও আরো—পাড়াসুদ্ধু সব ছুটে আসুক।'

'আমার দোষ হল?' খুব ক্ষীণস্বরে, যেন ভয়ে-ভয়ে লোকটি জবাব দিলে, 'চোর-চোর বলে চ্যাচালে তো তুমিই।'

ললিতা হেসে উঠল। —'তোমাকে চটাতে এমন মজা লাগে!' তারপর লোকটির দিকে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে; 'কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমাকে। ঠিক যেন সং।' ললিতা হেসে উঠল আবার।

লোকটি আয়নায় নিজেব দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ল। ললিতা জিগেস করলে, 'কেন পরেছিলে তুমি ও-সব? পাইপ বেয়ে উঠতে সুবিধে হবে বলে?'

লোকটি চুপ করে রইল।

'বেশ, যেমন এসেছিলে তেমনি এবার পাইপ বেয়ে নেমে যাও। কতক্ষণ আর তোমাকে নিয়ে রাত জেগে বসে থাকব?'

'না, না। পাইপ বেয়ে আমি কিছুতেই নামতে পারব না।'

'পারবে না? উঠতে পেরেছিলে কী করে?'

'কী করে পেরেছিলাম? তাই তো। নিজেই এখন সে কথা ভাবছি।'

'সে কথা বললে চলবে কেন? উঠতে যখন পেরেছিলে, নামতেও পারবে। নামতেই হবে তোমাকে।'

'না, না', লোকটির স্বর এবার ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'পারব না। কিছুতেই পারব না। আমি ঠিক পড়ে মরে যাব। দয়া করে আমাকে সিঁড়ির পথটা একটু দেখিয়ে দাও, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।'

'বা রে আবদার! এখন আমি হাঁকডাক করে দরোয়ানকে জাগাতে যাই আর কী। আর দরোয়ান যদি মনে করে, তোমার মতো পোশাক নিয়ে কোনো লোক আমার কাছে আসে, তাহলে কি আর আমার মান থাকবে!'

লোকটির মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। —'তাই তো—'

'তাই তো তাই তো করে আর লাভ কী? পাইপ বেয়েই নামতে হবে তোমাকে!'

লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লানমুখে বললে, 'নামতে যদি হয়ই তো নামব। এক্ষুনি?'

'হ্যাঁ, এক্ষুনি।'

'আচ্ছা।' লোকটি অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করল। 'এক গ্লাস জল দিতে পার আমাকে?'

'তা আর পারিনে। জল খাবে?'

'জল খাব।'

'না অন্য কিছু?'

'অন্য কিছু আবার কী?'

'এই যেমন, হুইস্কি—'

'না, না, ও-সব কিছু না।'

'না কেন? হুইস্কি খেয়েছ কখনো?'

'না।'

'তাহলে দ্যাখো না একটু খেয়ে।'

'না, জল।'

ললিতা ঘরের কোণের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে দিলে। লোকটি ঢকঢক করে সবটা জল খেয়ে ফেলে বললে, 'আঃ।' তারপর আস্তে-আস্তে— যে-জানলা দিয়ে সে ঢুকেছিল, তার দিকে পা বাড়াল।

'ও কী, চললে?'

'হ্যাঁ।' একটু পরে ঃ 'তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

হঠাৎ ললিতা বলে উঠল, 'এই—'

লোকটি ফিরে তাকাল।

'—তোমার জিনিস যে ফেলে যাচ্ছ।'

'কী জিনিস?'

'তোমার পিস্তল—আর মুখোশ।'

'ও থাক গে।' বলে লোকটি আবার পা বাড়াল। 'কী হবে আর নিয়ে?'

'আমারই বা কী হবে রেখে? কেউ দেখলে যদি জিগেস করে, তখন বলবই বা কী?'

'ফেলে দিও।'

'ফেলবই বা কোথায়? না, তুমি নিয়েই যাও।' ললিতা জিনিস দুটো কুড়িয়ে আনল।

'আচ্ছা দাও, নিয়েই যাচ্ছি।' লোকটি ফিরে ললিতার কাছে এসে সেগুলো নিতে যাবে, এমন সময় এক প্রকাণ্ড হাড়-ভাঙা হাই এসে তাকে বাধা দিল। —'আঃ, কী যে ঘুম পাচ্ছে!' কথাগুলো জড়িয়ে গেল তার।

ললিতা তার ঘুমে-ঘোলা চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিগেস করলে, 'আচ্ছা, কেন করলে তুমি?'

'কী করলাম?'

'এই যে—'

'কেন, বুঝতে পার না কেন?'

'টাকার জন্য?'

লোকটি কথা না বলে ললিতার হাত থেকে তার পিস্তল আর মুখোশ নিতে গেল; কিন্তু সে-দুটো তার হাত ফসকে পড়ল মেঝের উপর।

'বা-বাঃ, এতই ঘুম পেয়েছে তোমার! এই ঘুম নিয়ে তুমি আবার যাচ্ছিলে পাইপ বেয়ে নামতে। —থাক, ও-দুটো আর কুড়োতে হবে না এখন —না-হয় একটু বসেই যাও। বস না—এখানেই বস।'

লোকটি ভয়ে-ভয়ে আলগোছে খাটের উপর বসল।

মশারিটা চাঁদা করে তুলে ললিতা বসল তার কাছে। —'এইবার বলো।'

'কী?' (অস্পষ্টস্বরে)

'আচ্ছা, তোমার এমন-কী টাকার দরকার হল?'

'টাকার দরকার সবারই হয়।'

'সবাই কিছু পায়ও। কী করো তুমি?'

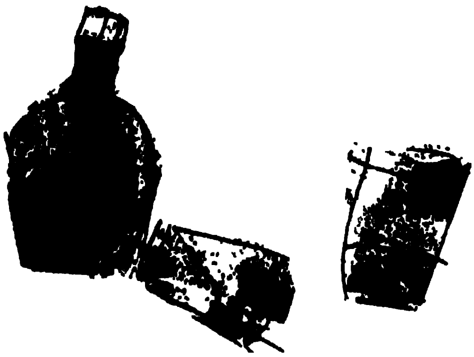
লোকটি বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ তুলে মৃদুভাবে একটু সঞ্চালন করল।
'থাক কোথায়?'
'মেসে।'
'কী করে চলে?'
'চলে না। সেইজন্যেই—'
'ও। তোমার বাবা—?'
বাঁ হাত একবার শূন্যে ঘোরাল সে।
'মা—'
'আছেন এক মা।'
'ভাই-বোন?'
লোকটি আঙুল দিয়ে শূন্যে ঢালু রেখা আঁকল।
'অনেক বুঝি?'
'অনেক।'
'কোথায় থাকে তারা?'
'দেশে।'
'সেখানে—?'
'এই, কোনোরকমে।'
'তুমিই বড়ো?'
লোকটি মাথা ঝাঁকাল।
'আর কেউ নাই তোমাদের?'
লোকটি মাথা নাড়ল।
'হু।' একটু চুপ করে থেকে ঃ 'বলো না।'
'কী?'
'সব বলো।'
'সবই তো বললাম।'
'ওই যাঃ —আসল কথাটাই তো এতক্ষণ জিগেস করা হয়নি। তোমার নামটি কী?'
'কমল।'
'বাঃ, বেশ নাম, কমল। কমল, কমল।' ললিতা দু-একবার নামটা নিজের মনে পুনরাবৃত্তি করলে।
'ডাকছ কেন?'
ললিতা ছেলেটির এলোমেলো চুলগুলিতে একবার হাত বুলিয়ে আস্তে বললে, 'কমল।'
'উঃ, কী শক্ত কবেই বেঁধেছিলে হাত; এখনো টনটন করছে।'
'খুব লেগেছিল, না? দাও, আমি রগড়ে দিচ্ছি, সেরে যাবে। —না, না, এমনি সুবিধে হবে না। তুমি শোও তো।'

কমল দ্বিরুক্তি না-করে বালিশের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। ললিতা তার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে কব্জি থেকে আরম্ভ করে আস্তে-আস্তে রগড়ে দিতে লাগল।

'আঃ', গভীর আরামে কমল চোখ বুজল। তার মুখ সদ্য-মৃত লোকের মতো প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ! সেই মুখের দিকে ললিতা তাকিয়ে রইল—মুগ্ধ দৃষ্টিতে। হঠাৎ তার মনে হল বিছানায় যেন সে শুয়ে আছে নিজে, আর পাশে বসে আছে তার মা—সারা রাত সে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে—'মাগো আর পারিনে, মরে গেলাম; উঃ, মা, মা-গো!' তারপর ভোরের দিকে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবু ঘুমের মধ্যে টের পেয়েছে, মার হাত তার কপালে, মুখে, চুলে.... সেই তাদের পাড়াগাঁর বাড়ি, খিড়কির পুকুর, উঠোনে ব্রতের আলপনা, মাঘের শীতে রাত থাকতে নাইতে যাওয়া, মাঘমণ্ডলের গান, 'ওঠো ওঠো সূয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়ে'— মা-গো। ললিতার সারা গা হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠল, তার চোখ উঠল ছলছলিয়ে।

ঘুমের মধ্যে কমল পাশ ফিরল।

বারবধূ



সুবোধ ঘোষ

বাইরের বারান্দায় অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা যায়, তার সঙ্গে একদল মেয়ে ও পুরুষের হাসিখুশি আলাপের কলরব। কারা যেন এসেছে। এইবার কড়া নাড়ছে।

— শুনছেন। বাইরে থেকে এক ভদ্রলোকের গলার স্বর শোনা গেল।

ঘরের ভেতর চমকে উঠল প্রসাদ। চেয়ারটা ছেড়ে চকিতে উঠে দাঁড়াল। ঘরের অবস্থা যেমন অসম্বৃত, তার বুদ্ধিও তখনকার মতো তেমনি অপ্রস্তুত। ফাঁপরে পড়ল প্রসাদ। চাপা গলায় আস্তে আস্তে বলল — যা ভয় করেছিলাম, শেষে তাই হল লতা। শিগগির ওঠ।

লতা বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে— আমাকে মিছে ভোগাও কেন? আমি ওসবের কি ধার ধারি?

তাকিয়ার ওপর এলিয়ে শুয়ে তেমনি নিবিষ্টমনে সিগারেট খেতে থাকে লতা। পাশে টেবিলের ওপর একটা বিয়ারের বোতল আর চাবি, তখনো ছিপি খোলা হয়নি। একটা রেশমি শাড়ি এলোমেলোভাবে লতার কোমরে জড়ানো। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোতে সবেমাত্র বৈঠক তখন বসেছে।

— অন্যায় করছ লতা। ওঠ লক্ষ্মীটি। তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেল। এতে শুধু আমারই মান বাঁচবে তা নয়, তোমারও। একটু ভদ্রতা রক্ষা করে চলতে দোষ কী? ওঠ, কিছুক্ষণের জন্য একটু কষ্ট কর, অনেকক্ষণ ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

লতা উঠল। প্রসাদ তাড়াতাড়ি বিয়ারের বোতলটা আলমারিতে তুলে বন্ধ করল। ঘরের দেয়ালে টাঙানো দুটো বড়ো বড়ো ছবি নামিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখল। যতদূর সম্ভব ঘরের মূর্তিটাকে দু'চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল প্রসাদ কোথাও কোনো অপরুচির ইঙ্গিত সব সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়ে যদি বা লুকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, ওই পর্দাটা — জরির কাজ-করা এক জোড়া বিলিতি নগ্নিকা বাতাসের দোলায় কুৎসিতভাবে ঢলাঢলি করছিল তখনো। প্রসাদ পর্দাটাকে এক থাবা দিয়ে ধরে, কুঁচকে পাকিয়ে, খাটের তলায় ছুঁড়ে দিল।

প্রসাদ—এইবার তুমি একটু তাড়াতাড়ি...।

লতা— নাঃ, আর পারি না। তোমার ভদ্দোরপনার ভড়ং রাখতে গিয়ে বার বার বাইরের লোকের কাছে ঢঙ দেখাতে পারব না। সারাটা দিন তো তোমার মানের ভয়ে চাকর-বাকরের সামনে একটু জোরে হাসতে কাশতেও পারি না। এতই যদি পারি, তবে তোমার কাছে বাঁধা থাকব কেন? থিয়েটারে খাটলে দুদশ'শো হত।

প্রসাদ যত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, লতার উৎসাহ যেন ততই এক নির্বিকার হৃদয়-হীনতায় শ্লথ হয়ে পড়ে থাকে। প্রসাদ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখের চেহারাটা যেন বলছে — জোর করছি না। দয়া করে উদ্ধার কর।

ফিক করে হেসে ফেলে লতা। প্রসাদের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলে — ডুডু খাবে খোকা? ভদ্দোরলোকের ভয়ে বুক দুর দুর করে, মেয়েমানুষ রাখার শখ কেন? শ্যাম রাখি কুল রাখি—দুই-ই একসঙ্গে হয় না।

লতা একটা তোয়ালে আর শাড়ি আলনা থেকে তুলে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে যায়। প্রসাদের বুক থেকে বদ্ধ নিশ্বাসটা মুক্তি পায়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজা খুলে দেয়। জন চারেক প্রৌঢ় বৃদ্ধ ও যুবক, ছ'সাতটি প্রৌঢ়া ও তরুণী আর গোটা দশেক ছোটো ছোটো মেয়ে মুহূর্তের মধ্যে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে।

হিলতোলা জুতো আর স্যান্ডেলের শব্দ। একপাল ছেলের উল্লম্ফ হুটোপুটি, শাড়ি আর আঁচলের খশখশ ফিশফাশ শব্দ, চুড়ির নিক্বণ, পাউডার ও এসেন্সের একটা সুবাসিত ঝড়, তার সঙ্গে বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়দের চুরুটের

ধোঁয়া আর হাতছড়ির ঠুকঠাক — বাইরের পৃথিবী থেকে একটা প্রীতি ও সজ্জনতার উচ্ছ্বাস যেন প্রসাদের ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে এসে ছড়িয়ে পড়ল। প্রসাদ হাসি মুখে নমস্কার জানায় — আসুন।

বেশ লোক এঁরা। ব্যবহারে কোনো জড়তা নেই। কেতাদুরস্ত ভদ্রয়ানার বালাই নেই। অপরিচয়ের সঙ্কোচ নেই। বৃদ্ধ রাখালবাবু গা থেকে আলোয়ানের স্তূপ নামিয়ে প্রসাদের খাটের ওপরেই তাকিয়া টেনে বসে পড়লেন। যে যার ইচ্ছামতো চেয়ার টেনে নিল। মেয়েরা ব্র্যাকেট থেকে একটা গোটানো সুতির গালিচা নিজেরাই নামিয়ে নেয়, মেঝের ওপর পাতে এবং বসে পড়ে।

এক যুবক-আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে এক বৃদ্ধ-আগন্তুক বললেন — এইবার তোমার অভিযোগ শুনিয়ে দাও, রণজিৎ।

রণজিৎ প্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলে — সত্যি মশাই, আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক বলবার আছে। আমরাও আপনার মতোই এখানে চেঞ্জে এসেছি। এই তো ক'ঘর মাত্র আমরা, এ ছাড়া আর কোনো বাঙালির মুখ দেখতে পাই না। আমরা খুঁজছি কী করে দল ভারী করি, আর আপনি বেমালুম আড়ালে লুকিয়ে আছেন?

প্রসাদ সলজ্জভাবে স্বীকার করে নিল — হ্যাঁ, এটা অন্যায় হয়েছে।

মেয়েদের দল থেকে প্রথম কথা বলল আভা, রণজিতের বোন।

— বড়দা, তোমরা তো এরই মধ্যে নিজেদের দল ভারী করে ফেললে। আমরা কী করি? ভেতর থেকে তো কারও কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

প্রসাদ তেমনি লজ্জিতভাবে হেসে হেসে বলে। — একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি আসছেন।

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল লতা।

চাওড়া-পাড় একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে লতা। ঘরে ঢুকে সামনেই বুড়ো রাখালবাবুকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায় লতা, মাথার কাপড়টা আরও একটু টেনে সামনে নামিয়ে দেয়। লতার সিঁথিতে লম্বা সিঁদুরের টান, পায়ে জুতো নেই, তাই দেখা যায় সরু আলতার রেখা।

লতাকে দেখবার পর প্রসাদের মুখের ওপর থেকে এতক্ষণের ভীরুতা ও কাতরতার খিন্ন ছায়াটুকু সরে গেল। কথাবার্তায় সহজ স্ফূর্তি ফিরে পেল প্রসাদ।

রণজিতের বোন আভা লতাকে হাত ধরে গালিচার ওপর বসাবার জন্য একবার টানল। লতা বলল — ভেতরে চলুন।

বাইরের ঘরে ও ভেতরের ঘরে অবাধ গল্প, তর্ক ও হাসির পালা গড়িয়ে চলল অনেকক্ষণ। ছেলেপিলেরা দু'বার মারামারি বাধাল। তাদের থামাতে গিয়ে বুড়োরা গোলমাল করল আরও বেশি। আজ দেড় মাসের মধ্যে বরাকর কলোনির একান্তে এই নিরালা বাংলো বাড়িটার কোনো সন্ধ্যা আজকের মতো এত হর্ষমুখর হয়ে ওঠেনি।

অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করার জন্য লতা খাবার তৈরি করবার উদ্যোগ করে। মেয়েরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করে — শুধু চা হলেই হবে, খাবার-টাবার করবেন না, খবরদার।

লতা বলে — কিন্তু ছেলেরা কী খাবে? শুধু চা? তা হতে পারে না।

লতা রাগ করেই বলে — দেখছেন তো, ওদিকে মশাই কেমন নিশ্চিন্ত মনে শুধু কথা দিয়ে চিঁড়ে ভেজাচ্ছেন। এদিকের কাজের জন্য কোনো হুঁশ নেই, একটু খোঁজখবরও নেই।

মেয়েরা হেসে উঠল সবাই — তা বেশ করেছেন, আপনি হিংসে করছেন কেন?

আভা হঠাৎ নিজের খেয়ালেই বাইরের ঘরে এসে বলে —বউদি রাগ করছেন। ভেতরে কত কাজ রয়েছে, আর আপনি এখানে গল্পে ডুবে আছেন?

প্রসাদ—কেন কী ব্যাপার?

আভা — স্বয়ং এসে খোঁজ নিন।

লতাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। দরজার আড়ালে ভেতরের দাওয়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। প্রসাদ ভেতরে আসতেই ফিস্‌ফিস্ করে লতা বলে — চা না হয় হল, কিন্তু ছেলেপিলেদের কী দেব? তুমি একবার বাজারে ঘুরে এস, কিছু মিষ্টি-টিষ্টি...।

আভা এবং আরও দুটি তরুণী ওই মৃদু ফিস্‌ফিসের ভাবার্থ বুঝতে পেরেই একসঙ্গে প্রতিবাদ করে—বউদি বড়ো বাড়াবাড়ি করছেন!

প্রসাদ বলে — বিস্কুটের টিনটা খুললে হয় না? নইলে বাজারে যেতে হয়।

লতা বলে — তাই তো, মনে ছিল না। যাক, ওতেই হবে।

বিস্কুটের টিন শূন্য করে দিল ছেলের দল। মেলামেশার পালা ক্ষান্ত হল রাত্রি দশটায়। তার আগে প্রসাদকে গাইতে হল গান; ঘরের কোণে শালুর খোলে ঢাকা এসরাজটা গুণী প্রসাদের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিল।

রাখালবাবু আলোয়ানটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালেন আবার। রাখালবাবুর স্ত্রী, মেয়েরা এঁকে মাসিমা বলে ডাকছিল, পায়ের মোজাটা টেনেটুনে ঠিক করলেন। তাঁর ফোলা ফোলা পা দুটোতে বেরিবেরির নিদর্শন স্পষ্ট। তারকবাবু নতুন চুরুট ধরিয়ে হাতছড়িটা আবার ঠুকলেন। আভা ছাড়া সঙ্গের আর তিনটি মেয়েই হল তাঁর ভাগ্নি, ভাইঝি আর শ্যালিকা। ছেলেপিলেদের মধ্যে চারজন হল রাখালবাবুর নাতি, বাকি সবকটি হরিশবাবুর হরিশ দম্পতি আজ অনুপস্থিত। তাঁরা বাতের প্রকোপে এখন শয্যা আশ্রয় করে আছেন।

রাখালবাবু বললেন — তা হলে এইবার তোমায় মুক্তি দেব প্রসাদবাবু। রাত হল অনেক। আমরা উঠি।

বিদায় প্রসঙ্গে আর একবার আলাপবার্তার কলগুঞ্জন মুখর হয়ে উঠল। প্রসাদ ফটক পর্যন্ত লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল। লতা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইল ছায়ার মতো।

চলে গেল আগন্তুকের দল।

—আঃ বাঁচা গেল! বিয়ারের বোতলটা আবার টেবিলের ওপর নামাল প্রসাদ। শরীরটা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল লতার, তাই বিছানার ওপর একটা বালিশ আঁকড়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

কিন্তু প্রসাদের গলার স্বরে স্ফূর্তি চড়ে উঠেছে— এ কী? উঠে বসো লতা, এ সময়ে বে-রসিকতা করো না মাইরি!

লতা কোনো সাড়া না দিয়ে তেমনি নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকে। প্রসাদ হাত ধরে টানাটানি করতেই উঠে বসে এবং রুক্ষস্বরে বলে—যখন তখন অসভ্যতা করো না।

প্রসাদ—বেশ বেশ, করব না। যাও, এবার চটপট এই আল্‌তা-ফাল্‌তা সাজসজ্জা বদলে এস। এক পাত্র চড়িয়ে নিয়ে বসা যাক জুত করে।

লতা — এ রকম ক্যাংলাপনা করছ কেন? কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

পাশের ঘরে চলে গেল লতা। তাঁতের শাড়ি ছাড়ল, আলতা সিঁদুর মুছে ফেলল। আকস্মিক একটি সন্ধ্যার কপট বধূবৃত্তির নির্মোক ঘুচিয়ে, পায়জামা পরে চটি পায়ে দিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকল।

প্রসাদ খুশিতে আটখানা হয়ে গেল—বাঃ, সত্যিই তোমাকে ফাইন মানিয়েছে এইবার।

লতার কানে যেন কথাটা গেল না; ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল লতা। দূরে বরাকরের পুলের ওপরে একটা আলোর সারি মিটমিট করছে। আর কিছুই দেখা যায় না। নিকটেই একটা নামহীন ফুলের গাছের তলা থেকে স্তূপীকৃত বাসি ফুলের পচাটে গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। লতা লম্বা লম্বা টান দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ভরে নেয়, আস্তে আস্তে ছাড়ে।

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদের যেন চমক ভাঙল। দ্বিতীয় বিয়ারের বোতলটা শেষ হয়েছে। লতা তখনো জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। প্রসাদ ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকায়। তারপর বিড়বিড় করে বলে, স্বর জড়িয়ে যায়—বেশ, বেশ! ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক। দূরেতে বন্ধু দূরেতে রহ। কিন্তু তুমি বাবা পাকা খেলোয়াড়। এতগুলি ভদ্র নরনারীতে দিনে তারা দেখিয়ে দিলে বাবা। তবু থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্‌! আমার মান বাঁচিয়েছ। তোমাকে বকশিশ দেব। আসছে বছর কাশ্মীর। কিন্তু...কিন্তু তুমি আমাকে এইমাত্র অসভ্য বলেছ। ইউ ভ্রষ্টা মুড়িওয়ালির বাচ্চি। আমি তোমাকে জুতিয়ে...।

টেবিলটা একটা ঠেলা মেরে উল্টে দিয়ে সরোষে দাঁত ঘষে প্রসাদ একটা হুমকি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

লতা শান্ত ও সহজ অথচ দৃঢ়স্বরে বলে—হঠাৎ এত মেজাজ জেগে উঠল কেন? বসো বলছি!

প্রসাদের মেজাজ কুলকাঠের আগুনের মতো তবু যেন থেকে থেকে সশব্দে ছিটকে পড়ছিল। লতা খুব ভালো করেই এ-রোগের ওষুধ জানে। এখনি প্রসাদের কোলের ওপর পা দুটো চড়িয়ে দিয়ে যদি একটু ফষ্টি করা যায়, অথবা দুটো খেউড় গেয়ে ওঠে, তবে ওই মেজাজের আগুন ঠান্ডা ছাই হয়ে উঠতে কতক্ষণ।

প্রসাদ লতার মুখের দিকে তাকিয়ে, বড়ো বড়ো চোখ করে, একটা দৃপ্ত ভঙ্গি নিয়ে বলে— যেমন রেখেছি তেমনি থাকবে!

লতা— বলছি তো, তাই থাকব।

প্রসাদ—তবে এত পোজ করছ কেন? তুমি তো বাঁধা মেয়েমানুষ মাত্র।

লতা—তা তো জানিই।

প্রসাদ—তুমি আভার চাকরানি হবার যোগ্য নও।

হঠাৎ যেন আগুনের ঝাপটা লেগে লতা ছটফট করে উঠল। এতক্ষণ প্রসাদের বকাবকিকে নেশাড়ে মানুষের মূঢ়তা মনে করেই চুপ করে ছিল লতা। কিন্তু এই কথাগুলির ভিতব দিয়ে যেন একটা অতি সূক্ষ্ম সত্যের ইঙ্গিত ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

প্রসাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরে তার মুখের ওপর কঠোরভাবে তাকিয়ে রইল লতা। কিন্তু লতার ক্ষোভ শুধু ফণা তুলে দাঁড়াল মাত্র। ছোবল আর পড়ল না।

— তোমার কাছে বাঁধা থাকতে কোনো গরজ নেই আমার। আমি কালই চলে যাব তারকেশ্বরে। লতা সরে এসে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গিয়ে দরজার খিল এঁটে দিল।

অনেক রাত্রে একটানা স্তব্ধতার পর লতার ঘরের কড়া বেজে উঠল আবার। নেশা কেটে যাবার পর প্রসাদের মনের অবসাদের মধ্যে সেই ভালোমানসী ভীরুতা যেন আবার সতর্ক হয়ে উঠেছে। লতাকে সে ভালো করেই চেনে। এসব মানুষকে চটিয়ে লাভ নেই। জীবনের চোরাঘরে ওরা পাপের সঙ্গে চুক্তি করে চলে। বাইরের আঙিনা, যেখানে আত্মীযতার মেলা, সেটা ওদের কাছে বিদেশের মতো দুর্বোধ্য। তার মর্যাদা দেবার মতো কোনো দরদ ওদের নেই। লোকসমাজে প্রসাদের মান-মর্যাদার জন্য কতটুকু মাথাব্যথা লতার? কাল সকালেই যাবার আগে হয়তো বরাকর কলোনির প্রতিটি প্রাণীকে জানিয়ে দিয়ে যাবে নিজের পরিচয়, আর সেই সঙ্গে প্রসাদের এত যত্নে গড়া সুনামের সামাজিক স্বাক্ষরে কালি ঢেলে দিয়ে যাবে।

প্রসাদ বাইরে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বলে— লতা, বল তুমি রাগ করনি, তবে আমি ঘুমোতে যাব। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। বল, তা না হলে এখান থেকে নড়ব না।

প্রসাদ বারবার কড়া নাড়তে থাকে, ভেতর থেকে লতার শান্ত কণ্ঠস্বরের জবাব আসে-- না, আমি যাব না। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

--চাচিজি!

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লতাকে ডাকছে বিক্রম, সুবেদারবাবুর ছোটো ছেলেটা। মেঝের ওপর বিক্রমের লাট্টু মাঝে মাঝে খর্ খর্ করে চক্কর দিচ্ছে শোনা যায়। ঘুম ভাঙতেই প্রসাদ বুঝল ভোর হয়ে গেছে।

কদিন থেকে রোজ প্রত্যূষে ছেলেটা আসে। লতার সঙ্গে চা পাউরুটি খায়। তারপর কিছুক্ষণ পেঁপে গাছটার নীচে মাটি দিয়ে একটা কেল্লা তৈরি করে, পেঁপে ডাঁটার তোপ দিয়েই শেষে উড়িয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যায়।

ভাঙা স্বপ্নের মতো গত রাত্রির ঘটনার ছবিগুলি যেন জাগ্রত চেতনায় আবার জোড়া লেগে সমস্ত ইতিহাসটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রসাদের কাছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রসাদ বুঝতে পেরেছে—পাশের ঘরে লতা জেগে উঠেছে, কাপড়-চোপড় ছাড়ছে। এইবার বাইরের ঘরের খিল খুলছে লতা। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শোনা যায়, লতা বলছে—এস বিক্রম।

বিক্রম যেন অনুযোগ করে বলে---কিত্না নিঁদ যাতি হো চাচিজি।

প্রসাদ শুয়ে শুয়ে সবই অনুমান করে নিতে পারছিল। মহাবীর চাকরটাও বোধ হয় এসে গেছে। ঝাড়ু দেবার শব্দ শোনা যায়। তারপর? তারপর মহাবীর চা নিয়ে আসবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে। তারপর আরও দেখতে হবে—লতা সুগৃহিণীর মতো সারা দুপুর মহাবীরের কাজ তদারক করছে। ভাঁড়ার খুলে হিসেব করে ঘি-ময়দা বের করছে। তারপর খাওয়া। লতা তখন স্নান সেরে মহাবীরের সঙ্গে ধর্মশালার মন্দিরে প্রসাদ আনতে যাবে। এক কৃত্রিম সংসারের শিবিরে সমস্ত দিন ধরে এই নিষ্ঠাশীল ও নিয়মিত কর্তব্যের সাধনা। প্রেরণা নেই, তবু যেন নিজের দমেই চলে। প্রদাসের মনও যেন ক্লিষ্ট যাত্রীর মতো এই খাপছাড়া মুহূর্তগুলির চাকার

ওপর দিয়ে ধৈর্য ধরে গড়িয়ে চলে যতক্ষণ না সন্ধে হয়, গন্তব্য এসে পৌঁছে। তখনি শুধু লতাকে কাছে পাওয়া যায় আর চিনতে পারা যায়। তার আগে, এতক্ষণ সে বাংলো বাড়ির হাওয়া থেকে যেন উবে যায়।

বিক্রম চলে যায়, এবং যেতে না যেতে হয়তো লালাবাবুর স্ত্রী এসে বিশ্বসংসারের কাহিনি নিয়ে বসেন। লালাবাবুর জামাইটির চাকরি নেই, মেয়েটা দুঃখে আছে। কাহিনি শুনে লতার মুখ ম্লান হয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, দুঃখটা যেন লতার মনে বড়ো বেশি বেজেছে।

সমস্ত ঘটনাগুলিই প্রসাদের কাছে আজ কেমন যেন গর্হিত মনে হয়। এত বড়ো একটা ফাঁকি সত্যের সাজ সেজে থাকবে, আলো-অন্ধকারের তফাতটুকুও যে মিথ্যে হয়ে যায়।

রাখালবাবুর বেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে এল—প্রসাদবাবু, লতাকে আজ বিকেলে একবার পাঠিয়ে দিও। আজ রাত্রে এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে ফিরবে। ইতি—মেসোমশাই।

চিঠি পড়ে অগ্রসর হয় প্রসাদ। দুশ্চিন্তার জাল আরও জটিল হয়ে ওঠে। কেমন যেন ভয় ভয়ও করে। এবং কী করবে ভেবে পায় না। ঘরের পর্দা সরিয়ে দিয়ে দেখতে পায়, বারান্দায় বসে মশলা বাছছে লতা।

আজকের সকালে লতার মনটাও কেমন অস্বস্তিতে ভরে আছে। মাঝে মাঝে অকারণে ভয়ও করছে। কীসের জন্য এবং কেন, লতা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এ রকম কোনো দিন হয়নি। নইলে তাকে গালাগালি দিয়ে সেরে যাবে, এমন কোনো জমিদারের বেটা আজও সে দেখেনি। কিন্তু নিজের মনের দিকেই চেয়ে লতা আশ্চর্য হয়, কালকের রাত্রির ঘটনা নিয়ে একটা ঝগড়া বিতণ্ডা করার মতো উৎসাহও যেন সেখানে আর নেই।

লতার বুঝতে দেরি হয় না —এটা ভয় নয়, দুর্বলতা। কিন্তু দুর্বলতাই বা কেন?

এই এলোমেলো ভাবনার মধ্যেই লতার মন ধীরে ধীরে আবার হিংস্র হয়ে ওঠে। তাড়িয়ে দেবে দিক না, তাতে ক্ষতি কী? সেই মাড়োয়ারি বেনিয়াটা এখনও আছে, তু করে ডাকলেই চলে আসবে। কিন্তু যাবার আগে এই ভালোমানুষের ছেলেকে এমন শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে, জীবনে যেন আর বেশ্যার সঙ্গে বেয়াদবি করার দুঃসাহস না হয়।

— লতা।

প্রসাদের ডাক শুনে লতার বুকটা তবু আশঙ্কায় ছমছম করে উঠল। প্রসাদ এগিয়ে আসতেই লতা মাথা নিচু করে মশলা বেছে চলল, কোনো উত্তর দিল না!

—রাখালবাবুর বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন। যাবে?

চোখ তুলে তাকাল লতা। আশঙ্কার ঝাপসা পর্দাটা সরে গেল। উত্তর দেয়—যাব।

—যাও, কিন্তু কোনো রকম বেয়াড়াপনা যেন টের না পায়।

নাটকের সিন পাল্টে গেছে। নতুন দৃশ্যের আরম্ভ। যেমন অদ্ভুত তেমনি জটিল। শুধু লতা নয়, প্রসাদও তার সংক্ষিপ্ত জীবনের পরিধি অতিক্রম করে বহু মানুষের মেলামেশার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রসাদের সন্ধেগুলি বেশির ভাগ আভাদের বাড়িতেই কেটে যায়। লতা যায় রাখালবাবু, তারকবাবু ও হরিশবাবুর বাড়ি। তাছাড়া সুবেদার ও লালাজির বাড়িও আছে। শুধু আজ পর্যন্ত আভাদের বাড়ি লতার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বার বার দু'বার নেমন্তন্ন এসেছে। কিন্তু দুদিনই হঠাৎ কেন জানি লতার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একদিন জ্বর আর একদিন মাথাধরা।

প্রসাদ খুশি হয়ে বলে—সত্যিই তোমার বাহাদুরি বলতে হবে। যেখানে যাই, সবারই মুখে তোমার প্রশংসা আর ধরে না। কী চালই চেলেছ লতা!

উত্তরে লতা চুপ করে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।

প্রসাদ আবার বলে—দেখো, বেশি বাড়িয়ে তুলো না যেন।

লতা—বাড়িয়ে তুললে তোমারই মান বাড়বে।

প্রসাদ হেসে ফেলে—সত্যিই কী যে কাণ্ড হচ্ছে! এক এক সময় যা ভয় করে আমার! যদি একবার ধরা পড়ে যাও লতা, কী ব্যাপার হবে বল তো?

লতা—আমার আর কী ছাই হবে? বনের পাখি বনে ফিরে যাব।

প্রসাদ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কী যেন ভাবে, তারপর অন্যমনস্কের মতোই বলতে চলে যায়— হ্যাঁ, তোমার কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু.....

আভা আরও দু'তিন দিন প্রসাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। আভা কথা বলেছে লতার সঙ্গে, কিন্তু প্রথম দিনের সেই সহজ হৃদ্যতা তার মধ্যে আর ছিল না। পরিচয় যত পুরনো হয়েছে, ব্যবধান বেড়ে গেছে তত। লতাও ঠিক সহজভাবে মিশতে পারেনি। কথা বলেছে লতাও, কিন্তু তাল কেটে গেছে বার বার। লতা চা এনে আভার সামনে ধরেছে, আভা আপত্তি করেছে, কিন্তু সাধাসাধি করতে পারেনি লতা। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

প্রসাদ আর লতা। যখন এরা দুজন শুধু থাকে, তখনই এদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কথাবার্তা বিরল থেকে বিরলতর হয়ে এসেছে। লতা বেড়িয়ে এসে দেখে প্রসাদ তখনও ফেরেনি। প্রসাদ বাইরে থেকে মাঝে মাঝে ফিরে এসে দেখে — লতা ঘুমিয়ে পড়েছে, তার ঘরের দরজা বন্ধ।

ভদ্রলোকদের বাড়িতে মেয়েদের গল্পের আসরে লতার প্রসঙ্গ এক-একবার ওঠে। মাসিমা বলেন— মেয়েটা বড়ো শান্ত।

তারকবাবুর মেয়েরা নিভা, প্রভা ও মমতা একসঙ্গে সায় দিয়ে বলে—লতাবউদি বেচারা সত্যিই ভালোমানুষ। আভা মিছিমিছি ওর নিন্দে করে।

মাসিমা গলার স্বর চড়িয়ে প্রশ্ন করেন—আভা কী বলেছে?

মমতা—লতাবউদি নাকি লেখাপড়া জানে না। একেবারে গেঁয়ো, গাঁয়ের মেয়ে।

মাসিমা চটে উঠলেন—আভা নিজেকে কী মনে করে? ভয়ঙ্কর বিদুষী? মর ছুঁড়ি, বিয়ের ছ'মাস না যেতে স্বামী হারিয়েছিস, বিদ্যে নিয়ে ধেই ধেই করছিস। লজ্জাও করে না!

নিভা প্রভা হেসে ওঠে। আভার ওপর মাসিমার আক্রমণের একটা অর্থ হতে পারে, মাসিমাও গাঁয়ের মেয়ে।

লালাজির স্ত্রী এসেছেন। লতা তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করছে। বাইরের ঘরে গল্প করে প্রসাদ, আভার সঙ্গে।

প্রসাদ বেশ জোরে জোরে যেসব কথা বলে, শুনে আভার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। ঘন ঘন দরজার দিকে তাকায়। ভুরু কুঁচকে ভর্ৎসনার সুরে বলে- -আপনার কোনো ভয়-ডর নেই, প্রসাদবাবু!

একটু পরেই দেখা যায়, আভা ও প্রসাদ বেড়াতে বার হয়ে যাচ্ছে। লালাজির স্ত্রী বোকার মতো লতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন — ও ছোকরি কে লতা? ওর চালচলন ভালো মনে হচ্ছে না। তুমি একটু কড়া হও, লতা।

লতা বলে— আমি ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকবে, আমার স্বামীও ঠিক থাকবে। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

লালাজির স্ত্রী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেন—তা বটে।

কিন্তু লতার নিজের কথার প্রতিধ্বনি তার অন্তরের ভেতরে প্রচণ্ড বিদ্রূপের মতো বেজে ওঠে। হেসে ফেলে লতা।

প্রভার স্বামী এসেছে প্রভাকে নিয়ে যেতে। তারকবাবুর বাড়ি তাই আজ লতা ও প্রসাদের নেমন্তন্ন ছিল। সব মেয়েদের মতো লতাও জামাইয়ের সঙ্গে গান, গল্প ও ঠাট্টা নিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসল। বিদায় নেবার সময় প্রসাদ দেখতে পায়, প্রভার স্বামী লতার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। প্রসাদের সারা মনটা একটা অপঘাতে যেন ছিঁড়ে পড়ল।

পথে আসতে লতাকে গম্ভীরভাবে প্রসাদ বলে—সত্যিই বড়ো বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

লতা উত্তর দেয় না।

প্রসাদ বলে—এই পাপ আমার লাগছে। তোমার কিছু হবে না।

প্রসাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারলে খুশি হতে পারত লতা। সব পাপ প্রসাদের জীবনের অভিশাপ বড়ো

করে তুলুক, লতা তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু এতটা সৌভাগ্য বিশ্বাস হচ্ছিল না লতার। তাই লতার বুকের ভেতরটাও শিউরে উঠেছিল সংশয়ে।

প্রসাদের অনুমান সত্য হলে আশ্বস্ত হওয়া যেত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিরীহ নির্দোষ মানুষের হৃদয়ের প্রীতিকে এত বড়ো ফাকি দেওয়া পাপ বইকি। সে পাপের ভাগী কি সে নিজেও নয়? কিন্তু কোন্ স্বার্থের খাতিরে? প্রসাদের মানের জন্য।

লতা মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়েও হেসে ওঠে। আরও বেশি করে হাসি পায়, প্রসাদের ভাগ্যবিপাক দেখে।

ঘরে ফিরে প্রসাদ আবার কথা পাড়ল। কথার খাপছাড়া ভঙ্গিতে বোঝা যায়, অনেক কিছু সে বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না, সে সাহস তার নেই।

প্রসাদ বলে—আজকাল দেখছি ঘরের ভেতরেও তুমি বড়ো শুদ্ধাচার চালিয়েছ। এখানে তো তোমাকে কেউ দেখতে আসে না। তবে এখানেও কনে বউটি সেজে থাক কেন।

লতা—কই, তুমি তো আজকাল কাছে ডাক না।

প্রসাদ - আমি না ডাকলে তোমার তাতে কী আসে যায়? দরকার থাকলেই ডাকব। কিন্তু তুমি সিগারেট ছেড়ে দিলে কেন? তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। তোমার এত কষ্ট করার দরকার নেই।

লতা তোমাকেও কোনো উপদেশ দিতে হবে না। যেমন ইচ্ছে তেমনি থাকব।

লতার এই উদ্ধত উক্তি প্রসাদকে অপমান করল ঠিকই, কিন্তু তার বিভ্রান্ত ও অসহায় চিত্তের অলিগলি ঢুঁড়ে সে এমন কোনো মুক্ত আশ্রয় পেল না, যেখানে এসে লতাকে উপেক্ষা করা যায়। তার সম্ভ্রমভীরু মনুষ্যত্বের চাবিকাঠিটা যেন লতা হাত করে ফেলেছে।

লতা সত্যিই বেপরোয়া হয়ে গেছে। আভার কথা মনে পড়লে হেসে ফেলে। তার একটা মেকি আধুলি চুরি করে আভার যদি কিছু লাভ হয় হোক, তার কিছুই হারাচ্ছে না। কেউ তার কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। এমন কি প্রসাদেরও সে ক্ষমতা নেই। লতার নামের দাবি সবাকার স্বীকৃতির জোরে সব বাধা ছাপিয়ে গেছে।

এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক না। বাহির যার এত বিচিত্র, অন্তর শূন্য থাকলে ক্ষতি কী। লতার দিনগুলি এই আশ্বাসে ভরে উঠেছিল। চোরাবালির উপর কত বড়ো দালান তোলা যায়, প্রসাদ ও লতার সংসার তার প্রমাণ।

আভার জ্বরের খবর শুনে প্রসাদ সেই যে সকালবেলা বের হয়েছিল, ফিরে এল এই সন্ধ্যায়। আভার জ্বরের সঙ্গে হিস্টিরিয়ার মতো আর একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে, শুধু অকারণ কান্না। রণজিৎ বলেছে, আভার জ্বর আগেও হয়েছে, কিন্তু এসব উপসর্গ কখনও ছিল না।

লতাও সবেমাত্র বেড়িয়ে ফিরেছে।

প্রসাদ ঘরের ভেতর চিন্তিতভাবে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতে থাকে। একটা কৌতুক যেন বিভীষিকা হয়ে চারদিক থেকে তাকে চেপে ধরেছে।

অনেকদিন পরে প্রসাদ আজ আবার কথা বলল—তুমি বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি করছ, লতা। আভার নামে নিন্দে রটাবার সাহস পেলে কোথায়।

লতা—নিন্দে? আমি আভার নামে কোথাও তো কিছু বলিনি।

প্রসাদ সেটাও একরকমের নিন্দে ও অপমান করাই হল।

প্রসাদের কথাগুলির মধ্যে উত্তেজনা ছিল না। মেজাজও আগের মতো দপ করে জ্বলে ওঠে না। বিচারকের রায়ের মতো অবিচল সিদ্ধান্তে তীক্ষ্ণ ও শান্ত।

লতা—বল, কী করব।

প্রসাদ—না তোমাকে দিয়ে আর বেশি নাটুকে খেলা করতে চাই না। অনেক করেছ, বেশ ভালো ভাবেই করেছ। কিন্তু তোমার দিক থেকেই ভেবে দেখ, চিরকালই তো এমনি ভাবে চলতে পারে না, তাতে তোমারই বা লাভ কী?

চুপ করে শুনতে থাকে লতা।

প্রসাদ যেন আরও একটু শক্ত হয়ে উঠল—তারপর, আজ যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়, তুমি কী বস্তু? তাহলে আমি কোথায় থাকি? তুমি আমার মানমর্যাদার চাবিকাঠি আগলে বসে থাকবে, তা হয় না। তোমাকে ভয় করে চলতে হবে, তোমার মেজাজ মর্জির জন্য সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হবে, এ হয় না।

লতা টেবিল ল্যাম্পটার দিকে একাগ্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল। কথা বলতে সেও জানে, কিন্তু এই অভিযোগ খণ্ডন করার মতো যুক্তি তার নেই, তার সে শিক্ষাদীক্ষা নেই। সে প্রয়োজনও হয়নি।

প্রসাদ বলে—তোমার চলে যাওয়া উচিত।

লতার শরীর পাথরের মতো তেমনি স্তব্ধ হয়ে রইল।

—তোমার যা পাওনা হয়েছে, সব মিটিয়ে দিচ্ছি, আরও কিছু দেব।

লতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে বলে—কিন্তু, তারপর আমার চলবে কী করে?

প্রসাদ এইবার মেজাজ হারাল—সেটা কি আমার ভাবনা? ভুলে গিয়েছ, এখানে এসে প্রথম দিন তোমায় রাঁধতে হয়েছিল বলে কী কাণ্ড করেছিলে? বাক্সপেটরা নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত চলে গিয়েছিলে। কত সাধতে হয়েছিল মনে আছে? তোমার মতো একটা...।

প্রসাদের কথার মধ্যে এক তিল মিথ্যা নেই। প্রতিবাদের কোনো অবকাশ নেই। নিছক নিরেট সব সত্য কথা। কাহিনি নয়, ঘটনায় গড়া ইতিহাস।

প্রসাদ তখুনি আবার শান্ত হয়—তুমি যেজন্য এসেছিলে, সে প্রয়োজন আমার আর নেই। সে রুচি আমার আর নেই। তুমি এখানে মিছামিছি পড়ে আছ।

প্রসাদের গলার স্বর আরও নরম হয়ে এল—সত্যিই, আমি এভাবে টিকতে পারছি না, লতা। তোমার বোঝা উচিত।

এক পীড়িত মানুষের কাতরোক্তির মতো, নিঃসহায়ের আবেদনের মতো শোনায় কথাগুলি।

লতা বলে—সত্যি বলছ, আমায় যেতে হবে?

প্রসাদ—হ্যাঁ। শুধু ভাবছি, কার সঙ্গে যাবে।

লতা উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে—তার জন্য ভাবতে হবে না। আমি একাই যাব। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দিও কিছু, মামা-কাকা কেউ এসে নিয়ে গেছে। কাল ভোরেই যাচ্ছি।

প্রসাদের সম্মুখ থেকে লতা সবেগে ছুটে অন্য ঘরে চলে যায়।

মাত্র আজ রাত্রিটা। জেগে থাকলেও কেটে যাবে, ঘুমিয়ে পড়লেও কাটবে। তবু খুব ভোরেই উঠতে হবে, বিক্রম আসবার আগেই। কিন্তু প্রতিশোধ নিয়ে যেতে হবে।

ভেতরের বারান্দার অন্ধকারে মেজের উপর নিঝুম হয়ে বসেছিল লতা। উঠোনে তখনো থালায় সাজানো ডালের বড়িগুলি হিমে ভিজছে। আচারের বয়েম দুটো রয়েছে। এখনো উঠিয়ে রাখা হয়নি। আর প্রয়োজন নেই।

লতা একবার নিজের মনে হেসে ফেলে। ভদ্রলোক ভয় পেয়েছে। যদি কেউ টের পেয়ে যায়, এই ভয়। আজ যদি মাসিমা বুঝতে পারেন, তারকবাবু হরিশবাবু শুনতে পান যে, আমি লতা নই, আমি তারকেশ্বরের পঞ্চীবিবি? আমিই যদি ফাঁস করে দিই? তাহলে ভদ্রলোকের জমকালো সম্মান কোথায় থাকে?

কিন্তু সে যে অসম্ভব! ওভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। বহুজনের স্মরণে ও সমাদরে লতার এই ছদ্মনামের শঙ্খ বাজতে থাকুক চিরকাল।

আহা! বুড়ো মানুষ রাখালবাবু, মেসোমশাই। ঠাকুর দেবতার মতো শুদ্ধ। মাথা ছুঁয়ে কতবার আশীর্বাদ করেছেন! সব পাপ আমার লাগুক। মেসোমশাই চিরদিন এমনি সুখী থাকুন, মাসিমার বেরিবেরি সেরে যাক।

বুঝতে পারে এবং স্পষ্টভাবে কল্পনা করে নিতে পারে লতা, ভদ্রলোকের ছেলে প্রসাদের ভদ্র প্রেমের আবেগ কোন্ পথে মুক্তি খুঁজছে। এক বছর দু'বছর পরে এ বাড়ির ভবিষ্যতে এই রকমই একটি রাত্রি লুকানো আছে। তখন লোকে শুধু জানবে, লতা মরে গেছে। বিধবা আভার মাথায় নতুন করে সিঁদুরের দাগ পড়বে, এই বাড়ির ঘরে ঘরে আভার সংসারপনার চুড়ি শাঁখা বাজার ঠুং ঠুং মিষ্টি শব্দ করে।

উনি কী করছেন? ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। বোধ হয় বই পড়ছেন।

বোধ হয় মতিগতি ফিরে গেছে। কিন্তু একবার যাচিয়ে দেখলে হয়। রেশমি পায়জামাটা পরে বেণী দুলিয়ে, চোখে সুরমা লেপে, এক পাত্র হুইস্কি নিয়ে যদি কোলের উপর চড়ে বসি, চরিত্তিরওয়ালার মুরোদটা দেখি একবার। কিন্তু ছিঃ!

তা করতে পারলেও যে ভালো ছিল। কিন্তু এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না, কারণ লোকটাকে কুষ্ঠরোগীর মতো অস্পৃশ্য মনে হচ্ছে আজ। জীবনে কোনো লুচ্ছাকে ছোঁবার আগে এত ঘৃণা হয়নি কখনো। তবে, কড়া এক পেয়ালা মদ গিলে নিলে বোধ হয় এ ঘেন্না ভেঙে যাবে। কিন্তু মদ? গেরস্থের বাড়িতে মদ? মনে হতেই লতার বুকটা দুরদুর করে ওঠে।

সব সামর্থ্য যেন খসে পড়ে গেছে, যেন সব দিক দিয়ে অসহায় হয়ে গেছে লতা, শুধু একটু ছদ্মনামের গৌরবের লোভে। ঘোমটা আর সিঁদুর, শাঁখা আর নোয়া দিয়ে সাজানো তার নিজেরই ছদ্ম মূর্তিটার ওপর বড়ো বেশি মায়া পড়ে গেছে। ভাঙতে পারে না এই মূর্তিকে, ভাঙবার চেষ্টাও করতে পারে না, বোধ হয় চেষ্টা করতেই ইচ্ছা করে না! কোনো উপায় নেই।

চোখ দুটো একবার আঁচল দিয়ে মুছে নিল লতা। যাত্রাগানের পালায় রানিগুলো বনবাসে যাবার আগে বোধহয় এই রকম কাঁদে।

হ্যাঁ, যেতেই হবে। কিন্তু ওই লোকটার ওপর যে প্রতিশোধ না নিয়ে যাওয়া যায় না। নিস্তব্ধ রাত্রির শূন্যতার মধ্যে একটি প্রতিশোধের মুহূর্তকে শুধু মনে মনে জপতে থাকে লতা।

না, উঁচুদরের প্রেমের ঐ অহংকারের ওপর পক্ষীবিবির ঘৃণার থুতু ছিটিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে, চৌদ্দপুরুষ তুলে গালাগালি দিয়ে। ভদ্রয়ানার শিকলে বাঁধা জমিদার প্রসাদ বায় শুধু অপমানের যন্ত্রণায় ছটফট করবে, সহ্য করবে আর নীরবে তাকিয়ে থাকবে; লোকের কানের ভয়ে জোর কলা করে একটা কথাও বলতে পারবে না। বেশ হবে। এইটুকু প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে লতা।

ঘরের ভেতর হঠাৎ পড়া বন্ধ করে প্রসাদ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

আহত সাপ পালিয়ে গেলেও কোনো না কোনোদিন ফিরে এসে কামড়ায়। প্রসাদের মন হঠাৎ এই ধরনেব একটা শঙ্কায় ভরে উঠল। রাগানো উচিত নয়, বেশ খুশি করে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় দেওয়া উচিত।

একতাড়া নোট দেরাজ থেকে বের করে প্রসাদ লতার কাছে একটা আলো হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

--এই নাও। আমার ওপর মনে কোনো রাগ পুযে রাখলে না তো লতা? আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাইনি, ক্ষতি করিনি।

লতা হাত পেতে নোটগুলি নেয়। চুপ করে বসে থাকে।

প্রসাদ আবার বলে—কী চুপ করে রইলে যে?

মুখ তুলে তাকায় লতা। প্রসাদের হাতের লণ্ঠনের আলো লতার চোখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। প্রখর হয়ে জ্বলছে তার চোখের তারা; যেন বিবরের অন্ধকার থেকে ফণা তুলে এক বিষধরী তার জীবনশত্রু একটা জীবের দিকে তাকিয়ে আছে।

ভয় পেয়ে কম্পিতস্বরে প্রসাদ ডাকে—লতা!

বোধহয় আলোর ধাঁধানি থেকে দৃষ্টি আড়াল করার জন্যই হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিয়ে মাথার ওপর কাপড়টা বড়ো করে টেনে নিল লতা। আর, কী আশ্চর্য, সত্যিই যেন এক লাঞ্ছিতা গৃহবধূ; ভীরু অভিমানের এক করুণ মূর্তি; আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিয়ে লতা বলে—না, তুমি ক্ষতি করনি; আভা ঠাকুরঝি আমার এই সর্বনাশটা করে ছাড়ল।

ঘরন্তী



বিমল মিত্র

এ-গল্পটা হয়তো না লিখতে হলেই আমি খুশি হতাম। কিন্তু লেখক-জীবনের শুরু থেকেই ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া নিজেব সুখ-অসুখের প্রশ্ন তো এখানে ওঠেই না, কারণ মিসেস্ চৌধুরীর বিশেষ অনুরোধেই এটা লেখা। তবু তিনি গল্পটা আমাকে যেভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেভাবে শেষ আমি করতে পারব না বলে দুঃখিত। তিনি যেখানেই থাকুন, এ গল্প যদি পড়েন, যেন আমায় ক্ষমা করেন।

সত্যি, সেদিনের সেই ঘটনার পর মিসেস্ চৌধুবী যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানে না। জানি না এই বই তাঁর হাতে পড়বে কিনা। তবু যদিই তাঁর নজরে পড়ে, তাঁর অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি—লাবণ্য ভালো আছে, লাবণ্যর একটি ছেলে হয়েছে, লাবণ্য ছেলের নাম রেখেছে....

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

মিসেস্ চৌধুরীর হয়তো মনে নেই সে-সব কথা। কিন্তু আমার আছে।

রাত তখন প্রায় বারোটা। লাবণ্যর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে শেষে আমার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। বৃদ্ধা না হোন, মিসেস্ চৌধুবীকে যুবতি বলা চলে না। তবু ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সেন্টের গন্ধে ঘর ভরে গিয়েছিল। রুজ মাখা গাল আর লিপস্টিক-মাখা ঠোঁটের ওপর যেন কে হঠাৎ কালি লেপে দিয়েছে।

বললেন—একটা ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে একটা গল্প লিখতে হবে বিমল—

বললাম- -ব্যাপার কী? কী হল?

—তুমি কথা দাও লিখবে? তুমি অনেককে নিয়ে লিখেছ, এ-ও তোমারই সাবজেক্ট।

—খুলে বলুন, কী ব্যাপার?

মিসেস্ চৌধুরী বললেন —লাব্যণকে নিয়ে তোমায় একটা গল্প লিখতেই হবে।

—লাবণ্য কে?

—বলব তোমাকে সব, কিন্তু আগে কথা দাও—লিখবে?

অগত্যা কথা দিতেই হল।

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—যত বদনাম শুধু আমাদেরই বেলায়, কিন্তু তবু তোমাকে বলি, আমাদের আর যা-ই দোষ থাক, আমরা চরিত্রহীনা নই। আমার বাড়িতে যারা আসে, কিংবা আমি যাদের কাছে যাই—তারা কেউ আমাকে সতী-সাবিত্রী বলে না জানুক, আমাকে শ্রদ্ধা করে সবাই। অন্তত সমাজকে আমি ঠকিয়েছি এ কথা কেউ বলবে না। আমার কাছে সরল সোজা কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল। কেউ বলতে পারবে না আমার ঘরে এসে কাউকে পুলিশের হেফাজতে পড়তে হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কি কিছু জানেনা? জানে বইকী। সব জানে। আমার কীসের কারবার, আমার পেট চলে কীসে, সবই জানে। কিন্তু তবু বলে না কেন? তুমি তো দেখেছ আমার বাড়ির পাশেই পুলিশের থানা। তাদের নাকের ওপরই তো আমার কারবার চলছে, তবু কিছু বলে না কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর মিসেস চৌধুরী অবশ্য আশা করেন না। তাই, আমিও চুপ করে রইলাম।

কথা বলতে বলতে মিসেস্ চৌধুরীর আধাপাকা চুলের খোঁপা খুলে পড়ল। দু হাতে সেটাকে সামলে নিয়ে আবার বললেন— এই রাত্তির বেলা তোমার ঘরে বসেই বলছি, আমায় কেউ কুলত্যাগিনী বলে জানে, কেউবা বলে আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে। আমি সব জানি সব স্বীকার করি, তোমাদের কাছেও আমি নিজেকে

সতী-সাবিত্রী বলে বড়াই করি না, আমি যা আমি তা-ই। আমার সুটকেস-এর মধ্যে যেদিন মিস্টার চৌধুরী এক প্রেমপত্র আবিষ্কার করলেন, সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করিনি। তা ছাড়া তোমরা তো জানো, একগ্লাস বিয়ার খেলে কী-রকম ভুল বকতে শুরু করি।

কথা বলতে বলতে যেন হাঁপাতে লাগলেন।

বললেন—তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, বরাবর জানো নিশ্চয়ই সন্ধেবেলা তিন কাপ চা খেয়ে তবে আমার নেশা কাটে, আজ সত্যি বলছি তোমায়, এক-কাপ চাও জোটেনি কপালে।

তারপর লজ্জা ত্যাগ করে বললেন—তোমার চাকরকে জাগাও, চা করুক।

সত্যি মনে হল মিসেস্ চৌধুরী এক নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন যেন। সে-আঘাতে নেশার খোরাক খেতেও ভুলে গেছেন তিনি —এমনি কঠোর তাঁর যন্ত্রণা। নইলে মিসেস্ চৌধুরীর মতো মেয়েমানুষ এই রাত্রে নিজের ব্যবসা ছেড়ে আমার বাড়িতেই বা আসবেন কেন! অথচ সে-আঘাত প্রতিরোধ্ করবার ক্ষমতাও যেন তাঁর নেই। দুর্বল অক্ষম আক্রোশে তিনি যেন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছেন। আমিই বুঝি এখন তাঁর একমাত্র অস্ত্র। গল্প লিখে যেন আমিই একমাত্র তার প্রতিকার করতে পারি।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু লাবণ্য কে আপনার?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলেন মিসেস্ চৌধুরী। বললেন— আমার কেউ না। আসলে আমার নিজের বলতে কে আর আছে বলো! আরো যেমন দশজন ছেলেমেয়ে আসে আমার বাড়িতে — লাবণ্যও তেমনি। এদের সঙ্গে আমার কাঁসেব সম্পর্ক! কত মারোয়াড়ি, ভাটিয়া, গুজরাটি, বাঙালি আসে-মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, কেউ এক ঘণ্টা, কেউ দু ঘণ্টা, কেউ তিন ঘণ্টা, কেউবা সারা রাত ঘর ভাড়া করে তিনখানা ফারনিশ্‌ড ঘর আমার, ভাড়া নেয়—আবার কাজ ফুরোলে চলে যায়। লাবণ্যও ওদের মতো একজন, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কীসেব?

লাবণ্যর সঙ্গে যদি কোনো সম্পর্ক নেই, তবে তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা, তাকে নিয়ে এই গল্প লেখানোর প্রচেষ্টা কেন, বোঝা গেল না।

মিসেস্ চৌধুরী বললেন,—কিন্তু তা বলে কি তোমরা আমায় অর্থপিশাচ বলবে? এই যে তোমরা আমার ঘরে যাও, নিজের পয়সা খরচ করে খাও দাও ফুর্তি করো, কখনও ঘর ভাড়া চেয়েছি? ছোটোবেলায় এককালে কবিতা লিখেছি, তাই তোমাদের সঙ্গে মিশি, কিন্তু এ-লাইনে এসে আর ওসব হল না। না হোক, সকলের সব জিনিস হয় না, ওই বাড়ি-ভাড়া থেকে যে-ক'টা টাকা আসে, তাইতেই আমার শেষজীবনটা একরকম করে কাটিয়ে দেব—

মিসেস্ চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝতে পারবে এ তাঁর বিনয়ের কথা। যেমন-তেমন করে কাটিয়ে দেবার মতো জীবন তাঁর নয়। এ ক'বছরে অনেক টাকা তিনি কামিয়েছেন।

একটু থেমে বললেন—ফুলচাঁদকে তুমি দেখেছ?

বললাম -দেখেছি।

—তার মতন অত বড়োলোক, যে এক কথায় দশ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে, সে-ও যখন প্রথমে ওই লাবণ্যর জন্যে আটশো টাকা খরচ করবে বলেছিল, আমি রাজি হইনি। আমি যত বড়ো ব্যবসাদার মেয়েমানুষই হইনা কেন, এককালে তো আমিও ঘরের বউ ছিলাম, রোজ সকালে স্নান করে তুলসীতলায় জল দিয়ে আমিও তো প্রণাম করেছি —আমিও তো ছেলেমেয়ের মা ছিলাম। আজ না-হয় তোমরা আমায় দেখছো অন্যরকম, এখন পাকা চুলে কলপ মাখি, তোবড়ানো গালে রুজ মাখি—

হঠাৎ মিসেস চৌধুরীর মুখে এ-কথা শুনে কেমন যেন অবাক লাগল!

বললেন—যাক গে এ-সব কথা। আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, তুমি আমার ওখানে চলো— সব গল্পটা তোমায় বলবো।

— এখন? এত রাত্রে?

—তাতে কী হয়েছে?

শেষ পর্যন্ত সে-রাত্রে আমি অবশ্য মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ি যাইনি। অনেক রাত পর্যন্ত মিসেস্ চৌধুরীই সমস্ত গল্পটা আমায় বলেছিলেন। গল্প যখন শেষ হল তখন রাত প্রায় তিনটে!

চলে যাবার সময় আমার হাত-দুটো ধরে বলেছিলেন—লক্ষ্মীটি, এটা তোমায় লিখতেই হবে। তবে, ওই শেষকালটা শুধু বদলে দিয়ো। যেমনভাবে বললাম ওইভাবে শেষ কোরো—কেমন?

তারপর ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে বলেছিলেন—তা হলে কাল বিকেলবেলা আমার ওখানে যাচ্ছো তো?

পরের দিন ঠিক সময়ে গিয়েছিলাম মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু দেখা তাঁর পাইনি। দরজায় তালা-দেওয়া। শুনেছিলাম, মিসেস্ চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কোথায়, কেউ জানে না।

তাঁর সঙ্গে সে-ই আমার শেষ দেখা।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পর্ক সেখানেই শেষ হয়নি। অনেক গল্পের সূচনায় যখন কী নিয়ে লিখব ভেবেছি, তখন মিসেস্ চৌধুরীর গল্পটার কথাও মনে হয়েছে বারবার। মনে হয়েছে নিরঞ্জন আর লাবণ্যর গল্পটা লিখেই ফেলি। যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন তেমনি করেই না হয় শেষ করি। মিসেস চৌধুরী যেখানেই থাকুন, এ গল্প তাঁর হাতে পড়তেও পারে। একদিন আমাকে স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন—সে-স্নেহ সে-ভালোবাসার কিছুটা অন্তত তা হলে পরিশোধ হয়। কিন্তু মন সায় দেয়নি।

ট্রামে বাসে সিনেমায় সংসারে সর্বত্র লাবণ্যকে খুঁজে ফিরেছে আমার মন। সন্ধেবেলা চৌরঙ্গীর ধারে গালে সস্তা পাউডার আর আলতা মাখা ঠোঁট দেখে অনেকবার চমকে উঠেছি। ভেবেছি—এই-ই বোধহয় মিসেস্ চৌধুরীর লাবণ্য! লাবণ্যর জীবন হয়তো এইখানে এসেই থেমেছে। আবার কখনও কোনও নতুন পরিচিত পরিবারের শান্ত সান্ধ্য পরিবেষ্টনীতে—পুত্র-কন্যার আনন্দ পরিবেশে—গৃহিণীর দিকে চেয়ে চোখ আমার অপলক হয়ে গেছে। এই-ই কি লাবণ্য? হয়তো নিরঞ্জনের উদার প্রেমের প্রাচুর্যে সে-লাবণ্য এখন মহীয়সী হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু আমার অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা মেটেনি কোথাও। মিসেস্ চৌধুরীর কল্পিত পরিণতির সঙ্গে, লাবণ্যের বাস্তব জীবনের পরিণতির যেন কোথাও অসঙ্গতি ছিল। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কোনোদিন তার কোনো সমাধান খুঁজে পাইনি।

তা নিরঞ্জনের মতো পুরুষকে তো আজও দেখি সকালবেলা বাসে চড়ে অফিসে যেতে। টেনেবুনে একশো টাকাই না-হয় মাইনে পাক। টুইলের শার্ট আর মিলের কাপড়। এক কথায় মোটা ভাত আর মোটা কাপড়। একটা পেট একশো টাকায় একরকম চলে যায় বইকী। আর লাবণ্য।

মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—লাবণ্যও ছিল ওই নিরঞ্জনের মতো সাদাসিধে—পঞ্চান্ন টাকা মাইনে আর পঞ্চাশ টাকা ডিয়ারনেস—

তা সত্যি। আমিও ভাবি, ও-মাইনেতে ওর চেয়ে বিলাসিতা কী করে করা যায়! বিশেষ করে মেসের খরচ, বাস-ভাড়া, টিফিন। তার পর দু-একদিন কি সিনেমাতেও যেত না?

কেমন করে ওদের আলাপ হল কে জানে! গ্রহচক্রের কোন ষড়যন্ত্রের ফলে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন। তারপর ওদের আর ছাড়াছাড়ি হল না কেন, তাই বা কে জানে? ওদের নিয়ে একদিন গল্প লেখাতে হবে এ-ধারণা থাকলে মিসেস্ চৌধুরী সে কথা নিশ্চয়ই জেনে রাখতেন। কিন্তু আর যা-ই হোক পছন্দের বাহবা দিতে হবে বটে নিরঞ্জনের।

মিসেস্ চৌধুরী বলেন—লাবণ্য রোগা হলে কী হবে, ওর গালের তিলটার জন্যে সকলেরই ওকে পছন্দ হত।

তা লাবণ্যকে আমিও কল্পনা করে নিতে পারি বইকী! মিসেস্ চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে অনেকসময় বাসের ট্রামের মেয়েদের মিলিয়েও নিই। যেন মনে হয়—এক লাবণ্য আজ একশো লাবণ্য হয়ে সারা কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর লিন্ডসে স্ট্রিটের মোড়ের ওপর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একসঙ্গে যেতে দেখলে কেমন যেন মনে হয় ওরা সেই নিরঞ্জন আর লাবণ্য। অফিসের ছুটির পর ওরা আজ চলেছে মিসেস্ চৌধুরীর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাড়িটার দিকে! মাসের প্রথম দিক। পাঁচ টাকা দিয়ে একঘণ্টার জন্যে একটা ঘর ভাড়া করে ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসে ঘনিষ্ঠ হবে—একান্ত হবে—।

এক এক দিন পেছনে পেছনে অনুসরণও করেছি ওদের। তবে কি মিসেস্ চৌধুরী আবার ব্যবসা শুরু করেছেন! সেই আগের মতন ঃ সাহেব, মেম, মোটর দোকান-পত্তর পেরিয়ে সামনে নিরঞ্জন আর লাবণ্য

পাশাপাশি চলেছে। গায়ে টুইলের শার্ট। পায়ে মোটা কাবুলি জুতো। পাশে গিয়ে দেখা যায়—নিখুঁত করে দাড়ি কামিয়েছে আজ। আব তারই পাশে লাবণ্য। নতুন কেনা স্কার্ট শাড়িটা পরেছে আজ। কানের একটা দুল কেনবার পয়সাও নেই ওর। গলায় পরেছে ঝুটো মুক্তোর নেকলেস। একটু তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পাশ থেকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। রাস্তায় জনস্রোতের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবেনা ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। ওদের নিয়ে গল্প লিখতে হবে, ভালো করে দেখা চাই! মিসেস্ চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে আজও এদের কোনো অমিল নেই যেন। লাবণ্যের পায়ের চটিটার পর্যন্ত যেন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এত বছর পরেও কি সেই চটিটাই পরছে! নিরঞ্জনও কি দশ বছর আগের সেই টুইলের শার্টটাও বদলায়নি আজ পর্যন্ত। সেই বিকেলের আলো-ছায়ার মধ্যে জনবহুল রাস্তার স্রোতে মিসেস্ চৌধুরীর কাছে শোনা নিরঞ্জন আর লাবণ্য যেন আবার রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে হাজির হল আমার সামনে।

নিরঞ্জন বলছে—এ শাড়িটা পরে তোমায় খুব ভালো দেখাচ্ছে কিন্তু —

—কত দাম নিলে এর?

আরো পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুনতে লাগলাম ওদের কথা।

নিরঞ্জন বলছে—দাম এখনও দিইনি, চেনা-শোনা দোকান—মাসে মাসে দু'টাকা করে দিলেই চলবে।

লাবণ্য বললে—কিন্তু কেন কিনতে গেলে শাড়িটা, তোমার জুতোটা তো বহুদিন ধরে ছিঁড়ে গেছে, জুতো একজোড়া কিনলে হত তোমার।

নিরঞ্জন বলে—আসছে মাসে চাকরিটা পাকা হলে কিনব, তার আগে নয়।

লাবণ্য বলে --কিন্তু এখন থেকে কিছু টাকা তো জমানোও আমাদের দরকার। তা না হলে আব কদিন মিসেস্ চৌধুরীর ঘর ভাড়া নিয়ে চলবে, গত মাসে দু'দিনের ভাড়া এখনও বাকি আছে যে!

নিরঞ্জনের মুখটা দেখতে পাই এবার ভালো করে। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের ভবিষ্যৎ-হীন দিন-যাপনের ক্লান্তির ফাঁকে ফাঁকে যেন কোথাও একটুকরো আশা উঁকি মারে। লাবণ্য আর সে বাড়ি ভাড়া করবে একটা একটা স্বাধীন দু-ঘর-ওয়ালা ফ্ল্যাট। তিরিশ কিংবা চল্লিশ, এমনকি পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবে। তার পর যদি ভবিষ্যতে কোনো দিন সুদিন আসে, সেদিন....

নিরঞ্জন চলতে চলতে হঠাৎ বললে—একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েছি জানো?

লাবণ্য চমকে ওঠে—কত ভাড়া?

-ভাড়া বেশি নয়, পঞ্চাশ, কিন্তু--

—সেলামি চায় বুঝি?

সেলামি ছাড়া বাড়ি পাওয়া কি সম্ভব নয়? চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়! চেষ্টা কি আর নিরঞ্জন কম করেছে? আজ দু'বছর ধরে চেষ্টা তো করেই চলেছে।

অনেকদিন থেকেই চেষ্টা চলেছে। একাট বাড়ি পেলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তা হলে এমন করে আর মিসেস্ চৌধুরীর ঘর ভাড়ার জন্যে টাকা নষ্ট করতে হয় না। মাসে এখানে চারদিন এলেই তো চার-পাঁচে কুড়ি টাকা চলে গেল। এক এক মাসে পাঁচদিন-ছ'দিনও এসেছে! তবে মিসেস্ চৌধুরী লোক ভালো। ব্যবহার ভালো তাঁর। হাতে নগদ টাকা না থাকলে বাকিতেও চলে। তা ছাড়া ক'ঘণ্টাই বা থাকে তারা! বাস-ট্রাম বন্ধ হবার আগেই বেরিয়ে আসতে হয়। তার পর আবার কতদিন পরে দেখা হবে! চলতে চলতে লাবণ্যের হাতটা ধরে নিরঞ্জন।

ওদের কথা শুনতে শুনতে আমিও যেন এগিয়ে চলি। হঠাৎ মানুষের ভিড় আর দোকানপত্রের সার পেরিয়ে কখন নিরঞ্জন আর লাবণ্য কোথায় হারিয়ে যায়। একলা মিসেস্ চৌধুরীর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। হঠাৎ যেন স্বপ্নও ভেঙে যায়! সেই পরিচিত বাড়িটার সামনের ঘরে সাহেব মেম সেজেগুজে বসে আছে, ভেতর থেকে পিয়ানোর শব্দ আসছে। মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ির সেই নেপালি দারোয়ানটা আর সেলাম করলে না আগেকার মতো!

মিসেস্ চৌধুরী বলতেন — টালিগঞ্জ থেকে বাসন্তী আসত, চেতলা থেকে আসত কল্যাণী, বেহালা থেকে আসতো টগর। কিন্তু এক এক দিন এক এক জনের সঙ্গে। চৌরঙ্গীর রাস্তা থেকে যাকে পেত ধরে আনত। কিন্তু

লাবণ্য? বরাবর নিরঞ্জনকে দেখেছি সঙ্গে। নিরঞ্জনের যখন চাকরি ছিল না, ওই লাবণ্যই তিন মাস মেসের খরচ জুগিয়েছে ওর!

ঘর-ভাড়া হয়তো শহরে আরো অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এমন রুচি আর শালীনতা পাবে না। বাইরে থেকে বোঝবার কিছু উপায় নেই। সামনে অর্কিড আর মর্নিং-গ্লোরি দিয়ে ঘেরা। পেছনের দরজা দিয়ে সোজা চলে যাও ভেতরে। কোনাকোনি তিনটে ঘর। পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতর যেতে হবে। ঘরে একটা ইংলিশ খাট, একটা ড্রেসিং আয়না আর দুটো চেয়ার—আসবাব বলতে এই। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। ব্যবস্থা পুরোদস্তুর বিলিতি। এখানে টাকা খরচ করেও তো আরাম।

মনে আছে হঠাৎ মিসেস্ চৌধুরী তাস খেলতে খেলতে উঠে পড়লেন একদিন।

জর্জেটটা সামলে নিয়ে বললেন—দেখি, ওদিকে গোলমাল কীসের—আমায় তাস দিয়ো না ভাই।

বাইরে থেকে খানিকটা বচসার শব্দ কানে এল।

তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে ডেকে উঠল মিসেস্ চৌধুরীর অ্যালসেসিয়ানটা।

খানিক পরে মিসেস্ চৌধুরী ঘরে ঢুকে পাখার রেগুলেটারটা বাড়িয়ে দিলেন।

বললাম—ব্যাপার কী?

—আর বলো কেন, শেঠজি এসেছিল। ফুলচাঁদ শেঠ। মদে চুবে একবারে—একদিন বারণ করে দিয়েছি, তবু—

নির্বিকারভাবে আবার তাস খেলতে লাগলেন—নো বিড্, থ্রি ডায়মন্ডস্—

সেদিন অনেকদিন পরে সেই ফুলচাঁদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল, লম্বা-চওড়া একটা গাড়ি হঠাৎ সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। দেখি ফুলচাঁদ। কে বলবে চল্লিশ বছর বয়েস। নিজেই ড্রাইভ করছে।

মুখ বাড়িয়ে হেসে বললে—কী খবর স্যার?

আমিও আশা করছিলাম কিছু খবর পাব। কিন্তু ফুলচাঁদই প্রশ্ন করলে—মিসেস্ চৌধুরীর খবর কিছু জানেন স্যার?

ফুলচাঁদ শেঠের ভাবনা নেই। হয় এ পাড়ায় নয় ও-পাড়ায়, যেখানে হোক আড্ডা ও খুঁজে নেবেই। মিসেস চৌধুরী না থাক, মিসেস্ সরকার আছে। নার্সিং হোম আছে। কত কী আছে কলকাতা শহরে। ছোকরা বয়েস। দিন-দিন যেন বয়েস কমছে ফুলচাঁদের। তিনটে আসল আর দুটো ভেজাল ভেজিটেবল ঘি-এর কারবার। গাড়িটা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু সেদিনই সত্যি সত্যি বসলাম কলমটা নিয়ে। এবার লিখতেই হবে। মিসেস্ চৌধুরী যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেইভাবেই শেষ করব না-হয়।

প্রথমেই লিখলাম—নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে সাপ্লাই অফিসের একতলার সিঁড়ির সামনে। লাবণ্যের অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। একে একে নামতে শুরু করেছে সবাই।

লাবণ্যও চমকে উঠেছে কম নয়। বললে—একি, তুমি!

নিরঞ্জন বললে—তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ তো কথা ছিল না তোমার আসবার।

—তা হোক, তবু এলাম, মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাব, আজ বড়ো যেতে ইচ্ছে করছে—

—কিন্তু টাকা? টাকা এনেছো? আমার তো হাত খালি, শুধু বাসভাড়াটা—

—সে একরকম বলে-কয়ে ব্যবস্থা করা যাবে, আজ যেতেই হবে তোমায়—জানো লাবণ্য, আমার চাকরিটা চলে গেছে—

—সেকী!

মিসেস্ চৌধুরী শুনেছেন সে-সব কথা। তিনি জানতেন লাবণ্যের সে কৃচ্ছ্র-সাধনের ইতিহাস। ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়া লাবণ্যের বন্ধ হল সেইদিন থেকে। শুরু হল সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে চড়া। টিফিন বন্ধ। এক এক দিন নিজের জলখাবারটা রুমালে করে বেঁধে নিয়ে ভাগ করে খেয়েছে মিসেস্ চৌধুরীর ঘরে দরজা বন্ধ করে। চুলে তেল পড়তে লাগল একদিন অন্তর। স্নো ফুরিয়ে গেল, আর কেনা হল না।

মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন— ওদের জন্যে দিলাম কনসেসন করে। আমার ঘরের ভাড়ার রেট পাঁচ টাকা বরাবর—ওদের জন্যে ঠিক হল তিন টাকা। তাও সব সময় নগদ দিতে পারত না, বাকি পড়ত।

কিন্তু ওদিকে টালিগঞ্জের বাসন্তীর গায়ে তখন ঢাকাই শাড়ি উঠেছে। চেতলার কল্যাণী নতুন একছড়া হার গড়াল। বেহালার টগরও ব্রোঞ্জের চুড়ি ভেঙে গিনি-সোনার কঙ্কণ গড়িয়েছে। বাজার গরম বেশ।

সে-বাজারে মিসেস্ চৌধুরীই বা ছাড়বেন কেন? ঘর-ভাড়া পাঁচ টাকা থেকে বেড়ে দশ টাকা হল। তাতেও খালি পড়ে থাকে না। খদ্দের এসে ফিরে যায় বাইরে থেকে। মিসেস্ চৌধুরীর টেলিফোন সারা দিন-রাত এনগেজড্ থাকে!

মনে আছে একদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি।

দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া করে মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে আড্ডা দেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে—নতুন বইটা ওঁকে এক কপি উপহার দেব। তার পর ওঁরই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে শোনাব জায়গায় জায়গায়। মিসেস্ চৌধুরী সাহিত্যিক না হোন, সাহিত্য-রসিক। ওঁকে বই দিয়ে আমরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতাম। কিন্তু দূর থেকে দেখি বাড়ির সামনে ভীষণ ভিড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে গোল হয়ে ফুটপাথের ওপর লোক জমা হয়েছে। কয়েকটা পুলিশও সেখানে দাঁড়িয়ে। মনে হল—নিশ্চয় কোনো গোলমাল, কোনো কেলেঙ্কারী বেধেছে। এবারে মিসেস্ চৌধুরীর আর নিস্তার নেই। আমাদের আড্ডা ভাঙল বুঝি!

যাব কি যাবনা ভাবছি। শেষকালে আমরাও কি জড়িয়ে পড়ব?

কথাটা ভাবতেই কেমন লজ্জা হল। ছি-ছি। আমরা কি বিপদের দিনে ওঁকে এমনি করেই ফেলে পালাব! সেইদিন সত্যি প্রথম উপলব্ধি হল, মিসেস্ চৌধুরী কতখানি একলা। বুঝলাম পৃথিবীতে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার পর সারা জীবন একজন অভিভাবকের প্রয়োজন কেন এত অপরিহার্য হয়।

মিসেস্ চৌধুরী, আপনি যেখানেই থাকুন, আজ অকপটে স্বীকার করছি— সেদিন আপনার জন্যে আমার মায়া হয়েছিল সত্যি!

থাক্‌-সে কথা। আপনার বাড়িতে গিয়েই আমি বলেছিলাম—আজ বড়ো ভয় পেয়েছিলাম।

আপনি তখন সালোয়ার পায়জামা পরে কৌচে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন?

কিন্তু উদ্বেগের লেশমাত্র ছায়াও আপনার মুখে ছিল না।

আমি বললাম—বাড়ির সামনে ভিড় দেখে ভাবলাম বুঝি পুলিশের হাঙ্গাম, কিন্তু —

পুলিশের নাম শুনে আপনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার কৌচে হেলান দিয়েছিলেন।

—কিন্তু কী?

—কিন্তু দেখলাম ফুটপাথের ওপর বাঁদর-নাচ হচ্ছে।

আপনি হেসে বলেছিলেন—না, সে-সব ভয় নেই, পুলিশ আমার কিছু করবে না। তবে ভয় ফুলচাঁদকে নিয়ে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন, ফুলচাঁদ আপনার কী করতে পারে?

আপনি বলেছিলেন—না, আমার আর সে কী করবে? ফুলচাঁদ আমার চেয়ে বড়োলোক হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার টিকি বাঁধা! কিন্তু ভয় অন্য ব্যাপারে—

—অন্য কী ব্যাপার?

—ভয় লাবণ্যর জন্যে—বলে আপনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন আমি জিজ্ঞেস করিনি—কে লাবণ্য! কী তার পরিচয়!

আপনার হয়তো মনে নেই আপনি নিজের মনেই যেন বলেছিলেন—লাবণ্যকে ফুলচাঁদ বহুদিন থেকে চাইছে। দুশো পর্যন্ত খরচ করতে রাজি—আমিই রাজি হইনি—শেষে কোন দিন না—

মনে আছে এবারে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম —লাবণ্য কে?

আপনি সে প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনি তেমনি কৌচে হেলান দিয়েই বলেছিলেন— ফুলচাঁদ যদি বাসন্তীকে চাইত আপত্তি করতাম না, কল্যাণীকে চাইলেও চলত, টগরের বেলাতেও কিছু বলবার ছিল না! আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোনে আনিয়ে নিতাম, কিন্তু তা বলে লাবণ্য? ছি-ছি—

লাবণ্যকে আপনি কেন অতখানি সম্মান করতেন তা সেদিন কিছুটা যেন বুঝেছিলাম, আর কিছুটা যেন বুঝতে চেষ্টাই করিনি। সেদিন মিসেস্ চৌধুরীই কি জানতেন তাঁর সেই লাবণ্যকে নিয়ে গল্প লেখানোর জন্যে একদিন রাত বারোটার সময় আমার বাড়িতেই আসতে হবে!

হয়তো মিসেস্ চৌধুরী নিজের জীবনে যা হারিয়েছিলেন, তা ফিরে পেয়েছিলেন লাবণ্যের মধ্যে। হয়তো সেইজন্যেই ফুলচাঁদের হাতে লাবণ্যকে তুলে দিয়ে নিজেকেই অপমান করতে চাননি! কে জানে?

তাই ফুলচাঁদের প্রস্তাবের উত্তরে মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন—দুশো কেন, পাঁচশো টাকা দিলেও লাবণ্যকে পাবে না। ওর দিকে তুমি নজর দিয়ো না ফুলচাঁদ—

কিন্তু ফুলচাঁদকে আপনি চিনতে পারেননি। ফুলচাঁদ শেঠ জাত-ব্যবসাদার, সাত পুরুষের ব্যবসাদার। কখন কিনতে হবে, কখন বেচতে হবে, তা সে জানে। সেও তাই ধাপেধাপে উঠেছে। পাঁচশোতে রাজি না হয়, সাতশো। সাতশোতে রাজি না হয়, আটশো—আটশোতে রাজি না হয়....

আজো যেন চেষ্টা করলেও দেখতে পারি। দেখতে পারি, তেতলার থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছে নিরঞ্জন। পাশে লাবণ্য!

লাবণ্য যেন খুশিতে উচ্ছল। বললে—দেখেছ, একটু মাটি নেই কোথাও বাড়িটাতে।

নিরঞ্জন বুঝতে পারল না। বললে— কেন, মাটি দিয়ে কী হবে?

—একটা তুলসীগাছ পুঁততাম। হিন্দু গেরস্থের বাড়িতে তুলসীর গাছ রাখতে হবে যে—

নিরঞ্জন বললে —তা সে একটা টবে পুঁতলেই চলবে—এই রান্নাঘরের পাশে।

—কিন্তু শোবার-ঘর কোনটা করবে?

—দক্ষিণের ঘরটাই তো ভালো সবচেয়ে, জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়।

—একটা খাট কিনতে হবে আমাদের—

নিরঞ্জন হেসে উঠল—সবুর করো, সবে তো চাকরি হল, আস্তে আস্তে হবে সব—আগে বাড়িটাই হোক।

বাড়ির মালিক বললেন,—আমার এক কথা —ভাড়া চল্লিশ টাকা, যা সবাই দিচ্ছে আপনারাও তাই দেবেন। কিন্তু –

- কিন্তু কী?

মালিক এবার আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন—ব্যবসায় আমার অনেক লোকসান গেছে এদানি, এখন ওই বাড়ি ভাড়াতেই সংসার চলছে একরকম, তা সেলামি কিছু দিতে হবে আপনাদের।

নিরঞ্জন দমে গেল। লাবণ্যও ফিরে আসছিল। এমন ঘটনা প্রথম নয়। আগে জানতে পারলে—

তবু নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করল—কত?

যেন কম-সম হলে দিতে তৈরি সে।

মালিক বললেন—বেশি না, আর সব টেনেন্ট যা দিয়েছেন, তা-ই দেবেন— তার একপয়সা বেশি নেব না। আমার কাছে সবাই সমান।

সাম্যবাদীর মতন পরম নিঃস্পৃহ ভঙ্গি করলেন তিনি।

—তবু কত?

—পুরোপুরিই দেবেন; ভাঙা-ভাঙতি ভালোবাসিনা আমি।

তবু তিনি দুর্বোধ্য হচ্ছেন দেখে দয়া করে খুলে বললেন—হাজারের কম আমি নিইনে।

ফুলচাঁদ সেদিন সেই কথাই বললে—আটশোতে রাজি না হয়, হাজার—

সংখ্যাটা পুরোপুরি হলে যেন অন্যরকম শোনায়। কিন্তু নিজের কানকে আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন মিসেস্ চৌধুরী। তাই হয়তো দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেননি। তবু কিন্তু আপনাকে ব্যস্ত হতে দেখা গেল না। আপনি তেমনি নির্বিকারভাবেই টফি চুষতে লাগলেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক তখনই কি লাবণ্য আর নিরঞ্জনকে সামনে দিয়ে চেতে হয়! রাত তখন সাড়ে ন'টা। চটি ফটাস্-ফটাস্ করতে করতে চলেছে লাবণ্য। সারাদিন অফিসের খাটুনির পর বাড়ি ফিরতে পারলে সে বাঁচে। আপনার মনে হল— ও তো লাবণ্য নয়। আপনার ভাষাতেই বলি—আপনার মনে হল—ও তো লাবণ্য

নয়, ও যেন আপনার বিগত-জীবন, আপনার পরিশুদ্ধ আত্মা আপনাকে ব্যঙ্গ করে আপনার দিকেই পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে। আর ফিরে আসবেনা কোনো দিন।

আপনি সেখানে বসেই নেপালি দারোয়ানকে ডাকলেন—জঙ্গি?

জঙ্গি তিন লাফে এসে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে স্যালিউট করার পর আপনি বললেন—লাবণ্যাকে ডেকে দে তো—

লাবণ্য এল।

আপনি আপনার আত্মার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। এবং সেই বোধ হয় প্রথম আর শেষবার।

তার পর তাকে আড়ালে নিয়ে এসে ফুলচাঁদের প্রস্তাবটা জানালেন। আপনার মনে হল, পৃথিবীর প্রচ্ছদপটে আজ পর্যন্ত যত মানুষের পদচ্ছায়া পড়েছে, সেই কোটি কোটি সংখ্যাহীন জনসমুদ্রের তরঙ্গ যদি আবার উদ্বেলিত হয় তো হোক। নক্ষত্র-নীল আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক আর কক্ষচ্যুত কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যদি দিগ্‌ভ্রান্ত হয় তো হোক। তবু আপনার আত্মা অচল অটল থাকবে! লাবণ্য কিন্তু সমস্ত শুনে মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর যেন দাঁতে দাঁত চেপে বললে—ওকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি, মাসিমা!

মর্নিং-গ্লোরির আড়ালে অন্ধকারে একলা অপেক্ষা করছিল নিরঞ্জন। লাবণ্য সেখানে গেল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কী যে পরামর্শ হল দু'জনে। দূর থেকে কিছু শোনা গেল না। তবু আভাসে বোঝা গেল—একজন বুঝি কেবল বোঝাতে চাইছে, আর একজন যেন কিছুতেই বুঝতে চাইছে না।

এক সময়ে লাবণ্য এল। আপনার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে— আমি রাজি।

কথাটা বোধ হয় লাবণ্য একটু আস্তেই বলেছিল, কিন্তু আপনি দেখতে পেলেন—ঘরের ভেতর ফুলচাঁদ সে-কথা শুনে নতুন ধরানো সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আর, আপনি ও, আপনি, আপনারও মনে হল বারান্দায় চেইনে বাঁধা অ্যালসেসিয়ানটা যেন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল।

বললাম—তারপর?

মিসেস চৌধুরীর পাকা চুলের খোঁপাটা আবার একবার খুলে গেল। এবার সেটাকে আর সামলাবার চেষ্টা করলেন না। বললেন—তারপর? তারপর সেই প্রথম আর সেই শেষ। আর আসেনি তারা আমার বাড়িতে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের লোকেরা আর কোনো দিন সে-রাস্তায় হাঁটতে দেখেনি নিরঞ্জন আর লাবণ্যকে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে কোথায় গেল তারা?

মিসেস্ চৌধুরী বলেন—আমিও তাই ভাবতুম—কোথায় গেল তারা। মনে হত— সেও বোধ হয় অন্য মেয়েদের পর্যায়ে নেমে এসেছে। টালিগঞ্জের বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করেছি, চেতলার কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করেছি, বেহালার টগরকে জিজ্ঞেস করেছি— তারা এখনও আসে কিন্তু বলতে পারেনা কোথায় গেল তারা—এমনকি ফুলচাঁদও না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে হয়তো ওই ঘটনার পর নিরঞ্জন ত্যাগ করেছে তাকে।

—তাও ভেবেছি অনেকবার। হয়তো অবিশ্বাসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নিরঞ্জন। আর ওদিকে আত্মধিক্কারে হয়তো আত্মহত্যা করেছে লাবণ্য। নিজের আত্মাকে আমি নিজের হাতে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পেরেছি জেনে মনে মনে খুব খুশিই হয়েছিলাম—সত্যি বলছি—খুব খুশি হয়েছিলাম। মিস্টার চৌধুরী যেদিন বিয়ের পর আমার সুটকেসের মধ্যে একটা প্রেমপত্র আবিষ্কার করে আমায় ত্যাগ করেছিলেন, তারপর জীবনে এই প্রথম এমন খুশি হতে পারা—সে যে কী আনন্দ! সে-আনন্দে সেদিন বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে তিন কাপের বদলে তিন-ত্রিক্কে ন'কাপ চা-ই খেয়ে ফেললাম।

মিসেস্ চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তিনি কথা বলছেন আর চোখ বেয়ে জল পড়ে আর গালের রুজ ঠোঁটের লিপস্টিক চোখের সুর্মা সব ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা তাঁর আগে কখনও দেখিনি। কী যে করব বুঝতে পারলাম না।

তারপর মিসেস্ চৌধুরী হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বার করলেন।

আমার দিকে সেখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন—তারপর এতদিন পরে আজ সকালবেলা এই চিঠি, চিঠি পড়ে আমি তো অবাক।

দেখলাম নিরঞ্জন আর লাবণ্যের বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। পনেরোর সি কালী সরকার রোড, তেরো নম্বর স্যুট। আজকের তারিখ।

আমি মিসেস্ চৌধুরীর দিকে নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে চাইতেই তিনি বললেন— এখন সেখান থেকেই আসছি।

বললাম—কী দেখলেন?

—দেখলাম বিয়েতে যেমন হয় তেমনই, লাবণ্য সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে, চন্দনের ফোঁটা। নিরঞ্জনের গায়েও গরদের পাঞ্জাবি, মাথায় টোপর। হঠাৎ কোথা থেকে সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে পড়েছে, এতদিন কোথায় ছিল তারা সব কে জানে। আজ হঠাৎ ওদের শুভাকাঙ্ক্ষীর আর আশীর্বাদকের অভাব নেই। বাড়িটাও ভালো, রান্নাঘরের পাশে একটা টবে তুলসীগাছ প্রতিষ্ঠা করেছে, শোবার ঘরে একটা খাট, দক্ষিণ দিকের জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়। আয়োজনও করেছে প্রচুর—কিন্তু ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম —ফুলচাঁদের স্পর্শের কলঙ্ক কোথাও নেই এতটুকু— চন্দনের ফোঁটায় সব ঢেকে গেছে। কিন্তু আমার যেন কিছু ভালো লাগল না। আমি জলস্পর্শ না করে সোজা চলে এলাম বাইরে, তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সমস্ত কলকাতাটা টো টো করে ঘুরে এখন এই রাত বারোটার সময় তোমার এখানে।

গল্প বলতে বলতে মিসেস্ চৌধুরী যেন স্তিমিত হয়ে এলেন মনে হল, এখনি যেন তিনি নিভে যাবেন।

বললাম—তা হোক, তবু নিরঞ্জনের উদারতা আছে বলতে হবে।

মিসেস চৌধুরী দপ্ করে উঠলেন তা থাকগে উদারতা, কিন্তু গল্পে তুমি ওদের বিয়ে দিতে পারবেনা— শেষটুক তোমায় বদলাতেই হবে।

কেন?

মিসেস চৌধুরী দম নিয়ে বলতে লাগলেন— হ্যাঁ, আগাগোড়া সব ঠিক রেখে শেষকালটাতে বদলে দেবে। বিয়ে ওদের কিছুতেই দিতে পারবেনা তোমার গল্পে— ওর আত্মায় ঘুণ ধরেছে যে—আমি মিসেস চৌধুরী তার সাক্ষী

বললাম কিন্তু আত্মা তো মরে না।

নিশ্চয়ই মরে আলবৎ মরে আমার আত্মা মরেছে লাবণ্যর মরেছে, বসন্তী, কল্যাণী টগর সকলের মরেছে আর তা ছাড়া যদি বিয়ে দিতেই হয় তো দু'দিন বাদেই ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ো। তারপর ধাপে ধাপে লাবণ্যকে কল্যাণী বাসন্তী টগরের পর্যায়ে আনবে, আর তারপর একদিন জীবনের শেষ অঙ্কে দেখাবে লাবণ্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে আমার মতন পারবেনা করতে? লক্ষ্মীটি শেষটুকু ট্র্যাজেডি করে দিয়ো।

আবার জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু কেন?

ধরে নাও আমার শখ আর কিছু না। একদিন আমাকে যদি তুমি ভালোবেসে থাকো, আমিও যদি তোমার কোনোদিন কোনো উপকারে এসে থাকি তো আমার এ অনুরোধটা রেখো ভাই। আর তা ছাড়া অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর' এ কথাটা মানো তো?

অতীতের সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই আজ। তবু বলতে পারি, দশ বছর ধরে এ গল্প লেখবার জন্যে আমার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। বন্ধুবান্ধবের কাছে কতবার গল্প করেছি—কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করেনি। কিন্তু মানুষের সংসারে চোখের সামনে জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধের এত পরিবর্তন দেখেছি—এত অভাবনীয় বিস্ময়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এত সহজ স্বাভাবিকভাবে যে, তা বলা যায় না। তবু সাহিত্যের কারবারে এসে দেখছি আজও জীবন সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণাই থাক, সাহিত্যে আমরা আজও তো ফরমুলা মেনেই চলি। তাই সধবা কিরণময়ীকে শেষ পর্যন্ত পাগল করতে হয়, বিধবা রমাকে কাশী পাঠাতে হয় আমাদের। তাই বিশ্বাস করুন মিসেস্ চৌধুরী—তাই আপনার অনুরোধ মতোই গল্পটা শেষ করব ভেবেছিলাম। লাবণ্যকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়ে দিতে পারলে আমিও আপনার মতোই খুশি হতাম। তাতে গল্পটা 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর' এই সাধারণ প্রবাদ-বাক্যটারও একটা উদাহরণস্থল হয়ে থাকত। জীবনে না হোক, সাহিত্যে অন্তত তাই ই ঘটে। সেইজন্যেই তো বলছিলাম যে এ-গল্পটা না লিখতে হলেই আমি খুশি হতাম।

কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ চৌধুরী, আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুরোধটা রাখতে পারলাম না।

কেন রাখতে পারলাম না, তার একটা কারণ আছে বইকী।

সেই কারণটা বলি। লজ্জায় ঘৃণায় ধিক্কারে আমার মাথা নিচু হয়ে এলেও আমাকে তা বলতেই হবে!

সেদিন কলকাতার বাইরে সি.পি.-র একটা কোলিয়ারি অঞ্চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। একটা লাইব্রেরির উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতি পদের ভার নিয়ে।

সভা হল।

সভার শেষে ভিড় পাতলা হবার পর জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার মজুমদারের বাড়ি।

স্বামী-স্ত্রী। দুজনেই ভারি অতিথিপরায়ণ। ছোট্ট বাঙলো। চারিদিকে বাগান করেছেন। ঘরটাও বেশ সাজানো। বেশ বোঝা গেল—গৃহের সর্বত্র গৃহিণীর একটা সুনিপুণ কল্যাণ-হস্তের স্পর্শ লেগে আছে। চা পরিবেশন করতে লাগলেন মিসেস্ মজুমদার।

মিস্টাব মজুমদার বললেন—মিসেস্ মজুমদার আপনার একজন ভক্ত, জানেন না বোধ হয়—ওই দেখুন আপনার সব-ক'টা বই-ই কিনেছেন।

মিসেস্ মজুমদার সলজ্জভাবে হাসতে লাগলেন। সত্যিই পাশের আলমারিতে অন্যান্য বই এর সঙ্গে আমাব লেখা ক'টা বই রয়েছে দেখে নিয়েছি আগেই।

মিস্টার মজুমদার আবার বললেন—এখানকাব মহিলা-সমিতিটা ওঁরই তৈরি, আর আজকে যে লাইব্রেবিব উদ্বোধন হল এ-ও ওঁরই চেষ্টায় বলতে পাবেন—সভাপতি হিসেবে আপনার নাম তো উনিই প্রথম সাজেস্ট করেন।

নিজের প্রশংসায় মিসেস্ মজুমদার যেন বড়ো লজ্জিত হচ্ছেন বলে মনে হল।

হয়তো তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পড়ল। হঠাৎ চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকল একটি পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে। সুন্দর দেহশ্রী। ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। সভায় এই ছেলেটিই আমার গলায় মালা পরিয়েছিল। ছেলেটি ঘরে ঢুকে মা'র কোলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। বললাম—এটি আপনার ছেলে বুঝি? কী নাম তোমার খোকা?

কাছে ডাকলাম তাকে।

ছেলেটি বিশুদ্ধ বাংলায় বললে— নীলাব্জ মজুমদার।

—নীলাব্জ! বড়ো সুন্দর নাম দিয়েছেন তো?

মিস্টার মজুমদার এবারও স্ত্রীর দিকে চেয়ে নিয়ে হসে বললেন—এ নাম ওঁরই দেওয়া, ও-নাম দেওয়ার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য আছে জানেন, আমাদের দু'জনের নামের প্রথম দুটো অক্ষর নিয়ে ওর নাম হয়েছে নীলাব্জ।

ওঁদের দু'জনের নাম জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে কিনা ভাবছি—

মিস্টার মজুমদার নিজেই আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন—আমার নাম নিরঞ্জন, আর ওঁর নাম লাবণ্য কিনা —তাই থেকে নীলাব্জ। কিন্তু আপনি আর একটা সিঙ্গাড়া নিন—কী আর একটা সন্দেশ....

আমি কিন্তু ততক্ষণে নির্বাক হয়ে দেখছি। দেখছি মিসেস্ মজুমদারকে। এতক্ষণে তো নজরে পড়েনি। তাঁর চিবুকের ওপব ডান দিকে একটা কালো তিল জ্বল-জ্বল করছে।

ট্যাক্সিওয়ালা



জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বিধবা কি সধবা কী করে বুঝব বলুন।

সরু পাড় কি নিপাড় সাদা শাড়ি এখন অনেকেই পরেন। ওটা স্টাইল।

আর চুড়ি না রাখা।

সিঁদুর না পরা।

কী এমনভাবে সিঁদুরের টিপ চুলের অরণ্যে লুকিয়ে রাখবে যে কপালের সঙ্গে কপাল ঠেকলে যদি আপনার মালুম হয় আলপিনের ডগার আঁচড়টি। অনেক সময়ই হয় না।

তাছাড়া মুখখানা প্রায় সবসময়ই বাঁ দিকেব পার্টিশন তাক করে ধবেছিল বলে মেয়েটির সিঁথি নজরেই পড়ছিল না।

চুড়ির বদলে বাঁ কবজিতে ছোটো ছেলেদের মোজার গার্ডারেব মতো কালো সরু ফিতায় বাঁধা ঘড়ি। ওর তলে রাখা হাতের সাদা ঈষৎ চ্যাপ্টা সরু কবজির মাথায় তেঁতুল বিচির মতো ঘড়িটা দেখতে দেখতে কেন জানি আমি মোটামুটি একটা বয়স আন্দাজ করে ফেললাম। ত্রিশ বত্রিশ? আটাশও হতে পাবে।

কি আর একটু কম।

চব্বিশ। বাইশ?

বাইশ হলে খুব কম করে ধরা হত। বস্তুত একদিকে বর্ষার কচি মুলোর মতো মসৃণ কোমল কবজি, আবার অন্য দিকে ওর পর মাংসল ভারী পা দুটো বয়েস সম্পর্কে মনে কেমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিল। তাই হয়। অনেক সময় কোনো মেয়ের চিবুক ও চোয়াল আপনাকে যে বয়সের ইঙ্গিত দেবে, গলা বা ঘাড়ের দিকে চোখ রাখা মাত্র আপনার সেই অনুমান মিথ্যা মনে হবে। চিবুকে যদি চব্বিশ বছর বয়স লেখা থাকে ঘাড়ের দিকে তাকানো মাত্র আপনার মনে হবে — না আরো বেশি, বত্রিশ।

এই ক্ষেত্রে আমি সে ধরনের একটা গোলমালে পড়েছিলাম। চেয়ারের তলা দিয়ে মেয়েটিব চটি খোলা পায়ের যেখানটায় সাদা লেস পরানো সায়াটা উড়ু -উড়ু করছিল (বস্তুত এত জোরে ও ফ্যান চালিয়ে দিয়েছিল যে হাওয়ায় তার কামরার ভিতর ঝড় বইছিল) দুবার আমি সে জায়গাটা বেশ ভালো করেই দেখতে পেলাম। তামাটে বেশ শক্ত মতন মাংসের একটা ডেলা। অথচ সেই তুলনায় তার হাতটা অনেক বেশি শুভ্র কোমল কচি মনে হচ্ছিল।

সুতরাং হাত যে বয়স বলছিল, পা বলছিল তার উল্টোটা। কিন্তু তাহলেও আমি পায়ের বয়সটা বাতিল করে দিলাম। কেননা ঝড়ো হাওয়ায় মুহুর্মুহু খোঁপা থেকে আঁচলটা যখন খসে খসে পড়ছিল ওর গলা ও ঘাড়ের সুন্দব কোমল বাঁক ও রেখাগুলি দেখে চব্বিশ-পঁচিশের বেশি বয়স হবে না নিশ্চিন্ত হতে পারলাম।

আমার এতটা দেখার সুবিধা হত না।

আমি অনেকক্ষণ আগেই চা শেষ করে চুপচাপ বসেছিলাম। একজন কেউ ভিতরে পর্দা খাটানো কামরায় বসে খাচ্ছে হোটেলে (হোটেল রেস্টুরেন্টে) পা দিয়েই অনুমান করতে পেরেছিলাম। পর্দার ওপারে একজন আছে কি দুজন আছে প্রথমটায় অবশ্য ঠিক ধরতে পারিনি। এবং ধরতে না পারাটা কাজের কথা নয়—কোনো বুদ্ধিমান যুবকই মেয়েটি একলা এসেছেন না সঙ্গে অন্য লোক আছে, না জানা পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট থাকেন না।

আমি চেয়ারটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে পর্দার দিকে চোখ রেখে এপারে বসে আর একটা কিছুর অর্ডার দিতে তৈরি হতে লাগলাম।

পুরুষ খদ্দেরের গলার শব্দ শুনে কিনা ঈশ্বর জানেন, ও-ঘরের পাখা হঠাৎ বেগবতী হয়ে উঠল। তারপর তো পর্দা কতবার উঠল, কতবার নড়ল, কতবার দরজা থেকে তা সরে সরে গেল। ভিতরের হুকুম পেয়ে কিনা

বোঝা গেল না যে ছেলেটা আব একবাব ভাত নিয়ে সেদিকে যাচ্ছিল পর্দাটা দলা পাকিয়ে পার্টিশনেব মাথায় তুলে দিলে।

ভাতেব পব দেখলাম আবাব ডালেব বাটি গেল, এক দলা আলু সিদ্ধ।

ডিম, মাংস, কালিযা, কোর্মা, দো-পেঁযাজি, ইলিশ-ভাতের গন্ধে চারদিক ম ম কবছিল। চপ, কাটলেট, গ্রিল, মোগলাই পবোটাব অর্ডাব পড়ছে অন্য দিকে। বেশ বড়ো বেস্টুবেন্ট।

কিন্তু সেই ডিশে ও কামবায় ডাল আর আলু ছাড়া অন্য কিছু প্রবেশ কবল না লক্ষ কবে সচকিত হয়ে উঠলাম।

এটা অবশ্য কাজেব কথা নয।

অবস্থা ও রুচিভেদে এক একজন এক একবকম খাওয়া পছন্দ কবে। একটা আস্ত সিগাবেট শেষ করে আমি একটা চিংড়ি কাটলেট-এব অর্ডাব দিলাম। সামনেব কামবায একটি মেয়ে খাচ্ছে আব সেদিকে হাঁ কবে তাকিয়ে থেকে একটা চেযার দখল কবে এমনি বসে থাকাটা অশোভন। কাজেই অতিবিক্ত খবচে নামা গেল।

ছেলেটাকে ডাকলাম।

যে উদ্দেশ্যে গলা বড়ো কবে আমি ছেলেটাকে ডাকছিলাম তাও চবিতার্থ হল। পব পব দুবাব ঘাড় ফিবিয়ে মেয়েটি এদিকে তাকায ও আমাকে দেখে।

একটি মেয়ে সম্পর্কে আমি এতটা উৎসুক কেন, আপনাদেব মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ভাবছেন লোকটা অভদ্র ইতব।

আসলে কিন্তু আমি তা না। আমি ট্যাক্সি চালাই। যাবা ট্যাক্সি চালায তাবা সব সময়ই চোখ কান সজাগ বাখে। কে কখন ডাকে, কাব কখন হঠাৎ ট্যাক্সিব দবকাব হয তাব ঠিক আছে কিছু।

হ্যাঁ, আমাব প্রথমেই মনে হল যেন খাওয়া সেবেই মেয়েটি নিশ্চয গাড়ি ঘোড়া কিছু একটা ডাকবে

আপনাবা ঠোঁট টিপে হাসছেন

কিন্তু এটা তো সত্য যে নিত্য যাত্রী পাবাপাব করে কাব কখন গাড়িব দবকাব হবে বাস্তায় ঘাটে লোকেব চোখ মুখ দেখলে আপনাদেব চেয়ে সে একটু আগে বুঝতে পাবে।

হ্যাঁ আট বছব আমি কলকাতা শহবে ট্যাক্সি চালাই। আমাব নিজেব গাড়ি।

গাড়ি কিনে আমি এই ব্যবসা কবছি ঠিক তা না কিন্তু।

ববং গাড়ি চড়ে দিব্যি হাওয়া খাওয়া যাবে এই মতলবে গাড়ি কেনা হয়েছিল। হাম্বাব। এক নম্ববেব গাড়ি এটা মশাই আমাব।

হ্যাঁ, ওতে চড়ে হাওয়া খাওয়াব মতলবটা আমাব চেয়ে আমাব বাবাব বেশি ছিল।

কিন্তু কেনাব এক বছব পবে বাবা মাবা যান।

তাব পবেব বছব আমাদেব দেশ ভাগ হয। অর্থাৎ পাকিস্তানেব ছোটোখাটো জমিদাবিটা গেল।

ফতুব, আমি তখন ফতুব। জমানো টাকা কিছুই প্রায ছিল না। জমিদাবিতে ক'বছব ধবেই ঘুণ ধবেছিল।

আব কী, গাড়িখানা সম্বল কবে আমাব স্ত্রী বমাব হাত ধবে হিন্দুস্থান, মানে কলকাতায বড়োমামার বাসায এসে উঠলাম।

হুঁ, একডালিযা বোডে।

গাড়িটা এবং বলতে সঙ্কোচ নেই, বমাও প্রায নতুনই ছিল। গাড়ি কেনাব ছ'মাস আগে তো আমি বিয়ে কবেছিলাম।

যাক্‌গে এখন জমিদাব নন্দন চাকুবে মামাব ঘাড়ে চেপে তাব অন্নধ্বংস কববে তা-ও একলা না সস্ত্রীক, অত্যন্ত নিন্দনীয়। বুঝলাম।

তাছাড়া মামা পাবতেনও না।

বুদ্ধি কবে বউকে মামাশ্বশুবেব জিম্মায বেখে আমি গাড়িটা নিয়ে রাস্তায বেবোলাম।

হুঁ, ট্যাক্সির লাইসেন্স নিয়ে (অবশ্য সবকারি চাকুবে আমাব মামাই তদ্বিব-টদ্বিব কবিয়ে চট্‌ কবে লাইসেন্সটা বাব কবতে সাহায্য কবলেন।) বেশ দু'পয়সা কামাতে লাগলাম।

চাকবি, বিশেষ কবে অফিসেব লেখা-পড়াব কাজেব বিদ্যা মশাই, আমাব ছিল না বলে বাখছি— জমিদাবেব বাচ্চা, দুধেব সব আব মাছেব পেট খেয়ে প্রজাদেব চোখ বাঙিয়ে জমিদাবি চালাব এই স্বপ্ন নিয়েই বড়ো হয়েছিলাম। তা সে সুখ তো কপালে বইল না।

হুঁ, আমি ও আমাব গাড়ি যখন দিবাবাত্র কলকাতা শহব চষতে লাগলাম আব একজন কিছু দূবে একডালিয়া বোডে চুপ কবে বসে বইল না। বমা।

পাকিস্তান থেকে সে-ও নতুন এসেছে তাজ্জব শহবে। গাড়িটা যদি একডালিয়া বোডেব বাসায় এমনি পড়ে থাকত তো আমাব মামা বিকাশ বাযেব বড়ো মেয়ে টুনি (ফার্স্ট ইযাবে পড়ছেন) ওটাকে ব্যবহাব কবত। সে কি এক আধবাব। দিনেব মধ্যে বিশ বাব। সে-বাড়ি উঠেই দু-এক দিনেব মধ্যে আমি টেব পেয়েছিলাম। নতুন কলেজি হাওযা গাযে লেগেছে টুনিব। তাব ওপব চেহাবাখানাও মিষ্টি মতন। তায আবাব সবে লাগছিল ষোলোটা বসন্তেব হাওযা। মশাই, ও কী আব ওব মধ্যে ছিল। টুনি বন্ধুদেব সঙ্গেই দেখা আব শেষ কবে উঠতে পাবছিল না।

অবশ্য বিকাশবাবু চেষ্টা কবেছিলেন অনেকদিন থেকেই গাড়ি কিনতে। তা, সে কি আব চাকুবে লোকেব পক্ষে চট কবে হয মশাই তা ও এই গ্রেডে থেকে।

কাজেই বুঝতে পাবছেন টুনি গাড়িটা একবাব বাড়িব মধ্যে পেয়ে প্রাণখুলে বেড়াতে শুরু কবেছিল। ওটাকে আমাব সঙ্গে না নিয়ে এলে কী অবস্থাটা হত?

গাড়ি বেহাই পেল, কিন্তু বমা বেহাই পাযনি। মফসসল থেকে নতুন মেয়ে এসেছে। তা ও একডালিয়া বোডেব মতো ফ্যাশানেবল পাড়ায। তাব ওপব বমাব চেহাবা পাড়াব অনেক মেয়েব চেয়েই ভালো আব এই তো সবে বিয়ে হয়েছে, এখনো ইযে

বউদি বউদি

হ্যাঁ বিকাশ বাযেব বড়ো ছেলে বেণু বায। কী পাজি মশাই যদি দেখতেন। এমনি মুখ দেখলে মনে হবে ভাত চড়ে বা বেবোয না। ভাজা মাছ উল্টে খেতে শেখেনি। আব এদিকে তলে তলে হাড়বদমায়েস।

বউদি বউদি

ওই যে বললাম টুনি কবত আমাব গাড়িটাব সদ্ব্যবহাব আব বেণু হাবামজাদা কবতে লাগল আমাব স্ত্রী বমাকে ব্যবহাব হ্যা ওই যথার্থ শব্দ। বউদি না হলে চা খাওযা হয না বাবুব বিছনা ঠিক থাকে না বউদি টেবিলেব বই গুছিয়ে না বাখলে গোছানো হয না ধোবাব কাপড় এলে সেগুলো সুটকেসে তুলতে ও দবকাব ... একটা একটা কবে বাব বাব দিতে বউদি। ভাত খেযে উঠে বউদিব হাতেব মুখশুদ্ধি মশলা মিষ্টি বাথরুমে যাও তোযালে সাবানেব জন্যে বউদিব ডাক।

কেন হবে না মশাই।

বাংদিন দেখছিল সমর্থ সব মেযে।

সমর্থ মেযেবা বেছে বেছে সমর্থ পুরুষকে পাকড়াও কবছে। একত্র বেড়ানো একসঙ্গে সিনেমা দেখা।

আমি তো আগেও কলকাতায এসেছি। কিন্তু হালে পাকিস্তান ছেড়ে এসে এবাব বকম সকম দেখে বুদ্ধি লোপ। আব একডালিয়া বোডেব মতো বাবুপাড়া। অবাধ মেলামেশাব যেন বান ডাকছিল।

কিন্তু আমাদেব সোনাব চাদ বেণু সুবিধে কবতে পাবছিল না। বাপেব অবস্থা তো আব দশটি ছেলেব বাপেব মতন না। বুঝতে পাবছেন। বাজা জমিদাবেব মতো অবস্থাব ঘবেব ছেলেব সংখ্যা সেখানে অনেক।

আব লটছিল সব তাবাই।

গাড়ি আছে বাড়ি আছে হাতে দুটো তিনটে কবে হিবে চুনিব আংটি সব ছেলেব।

মশাই কাযদা কবে বাবা বনেদি পাড়ায বড়োমানুষদেব সঙ্গে পাল্লা দিযে ভাড়া কবা ফ্ল্যাটে থাকছিল বটে। কিন্তু চাবদিকেব অবস্থা যে অন্যবকম। ছেলে মেয়ে দুটোবই উপোসে কাটছিল। টুনি পাচ্ছিল না একটা গাড়ি বন্ধুদেব সঙ্গে দেখা কবতে। আহা কী সব বন্ধু। হাতিবাগান না সিমলা স্ট্রিট থেকে একদিন একটা ছেলে গিয়েছিল ও বাড়ি। ছেড়া স্যান্ডেল গাযে কাঁধছেঁড়া মযলা পাঞ্জাবি। শুনলাম ওই নাকি টুনিব লেটেস্ট। তা যেমন অবস্থাব ঘবে মেয়ে এব চেযে ভালো ছেলে ও জোগাড় কবতে পাবত কি?

আব এদিকে ভুগছিলেন বেণুবাবু।

নতুন গোঁফ কামাচ্ছেন। কলেজে একটা পাস দিয়েছেন। আদ্দি মলমলটা যে গাযে না উঠছে তা নয, পাযে হবিণ চামড়াব চটি, বোতামেব গর্তে একটা দুটো গোলাপ ফুলও মাঝে মাঝে গোঁজা হয এবং মাথায একটু আধটু গন্ধ তেল। কিন্তু ওই। এব বেশি না। পকেটে পার্সে আব ক'টাকা নিয়ে চলাফেবা কবতেন সাব ডেপুটিব ছেলে? এই বিত্ত নিয়ে ওখানকাব মেয়েদেব সঙ্গে প্রেম কবা। আমাব তো মনে হয কাবো চুলেব ডগাটি ও ছুঁতে পাবেনি ও পাড়াব।

তার শোধ তুলল সে রমার ওপর। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। আত্মীয়াও বটে, নারী তো বটেই। আঠারো বছর বয়স সবে পা দিয়েছিল রমা। আর, বেণু ওকে পেলে কোথায় — রাস্তায় ঘাটে না, বাড়িতে, ঘরে, একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে।

'বউদি বউদি।'

মানে উপোসি বাঘ হরিণের সাক্ষাৎ পেল। কী, আমি খুব বেশি দোষ দিই না রমার। কী আর তেমন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে ওই বয়েসে, পাড়াগাঁয়ে থেকে লেখাপড়া শিখে চোখমুখ ফুটবে তারও খুব একটা সুযোগ পায়নি। আদুরে বাপের মেয়ে মাঘমণ্ডল ব্রত করে আর দেয়ালি রাতে হাজার বাতি ও রংমশাল জ্বালিয়ে বড়ো হতে না হতে টুপ করে একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

তাছাড়াও একটা শয়তান যদি একটি মেয়ের মুখের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্বাস ফেলতে থাকে।

একডালিয়া রোডের বাড়ির শোবার ঘরে, বাথরুমে, বাগানে, ছাদে আধখানা মাথা নষ্ট হয়েছিল রমার। বাকি আধখানা হল বাইরে রেস্টুরেন্টে, হোটেলে এবং আর কোথায় কোথায় বেণু ওকে নিয়ে গিয়েছিল জানি না। এদিকে আমাকে থাকতে হচ্ছিল বাইরে বাইরে গাড়ি নিয়ে রোজগারের ধান্দায়। টের পাইনি। কিন্তু যখন টের পেলাম তখন সব শেষ হয়ে গেছে। না, একটা সান্ত্বনা থাকত যদি বেণু ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও ঘর সংসার পাতত —কিন্তু তা সে করেনি, করার ইচ্ছাও ছিল না। হয়তো এসব রেওয়াজ এই শহরে আজকাল উঠে গেছে। একডালিয়া রোডের বাসায় যাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। দরকার ছিল না। রমাও সেখানে ছিল না জানতাম। নারকেলডাঙার কাছাকাছি একটা টিনের শেড ভাড়া করে আমি আমার ট্যাক্সি নিয়ে থাকি। তখনই একদিন খবর পেয়েছিলাম রমা নাকি ধর্মতলার কোন একটা বার-এ মদ খেয়ে এক রাত্রে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। বেণু রায়? না, সঙ্গিনী নিয়ে শুঁড়িখানায় বসে ফুর্তি করার পয়সা তার ছিল না। হাত বদল হয়ে হয়েই রমা সেদিন কাব কাছে গিয়ে পড়েছিল। তারপর বেশ কিছুদিন আর আমার স্ত্রী সম্পর্কে কেউ কোনো সংবাদ দেয়নি।

তারপর বছর তিন বাদে সংবাদ পেলাম দেরাদুন না কোথাকার হাসপাতালে আড়াই মাস একটা ঘা নিয়ে শুয়ে থেকে তারপর রমা শেষ নিশ্বাস ফেলেছে।

শুনে আমিও শান্তির নিশ্বাস ফেললাম।

তারপর, তারপর আমি নারকেলডাঙা থেকে উঠে এসে সার্কুলার রোড ও শেয়ালদার কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা টালির শেড ভাড়া করে গাড়ি নিয়ে আছি, হুঁ তেমনি ট্যাক্সি ড্রাইভার। তবে রোজগার এখন বেড়েছে। বেড়েছে মানে বেশ বেড়েছে।

না, পূর্বপরিচয় দিলাম এইজন্যে যে আমার ওপর দিয়ে, হ্যাঁ ভাগ্যের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে

আপনারা শুনলে হাসবেন।

হাসবেন এবং দুঃখও করবেন।

এবং এটা খুবই সত্য যে লোকে বলে যে, ঈশ্বর একদিকে কেড়ে নিলে আর একদিক দিয়ে দেয়।

স্ত্রী, জমিদারি গেছে। দেশ গেছে। কিন্তু যেমন দিনকাল। খুব একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে যে আজ এই শহরে আমাকে থাকতে না হত তার বিশ্বাস ছিল কি? হ্যাঁ, আমি টাকা-পয়সার কথাই বলছি। দিব্যি আছি। সুখই বলা যায়। আমি, দেখুন ইচ্ছে করলে, রোজ এক বোতল বিয়ার খেতে পারি। দুপুরবেলা আস্তানায় ফিরে গিয়ে সস্‌প্যানে করে আলুসিদ্ধ-ভাত রান্না করে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শেয়ালদা কি ধর্মতলার কোনো হোটেলে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা খরচ করে এখন মাংস-ভাত চালাই। তবে একটু রয়ে-সয়ে খাওয়া দাওয়া করি আর মদটদও পারতপক্ষে অভ্যাসে আনতে চাই না। আমার পেটের ধাত ছোটোবেলা থেকেই একটু-আধটু খারাপ। লিভারের জোর কম।

তাব সুবিধা হল এই যে, অপব্যয় না করার ফলে দু'চার হাজার টাকা আমি যখন তখন বার করে দিতে পারি। একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছি ব্যাংক-এ। খাই-খরচা বাদ দিয়ে যে টাকাটা বাঁচে ওখানেই ফেলে রাখি।

এতক্ষণ পর নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন আমি অত লোলুপ দৃষ্টিতে কেন বারবার মেয়েটিকে দেখছি। খাওয়া দেখছিলাম।

হ্যাঁ, কখন খাওয়া শেষ হবে আর বেরিয়ে এসে আমার গাড়িতে উঠবে। আরও ক'টা টাকা পাব। ড্রাইভাররা, বিশেষ করে যারা ট্যাক্সি চালায়, তাদের চিন্তাটা সাধারণত এ-খাতেই বয়। অন্তত প্রথম বইতে শুরু করে। —

আর তা ছাড়াও আমি গোপন করব না, মেয়েটিকে যখন দেখছিলাম তখন তার হাত, পা, পিঠ, কাঁধ, চুল, গায়ের রং এমনকি কোমরে কতটা মাংস নেই আর বুকে কতটা মাংস বেশি আছে দু চোখ দিয়ে জরিপ করলাম, দূর থেকে যতটা সম্ভব।

হাওয়ার দাপটে যখন খোপা থেকে আঁচলটা পিঠে নামল ও পরে পিঠ থেকে সরে গিয়ে আর একটা কাঁধের কাছে উড়ু উড়ু করে তখন আমি তার এ-কাঁধটা দেখতে পাই, বুকের এপাশের সুগোল মসৃণতা। তারপরেই অবশ্য ধীরে-সুস্থে একটা কাটলেটের অর্ডার দিই। না হলে আর এই গরমে আমার কাটলেট খাওয়ার ইচ্ছা—

কেননা এ-কাঁধের কাপড় সামলাতে এদিকে ও ঘাড় ফেরাতে আমার চোখের সঙ্গে ওর চোখ বেঁধে গেল। ওই এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই বুঝে নিতে পারলাম গাড়ির দরকার হবে।

কাটলেট শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরাই।

ব্যক্তিগতভাবে আমার যে খুব একটা লোভ হচ্ছিল বউটিকে দেখে, তা না।

তাছাড়া, নিজের স্ত্রী, রমার কাছে কামড় খাওয়ার পর স্ত্রীলোকদের আমি একটু এড়িয়েই চলি। বেশ আছি একলা আমার টিনের শেডে। খাই-দাই ফূর্তি করি। তা না, জমিদারের ছেলে, দেশের অনেক বড়োলোক বন্ধু পেয়ে গেছি এখন এই শহরে। হয়তো অনেকে আগে বড়োলোক ছিল না, এখন হয়েছে, নিজেদের চেষ্টা, বুদ্ধি ও ভাগ্যের জোরে। ব্যবসাকেন্দ্রে আমার আনাগোনা একটু বেশি। তাঁদের আমাকে একটু সহানুভূতি করাও বটে। তাঁরা ডাকছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা ডাকছেন, আত্মীয় এবং বন্ধুরা দরকার হলেই আমার গাড়ি ভাড়া করেন। বালিগঞ্জ থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে গড়পাড়, গড়পাড় থেকে নতুন বাবুপাড়া লিন্টন স্ট্রিট, সেখান থেকে সোজা পার্ক স্ট্রিট এবং সেখান থেকে বেরিয়ে ডালহৌসি, কি চৌরঙ্গি কি ধরমতলা। পুরুষ— আমি আপনাদেব কাছে যখন কিছুই গোপন করব না তখন বলে রাখি, পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই আমাকে বেশি ডাকে। তাই বলছিলাম, ভগবান আমার একদিক নিয়েছেন আর একদিক পূরণ করেছেন। এক-এক সময় ভাবি, এককালে জমিদার ছিলাম, আমার চেহারায়, চলায়-বলায় তার পরিচয় এখনো একটু-আধটু লেগে আছে বলে কি তারা আমার ট্যাক্সিতে চাপতে পছন্দ করেন! আমিও আমার চেহারা এবং পোশাক যতটা সম্ভব সুন্দর সুদৃশ্য রাখতে চেষ্টা করি এবং ফি মাসে গাড়িটার রং ফিরিয়ে ওটাকে তকতকে ঝকঝকে রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করি না। কেন তা করব না বলুন, আর দশটা ট্যাক্সিও যদি পরপর দাঁড়িয়ে থাকে, বালিগঞ্জের সেই সুন্দরী মেয়েটি, কী যেন নাম — উমা সেন, হাত তুলে ঠিক আমাকেই ডাকবে। লিন্টন স্ট্রিটের সেই রূপসী বউ, রুবি রায়— যদি কষ্ট করে একটু হেঁটে এসেও আমার গাড়ি ধরতে হয় তো তা করতে সে ভ্রূক্ষেপ করে না। রাস্তায় আর পাঁচটা ট্যাক্সিওয়ালা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে শুধু দেখে। গড়পাড়ের অসীমা চ্যাটার্জি, পদ্মপুকুরের তৃপ্তি চৌধুরী, মোহনবাগান স্ট্রিটের মালা রায়, পার্ক সার্কাসের চামেলি, শোভাবাজারের সুমিতা এবং আরও একগোটি মেয়ের বাড়ির নম্বর আমার মুখস্থ। বাড়ির নম্বর এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে (যদি কেউ অফিসে কাজ করে তো সেই অফিস এবং সেখান থেকে বেরিয়ে যেখানে যায়) যেখানে যাবে সেই ঠিকানা আমি জানি! মাফ করবেন, আপনি যদি স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে লটবহর নিয়ে হঠাৎ শেয়ালদায় ট্রেন ধরতে কি কাঁকুড়গাছি কোন আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছে দিতে আমায় ডাকেন, আমি দু'হাত তুলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব। সময় নেই। আজ শনিবারের দুপুর, সোওয়া বারোটা বাজে, ঠিক একটায় ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিটের লাল অফিস-বাড়িটার সামনে আমাকে ট্যাক্সি নিয়ে হাজির থাকতে হবে। সেই অফিসের রেবা সোমকে আমায় শেয়ালদার একটা হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে। আজ রোববার, উঁহু তিনটে বেজে গেছে, এখনই আমাকে গাড়ি নিয়ে ছুটে যেতে হবে সদার্ন এভিন্যু। ঝাউ গাছের আড়াল করা সেই আকাশি রঙের বাড়ির সপ্তমী বোসকে পৌঁছে দিতে হবে সৈয়দ আমির আলি এভিন্যুর একটা সুন্দর ফ্ল্যাটবাড়িতে। সোমবারের সকাল, সময় নেই, মধু বোস লেনের মায়া গাঙ্গুলি আমার ট্যাক্সিতে চেপে টালিগঞ্জের একটা বাড়িতে যাচ্ছে। সেখান থেকে আবার সন্ধ্যা সাতটায় সেই মায়াকে নিয়ে ধর্মতলায় যেতে হবে।

হ্যাঁ, সব ঠিক করা আছে। সময়, স্থান, লোক ও পথের দূরত্ব। ঘড়ির কাঁটা ধরে ধরে আমার সে-সব জায়গায় উপস্থিত থাকতে হয়।

তাই বলছিলাম, হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যাবেন মনে মনে ঠিক করে যদি হঠাৎ আপনার বুড়ি দিদিমা একদিন হাওড়ার মেল ধরতে চাকর পাঠিয়ে আমার ট্যাক্সি ভাড়া করতে চান তো তিনি নিরাশ হবেন।

অবশ্য মিষ্টি বাক্য বললেই আমি আপনাদের চাকরকে ফিরিয়ে দেব আর আপনার দিদিমার জন্য মনে মনে কষ্টও করব, কিন্তু আপনারা শুনে হাসবেন আজ অবধি কোন বর্ষীয়সীই আমার গাড়িতে চাপল না। তখন, তখন হয়তো আমি আমার সাদা-কালো হাম্বার নিয়ে লিন্‌টন স্ট্রিটে যেতে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে তৈরি হতে আপনাদের পাড়ার রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়িটা থামিয়েছি। আর আপনার চাকরটাকে ফিরিয়ে দিয়ে দোকানে বসে চায়ের বাটি সামনে নিয়ে আমি একটি তরুণীকে দেখছি। বনানীকে। তার ফরসা সুগঠিত বাহু, শক্ত মজবুত খোঁপা এবং ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ উদ্ধত নাক। ট্যাক্সি নিয়ে যেতে হলে সেই নাকের ঘায়ে ও আমাকে কচুকাটা করে দিতে চাইবে। ছবিটা ভাবছিলাম। গোলাপি রং করা গোল প্যাটার্নের বাড়ির অসামান্য সুন্দরী মেয়ে। কলেজে পড়ে। বনানী সেন।

এবং বনানীর মতো সবাই দেখতে ভালো। হ্যাঁ, যারা আমার গাড়িতে চাপে। সব মেয়ে, সব বউ।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে আমি যখন পাশে চুপ করে দাঁড়াই তখন দেখি তাদের চুল দেখি চোখের পালক দেখি ঘাড়ের বাঁক দেখি পিঠ দেখি কোমর। গাড়িতে উঠতে কি নামতে যদি কোনো মেয়ের শায়া বা শাড়ি একটু বেশি সরে বা উঠে যায় তো আমি পায়ের রং মাংসল ডিম এমন কি রোমকূপগুলি পর্যন্ত সতর্ক সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে চট করে দেখে নিই। প্রশ্ন করবেন, কেন? অভ্যাস। কিন্তু ওই পর্যন্ত। ওপর ওপর দেখা। নখ, চুল, আঙুল, পালক, মাংস, চামড়া, ছাড়া আর কিছু দেখা আমার ইচ্ছাও নেই সময়ও হয় না।

মন?

তাই বলছিলাম ওদের ওদিকটা আমি মাড়াই না। যতদূর সম্ভব চোখ বুজে থাকি, এড়িয়ে যাই। না হলে বনানী কেন আমার ট্যাক্সি যথাসময়ে ওর দরজায় হাজির না থাকলে রাগ করে, বালিগঞ্জের বউটি মূর্ছা যায় টালিগঞ্জের মেয়েটি চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে, আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয় তার কিছু কিছুটা আমি জানি কিন্তু জেনে করব কী। আমি যে আগেই আর একজনের কাছে ছোবল খেয়ে আছি।

চুপ থাকি। চোখ বুজে যাই। মিটার মিলিয়ে পয়সা আদায় করে আর এক সেকেন্ড কোথাও দাঁড়াই না আর এক পাড়ায় খেপ দিতে শহরের রৌদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বরং মন-টন না দেখে আর দশজন ট্যাক্সিওয়ালার মতো নিস্পৃহ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকাটাই নিরাপদ মনে করি। পৃথিবীতে বোধ করি একমাত্র ট্যাক্সিওয়ালারাই এত কাছে এসে এত নিরাসক্ত চোখে নারীর রূপ দেখে। তাই তাদের হাঁ করে তাকিয়ে দেখাটাও বাড়ির 'জেনানারা' কোনোদিন আপত্তি করে না।

আমরা ট্যাক্সিওয়ালারাও সিগারেট মুখে গুঁজে সেই অগাধ রূপের ওঠানামা দেখার নেশায় বঁদ হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে যাই। এর বেশি কিছু আমাদের দরকার হয় না।

আর, তা ছাড়াও, আমি, ধরুন এখন যেমন অভদ্রভাবে টেবিল থেকে চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বার বার খাবার প্লেট থেকে থুঁতনিটা তুলে বউটির খাওয়া দেখছিলাম, এমন করার সুযোগ আপনারা সেখানে পেতেন না।

রেস্টুরেন্টওয়ালাই আপত্তি তুলে বলত, মশাই বেরিয়ে যান। এটা ভদ্রলোকের জায়গা। এমন ভাবে তাকানো—

সেই স্বাধীনতা আমার ছিল।

সেই সুখ। আর আপনাদের এখন বুঝাতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না, রোজ অন্তত দেড় ডজন মেয়ের রঙিন শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ, অবিশ্বাস্য রকমের সব সুন্দর খোঁপা বেণী, চোখ, চোখের রং ও হাসি-কান্না দেখে আমি নিজের স্ত্রী-বিচ্ছেদের কথা একেবারে ভুলতে পেরে ট্যাক্সিওয়ালার জীবন কায়মনে আঁকড়ে ধরে আছি। বেশ আছি।

হ্যাঁ, কী যেন বলতে যাচ্ছি— খুঁটিয়ে বউটিকে দেখছি। নিশ্চিন্ত মনে। তা ছাড়া এইমাত্র হঠাৎ একটা ভিড় হয়ে রেস্টুরেন্ট আবার পাতলা ফাঁকা হয়ে গেছে। কলকাতা শহরের হোটেল রেস্টুরেন্টের দস্তুর যা। কোথা থেকে সব লোক ছুটে আসে আবার একসঙ্গে সব অদৃশ্য হয়ে যায়। একটিও থাকে না।

আমি দৃশ্যটা তাই উপভোগ করব বলে চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে বসি। খাওয়া দেখি। ছোটো ছোটো হা। সাদা মুখ সাদা ব্লাউজ। সাদা পাড় ছাড়া কাপড়। একটা শ্বেতপাথরের পুতুলের মতো লাগছিল। পুতুল খাচ্ছে।

তা ছাড়া ওর উল্টো দিকের দেয়ালের রংটা পাকা সবুজ। তার ওপর এই দিনেরবেলায়ও মাথার ওপর বত্রিশটা বাল্‌ব জ্বলছে। শরীরের একটা সাদা ছায়া পড়েছিল সামনে টেবিলের কাচে। শরীরটা ছোটো। নুয়ে খাওয়ার সময় ছায়াটা আরো ছোটো হয়ে টেবিলে পোর্সেলিনের সাদা ডিশটার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছিল এক একবার।

এবার পায়ের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম শাড়ির আঁচলটা সরে গিয়ে শায়ার খানিকটা বেরিয়ে আছে। ঘোর লাল রং। এখন বুঝলাম হাতের মতো পা দুটোও খুব ফর্সা। শায়ার লালচে আভা লেগে পায়ের মাংস বাদামি রং ধরে আছে। বয়সের রং না ওটা।

মানে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম, হাত, পা, আঙুল, গলা, নাক, ভুরু, চুল, চোখ সব নতুন। একেবারে টাটকা, তক্তা। যেন এইমাত্র বাক্স থেকে (বা ঘর থেকে যা-ই বলুন) বেরিয়ে রাস্তায় এসেছে। একটা রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছে।

এক গ্লাস জল দিতে ডাকলাম ছেলেটাকে।

জল খেয়ে মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসলাম।

মেয়েটিও সোজা হয়ে বসেছে। জল খাচ্ছে। ওপরের দিকে ওর থুতনি। আঁচলটা আর খোঁপা বা ঘাড়ে লেগে নেই, সরে গিয়ে বাঁ বগলের তলায় উড়ু উড়ু করছিল, ফলে সবটা পিঠ এখন দেখা যাচ্ছিল। আহা, কী পিঠ! যেন ঈশ্বর নিজের হাতে বাটালি চালিয়ে খোদাই করে সেই পিঠ তৈরি করেছে, তারপর ওতে রাঁদা চালিয়েছে।

মেয়েরা খুব পাতলা ব্লাউজ পরে। ব্লাউজের তলায় বডিজের ফিতে দুটো কড়া হয়ে চোখে পড়ে। যেন ওটা দেখানোর জনাই ওপরের জামাটা। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখে খুশি হলাম। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, টালা, গড়পার, এন্টালি, পার্ক সার্কাস এর এত মেয়েকে আমি রোজ বয়ে বেড়াই! এমন রেখে-ঢেকে জামা পরতে আর কাউকে দেখিনি। অথচ এতে যে তার পিঠের লাবণ্য মাংসের ছোটো নরম ঢেউগুলো বোঝা যাচ্ছিল না তা ও না। সাদা স্ট্র্যাপ দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। এখন দেখলেই মনে হয় শরীরের কোথাও বুঝি অপারেশন হয়েছে। ওটা ব্যান্ডেজ। বাদুড়বাগানের শ্যামলী, সাদার্ন এভিন্যুর রেখা, লিনটন স্ট্রিটের বনানী, সুরাবর্দি এভিন্যুর শোভা সোম সব, সব এক। আমি, যদি কোনো সময় কাপড় সরেও যায়, ওদের পিঠের দিকে তাকাই না। চোখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু, গোপন করে লাভ নেই, আমার যেন ইচ্ছে হচ্ছিল এখন এখানে এই মেয়েটির পিঠটা একবার ছুঁয়ে দেখি।

অবশ্য আমাদের ট্যাক্সিওয়ালার জীবনে তার সুযোগ কম। পিঠ ধরব কী ভালো করে ওদের সঙ্গে কথাই বলা যায় না। 'রোক্‌কে', 'জোর্‌সে চালাও', 'আ গিয়া' আর তারপর 'কত উঠল মিটারে?' ইত্যাদি একটা দুটো প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া ছাড়া জেনানাদের সঙ্গে ক'টা আর কথা হয়।

আর তাঁরা এত ব্যস্ত থাকেন এক একজন।

আমরা ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েই খালাস। কেবল রাস্তার ক'মিনিটের সম্পর্ক।

কেবল সেদিন, আমার এখানে এই সাত বছরের জীবনে বকুলবাগান স্ট্রিটের একটি বউয়ের হাত ধরেছিলাম। ভারী নরম হাত। বউটি তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে ফুটবোর্ড থেকে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

আর কোনোদিন দেখিনি আমার ট্যাক্সিতে উঠতে। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি করছিল।

এখন বউটি স্বামীর বাড়ি থেকে ভরদুপুরে পালিয়ে হাজরার মোড়ের একটা বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে যে প্রেম করছিল আমি এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম।

হ্যাঁ, হর্ন শুনে যেভাবে ছেলেটিও একটা ঘরের পর্দা ঠেলে ছুটে বেরিয়ে মেয়েটিকে ধরতে এসেছিল। পড়ে যেত বলে তার আগেই আমি যদিও ওর হাতটা ধরে ফেলে নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিলাম।

না, বলছি এইজন্য যে, আমি সেখানে দাঁড়ানো সত্ত্বেও ছেলেটি বউটির গলায় হাত রেখে যেসব কথা বলছিল।

কিন্তু তা শুনে তা বুঝে করব কী। আমি করবার কে। চোখ মুছে ফের মেয়েটি গাড়িতে উঠে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরিয়ে নিতে বলেছিল। ডবল টিপ। দুটো বেশি পয়সা রোজগার হয়েছিল। ওই পর্যন্ত।

আর দেখিনি ওকে।

অবশ্য এরকম ঘটনা আমি আঙুলের কড়ে গুনে আপনাদের শোনাতে চাই না। শোনাই না। আমরা সব দেখে বুঝে চুপ থেকে সিগারেট ধরিয়ে ফটক ছেড়ে চলে আসি। কথাটা উঠছে এইজন্যে যে, হাত ধরেছিলাম।

কিন্তু আমার হাত ধরায় কী এসে যায়। আমার দিকে আর কবার ও তাকিয়েছিল? যে হাত ধরেছিল ফেরার পথে তার মুখ ভেবেই সারা রাস্তা চোখে রুমাল চাপা দিয়ে বউটি গাড়ির কোণায় মাথা রেখে নিঝুম পড়েছিল। কাজেই আমাদের ট্যাক্সিওয়ালাদের হৃদয় মন হাসি-কান্নার মধ্যে উঁকি না দিয়ে থাকাই লাভ।

কী, সেদিন, আমি যতক্ষণ না রিচি রোডের উমা চ্যাটার্জিকে তুলে চৌরঙ্গির হোটেলের একটা কামরায় পৌঁছে দিতে পারছিলাম ততক্ষণ, সারাটা বিকেল, উনিশ বছরের (কি কুড়ি একুশ বছর বয়স হবে বউটির) একটি মেয়ের শরীরের তাপ, খাঁ খাঁ যৌবন, মাংসের মসৃণতার স্বাদ হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছি, চিন্তায় বুদ হয়ে শিস দিয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়েছিলাম। মনখারাপ করব কেন।

হ্যাঁ, ট্যাক্সিওয়ালা তার ওপর রমার সেই ঘটনায় হৃদয় নামক জিনিসটাকে গাড়ির চাকার তলায় থেঁতলে থেঁতলে এই শহরের পিচের রাস্তায় আমি যে সাত বছরে একেবারে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলাম তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারছেন।

আর এক মেয়ে উমা।

কী চেহারা মশাই! আগুন।

এখনো কলেজে পড়ছে। এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চুরি করে রোজ হোটেলে সেই ভদ্রলোকের কাছে কেন যায় আমি কি জানি না, জানি, জেনে চুপ থাকি।

চুপ থাকার কারণ কাল আবার ট্যাক্সিটা যখন উমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ধীরে ধীরে চালিয়ে যাব ও হাত তুলে ডাকবে।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট সময় লাগিয়ে একটা নীল কি গোলাপি সিল্কে শরীর মুড়ে, চোখে কাজলের পুরু প্রলেপ বুলিয়ে ও আমার ট্যাক্সিতে চাপবে। হুঁ সিনেমায় যাচ্ছে। আজ তিন মাস। সেই হোটেল। সেই সন্ধ্যার অন্ধকার কামরা। অথচ আর সব ঘরে আলো।

ফুলের মতো মেয়ে উমা।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তি, ন্যায় অন্যায়ের চর্চায় মাথা ঘামালে আমার চলছিল কী। হোটেলে পৌঁছে দেওয়া মাত্র একটা দশটাকার নোট। মিটার খরচ পাঁচ, আমার বকশিশ পাঁচ।

টাকাটা পকেটে পুরে লম্বা সেলাম জানিয়ে আর একবার উমার লম্বা ঘাড় মৌচাকের মতো মস্ত খোঁপা ও সোনার বর্শার মতো সুন্দর লম্বা হাত দুটো দেখে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসেছি। ওই দেখাটুকুনই আমার লাভ।

উপরি পাওনা।

এত কথা বলছি এই জন্যে যে, এখনো যে আমার ওই মেয়েটির পিঠ ছুঁয়ে দেখতে ভয়ানক ইচ্ছা হচ্ছিল সেটা নিতান্তই সাদা ইচ্ছা। হাই-এর সঙ্গে ওঠে নামে। এই ইচ্ছাকে আমি কোনোদিনই কাজে পরিণত করব না, কোনো ট্যাক্সিওয়ালাই করে না। লোকের মার পুলিশের হাঙ্গামা মামলা-মোকদ্দমা যাহোক একটা কিছুর কথা ভেবে তারা ভীষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে সিগারেট টানে। সিগারেট টানে আর ঘড়ি দেখে। কখন সময় হবে। কখন সে এসে গাড়ি আলো করে বসবে আর বলবে, 'চালাও।'

আমিও তার অপেক্ষা করছিলাম। খাওয়ার পর আরো একটা সিগারেট শেষ হয়েছে। পুরো পঁচিশ মিনিট এখানে খেয়ে বসে বিশ্রাম করে কাটানো গেছে হিসাব করলাম।

'ওটা তোমার ট্যাক্সি?'

ঘাড় নাড়লাম।

আর অবাক হলাম বউটিকে দেখে। হ্যাঁ, সুন্দর বলতে সুন্দর। সিঁদুরের রেখাটা অমন সরু করে না দিলে অত সরু চুলের সঙ্গে মানাত না। আর এমন সুন্দর চোখ। লম্বা সরু পালক ঘেরা দুটো দিঘি। জল টলটল করছে, জীবন। ব্লাউজের হাতায় আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতে বেরিয়ে আসা কচি সবুজ সোনালি আঙুরগুচ্ছ। শাড়ির পাড় আছে। সূক্ষ্ম জড়ির কাজ। দূর থেকে বোঝা যায় না।

'বাঙালি ট্যাক্সিওয়ালা আমার ভালো লাগে।' মেয়েটি বলল।

আমি চুপ করে হাসি।

লম্বা স্বর্ণচাঁপার মতো দুটো আঙুল গলিয়ে বউ বিলের টাকাটা কাউন্টারের ওধারে পাঠায় আর এক হাত দিয়ে মনি-ব্যাগটা বুকের মধ্যে ব্লাউজের ভিতর রাখে।

আমি ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিই। কেননা সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকা অসভ্যতা।

'ভারী সুন্দর গাড়ি তো!'

গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বলল। মনে মনে বললাম, তোমার মতো সুন্দরী মেয়েরাই তো আমার গাড়ির সওয়ার। ওরা রোজ বেরোয়, বেড়ায়। তুমি, তোমায় তো আর কোনোদিন দেখিনি!

'এই ট্যাক্সিওয়ালা!'

ঘাড়টা ফেরাই।

'কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করছ না তো?'

আহা, কী দাঁত।

আমার তো মনে হয় ওই দাঁত দিয়ে যদি সে কামড়াতে চায় তো রাস্তার সব পুরুষ দাঁড়িয়ে পড়বে, হাত বাড়িয়ে দেবে, গলা কি আঙুল। কেটে আলগা করে দিক।

আমি দেখছিলাম ওর গাল।

হ্যারিসন রোডের দিক থেকে রোদের লম্বা রেখা ওর গালে গলায় পড়ছিল। ওর পাতলা চামড়ার তলায় রঙের লাল আভা দেখছিলাম। গলা বাড়িয়ে দিয়ে সে সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখছিল তখন। সামনে রেড সিগন্যাল। এগোবার উপায় নেই। তাই দুজনের কথা বলার সুযোগ হল।

'লোয়ার সার্কুলার রোড বললেন না? ওই তো দক্ষিণ দিক।'

'হ্যাঁ, তারপর বাঁয়ে। মিডল রোড।'

'ও দশ মিনিটে নিয়ে যাব।'

'আবার সেখান থেকে আমাকে এই গাড়িতে ফিরতে হবে। চারটের মধ্যে মানিকতলায় ফেরা চাই। হরীতকী বাগান লেন।'

'তা হবে, খুব হবে, বিশ মিনিট লাগবে বড়ো জোড় নর্থে ফিরতে।'

ঘাড়টা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে আবার সুন্দর চোখজোড়া দেখলাম। দেখলাম আর দরকার হলে কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা যে কত ভদ্র মার্জিত গলায় জেনানাদের সঙ্গে কথা বলে প্রমাণ করতে আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'শেয়ালদার রিফিউজি হোটেলটায় খেতে বসে আপনি হঠাৎ যেভাবে গলা বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন তখনই বুঝে গেলাম আপনি গাড়ি খুঁজছেন। ট্যাক্সি চাই।'

একটু হাসলাম।

ওর একটু নিশ্বাস এসে আমার গলায় ও ঘাড়ে লাগল। ভালো লাগল। অবশ্য এগুলো আমাদের উপরি-পাওনা। গাড়ি একটু সামনের দিকে ঝুঁকলেই মেয়েদের গায়ের গন্ধ এসে আমাদের গায়ে-পিঠে লাগে। রাস্তা পরিষ্কার দেখে চট করে আমি তখন স্টার্ট নিয়েছি।

'চারটের মধ্যে ফিরতে পারলেই হল। ওখানে আমার বেশি দেরি হবে না। যাচ্ছি তো একটা কথা বলতে।'

'কার সঙ্গে?'

'মার সঙ্গে।'

'ওখানে বুঝি আপনার মা থাকেন? মিডল রোড কত নম্বর?'

পাঁচ -এর পি কি সি বুঝতে পারলাম না কিন্তু তা না পারলেও কার কাছে যাচ্ছে একবার একটা প্রশ্নের ঢিল মেরেই যে জেনে নিতে পারলাম জেনে সুখী হলাম। আমরা ট্যাক্সিওয়ালারা কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে আগেই জেনে গেলে একটু বেশি খুশি মেজাজে গাড়ি চালাই তো।

'আর ওখানে বুঝি আপনার শ্বশুরবাড়ি মানে স্বামীর ঘর, হরীতকী-বাগান লেন?'

কথা না কয়ে থুতনি নেড়ে বউ হাসল। রামধনুর মতো বাঁকা ভুরু টান করে ফিসফিসে গলায় বলল, 'ওটা আমার স্বামীর ঠিকানা। তোমরা ট্যাক্সিওয়ালারা চট করে বুঝে ফেল।'

'তা কেন পারব না, আমরা কি এ-লাইনে নতুন নাকি। আপনাদের কে কোথায় থাকেন আসা-যাওয়া দিয়ে আমাদের বুঝতে হয়। অনেক সময় ঠিকানা ভুলে যাবার পরও আন্দাজের ওপর আমরা গাড়ি চালাই।'

'হ্যাঁ, শেয়ালদা থেকেই ট্যাক্সি ধরব ঠিক করেছিলাম। ভীষণ খিদে পেল ট্রেন থেকে নেমে। দুটো খেয়ে নিলাম। সারাদিন খাওয়া হয়নি। ইস্ কী রান্না!'

'বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল বুঝি?'

'হুঁ. কাঁচড়াপাড়া। আমার ছোটো ভাই আছে ওখানে। টি. বি.।'

'আজকাল টি.বি-র জ্বালায় প্রাণ ঝালাপালা। চারদিকে কেবল ওই।'

উত্তরে কী বলল ও বোঝা গেল না। কেননা একটু ফাঁকা পেয়ে গাড়ি জোরে চালিয়েছিলাম। তা ছাড়া এলোমেলো হাওয়া ছিল।

আর একটু পর। একটা বাঁক ঘুরতে সামনে প্রকাণ্ড ভেড়ার পাল পড়ে গেল। রং করা ওদের গায়ের পশম। হাতে সময় আছে. তাড়াতাড়ি ছুটব বলে পথ পেতে খামকা কতগুলো হর্ন দিয়ে স্লটার হাউসের যাত্রীদের ব্যতিব্যস্ত করতে বাধল। বরং যতটা পারা যায় আস্তে. বেশ আস্তে গাড়ি চালিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাই।

'তোমার কি সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি ট্যাক্সিওয়ালা। তা হলে গাড়ি থামিয়ে এইবেলা সিগারেট ধরিয়ে নিতে পার।' বউ তার হাতের ঘড়ি দেখল। 'হাতে সময় আছে।'

দাঁড়িয়ে পড়ি। স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। রাস্তায় চলতে এ ধরনের সহানুভূতিগুলি আমরা খুব পছন্দ করি।

সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আজ রাতটা তা হলে মার কাছেই থাকবেন। ও-বাড়ি?'

'ও মা, কী বলছি, তোমায় ট্যাক্সিওয়ালা? এই গাড়িতেই যে আমাকে মানিকতলা ফিরে যেতে হবে। চারটের সময় আমাকে হরীতকী-বাগান লেনে নামিয়ে দিতেই হবে।'

কথাটা মনে ছিল না। তাই লজ্জায় হাসলাম। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'আমার স্বামী খুব কড়া লোক। কোথাও একলা বেরোতে দেয় না। আজ ও একটু অফিসের কাজে বাইরে গেছে। বিকেলে ফেরার কথা। এই ফাঁকে ওদের দেখে নিচ্ছি। একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'অঃ বাবা, আপনি তা হলে ভীষণ লোকের পাল্লায় পড়েছেন। সারাক্ষণ বাড়িতে?'

'সারাক্ষণ।

চোখ জোড়া ভীষণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল মেয়েটির।

'আমি যে কী সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছি তা যদি তোমরা বাইরের লোক একটু জানতে ট্যাক্সিওয়ালা. আমি কী ভীষণ লোকের ঘর করছি।'

নতুন করে স্টার্ট দেওয়াতে আমার গাড়ির ইঞ্জিন ধুকধুক করছিল। আমিও সেরকম একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম ভিতরে।

এই গাড়িতে চড়ে আমার এই ট্যাক্সির হাওয়া লাগিয়ে লাগিয়ে শহরের কত অসংখ্য মেয়ে আমোদ-ফুর্তি লুটছে তা যদি তুমি জানতে বউ. রোজ—অবশ্য তারা তোমার চেয়ে অনেক বেশি চালাক. ঢের বুদ্ধিমতী।

কথাটা বললাম না।

কেননা আমাদের ট্যাক্সিওয়ালাদের এসব ব্যাপারে নাক ঢোকাতে নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে সেই নরম বুক কতটা ওঠে নামে আড়চোখে সেটুকুন দেখে নিয়ে আমি নিজের কাজে মন দিই. জোরে দুই হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরি। ভেড়ার দল সরে গেছে। ফাঁকা রাস্তা।

'আপনি যখন জানা হয়ে রইলেন তখন মাঝে মধ্যে দুপুরে আধ ঘণ্টা আমার ট্যাক্সিতে করে বেড়াতে বেরোতে পারেন। আপনার স্বামী অফিসে বসে মোটেই টের পাবেন না। কোন্ ফাঁকে কখন আপানাকে তুলে ঘুরিয়ে আবার কলে জল আসবার আগে হরীতকী বাগান লেনে রেখে এসেছি। মিডল রোড যান ইচ্ছা পার্ক সার্কাস যান, সময় মতো নিয়ে যাব. আবার ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বাড়ি ফিরিয়ে আনব।'

'আচ্ছা দেখা যাবে, সে দেখা যাবে।' বউ বলল আর আমি আড়চোখে ওর লম্বা শ্বাসের সঙ্গে বুকটা কতটা কাঁপে তা চুরি করে লক্ষ করি।

কেননা কাল হয়তো ওকে আর দেখতেই পাব না. কোনোদিনই না।

'এবাড়ি?'

'না. আর একটু চলো।'

আমি বললাম, 'যদি মন খুব খারাপ লাগে তো আজ রাতটা মার বাড়ি থেকে যান। একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই হল। মার অসুখ।'

'তোমরা যত সহজ মনে করো ট্যাক্সিওয়ালা তত সহজ না। ঘরের বউয়ের বাইরে মানে স্বামীর ঘর ছাড়া আর কোথাও রাত কাটাতে হলে অনেক তথ্য প্রমাণ হাতে নিয়ে নামতে হয়। যে-লোক সাত জন্মে শ্বশুরবাড়ি যায় না, সে ছুটে তক্ষুনি এসে দেখে যাবে কতটা অসুখ, কী রকম অসুখ শাশুড়ির।'

'বুঝতে পেরেছি,' আমি অল্প হেসে মাথা নেড়ে বললাম, 'আপনার শরীরটা আপনার স্বামীর কাছে একটা মদ বিশেষ, দামি নেশার মতো। কিছুতেই আপনি না থাকলে ভালো লাগে না।'

অল্প হেসে বললাম আর দু'বার ঘন ঘন, ও দেখে ঠিক সে ভাবেই ওর গলার নরম পেশির ওঠানামা দেখলাম।

সত্যি দামি শরীর বলে আমার এতটা লোভ হচ্ছিল মেয়েটির ওপর, কিন্তু কী করি উপায় কী, কতটা আর করতে পারে একটি যুবতি মেয়েকে—একলা গাড়িতে নিয়ে যখন শহরের ট্যাক্সিওয়ালারা চলে। একটা বাড়ির নম্বর দেখে জোরে আর একটা মোচড় দিয়ে এগোই। 'এ বাড়ি?'

'হুঁ।'

হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিতে ও নামল। 'তুমি দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি কথা সেরে আসছি।'

আমি গলা বাড়িয়ে আবার ওর পায়ের মাংসের গোছা দেখলাম। কেন জানি আমার তখন গরম ফাউলকারির কথা মনে পড়ে গেল।

মুখটা ফেরানো ছিল। চিবুকের ধারটা দেখে আপেলের টুকরোর কথা মনে পড়ল। আর টুসটুসে আঙুর!

আহা পৃথিবীর সেরা আঙুর ভেবে সারারাত চুষে ছিবড়ে করে ফেললেও রস যাবে না, ভাবলাম। .

কিন্তু ভেবে কী আর আমি গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিলাম। শতকরা নিরানব্বই জন ট্যাক্সিওয়ালার মতো ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে গাড়িটাকে ব্যাক করে একটু ঘুরিয়ে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে রাখলাম উল্টো দিকে মুখ করে।

হ্যাঁ ওর শরীরের ওপর বেশি লোভ করেছিলাম বলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে এই দাঁড়াল। দেখুন কী সব ঘটনা ঘটে আমাদের জীবনে! আমি তো ভাবছিলাম মার সঙ্গেই দেখা করে ও বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। চোখে জল। নীল রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে!

কিন্তু তা না। সাদা কাঠের গেট-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক চিৎকার করছিল। হ্যাট পরা! সাহেব মানুষ। যেন এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরছে কি এখন বাইরে যাবে।

তা অত সব চিন্তা করার সময় ছিল না।

আমি কথা শুনছিলাম দুজনার।

ট্যাক্সিওয়ালাদের দাঁড় করিয়ে আপনারা যেমন কথাবার্তা বলেন।

'বাড়িতে আর কোনোদিন তোমাকে দেখলে আমি ঠিক গুলি করব, চিত্রা।'

'আমার গ্রাসাচ্ছাদনের যতদিন না সুব্যবস্থা হয় তদ্দিন আমাকে আসতে হবে।'

'না চরিত্রহীন স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিতে আমি বাধ্য নই।'

'বেশ তাহলে আমি কোর্টে যাব।'

'হ্যাঁ, তাই যাও আমি তাই চাই। একটা প্রস্টিটিউট এসে মোকদ্দমা করে মহীতোষ রায়ের কাছ থেকে খোরপোশ আদায় করবে। বেশ তো, তাই একবার চেষ্টা কর।'

বলে মহীতোষ রায়, সেই হ্যাটকোট পরা ভদ্রলোক সযত্নে কাঠের গেটটায় একটা তালা পরিয়ে দিয়ে গট্ গট্ করে ভিতরে চলে গেলেন।

চিত্রা ঘুরে এসে আমার গাড়ির কাছে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিতে ভিতরে ঢুকল। 'চালাও।'

এ সময়টা আমরা বিশেষ কথাবার্তা বলি না। কিন্তু তবু স্টার্ট দেওয়ার পর আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নীল রুমাল দিয়ে চোখটা এখনো টিপে আছে কি না।

'এই ট্যাক্সিওয়ালা।'

খানিকটা অগ্রসর হবার পর, ও আমায় আস্তে ডাকল। ঘাড় ঘুরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। রুমাল সরে গেছে। চোখের কোণ শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে আছে।'

'তুমি তো দাঁড়িয়েছিলে কাছে, কথাগুলো শুনলে?'

কথা বললাম না। সামনে এবার একপাল মোষ। রাস্তাটা কালো হয়ে গেছে।

'ও আমাকে গুলি করে মারবে।'

যেন কিছুই হয়নি, এসব কথার কোনো দাম নেই, এরকম একটা ভান সময় সময় আমাদের করতে হয়। গাড়িটা একেবারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অল্প হাসলাম: 'ও কিছু না। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। দু'দিনেই মিটে যাবে।'

বললাম— বলতে হয় আমাদের এসব।

কিন্তু দেখলাম সে কথায় বউটির কান নেই। একদৃষ্টে রাস্তার ধারের একটা বাদাম গাছের গুড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে কী ভাবছে। জায়গাটাও নির্জন।

মোষেরা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

'না মিটবে না, এ ঝগড়া মিটবার নয় তা সে-ও জানে আমিও জানি। তেমনি বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্পষ্ট ধরা গলায় ও যেন নিজের মনে কথাগুলো বলল, তারপর হঠাৎ এক সময় মুখটা ফিরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল।

'ট্যাক্সিওয়ালা!'

'কী, বলুন।'

'ও আমায় ঘৃণা করে। কিন্তু আমিও যে ওকে ঘৃণা করি তা কি সে বোঝে না?'

আমি হাসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না। মেয়েটির গলার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত শব্দ হতে শুনলাম যে চমকে উঠলাম।

'গুলি করবে, সামান্য ক'টা টাকা চাইতে গেছি বলে তোমার সামনে, একজন ট্যাক্সিওয়ালার সামনে আমাকে অপমান করল, উঃ, কিন্তু, কিন্তু— সে কী মনে করে—'

আমি হতভম্ব হয়ে ওর কাণ্ড দেখলাম।

'কোথায় গুলি করবে, এখানে এই বুকে, এই বুকের মাংস ঝাঁজরা করে দেবে মহীতোষ!' উপেক্ষার হাসি হেসে দ্রুত ব্যস্ত আঙুলে ব্লাউজের সব ক'টা হুক ও খুলে ফেলল। 'হ্যাঁ, তোমায় দেখাচ্ছি, তোমার সামনে অপমান করল কি না, তুমি দেখে রাখ, আমার এই বুক লক্ষ টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা রাখে কিনা— সামান্য ক'টা টাকা, সামান্য ক'টা — উঃ, এত অপমান!'

এ-ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে আমার হয়নি। কিন্তু তা না হলেও বিমূঢ় বা বিব্রত হওয়ার পরিবর্তে শরীরটাকে শক্ত কঠিন করে আমি ইঞ্জিনের দিকে ঘুরে বসার উপক্রম করতে ও আমার হাত চেপে ধরল। এবার বিব্রত হয়ে পড়লাম। ব্লাউজের মুখটা হা করে আছে। নিশ্বাসের সঙ্গে দুটো পেশি শক্ত হয়ে উঠে আবার জেলির মত নরম হয়ে যাচ্ছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ততক্ষণে ও আমার হাতের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। গরম জল টের পেলাম। কান্নার ঠমকে সেই সুন্দর র‍্যাঁদা করা পিঠ অনেকবার উঠল নামল।

কিন্তু তা দেখবার সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই আমার ছিল না। তিক্ত গলায় বললাম, 'তা অত ঘৃণা যখন, ওখানে গিয়েই বা কাজ ছিল কী—' বলছিলাম, কিন্তু এমন অস্পষ্টভাবে কথাটা মুখ থেকে বেরোল যে ও শুনল বলে মনে হল না।

হ্যাঁচকা টান মেরে হাতটা এবার ছাড়িয়ে নিয়ে মোটা গলায় বললাম, 'ভালো কথা, এখন আপনি কোথায় যাচ্ছেন কিছু বলছেন না তো, সেই হরীতকী বাগান লেনের ঠিকানায় কি ট্যাক্সি—'

আমার কথা শেষ হবার আগে ও চোখে নীল রুমাল গুঁজে মাথা নাড়ল। তারপর রুমাল সরিয়ে নিয়ে অল্প হেসে বলল, 'বেশ্যার আবার ঠিকানা কী, ট্যাক্সিওয়ালা।'

আপনারা ভাবছেন সেই মদির হাসি দেখে আমার বুকের ভিতরটা তির তির করে উঠবে, কিন্তু তা হয় না, আমরা হতে দিই না। তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষে আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলাম। এবং মুখের ওপর সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'সঙ্গে পয়সাকড়ি কিছু আছে কি, ট্যাক্সিভাড়া দিতে পারবে?'

'না।'

'তবে এক্ষুনি নেমে পড়।' কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠে আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে দিই। আর আমার মুখের দিকে তাকায়নি, ঘাড় নিচু করে ও গাড়ি থেকে নেমে গেল। একবারও সেদিকে না তাকিয়ে আমি জোরে গাড়ি চালিয়ে সার্কুলার রোডে উঠে এলাম। তেল না, জল, তাই ট্রাউজারে হাতটা ঘষে তা মুছে ফেলতে অসুবিধা হল না।



মহাকাব্য

প্রতিভা বসু

লতা যখন এখানে এসে পৌঁছাল তার বয়েস ছিল ষোলো, এখন বাইশ। এই ছয় বছরে তার শরীর, মন দুইই নিজের থেকে কেমন করে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায় সে বিদ্যা সে অর্জন করেছে। তার বালিকাজীবন কেটেছে পূর্ববাংলার এক অখ্যাত গ্রামে, কিশোরী হতে হতে চলে এসেছে ঢাকা শহরে। যৌবনে পদার্পণ করতে করতেই এক সর্বনাশা স্রোতের বেগ ভাসিয়ে এনেছে এখানে এই বাড়িতে, যে বাড়ির প্রত্যেকটি মেয়েরই সর্বময়ী কর্ত্রী মানদামাসি। লতা পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য উন্মূল মনুষ্যের আর একটি হতভাগিনী হিন্দু কন্যা। বঙ্গভঙ্গের পরে যখন তারা পালাতে বাধ্য হয়েছিল, রওনা হয়েছিল সব একসঙ্গেই। গ্রাম থেকে চলে আসা দাদু, ঠাকুমা, ঢাকা শহরে বাস করা মা, বাবা, ছোটো ভাই সবাই রাত্রির অন্ধকারে আরো অনেক মানুষের দলে মিশে জল, জঙ্গল, সাপ, বাঘ কিছুরই কোনো পরোয়া না করে শুধু ছুটছিল, আর ছুটছিল। ছুটতে ছুটতে কে যে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল পড়ে থাকছিল, ডুবে মরলি, সাপে কাটছিল কারুরই সেদিকে তাকাবার অবসর ছিল না। কেবল ছুটতে হবে, এ দেশ ছাড়তে হবে, তারপর আবার যেখানে নিরাপদ মাটি পায় সেখানে গিয়ে পা রেখে বুঝতে হবে তারা কতটা পরিশ্রান্ত, কে কাকে হারিয়েছে বা হারায় নি, কে কতটুকু সম্বল গুঁজে আনতে পেরেছে কোমরের গুঁজিতে অথবা এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

যখন ভোর হল, রাতের অন্ধকার কাটল, তাদের অন্ধকারও কাটল। নিরাপদ মাটিতে এসে পা রেখে সব থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কে আছে আর কে নেই। লতা দেখল বাবা আর ঠাকুমা হারিয়ে গেছেন, মা আর ছোটো ভাইকে নিয়ে সে আছে। কয়েকদিন ঝড়জল রোদ মাথায় নিয়ে কোনো একটা স্টেশনের ধারেই পড়ে থাকতে হল, তারপর মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে বাসস্থান নির্মাণ করে দিল কোনো সেবাসংঘ। যৎসামান্য হলেও কিছু আহার্যও জুটল তাদের কাছ থেকে। শোনা গেল শীঘ্রই সরকার থেকে ভালো ব্যবস্থা করা হবে। কোথায় পাঠানো হবে।

লতারা এর পূর্বে কোনোদিন কলকাতা আসে নি। কিন্তু জানে মায়ের এক কাকা কলকাতাতেই থাকেন। তাদের ঠিকানাও মায়ের জানা ছিল। সুতরাং শোক-তোপ ভুলে তিনি কীভাবে কোন পথে কলকাতা যাওয়া যায় এর ওর তার কাছে সেই খবরটাই নিতে লাগলেন। একটি পরোপকারী ছেলে এসে যেচে বলল, কলকাতা যেতে চান? ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আমি কাল যাব।

মা বললেন, 'আচ্ছা বলতে পার শেয়ালদা স্টেশন থেকে এই জায়গায় কীভাবে যাওয়া যায়?'

ছেলেটি বলল, 'কেন পারব না? আপনাদের আমি সেখানকার বাসে বসিয়ে দেব। বাড়ির নম্বর জানেন তো? ঠিক কোথায় তা জানেন তো?'

মাকে ইতস্তত করতে দেখে ছেলেটি বলল, 'ঠিক আছে, আবার ঠিকানাটা বলুন। আমি বুঝে নিয়ে আপনাকে বুঝিয়ে দেব।' মা ঠিকানাটা বলতে ঠিকই সে বুঝিয়ে দিয়েছিল এবং তারাও ঠিক জায়গাতেই নেমেছিল।

দুঃখে দৈন্যে হতাশায় রিফিউজিদের বোধহয় একটা আলাদা চেহারা হয়ে যায়, যা দেখেই লোকে বুঝতে পারে তারা রিফিউজি। একটি লোক এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা কি পূর্ব বাংলার লোক?'

মা বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সম্ভবত এই প্রথম কলকাতা এলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো বাড়ি খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ বাবা, এই তার ঠিকানা।'

লোকটি বলল, 'আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বাড়িটা।' সত্যি সে দেখিয়ে দিল, মা অনেক ধন্যবাদ দিলেন। লোকটি বলল, 'এ আবার একটা ধন্যবাদের বিষয় নাকি? আমিও এই কাছাকাছিই থাকি, আশা করি আবার দেখা হবে।' নমস্কার করে চলে গেল সে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতেই মায়ের কাকা কাকিমা যে রকম চমকে উঠলেন, তা দেখেই তার আর তার মায়ের বুক হিম হয়ে গেল। নিরুত্তাপ গলায় কাকিমা বললেন, 'এ কি, তোমরা? তোমরা কোথা থেকে এলে?'

মা কেঁদে ফেললেন, 'আর কোথা থেকে? দেখেই তো বোধহয় বুঝতে পেরেছ।' কাকিমা বললেন, 'কলকাতার বাড়ি, দেখছ তো দু'খানা কামরা নিয়ে থাকা। এখানে কোথায় বা তোমরা থাকবে, কোথায় বা আমরা থাকব।'

মা আর পারলেন না, বসে পড়লেন সেখানে। সাত বছর বয়সের ছোটো ভাইটা আর্তস্বরে বলে উঠল, 'মা আমি আর থাকতে পারছি না, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।' শুধু লতাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'অন্তত এক সপ্তাহের মতো থাকতে জায়গা দিন, তারপর চলে যাব।'

মায়ের কাকা-কাকিমা এতক্ষণে লতার দিকে ভালো করে তাকালেন। সুষম সুন্দর স্বাস্থ্য, ফর্সা রঙ, না-আঁচড়ানো মাথায় একরাশ ঘন চুল, পরিপূর্ণ যৌবনে এক ঢাল লাবণ্যের বন্যা।

কাকিমা সামান্য তাকিয়ে দেখে বললেন, 'কোথায় যাবে?'

'যেখানে হয়। কোথাও কোনো বাড়ির রান্না করা, বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, আশা করি আমাদের মা মেয়ের ভাইকে নিয়ে তাতেই চলে যাবে।'

'তোমরা ঝিয়ের কাজ করবে?'

'উপায় কী?'

'তুমি কিছু লেখাপড়া শিখেছ?'

'আমি ক্লাশ টেনে পড়তাম, পরীক্ষা সামনে রেখেই পালাতে হয়েছে।'

কাকা বললেন, 'আয় তোরা ঘরে আয়, হাত মুখ ধো, কিছু খা, তারপর দেখা যাক কী করা যায়।'

রাত্রে শুয়ে মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে মা বললেন, 'সত্যিই কি আমরা শেষে বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ করব?'

লতা বলল, 'দোষ কী? সেটাও তো একটা চাকরিই?'

মা আর কথা বললেন না, মেয়েই আবার বলল, 'এই অসম্মানের আশ্রয় থেকেও কি সেটা খারাপ?'

মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন।

দিন তিনেক বাদে লতা রাস্তায় বেরুল, একটু ঘোরাফেরা করে আশপাশটা চিনতে চেষ্টা করল। বাঁক ফিরতেই দেখা হয়ে গেল সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে যে তাদের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছিল। ভদ্রলোকটি খুশি হয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'ভালো আছেন?'

লতা বলল, 'আপনি ভালো আছেন?'

'এই বাজারে আর ভালো থাকা —'

'আচ্ছা শুনুন —'

'বলুন।'

লতা ইতস্তত করে বলল, 'মানে বলছিলাম যে আমি তো এখানকার কিছুই চিনি না, সামান্য লেখাপড়া জানি, যদি বাচ্চাদের পড়াবার জন্য দু'একটা টিউশনি পাই—'

'টিউশনি? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কদ্দুর পর্যন্ত আপনি পড়াশুনো করেছেন?'

'ক্লাস টেন। আমাদের টেস্টও হয়ে গিয়েছিল, আমি থার্ড হয়েছিলাম। মনে মনে আশা করেছিলাম ফার্স্ট ডিভিশনে যাবই। কিন্তু তার মধ্যেই তো এই ঘটনা।'

'সত্যি কী ঘটে! যাই হোক এই মুহূর্তে দু'টো বাচ্চাকে পড়াবার কাজ তো আমি দিতেই পারব, অন্য একটি চাকরির খোঁজও আমার কাছে আছে, সেটাও চেষ্টা করলে হয়ে যেতে পারে।'

'ইস্! তা হলে আমার যে কী উপকার হয়।'

'উপকারের কথা বলছেন কেন? আপনাদের জন্য কিছু করা তো আমাদের কর্তব্য। সে কর্তব্য আর আমরা করি কোথায়? সব মানুষই এখন যার যার ধান্দায় ব্যস্ত।'

'তবে আমি কবে সেই টিউশনিটা পাব?' অন্য কোনো কথায় আর মন দিতে পারছিল না লতা।

লোকটি একটু চিন্তা করে বলল, 'আমি বরং আজ একটু জেনে নি প্রকৃতই তাঁরা চান কিনা, আর সেই সঙ্গে মাইনের কথাটাও জেনে নেব।'

'তাহলে কাল আমি কখন আপনার জন্য অপেক্ষা করব?'

'এক কাজ করুন —' থেমে থেমে চোখ কুঁচকে বলল, 'দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটের মধ্যে যদি হয় তবে কি কোনো অসুবিধে আছে?' লতা সাগ্রহে বলল, 'মোটেই না। আপনি আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়ালেই আমি বেরিয়ে আসব।'

'আমি আর বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চাই না। একটা ব্যবসা করি তো? ওই সময়টায় গাড়ি পাই টিফিনে বেরুবার জন্য। সেই গাড়ি নিয়ে আর গলিতে ঢুকব না। গলিটা পেরিয়ে যদি বড়ো রাস্তার মুখটাতে এসে দাঁড়ান, আমি টুক করে তুলে নেব। আপনাকে সেখানে নামিয়ে আমি আবার চলে যাব কাজের জায়গায়। কাল শনিবার ছুটি করে নেব। আপনি ততক্ষণ তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতেই ফিরে এসে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। তবে এ নিয়ে আজই বাড়িতে বলাবলি করবেন না। শেষে যদি না হয়? আমি ধরেই নিচ্ছি হবে, হলে আমি আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করে কিন্তু মিষ্টি খেয়ে আসব।'

লতা হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

দুই

কলকাতার উত্তর প্রান্তে কোনো একটা অন্ধ গলিতে সামনে টানা একটি বারান্দাওয়ালা একতলা বাড়ি। উমাপতি সরখেল সেই গলিতে ঢুকে একেবারে ভিতরের উঠোনে চলে এল। মানদা সবে খাওয়া শেষ করে থালা হাতে নিয়ে কলতলা যাচ্ছিল। উমাপতিকে দেখে বলল, 'বাবুর আজ এই অসময়ে উদয়? ব্যাপারটা কী?'

উমাপতি হেসে বলল, 'তোকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করল মাইরি।' চোখ মটকে মানদা বলল, 'তাই নাকি?'

'তাছাড়া আর কী বল? সত্যি তোকে যে কত ভালোবাসি সে কথা আর বোঝানো গেল না।'

'যাক। খোস্‌খবরের ঝুটাও ভালো। এখন বলো দেখি চাঁদু কী উদ্দেশ্যে আগমন?'

'আমি কি কেবল উদ্দেশ্য নিয়েই চলাফেরা করি? যা যা মুখ ধুয়ে আয়, কথা আছে।'

মানদা মুখ ধুতে গেল। উমাপতি সরখেল মানদার ঘরে ঢুকে তার বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে পা নাচাতে লাগল। মানদা মুখ ধুয়ে, বাসন ধুয়ে, মেঝেতে বসে চৌকির তলা থেকে পানের ডাবর বার করে পান সাজাতে সাজাতে বলল, 'বল, কী তোমার কথা।' পা নাচাতে নাচাতে উমাপতি গানও ধরেছিল 'কাননে কাননে তোমারি সন্ধানে বেড়াব দেখাটি পাব না আঁ আঁ আঁ।' সুপুরি কুচোতে কুচোতে হাসিমুখে মানদা বলল, 'পেয়েছ নাকি?' সরখেল গান থামিয়ে বলল, 'পান দে আগে। সাদা পাতা দিয়ে খুব ভালো করে সাজা পানটা।'

'আহ্ খুব যে বাবুয়ানি দেখাচ্ছ। সত্যি তোমার মতলবটা কী বলে ফ্যালো তো। আমি কিন্তু আজ একটা পয়সাও দিতে পারব না।' পান সাজিয়ে হাত এগিয়ে ধরল মানদা।

উমাপতি হাঁ করে বলল, 'মুখে দিয়ে দে—' মুখে দিতে গিয়ে একটু নিচু হতেই খানিকটা অসভ্যতা করে নিয়ে উমাপতি বলল, 'সত্যি মাইরি তোর কাছে একটা যুবতিও খাপ খুলতে পারবে না।'

'খোসামোদি কথা ছাড়ো, আসল কথাটা বলো।'

'অবশ্য আমিও কম যাই না। তোকে কাছে দেখলে, চোখ ছুঁয়ে বলছি, আমারো যৌবন যেন উথলে ওঠে। আয় না একবার কাছে, আয়—'

খ্যা খ্যা করে মানদা বলল, 'আমি কি তোমার বিয়ে-করা ইস্তিরি না কি, যে হুকুম করলেই কাছে যেতে হবে?'

উমাপতি হাসল, 'ইস্তিরি নোস বলেই তো মাইরি তোর উপর এত টান।'

'কী বলবে বলো, এখন আমি শোব। দুপুরে না ঘুমোলে আমার শরীর খারাপ হয়।'

'আমি কি বারণ করছি? আমি তো সেজন্যই ডাকছি।'

'তুমিই তো সারা বিছানা জুড়ে শুয়ে আছ, আমি শোব কোথায়?'

উমাপতি উঠে বসল, 'দ্যাখ মানি, আজ সাত বছর তোর দালালি করছি, তুই বড়োলোক হয়ে গেলি। আমি হতভাগা যে কে সেই পড়ে আছি।'

'ঘ্যানর ঘ্যানর না করে কী বলতে এসেছ তাই বল।'

'তোর বোর্ডিংয়ে একটা ভালো ঘর ফাঁকা আছে তো?'

'আমার বোর্ডিং? হি হি হি।' হাসতে হাসতে গড়িয়ে গেল মানদা, তারপর বলল, 'তা হলে তোমার বঁড়শিতে সেই সেরা পোনাটা উঠল না কি?'

'তাই তো মনে হয়।'

'আবার মনে হয় কেন বলছ?' দুই চোখে বেড়ালের লোভ নিয়ে বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকল মানদা।

এই ব্যবসা মানদা তার মায়ের থেকে পেয়েছে। শুনেছে তার সুন্দরী দিদিমা আগে ভদ্রলোকের মেয়েই ছিল। বালিকা বয়সেই বিয়ে হয়, বালিকা বয়সেই বিধবা হয়। যুবতি হতে হতে আশপাশের কোনো একটি ছেলের সঙ্গে ছাদে ছাদে প্রেম হয়েছিল, সেই ছেলেটির সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল কিন্তু ছেলেটি তাকে বিবাহ না করে যথেষ্ট ভোগ করে এই নরকে এনে ঢুকিয়ে দেয়। এই নরকেই মায়ের জন্ম, এই নরকেই তার জন্ম। এই উমাপতি সরখেল তার দালাল হলেও তার উপরেই একটা টান আছে মানদার। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু নিজের শরীর সে বিশেষ খাটায় নি, মেয়েরা খেটেই যা দেয় তাইতেই তার বেশ রোজগার হয়। বাড়িটা পুরোনো কিন্তু মা এটা কিনেই নিয়েছিলেন। সুতরাং ভাড়াও লাগে না। বছর সাতেক হল বলতে গেলে সে সরখেলকেই একমাত্র পুরুষ হিসেবে মধ্যে মধ্যে গ্রহণ করে।

উমাপতি বলল, 'তোর স্বপ্না মরে গিয়ে তোর যত শোক হয়েছিল, এবার বোধ হয় সেই শোক সুদে আসলে সুখ হয়ে উঠে আসবে।'

'সত্য বলছ?'

'নয়তো কী?'

হঠাৎ গলার স্বর বদলে মানদা বলল, 'জান উমাপতি, এই ব্যবসাটা আমার আজকাল ভালো লাগে না। করে আসছি তিন পুরুষ ধরে যেন সবই একটি অভ্যাসে করি।' পিচ করে জানালা দিয়ে পানের পিক্‌ ফেলে উমাপতি বলল, 'তাহলে তোর কী ইচ্ছে করে?'

'যে মেয়েগুলো আগাগোড়াই এই পেশাতে আছে তাদের কথা আলাদা। তারা মনে হয় ভালোই আছে। কিন্তু যাদের মিথ্যে বলে ধরে এনে এই অন্ধকূপে ঢুকিয়ে দি, আর তারা নিরুপায় হয়ে কেঁদে বুক ভাসায়। মাঝে মাঝে তাদের জন্য আমার খুব কষ্ট হয়।'

'লেব্বাবা, এ যে দেখি সাতখোপ কবুতর খেয়ে বিড়াল বসেছে তপস্বী হয়ে। পঁয়ত্রিশ বছর হতেই তো মাসি সেজেছিস এখন আবার তাতেও শানাচ্ছে না,'বুড়ি বেশ্যা হল সতী, তুলসীতলায় দিয়ে বাতি। হাহ্ হাহ্‌হা—' মানদা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'তা হলে তোমার সাতকেজি পোনাটাকে তুমি কখন আনবে?'

'আর কি দরকার আছে?'

'কেন থাকবে না?'

'যাক নিশ্চিন্ত হলাম। দে আর একটা পান দে, উঠি।'

'অ্যাত তাড়া কিসের?'

'তুই এখন শুবি, ঘুমোবি, না ঘুমোলে শরীর খারাপ হবে, কত সাত সতেরো কথা তো শুনিয়ে দিলি, এরপর কি তোর মুড়োঝাটার বাড়ি খেয়ে বাড়ি যাব?'

'আচ্ছা সরখেল—'

'বল—'

'তোমার তো স্ত্রী মরে গিয়ে বেঁচেছে, তোমার আর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না?'

'কেন করবে? তোর কাছেই তো আমি সব পাই।'

'কিন্তু আমি তো খারাপ মেয়ে, আমাকে নিয়ে তো আর ঘর-সংসার করতে পারবে না।'

'ঘর-সংসার করে হবেটা কী শুনি?'

'ঘর সংসার যদি কর, আর আমাকে যদি ভালোবাসো, তবে কি আমাকে বিয়ে করতে পার?'

'আজ কী হয়েছে তোর বল তো?'

'না, কিছু না, এবার এসো তুমি।'

উমাপতি সরখেল উঠল, মানদা ঘরের দরজা বন্ধ করল।

কিন্তু বেলা আর বেশি নেই। মেয়েগুলোর তো এখুনি সাজ সাজ রব শুরু হবে। মানদা থাকে একেবারে একটেরে একটা ঘরে। বেশ আলাদা। অন্য ঘরগুলো সব ব্যারাকের মতো খোপ খোপ কাটা। অবশ্য তার মধ্যেও আবার তফাত আছে কিছু। খানতিনেক ঘরবিশিষ্ট লোকের জন্য আছে। সে সব ঘর যে মেয়েকে দেওয়া হয়, সে-ও অবশ্য বেশ বিশেষ বলে পরিচিত থাকে। শুধু দেখতেই যে সুন্দরী তা নয়, কিছুটা লেখাপড়া জানে, গান জানে, কথাবার্তায় বেশ চটুল। উমাপতি সরখেল যে কেবলমাত্র মেয়েই আনে তা নয়, ভালো ভালো বাবুও আনে। সত্যি উমাপতিটা তার জন্য অনেক করে। সুন্দরী স্বপ্নাকে উমাপতিই এনেছিল। বেশ ভলো রোজগার হচ্ছিল তাকে দিয়ে। দুম করে মরে গেল মেয়েটা। তা আবার কী রোগ! না কলেরা। অশান্তি কম গেল না। যা ছোঁয়াচে আবার কার হয় ঠিক কী। সবাই জল ফুটিয়ে খেয়েছে, আপন আপন ঘরে বসে থেকেছে। সেবাযত্ন বলতে তারা অবশ্য কিছু করে নি। করতে হয় নি। সরখেল তাকে হাসপাতালে দিয়ে এসেছিল। সেখানেই শেষ নিশ্বাস ছাড়ল। খুব কষ্ট হয়েছিল মানদার। শুধু স্বার্থের জন্যই নয়; এমনি। মেয়েটা কেন এইটুকু বয়সে চলে গেল শুধু সে কথা ভেবেই।

তার ঘরে যে ক'জন মেয়ে আছে স্বপ্নার মতো না হলেও মোটামুটি সবাই দেখতে ভালো। কিছুটা সভ্য-ভদ্রও। আর যারা এখানে আসে তারাও ভদ্রলোকই। মানদা শুয়ে শুয়ে ভাবল, যে লোকগুলো আসে তারা তো বাইরে গিয়ে মুখ মুছে যেমন ছিল তেমনি থাকে, তারা তো অপাঙ্‌ক্তেয় হয় না, তাদের তো ঘর সংসার করবার কোনো বাধা থাকে না, তবে মেয়েরা অচ্ছুৎ হয় কেন? কী দোষ মেয়েদের? মেয়েরা যা করে সবই অদের ভাগ্যবিপর্যয়। সবই বাধ্যতামূলক অথচ পুরুষ যা করে সব করে নিজেদের বদস্বভাবে। নিজের অসভ্যতায় অভদ্রতায়। পাপ করে পুরুষ, দুর্ভোগ হয় মেয়ে ... দোষ করবে পুরুষ, শাস্তি পাবে মেয়েরা। একি উদ্ভট নিয়ম? অন্যায় নিয়ম? মেয়েরা যেন পুরুষের খাদ্য, একবার মুখে দিলেই উচ্ছিষ্ট। সেই উচ্ছিষ্ট খাবার আর কেউ খেতে পারবে না। পুরুষটিও তো তবে উচ্ছিষ্ট।

এই গণিকাবৃত্তির পক্ষে এই দর্শন তেল আর জলের মতো। কোনোরকমেই মিশ খায় না। তবু যে মানদা এসব ভাবে তার সত্যি কোনো কারণ নেই। ছেলেবেলায় সবাই বলত তার মা নাকি তার দিদিমার চাইতে সুন্দরী ছিল। মাত্র একজনই বাবু ছিল তার। তাই জানত মানদা কার মেয়ে। ব্যবসাটা ব্যবসা হিসেবেই নিয়েছিল কিন্তু ভালোবাসাটাও ভালোবাসার নিয়মেই ঘটে গিয়েছিল। হয়তো সেজন্য মানদাকে তার মা কিছুটা প্রভাবিতও করেছে। মা নাকি সেই ভদ্রলোককে বলেছিলেন, 'মেয়ে তোমার, তুমি তাকে নিয়ে যাও এখান থেকে। ও যেন এই নরকে না পচে মরে।' ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে সামান্য হাসলেন। মানদার মা বলল, 'হাসলে কেন? কথাটা কি হাসবার? মেয়ে যেমন আমার, তোমারো তো তেমনি? তুমিও নিশ্চয় সন্তানের ভালো চাও।'

ভদ্রলোক বললেন, 'শুধু মেয়েকে কেন, তার মাকেও তো তাহলে নিয়ে যেতে পারি।'

'নাও নাও, আমাকেও নাও তুমি। তোমাকে ভালোবেসে এই গণিকাগৃহে বাস করা আমার কাছে প্রতিদিনের মৃত্যুযন্ত্রণা।'

ভদ্রলোক কাছে টেনে নিয়ে কাম নিবৃত্তি করতে করতে বলল, 'গণিকা বলেই তো এত আকর্ষণ' সেই একই কথা। সরখেল যা বলে, 'ঘরে আমার সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী আছে, পুত্র কন্যা আছে, চারবিঘা জুড়ে পৈতৃক অট্টালিকা আছে, তার উপরে আমি একজন রাজনৈতিক নেতা, তবু যে আসি, গণিকা বলেই আসি, গণিকার আকর্ষণ অন্যরকম।'

'কিন্তু আমি তো সেই অর্থে গণিকা নই।'

'গণিকা গণিকাই, তার একটাই অর্থ, দুটো নয়।'

কথা শুনে মায়ের ভালোবাসা মাথায় উঠে গিয়েছিল। উদ্ভিন্নযৌবনাবস্থা থেকে যে লোকটাকে এতদিন ভজনা করে এসেছে, তার উপর ঘৃণায় তার মরে যেতে ইচ্ছে করেছিল। এই মুখোশপরা লোকটাকে সে আর কোনোদিন প্রশ্রয় দেয় নি, অনেক বেশি টাকার মোহেও নয়। তার দেওয়া গয়নাগুলো পর্যন্ত সে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

পা মুছে বিছানায় গা দিল মানদা, তন্দ্রাচ্ছন্ন হল।

তিন

নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে এল লতা। মনে মনে তার কোনো উদ্বেগ ছিল না। সন্দেহ ছিল না, কিন্তু যে মুহূর্তে সে অপেক্ষারত গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল চেনা না জানে না এই লোকটির সঙ্গে সে যাচ্ছে

কেন? লোকটার চেহারার মধ্যে কোথাও একটা ভদ্র ছাপ নেই যদিও দেখতে খারাপ নয়, ব্যবহারও খারাপ নয়। কেমন একটা ভয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরেই দাঁড়িয়েছিল, পারল না। উমাপতি সরখেল অভিজ্ঞ লোক। কোন মাছ কীভাবে ধরতে হয় জানে। সঙ্গে সঙ্গে এক ধাক্কায় গাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখের মধ্যে একটা রুমাল চেপে ধরল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল লতা, গাড়ি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল উত্তর দিকে। কোথায় পড়ে রইল তার মা আর ভাই। যখন চৈতন্য ফিরে এল চারদিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবল, 'আমি কোথায়?' কিন্তু জবাব দেবার জন্য কেউ কাছে বসে ছিল।

সেই থেকে এই ছয় বছর সে এখানেই আছে। এই অসহ্য জীবন আর অসহ্য দুঃখের মধ্যে শুধু এইটুকুই আলো মানদা তাকে সুচক্ষে দেখে, মানুষটাও ভালো, মেয়ের মতোই ভালোবাসে। পালাবার অনেক চেষ্টা করেছিল. প্রথম দিকে। কিন্তু একবার এখানে ঢুকলে যে আর বেরুনো যায় না সেটা জানতে দেরি হয় নি। শরীর বিক্রি করার মধ্যেও যে কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন থাকে না তা জানতেও দেরি হয় নি। সমর্পণই এই পেশার শেষ কথা। হ্যাঁ, এখন সে সমর্পিত। অভ্যস্ত। নিজের সঙ্গে নিজেরই আপস হয়েছে, আর সব চাকরির মতো এটাকেও একটা চাকরির মতোই মেনে নিয়েছে।

সেদিন বৃষ্টি নেমেছিল, সারাদিন টিপটিপ চলছিল, রাত হতে হতে তার প্রচণ্ড জোর বেড়ে গেল। আর এরই মধ্যে ভিজে চুপচুপে হয়ে টলতে টলতে একটি শার্ট প্যান্ট পরা চশমা চোখে সুশ্রী যুবক ঘরে এসে হাজির। টালুমালু দৃষ্টিতে লতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি শোব্‌'

নিস্পৃহ গলায় লতা বলল, 'ওই তো বিছানা পাতা আছে। শুয়ে পড়ুন।'

ছেলেটি বলল, 'আমাকে ধরো, আমি দাঁড়াতে পারছি না।'

ভুরু কুঁচকে লতা বলল, 'ওসব করেন কেন, যার জন্য নিজে চলতে পারেন না। এই বৃষ্টির মধ্যে কেন এসেছেন?'

ছেলেটি সেখানে সেই মাটিতেই প্রথমে বসে পড়ল, তারপর শুয়ে পড়ে বলল, 'জল, জল দাও। জল দাও।'

রাগ আর বিরক্তি ভুলে এবার একটু নজর করে তাকাল লতা, বুঝতে পারল ছেলেটা মদ খেয়ে টলেনি, অসুস্থ।

অসুস্থ তো এখানে মরতে এল কেন?

কোণের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে বলল, 'এই যে জল নিন।'

শুয়ে শুয়েই হাঁ করল, লাল টকটকে চোখ মেলে তাকিয়ে অস্ফুট বলল, 'মাকে ডেকে দাও।'

লতা বলল, 'এখানে কারো মা থাকে না।'

'কে থাকে?'

'সে সব না জেনেই এসেছেন নাকি?'

'তবে দিদিকে ডাক।'

'দিদিও এখানে থাকে না।'

'তবে কে থাকে?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন কে আছে?'

'ও।' চোখ বুজে ফেলল। লতা কপালে হাত দিয়ে দেখল আগুনের মতো গরম। এই মানুষকে খাটে টেনে তোলা সহজ নয়, তার চেয়ে বেশি কঠিন ধাক্কা মেরে বার করে দেওয়া। হাজার হোক অসুস্থ তো বটে। আর সে-ও এখন পর্যন্ত এতটা পাষাণ হয়ে যেতে পারে নি। কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মেঝেতেই একটা বিছানা পেতে কোনোরকমে টেনে নিয়ে বিছানায় তুলল। ছেলেটা জ্বরের ঘোরে ছটফট করছিল, লতা একটা শাড়ি ছিঁড়ে নিয়ে মাথায় জলপট্টি দিল। তারপর বসে রইল চুপচাপ। হঠাৎ খেয়াল হল জামাটা তো চুপচুপে ভেজা, এত ভেজা জামা পরে থাকলে তো শেষে নিউমোনিয়া হবে। শার্টের বোতামগুলো খুলে অতি সন্তর্পণে ছাড়িয়ে দিল শার্টটা। পকেটে দুমড়ানো, অনেকগুলো টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা। প্যান্টটা তত ভেজা নয়। আর ভিজলেও নাইলনের প্যান্ট, জল নিজেই ঝরে যাবে। গায়ের উপর একটা বেডকাভার ছড়িয়ে দিল।

ছেলেটা মনে হয় আরাম পেল, সম্ভবত শীত করছিল। বলল, 'আঃ।' তারপর তার কোলের উপর একটা হাত ছড়িয়ে দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'তুমি খুব ভালো।'

লতা বুঝল প্রলাপ বকছে। কিন্তু এই ভীষণ জ্বর নিয়ে এরকম ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে ও এখানে এল কী করে? কেন এল? এত টাকাই বা ওর পকেটে কেন? কী আর করবে, বসে রইল মাথার কাছে। ভোরের দিকে জ্বরটা অনেক নেমে গেল। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ ধুতে গেল লতা। ফিরে এসে দেখল খালি গায়ে বসে আছে ছেলেটা। ইতি-উতি তাকাচ্ছে। তাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কে?'

লতা বলল, 'সারারাত যাকে জ্বালিয়েছেন।'

'কিন্তু এটা তো আমার বাড়ি নয়।'

'নয়ই তো।'

'তবে।'

'তবে কী, সেটা তো আপনার জানবার কথা। আমি কী করে বলব?'

'এটা কার বাড়ি?'

'এই ঘরটা আমার কিন্তু বাড়িটা অনেকের।'

'আমি তা হলে যাই?'

'কোথায়?'

'যেখানে আমার বাড়ি।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'তাই তো।'

'ঠিকানা কী?'

'ভুলে গেছি।'

'এখানে এলেন কেমন করে?'

'জানি না।'

'আপনার নাম কী?'

'সীমন্ত।'

'ও, নামটা ঠিক মনে রেখেছেন? সীমন্ত কী?'

'সীমন্ত চৌধুরী।'

'বাড়ি কোথায় বলতে পারছেন না, বাবার নাম বলতে পারছেন না, ঠিকানা বলতে পারছেন না তবে যাবেন কেমন করে?'

'তাই তো।'

'কেবল তাই তো তাই তো করছেন। এখন থাকবেন কোথায়?'

'তবে যাই।'

'জামা গায়ে দেবেন না?'

'ও। জামাটা কোথায়?'

'তা-ও মনে নেই?'

সীমন্ত নিজের শরীরটা নিজেই তাকিয়ে দেখল।

'জামাটা তাহলে দিন।'

'জামাটা আমার কাছে সে কথা আপনি জানলেন কী করে?'

'কেন জানব না। আপনি তো সারারাত বসেছিলেন আমার কাছে?'

'বাঃ, এই তো দেখছি কথা ফুটেছে। আর কিছু মনে পড়ছে না?'

হঠাৎ ছেলেটা সুর করে গেয়ে উঠল, 'প্রভাত আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে। এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।'

লতা বলল, 'আবার গানও জানেন দেখছি। এতগুলো লাইন মুখস্থ বলতে পারলেন আর বাড়ি কোথায়

বলতে পারছেন না?' শার্টটা কাছে এনে দিয়ে বলল, 'নিন। গায়ে দিয়ে নিন। ঠাণ্ডা লাগছে। আবার জ্বর বাড়িয়ে ফেললে তো আমারি মুশকিল।'

'কেন? আপনার মুশকিল কেন?'

'তো কী করব? সব তো ভুলে বসে আছেন এ অবস্থায় কোথায় পাঠাব আপনাকে?'

একটু চুপ করে থেকে বলল, এই লাইন ক'টা কেন মনে এল আপনার?'

সীমন্ত বলল, 'জানি না। বোধহয় আপনাকে দেখে। আপনার খুব দয়া।' উঠে দাঁড়াল, 'যাই?'

'কোথায়?'

'নিজের বাড়িটা খুঁজি।'

'এখন আমি চা করব, চা খাবেন না? আপাতত শুয়ে থাকুন।'

সীমন্ত তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়ল। বোঝা গেল তার দেহে কোনো বল ছিল না।

কোণের দিকে স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল বসাল লতা। টুকটাক অন্যান্য কাজও করতে লাগল। সেই সঙ্গে গানের লাইন কটা মনে মনে আওড়াতে লাগল। ছেলেটির যে মাথায় একটা গোলমাল আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। নইলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারছে না কেন কিন্তু গোলমালটা এমন নয় যে তাকে ঠিক পাগল বলা যায়।

এক সময়ে লতা ভেবেছিল, সে যখন বি.এ. পড়বে তখন সে সাইকোলজিতে অনার্স নেবে।

তাহলে এই রোগীটিকে দিয়ে বেশ হাত পাকানো যেত। ভাবতে ভাবতে চা আর টোস্ট নিয়ে সীমন্তর কাছে এসে বলল, 'এই নিন, চা নিন, ঘুমোলেন নাকি?'

সীমন্ত চোখ খুলে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'চা?'

লতা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা খেয়ে নিয়ে আমাকে বাধিত করুন, তারপর ধীরে ধীরে মনে করুন বাড়ির ঠিকানাটা কী?'

উঠে বসল সীমন্ত, হঠাৎ বলল, 'আমি দিল্লি থেকে এসেছি।'

'কবে এসেছেন?'

'আজ।'

'কখন?'

'রাজধানীতে সকালবেলা।'

'তারপর?'

'তারপর? তারপর কী?' চায়ে চুমুক দিল, 'আঃ! কী ভালো চা।'

'দিল্লিতেই থাকেন?'

'হ্যাঁ। না।'

'একবার বলেন, হ্যাঁ, একবার বলেন না, কোনটা ঠিক বলুন তো?'

'ওরা তো তাই বলল।'

'কারা?'

'দাদা, বউদি, বউদির মা—'

'কী বলল?'

'বউদির মা বললেন এ আপদ বিদায় কর।'

'সেসব কথা তো দেখছি বেশ মনে রেখেছেন। বাড়িটা ভুলে গেলেন কেমন করে?'

'জানি না।'

'বাড়িতে কে থাকে?'

'মা, বাবা, দিদি।'

'বাড়ির ঠিকানা যদি মনে না পড়ে কী করবেন তবে?'

'আমার স্যুটকেসটা কোথায়?'

'স্যুটকেস? স্যুটকেস তো এখানে আনেন নি।'

'তবে?'

'সেটা কি আমার জানবার কথা?'

'আমি তো কুলির মাথায় দিলুম।'

'আপনি এত ভুলে যান তবুও আপনার দাদা বউদি একা একা আপনাকে কী ভরসায় পাঠিয়ে দিলেন?'

সীমন্ত গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল, জবাব দিল না। খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ল। লতা ভেবে পেল না এই মানুষটাকে নিয়ে সে কী করবে। তার উপরে অসুস্থ। এমনি এমনি সুস্থ শরীরে এলে না হয় বার করে দেয়া যেত, জ্বর গায়ে ছেলেটাকে তাড়ায় কী করে? ভদ্রলোকের ছেলে, কী সুন্দর দেখতে, কী সুন্দর নাম? আর সবচেয়ে যেটা লতার মন ভোলালো, কতকাল পরে সত্যি সত্যি একটা সৎ চরিত্রের ভদ্রছেলেকে সে দেখল, যে ছেলে এটাকে গণিকালয় ভেবে আসে নি। তাকে গণিকা ভাবে নি। অসুস্থ ফুর্তির লোভে একা ঘরে একটি মেয়েকে দেখে, তার মনে কোনো কাম উদ্রেক হয় নি। সহসা নিজেকে লতার কেমন যেন ঝরঝরে লাগছিল। মনে হচ্ছিল আবার যেন সে একটা স্বাভাবিক জীবনের দরজা খুঁজে পেয়েছে।

চার

বিমলেন্দু চৌধুরী ব্যারিস্টার। সংসার ছোটো, একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, মেয়ে অধ্যাপিকা। ছেলে তার কাজের জায়গা কানপুরে থাকে। দিল্লিতে কী কাজে গিয়েছিল, কিছুদিন থাকতে হবে বলেই গিয়েছিল, তারপরে কলকাতা আসবে মা বাবার কাছে। লম্বা ছুটি পড়েছে একটা। এই পর্যন্তই তাঁরা জানেন। সকালে চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, একটা চিঠি এল। লিখেছে বড়োদার ছেলে মাধব। চিঠিটা পড়েই তাঁর চোখ বড়ো হয়ে গেল, চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'আভা, আভা।' আভা তাঁর স্ত্রীর নাম। স্বামীর এই ধরনের একটা বিপদের মতো ডাকের সুর শুনে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এলেন, 'কী! কী হয়েছে?' বিমলেন্দু মাথায় হাত দিয়ে বসে প্রায় কান্নার সুরে বললেন, 'এই দ্যাখো, মাধবের চিঠি দ্যাখো।'

শ্রীচরণেষু

মেজকাকা, দু'সপ্তাহ আগে ন' তারিখে সীমন্ত এখান থেকে কলকাতা যায়। আজ পর্যন্ত তার কোনো পৌঁছসংবাদ না পেয়ে বিশেষ চিন্তিত আছি। চিন্তার একটা বড়ো কারণ ও যেন কেমন এলোমেলো কথা বলে। সব কথা ভুলে যায়। আমি ওকে একটা রাজধানীর টিকিট কেটে বসিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। আমি ধরেই নিচ্ছি সে ঠিকমতো গিয়ে পৌঁচেছে, তথাপি যে চিঠিটা লিখলাম তার কারণ আমার মনে হয় কোনোরকম শক পেয়ে, ওর মাথাটা ঠিক স্বাভাবিক নেই। আশা করব এতদিনে ওকে তোমরা ভালো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার একটা বন্দোবস্ত করতে পেরেছ এবং ও-ও ভালো হয়ে ওর কাজে গিয়ে জয়েন করেছে।

দেখতে দেখতে বাড়িতে একটা শোকের ছায়া নেমে এল। তারপর তারা তিনটি প্রাণী কী করল আর করল না, তার কোনো তালিকা নেই। পুলিশ আপিস থানা হাসপাতাল কানপুর দিল্লি মিসিং স্কোয়াড কিছু বাকি রাখল না। কোথাও পাওয়া গেল না ছেলেকে।

এদিকে এই দু'সপ্তাহ সীমন্ত লতার কাছেই আছে। জ্বর ছাড়তে তার সাতদিন কেটে গেল, ছাড়ে আবার আসে। ম্যালেরিয়ার মতো ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। লতা পরিচর্যা করে, সারাক্ষণ কথা বলে বলে জানতে চায় কী জন্য তার এই ভ্রান্তি। বর্তমানকে সে এখন বেশ ভালোভাবেই মনে রাখতে পারছে, বর্তমানের কাছে সে একান্তভাবেই একটা স্বাভাবিক মানুষ হয়ে গেছে। অতীতের কথাটা কিছুতেই মনে আনতে পারছে না। এই দু'সপ্তাহ লতার ঘরে কোনো পুরুষকেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মানদার মুখ ভার, আর বেশিদিন সে সহ্য করবে বলে মনে হয় না। লতা আত্মগোপন করে নি। করতে ইচ্ছে হয় নি এই মানুষটির কাছে। দু'তিন দিন বাদেই বলেছিল, 'আপনি কোথায় এসে উঠেছেন, তা কি আপনি জানেন?'

'কোথায় উঠেছি?'

'এটা একটা গণিকালয়।'

'কী!' কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না।

'গণিকা মানে জানেন?'

'জানি!'

'এটা তাদেরই বাড়ি। আমিও তাদের একজন।'

'না।'

'যা সত্য তাই বললাম আপনাকে।'

'কী সত্য?'

'আমিও সেই পেশারই মেয়ে।'

চুপ করে থেকে সীমন্ত বলল, 'আমি থাকতে আপনার খুব ক্ষতি হচ্ছে না?'

'লাভ-ক্ষতির বিচার করার কর্তা আমি নই।'

'আমি তো আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। তা হলে আমার চলে যাওয়া উচিত, তাই না?'

'উচিত অনুচিতেরও প্রশ্ন নয়। একটা গণিকালয়ে ঢুকে, একজন গণিকার ঘরে দিন যাপন, নিশ্চয়ই ঘৃণ্য বিষয়।'

'কাকে ঘৃণা?'

'আমাকে?'

'আপনাকে! কেন?'

'নিজের মনেই ভেবে দেখুন।'

'ভেবেছি।'

'কী ভেবেছেন?'

'আপনি খুব ভালো।'

'সজ্ঞানেও কি কোনোদিন এই কথাটা বলতে পারবেন?'

'কেন, এখন কি আমি অজ্ঞান?'

'এখন পর্যন্ত বাড়িব ঠিকানাটাই বলতে পারছেন না, পিতামাতা-দিদি সকলের নামই ভুলে গেছেন, জ্ঞানটা হল কোথায়?'

'ভুলে গেছি, না? কেন ভুললাম?'

'সে জন্য কষ্ট হয় না?'

'হয়। খুব হয়।'

'তবে?'

'আপনার নাম লতা।'

'কে বলল?'

'আপনাব ডায়েরিতে লেখা আছে।'

'ডায়েরিটা আপনি পড়েছেন নাকি?'

'খুব ইচ্ছে কবছিল। কিন্তু আপনার অনুমতি না হলে তো পড়া যায় না।'

'আমাব কয়েকটা কথাব জবাব দিন তো।'

'বলুন।'

'আপনি কি দিল্লিতেই থাকতেন?'

'না?'

'কোথা থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন?'

'ওই যে যেখানে আমার বন্ধু' —শিহরিত হল।

'বন্ধু কী?'

'গাড়ি থেকে টানল না?'

'কে টানল?'

'লতা—'

এই প্রথম সীমন্ত তাকে নাম ধরে সম্বোধন করল।

লতা তাকিয়ে থেকে বলল, 'কী?'

'আমি যদি কোনোদিন বাড়ি ফিরতে না পারি আমার কী হবে?'

'সেটা তো আমারো ভাবনা।'

'আমাকে রোজ খাটে শুতে দেন কেন?'

'অসুবিধে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'বিছানাটা কি শক্ত?'

'না।'

'তবে?'

'আপনার বাড়ি, আপনার ঘর, আর আমি রোজ খাটে শুই, আপনি মেঝেতে।'

'আমি চলে যাব।'

'কোথায়?'

'যেখানে হয়। কিন্তু আমার খুব ভয় করে।'

'কীসের ভয়?'

'উঃ আমি চিন্তা করতে পারি না। আমি ভাবতে পারি না। কিন্তু আমি দেখেছি, নিজের চোখে দেখেছি।'

'কী দেখেছেন?'

'জানি না। জানি না।'

'এখান থেকে চলে গেলে কখনো কি আমাকে মনে পড়বে আপনার?'

'শুধু আপনাকেই মনে পড়বে। আমার জগতে এই মুহূর্তে আপনি ছাড়া আর তো কেউ নেই।'

'আমি খুব স্বার্থপর।'

'কেন?'

'আপনি নিশ্চয়ই একদিন আবার আপনার পুরোনো জগৎ ফিরে পাবেন। সেটাই আমার প্রার্থনা হওয়া উচিত। কিন্তু যখনি ভাবি সেই জগতে আর আমার জায়গা হবে না তখুনি—' মুখ নিচু করল। সীমন্ত হেসে বলল, 'জায়গা হোক আর নাই হোক আপনার তো কোনো ক্ষতি নেই, ক'দিন জ্বালিয়ে গেলুম এই যা।'

'তাই কি মনে হয় আপনাব?'

'মনে তো মানুষের কত কথাই হয়। সব কথা কি বলা যায়?'

'যায় না, না?'

'না।'

'আমি যদি গণিকা না হতাম তবে বোধহয় বলা যেত।'

'ওই কথাটা বারে বারে বলেন কেন বলুন তো? আমি দুঃখ পাই।'

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে লতা এটা-ওটা করতে লাগল। চোখ ভরে জল এল। কী একটা পবিচয় সে বহন করছে! কত লজ্জা, কত দুঃখ! ছি।

সীমন্ত বলল, 'শুনুন, আমি একটা কথা ভেবেছি।'

'বলুন।'

'আমি আজই চলে যাব এখান থেকে।'

'তারপর?'

'আমার কোনো তারপর নেই। সবই গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।'

'সেই গভীর অন্ধকারে আপনাকে আমি কেমন করে ছেড়ে দেব?'

'আমার জন্য আপনার কষ্ট হয়?'

'একজন সুস্থ সবল মানুষ কীভাবে তার অতীত ভুলে গেল, তাতে কষ্ট না হবার মতো নির্মম বলে কি আমাকে মনে হয় আপনার?'

'না না ছি। আপনি আমার জন্য কত করেছেন, কত ক্ষতি হয়েছে, ওঃ হো এইমাত্র মনে পড়ল, আমার প্যান্টের পকেটে একটা মানিব্যাগ ছিল। আপনি কি দেখেছেন সেটা?'

'না তো।'

'আমার পাজামা পাঞ্জাবি কী দিয়ে কিনলেন?'

'আমার কাছে টাকা ছিল।'

সীমন্ত প্যান্টটা এনে তার পকেটে হাত দিয়েই দেখল ব্যাগটা যথাস্থানেই আছে। অবাক হয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য, না?'

'কেন?'

'কী রকম মনে পড়ল। আস্তে আস্তে তবে কি আমার সব কথাই মনে পড়বে?'

'নিশ্চয়।'

'আমি তবে বেরিয়ে পড়ি।'

'আজই?'

'এক্ষুনি। আপনি এই ব্যাগটা রেখে দিন।'

'কেন?'

'গচ্ছিত থাক। আমি জানি না কেন এত টাকা আমি এনেছিলাম। কিন্তু এনেছিলাম যে সেটা কেমন মনে পড়ে গেল।'

'এভাবেই সব ফিরে আসবে মনে কিন্তু ভুলবশত যে জীবন এখানে যাপন করে গেলেন সেটাই শুধু একটা শূন্যের অঙ্কে পরিণত হবে। সুতরাং এই গচ্ছিত ধন আমি রাখব কেমন করে?'

'আমি আপনাকে কোনোদিন ভুলব না।'

'ভুলবেন, আমি জানি ভুলবেন, শুধু আমিই একটা ক্ষণিক আলো দেখে আবার সব অন্ধকার দেখব। আরো অন্ধকার। আরো আরো।' খুব আস্তে লতার পিঠে হাত দিয়ে সীমন্ত বলল, 'একটা কথা মনে রাখবেন, শরীরে কোনো ময়লা জমলে তা ধুলেই পরিষ্কার হয়ে যায়,কিন্তু মনের ময়লা ধোবার কোনো ওষুধ নেই। আপনি আমার কাছে আপনিই, তার বাইরে কিছু নয়। আমাকে শান্তমনে বিদায় দিন।'

এখানে এ বাড়িতে কেউ খবরের কাগজ পড়ে না, শুধু লতাই কাগজ রাখে একটা। কেন রাখে জানে না। হয়তো ছেলেবেলা থেকে পড়েছে বলেই রাকে। কিন্তু না, সে কোনো খবরের দিকে তাকায় না। সে খোঁজে। মাকে ভাইকে খোঁজে। কিন্তু খুঁজে সে তাদের কোথায় পাবে? জানে সেটা, তবু প্রথমে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের পৃষ্ঠাগুলোই সে আঁতিপাতি করে দেখে। কেন যেন মনে হয় একদিন না একদিন সেই পৃষ্ঠাগুলোতেই পেয়ে যাবে সব। কিন্তু আজ আর তার কিছুই মনে হচ্ছিল না। শুধু একটা বিচ্ছেদ-বেদনায় আত্মহারা হয়ে পড়ছিল। রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে সীমন্ত আবার ঘুরে তাকাল। লতা উলটোদিকেমুখ ফিরিয়ে বসে আছে। সে বলল, 'আমি তবে যাই?'

লতা জবাব দিল না, ফিরেও তাকাল না। বারান্দা থেকে নেমে গেল সীমন্ত। কাগজওলা তাকে দেখে কাগজটা তার হাতেই দিল।

কাগজটা দিয়ে আসার জন্য যে আবার তাকে লতার কাছে যেতে হবে ভেবে খুব খুশি হলো মনটা। খুশিতে অনামনস্ক হয়ে পড়ার দরুনই বোধহয় হাত থেকে পড়ে গেল কাগজটা।

পৃষ্ঠাগুলো ছড়িয়ে গেল। নিচু হয়ে কুড়োতে গিয়েই বুকটা ধক্ করে উঠল। নিজের ছবিটা দেখে নিজেই তাজ্জব হয়ে গেল। ছবিটার তলায় লেখা সীমন্ত চৌধুরী, তার তলায় লেখা, ব্যারিস্টার বিমলেন্দু চৌধুরীর একমাত্র পুত্র, ইঞ্জিনিয়ার, কানপুরে আছে ন'মাস যাবৎ কোনো কর্মোপলক্ষে দিল্লি গিয়েছিল। মার্চ মাসের ১০ তারিখে রাজধানীতে কলকাতা এসে পৌঁছুবার কথা, কিন্তু অদ্যাবধি তার কোনো খবর নেই। দেখতে সুশ্রী বয়স ছাব্বিশ, স্বাস্থ্য ভালো, রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, ভুরুর উপরে একটা কাটা দাগ আছে। যদি কোনো দয়ালু ব্যক্তি তাকে দেখতে পেয়ে সন্ধান দেন কৃতজ্ঞ হব। ঠিকানা আয়রনসাইড রোড ৩৬/৮ নম্বর বাড়ি। ৫০০০০০ টাকা পুরস্কার।

এইবার সমস্ত ঘটনাটা সীমন্তর মনের উপরতলায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মনে পড়ে গেল কানপুর থেকে সে গাড়িতে দিল্লি যাচ্ছিল, সঙ্গে এক বন্ধু আর তার স্ত্রী, পথে কোনো এক নির্জন জায়গায় একটি মোটর সাইকেল গাড়ির গতি রোধ করে দাঁড়াল, তারপর গাড়ির পিছনে বসা তার বন্ধু এবং বন্ধুর স্ত্রীকে টেনে নামিয়ে সেখানেই কুপিয়ে মেরে ফেলল। গাড়ির ড্রাইভার এক মুহূর্ত দেরি না করে ফুলস্পিডে গাড়ি চালিয়ে ছুটল দিল্লির দিকে। সেই থেকেই ওই মর্মান্তিক দৃশ্যটা অবিশ্রান্ত তাকে হানা দিতে লাগল। একবিন্দু ঘুম হল না রাত্রিতে। তারপরে

দৃশ্যটা মুছে গেল। কেবল একটা ভয় ঘিরে থেকে সব ভুলিয়ে দিল। একেবারে সব। কলকাতা পৌঁছে সমস্তদিন ঘুরে ঘুরেও ঠিক বুঝতে পারল না কী করবে বা কোথায় যাবে। যখন ভীষণ বৃষ্টি নামল তখন। এই খোলা দরজা পেয়ে ঢুকে পড়ল এখানে। সবই ভবিতব্য। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এ পাড়ায় এসে এই মেয়েটির অক্লান্ত সেবা পাবে, ভালোবাসা পাবে— এই ছিল তার কপালে। সেও কি বাসে নি? বেসেছে। কিন্তু তার উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের সঙ্গে এই মেয়েকে সে কেমন করে জড়াবে! সে কথা ভেবেই নিজেকে ছিন্ন করে দরজার বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের যা নির্দেশ তা কি কখনো অমান্য করা যায়? দরজার পর্দা সরিয়ে আবার সে ঢুকে এল ঘরে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে লতা। সীমন্ত ডাকল, 'শুনুন।' চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল লতা। কান্নায়-ভেসে-যাওয়া মুখে আলো ফুটে উঠল। সীমন্ত বলল, ভেবে দেখলাম আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে না গেলে আমার অস্তিত্বের আর কোনো মানে থাকে না।'

'নেবেন! নিয়ে যাবেন আমাকে? এই নরক থেকে উদ্ধার করবেন আমাকে? আমার দুঃখিনী মা, আমার ছোটো ভাই—' আবার লতা কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল।

'কোথায় তারা?' মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিল সীমন্ত।

'আমি জানি না। কলকাতার কিছুই চিনি না আমি, এ জায়গাটা যে কোথায় তা-ও আমি বুঝি না।'

'তা হলে কী করে এলেন এখানে?'

'তাও আমি জানি না। একটি লোক আমাকে প্রাইভেট টিউশনি দেবে বলেছিল, আমি বিশ্বাস করে তার গাড়িতে উঠতে গিয়েও কেমন একটা ভয়ে ফিরে যাই ভাবছিলাম তক্ষুনি সে টেনে উঠিয়ে নিয়ে মুখে একটা রুমাল চাপা দিয়ে দিল যখন চোখ খুললাম দেখলাম এখানে এসে পৌঁছেছি।'

'হুঁ! চলুন যাই--'

'আমি? কিন্তু মানদা মাসি—'

'তার জন্য ভাববেন না। পুলিশই দেখবে তাকে। আজ যে আপনি আমার বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা উপহার পাবেন, ভাবছি সেটা আমরা আমাদের হানিমুনের জন্য খরচ করব।'

'হানিমুন? কার সঙ্গে? কীসের টাকা?'

'হানিমুনটা অবশ্যই আমার সঙ্গে।' সীমন্ত হাসল, চিকচিক করে উঠল চশমার কাচ। বলল, টাকাটা আমার বাবার।'

'আপনার সঙ্গে? আপনার বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবেন আমাকে? এসব আপনি কী বলছেন?'

'রোজ তো দেখি কাগজ খুলেই হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ দেখেন। এ ছবিটা দেখুন তো, চেনেন কিনা।'

ছবিটা দেখল লতা। নিচের লেখাগুলোও পড়ল। তার লাবণ্যমাখা বেদনার্দ্র মুখের টানাটানা দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। কেঁপে উঠে দু হাতে নিজেই নিজেকে জড়িয়ে ধরল। চোখে চোখ রেখে সীমন্ত বলল, 'উহুঁ, ওটা আমার প্রাপ্য।' লতার হাত দুটো সরিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে করতে বলল, 'ভাবী স্ত্রীকে কোর্টশিপ পিরিয়ডে এটুকু বোধহয় করা চলে, কী বলো?'



রাত্রি

নবেন্দু ঘোষ

টগর সাজিতে বসিল।

ঘণ্টাখানেক পূর্বে একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন, পুবের আর্দ্র বাতাসে একটু শীত বোধ হয়। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সময় হইয়াছে।

সময় হইয়াছে বৈকি। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ বরং একটু দেরি হইয়াছে, টগর আজ বেশিক্ষণ ঘুমাইয়াছে। পান্না আসিয়া বারদুয়েক তাহাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু সে উঠে নাই। হ্যাঁ, সময় হইয়াছে বৈকি।

বহুদিনের পুরাতন স্টোভের উপর চায়ের পাত্রটা চড়াইয়া দিয়া টগর সাজিতে বসিল।

সেই পুরাতন সাজ। সাত বৎসর প্রত্যহ সে একই ধরনের সাজ করিয়াছে। জড়ির পাড়ওয়ালা নীল শাড়ি, গিল্‌টি-করা গহনা, ললাটে একটি খয়েরের টিপ, চোখের কোণে কাজলের সূক্ষ্ম রেখা, পায়ে আলতার ঘন প্রলেপ, সস্তা পাউডার আর 'দিলবাহার' এসেন্স।

সাজসজ্জা শেষ হইলে টগর দেওয়ালে বিলম্বিত বড়ো দর্পণটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক আছে। নিত্যকার রাত্রিজাগরণে চোখের কোলে কালো ছায়া ঘন হইয়াছে, অলক্ষ্যে সময় তাহার ললাটে দুর্বোধ্য রেখায় কী যেন লিখিয়াছে, দেহ হইয়াছে ঈষৎ মেদবহুল, বক্ষ আর কটিদেশ। আগেকার মতো আকর্ষণীয় নয়, তবু চলিবে। এখনও আরও কিছুদিন চলিবে।

চায়ের জল টগ্‌বগ্‌ করিতেছে।

'আমায়ও এক কাপ দে ভাই' —মানদা আসিয়া দাঁড়াইল। মানদা প্রৌঢ়া, স্থূলাঙ্গী, মুখে বড়ো বড়ো বসন্তের দাগ, রংটা শ্যামবর্ণ। এককালে তাহার চেহারা ভালোই ছিল, আর ব্যবসাও চলিত ভালো, কিন্তু আজকাল—।

'বস ভাই' — টগর বলিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিছুক্ষণ পরে সে প্রশ্ন করিল, 'শশী কোথায় মানদা?'

মানদা ঠোঁট উলটাইল, 'সে হারামজাদার কি আর কোনো জ্ঞানগম্যি আছে—কাল রাত থেকেই তো উধাও।'

টগরকে একটু চিন্তিত বোধ হইল; 'আজ মুখপোড়া গেল কোথায় কে জানে।'

মানদা মুচকি হাসিয়া বলিল—'জানিস, হতভাগা তোকে ভালোবাসে?'

টগর হাসিল। ভালোবাসা! বহুদিন পূর্বেকার কথা—সুধীর নামক একটি সুদর্শন যুবক বিমলাকে ভালোবাসিত। সেই বিমলা আজ টগর হইয়াছে—আর সুধীর?

চায়ের কাপটা নামাইয়া রাখিয়া মানদা বলি, 'যাই ভাই, আমিও তৈরি হইগে।'

মানদা চলিয়া গেল। এখন আর তাহার সেদিন নাই, একটি লোকও তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় না, আর সকলের দাসীবৃত্তি করিয়াই সে আজকাল বাঁচিয়া আছে; তবুও অন্যান্য সকলের মতো সেও সাজিয়া গুজিয়া দ্বারপার্শ্বে দাঁড়ায়, পথগামী লোকদের প্রতি কটাক্ষ হানে, রসিকতা করে, অশ্লীল কথা বলে। রক্তের মধ্যে অভ্যাসটা যেন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

টগর বসিয়া রহিল। শশীর ভালোবাসা! এবার আর সে হাসিল না। ধীরে ধীরে তাহার দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া উঠিল, পাউডারে অবলিপ্ত ললাটের রেখাত্রয় আবার পরিস্ফুট হইল, চোখের কোণের কাজলের রেখার উপর একবিন্দু জল টলমল করিতে লাগিল। ভালোবাসা! সে কবেকার কথা—!

দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। মেঘলা দিনের আলো। সেই আলো যেন হঠাৎ অন্ধকারে পরিণত হয় আর সেই অন্ধকারের মধ্যে ছায়াছবির মতো কতকগুলি ছিন্নভিন্ন ছবি ভাসিয়া যায়, কতকগুলি পুরাতন কথা পুনর্জীবন লাভ করে।

সুধীর বলিল, 'বিমলা, তোমায় আমি ভালোবাসি।'

বিমলা লজ্জায় অধোবদন হইল।

বাহিরে সূর্য অস্ত গিয়াছে। আকাশের মেঘে মৃতসূর্যের শোণিত-চিহ্ন।

সুধীর বলিল, 'বিমলা, তুমি আমার'—

বিমলা বলিল, 'আর তুমি আমার।'

গলিতে ভিড় বাড়িতেছে। বিসর্পিল গলি।

গলির মোড়ে কানাইয়ের মাংসের দোকান। পুবের ঠাণ্ডা বাতাসে মাংসের তরকারির গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে।

সুধীরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ বিমলা।

সুধীর বলিল, 'বিমলা, চল —পালিয়ে যাই।'

বিমলা বলিল, 'চল'—

তাহার পর এক নগর। সেখানে স্বপ্নভঙ্গ। পাখি উড়িল। মাতৃত্বের ভারে বিমলাকে ভারাক্রান্ত করিয়া একদিন সুধীর অদৃশ্য হইল। তারপর নূতন নূতন লোলুপ মুখ আর ক্ষুধিত দৃষ্টির মাঝে একটি শিশুর কান্না শোনা গেল। তারপর -

'কী লো, গালে, হাত দিযে কী ভাব্‌ছিস, ভাই?'

চমক ভাঙিল। বুঁচি। সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিযাছে, গলির বাতিগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মানুষের ভিড় বাড়িয়াছে। তাহাদের হাসির শব্দ আর কোলাহল শোনা যায়।

'বলি কী ভাবছিস্ লা পোড়ারমুখী?'

টগর হাসিল—'তোর কথা বে বুঁচি।'

বুঁচি নিজের গোলমুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটাইয়া বলিল, 'যাঃ মাইরি—ইয়ার্কি করিস না। বল না ভাই—

কোন সে পুরুষশ্রেষ্ঠ হরিয়াছে
চিত্ত তব দেবেন্দ্রযোগ্য?—

বুঁচি কোনো থিয়েটারে একবার এক সখীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিল। তাহার অভিনয় প্রথমবারেই শেষবারে পর্যবসিত হইয়াছিল, যেহেতু সে স্টেজে নামিয়া একটি কথাও বলিতে পারে নাই, অনেক লোক দেখিযা সে ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু স্টেজে যে কথা তাহার বলা হয় নাই তাহা প্রায়ই বেশ সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়া মাঝে মাঝে টগব পান্না প্রভৃতিকে কারণে অকারণে শোনায়।

টগর হাসিল। বেশ মেয়ে এই বুঁচি।

বুঁচি আবার বলিল—'কী, বলি কোন মনচোরের কথা ভাবছিলে?'

মনচুরি! সে ভুল একবার হইয়াছিল। সে কবেকার কথা! তাহার পর 'পুরুষশ্রেষ্ঠ' নয়, বহু পুরুষ আসিয়াছে, নিত্য নূতন। বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ়। সুস্থকায় আর ব্যাধিগ্রস্ত। এখনও আসে, নিত্য তাহার চতুর্দিকে তাহারা ভিড় করে গুঞ্জনধ্বনি তোলে। টগরের নয়, বিমলার মন একবার চুরি গিয়াছিল বটে। কিন্তু সে হতভাগী তো আর বাঁচিয়া নাই।

'বুঁচি'—

'কী প্রাণেশ্বর?'

'আর বাজে কথা বললে চলবে না।'

'কেন হৃদয়বল্লভ?'

'সবাই চলে গেছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ।'

বুঁচির জ্ঞান হইল, 'তাই তো! চল্ চল্'—

ফটকের সামনে গিয়া তাহারা দাঁড়াইল। ল্যাম্পপোস্টের আলোতে তাহাদের দেহ আর পোশাক আর গিল্টির গহনাগুলি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। আলোর ইন্দ্রজাল।

রাত্রি হইয়াছে। তাহাদের জীবন আরম্ভ হইল।

তাহারা সকলে দাঁড়াইল—এক বাড়িতে তাহারা পাঁচজন থাকে।

মানদাও দাঁড়াইয়াছে! রক্তের মধ্যে অভ্যাসটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

পান্না হাসিয়া বলিল, 'মাইরি টগর, তোর রূপের দিন দিন খোলতাই হচ্ছে।'

টগর নিরুত্তর হাসিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল রাধার দিকে। এককোণে সে গম্ভীরভাবে একটা সাদা শাড়ি পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। টগর বিস্মিত হইল।

'রাধা'— সে ডাকিল।

রাধা তাহার মুখের দিকে চাহিল।

'তুই এলি যে, আজই না তুই পথ্যি করেছিস?'

রাধা শুষ্ককণ্ঠে বলিল —'হ্যাঁ'—

'কেন এলি তবে?'

'টাকা চাই, বাড়িউলি আজ আমায় অনেক কথা শুনিয়েছে।'

টগর আর কী বলিবে?

রাধা চলমান জনতার দিকে দুইটি বড়ো বড়ো চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রোগভোগের পর তাহার শীর্ণ আকৃতি অধিকতর শীর্ণ হইয়াছে, কালো রং মিশ্‌কালো হইয়াছে, গাল ভাঙিয়া গিয়াছে আর মাথার চুল কিছু উঠিয়া গিয়াছে। রাধার বুকে নাকি এক দুর্বোধ্য ব্যাধি হইয়াছে, জীবনের আশা খুব কম, শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে তাহার আজকাল বড়ো কষ্ট হয়। পরেশ ডাক্তার তাহাকে খুব সাবধানে থাকিতে বলিয়াছে।

প্রেতিনীর মতো মাংসহীন, লিক্‌লিকে একটি বাহু দিয়া দরজার পার্শ্বদেশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাধা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। টাকা চাই।

কনক বলিল—'সত্যি তুই শুয়ে থাক্‌গে লো রাধা, এখনও আরও কয়েকদিন তোর জিরোন উচিত।

রাধা নড়িল না, কথাও বলিল না।

'বিবিসায়েব, গোলামের সেলাম নাও।'

একটি কালো ও মোটা লোক। গায়ে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে লপেটা।

পান্না একগাল হাসিয়া আগাইয়া গেল—'মর মিনসে, কত ঢংই জান, চল ভেতরে।'

লোকটি হো হো করিয় হাসিয়া উঠিল। পান্না তাহাকে ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

গলিতে ভিড় ক্রমে বাড়িয়া উঠে। নানারকমের এসেন্স, পাউডার আর দেহের গন্ধ। নানারকমের মুখ, পোশাক আর কথা। হাসি আর পানের পিচ আর সিগারেটের ধোঁয়া।

'ওই মেয়েটা মন্দ নয়।'

'কোন্‌টা?'

'ওই যে কোমরে হাত দিয়ে—আহাহা, শরীরের গঠনটা দেখছিস!'

একটি যুবক এদিক-ওদিক একবার ত্বরিতগতিতে দেখিয়া লইয়া টগরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

'শোন'— সে বলিল।

'আমায় বলছেন?' টগর হাসিল।

বুঁচি ঝংকার দিয়া উঠিল—'মর ছুঁড়ি—আর কাকে লা?'

যুবকটি ঘামিয়া উঠিয়াছে। সে এ গলিতে নবাগত।

'কী কথা, বলুন'— টগর নিপুণ কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিল।

'ভেতরে চল।'

'সে কি? দরদস্তুর!'

'সে পরে হবে।'

সকলে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, কেবল রাধা হাসিল না।

নিজের ঘরে গিয়া টগর বলিল, 'বসুন।'

যুবকটি সলজ্জভাবে বসিল। পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া সে ঘন ঘন টানিতে লাগিল।

'পান খাবেন?' টগর প্রশ্ন করিল।

'না।'

একদৃষ্টে যুবকটি তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বারংবার তাহার নাসিকা স্ফীত হইতে থাকে। সুদর্শন, সুকুমার যুবক। টগর মনে মনে হাসে। নূতন পথিক।

'কতদিন এ পথে এসেছ?'

টগর শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে বলিল, 'ওসব জেনে কী করবেন— দেবদাস হবেন নাকি?'

যুবক অপ্রতিভ হইল—'না-না, মানে'—

'থাক ওসব কথা, বাতি নিভিয়ে দেব?'

সিগারেট বারান্দায় নিক্ষেপ করিয়া শয্যায় বসিয়া যুবক কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'দাও!'

'আগে দুটো টাকা দিন!'

দুইটি টাকার আওয়াজ। অন্ধকার হইল।

অন্ধকারে উষ্ণ রক্তের মত্ত ইতিহাস। নিবিড় আলিঙ্গনে টগরের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, দেহগ্রন্থিগুলি টন্‌টন করে।

বারান্দায় সিগারেটটা নিভিতে চলিয়াছে।

আলো জ্বলিল।

যুবকটির মাথা নত। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, অবিন্যস্ত চুলে একবার হাত বুলাইয়া সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

'একটা সিগারেট দিন তো'—টগর বলিল।

যুবকটি তাহাব দিকে চাহিল না, কেবল নিরুত্তরে একটি সিগারেট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া টগর বলিল, 'বসুন।'

'না' – পাপের অবসাদ তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

'আমাব জীবনকাহিনি শুনবেন না?'

যুবক মাথা নাড়িল।

'কালকে আসবেন তো?'

যুবক লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মুহূর্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সিঁড়ি বাহিযা নামিয়া গেল।

টগব হাসিল। সে জানে ওই যুবক আবার একদিন আসিবে। এখন তাহার মাথা নিচু হইয়াছে বটে, কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থিত নিস্তেজ শিরাগুলি যখন আবার উষ্ণ রক্তের স্রোতোবেগে উদ্দাম হইয়া উঠিবে, মন তখন আবাব বদলাইবে, সে আবার আসিবে।

বাতাসে কানাইযেব দোকানের মাংসের গন্ধ। পাশের ঘবে পান্না হাসিতেছে। ওপাশের বড়ো বাড়িটায় সুকেশী গান ধবিযাছে। মহানগবীর বুকে রাত্রি গভীর হয়।

আয়নায় মুখ দেখিয়া, খোঁপা ও বেশ ঠিক করিয়া লইয়া টগর সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

এমন সময়ে আসিল শশী।

সিঁড়ির কযেক ধাপ উঠিযা রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সে হাসিল, 'তোকেই খুঁজছিলাম টগর।'

টগর ঝংকার দিয়া উঠিল, 'কেন, কী দবকার আমার খোঁজে, এখন বুঝি খিদে পেয়েছে?

'না—তা নয়, দুটো পয়সা চাই।'

'ওপবে চল্।'

টগরের পিছনে শশী ঘরে ঢুকিল।

ঘবের আলোতে শশীব চেহারা এইবার পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। একটি সরু পাড় ময়লা শাড়ি পরনে, গায়ে একটা অর্ধছিন্ন পাঞ্জাবি, মাথায় একবাশ ফাঁপিয়া-ওঠা রুক্ষ চুল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দেহ তাহার অতিমাত্রায় দীর্ঘ, অস্বাভাবিক শীর্ণ, হাতের শিরাগুলি স্ফীত, লম্বাটে মুখের মাংসহীন দুইটি গালের উপর গোরুর মতো একজোড়া ড্যাবডেবে ও ক্লান্ত চক্ষু।

পয়সা দিতে গিয়া শরীর দিকে ভালো করিয়া চাহিল, হৃদয়ে একটা ব্যথা মোচড় খাইয়াও উঠিল। হতভাগা শশী। কবে কোন এক বেশ্যার গর্ভে এই গলির এক অন্ধকার ঘরে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার আর মনে নাই, উদ্দেশ্যহীন ছন্নছাড়া জীবনের স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়া সেই কথা সে ভুলিতে চায়। কোথায় যায়, কোথায় কখন থাকে, কী খায়, কিছুরই ঠিক নাই।

'বলি আজ খেয়েছিস তো?' টগর প্রশ্ন করিল।

ক্ষুদ্র শিশুর মতো মাথা দুলাইয়া শশী বলিল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া টগর বলিল—'আচ্ছা শশী'—

'এ্যাঁ'—

'কেন মরতে এখানে থাকিস বল্ তো— অন্য কিছু করতে পারিস না?'

শশীর শান্ত ও ক্লান্ত দৃষ্টিতে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, 'এখানে যে নাড়ির টান আছে।'

'না শশী, বাজে কথা নয়।'

শশী একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'তোমাদের মায়া ছাড়তে পারি না।'

'কেন?'

শশী তাহার উত্তর দিল না, হঠাৎ একটা কথা যেন তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে এমনিভাবে মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'আজ গণেশের ওখানে একটি ভারী অদ্ভুত লোকের সঙ্গে দেখা হল টগর, বয়স বেশি নয় কিন্তু তার জ্ঞান! সে আমায় বললে'— সে থামিল।

'কী বললে?'

'তার আগে একটা কথার উত্তর দে তো?'

'কী?'

'এই জীবন কি তোর ভালো লাগে?'

টগরের দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসিল, মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, 'না, বাঁচতে হবে তো, অন্য আর কী উপায় আছে?'

শশী মাথা নাড়িল, লোকটি সেই কথাই বললে যে এমন একটা দিন আসবে যখন তোদের এ জীবনের আর দরকার হবে না, মানুষ আর সমাজ একদিন ভেঙে পিষে নতুনভাবে তৈরি হবে।

শশীর কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিতে থাকে, কথা শেষ করিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

টগর ঠিক কথাগুলি বুঝিতে পারে না, তবুও তাহা কেমন যেন ভালো লাগে। সমাজ আর মানুষ! ঠিকই তো। মুহূর্তে তাহার সারা অতীত আবার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। কিন্তু এই অতীতের স্মৃতিতে কোথায় যেন একটা পীড়াদায়ক যন্ত্রণা লুক্কায়িত আছে, টগর তাহা সহ্য করিতে পারে না। জোর করিয়া হাসিয়া সে বলিল—'আচ্ছা এবার নীচে চল্।'

শশী হঠাৎ তাহার দিকে আসিয়া দ্রুতকণ্ঠে, উত্তেজিতভাবে বলিল, 'টগর'—

'কী?'

'চল্ না কোথাও বেরিয়ে পড়ি, এই কুকুরের জীবন, এই গলির ভ্যাপসা দুর্গন্ধ আর অন্ধকার ছেড়ে চল্ না কোথাও চলে যাই। যাবি?'

টগর হাসিল, 'তা আমাকে এত দয়া কেন রে মুখপোড়া, আরও তো কত লোক রয়েছে—বুঁচি, মানদা, পান্না—তাদের বল্‌গে না।'

'তোকে যে ভালোবাসি।'

'কী!' মানদার কথাগুলি টগরের মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ভালোবাসার ছবিগুলি চোখের সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া সে বলিল, 'ভালোবাসা!' যা যা শশী দূর হ, বেশ্যাকে ভালোবাসতে এসেছেন, বলি কত টাকা আছে রে তোর হারামজাদা?'

শশীর বড়ো বড়ো চোখ দুইটি যেন এবার ফাটিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম হইল, নাই বা থাকল টাকা, টাকাওয়ালাদের মতো রাতের বেলায় এসে এক ঘণ্টার জন্য তো তোকে ভালোবাসি না আমি, আর বেশ্যার ছেলে আমি, বেশ্যাকে ভালোবাসব না তো কাকে ভালোবাসব?'

টগর বিরক্ত বোধ করে, 'পথের কুকুর মাথায় উঠেছিস্ না? প্রেমের কথা শোনাতে এয়েছেন বাবু, বলি ভাত যে গিলিস, আজ কটা লোককে এনেছিস্ রে মুখপোড়া? যা যা দূর হ সুমুখ থেকে।'

মুহূর্তে শশীর মুখের রূপান্তর ঘটিল, আবার পূর্বেকার সেই নিরীহ পশুর মতো ক্লান্ত ভাব ও দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, একটু হাসিয়া বলিল, 'ঠিকই তো, বাইরে যে একটা বুড়োকে দাঁড় করিয়ে এসেছি।'

টগর একটু চুপ করিয়া বলিল, 'যা—নিয়ে আয়।'

'যাই।'

লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া শশী চলিয়া গেল। কেবল যাওয়ার সময় একবার কী ভাবিয়া টগরের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিল। ঘরের আলো তির্যক গতিতে সিঁড়ির উপর পড়িয়াছে, তাহাতে সিঁড়িটা সম্পূর্ণভাবে আলোকিত হয় নাই। সেই আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে শশীর গোরুর মতো ড্যাবডেবে চোখের মধ্যে যেন কী একটা ভাষা। টগর বুঝিয়াও বোঝে না। ভারী অদ্ভুত এই শশী, একেবারে পাগল।

টগর বিছানায় গিয়া বসিল। ঘরের ভিতর বর্ষাকালের ঠান্ডা বাতাস আসিতেছে। বাহিরে নক্ষত্রহীন অন্ধকার আকাশে মেঘরাশি আবার পুঞ্জীভূত হইতেছে। টগর ভাবে। ভালোবাসা! শশীর ভালোবাসা। সুধীর আর বিমলা।

সন্ধ্যাবেলায় অতীত জীবনের কথা চিন্তা করিতে করিতে যেখানে ছেদ পড়িয়াছিল, সেইখান হইতে সে আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল—

—এক নগর। সেখানে হঠাৎ একদিন একটি শিশুর ক্রন্দনে বিমলার নেশা ভাঙিল, সে বুঝিতে পারিল যে পশ্চাতের জীবনে ফিরিবার আর কোনো উপায় নাই। এদিকে মধুলোভী মুগ্ধভ্রমরদের ভিড় বাড়িয়া চলিল। ইঙ্গিতে দৃষ্টিতে কদর্য পিপাসা আর প্রলোভন। ওদিকে পাপের বোঝাটি দিবারাত্র ট্যাঁ ট্যাঁ করে। বিমলা বড়ো মুশকিলে পড়িল, সে কী করিবে? অবশেষে সে একদিন নিজের পাপকে ভুলিতে চাহিল। এক মত্ত মুহূর্তে সে ওই শিশুটির কোমল গলদেশ নিপীড়ন করিয়া তাহাকে এই পৃথিবী হইতে বিদায় দিল। যন্ত্রণায় বেচারীর দেহটি কয়েকবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল মাত্র, আর কিছু নয়। তারপর দূরে এক জঙ্গলে, মাটির নীচে তাহার কচি দেহ চাপা পড়িল। হায়, বিমলা ভুল করিয়াছিল। পাপ দূর করিতে গিয়া সে তাহাকে আরও কায়েমি করিয়া তুলিল, অজ্ঞাত নিয়তির আকর্ষণে সে থামিল এই গলিতে। তাহার পর এই গলির অন্ধকারে বহু মানবের আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট হইয়া বিমলা হইল টগর। সে কবেকার—

পদশব্দ।

একজন বৃদ্ধ আসিল। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। ন্যুব্জদেহে শীর্ণকায়, মাথার চুলগুলি কাঁচাপাকা, ছোটো ছোটো চোখে সর্বদা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, পরনে কোঁচানো ধুতি, পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর।

'আসুন'— টগর বলিল।

বারান্দা হইতে শশী একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল,

বৃদ্ধ হাসিল, 'আসুন কিগো, এসেছি।'

'বসুন।'

বৃদ্ধ বলিল, 'তোমার নামই টগর বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ —'

'বেশ বেশ, তা বাছা শশী মিথ্যে কথা বলেনি— তুমি দেখতে মন্দ নও।

টগর হাসিল, 'পান খাবেন?'

'নিশ্চয়ই, অনেক পান তো খেলাম, তোমার হাতেরটাও খেয়ে দেখি। দেখ যেন গুন্ কর না ভাই।'

বৃদ্ধ রসিক।

টগরও রসিকতা করে, 'গুন্ করলেই বা ভয়ের কী, আমি কি বাঘ?'

'বাঘ! কে বলে তা? তোমরা বাঘের চেয়েও বড়ো, তোমরা হচ্ছ বাঘের মাসি।

বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ দেওয়ালে বিলম্বিত কালীর পটের ওপর দৃষ্টি পড়ায় তাহার হাসি থামিয়া গেল, দৃষ্টি নত হইল, ফিস্‌ফিস্ করিয়া সে বলিল, 'বাতিটা নিভিয়ে দাও তো'—

'কেন?' টগর বিস্মিত হয়, 'এত তাড়াতাড়ি, গল্প করবেন না?'

'নেভাও বলছি।'

অন্ধকার।

'ঘরে মায়ের ছবি রেখেছ কেন?' বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল।

'আমরা কি মায়ের সন্তান নই?'

'না, তা বলিছ না—কিন্তু মায়ের ছবির সামনে ভয় হয়।'

'তবে ফিরে যান।'

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধ টগরকে নিকটে টানিয়া লইল। লোল চর্মের স্পর্শ।

'পাগল, এখানে যারা আসে, তারা কি ফিরবার জন্য আসে?'

টগর মৃদু হাসিল, 'ছবি না রাখলে কি মা এসব কাজ দেখতে পান না?'

'না—তা নয়—তবে'—

'কেন তবে এই ফাঁকি, পাপ করছেন আবার নিজেকে ভুলও বোঝাচ্ছেন!'

বৃদ্ধ নিবিড়ভাবে টগরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'ও বাবা, তুমি যে অনেক বড়ো বড়ো কথা জান মাইরি।'

সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া শশী যেন কী ভাবিতেছে। বেশ্যার ছেলে শশী।

আলো জ্বলিল।

বৃদ্ধ ম্লান হাসিয়া বলিল, 'নেশা কাটলে যেমন সব বিস্বাদ মনে হয় এখন তেমনি মনে হচ্ছে। ভাবছি—কেন এসেছিলাম?'

'কেন এসেছিলেন?'

'তা কি জানি—মনকে সামলাতে পারি না। ঘরেতে আমার বউ ছেলে-মেয়ে নাতি-নাত্নি সবই তো আছে তবু তোমাদের এখানে একবার না এসে পারি না— কেন?'

'আমাদের ভালোবাসার টান' — টগর হাসিয়া বলিল।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িল, 'তোমাদের ভালোবাসা! সে তো মিথ্যা—অভিনয়।'

সে নীচে নামিয়া গেল।

মিথ্যা — অভিনয়! বিমলার ভালোবাসা কি মিথ্যা ছিল!

রাধা তখনও একই ভাবে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। একটি লোকও তাহার দিকে ফিরিয়া চাহে না।

মানদাও একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল, টগরকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল—'তোদেরই ভাগ্যি মাইরি।'

'কেন?'

'একটা যাচ্ছে তো আরেকটা আসছে।'

টগর মৃদু হাসিল।

'বুঁচি, পান্না, কনক —এরা বুঝি ঘবে?'

'হ্যাঁ।'

মানদা সাগ্রহে রাস্তার দিকে তাকায়। কেহ কি মুগ্ধ হইল? একদিন কিন্তু তাহার দ্বারে লোকেরা হুমড়ি খাইয়া পড়িত। সেই যে এক মারওয়াড়ি, কী বিরাট ভুঁড়ি ছিল তার! সে একদিন আসিয়া মানদার পা জড়াইয়া ধরিয়া, কত সাধিয়াছিল তাহার সহিত যাইতে, কিন্তু সে যায় নাই। আর আজ? নিজের মুখের বসন্তের দাগগুলিব উপর মানদা হাত বুলায়।

রাধার দিকে চাহিয়া টগরের মনটা কেমন যেন করে। মোলায়েম সুরে সে ডাকিল —'রাধা।'

রাধা ক্লান্তভাবে তাহার দিকে চাহিল।

'তোর টাকার দরকার তো একটা টাকা নিস আমার কাছ থেকে, তুই এখন ভেতরে যা ভাই।'

রাধা নিরুত্তরে মুখ ফিরাইয়া লইল।

রাত্রি বাড়িতেছে। রাত্রির কালো ধমনীতে তাহার কালো আত্মার স্পন্দন। গলির মধ্যে ভিড়। নানা মুখ আর নানা কথা, হাসি আর ইঙ্গিত, মদ আর পানের পিচ্, অদৃশ্য বীজাণুর হাসি আর কানাইয়ের দোকানের মাংসের গন্ধ। হ্যাঁ, রাত্রি বাড়িতেছে।

আবার শশী আসিল।

'আর একটাকে এনেছি'— সে বলিল।

তাহার পশ্চাতে একটি লোক টলিতেছিল। তাহার মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত, অত্যাচারে গাল ভাঙিয়া গিয়াছে, রক্তাভ দৃষ্টিতে অর্থহীন চাহনি। চেহারাটা তাহার ভালোই, দেখিয়া অবস্থাপন্ন ও ভদ্র বলিয়া মনে হয়।

'নিয়ে আয়'— বলিয়া টগর সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে জড়িতস্বরে লোকটি বলিল, 'অত হন্‌হন্ করে যেও না ভাই, মুঁখখানা একবার দেখাও'—

টগর থামিল, লোকটির দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, 'দেখুন না কত দেখবেন।'

লোকটি টলিয়া টলিয়া দেখিতে দেখিতে হাসিল, 'বেশ মুখ!'

লোকটিকে টগরও দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ তাহার সারা দেহের রক্তস্রোত উদ্দাম হইয়া উঠিল, প্রতি কোষে উপকোষে হিংস্রতার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, দুই হাত বাড়াইয়া কঠিনভাবে লোকটির গলা টিপিয়া ধরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'শশী!'

শশীর লম্বা ছায়া সিঁড়ির ধাপে পড়িল।

'এ হারামজাদাকে বের করে দে।'

'কেন?'

'বের করে দে বলছি।'

লোকটির নেশা ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রাচীরে হেলান দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, 'তোমায় যেন চিনি—তুমি কে?'

টগর অদ্ভুত হাসিয়া বলিল, 'চিনে দরকার নেই আর, এ গলিতে আর কোনোদিন যেন তোমার মুখ না দেখা যায়।'

'তুমি কে?'

'আমি টগর—বেশ্যা —আবার কে।'

'না, ঠিক করে বল তুমি কে?'

টগর গর্জন করিয়া উঠিল, 'শশী—হতভাগা আমার কথা কি তোর কানে যায়নি... বের করে দে এ কুকুরটাকে।'

শশী লোকটির হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিল।

তবুও লোকটি আকুল কণ্ঠে বলিল—'তোমায় যেন চিনি—তুমি কে?'

শশী আবার তাহাকে ধাক্কা দিল।

টগর একটা সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িল।

দুইটি কাবুলিওয়ালাকে লইয়া রাধা উপরে চলিয়া গেল। তাহার টাকা চাই—আজই।

হঠাৎ টগর উঠিল, দ্রুতপদে দ্বারপার্শ্বে গিয়া গলির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল। লোকটি টলিতে টলিতে গলির মোড়ে অদৃশ্য হইল। সুধীর অদৃশ্য হইল। হইবে না তো কি— টগর তো বিমলা নয়। বিমলা তাহাকে ভালোবাসিত, টগরের সে শত্রু।

মানদা প্রশ্ন করিল, 'ফিরিয়ে দিলি কেন রে?'

নিরুত্তর টগর নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িল। মুহূর্তে কী যেন হইয়া গেল। না দুঃখ, না ক্রোধ, না হতাশা, এমনি একটা অবর্ণনীয় ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সে নিঝুমের মতো পড়িয়া রহিল আর অতীতের ছবিগুলি একের পর এক ভোজবাজীর মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল। কেবল একটি দূর-দূরান্তরের কোনো এক জঙ্গলের মাটির বাধাকে ভেদ করিয়া একটি রুদ্ধশ্বাস কচি শিশুর কান্না ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

বাহিরে মেঘগর্জন শোনা গেল।

পাশের ঘরে কাবুলিওয়ালা দুইটি তাহাদের দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব রসিকতা করিয়া হাসিতেছে।

শশী আসিল।

'খাবি না টগর?'

'তুই খেয়েছিস?'

'তুই আগে খা।'

টগর উত্তর দিল না।

বারান্দায় বসিয়া শশী বলিল, 'পুরনো দিনের কথা ভাবিস না, এমনি হয়, অথচ কত কথাই না ভেবেছিস ঐ অপদার্থ লোকটার বিষয়ে!'

'ওসব কথা ছাড় দেখি।' টগর তিক্ত হইয়া উঠিল।

শশী ম্লান হাসিল, 'আচ্ছা তবে খেয়ে নে চারটি।'

টগর উঠিল। দিনের রাঁধা ভাত একটি পাত্রে কিছু দিয়া বলিল, 'নে খা।'

শশী খাইতে বসিল।

পাশের ঘরে রাধা একটু গোঙাইয়া উঠিল।

টগর খাওয়া দেখে। একগাল ভাতের চাপে শশীর দক্ষিণ গালটা ক্ষণেকের জন্য মাংসল বলিয়া মনে হয়। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় সে খাইতেছে তাই আরামে তাহার চক্ষু অর্ধনিমীলিত হইয়া আসে। টগরের মমতা বোধ হয়। শশী নাকি তাহাকে ভালোবাসে! ভালোবাসা!

টগর হাসিল, 'কি রে এখনও আমায় ভালোবাসিস?'

খাওয়া থামাইয়া শশী তাহার দিকে চাহিল, কোনো উত্তর দিল না, কেবল তাহার গোরুর মতো ড্যাবডেবে চক্ষু দুইটিতে একটা করুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল। পরে একটু মৃদু হাসিয়া সে বলিল, 'খেয়ে নে তুই এবার।'

টগর নিজের থালা টানিয়া লইল।

বাহিরে বৃষ্টি নামিল। সঙ্গে বাতাস।

কাবুলিওয়ালা দুইটি উত্তেজিতভাবে কী বলাবলি করিতে করিতে তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

'এক গেলাস জল দে তো শশী।'

'দিই।'

হাত ধুইয়া শশী টগরকে জল দিল। একটি বিড়ি ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সে পরে বারান্দার উপব গড়াইয়া পড়িল।

'ওকি রে, খালি মাটিতে শুবি!'

শশী রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'শবীরটাও মাটির তা জানিস, একদিন তা মাটিতে মিশে যাবে - বাউলের গান শুনিসনি?'

মাটি!

ঝংকার দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে টগর বলিল, 'বেশি কথা বলিস না হারামজাদা—ওঠ বলছি' খেয়ে নিই, একটা মাদুর আর বালিশ দিচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

মানদার চিৎকার শোনা গেল—'ওরে তোরা শিগগির আয়—ও বুঁচি—ও টগর, শিগগির আয়—রাধা নড়ে না যে;'

'এ্যাঁ।' টগর উঠিয়া দাঁড়াইল।

'তুই খা না, আমি দেখে আসি' —শশী রাধার ঘরের দিকে গেল।

কী হইল রাধার? টগর আর খাইতে পারে না।

শশী ফিরিয়া আসে না।

বুঁচির কান্না শোনা যায়, 'ও ভাই রাধা—রাধা।'

টগর যন্ত্রচালিতের মতো গিয়া রাধার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। মলিন শয্যার উপর রাধা মূৰ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু কাবুলিওয়ালা দুইটি অকৃতজ্ঞ নয়, তাহারা একটি টাকা তাহার মাথার নিকটে রাখিয়া গিয়াছে।

ঘরের ভিতর ভিড় জমিয়া গেল। পাশের বাড়ির কমল, মতি প্রভৃতি আর বাড়িউলি আসিল। অনেক জেরা, অনেক চিৎকার, জল ঢালা আর পাখার বাতাস। রাত্রি গভীর হইতেছে।

নিজের ঘরে অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া টগর ভাবে। রাধার নিস্পন্দ দেহটা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেই একটা দুর্নিবার বিবমিষা পাকস্থলীতে পাক খাইয়া উঠিল। সে বমি করিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে বৃষ্টি জোরে আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রি অন্ধকার। এ গলির অন্ধকার আর তাহাদের অন্ধকার জীবনের মতো।

বেশ্যার ছেলেটা মমতায় ভাঙিয়া পড়ে। টগরের মাথায় জল ঢালিয়া তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া শশী বলিল, 'এবার ঘুমো টগর—ঘুমোলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে? আচ্ছা'—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া টগর আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল। বিমলা। মাটি। 'টগর তোমায় যেন চিনি— তুমি কে?' রাধার মাংসহীন দেহ আর রক্ত। টগর কী করিবে?

শশী মেঝেটা ধুইয়া বাতি নিভাইয়া বারান্দায় গিয়া শুইল।

রাত গভীর হইতে থাকে। বৃষ্টি থামে না, একটানা সুরে অবিরাম পড়িতে থাকে। কালির মতো কালো আকাশ।

হঠাৎ টগর বিছানা হইতে উঠিল, বাতিটা আবার জ্বালাইয়া শশীর নিকট গিয়া তাহার দেহে ঠেলা দিয়া বলিল, 'শশী!'

শশী জাগে না, সারাদিনের ঘুম তাহার চোখে।

'ও শশী—শশী?'

'এ্যাঁ— কে?'

'আমি।'

'কে— টগর?'

'হ্যাঁ।'

'কী হল?'

'চল।'

'কোথায়?'

'এই না আজ সন্ধ্যাবেলা বলেছিলি কোথায় নিয়ে যাবি আমায়, এই কুকুরের জীবন থেকে আমায় না তুই মুক্ত করতে চাস?'

শশীর ঘুমভরা চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, টগরের দিকে চাহিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে কি না তাহাই সে কেবল ভাবিতে লাগিল।

'নিয়ে চল শশী—ও শশী—তুই না আমায় ভালোবাসিস?' টগরের কণ্ঠে ক্ষুদ্র বালিকার মতো কাতরতা, সে যেন বড়ো অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।

মুহূর্তে শশীর চেহারা বদলাইয়া যায়, গোরুর মতো ড্যাবডেবে ও নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটিতে মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলিয়া উঠে।

টগরের ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া সে প্রশ্ন করিল, 'সত্যি বলছিস টগর—না মিথ্যে কথা?'

দুই হাতে টগর এবার শশীকে আঁকড়াইয়া ধরিল, ফিসফিস করিয়া বলিল—'সত্যি—সত্যি, এক্ষুনি চল শশী, দেরি করলে আর হয়তো হবে না।'

টগরের কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া শশী ভারী মিষ্টি হাসিয়া বলিল— 'চল তবে।'

রাত্রি গভীর। কেহ জাগিয়া নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে অবিরাম আর আকাশটা যেন কালো কালি।

রাস্তায় নামিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তাহারা দুইজনে চলিল।

'বড়ো বৃষ্টি—না?' টগর বলিল।

শশী মাথা নাড়িল, হ্যাঁ—তাতে কী।'

চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে অনুভব করিয়া টগর আবার বলিল, 'রাত অনেক হয়েছে—আর বড়ো অন্ধকার—না শশী?'

বেশ্যার ছেলেটা গভীর অনুরাগের সহিত টগরকে আরও নিবিড়তর সামীপ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, 'হোক না, ভয় কী, আমি তোকে আকাশের সূয্যি এনে দেব।'

রাত্রি গভীর। কেহ জাগিয়া নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে অবিরাম আর আকাশটা যেন কালো কালি। তবু—ভয় নাই, বৃষ্টি থামিবে, লোকেরা জাগিবে, রাত্রিও শেষ হইবে, বেশ্যা টগর আর বেশ্যার ছেলে শশীর জীবন নূতন দিনের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এ আলো পশ্চাতে ফেলিয়া আসা গলিতে কোনোদিন ছিল না, থাকিবেও না সেখানে তো, চিরান্ধকার রাত্রির চিরন্তন বিলাস।



জামাই

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গভর্নমেন্ট প্রেসের বড় অফিস বাড়িটার সামনে দশটা বাজতে না বাজতেই পানের পুঁটলি নিয়ে এসে বসল প্রমদা। এত সকালে বাবুরা পান খায় না। অন্য কেউ এসে যে তার জায়গা দখল করে বসবে তেমন আশঙ্কাও নেই। তবু প্রমদা সকাল সকালই আসে। বিক্রি তেমন হোক আর না হোক অফিসের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় বসে থাকে। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশেক হবে। কিন্তু চেহারায় আরো বেশি বুড়ি বলে মনে হয়। চুলে পাক ধরেছে। রোগা লম্বা দেহটা নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। বেশ-বাসের ওপর কোনরকম লক্ষ নেই। চুলপেড়ে শাদা একখানা আধময়লা ধুতি পরনে! গায়ে কোথাও কোন গয়না নেই। অথচ একটু যত্ন নিলে দেহ এখনো সুন্দর দেখায় প্রমদার. লক্ষ করলে চোখে-মুখে বিগত যৌবনশ্রীর এখনো কিছুটা আভাস মেলে।

ভাগ্য ভালো। অফিসে ঢুকবার আগে চব্বিশ পঁচিশ বছরের দুজন যুবক আজ সামনে এসে দাঁড়াল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মিঠে পান হবে?'

'হবে বাবা।'

'তাহলে দাও দুটো।'

সঙ্গীটি বলল. 'আঃ, আবার আমার জন্যে নিচ্ছ কেন সুকুমার? আমি পান খাব না।'

সুকুমার বলল, 'আহা. খাও না শুভেন্দু, বেশ ভালো পান।'

শুভেন্দু বলল. 'তাহলে দাও। কিন্তু জর্দা-টর্দা দিওনা যেন।'

প্রমদা পান সাজতে সাজতে যুবক দুটির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'জর্দা না খেলে দেব কেন বাবা।'

সুকুমার বলল. 'আমারটায় দাও। ওরটায় দিয়ো না। খাওয়া তো ভালো. জর্দার নাম শুনলেই আমাদের শুভেন্দুর মাথা ঘোরে।'

শুভেন্দু বাধা দিয়ে বলল, 'আঃ, কি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেরে নাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

দাম চুকিয়ে দিয়ে সুকুমার একটু সরে এসে সিগারেট ধরাল।

শুভেন্দু বলল, 'পানওয়ালীদের মুখে অমন বাবা শুনতে আমার বড়ো খারাপ লাগে।'

সুকুমার একটু হেসে বলল, 'কী করবে বলো. ওর বাবু ডাকবার বয়স তো আর নেই।'

শুভেন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ। কিন্তু বয়স না থাকলেও তাকাবার ভঙ্গিটি প্রায় তেমনি আছে। পান সাজতে সাজতে আমাদের মুখের দিকে কী রকম করে বার-বার চাইছিল দেখলে তো?'

সুকুমার বলল, 'দেখেছি। শুধু তোমার মুখের দিকে নয়, তোমার আমার বয়সি সকলের মুখের দিকেই ও অমনি করে তাকায়। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নয়। প্রমদা ওর জামাইকে খোঁজে।'

হাসতে গিয়ে সুকুমার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

শুভেন্দু বিস্মিত হয়ে বলল, 'জামাই মানে?'

গলাটা একটু চড়ে গিয়েছিল শুভেন্দুর। সুকুমার তার দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আস্তে হে আস্তে। শুনতে পাবে। চল. এবার ভিতরে চল।'

রাস্তা পার হয়ে দুই বন্ধু অফিসে ঢুকল। একদল মেয়ে ঢুকল তারপর। তাদের পিছনে-পিছনে আর-একদল ছেলে। প্রমদা পান-সাজা থামিয়ে তাদের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে একটু কাল তাকিয়ে রইল, তারপর ফের নিজের কাজে মন দিল। শুনতে সে পেয়েছে। চোখের মতো কানও আজকাল তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে প্রমদার। কে কী বলে না-বলে সব সে বুঝতে পারে। প্রমদা সব দ্যাখে, সব শোনে, সব টের পায়। লোকে ভাবে আগের মতো এখনো বুঝি তার মাথা খারাপই আছে। ওদের ভুল। প্রমদার মাথা অনেক দিন হল ফের ঠিক হয়ে গেছে। আজকাল তার সব মনে পড়ে।

মনে পড়ে সেই কৃপানাথ দে-র গলি। দোরের সামনে রাতের পর রাত সেই আগন্তুকের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়ান। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা-বাদল নেই, পথে এসে দাঁড়াতেই হবে। মাস মাস ভাড়া না পেলে বাড়িওয়ালি ছাড়ে না। পোড়া পেটের তাগিদেও কি কম। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত না প্রমদাকে। মানদা-মোক্ষদাদের তুলনায় ওর ঘরে লোকজন ঘন-ঘনই আসত। রূপ স্বাস্থ্য বয়স বুদ্ধি দলের মধ্যে তারই সবচেয়ে বেশি ছিল। নিত্য নতুন ধরনের সাজসজ্জা করত প্রমদা। সিঁথিতে কপালে সিঁদুর লেপে শাঁখা চুড়ি পরে কোনদিন কুলবধূ হত, কোনদিন বা কুমারীর বেণী পিঠে লুটিয়ে পড়ত।

মানদা মুখ ঘুরিয়ে বলত, 'ঢং। তুই থিয়েটারে গেলেই পারিস। এখানে পড়ে মরছিস কেন।'

মালতী বলত, 'সোনাগাছিতে চলে যা। ছ বছর বাদে বড়ো রাস্তার ওপর বাড়ি তুলতে পারবি। এই এঁদো গলিতে পড়ে মরছিস কেন?'

প্রমদা হেসে জবাব দিত, 'তোদের জ্বলে মরা দেখব বলে।'

তারপর তেইশ বছর বয়সে বকুল কোলে এল প্রমদার। বাড়িওয়ালি বলল, 'এতদিনে তোর দুঃখ ঘুচল পেরমো। পেট থেকে পড়তে না পড়তেই যা চোখ মুখ বেরিয়েছে, তোর চেয়ে লাখো গুণে রূপসি হবে। সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে নিশ্চিন্তে খেতে পাবি।'

মোক্ষদা বলল, 'একেই বলে ভাগ্যি। আমাদের ঘরে ব্যাটাছেলে পাঠিয়ে ভগমান ওকেই মেয়ে দিলে। দেবে না? সে-ও তো একচোখো পুরুষের জাত। সুন্দর মুখ দেখলে সে-ও ভোলে।'

কিন্তু সবাই যা ভেবেছিল তা হল না। বকুলের বছর সাতেক বয়স হতে না হতেই তাকে নিয়ে কৃপানাথ দের গলি ছেড়ে চলে এল প্রমদা। সোনাগাছিতে রূপাগাছিতে নয়, বেলগাছিয়ার বস্তিবাড়িতে এসে বাসা বাঁধল।

নিজের পেশার ওপর তার অপ্রবৃত্তি জন্মে গেছে। দু দুবার যথাসর্বস্ব চুরি হয়েছে প্রমদার। একবার হতাশ প্রেমিকের ছোরার মুখ থেকে বেঁচেছে। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে প্রমদার। এ-পথ আর নয়। পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দোতলা বাড়ির অল্পবয়সি বউটির স্বামী শাশুড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের ঘরকান্না দেখতে দেখতে প্রমদা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে তার বকুলকে কিছুতেই সোনাগাছিতে পাঠাবে না সে, বোসেদের বউয়ের মতোই একটি সোনার সংসার বকুলকে সে গড়ে দেবে।

বেলগাছিয়াতে এসে সধবার বেশ ছেড়ে ফেলল প্রমদা। পুরুষ সঙ্গে না থাকলে শাঁখা সিঁদুর নিয়ে অনেক কৈফিয়তের তলায় পড়তে হয়। তার চেয়ে সাদা থান আর সাদা সিঁথিতে আপদ কম। একেবারে অনাথা বিধবা সাজল প্রমদা। এই বয়সেই সব সোহাগ, আহ্লাদ, সাজসজ্জা ছেড়ে ফেলতে প্রথমটায় অবশ্য খুবই কষ্ট হল। কিন্তু মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রমদা নিজেকে সান্ত্বনা দিল। ওর সিঁথিতে সত্যিকারের সিঁদুর তুলে দেওয়ার জন্যে নিজের লোক-দেখানো সিঁদুরের দাগ না-হয় মুছেই ফেলল প্রমদা। তাতে দুঃখ কিসের।

বস্তিতে সবাই গৃহস্থ নয়। আধা গৃহস্থও কয়েক ঘর আছে। দিনদুপুরে রাত-দুপুরে ভুল করে কেউ-কেউ প্রমদার দোরে এসেও হানা দিতে লাগল। কিন্তু ফের কোন ফাঁদে পা দেওয়ার মত মেয়ে নয় প্রমদা। জীবনে তার শিক্ষা কম হয়নি।

কয়েক পা এগিয়েই পাইকপাড়া। সেখানে ডাক্তারবাবুদের বাড়িতে ঠিকে-ঝির কাজ নিল প্রমদা। বাসন মাজে, বাটনা বাটে, বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েরা কাঁদলে কোলে তুলে নেয়। আর মনে মনে স্বপ্ন দ্যাখে, নিজে ঝি-গিরি করলেও বকুলকে সে এমনি একটি বড়লোকের বাড়ির বউ করে পাঠাবে।

শুধু ঝি-গিরির পয়সায় সংসার চলে না। যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্রে আগুন লেগেছে। দুপুরবেলায় পানের পুঁটুলি নিয়ে প্রমদা অফিস আদালতের সামনে গিয়ে বসে। বিক্রি মোটামুটি মন্দ হয় না। অফিসের বাবুরা অনেকেই এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, চুনের বোঁটা হাতে নিয়ে গল্প করে।

একদিন ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার মেয়ে তো বেশ চালাক চতুর দেখছি। লেখাপড়া শিখল কোথায়? ওকে স্কুলে দিয়েছ নাকি?'

প্রমদা লজ্জিত হয়ে বলল, না বাবু। বস্তির সামনে নিমাই মুদির দোকান আছে। বই-খাতা নিয়ে সেখানে যায়। পড়াশুনো পেলে বকুল আর কিছু চায় না। দিনরাত বই নিয়ে থাকে। রামায়ণ মহাভারত ওর মুখস্থ।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'শুধু রামায়ণ-মহাভারত কেন। ও আরো অনেক বই পড়েছে! ওকে এবার ভালো একটা ইস্কুল-টিস্কুল দেখে ভর্তি করে দাও প্রমদা। মুদির দোকানে ফেলে রেখ না। তোমার মেয়ে দেখতে তো

অমনিতেই সুন্দরী। লেখাপড়াটা যদি ভালো করে শেখে ওর বিয়ের জন্যে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। যে দেখবে সে-ই ওকে পছন্দ করবে!'

প্রমদা আধখানা ঘোমটার আড়াল থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'সে আপনাদের আশীর্বাদ, কর্তা!'

শ্যামবাজারে ডাক্তারবাবুর জানা মেয়ে-স্কুল আছে। সেখানে আধা-মাইনেতে বকুলকে ভর্তি করে দিল প্রমদা। স্কুলে পুরো নাম জিগ্যেস করায় বলল, 'বকুলমালা দাসী।'

পরদিন বকুল এসে বলল, 'আজকাল আর মেয়েরা দাসী লেখে না মা। আমাদের ক্লাসের দিদিমণি রেজিস্টার খাতায় আমার নাম বকুলমালা দাস লিখে নিয়েছেন।'

প্রমদা চমকে উঠে বলল, 'রেজিস্টার। সে আবার কি রে।'

বকুল হেসে বললে, 'বাঃ রে। রোজ যে নাম ডাকা হয় ক্লাসে। স্কুলে গেলাম কি গেলাম না তার হিসেব রাখার জন্যে নামের খাতা আছে প্রত্যেক ক্লাসে।'

প্রমদা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ও।'

ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে চলল বকুল। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরল। স্কুল ছেড়ে কলেজ।

বস্তির সবাই বলল, 'আর কেন, এবার মেয়ের বিয়ে দাও।'

প্রমদা বলল, 'আমি তো অনেক দিন ধরেই বলছি। কিন্তু মেয়ে যে কথা শোনে না।'

কত সম্বন্ধ এল, কত সম্বন্ধ হাত-ছাড়া হল, কিন্তু বকুল কিছুতেই বিয়ের প্রস্তাবে সায় দিল না।

প্রমদা একদিন মেয়েকে ডেকে বলল, 'তুই কী ভাবলি বল দেখি। বিয়ে-থা ঘর-গেরস্থালি করবি নে?'

বকুল বলল, 'না মা, এই বেশ আছি।'

প্রমদা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই বেশ আছি! তুই দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকবি আর আমি জীবন-ভর পরের বাড়িতে দাসীগিরি করব, রাস্তায় বসে পান বেচব, এই বুঝি তোর ইচ্ছে?'

বকুল কালো ব্যথাভরা চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল, 'আমি তো তোমাকে বলেছি মা, ও-সব কাজ ছেড়ে দাও।'

প্রমদা রাগ করে বলল, 'কেবল ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! ছেড়ে দিলে চলবে কী করে শুনি? দু-বেলা অন্ন জুটবে কী করে?'

বকুল বলল, 'আমি ট্যুইশন করব মা, চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেব। তবু তোমাকে ও-সব কাজ করতে দেব না।'

তারপর সত্যিই যখন বকুল একটা স্কুলের মাস্টারির খবর আনল, প্রমদা বাধা দিয়ে বলল, 'উঁ, তা হবে না তার চেয়ে তুমি যা করছিলে তাই কর বাপু। পাস-পরীক্ষা শেষ কর। ভাতের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

বকুল বলল, 'কিন্তু রাস্তায় বসে পান বিক্রি করতে তোমাকে আর আমি দেব না মা। কলেজে তো আমার মাইনে লাগে না। প্রিন্সিপাল যে ট্যুইশনটা আমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন, তাতে সংসারের অনেক খরচ আমাদের চলে যাবে। তারপর বি.এ.টা পাস করে কোনো অফিস টফিসে ঢুকতে পারলে যা আনব, কষ্টেসৃষ্টে আমাদের দুজনের তাতেই চলবে। তোমাকে আর আমি কষ্ট করতে দেব না।'

মেয়ের মুখের দিকে মমতাভরা চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রমদা বলল, 'দূর পাগলী। আমার আবার কষ্ট কীসের! তোকে পেয়ে আমি সব দুঃখ ভুলেছি।'

বি. এ. পাশ করবার কিছুদিন বাদেই চাকরি জুটিয়ে নিল বকুল। আগে থেকেই চেষ্টা চরিত্র করছিল। কলেজের এক প্রফেসরের স্বামী সরকারি অফিসে ভালো চাকরি করেন। সেখানেই কাজ জুটল বকুলের।

পান বিক্রি আগেই বন্ধ হয়েছিল, চাকরি পাওয়ার পর ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ঝি-গিরিও আর মাকে করতে দিল না বকুল!

প্রমদা বলল, 'কেন, পেটের জন্য তুই খাটবি আর আমি খাটতে পারব না? আমার কি গতর গেছে?'

বকুল বলল, 'ও-কথা কেন বলছ, মা। এতকাল তো তুমি আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছ। এবার তুমি বিশ্রাম কর। নিজের ঘর-সংসার দ্যাখ।'

প্রমদা বলল, 'ঘর-সংসার না ছাই। তোর বিয়ে হবে, জামাই আসবে; কোল ভরে ছেলেমেয়ে আসবে-তবে তো আমার সংসার। তার আগে আমার সংসার কিসের রে?' বলে মেয়ের দিকে তাকাল প্রমদা। একুশ-বাইশ

বছরের সোমত্ত মেয়ে। কিন্তু বিয়ের কথায় ওর মুখে রং লাগল না। চোখের পাতা লজ্জায় আনন্দে নেমে এল না।'

বকুল আর কোনো কথা না বলে চোখ নামিয়ে নিল। একটু বাদে সে উঠে চলে যাচ্ছিল, প্রমদা তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে ব্যাকুল স্বরে বলল, 'হ্যাঁ জানি। কিন্তু তাতে তো তোর কোন দোষ নেই; তুই যে আমার পাঁকের পদ্ম, বকুল। সেই দুঃখে তুই কেন বিয়ে করবি নে?'

বকুল বলল, 'আমার কোনো দুঃখ নেই, মা। আমার জন্যে তুমি ভেবনা, আমি বেশ আছি।'

এবার বকুল উঠে গিয়ে কালো মলাটের একখানা ইংরেজি মোটা বই খুলে বসল। দুঃখে বুক ভেঙে যেতে লাগল প্রমদার। মেয়েরা হই-চই করে, কত আনন্দ আহ্লাদ করে, কিন্তু বকুল সেই এগারো-বারো বছর বয়স থেকেই ভারি গম্ভীর, ভারি বিষণ্ণ। বকুল প্রথম-প্রথম তার বাপের খোঁজ করেছে, কাকা, মামা, দাদাদের খোঁজ করেছে। প্রমদা মেয়েকে বুঝিয়েছে, তারা কেউ বেঁচে নেই। বকুল তবু অবুঝের মতো জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, কী অসুখে মরল বাবা? শীলা-লীলাদের মতো আমার কি জ্যাঠামণি ছিল? তাঁর কী নাম ছিল মা?'

ধৈর্যের সীমা আছে সকলেরই। প্রমদাকেও একসময়ে বিরক্ত হয়ে বলতে হয়েছে, 'রাতদিন অত আমি বকতে পারি নে বাপু, যা বলেছি, বলেছি। আর আমি কিচ্ছু জানে নে।'

কিন্তু প্রমদা না জানালে কি হবে, বকুল ক্রমে ক্রমে সবই জেনেছে। বস্তিতে কুট-কচালো লোকের তো অভাব নেই। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, ইশারা ইঙ্গিতে সবই বুঝতে পেরেছে বকুল। ঝগড়ার সময় প্রতিবেশিনীদের ভাষা আরও স্পষ্ট, আরও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বকুলের খেলার সঙ্গীরা পর্যন্ত খোঁটা দিয়েছে, 'বেশ্যার মেয়ে, তোর বাপের ঠিক নেই! তুই কেন খেলতে আসিস আমাদের সঙ্গে?'

প্রমদা ঝাঁটা নিয়ে ছুটে গিয়েছে তাদের মারতে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে অকথ্য ভাষায় তাদের বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। বকুল ব্যাকুল হয়ে তাড়াতাড়ি মাকে হাত ধরে ঘরে টেনে এনেছে। 'মা, চুপ কর, চুপ কর।'

কিন্তু ক'বছর পরে সেই দুঃখের দিনগুলিও গেছে। নিজের কুল-পরিচয়ের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা বকুল মাকে আর জিজ্ঞাসা করে না। তার সঙ্গে বস্তির কারো আর ঝগড়া হয় না। কারো সঙ্গে বড়ো একটা মিশতে যায় না বকুল। স্কুলে যায়, স্কুল থেকে ফিরে আবার বই নিয়ে বসে।

প্রমদা মাঝেমাঝে জিজ্ঞাসা করে, 'এত বই তুই কোত্থেকে পাস, বকুল?'

বকুল জবাব দেয়, 'শহরে বইয়ের কি অভাব আছে, মা? স্কুলের মেয়েদের কাছ থেকে আনি, দিদিমণিদের কাছ থেকে আনি।'

প্রমদা বলে, 'বই ছাড়া তুই কি দুনিয়ায় আর কিছু চোখে দেখতে পাসনে? লীলারা কেমন সুন্দর তাদের ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে, তোর সঙ্গে বুঝি কারো ভাব নেই?'

আছে।'

'তবে আনিস নে কেন তাদের?'

বকুল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে 'ভয় করে মা। যদি তারা আমাদের ঘেন্না করে।'

প্রমদা হঠাৎ কোনো কথা খুঁজে পায় না।

স্কুল থেকে ভালভাবে পাস করে কলেজে ভর্তি হল বকুল। কিন্তু মেয়ের স্বভাব বদলাল না। সেই বইয়ের রাশ, ঘরের কোণ আর নিজের মন নিয়ে পড়ে থাকে। দুনিয়ার আর কিছুতে ওর কোনো আসক্তি নেই।

ওর সমবয়সি শীলা লীলা দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে একজন ছেলে কোলে নিয়ে আর একজন পেটে নিয়ে বাপের বাড়ি এলো বেড়াতে। প্রমদার সাজা পান খেয়ে তারা ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে শ্বশুরবাড়ির কত গল্প করল। শেষে লীলা হাসতে হাসতে বলল, 'মাসিমা, ওই গোমরামুখীকে এবার বিয়ে দিয়ে দিন। ওর যা ভাবভঙ্গি দেখছি, কবে যে ও সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে ঠিক নেই।'

সন্ন্যাসিনী হতে বাকিই বা কি। বকুল গয়নাগাটি কিছু পরে না, অত বড়ো চুলের গোছ মাথায়, কিন্তু ভালো করে যত্ন নেয় না। মেয়ে তো নয়, এ এক অনাসৃষ্টি।

প্রমদা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, বকুল, লীলাকে দেখে তোর কি হিংসে হয় না?'

'হিংসে কেন হবে মা?'

'তুই কী চাস বল তো?'

বই থেকে মুখ তুলে বকুল মৃদু হাসে। 'সেই তো সমস্যা। কী চাইব বল তো?'

প্রমদা বিরক্ত হয়ে বলে, 'হাসিস নে বাপু, তোর হাসিতে আমার গা জ্বলে। কী চাইবি, তা-ও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? সোয়ামী, সংসার, গা-ভরা গয়না, কোলভরা ছেলে। মেয়েমানুষে দুনিয়ায় আর কী চায়।'

বকুল বইয়ের দিকে চোখ রেখে মৃদুস্বরে বলে, 'ও-সব আমি কিচ্ছু চাই নে।'

প্রমদা গালাগাল দিয়ে ওঠে, তা 'চাইবি কেন, পোড়াকপালী, হতচ্ছাড়ী। এ যে রক্তের দোষ, ঘরসংসারে তোর মন চাইবে কেন? কিন্তু তুই চাস নে, আমি চাই। যেমন করে পারি জামাই আনবই।'

বকুল বই নিয়ে মায়ের চোখের আড়ালে গিয়ে বসে।

রাগে জ্বলে যায় প্রমদা। ইচ্ছে করে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ওই বইয়ের রাশ। বই তো নয়, শত্রু। ওই বইপড়া বিদ্যার জন্যেই মেয়ে তার এমন করে পর হয়ে গেছে। ও কী ভাবে, কি চিন্তা করে, তা প্রমদা বুঝতে পারে না। এমনকি ওর মুখের ভাষা পর্যন্ত যেন আলাদা। অথচ এই মেয়েকে বুকে করেই এই মেয়ের সুখের জন্যই প্রমদা অকালে নিজের সব সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করেছে। এক এক সময় তার মনে হয়, এর চেয়ে বকুলকে নিয়ে তার সেই কৃপানাথ দে লেনেই পড়ে থাকা ভালো ছিল। বাড়িওয়ালী মাসির মেয়ে আলতার মতো বকুলেরও সেখানে দর থাকত, আদর থাকত। আর বকুলের খাতিরে খাতিরে বাড়ত প্রমদার। সব আটঘাট, ফিকির-ফন্দি বকুলকে সে শিখিয়ে দিত। যেমন বাড়ীওয়ালি মাসি শেখায় তার মেয়েকে। হয়তো তাদের মধ্যে মাঝেমাঝে চুলোচুলি খুনোখুনি হত, যেমন আলতা আর তার মা বিনী মাসির মধ্যে প্রমদা হতে দেখেছে। কিন্তু ঝগড়া মিটে গেলে আবার সুখ দুঃখে কথাও হত দুজনের মধ্যে, একজন আর একজনের যত্ন করত, মাতাল হয়ে পড়ে থাকলে বিছানায় তুলে দিত, খারাপ অসুখ বিসুখ হলে প্রাণ দিয়ে সেবা করত, মা মেয়ে কেউ কারো কাছে কিছু লুকোত না। কেউ কাউকে ঘৃণা করত না। নিজের রক্তমাংসের মেয়েকে একেবারে নিজের করে পেত প্রমদা। বকুল তখন মা-র কাছ থেকেএমন দূরে দূরে থাকতে পারত না, মনে মনে এমন করে ঘৃণা করতে পারত না। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতে দিয়ে ভারি আহাম্মকিই করেছে প্রমদা।

কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করে অফিসে ঢুকে একমাস বাদে যখন মাইনের টাকাগুলি তার হাতে এনে দিল বকুল, প্রমদার মন অন্যরকম হয়ে গেল। সে যা ভেবেছিল তা নয়। মেয়েটার মনে তাহলে সত্যিই মায়া-মমতা আছে।

'এই কি সব টাকা, বকুল?'

'হ্যাঁ মা, সব।'

'হ্যাঁ রে, সব দিলি? তোর নিজের কাছে কিছুই রাখলি নে?'

'না মা, তোমার কাছেই সব থাক।'

এতখানি বিশ্বাস আলতা তার মাকে করত না। নিজের রোজগারের পুরো টাকা তো ভালো, অর্ধেক টাকা, সিকি টাকাও সে মাকে প্রাণ ধরে দিত না কোনোদিন। তার চেয়ে প্রমদার বকুল হাজার গুণ ভালো, লক্ষ গুণ ভালো।

প্রমদা এগিয়ে সস্নেহে মেয়ের চিবুক তুলে ধরল, 'হ্যাঁ রে বকুল, আমি কি তোর কাছে রোজগার চেয়েছি, টাকা চেয়েছি?'

বকুল বলল, 'কিন্তু সংসারে টাকারও তো দরকার আছে, মা।'

প্রমদা বলল, 'না কোন দরকার নেই। টাকা আমি যেমন করে পারি আনব। ঝি-গিরি করব, পান বিক্রি করব। টাকার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তোর কাছে আমি টাকা চাই নে।'

বকুল মৃদুস্বরে বলল, 'তবে তুমি কী চাও?'

'কী চাই? হতভাগী, তা কি তুই এতদিনেও বুঝতে পারলি নে? আমি আমার জামাই চাই, ঘর-ভরা নাতি-নাতনী চাই। সেই দোতলা বাড়ির বউয়ের মতো আমি তোকে ভরা-সংসারের মাঝখানে দেখতে চাই যে বকুল।'

প্রমদার দু-চোখ জলে ভরে উঠল।

বকুল কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে সরে গেল সামনে থেকে।

তারপর খেতে বসে মাকে আনমনা করার জন্যে নিজের অফিসের গল্প শুরু করল। খুব বড়ো অফিস। ঠিক যে-তেতলা বাড়িটার সামনে বসে প্রমদা পান বিক্রি করত, সেই বাড়ি। বকুলের মতো আরো কত মেয়ে আছে

সেখানে। শুধু মেয়ে? না, শুধু মেয়ে না, ছেলেরাও আছে। তাদের সংখ্যাই বেশি। মিলেমিশে কাজ করতে প্রথম প্রথম খুব লজ্জা করত বকুলের, এখন আর করে না।

প্রমদা অবাক হয়ে বলে, 'বলিস কি? আমাকে একদিন দেখিয়ে আনবি?'

বকুল হেসে বলে, 'বেশ তো যেও একদিন।'

কিন্তু ওই কথাই। সত্যি সত্যি প্রমদাও যায় না, বকুলেরও তাকে নিয়ে যাওয়ার কোনো গরজ নেই।

তারপর মাস পাঁচ-ছয় চাকরি করতে না করতেই মেয়ের বেশে বাসে চেহারায় বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষ করে প্রমদা। বকুল আগে পরত আটপৌরে মিলের শাড়ি, এখন রঙিন তাঁতের শাড়ি পরেই বের হয়। সে রং কখনো সবুজ, কখনো গোলাপি, কখনো হলদে। বকুলের নিজের গায়ের রং গৌর। ওকে সব রংই মানায়। আগে চুলের রাশ ছিল যেন বাবুই পাখির বাসা; এখন বকুল নিজেই বিনুনি করে। সে-বেণী কোমর ছাড়িয়ে অনেক নিচে যায়। কোনদিন বা আলগা খোঁপা বাঁধে বকুল। তাতেও ওকে চমৎকার দেখায়। স্নো-পাউডারের দিকে এতকাল মেয়ের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। এখন এক একটি করে সে-সবও আসতে শুরু করেছে। সময় বুঝে নিজের হার চুড়ি আর দুল মেয়েকে বের করে দিল প্রমদা। এর আগেও কয়েকবার দিয়েছে। কিন্তু বকুল কিছুতেই পরেনি।

এবার বলল, 'ওই সব ডিজাইন আজকাল কেউ পরে নাকি মা?'

প্রমদা মনে মনে হাসল—ভিতরে ভিতরে সব জ্ঞানই দেখি আছে মেয়ের।

বকুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'হাসছ যে।'

প্রমদা বলল, 'হাসলাম আবার কই। বেশ তো, ও-সব ডিজাইন পুরনো হয়ে গিয়ে থাকে, হালের নতুন ডিজাইন গড়িয়ে নে। দুবার বলার পর নিমরাজি, তিনবারের পর পুরোপুরি রাজি হয়ে গেল বকুল।'

তারপর ক্রমে মেয়ের চালচলন ভাবভঙ্গি দেখে আরো অনেককথা টের পেল প্রমদা। এ কেবল শাড়ি বদল নয়, মেয়ের ঘর-বদলের দিনও এসেছে। বকুল আজকাল আর শুধু মনে-মনে বই পড়ে না, সুর করে ছড়া আওড়ায়। ছড়া বললে বকুল ভাবি রাগ করে। ও বলে, কবিতা। বেশ, না হয় কবিতাই হল। তুই যা বলে খুশি হোস তাই বল। এতদিন বইয়ের শুকনো পাতা ছাড়া কোনো দিকে মেয়ের লক্ষ ছিল না। এখন গোছায়-গোছায় নিয়ে আসে রজনীগন্ধার ডাঁটা। একদিন চোখে পড়ল, বকুলের খোঁপায় লাল গোলাপ ফুল গোঁজা।

ও যখন ছোটো ছিল এক বিছানায় শুত প্রমদা। কিন্তু বড় হওয়ার পর মেয়ে নিজেই আলাদা বিছানা করে নিয়েছে। কিন্তু সে বিছানাও প্রমদা নিজে পেতে দেয়। মশারি গুঁজে আলো নিবিয়ে মেয়ের বিছানার কাছে সেদিন একবার দাঁড়াল প্রমদা, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'বকুল, আমার কাছে আর লুকোসনি। বল না সে কে?'

'কার কথা বলছ, মা?'

'তুই যাকে ভালোবেসেছিস। তোকে যে ভালোবেসেছে।'

'কী বাজে বকছ। আমাকে আবার কে ভালোবাসবে?'

প্রমদা একটু হাসল, 'আচ্ছা বকুল, তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি!'

বকুল তরল সুরে বলল, 'তুমিই আমার পেটে হয়েছ মা। লক্ষ্মী খুকু, যাও, এখন ঘুমোও গিয়ে। রাত অনেক হয়ে গেছে।'

প্রমদা হাসি চেপে নিজের বিছানায় গিয়ে শোয়। আজ গোপন করল, কিন্তু কদিন আর তার কাছ থেকে সব গোপন রাখতে পারবে বকুল। কালই হোক, পরশুই হোক, বলতে তাকে হবেই।

অনেক রাত অবধি সেদিন প্রমদার ঘুম এলো না। বার-বার মনে পড়তে লাগল সেই প্রথম মানুষটির কথা। সে বলেছিল প্রমদাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। প্রমদা বিশ্বাস করেছিল। ভেবেছিল, মানুষের সব কথাই বুঝি সত্যি। প্রমদা ভারি বোকা ছিল তখন। তারপর ক্রমে বয়স বাড়ল, জ্ঞান বুদ্ধি বাড়ল। প্রমদা চিনতে শিখল মানুষকে। এমন অবিশ্বাসী জীব দুনিয়ায় আর দুটি নেই। তার কথা মানেই মিছে কথা। কিন্তু এমন শুভদিনে এ-সব অলক্ষুণে কথা মনে আনছে প্রমদা। তার চেয়ে বকুলের যে-বর আসবে তার কথা ভাবুক। পরান জুড়িয়ে যাবে। তার অল্প বয়স, কিন্তু অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি। যেমন রূপ তেমনি স্বাস্থ্য। এতকাল তপস্বিনী থেকে বকুল কি আর যাকে তাকে পছন্দ করেছে! সে কি প্রমদার তেমন মেয়ে!

আর একদিন মেয়েকে প্রমদা অনুরোধ করল, 'তার নামটা আমাকে বল না, বকুল।'

বকুল ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কী যে বল, মা। কার নাম আবার বলব?'

প্রমদা একটু হাসল, 'নাম ধরে ডাকতে তোর লজ্জা করছে, আচ্ছা তাকে তুই আপিসের পর একদিন আমার কাছে নিয়ে আয়। আমি তার কাছে থেকেই সব জেনে নেব—'

বকুল একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'তাকে কি এই-সব জায়গায় আনতে পারি মা?'

প্রমদা বলল, 'খুব বড়োলোক বুঝি? তবে থাক, এই বস্তির মধ্যে তাকে আর এনে কাজ নেই। এবার একটা ভালো ঘর-টর দেখে উঠে যেতে হবে। আর এই নোংরা বস্তির মধ্যে আমরা পড়ে থাকব না।

বকুল যেন নিজের মনেই বলল, 'শুধু বাড়িঘর বাদলালেই বা কী হবে।'

প্রমদা একদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ নিজের মা বদলাতে না পারলে বুঝি তুই আর তাকে আনবি নে।! আমাকে এত ঘেন্না তোর! কেন কী করেছি আমি? জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তুই আমাকে মদ খেতে দেখেছিস, না কোন পুরুষের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করতে দেখেছিস, যে এত ঘেন্না করবি তুই আমাকে? হায়, হায়,দুধ-কলা দিয়ে এতদিন কি সাপই আমি পুষেছি রে! এর চেয়ে তখন যদি বিনী মাসির কথা শুনতুম, বিক্রি করে দিতুম, সে-টাকা আমার আখেরে লাগত।'

বকুল বলল, 'চুপ কর মা। ঘরে-ঘরে সবাই কান পেতে রয়েছে। সবাই শুনতে পাচ্ছে তোমার কথা।'

প্রমদা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'শুনুক, আমার বয়ে গেল।'

ঘর-সংসারের কাজ সেরে খানিক বাদে প্রমদা মেয়ের খোঁজ নিতে এসে দেখল, বকুল তার ছোট্ট টেবিলখানির উপর মাথা নুইয়ে চুপ করে রয়েছে। পিঠ ভরে ছড়িয়ে পড়েছে কালো চুলের রাশ। প্রমদা আস্তে আস্তে সেই চুলগুলির উপর হাত রাখল। পরের বাড়িতে বাটনা বেটে-বেটে ক্ষয়ে গেছে, ফেটে গেছে আঙুলগুলি। বকুলের মসৃণ চুলের রাশের ওপর নিজের খরখরে, খসখসে হাতখানা রেখে একটুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল প্রমদা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বকুল, তুই কাঁদিস নে। সত্যি আমি তোর মা হওয়ার যুগ্যি নই মা, আমি যুগ্যি নই।'

বকুল হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে ছোটো মেয়ের মতো প্রমদাকে আঁকড়ে ধরল, 'ও-কথা বলো না, মা।'

জল-ভরা ঝাপসা চোখে আর দুটি ছলোছলো কালো চোখের দিকে তাকাল প্রমদা, তেমনি আস্তে-আস্তে বলল, 'সত্যি বকুল, আমি তোর মা-নই। আমার কথা তার কাছে তুই বলিস নে। বলিস, তোর আসল মা তোর ছেলেবেলায় মরে গেছে। সে ঠিক তোর মতোই ছিল, তোর মতই লেখাপড়া জানত, ভদ্দরলোকের ঘরে থাকত, ভদ্দরলোকের সঙ্গে মিশত। আমি তোর মা নই বকুল, সে-ই ছিল তোর আসল মা। আমি কেবল তোকে পেলে পুষে বড়ো করেছি।'

বকুল ধরা গলায় বললে, 'কোথায় বড়ো করেছ মা, আমি সেই ছোটোই রয়ে গেছি।'

প্রমদা নিজের কথাই বলে চলল, 'তাকে আমার কথা বলে দরকার নেই, তাকে আমার সামনে এনে দরকার নেই তোর। শুধু একবার আড়াল থেকে আমাকে দেখাস। এখানে আনতে হবে না। আমি তোর অফিসের সামনে বসে পান বেচতে বেচতে একবার শুধু তার মুখখানা দেখে নেব।'

বকুল বলল, 'ছিঃ মা। আবার ও-সব কথা বলছ। আমি তাকে এখানে নিয়ে আসব। সে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমাকে প্রণাম করবে। সে মোটেই অহংকারী নয় মা। সে বড়ো ভালো।'

'সত্যি।' প্রমদা একটু হেসে মেয়ের দিকে তাকাল। দুজনেরই চোখে জল, ঠোঁটে হাসি!

বকুল লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'হাঁ মা সত্যি। অত ভালো আমি আর কাউকে দেখিনি।'

প্রমদার দুটি কান যেন মধুতে ভরে গেল। আর তার কিছু জানার দরকার নেই? নাম নয়, ধাম নয়, অবস্থার কথা নয়। মানুষ ভালো হলেই সব হয়। ভালোবাসলেই সব পায়।

কিন্তু তারপর ফের মাস দুই যেতে না যেতেই দেখা গেল, বকুলের আবার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ওর মুখে হাসি নেই। গলা ছেড়ে কবিতা পড়া বন্ধ হয়েছে। চুল বাঁধায়, রঙিন শাড়ি পরায় তার ফের সেই ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে। কদিন বাদে গয়নাগুলিও বকুল খুলে ফেলল।

প্রমদা এবার রাগ করে বলল, 'তোর কী হয়েছে রে?'

বকুল বলল, 'কী আবার হবে?'

প্রমদা বলল, 'নিশ্চয়ই ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে।'

বকুল চুপ করে রইল।

প্রমদা এবার হেসে বলল, 'যত ভালো ছেলে আর ভালো মেয়েই হোক, দুজনে কাছাকাছি এলে ঝগড়া দু-চাব বার হবেই। সেই দোতলার বউটিকেও দেখতুম। সোয়ামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনরাত যেমন ভাব ঠিক তেমনি ঝগড়া। ঝগড়া শুনে মনে হত ওরা বুঝি কোনদিন জীবনে কেউ আর কারো মুখ দেখবে না। কিন্তু দু-দণ্ড যেতে না যেতেই আবার তাদের মধ্যে বেশ মিলমিশ হয়ে যেত। বিয়ে করা সোয়ামী, একজন আর একজনকে ফেলে যাবে কোথায়। তোরা এবার বিয়ে করে ফ্যাল বকুল।'

মুখ নিচু করে বকুল বলল, 'তার আব উপায নেই মা।'

প্রমদা চমকে উঠে বলল. 'সে কি বে! বিয়ে করার উপায নেই কেন? সে কি জাতের কথা তুলেছে? তাকে বলিস. তুই বামুনের মেয়ে। আমি যা-ই হই, জাতে সে বামুনই ছিল।পইতে ছিল গলায়। বামুনের চেয়ে তো উঁচু জাত কিছু আর নেই। তাব মেয়েকে সবাই বিয়ে করতে পারে।'

বকুল তেমনি নতমুখে বলল, 'বামুন-কায়েতের কথা নয় মা. তার ঘরে বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে। আমাকে সে আব বিয়ে করতে পারে না।'

প্রমদা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বলল, 'গোড়া থেকে তুই সব জানতিস?'

বকুল বলল, 'না। আমিও তাকে সব কথা জানাইনি, সে-ও আমাকে সব কথা বলেনি। কিন্তু তার কথা যে এত মারাত্মক সে আমি ভাবতে পাবিনি মা।'

প্রমদা মেয়েব দিকে তাকিয়ে আবো কিছুক্ষণ চুপ কবে রইল, তারপব বলল, 'কিন্তু বিয়ে করেছে, করেছে; ছেলেমেয়ে আছে, আছে। তোব কাছে তাকে আসতেই হবে। অমন কত সুন্দরী গরবিনী বউয়েব স্বামী. কত সোনাব চাঁদ ছেলেমেয়ের বাপকে আমি ঘব ছাড়িয়েছি, আব তুই একজনকে ছাডাতে পারবি নে? খুব পারবি। কী করে পারতে হয় আমি তোকে শিখিয়ে দেব।'

বকুল, 'ছিঃ মা, চুপ কর।'

আস্তে-আস্তে সেখান থেকে উঠে গেল বকুল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের সেই যাওয়াব দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে প্রমদা দ্রুতপায়ে তার পিছন পিছনে গেল। তারপব খপ করে মেয়েব একখানা হাত শক্ত করে ধরে কঠিন স্বরে বলল, 'বকুল, আমাব দিকে তাকা। আমাব চোখেব দিকে চেয়ে কথা বল।'

কিন্তু বকুল আর মুখ তুলল না।

প্রমদা মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘবের এক কোনায নিয়ে এলো। দোর-জানলা সন্তর্পণে বন্ধ করে গলা নামিয়ে বলল. 'পোড়ারমুখী, নিজের এমন সর্বনাশ কেন করতে গেলি। তুই-না লেখাপড়া শিখেছিস!'

বকুল তেমনি চুপ করে রইল।

প্রমদা বলল, 'আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তুই আমার পেটের মেয়ে আমার চোখে এই তিন মাস ধরে ধুলো দিয়েছিস, আমার কাছে কেবল মিছে কথা বলেছিস। কেন এমন সর্বনাশ করলি বকুল? কেন না জেনে-শুনে নিজেকে এমন করে বিলিয়ে দিলি! ভেবেছিলি সব দিলেই বুঝি সব পাবি। ওরে পোড়াকপালী, যারা অমন করে নেয়, তারা কিছুই দেয় না;কিছুই দেয় না।' চাপা কান্নায় গলা ধরে এল প্রমদার।

কিন্তু বকুলের চোখে একফোঁটাও জল নেই।

সে শান্ত স্বরে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও মা, যেতে দাও আমাকে।'

প্রমদা বলল, 'কোথায় যাবি তুই মুখপুড়ী, দুদিন বাদে যে আর তুই বেরুতেও পারবি নে। তোকে ঘরেই বা কদিন আমি লুকিয়ে রাখতে পারব। আমার সেই বিনী মাসি এখনো বেঁচে আছে। তোকে তার কাছে রাখব। সে সব ফিকির-ফন্দি জানে। ডাক্তার-বদ্যির বাবা। চল আমার সঙ্গে।'

বকুল শঙ্কিত হয়ে বলল, 'না মা, সেখানে আমি এক মুহূর্তও টিকতে পারব না।'

প্রমদা বলল, 'ইশ্, কি আমার সতীসাধ্বী রে। না টিকতে পারবার কী হয়েছে। সে তোকে নিজের মেয়ের মতো রাখবে।'

বকুল বলল, 'না। আমার জন্যে তোমাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার ব্যবস্থা আমি নিজে করব।'

প্রমদা রাগ করে বলল, 'কী ব্যবস্থা করবি তুই! এ-সবের কী তুই জানিস! ব্যবস্থা করতে করতে বুড়ি হয়ে গেলাম। তবু এখনো আমাদের গা কাঁপে।'

বকুল মৃদু হাসল, 'আমার গা কাঁপে না, মা। তার সব চিহ্ন আমি মুছে ফেলব।'

প্রমদা বলল, সেই হাড়হাভাতে আঁটকুড়োর ব্যাটার নামটা এবার বল। সব খরচ তার কাছ থেকে আদায় করব, সহজে না দেয় আদালতে নালিশ করব। কী নাম তার?

বকুল বলল, 'তার নাম মুখে আনার মত নয়, মা। এতদিন যখন শোননি, আজও সে-নাম তোমার শুনে কাজ নেই।'

প্রমদার কোনো পরামর্শই বকুল নিল না। অফিস থেকে একমাসের ছুটি নিল। গয়না বিক্রি করল। মোটা-মোটা বইগুলি সব বিক্রি করে ফেলতে তার চোখে জল এল।

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রমদার পায়ের ধুলো নিয়ে বকুল বলল, 'আসি মা।'

প্রমদার মনে পড়ল, বকুল বলেছিল, তার পায়ের ধুলো আর-একজন এসে নেবে। প্রমদা ভেবেছিল ওরা দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেবে। সেদিন আর এলো না। আজ না আসুক একদিন আসবেই। যেমন করে পারুক বকুলের বিয়ে দেবেই প্রমদা। বয়সের মেয়ে। শরীর সারতে ওর আর কদিন লাগবে।

প্রমদা বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস? কত দূরে?'

বকুল বলল, 'দূরে নয়, মা। এই শহরের মধ্যে। খুব ভালো ডাক্তারখানা। ভারি যত্ন করে। টাকা পেলে তারা সব করে।'

প্রমদা বলল, 'আমাকে ঠিকানা দিয়ে যা। আমি তোকে দেখতে যাব।'

একটু ইতস্তত করে এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিল বকুল।

প্রমদা সেই কাগজখানা হাত পেতে নিয়ে বলল, 'দাঁড়া।'

তারপর বাক্সর ভিতর থেকে একটা পুরনো কবচ এনে বকুলের বাহুতে যত্ন করে বেঁধে দিয়ে বলল, 'এটা পরে থাকিস, বকুল। আমাদের বিনী মাসির দেওয়া কবচ। আপদে-বিপদে সকলেই এতে ফল পেয়েছে। তুই তো বিনী মাসির কাছে গেলি নে। ও সময় কিন্তু তার নামটা স্মরণ করিস। ধন্বন্তরী আমাদের বিনী মাসি। পুরো নাম বিনোদিনী দাসী। মনে থাকবে, বকুল?'

বকুল একটু হেসে বলল, 'থাকবে।'

দুদিন বাদে সেই গোপন ডাক্তারখানার লোকেই রাত্রির অন্ধকারে গোপন সংবাদ বয়ে নিয়ে এলো বকুলকে বাঁচানো যায়নি।

মাস-কয়েকের জন্যে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রমদার। পোড়া অফিসের ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে দাবি করত, কে আমার মেয়েকে খুন করেছে, বাপের বেটা হও তো বলো। তাকে ফিরিয়ে দাও।'

গোলমালে কাজের ক্ষতি হয়। অফিসের দারোয়ান পাগলীকে জোর করে বের করে দিয়েছে। তারপর থেকে কিছুতেই তাকে আর ভিতরে ঢুকতে দেয়নি।

বন্ধ-দরজায় মাথা ঠুকতে ঠুকতে মাথা ফের ঠিক হয়ে গেছে প্রমদার। পাইকপাড়ার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আবার সে ঠিকে-কাজ নিয়েছে। দুপুরবেলায় পানের পুঁটলি নিয়ে অফিসের সামনে আগের মতো ফের বসতে শুরু করেছে। তার বকুলের অফিস।

পান বিক্রি করতে করতে প্রমদা প্রত্যেকটি যুবকের মুখের দিকে তাকায়। তার ঝাপসা চোখে আর জ্বালা নেই। সে জানে, কোনোদিন সে শোধ নিতে পারবে না। শোধ নিতে আর চায়ও না প্রমদা। কি হবে শোধ নিয়ে। যে গেছে তাকে কি আর ফিরে পাবে! শোধ নিতে চায় না প্রমদা। শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। বকুল যাকে ভালোবেসেছিল তার মুখখানা কেমন। শুধু একবার দেখবে।



একজিবিশন

—'শুনুন, আমার জন্যেও টিকেট কিনবেন একখানা।'

বসন্ত শুনেছিল ঠিকই, কিন্তু কথাটার লক্ষ্য যে সে-ই, সেইটেই অমুমান করতে পারেনি। একে তো এখানে সে এসেছে মাত্র দিন-চারেক, আস্তানা নিয়েছে একটা হোটেলে, তার ওপর নতুন জায়গায় এ পর্যন্ত একটি মানুষের সঙ্গেও তার আলাপ হয়নি। সুতরাং মেয়েলি গলায় পেছন থেকে কেউ তাকে এমনভাবে অনুরোধ জানাতে পারে—বসন্ত তা অনুমানও করেনি।

কিন্তু এবারে আলতো হাতের ছোঁয়া লাগল গায়ে। চমকে মুখ ফেরাল বসন্ত।

কুড়ি থেকে পঁচিশ পর্যন্ত যে-কোনো বয়সের একটি মেয়ে। কাঁধ পর্যন্ত ফাঁপানো রুক্ষ চুল। তুলির সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা ভ্রু, মুখে কড়া প্রসাধন। গলায় লাল 'বীডে'র মালা। নাইলনের স্বচ্ছ শাড়ি গায়ের ওপর থেকে পিছলে পড়তে চাইছে।

ভীত মৃদু গলায় মেয়েটি আবার বললে, 'দয়া করে একটা টিকেট নেবেন আমার জন্যেও!'

—'আচ্ছা, নিচ্ছি'—বলেই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করলে বসন্ত। কিন্তু মেয়েটি হাতব্যাগ খুলল না। একটু বিভ্রান্ত হল বসন্ত, লজ্জিতও। মাত্র চার আনা পয়সার জন্যে—ছিঃ ছিঃ।

দুখানাই টিকিট কিনে কাউন্টার থেকে সরে এসে সে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিলে একখানা। তবুও ব্যাগ খুলল না মেয়েটি, টিকেটও নিলে না। বললে, 'চলুন না, একসঙ্গেই ভেতরে যাই।'

বসন্ত ভালো করে তাকিয়ে দেখল এবার। জিজ্ঞাসা মিটে গেছে। মেয়েটি যেন হাঁপাচ্ছে অল্প-অল্প, শঙ্কিতভাবে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল বসন্তর ঠোঁটের কোণায়।

—চলুন না ভেতরে, কী হবে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে? আবার আলগা ছোঁয়া লাগল বসন্তের বাহুতে।

ঠিক এইটেই যেন আশা করেছিল বসন্ত। একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, নামিয়ে ফেলল ঠোঁট থেকে। তারপব বললে, 'আচ্ছা চলুন।'

গেট পেরুতেই ইলেকট্রিকে আর নিয়ন টিউবে ঝলমলে সোডা ফাউন্টেন। তারপরেই গোটাকয়েক গাছের ছায়ায় দ্বীপ—চারদিকের অসংখ্য স্টল, অস্বাভাবিক আলো আর অগণ্য মানুষের ভিড়ের মাঝখানে একটুকরো প্রায়ান্ধকার। ইচ্ছে করেই হয়তো কর্তৃপক্ষ আলো দেয়নি এখানে, লোকে দু-এক মিনিটের জন্যে জ্বালাধরা চোখকে জুড়িয়ে নেবে—চুরুট, প্রসাধন, ভাজা মাংস আর নতুন বার্নিশের গন্ধে জর্জরিত স্নায়ুগুলোকে তৃপ্ত করে নেবে ঠান্ডা মাটি আর কচি পাতার সুঘ্রাণে।

এই পর্যন্ত এসে বসন্ত মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটিও দাঁড়াল। দশ-বারোজন লোকের একটা মস্ত বড়ো দল পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পর, আবছা আলোয় আশ্চর্য শীর্ণ আর সংকুচিত মেয়েটিকে সে পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'পুলিশে তাড়া করেছিল?'

জবাবা এল না। আরো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি।

— 'গেট তো পার করে দিয়েছি। এবার আমাকে ছাড়ো দয়া করে।' বলেই পা বাড়াল বসন্ত।

'শুনুন?'

আবার ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে ফেলে অসীম বিরক্তিতে বসন্ত ঘুরে দাঁড়াল।

—'কী হয়েছে, জ্বালাচ্ছ কেন ফের?' —গলার স্বরে একরাশ ঘৃণা মিশিয়ে বললে, 'তুমি ভুল লোককে ধরেছ, আমি তোমার শিকার নই!'

'এক মিনিট দাঁড়াতেও পারেন না?'

গলার আওয়াজটা এবার তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। বসন্ত ভুরু কোঁচকাল।

'ও বুঝেছি।' — ব্যাগ খুলে পাঁচ টাকার নোট বের করল একটা। বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এই নাও—এবার মুক্তি দাও আমাকে।'

'আমি ভিখিরি?' — মেয়েটার তুলি-আঁকা ভ্রু বসন্তের চাইতেও সংকুচিত হল, কালি পড়া চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল একবার। তারপর বললে, 'অনেক উপকার করেছেন আমার, আর দরকার নেই। ধন্যবাদ।'

একটা কুৎসিত গাল দেবার প্রলোভন অনেক কষ্টে সম্বরণ করল বসন্ত। মেয়েটার দিকে একবারও আর না তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলল স্টলগুলোর দিকে। আপদের শান্তি হল।

কোথায় যাওয়া যায়?

যাওয়ার জায়গা অনেক। প্রথমেই সোডা ফাউন্টেনে ঢুকে একটা কোল্ডড্রিঙ্কে ভিজিয়ে নেওয়া যায় গলাটা। কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবা যায় কিছু কিনবে কিনা কিংবা কিনবার মতো কিছু আছে কিনা। আর কিছু না হোক, ফেনিল পানীয়ের ভেতর স্ট্র-টা দিয়ে পাঁচ-দশ মিনিট খেলাও করা যেতে পারে বসে বসে।

তাই করল।

ভিড়, দারুণ ভিড়। ভ্যানিলা, কোকাকোলা, প্রসাধন, হেয়ার-ক্রিম , সিগারের গন্ধ। পুরুষের মোটা গলার হাসি, মেয়েদের জলতরঙ্গ। শাড়ি, সুট, সালোয়ার, চোস্ত-চুড়িদারের সমারোহ।

একটা লেমন স্কোয়াশ সামনে নিয়ে প্রত্যেকের মুখগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখতে চাইল বসন্ত। নিয়নের কড়া সাদা আলোয়, ঝিলিমিলি কাচে, পানীয়-বাহিনী বিদেশিনীর স্থূল ছবিতে চড়া রঙের ওয়ালপেপারে প্রত্যেকটা লোককে তার অস্বাভাবিক বলে মনে হল। একটা বাঁকা আয়নার ভেতরে যেন সকলকে দেখতে পাচ্ছে সে— মেয়েদের রঙিন ঠোঁট চিড়িয়াখানায় দেখা বাঘকে স্মরণ করিয়ে দেয়, পুরুষের ভারী ভারী মুখের পেশি-গুলোর নড়াচড়া যেন জাবর-কাটা ষাঁড়ের উপমা মনে আনে। এই ভাবেই ইম্‌প্রেশনিস্টিক হয় নাকি মানুষ?

লেমন স্কোয়াশটা বড্ড বেশি টক লাগছিল, আর একটু সোডা চাইলে হত। কিন্তু সোডা চাইতে গিয়েও অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মেয়েদের ঠোঁটগুলোকে বাঘের মতো মনে হওয়ার কারণ আছে। একটু আগেই সে এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিল। যথাসময়ে সতর্ক না হলে জাবরকাটা ষাঁড়ের দুর্গতি ছিল তারও অদৃষ্টে।

তবু মুক্তির আনন্দে বসন্ত খুব বেশি আত্মপ্রসাদ পেল না। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধতে লাগল খচ খচ করে।

সেন্টিমেন্ট — ছোট্ট একটুকরো সেন্টিমেন্ট। বাংলাদেশ থেকে পাঁচশো মাইল দূরের এই শহরে একটি বাঙালির মেয়ে বাঁচব্যর জন্যে বীভৎসতম অপমানের পথ বেছে নিয়েছে, এইটেকে কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না। অহেতুক বাঙালি-প্রীতি বসন্তর নেহ—ইহুদি-সদুক্তির মতো বঙ্গসন্তান যে ভারতের লবণ, একথাও সে কোনোদিন ভাবে না। পাকিস্তানের হিসেব বাদ দিয়ে আন্দাজ কোটি তিনেক বাঙালির দায়িত্ব নেবার কথাও সে কল্পনা করে না। তবু বসন্তের মনে হল, একটা ছোট্ট কাঁটা কোনোমতেই নামতে চাইছে না। মেয়েটি বাঙালি না হলেই ভালো হত।

লেমন স্কোয়াশের আধখানা ঠেলে রেখে পয়সা মিটিয়ে বসন্ত উঠে পড়ল। সিগারেট ধরিয়ে এলোমেলোভাবে এগিয়ে চলল একজিবিশনের ভেতর!

ভিড়, অসম্ভব ভিড়—কাপড়ের স্টলে, টয় শপে, চায়না সেটের দোকানে, কিউরিয়োতে, এমন কি বইয়ের দোকানে পর্যন্ত। শুধু একটা ছবির দোকানে দাঁড়াবার জায়গা আছে। একবার চোখ পড়তেই বেশ বোঝা গেল কারণটা। কলকাতার ওয়েলেসলির একটি ছোট্ট দোকানকে যেন কে এখানে এনে বসিয়ে দিয়েছে অত্যন্ত বেমানান ভাবে। স্টলটি নিয়েছে কোনো এক ভক্ত ক্রিশ্চান।

মেরির কোলে জ্যোতির্ময় শিশু খিস্ট থেকে গোলগোথার ক্রসে বেঁধা যন্ত্রণার মানুষটি পর্যন্ত কেউ বাদ নেই।

রক্তাক্ত শরীর, ক্রসের ওপর এলিয়ে পড়া মাথা, আধবোজা চোখ, মুখে শিশুর মৃত্যু-কাতরতা খ্রিস্টের ছবিটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বসন্ত। কোনো মাস্টার আর্টিস্টের ছবির নকলের নকল, তারও নকল। তবু যন্ত্রণাটা

কী বাস্তব—ছবিটা কী জীবন্ত! আশ্চর্য, খ্রিস্টের ওই ছবিটা মনের সামনে রেখে কীভাবে নরহত্যা করতে পারে ইয়োরোপের মানুষ।

ছোটোখাটো চেহারার মাঝবয়সি স্টলওয়ালা এগিয়ে এল বসন্তর কাছে। শান্ত গলায়, দক্ষিণী ইংরিজি উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করল ঃ নেবেন কোনো ছবি? আরো ভালো ভালো জিনিস আছে আমার কাছে।

'না ধন্যবাদ, এমনি দেখছিলুম।'

'বেশ বেশ, দেখুন। নেভার মাইন্ড।'

স্টলওয়ালা ফিরে আবার তার কাঠের টুলে গিয়ে বসল, পকেট থেকে কালো চামড়ার বাঁধানো একটা বই বের করে পড়তে আরম্ভ করল একমনে। বসন্ত লক্ষ করল, সরু কারের সঙ্গে একটা ছোট্ট রুপোর ক্রস ঝুলছে তার বুকের ওপর।

'এই যে, ছবি দেখছেন?'

বসন্ত পেছন ফিরল। সেই মেয়েটি।

খ্রিস্টের এই ছবি, বাইবেলের মধ্যে ডুবে যাওয়া ওই মানুষটি, ম্যাডোনা-ডেল-গ্র্যান্ডুকার অমৃতবর্ষিণী চোখ -- সব মিলিয়ে চমৎকার একটা ভাবমণ্ডল তৈরি হচ্ছিল বসন্তর মনে। হঠাৎ যেন তার সুর কেটে গেল, কেমন অশুচি হয়ে উঠল সমস্ত।

'তুমি এখানে এসেও জুটেছ?' —একটু আগেকার সহানুভূতি ভুলে গিয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করল।

'কেন — আসতে নেই? একজিবিশনের স্টল তো সকলের জন্যেই! -- অদ্ভুত নির্লজ্জ মেয়েটা।'

দোকানদার বাংলা বোঝে না জেনেই বসন্ত বললে, না সব জায়গা সকলের জন্য নয়। অন্তত যিশুখ্রিস্টের কাছে তুমি এবার এসে না দাঁড়ালেই ভালো করতে।

'তাই নাকি?' — বাঘিনীর রক্ত-ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসল মেয়েটা ঃ খ্রিস্ট নিজে বোধহয় অন্য কথা বলতেন'

বসন্ত চমকে উঠল। ঠিক এমনি একটা জবাব সে আশা করেনি।

'হুঁ, বেশ কথা বলতে পারো দেখা যাচ্ছে।'— স্টল থেকে বেরিয়ে এল বসন্ত ঃ লেখাপড়াও বোধহয় কিছু জানো! এ পথে পা দিলে কেন?'

মেয়েটিও এসেছিল পেছনে পেছনে। সামনের দোকান থেকে একঝলক নীল আলো তার মুখে এসে পড়েছে। সে আলোয় বসন্ত বাঘিনীকে দেখতে পেল না— অদ্ভুত সুন্দর আর শান্ত দেখাল মেয়েটার চেহারা। বসন্তর জীবনে প্রথম আর শেষ প্রেম নিয়ে যে এসেছিল, বর্ষার এক-একটা ছায়ামন্থর দিনে এমনি দ্যাখাতো তার মুখ।

মুহূর্তের জন্যে কোমল হতে পারত বসন্তর মন, একবার বলে ফেলতে পারত ঃ এ পথ ছেড়ে দিয়ে তুমি নতুন করে বাঁচতে চেষ্টা কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব—কিন্তু সে কথা বলবার সুযোগ সে আর পেল না। তার আগেই মেয়েটা বললে, তা শুনে আপনার লাভ কী? তার চেয়ে সামনে ওই যে নাগরদোলা ঘুরছে— ওইটেতে কিছুক্ষণ চড়বেন আমার সঙ্গে?

আবার— আবার সেই হিংস্র ইচ্ছেটা চাড়া দিয়ে উঠল বসন্তর মাথার মধ্যে। ইচ্ছে করল সোজা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে।

— চুলোয় যাও—

একটা চাপা গর্জন করে এগিয়ে গেল বসন্ত। পেছনে সেই মেয়েটার হাসির আওয়াজ। ঠাট্টা করছে। সেই পাঁচ টাকা দিতে চাওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছে আমাকে এইভাবে।

—উইচ!

পা চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সে।

আবার ইতস্তত। কোনো লক্ষ নেই— কোনো কাজ নেই। অনেক ঘুরে ঘুরে কিনল একটা শৌখিন লাইটার আর চার টাকা দিয়ে একটা বিলিতি টাবসোপ। সাবানটা কেন কিনল সে নিজেই জানে না। কলকাতার বাড়িতে উঠোনের খোলা কলেই তার চিরদিন স্নান করবার অভ্যাস। হয়তো একটা সাবানের দাম চার টাকা —এইটেই তার কৌতূহল জাগিয়েছিল, কিংবা রঙিন মোড়কটাও ভালো লেগে থাকবে।

এক জায়গায় অ্যামপ্লিফায়ারে রক-এন-রোলের হিন্দি সংস্করণ বাজছে। এমনিতেই বস্তুটা তার কুৎসিত লাগে

—তার ওপর ওই বোম্বাই রূপান্তর শুনে গা ঘিনঘিন করে উঠল। আশপাশের কয়েকজন এরই মধ্যেই পা ঠুকছে —একটু পরেই বোধহয় নাচতে আরম্ভ করবে। সে দুর্ঘটনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হল না বসন্ত। ক্যানাডিয়ান শার্ট রক-এন-রোল, হিন্দি সিনেমার পোস্টার 'মাদার ইন্ডিয়া'। তিনটে মিলিয়ে যেন একটা যোগসূত্র।

ইমপ্রেশানিজম!

তার চাইতে সামনের ওই ক্লাউনটাই ভালো।

একটা উঁচু টুলের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। পরনে কালো ডিনার সুট — অবশ্য জরাজীর্ণ। গলায় চড়া সবুজ রঙের একটা বেমানান টাই। মাথায় আধভাঙা শোলা হ্যাট। চিত্র-বিচিত্র মুখ—হাতে টিনের চোঙা। সেই চোঙার ভেতর দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করে লোক ডাকছে।

'দি গ্রেট অরিয়েন্টাল সার্কাস ঃ টিকেট টু অ্যানাজ — অনলি টু অ্যানাজ—'

সবটা মিলিয়ে বসন্তর মনে হল, অরিয়েন্টাল সার্কাসই বটে। একটা নয়—অসংখ্য ক্লাউন। আর লায়ন-টাইগারের বিউটি প্যারেড। আর সেই মেয়েটা!

কী আশ্চর্য, কিছুতেই ভুলতে পারছে না! নিজের ওপরেই তার বিরক্তি বোধ হল। সেই বাঙালি সেন্টিমেন্ট। কিন্তু কোনো মানে হয়। আরো বিশেষ করে ওই মেয়েটার সম্পর্কে?

দু-আনা খরচ করে ঢুকেই পড়বে কিনা ভাবতে ভাবতে আবার সেই রক-এন-রোল। এখানেও? অসহ্য!

ঘুরতে ঘুরতে নাগরদোলাটার সামনে। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল হঠাৎ।

সেই মেয়েটাই।

দোলনাটা থেমে আসছে আস্তে আস্তে। আর একই দোলায় মেয়েটি বসে আছে বাইশ-তেইশ বছরের কাপ্তান চেহারার একটি ছোকরার সঙ্গে। আর দুজনেই হাসছে। হাসছে অশ্লীল খুশিতে। শিকার ধরেছে বাঘিনী।

চলে যেতে গিয়েও পারল না বসন্ত। কোনো কারণ নেই—তবু তার সারা শরীর জ্বালা করে উঠল।

মেয়েটা যদি বাঙালি না হত—

হিংস্র দৃষ্টি মেলে বসন্ত দাঁড়িয়ে রইল।

দোলনা থেকে নামল দুজনে। ছোকরা কী যেন বললে মেয়েটাকে — মেয়েটা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ রাজি হল না। ছোকরা একটা শিস দিলে, চোখের কুৎসিত ভঙ্গি করলে একবার, তারপর সরে গেল সেখান থেকে।

বসন্ত এগিয়ে গেল এবার।

— শোনো!

এবারে মেয়েটার চমকাবার পালা।

—আপনি?

বসন্তর গায়ে তখনো জ্বলছিল আগুনটা।

—এসো কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে? —তুলিতে আঁকা ভ্রূদুটো বিস্ময়ে প্রসাবিত হয়ে গেল।

অন্য সময় হলে এ ধরনের ছেলেমানুষি বসন্ত ভাবতেও পারত না। কিন্তু এই খেয়ালখুশির রাত, একজিবিশনের আলো, এই মানুষ আর গন্ধের ভিড়—ওই ছোকরাটা, সব মিলিয়ে কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। তার মনে হল, মেয়েটার জন্যে এখুনি তার কিছু করা উচিত— এই মুহূর্তেই। একেবারে রসাতলে ডুবে যাওয়ার আগেই তার কিছু কর্তব্য আছে।

—এসো—

স্পষ্ট আদেশের সুর। কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে মেয়েটা তাকিয়ে রইল বসন্তের দিকে। তারপর হাসল মৃদু রেখায়।

—চলুন—

—বসো এইখানে— আবার আদেশ করল বসন্ত।

আলোয় ঝিলমিল করছে ছোটো লেকের জলটা। সেই আলোয় রাত্রির ঘুমন্ত পদ্মগুলো যেন থেকে থেকে চমকে উঠছে। অল্প অল্প হাওয়ায় ঝাউয়ের শুকনো ফল ঝরছে জলের ওপর —শিশির পড়ার মতো আওয়াজ হচ্ছে। এখানেও ভিড় খুব বেশি নয়। স্টলের আলোর নেশা কাটিয়ে এখানে আসতে ইচ্ছে করে না সহজে।

তবু দু'চারজন আছে এদিক ওদিকে। প্রায়ই জোড়ায় জোড়ায়। সিগারেট জ্বলছে, সিগার জ্বলছে। আলোক ঝলক-লাগা জলে চমকে জেগে-ওঠা পদ্মগুলোও যেন ফিস ফিস করে কথা কইছে।

ঝাউ গাছের নীচে, কর্কশ খানিকটা শীর্ণ ঘাসের ওপর বসে পড়ল দুজনেই।

ঠিক পাশাপাশি নয়---অনেকখানিই দূরত্ব রাখল বসন্ত।

—কী নাম তোমার?

—কী করবেন শুনে? — আবছা অন্ধকারে আবার সুদূর হয়ে গেছে মেয়েটা। ঠোঁটের রক্তলেখা, কুটিল তীক্ষ্ণ চোখ—কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন।

—বলতে আপত্তি আছে?

— না, নেই। নাম এক সময় চম্পা ছিল। এখন চাঁপা।

চম্পা থেকে চাঁপা। অর্থটা খুব সহজ। ভদ্র জীবনের চিহ্ন রাখব না। সবই যখন বদলেছে, তখন নামটাও 'ভালগার' করে নেওয়াই ভালো। বসন্ত ঠোঁট কামড়ে ধরল।

—বাড়ি কোথায় ছিল তোমার?

—বুঝতেই পারছেন এক সময়ে বাংলাদেশে ছিল। কিন্তু এখানে সে কথা জিজ্ঞেস করে লাভ কী? চাঁপা হাসল ঃ একটা সিগারেট খাওয়াবেন?

নির্লজ্জ, বীভৎস রকমের নির্লজ্জ মেয়েটা। বসন্তর মনে হল পণ্ডশ্রম করছে সে। একে উদ্ধার করবার শক্তি দেবতারও নেই।

— দেবেন একটা সিগারেট?

নিঃশব্দে সিগারেট এগিয়ে দিলে বসন্ত, আর দেশলাই। বারুদের স্বল্পায়ু আগুনে আবার বাঘিনীর মুখ দীপিত হল। ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নিলে বসন্ত।

—লেখাপড়াও তো কিছু জানো বলে মনে হয়। জীবিকার কোনো ভদ্র পথ আর খুঁজে পেলে না? শেষকালে এই নরকের রাস্তায় নেমে এলে?

একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল চাঁপা। হেসেই উঠল খিলখিলিয়ে। অভ্যস্ত, নিষ্ঠুর, জান্তব হাসি।

—আমার জন্যে এত মাথাব্যথা কেন আপনার? প্রেমে পড়ে গেছেন নাকি?

বসন্তর মুখের ওপর চাবুক পড়ল। উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

—রাগ করলেন? নির্বিকারভাবে মেয়েটা আবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল ঃ প্রেমে যদি নাই পড়বেন, তা হলে আর একজনের সঙ্গে আমাকে ভাব জমাতে দেখে কেন ডেকে আনলেন এখানে? জেলাসি, কী বলেন?

বসন্ত চলে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু গেল না। একটা দানবিক ইচ্ছায় তার মাথার প্রত্যেকটা কোষ আগ্নেয় হয়ে উঠল।

মেয়েটার গলা টিপে ধরে শেষ করে দিলে কেমন হয়?

সাপের মতো তীব্র একটা চাপা গর্জন করে বসন্ত বললে, তোমাকে পুলিশে দেব!

আশ্চর্য দুঃসাহস মেয়েটার, বসন্তর হাত ধরে টানল। শিউরে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল বসন্ত, পারল না। কৌতুক মেশানো গলায় চাঁপা বললে, পারবেন না, পারলে অনেক আগেই পুলিশে দিতেন। কেন রাগ করছেন ছেলেমানুষের মতো? বসুন একটুখানি।

কেন জানে না, বসন্ত আবার বসে পড়ল। হয়তো চাঁপার স্পর্ধার শেষ পর্যন্ত দেখে নিতে চায়, হয়তো সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে যখন ওর গলা টিপে খুন করে এই লেকের জলের মধ্যে ফেলে দেবে। উত্তেজনায় সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগল, আর চাঁপা সিগারেট টেনে চলল নিঃশব্দে।

শিশির ঝরার মতো টুপ টুপ করে ঝরছে শুকনো ঝাউয়ের ফল। লেকের কালো জলে আলোর ঝিলিমিলি। ঘুমন্ত পদ্মবন জেগে উঠে এ ওর সঙ্গে ফিসফিসে গলায় কথা কইছে। অনেক দূর থেকে অ্যামপ্লিফায়ারে ভেসে আসছে রক-এন-রোলের সুর। লেক পেরিয়ে বসন্তর দৃষ্টি চলে গেল দূরের দিকে। দুদিকে বাহু মেলে দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সমুন্নত একটা কালো পাহাড় — যেন আকাশ-জোড়া একটা বিশাল ক্রসে এলিয়ে আছে মরণাহত খ্রিস্টের মূর্তি। কালপুরুষ নেমে এসেছে তার ওপর — যেন কণ্টকমুকুটের রক্তাক্ত বৃত্তরেখা। বসন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

চাঁপাই কথা বলল আবার। তারও দৃষ্টি বোধহয় রাত্রির আকাশে গিয়ে পৌঁছেছিল। একজিবিশনের এই আলোর সীমা ছাড়িয়ে, কেনা-বেচা-লোভ-লালসা-লঘুতার এই সিগার-সিগারেট-ধুলো-প্রসাধনের পরিবেশ পার হয়ে, সেও ওই দূরের পাহাড়টার একটা গভীর বিশাল অর্থ খুঁজে পেয়েছিল, ওই কালপুরুষের জ্যোতির্বিন্দুগুলো তারও কাছে কীসের একটা ব্যঞ্জনা বহন করে আনছিল। সিগারেটটাকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে চাঁপা বললে, আমাকে ক্ষমা করবেন, ভারি রাগ হয়েছিল আপনার অহঙ্কার দেখে।

—অহঙ্কার কখন করলাম?

— করেন নি? গেটটা পার করে দিলেন, কৃতজ্ঞতা জানাতে যাচ্ছি, যা-তা বলে চলে গেলেন। আবার ভিক্ষে দিতে চাইলেন তার ওপর। রাগ হয় না?

এবার গলার স্বর অন্য রকম। অভিমানের রেশ।

—কেন এলাম এই রাস্তায়? ইচ্ছে করে কেউ আসে। কাকার সংসারে থাকতাম। দুবার আই এ ফেল করবার পরে এমন অবস্থা কাকিমা সৃষ্টি করলেন যে গলায় দড়ি দেবার কথা মনে হল। কিন্তু গলায় দড়ি দেওয়ার চাইতে বাড়ি থেকে পালানো সোজা। রূপ ছিল শুনেছি, ভাবলাম বম্বে গিয়ে ফিল্‌মে নামব। নাগপুরেই দুটি সঙ্গী জুটল—তারা নাকি বম্বের ফিল্‌মেরই লোক।

তারপর—

চাঁপা একবার থামল।

— তারপর পুরো দেড় বছর কাটিয়েছি তাদের হাতে। ফিল্‌মই বটে। প্রতি রাত্রে মাতাল পশুদের সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছি, আর প্রায় দু'মাস ধরে তারা চাবুক মেরে আমাকে অভিনয়ের মহলা শিখিয়েছে। দুর্গের মতো প্রকাণ্ড বাড়ি, চারদিকে পাহারা, তিন-চারটে কুকুর। দেড় বছর পরে যখন পালাবার সুযোগ এল, তখন দেখলাম, নায়িকার পার্টেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আর কিছুই আমার করবার নেই।

বসন্ত আবার তাকাল আকাশের দিকে। ক্রুসে বেঁধা খ্রিস্টের মূর্তি। কাঁটার মুকুটের মতো রক্তাক্ত কালপুরুষ। দুটো ক্ষীণদীপ্ত আলো কখন জ্বলে উঠল পাহাড়ের ওপর? খ্রিস্টের দুটি করুণাঘন চোখ কি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল?

বসন্ত আস্তে আস্তে বললে, এখন কি ফেরা যায় না?

— না।

— চাকরি-বাকরি তো করতে পারো। লেখাপড়া যা জানো, তাতে তো কোনো কাজ জুটিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়!

—হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু রোজ রোজ মনিব বদলে যার অভ্যেস হয়ে গেছে—বাঁধা মনিবের চাকরি তার পোষাবে না।

বসন্তর কপালে ভ্রুকুটি ঘনিয়ে এল। এই মেয়েকে কি বাঁচানো চলে? বাঁচানো সম্ভব?

— কেউ যদি তোমায় বিয়ে করে? ঘরে নিয়ে যায়?

আবার সব সুর কেটে গেল। রক-এন-রোলের একটা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস ভেসে এল হাওয়ায়। সেই তীক্ষ্ণ আদিম হাসিতে ভেঙে পড়ল চম্পা, দু'হাতে কান চেপে ধরতে চাইল বসন্ত। খ্রিস্টের মূর্তিটা হারিয়ে গেল পাথুরে অন্ধকারের মধ্যে।

— সেও বাঁধা মনিবের চাকরি! —চাঁপার হাসি থেকে তিল তিল করে বিষ ঝরে পড়তে লাগল ঃ তবু এক সময় তারই জন্যে ছেলেমানুষের মতো পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আপনার আগে আরো —আরো অন্তত তিনজন ঠিক এই কথা আমাকে বলেছে, সুখে আর অনুতাপে, আশায় আর যন্ত্রণায় রাতের পর রাত চোখের জল ফেলেছি আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার ওপর থেকে নেশা কেটে গেলে তিনজনের একজনও আর ফিরে আসেনি।

গানের আওয়াজটা আবার ফিকে হয়ে গেল। শিশির পড়ার মতো ঝাউয়ের শুকনো ফল ঝরছে। আলোর চমক-লাগা পদ্মবনে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস, জলের কান্না। অন্ধকারের আবরণ সরিয়ে করুণা-বিষণ্ণ সেই দুটি চোখ গ্লানি-জর্জর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে।

কারো মুখে কথা নেই।

বসন্ত সিগারেট কেস বের করল ঃ নেবে?

— না, ধন্যবাদ। আর নয়।

এবার নিজেই সিগারেট ধরাল বসন্ত। কী একটা ভাবছে —শক্তি সঞ্চয় করে নিতে চাইছে নিজের ভেতরে।

—চতুর্থ জনকে বিশ্বাস করতে পারো?

— কে? আপনি?

হেসে উঠতে গিয়েও হাসতে পারল না চম্পা। কেঁদে ফেলল হু-হু করে।

বসন্ত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল না। কোনো অর্থ হয় না ভালো কথা বলবার। চম্পা কেঁদে চলল, বসন্ত পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল দূরের দিকে। আকাশ, রাত্রি, নক্ষত্র, পাহাড়—সব কিছুই যেন অপরিসীম বেদনায় গভীর নির্বাক হয়ে আছে। একরাশ সঞ্চিত কান্নার মতো ছল-ছল করছে লেকের জলটা।

দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট। চম্পা কেঁদে চলল।

আবার স্টলের সারি। সাত রঙ আলোয় চোখের যন্ত্রণা। ঘুরন্ত নাগরদোলা। ভিড়। সিগার-সিগারেট-ধুলো-প্রসাধনের গন্ধ। 'দি গ্রেট অরিয়েন্টাল সার্কাস। টু অ্যানাজ—অনলি টু অ্যানাজ! লায়ন-টাইগার-বিউটি প্যারেড'—

— কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে? — চম্পার স্বর এখনও কান্নায় ভেজা ঃ আপনার বাড়িতে?

— বাড়ি এখানে কোথায়? বসন্ত হাসল ঃ আমি ট্যুরিস্ট — সাতদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি। তোমাকে আমার হোটেলে নিয়ে যাব।

—তারপর?

—তারপর কাল কলকাতায় নিয়ে যাব। সেখানে পৌঁছে পরের দিন যাব রেজিস্ট্রি অফিসে।

চম্পার পা থেমে এল।

—আত্মীয়স্বজন নেই আপনার? সমাজ?

মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হল বসন্তর মুখ। বাবা-মা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু আর ভাবা চলে না। দাম হয়তো কিছু দিতেই হবে। তবু ভয় করবে না বসন্ত। অন্ধকার আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেদনায় জর্জর, করুণায় বিষণ্ণ একটা বিশাল মূর্তি তাকে আশ্বাস দিয়েছে।

—না, সে ভাবনা আমার নেই।

নিজের অজ্ঞাতেই বসন্ত এবার চম্পার একখানা হাত টেনে নিলে মুঠোর ভেতরে। ভীরু চড়াইপাখির বুকের মতো কাঁপছে হাতখানা, ঘামে ভিজে উঠেছে। বসন্ত ওই ভিড়ের মধ্যেও চম্পার কানের কাছে মাথা নামিয়ে একান্ত হয়ে উঠল ঃ না—আমার সে ভাবনা নেই।

আর ঠিক তখনই সমস্ত সুর, সমস্ত উৎসব একটা ঘূর্ণির মধ্যে হারিয়ে গেল যেন। মুহূর্তে একজিবিশনের হাজার আলোর দীপালি দপ করে নিভে গেল, আছড়ে পড়ল অন্ধকারের আকাশজোড়া ঢেউ আর সেই সঙ্গে মানুষের বিকৃত গলায় অমানুষিক চিৎকার ফেটে পড়ল ঃ ফায়ার —ফায়ার — আগ লাগা হ্যায়—

অকস্মাৎ আলো নিভে যাওয়ার অবিশ্বাস্য অন্ধকারে, প্রাণ বাঁচানোর আদিমতম প্রেরণায়, একজিবিশনের কয়েক হাজার লোক তখন অন্ধের মতো গেটের দিকে ছুটেছে। পেছন থেকে মেয়েদের আর্তনাদ, শিশুর কান্না আর পুরুষের গর্জনের একটা ছুটন্ত অতিকায় দেওয়াল ওদের দুজনের ওপর এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তর মুঠি থেকে খুলে গেল চম্পার হাত, স্পষ্ট অনুভব করল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে চম্পা।

—মা—মাগো—

—চম্পা—

চিৎকার করে চম্পাকে তুলতে গেল বসন্ত—কিন্তু পারল না। পেছনের ভিড় তখন তাকে স্রোতের কুটোর মতো ঠেলে নিয়ে চলেছে। তার উলটো মুখে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে হাজার হাজার পায়ের তলায় সে মুহূর্তে পিষে যাবে। পারল না বসন্ত—কিছুতেই পারল না। ওদিকে কয়েকটা আগুনের শিখা ফণা তুলেছে তখন, মৃদু পিঙ্গল আলোয় আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সব, মানুষের পালানোর চেষ্টা আরো ক্ষিপ্ত, আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। ছুটতে ছুটতে, পায়ের তলায় মানুষ মাড়াতে মাড়াতে সে নিজেও কখন আদিম প্রেরণার সঙ্গে মিশে গেল। ওই পিঙ্গল আলোটা রুদ্র ভ্রূকুটি করে তাকে বলতে লাগল ঃ পালাও —বাঁচতে হলে এখনো পালাও।

বসন্ত পালাতে লাগল।

গেটের বাইরে যখন এসে দাঁড়াল, তখন গায়ের শার্ট টুকরো টুকরো, পায়ের জুতোর চিহ্ন নেই। চারিদিকে ভয়ার্ত মানুষের চিৎকার, আত্মীয়স্বজনের নাম ধরে বুকফাটা ডাকাডাকি, মাটিতে আছড়ে-পড়া একটি মা ঃ মেরি বেটি — মেরি মুন্নি —

ফায়ার ব্রিগেড এসে পড়েছে। আর একজিবিশনের একটা অংশ হু হু করে জ্বলছে তখন। পিঙ্গল প্রেতদীপ্তি নয়, রক্ত-আলোর চিতা জ্বলে উঠেছে সারি সারি।

চম্পা!

এমনভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরল বসন্ত যে মনে হল মাংসের ভেতরে তার দাঁত বসে যাবে। এর মধ্যে আর কি খোঁজা যায় চম্পাকে? খোঁজবার অর্থ হয় কোনো?

ভালোই হল। হয়তো অবচেতন মনে এমনি একটা কামনাই করেছিল বসন্ত। শেষ পর্যন্ত সত্যিই কি সাহস হত তার? চম্পার জীবনের তিনজন পুরুষের মতো চতুর্থ পুরুষও যে তাকে বঞ্চনা করত না, এ-কথা কি জোর করেই বলতে পারে সে?

টলতে টলতে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল বসন্ত, একটা বিভ্রান্ত মাতালের মতো। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা পাহাড়টাকে আর দেখা যাচ্ছে না, অতল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আকাশজোড়া মূর্তিটা কোথায় মিলিয়ে গেছে।

আর পেছনের উজ্জ্বলন্ত আগুনে ছবির স্টলটা হয়তো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে এতক্ষণে, পুড়ে যাচ্ছে ম্যাডোনা-ডেল গ্র্যাণ্ডুকা থেকে ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্ট পর্যন্ত।

মেহেরজানের মা



মির্জা আবদুল হাই

রেল ইস্টিশানে হাটের ভিড়। সবগুলো গাড়িতেই লোক ঠাসা। তবুও একটা পাওয়া গেল। একেবারে খালি। বেশ সাফসুতরা। গদি মোড়া। মাথার উপর বন্ বন্ করে পাংখা ঘোরে। তারই ভেতর ছোট্ট একটা কুঠরি। আয়নায় মুখ দেখা যায়। কল থেকে টিপ টিপ করে পানি পড়ে। তারই ভেতর ধাক্কা দিয়ে রকিবাকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে জমিলা বেরিয়ে গেল।

রকিবার পেটে-পিঠে, শাড়ির নীচে, চটের থলিতে সুপারি বাঁধা। হাতে মবিলের টিন। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। আয়নার ভেতর দিয়ে নিজের পেটের দিকে নজর পড়তে মনে হল যেন আট ন'মাস। মেরাজান যখন পেটে এসেছিল, তখনকার কথা রকিবার মনে পড়ল। অনেক-অনেক দিন আগেকার কথা। বুকের দুরু দুরু ভাব ছাপিয়ে কেমন যেন একটা সরমরাঙা অনুভূতি তার মনের অতলে শিহরন জাগাল।

দশটার গাড়ি ঝক ঝক করে এগিয়ে চলেছে। মানুষের হালে বেঁচে থাকার জন্য এই নূতন জীবিকার পথে নেমে পড়া। শুধু আজকের জন্য বেঁচে থাকা, কালের ভরসা কাল। গরিবের শুধু দিনের দিন বাঁচা, ভবিষ্যৎ তো শুধু বড়োলোকের। রকিবার অন্তরলোকের চিড়-খাওয়া ভাবনা।

রকিবার বুকে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ। প্রাপ্তির হিসাব পাঁচটার গাড়িতে নাভারণে ফিরলে। এখন শুধু ভয়, মারধর আর জেল ফাটকের ভয়।

জমিলারাই মুখে শুনা সব বেটাই না কি দু'পয়সা করে খাচ্ছে — তা সায়েব সুবা-ই-হোক, আর মজুর ভিখিরি-ই হোক। মনকে যুক্তি দেখায় রকিবা।

বেনাপোলে অনেকক্ষণ গাড়ি থামে। থামার কিছু পরেই জমিলা এসে বলে, নেমে একটু হাঁটাহাঁটি কর।

রকিবা বলে — ভয় করে, যদি ধরে!

ধরবার হলে কি আর আমি নামতাম? আর ধরলেই বা কি? ওষুধ জানা আছে। চার আনা, আট আনা, বড়োজোর এক টাকাই নিল। তার তাই বা নেবে কেন? খেপে খেপে যে পেট ভরাই, তাই বা কি এমনি নাকি! ধরবে কোন খানকির পুত।

প্রতিমুহূর্তেই রকিবা ভাবে এই বুঝি একটা বিপত্তি বাধে।

গাড়ি থেমেছে তো থেমেই আছে। নড়বার নাম করে না। ধরা যদি পড়ে তো কী হবে? খুব নাকি মারধর করে। কিন্তু কতজনকে মারধর করবে। জমিলাই দেখিয়ে দিয়েছে —উ'রা সবাই। জমিলার মতো প্রৌঢ়া তো আছে-ই, বুড়া বুড়ি, ছেলে মেয়ে জোয়ান অগুনতি। এদের ভরসাই বা কম কীসের।

গাড়ি ছাড়বার আগেই জমিলা বলে দিল —দেখ, ঘাটে ঘাটে গাড়ি থামবে, আমাদের দরকার মতোই থামবে। এখান থেকে ছাড়ার পর, পয়লা দু'বারে নামবি না, তার পরের বার, বুঝলি?

রকিবা মাথা নাড়ে। এত বড়ো কলের গাড়ি যা গাঁয়ের পিসিডেন্ট কিম্বা থানার বড়ো বাবুও নাকি থামাতে পারে না, তাকে নিজেদের কথামতো থামাতে চালাতে পারে যারা নিজেকে তাদেরই একজন ভেবে রকিবা গর্ব অনুভব করতে লাগল।

তৃতীয় বার গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে রকিবা টিন হাতে করে নেমে পড়ে।

ফাঁকা মাঠ। অনেকগুলি নানা বয়সের মেয়ে-পুরুষ নেমে ত্রস্ত পায়ে মাঠের দিকে দৌড়াল। রকিবা দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। জমিলা তার কনুই চেপে ধরে বলে — দৌড়া, দাঁড়ালে চলবে না।

বনগাঁয়ে জিনিস বেচাকেনার কারবারটা নির্ঝঞ্ঝাট নয়। ভোগান্তি অনেক। যাদের মহাজন সঙ্গে — তাদের

তো পোয়াবারো। আর যাওয়া-আসার হাঙ্গামা যতটুকু রকিবা আঁচ করে রেখেছিল—আসলে তার সিকিও নয়। ভয় শুধু মনেই।

পাঁচটার গাড়িতে রকিবা যখন ফিরে এল, তখন তার কোমরে গোঁজা কিছুটা খুচরা পয়সা, আর টিনে ভর্তি সের চার সরিষার তেল।

সেরে কমসে কম টাকা দেড় টাকা পাবে। রকিবা শুধু হিসাব করে। আঙুলের আঁকে আঁকে গুন্‌তে গিয়ে তাল-গোল পাকিয়ে ফেলে।

ঘরে ফিরবার সময় রকিবা যেন আর হাঁটতে পারে না। অভূতপূর্ব একটা উত্তেজনা। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ানো বা শুধু পেটে ভাতে রাত দিন গৃহস্থের বাড়ি খাটনি, পান থেকে চুন খসলে অকথ্য অত্যাচার, সব কিছু যেন অনেকদিন আগেকার দেখা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। হাওলাদার বাড়ির সেই কল্‌কি সেঁকার ঘা'টা পিঠের উপর অনুভব করতে চেষ্টা করল। না, জ্বালা আর আছে বলে মনে হয় না। দু' একদিন পরই সে মেরাজানের জন্য একখানা দশহাত শাড়ি কিনে আনবে। একটুকরা তেনা পরে থাকে মেয়েটা। ভালো করে পরলে নয় হাতে হবার নয়। আর যা বাড়ন্ত গড়ন। পাড়ার বদ ছোকরারা এখন থেকেই বদ-নজর দেবার তালে আছে। বুকে বুকে আগলিয়ে রাখে রকিবা। মান-ইজ্জত যদি রাখা না যায় তবে দুনিয়ায় থেকে কী লাভ।

বজলটাকে নিয়েও চিন্তা কম নয়। ময়লা একটুকরা নেংটি পরে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। ঘরে থাকলে রকিবার প্রাণে শান্তি থাকে। মেরাকে দেখবার একটা লোক থাকে। হোক না দুধের ছেলে। খোদাতালা যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, বজলের জন্যও একটা লাল শার্ট আর একটা পেন্ট। পেটের দায়ে মেরাকেও ঘরে রাখা যায় না। লোকজনের বড়িতে এটা সেটা কাজকর্ম করতে হয়। বাঁধাধরা কিছু নয়, তবু রকিবার ভয় কাটে না। গাঁয়ের ড্যাকরাগুলোর যা বকম-সকম!

মেহেরজানের শাড়ি হয়েছে। মাথায় নারিকেল তেল লেগেছে। বজলের প্যান্ট শার্ট সব কিছু।

দিন গড়িয়ে চলে। ধুঁকে ধুঁকে বাঁচার দিন নয়, পেট ভরা, বেশ হাসিখুশির দ্রুত চলমান দিন।

দিনকয়েক যেতেই রকিবা একদিন কালের পিছন ফিরে তাকায়। নিজের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়। ভালো করে যেন বুঝে উঠতে পারে না। কী করে বজল ও মেরা দু'জনেই মায়ের সঙ্গে কারবারে নেমে পড়েছে। নেহাৎ যেন একটা গতানুগতিক ব্যাপার। তার প্রথম দিনের অভিযানের মতো এদের আসায় কোনো বৈচিত্র্য নেই মনে রাখবার কিছু নয়।

তিন জনেই ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। ঠিকা কাজে হাঙ্গামা যেমন কম, লাভও সেই অনুপাতে কম। তাই বা মন্দ কি, ঝক্কি যত মহাজনের ঘাড়ে।

ন দশ বছরের বজল। ভয়ানক চটপটে। টিন হাতে সরিষার তেল আনাটা যেন তার ধাতে সয় না। দু'একদিন টিন নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরই বাদ দিয়েছে, হয়তো মহাজনের নির্দেশে। ফিরবার পথে লবণ নিয়ে আসে। দ্বিতীয় বা মধ্যম শ্রেণির বেঞ্চের তলায় --- সের কয়েক লবণ বিছিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। ধরা পড়বার প্রশ্নই উঠে না। যায়তো শুধু মালই যাবে। গাড়ি যখন চলে বজল তখন গাড়ির তলায়, একটা লোহার রডের উপর অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে বিড়ি টানে। লাল পাট-সিল্‌কের একটা রুমাল গলায় বাঁধা, হাতে পিতলের একটা আংটি। কানে আধপোড়া বিড়ি। রকিবা যখন প্রথম শুনল যে বজল গাড়ির তলায় বসে চলা ফেরা করে, ভয়ে তখন সে প্রায় কঁকিয়ে উঠেছিল। বলা যায় না কখন কী হয়। বজল মায়ের কাছে কসম করেছে—গাড়ির ভিতর বসেই সে যাওয়া-আসা করবে। কিন্তু গাড়ি যখন চলে তখন গাড়ির নীচটা দেখবার সুযোগ থাকে না বলেই রকিবা ভাবে— মা-অন্তপ্রাণ ছেলে নিশ্চয়ই মায়ের কথা রাখছে।

মেহেরজানকে রকিবা চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু সম্ভব আর হয় কই। বেনাপোলের গাড়ি থামলেই রকিবা মেয়ের খবর করে। রকিবা প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেয়—দেখিস, ওই ছোঁড়াগুলির সঙ্গে মিশবি না কিন্তু, বুঝলি?

মেরা বুঝেছে বলে মাথা হেলায়।

আর শোন, ওই যে সেপাইগুলো, তা বেনাপোলেরই হোক, আর বনগাঁয়েরই, বুঝলি সব বেটাই বদমাসের ধাড়ি। এ লাইনে সব শেয়ালের এক রা। খবরদার। বলে দিলাম।

উঠতি বয়সের মেরাজান বুঝে সব কিছুই।

সরসপুর থেকে নাভারণ— অনেকখানি পথ। প্রত্যেকদিন এতটুকু পথ হেঁটে গাড়ি ধরা সোজা কথায় নয়। তাছাড়া বৃষ্টি পড়লে, রাত্রে ঘরে ঘুমানো যায় না। ঝর ঝর করে পানি পড়ে।

মেরা বলে—এখন তো আর সে রকম অভাব নেই, ঘরটাকে মেরামত কর।

সময় কোথায়? লোক লাগালে দু' তিন দিন কামাই দিতে হয়। রকিবা নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দেয়।

সন্ধ্যার দিকে আর রকিবা ঘর থেকে বের হয় না। মাঝে মাঝে মোল্লাপাড়ার মজিদ আসে। অবস্থা মন্দ নয়। টিংটিং-এ চেহারা। শেয়ালের মতো পিটপিটে ধূর্ত চোখ। সারা গায়ে পাঁচড়া না কি, লোকে বলে খারাপ ব্যারাম। কোন জন্মের কুটুম্বিতা নেই, ঘেন্নাই করেছে হয়তো এতদিন, এখন বলে —চাচি আছ কেমন? আর আড়চোখে মেহেরজানের দিকে তাকায়।

রকিবার হুকুম আছে — ওই ছোকরা মজিদ এলে, খবরদার বলে দিলাম — ঘোমটা তুলবি না

মেরা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, তা এই ঘেয়োটাকে ঘরে ঢুকতে দিস কেন?

এই মজিদেরই জ্বালায় আর ঝরঝরে পচা চালের দৌলতে একদিন মেয়ে ও ছেলের হাত ধরে, রকিবা নাভারণের তালের মিয়া মহাজনের বারান্দায় এসে উঠল। তালেব মিয়ার-ই কাজ করে সে। এই লাইনে যারা কাজ করে, তারা অনেকেই থাকে মহাজনের আশ্রয়ে। কেউবা ইস্টিশানে, প্লাটফরমে, কিংবা কোনো দোকানের বারান্দায়, রকিবাই ছিল দূরে। গরিব বলেই শুধু গ্রামে এত লোকের মাঝে নিজের ভিটায় থেকেও ছিল নির্বান্ধব। এদের মাঝে এসে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চারিদিকে শ'য় শ'য় যেন আপনার লোক। জমিলা, নন্দ, নিখিলের মা, জৈতুন এরা সবাই যেন কত কালের আত্মীয়। ব্যবসায়ীরা নাকি মিলে-মিশে থাকতে পারে না অথচ আশ্চর্য এরা সকলে একই কারবার করে কিন্তু অভিন্ন আত্মা। সুখে দুঃখে খবর করে, লাইনে কোন্ দিন কোন্ অফিসার চলে, কোথায় কীভাবে টিপলে কী ফল পাওয়া যায়, সবাই সবাইকে বলে। দিল খুলে আলাপ-আলোচনা করে। আশপাশে সারা রাতই প্রায় বাতি জ্বলে। খোলা বারান্দায়ও যেন ভয় নেই আর। গাড়ি ধরারও নেই তাড়াহুড়া

বয়স যেন আর তাল সামলাতে পারছে না। মেরার শরীরের গড়ন বয়সকে পিছনে ফেলেই এগিয়ে চলেছে।

বেনাপোলে বনগাঁয়ে ঠোঁট লাল করে পান খায় মেরাজান। রকিবার একদিন চোখে পড়ে গেল। দু'জন সেপাই মেরাজানের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। একজন বনগাঁয়েব আর অন্যজন বেনাপোলের। প্রায় সব সেপাইরই মুখ চেনে রকিবা। এদের কাছে পাকিস্তান-হিন্দুস্থান সব এক। একজন সেপাই হাত বাড়িয়ে কি যেন দেওয়া-নেওয়া করল মেরাজানের সাথে। সেপাই দু'টি সরে গেলে পরে রকিবা জোর পায়ে এগিয়ে গিয়ে খপ করে মেরাজানের চুলের মুঠি ধরল।

মেরাজান চমকে উঠল।

হিড় হিড় করে লোহার বেড়াটার কাছে টেনে এনে রকিবা চাপা গর্জন করে উঠল —হারামজাদি, এই সেপাই যণ্ডা দুটোর সঙ্গে কী করছিলি?

মুখের উপর কোনো দিন মেরা উত্তর দেয় না, কিন্তু আজ দিল— তোর সব তাতেই সন্দ। এত লোকের মাঝে চুল ধরে টানাটানি করিস না বলছি।

রকিবা কিছুটা থতমত খেয়ে গেল।

মেরাজান ততক্ষণে সামলিয়ে নিয়েছে।

—বুড়ি হয়ে গেছিস, তাল মান টের পাস না। এদের সঙ্গে খাতির রাখতে হয়।

— তোর খাতির ধুয়ে পানি খা গে, যা। হাজার বার করে মানা করেছি, হারামজাদির কানে যায় না। ওই ড্যাকরা হাত বাড়িয়ে তোকে কী দিচ্ছিল?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেরা বোধহয় উত্তর ঠিক করল। —বাঃ রে, ও আবার কী দেবে। পান কিনেছিলাম, ওরাই বলল পান খাওয়াতে। তাই দিয়ে দিলাম একটা। আমিই তো দিলাম। পুলিশের লোক আবার কাউকে কিছু দেয় নাকি কোনোদিন?

—কাজ নেই বাপু পান খাওয়ানোর। একটু বুঝে-সুঝে চলিস। রকিবা দরদ মিশিয়ে বলে।

মাঝে মাঝে, মাসে দু' মাসে, অনেকগুলি সেপাই আর বর্ডার পুলিশের বড়ো সাহেবরা এসে হানা দেন।

ধরপাকড় হয়, মারধর লাগে, কিন্তু কপালগুণে রকিবার কিছুই হয়নি। একদিন ব্যবস্থাটা হল বড়ো কড়া রকমের। অন্যান্য দিন আগে থেকেই কিছুটা আভাস পাওয়া যেত কিন্তু সেদিন হঠাৎ যেন পৌষের আকাশে মেঘ ডেকে উঠল। গাড়ির পেছন দিয়ে নামতেই, লোহার বেড়ার অপর পাশের জঙ্গল থেকে অনেকগুলি সেপাই মাথা তুলে দাঁড়াল। ক'জন বেড়া টপ্‌কিয়ে প্লাটফরমের ভেতর এসে পড়ল। হাতে লাঠি। যাকে ধরে, তাকেই দু এক ঘা লাগায়। হুল-স্থূল ব্যাপার। রকিবা স্তম্ভিতের মতো পেটে বাঁধা সুপারির থলেটার উপর হাত রেখে এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ নজরে পড়ল একজন সেপাই বজলকে দৌড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। বজল লাফ দিল। তার পা-টা লোহার পাতের মাথা চোখা বেড়ার উপরটা অল্প স্পর্শ করল মাত্র। রকিবার বুকটা ধড়াস করে উঠল, বজল ততক্ষণে বেড়ার অপর পাশে জঙ্গলের মাঝে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেছে। হতভম্ব রকিবা পাগলের মতো বেড়ার দিকে দৌড়াল। পরক্ষণেই তার পিঠের উপর লাঠির একটা প্রচণ্ড আঘাত।

সেদিন আব রকিবার বনগাঁ যাওয়া হল না। সুপারি, তেলের টিন, ট্যাকে যা কিছু সর্বস্ব দিয়ে তবে নিস্তার। রকিবার মাথা টন টন করছে। পিঠে জ্বালা আর ব্যথা। হাত দিলে টের পাওয়া যায় পিঠের চামড়া যেন বাইন মাছের মতো হয়ে ফুলে উঠেছে। প্লাটফরমের উপরই সে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

ফিরতি গাড়িতে যারা বেনাপোলে নামল তাদের দেখে রকিবার মনে হল কেউই কমেনি। অন্যান্য দিনের মতো পুরা দলটাই ফিরে এসেছে। এদের সঙ্গেই মেরা ও বজল গাড়ি থেকে নামল।

রকিবা ছুটে গিয়ে বজলকে বুকে জড়িয়ে ধরল। পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে —কোথাও লাগেনি তো রে?

কানের আধপোড়া বিড়িটা ধরাতে ধরাতে বজল জওয়াব দিল--- দুর, লাগবে কেন? দেখেছিলি নাকি — আমার লাফ দেওয়াটা? বাবা, কত পেট্রিস করে শিখেছি। পুলিশের বাবার সাধ্য আছে ধরবে?

নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফিল্মি কায়দায় ভঙ্গি করে বজল।

ছেলের বীরত্বে রকিবাও যেন কিছুটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

মেরা মায়ের কাছে এগিয়ে এসে পান চিবাতে চিবাতে বলে, — দেখি মা তোর কোথায় লাগল?

পরম স্নেহে মায়ের পিঠে বা হাতটা বুলায় মেরাজান।

রকিবা চুপ করে থাকে।

কিছুক্ষণ পর, মেরা আঙুলের ডগা থেকে বাড়তি চুনটুকু দাঁতে কেটে নিয়ে ঠোঁটটাকে একটু বাঁকিয়ে বলে -- মা, তোরও যেমন, বললে তো শুনবি না। বলেছিলাম না, খতিরে কাজ হয়। দেখলি, ধরতে পারল আমাকে? খিক খিক করে মেরা আত্মপ্রসাদে হেসে ওঠে।

রাগ করে রকিবা -- ঝাড়ু মারি অমন খাতিরের মুখে। মুখপুড়ি, দাঁত সিটকাবি না বলছি।

তেরছা করে হেসে মেরা বলে---তা হলে পড়ে পড়ে মার খা'। যেমন আক্কেল।

বাড়ন্ত শরীরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মেরা টিন হাতে সরে পড়ে।

তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে রকিবা পিঠের ব্যথায় কঁকায় আর ইস্টিশনের দিকে চায়। ঘুম আসে না। বজল পাশে শুয়ে নাক ডাকায়। মেরাজান আজ আর ফিরেনি। সেই যে বেনাপোলে দেখল, ফেরার আর পাত্তা নেই। জমিলা, জৈতুন এদের প্রায় সকলের কাছেই রকিবা খবর নিয়েছে কিন্তু সঠিক খোঁজ কেউই দিতে পারেনি। যে ব্যাপারির ঠিকায় মেরা কাজ করে তার লোকজনের কাছেও খবর নিয়েছে। মেরা নাকি নন্দর কাছেই বেনাপোলে মাল সমঝিয়ে দিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। নন্দকেও খুঁজে পায়নি রকিবা। সে নাকি কিছুটা বাড়তি লবণ এনেছিল। তাই নিয়ে একেবারে যশোর চলে গিয়েছে। নাভারণের কাজটা ঠিকমতোই সেরে দিয়ে গেছে। বেশ লেখাপড়া জানা ছেলে নন্দ, কিন্তু কেমন যেন পাগলাটে পাগলাটে।

রাত যতই বাড়তে লাগল, পিঠের ব্যথা ছাপিয়ে ততই মেরাজানের জন্য রকিবার দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। যদি খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে থাকে? কাস্টমের অফিসারগুলি একদিক থেকে মন্দ নয়। এদের নিয়ে বড়ো মাথা ঘামায় না। তারা আছে তাদের তালে। গাড়ি শুধু তল্লাশিই করে। কী যে পায় তারাই জানে। খুব ভালো লোক কিনা তাই বা কে বলতে পারে? সন্দেহ জাগে রকিবার মনে। ব্যাপারি দালালদের সঙ্গে হয়তো যোগসাজশ আছে, তাই রা করে না। কিন্তু ওই যে সেপাইগুলি, তা বনগাঁয়েরই হোক আর বেনাপোলেরই হোক, ভালোর

ভালো আর খারাপের খারাপ। দু' দেশের হিন্দু-মুসলমানে এত যে মারামারি কাটাকাটি, এদের কাছে তা কিছু নয়। কেমন মিলঝিল। খাও দাও আর ফুর্তি কর, মাঝে মাঝে শুধু খবরদারি আর পয়সা কুড়ানো। কোন্ মেয়ের গতরটা একটু ভালো তাই খোঁজ নেওয়া; তা এপারেই হোক আর ওপারেই হোক। অবশ্য সাড়ে সতেরোয় একদিন বড়োসাহেবরা এলে তোড়জোড় করে লাঠির কেরদানি দেখানো। এদের বিশ্বাস করা যায় না। বদমায়েশের হাড্ডি সব। বিয়ে-শাদি একটা মেরার না দিলে, মানইজ্জত আর রাখা যাবে না। বিয়ের কথা মনে পড়ায় রকিবার মনে অনেকটা স্বস্তি জাগে। দু একদিন কথাটা কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনাও করেছিল কিন্তু এক নন্দ ছাড়া সবাই বলে, আরও বড়ো হোক। নন্দ ছেলেটা লেখাপড়া জানে মনে হয়, বড়ো বড়ো কথা বলে। বোধহয় বই-পুঁথির শেখা কথা। একদিন নিজেই সে বলেছিল —চাচি, তোর মেহেরকে বিয়ে দে। হিন্দু-মুসলমান যাই হোক, ছেলে একটা হলেই হল। আমাদের আবার জাত বেজাত কি? আগের কালে হিন্দুদের কাজ দিয়ে জাত ঠিক হত। কিছুদিন পর দেখবি—বনগাঁয় বেনাপোলের আমরা সবাই একজাত হয়ে গেছি। আমার ছেলে বা নাতির নাম হবে অমুক চন্দ্র স্মাগলার। এমনি সব পাগলাটে কথা। সব কথা গুছিয়ে রকিবার মনে পড়ে না। কিন্তু যে যাই বলুক, মেয়ের শাদি নিয়ে কথা—-জাত বেজাতের প্রশ্ন আসে বৈকি। জাতধর্ম তো আর দেশ থেকে উঠে যায়নি। এখনও চান্দ সুরুজ উঠে। রকিবা ভাবে, নন্দর সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে কাল আরেকবার আলোচনা করবে।

রাত তিনটার গাড়ির ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রকিবা উঠে ইস্টিশনের দিকে পা বাড়াল। এই গাড়িতেও মেবা আসতে পারে।

আসুক হারামজাদি আজ। এত রাতে বাইরে থাকা বের করছি। রকিবা মনে মনে গরজায়।

মেবা সত্যি সত্যিই গাড়ি থেকে নামল। ঢুলু ঢুলু চোখ, শ্লথ গতি। কেমন যেন খোঁড়ার মতো পা টেনে টেনে প্লাটফরমের বাইরে এল। রকিবা একটু অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। মেরা বাইরে আসতেই খপ করে খোঁপাটা চেপে ধরে চাপা গলায় গর্জিযে উঠল।

হারামজাদি, বল, কোথায় ছিলি?

মেরা বোধহয় এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতই ছিল, ভড়কাল না। বরঞ্চ বেশ তিক্ত গলায়ই জবাব দিল—যেখানেই থাকি, তোর কী?

রকিবার মাথায় যেন খুন চড়ল। চটপট পিঠে মাথায় কিল-চড় চালাতে শুরু করল।

হাবামজাদি খান্‌কি, মান-ইজ্জত আর রাখলি না!

মেরা ফোঁপাচ্ছিল, ঘোঁত করে উঠল—ও, বড়ো ইজ্জতওয়ালারে। চোরাই কারবার করেন—আবার মান।

কথা কইস না হারামজাদি, সারাদিন ছিনালি করে আবার তেজ দেখায়। খবরদাব আমাকে আর মা বলে ডাকবি না। বারান্দায় আর উঠবি তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

থপ্‌থপ্ করে পা ফেলে নিজের জায়গায় গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ল। মেয়ের চরিত্রহীনতার অপমানে সারা অঙ্গে যেন সে বিছুটির জ্বালা অনুভব করছে। এমন মেয়ে পেটে ধরেছিল বলে তার নিজের সত্তাটাই যেন অপবিত্রতার গ্লানিতে কালো হয়ে উঠছে।

অনেকক্ষণ পর টের পেল মেরা এসে ছোটো ভাইয়ের কাছে শুয়ে পড়েছে। রকিবা চোখ মেলল না। একটা বোবা করুণা অবসাদের আকারে তাকে চেপে ধরে ঝিম লাগিয়ে দিয়েছে। সে নড়তেও পারল না।

একখানা হাত রকিবার পিঠে পড়ল। ফোলা জায়গাটায় মেরা হাত বুলাচ্ছে। কাচের চুড়িগুলো টুন টান করে বাজে। রকিবা নির্জীবের মতোই চুপ করে রইল।

এই মা, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

রকিবা চুপ্।

খুব লেগেছিল, না'রে?

রকিবা উঃ করে শব্দ করল।

জানিস মা, ওই যে কপালে মোটা আঁচিলওলা সাদেক আর বনগ্রামের সুরেন্দ্র, —তারা বলেছে আমাদের কোনো ভয় নেই। বিপদেআপদে তারাই দেখবে।

পেট্রলের মধ্যে জ্বলন্ত দেয়াশলাইর কাঠি ফেলে দিলে যেভাবে দপ করে জ্বলে উঠে, রকিবার মগজও যেন সেই ভবে জ্বলে উঠল। অন্ধকারে হাত নাড়ার সময় একটা আধ-পোড়া চেলার গায়ে হাত লেগেছিল —

নিঃশব্দে তাই তুলে দমাদম মেরাজানের উপর চালাতে লাগল। চিৎকার করে মেরা অন্ধকারের ভিতর মিশে গেল। ঘুমন্ত বজলের উপরও দুই এক ঘা পড়েছিল, সেও কেঁদে উঠল। রকিবা সুর তুলে অশ্রাব্য ভাষায় মেরার উদ্দেশে গাল পাড়তে লাগল। শোরগোলে লোকজন উঠে পড়েছিল, তারা এসে জোট পাকাল। রকিবাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল।

বাকি রাতটুকু রকিবা আর ঘুমোতে পারল না। বজলকে বুকের মাঝে চেপে ধরে পড়ে রইল। চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। কীসেব দুঃখ তার। রকিবা নিজের মনকেই প্রশ্ন করে। যে মেয়ে মান ইজ্জতের ধার ধারে না, তার সঙ্গে কীসেব সম্পর্ক? সে যেখানে খুশি যাক, রকিবা আর তার মুখ দেখবে না। মেয়ের ইজ্জত বন্ধক দিয়ে পয়সা রোজগার করবার আগে যেন তার মরণ হয়। মেরাজান তার মেয়ে নয় ঃ কোন খান্‌কির মেয়ে হয়তো ভুল করে তার পেটে এসে জায়গা নিয়েছিল কে জানে। ভোরের দিকে রকিবার চোখ দুটো জড়িয়ে এল।

চলতি গাড়িতে বসে, প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে সুখ-দুঃখের কথা হয়। একদিন জামিলা বলে — মেরাকে কি সত্যি বিদায় করে দিলি নাকি? এ লাইনে এসব ধরলে চলে না। হাজার হোক পেটের মেয়ে তো'। বত্রিশ নাড়ি ছেঁড়া ধন।

গুম হয়ে থাকে রকিবা কিছুক্ষণ, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে — একটা কথা এত দিন তোকে বলিনি বু,' মেরা আমার পেটের মেয়ে নয়। বিন্নার ঝোপে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

শেষের কথাগুলি খুব কষ্টে উচ্চারণ করে রকিবা। গাড়ি চলার খট খট শব্দে গলার আওয়াজের বিকৃতি হয়তো জমিলা ধরতে পারেনি।

শাড়ির আঁচল দিয়ে রকিবা দু' চোখ চেপে ধরে। এক গাড়ি লোক। পায়ে পায়ে ঠাসা।

একটা কঁকিয়ে উঠার শব্দ জমিলার কানে যেতেই সে ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল — কী হল রকিবা!

আঁচলেব মধ্যেই মুখ রেখে রকিবা জবাব দিল — কিছু না, চোখে কয়লা পড়েছে।

তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় শুয়ে রাতের আঁধারে, বজলকে বুকে চেপে ধরে রকিবা চোখের পানি ফেলে। আঁচল আর চাপা দিতে হয় না। মেরা গেছে —যাক। বজল তার সোনা মানিক। ঘুমন্ত বজলের মুখটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে। যেন কোলেব শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

একদিন বেনাপোলের ডিস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে গাড়িটা থামতেই হইহই একটা রব উঠল। একটি ছেলে কাটা পড়েছে। নীচের রডে বসে আরেকটি ছেলের সঙ্গে বিড়ি নিয়ে ঝগড়া করছিল। ফল যা হবার হয়েছে, এতগুলি লোকের মুখে ছেলেটার পরিচয় তালগোল পাকিয়ে হোঁচট খেতে খেতে রকিবার কানে যখন পৌঁছাল তখন গাড়ি আবার চলতে শুরু করে দিয়েছে। শফিক, মনীন্দ্র, না হয় বজল। এই তিনজনের মধ্যেই একজন। ঘটনা ঘটেছে দুই দেশের সীমানার পাথরটার কাছে। তেলের টিনটা হাতে নিয়ে রকিবা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। যে যা'র জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে উঠে পড়ল। চলন্ত গাড়ি থেকে কয়েকটি কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল —ও রকিবা, তাড়াতাড়ি উঠ। জলদি কর।

রকিবা পাথর!

গাড়িটা যখন অনেকখানি এগিয়ে গেল, রকিবা তখন হাতের টিনটা সেখানেই ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে লাইন ধরে বনগাঁয়ের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল।

শুধু রক্ত আর রক্ত।

মানুষ বলে চিনবার যো নেই। থেতলিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বীভৎস আকার ধারণ করেছে। মনীন্দ্রেরও হতে পারে, শফিকেরও হতে পারে। হঠাৎ নজরে পড়ল একখানা অক্ষুন্ন হাত আর সেই হাতের আঙুলে পিতলের আংটি। রকিবা আর কিছুই টের পায়নি শুধু সমস্ত রেললাইনটা যেন ঘুরতে ঘুরতে একটা রক্তের বন্যার মতো এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

পাশের গ্রামের একটা পড়ো দালানের দাওয়ায় অসুস্থ অবস্থায় ক'দিন পড়ে ছিল রকিবা। হয়তো কোনো সহৃদয় গ্রামবাসী লাইন থেকে উঠিয়ে এনেছে। টের পায়নি।

রকিবা ভাবে — মেরাজান খবর পেলে নিশ্চয়ই ছুটে আসত, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনের গলাটা টিপে ধরে ভাবনাটার দম বন্ধ করে মারতে চায়। না, না, মেহেরজান বলে কেউ তার কোনো দিন ছিলই না। ধুঁকে ধুঁকে মরবে— সেও ভালো।

এই ক'দিনেই যেন বয়স তার দশ পনেরো বৎসর বেড়ে গিয়েছে। পিঠটা বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। ভর না দিয়ে ভালো করে চলতে পারে না। রাস্তার পাশ থেকে একটা বাঁশের টুকরা কুড়িয়ে তাতেই ভর দিয়ে রকিবা কোনাকোনি পথে ভিক্ষা করে করে তিন দিনে সরসপুরে এসে পৌঁছাল।

নিজের ঘরটার শুধু ভিটের চিহ্ন আছে আর কিছুই নেই, শুধু একটা পোতা। ক্লান্ত রকিবা পোতার উপর বসে পড়ে বজলের মৃত্যুর পর এই প্রথম চোখের পানি ফেলল।

কাজ পাবার আশায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে রকিবা। যেখানেই যায় সেখানেই প্রশ্ন হয়—বলি রকিবা, তোর মে'রা আর বজল কোথায়?

নোংরা ছেঁড়া আঁচল দিয়ে চোখ মুছে রকিবা উত্তর দেয় —মরে গেছে।

আহা-হা, কী করে ম'ল!

গাড়িতে কাটা পড়ে।

সবাই আহা-হা করে, কিন্তু চাকবি দেয় না কেউই। হয়তো বা সাত কলস পানি আর দুটা ঘর লেপানোর বদলে দেয় আধ থালা পান্তা ভাত। মুখে রুচে না, তবু ভুখের মুখে জোর করে গিলে।

মজিদ একদিন বলে — ও চাচি, তুই যে বললি, মেহেরজান মারা গেছে তা আমি যে সেদিন দেখে এলুম বনগাঁয়ে। কী সুন্দর যে লাগল— কী করে বোঝাই, যেন ভদ্দরলোকের মেয়ে। তা ব্যাপারখানা কী বল দিখি?

রকিবা ফ্যালফ্যাল করে চায় যেন সে ধরা পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর উত্তর দেয় — তা বাবা এতলোকের মাঝে কাকে কী দেখলে তার ঠিক নেই আর বলছ আমার মেরা। আমার মেরা যদি—

কথাগুলি বলতে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল—হঠাৎ হাউ হাউ করে রকিবা কেঁদে উঠল।

মজিদ থতমত খেয়ে রকিবার পিঠে হাত দিয়ে বলে—কেঁদে কী হবে চাচি —আলার মর্জি।

মজিদ ভাবে হয়তো তার নিজেরই ভুল হয়েছে। এত মেয়ে-ছেলের মাঝে কোথাকার কাকে দেখে সে হয়তো ভুল করে বসেছে।

শরীর কিছুটা সেরেছে কিন্তু আগের মতো যেন আর বল পাওয়া যায় না। বড়ো ক্লান্ত মনে হয়।

শুধু দু'মুঠো পান্তাভাতের বদলে এত খাটনি আর রকিবার সহ্য হয় না। না খেতে পেলে শরীর সাববে কী করে। তবু মরি বাঁচি করে দিন কাটিয়ে দেয়। দীর্ঘ ক্লান্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা দিন।

শরিফ মোল্লাদের মস্ত বড়ো খামার। অর্ধেক রাত্রি জেগে রকিবা তাদের প্রায় পনের বিশ টিন ধান একা সিদ্ধ করেছে। পরদিন রোদ উঠতেই উঠানে মেলে দিয়ে লম্বা বাঁশে হাঁস মোরগ তাড়াচ্ছে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। তার উপরে ভ্যাপসা গরম। রকিবার একসময় ঝিমুনি এল।

হঠাৎ মাথায় একটা প্রবল ধাক্কা অনুভব করে ব্যাপারটা বুঝবার আগেই টের পেল পেটে পিঠে লাথি পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মালিকের তৃতীয় বউয়ের গর্জন—

বুড়ি মাগি, কাইর কাইর ভাত খায় আর পড়ে পড়ে ঘুমায়। নাক ডাকায়। রাজ্যের সব মোরগ এসে আমার সব উজাড় করে দিল সে হুঁশ নেই।

রকিবার কপাল কেটে তখন রক্ত চুয়াচ্ছে।

শ্লথ পায়ে রকিবা বাড়ির বাইরে এসে কাঁঠাল গাছটার নীচে স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। কেউ সমবেদনা জানাল না বা ফিরে যাবার জন্য ডাকলও না। তারপর এক সময় রকিবা রাস্তা ধরল। কপালের রক্তের ক্ষীণ ধারাটি যেন তাকে লোহার লাইন পাথর আর স্লিপারের উপর ভেসে যাওয়া কোনো বৃহত্তর রক্তধারার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। বজল গিয়েছে—সেও যাবে। কিন্তু মেরা গেল না কেন? সে-ও হয়তো গিয়েছে কে জানে। কথাটার নৈঃশব্দিক উচ্চারণেই সে শিউরে উঠল। বালাই ষাট, মরবে কেন— বেঁচে বর্তেই থাক। ছিনাল বেশ্যার পেশা নিয়ে যদি পেট চালাতে পারে— তবে তাই করুক। রকিবার তাতে কী। মেয়ে বলে স্বীকার না করলেই হল। মেরা তার কে! কিছু না। বিম্না ঝোঁপে পাওয়া—পালিতা মেয়ে।

প্রথম যৌবনের প্রথম পোয়াতি রকিবা মেরাকে পেটে ধরে যে অস্বস্তি অনুভব করত তেমনি একটা উপলব্ধির স্মরণে তার চোখ ফেটে পানি ছুটল। কপালে হাত চাপা দিয়ে সে ইস্টিশানের পথেই চলতে লাগল। নিশি-পাওয়া পদক্ষেপ।

একটা পেট বই তো নয়। না হয় মহাজনকে বলে কয়ে দু'তিন দিনে একবার খেপ দিবে। খোদার রাজ্যে বিচার যখন উঠেই গেছে, গতর খাটিয়েও যখন মানুষের মতো মোটা ভাত মোটা কাপড়ে বেঁচে থাকা যায় না, তখন ওই চুরির পথই ভালো। যে পথে বজল গিয়েছে, সেই পথে সে-ও যাবে। পেট ভরা থাকলে লাথিটা চড়টাও খাওয়া যায়। রক্ত যদি ঝরে, তবে চুইয়ে চুইয়ে ঝরবে কেন— গল গল ধারেই ঝরুক। এক সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাক। কিন্তু এই অবস্থা দেখে মেরাজান যদি এগিয়ে আসে! বলে তোকে কিছু করতে হবে না, আমিই তো আছি। হাজার হোক পেটের মেয়ে তো। না—না, মেরা সম্বন্ধে কোনো দুর্বলতাই সে মনে স্থান দেবে না। মেরা তার কেউ না — কেউ না, কোনোদিন কিছু ছিলও না।

এই বারে আর নাভারণের তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দা নয়। সেখানে আর পা ফেলবার জায়গা নেই। নতুন লোক জুটেছে।

অনেক হাঁটাহাঁটি করে কলিমুদ্দিনের সঙ্গে চুক্তি হল। তারই পড়ো গুদামঘরটার পিছনের একচালায় জায়গাও পেল।

নূতন মহাজনের ঘর থেকেই পাওয়া গেল মবিলের টিন। কিছুটা চট জোগাড় করে, সুচ সুতলি চেয়ে এনে থলেও তৈরি হল।

আবার সেই দশটার গাড়ি।

প্রথম দিনেই বেনাপোলে চোখে পড়ল মেরাকে। চেনা যায় না যেন। নূতন লাল-সবুজ চেক শাড়ি, ছাপাব ব্লাউজ। একপোচ পাউডারও হয়তো লাগিয়েছে পুষ্ট মুখের উপর। চোখ ফিরানো যায় না। রকিবা চোরের মতো সন্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চায় — বিদ্রোহ-করা মনটা হয়তো পাহারা দিচ্ছে। কখন ধরা পড়ে যায় কে জানে।

পুরনো পরিচিতরা ছেঁকে ধরে।

ছিলি কোথায় এ্যাদ্দিন।

এমন হল কী করে!

রকিবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জওয়াব দেয়—যাব কোন চুলায়?'অসুখ করেছিল।

গাড়িটা ছাড়ছে না। কাস্টমের চেকিং শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু কেন দেরি করছে কে জানে।

রকিবা প্ল্যাটফরমের পেছন দিকে—রেলিং-এর কাছে একটা নুড়িপাথরের স্তূপের উপর একা একা বসে সুপারি চিবাচ্ছিল। পিছন থেকে মেরা এসে তার পিঠে হাত রাখল।

রকিবা নিরুদ্বিগ্নভাবে মাথা ঘোরাল।

এ্যাই মা।

প্রকম্পিত করুণ অথচ মিষ্টি দুটা শব্দ। বহু বছরের পরিচিত।

অন্তরের নিরুদ্ধ মণিকোঠার গলা টিপে রাখা অন্ধ মাতৃত্বটা যেন সশব্দে ঝলকিয়ে উঠে আত্মপ্রকাশ করল।

মেরা!

কিন্তু পরমুহূর্তেই ঝটতি বেগে উঠে দাঁড়িয়ে ফেটে পড়ল — ছিনালির আর জায়গা পাস না! মা ডাক গিয়ে যে বেবুশ্যে তোকে পেটে ধরেছিল, তাকে। কোথাকার কোন আঁস্তাকুড়ের ময়লা— আমাকে বলে কি না মা।

রকিবা একটা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে সামনের দিকে হন হন করে এগিয়ে গেল।

দু-একজন ব্যাপারটা দেখে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। পিছু ধাওয়া করে রকিবাকে জেরা শুরু করল। সে একটি প্রশ্নেরও জওয়াব দিল না। রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দশটার গাড়িতে যাওয়া আর পাঁচটার গাড়িতে ফিরে আসা। জীবন সংস্থানের দুরূহ পরিক্রমা।

শরীরে যথেষ্ট বল হয়েছে। আর কিছু না হোক, দু'মুঠা ভাত তো পেট ভরে খাওয়া যায়।

আজকাল সকলের মুখে মুখে একটা কথা ঘুরে ফিরছে। সেপাইরা নাকি গুলি করে চোরা কারবার বন্ধ করবে। কাগজে নাকি লিখেছে। কেউ বলে ধরে নিয়ে গুলি করবে। কেউ বলে গুলি করে ধরবে। নানা মুখে নানা কথা। তবে গুলি যে করবে এই সত্যটুকু সবার মুখেই এক — শুধু সময়ের তফাত। মহাজনেরা বলে করুক দেখি, —কত গুলি করতে পারে। বন্দুকের নলের মুখেও ছিপি আঁটা যায়— বুঝলি? চান্দির ছিপি। তোরা কিছু ঘাবড়াবি না।

রকিবার ভয় হয়, গুলির ভয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবে— করুক না গুলি। চুইয়ে চুইয়ে তো রক্ত পড়বে না— বজলের মতো হয়তো লহমার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। তা'ছাড়া এত শ'তে বিশতে যদি ভয় না পায়, তবে সেই বা পাবে কেন। গুজবটা ওঠার পর থেকে কমেছে নাকি কেউ! না লাইন ছেড়ে দিয়েছে?

কিন্তু সত্যই একদিন ঝামেলা বাধল। বেনাপোলে গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই ধুম ধুম করে শব্দ হল। লোকজনের চিৎকারে প্লাটফরম মুখরিত হয়ে উঠল। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-জোয়ান সকলেই প্রাণ হতে করে বিশৃঙ্খলভাবে ছুটাছুটি করছে। হাটের মধ্যে একটা পাগলা মহিষ ঢুকে পড়লে যে বিক্ষিপ্ততার সৃষ্টি হয় তেমনি যেন একটা কিছু হয়েছে। রকিবা গার্ডের গাড়ির সঙ্গে লাগানো একটা কামরায় ছিল। মাটিতে নেমে হতভম্বের মতো গাড়িটার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। সন্ত্রস্ত চিৎকার কলরবের মাঝে গুলি গুলি শব্দের কাটা আওয়াজ। রকিবার বুকে আত্মরক্ষার আকুল মত্ততা। চোখে মৃত্যু-ভয়ের বিভ্রান্তি।

রেলিং যেখানে শেষ হয়েছে সেদিকে সেপাই সান্ত্রী যেন অপেক্ষাকৃত কম। লোকজনও যেন সেদিকে বেশি দৌড়াচ্ছে না। এই কি সুযোগ! ইতস্তত দৃষ্টিসঞ্চালনে হঠাৎ রকিবার নজরে পড়ল ইস্টিশনের পাশে প্ল্যাটফরমের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মেরাজান এক সেপাইর সঙ্গে হেসে হেসে কী আলাপ করছে। মুহূর্তে রকিবার মনে পড়ল মেরার সেই কথাগুলি — "তারা বলেছে, বিপদে আপদে তারা দেখবে। আমাদের কোনো ভয় নেই।"

না, না, মরণ— সেও ভালো। পেটের মেয়ের যৌবন বেচে বেঁচে থাকতে চাই না।

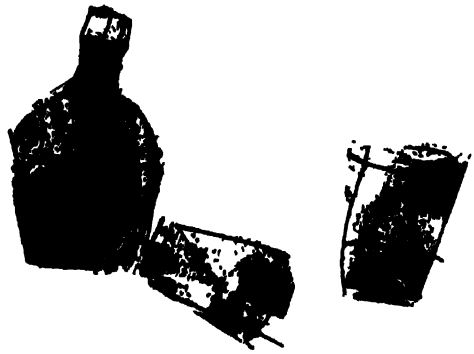
ধুম ধুম করে আরও কটা শব্দ হল। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পড়ে গেল। এমনিই কি সব লাল হয়ে যাবে! সীমানার পাথরের কাছে লাইন স্লিপারে, পাথরের মতো! রকিবা হাতের টিন ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে রেলিং-এর শেষ মাথা পার হয়ে পাশের ঝোপের দিকে দৌড়াল।

এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল। না উঠে এই জায়গায় লুকিয়ে থাকলেও হয়। কথাটা মনে পড়তেই দেখল একজন সেপাই তারই দিকে ধাওয়া করেছে, হাতে লাঠি না বন্দুক কে জানে। রকিবা মরিবাঁচি করে দৌড়াতে লাগল। পরনের কাপড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন— কাটায় লেগে অনেক জায়গায় রক্ত ঝরছে —সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কয়েক পা যেতেই ঝোপের ভেতরে থেকে আরেকজন সেপাই তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো এগিয়ে এল। লহমার মধ্যে রকিবা চিনতে পারল—কপালে সেই মোটা আঁচিল—কী নাম যেন তার। হাতে কি বন্দুক?

রকিবা রুদ্ধ নিশ্বাসে অতিকষ্টে যেন চিৎকার করে উঠল, "আমি, আমি মেরাজানের মা। চিনতে পারছ না!"



স্পর্শ



শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ-সংক্ষেপ করার জন্য এই গলিপথটা মাঝে মাঝে পার হতে হয় সুবিমলকে। সন্ধ্যার পরও কতদিন সে হেঁটে গেছে এই অপরিসর পথ ধরে সম্পাদক বন্ধুর বাড়িতে। কোনো-কিছু ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্কভাবে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পথ চলা।

ছোট্ট গলি। গলির মুখেই ক্ষুদ্রকায় একটি পান-বিড়ি-লেমোনেডের দোকান, এক ঝলক আলো এসে পড়েছে সেখান থেকে রাস্তার ওপর। এই আলোটুকুর পরেই অন্ধকার। কিছুটা অংশ জুড়ে অবশ্য। তারপরই আবাব একটা দোকান। টিনের চালার নীচে বেঞ্চি পাতা— চা-ফুলুরি প্রভৃতির দীন আয়োজন। আবার পথে এসে পিছলে-পড়া আলো। এই আলোতেই বড়ো রাস্তা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে হাঁটা যায়। বড়ো রাস্তায় সারি সারি আলোর প্রহরী, রিকশার টুং টাং, বাস অথবা ট্যাক্সির ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা।

গলিব যে-টুকু অংশ অন্ধকার — সেই অংশেই আবছা আলোয় ওরা দাঁড়িয়ে থাকে, সময়-সময় চিত্রার্পিতের মতো মনে হয়। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময়ে একযোগে নীরব হয়ে যায় পথচাবী আগন্তুকেব পদশব্দে, অসীম ঔৎসুক্যে তাকায় গলির মুখে বৃত্তাকারে পিছলে পড়া আলোর দিকে— যারা আসছে, চকিতেব মধ্যে সেই আলোয় দেখে নেয় তাদেব চেহারা, কখনো সখনো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে। মন-মনে সূক্ষ্ম একটা প্রতিযোগিতার ভাবও অনুভব করে, এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, কে কার থেকে দেখতে একটু সুন্দরী বেশি, কার প্রসাধনে পারিপাট্য জেগেছে আজ, কজ্জল-রেখায় কার চোখে ঔজ্জ্বল্য জ্বলছে বেশি? পথচারী নির্বিকারচিত্তেই ওদের পার হয়ে যখন আবার গিয়ে পড়ে আলোর বৃত্তের মধ্যে, তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সমবেদনায় মদির হয়ে ওঠে ওদের মন — এর-ওর মেকি সোনার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একট মায়া জাগে ওদের অন্তরে। কিন্তু তাও ক্ষণিকের। আলোর বৃত্তে দেখা যায় নতুন আগন্তুক, আবার মন ভরে ওঠে নতুন প্রত্যাশায়, মন্থরগতিতে এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসে পথিক — লক্ষ করে মুহূর্তের জন্য একটা শিহরণ কেঁপে যায় সারা শরীরে, ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা হয়ে ওঠে লীলায়িত — কটাক্ষে জ্বলে বাঁকা দৃষ্টি, মনে মনে হিসাব করে টাকার অঙ্ক, একটু ভালো খাবার — ভালো থাকবার উচ্চাশা মুহূর্তের জন্য তরঙ্গ তুলে আবার মিলিয়ে যায়।

দিনের পর দিন। সকলের অবস্থা অবশ্য সমান নয়, ওরই মধ্যে একটু অর্থনৈতিক তারতম্য আছে। কারুর ঘর বেশি সাজানো, কারুর কম। কারুর ঘর বড়ো, কারুর ছোট। কারুর বাড়িতে বৈদ্যুতিক নীল বাতি জ্বলে, কারুর বাড়িতে কালি-পড়া লণ্ঠন। হয়তো একই বাড়িতে এ-ঘরে বিদ্যুৎ, ও-ঘরে লণ্ঠন। কারুর তিন-চার মাস একাদিক্রমে বিদ্যুৎ জ্বলবার পর অবশেষে কেরোসিনের বাতি। ভাড়া বাকি পড়ায় বাড়িউলির লোক বাল্‌ব খুলে নিয়ে গেছে সম্ভবত। তবু, এরই মধ্যে নিত্যকার প্রসাধন, নিত্যকার হেসে কথা বলা।

ভাবুক বলে বন্ধু-মহলে খ্যাতি আছে সুবিমলের। একটি আত্ম-ভোলা কবি-মন। হিসাব-কষা সংসারে এই বে-হিসাবি লোকটাকে জীবনে মূল্য দিতে হয়নি কম, তবু আজো হিসাবে সে ভুল করে, আজো দুঃখ পায়।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি ঘন হয়েছে রীতিমতো। আকাশটাও কালো। পথ চলতে চলতে মেঘের সে কালিমা আরও ঘনীভূত হল, ওর তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। বড়ো রাস্তা দিয়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছে, দু'এক ফোঁটা বর্ষণের আভাস পাওয়া গেল। তখনো থামেনি সুবিমল, সংক্ষিপ্ত পথটা ধরে সম্পাদক বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে যাবার তখনো আশা পোষণ করছে সে।

তাড়াতাড়ি গলিতে ঢুকে পড়ে বিজলী-উজ্জ্বল দোকানটা পার হল সুবিমল, কিন্তু হিসাবে হল ভুল। ঝম্ ঝম্

করে নামল বৃষ্টি। সঙ্গে বর্ষাতি নেই, কিছু নেই। ছুটে যেখানে গিয়ে দাঁড়াতে হল সুবিমলকে, সেটা অন্ধকার এলাকারই মধ্যে। একটা কোঠা বাড়ির অ্যাসবেস্টাস ছাওয়া চাল, খানিকটা রাস্তার দিকে নেমে এসেছে, তারি নীচে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে ভালো করে তাকাল সুবিমল। জল লেগে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে রুমালে মুছে নিতে লাগল তার পুরু কাঁচ।

কিন্তু বৃষ্টি এল আরো জোরে। অ্যাসবেস্টাস্ ছাওয়া চালের কিনারের নিম্নদেশ থেকে কাছাকাছি অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চট করে ছুটে যাওয়া যায় কিনা, সন্ধানী চোখ মেলে দেখতে লাগল। বৃষ্টির ছাঁট যেন তীক্ষ্ণ ছুঁচের মতো এসে বিঁধে যাচ্ছে গায়ে। না কি খানিকটা এগিয়ে ভিজে ভিজেই যাবে চায়ের দোকানটার মধ্যে? ভরসা করা যায় না, যে বৃষ্টি— আগাগোড়া ভিজে যেতে হবে একেবারে। যেমন বৃষ্টি তেমনি হাওয়া। ওখান থেকেই দেখতে পেল সুবিমল, দোকানের সামনে দিয়ে আসতে গিয়ে জনৈক পথচারির খোলা ছাতাটা হাওয়ায় গেল উল্টে, ভদ্রলোক বাধ্য হয়ে ঢুকে গেলেন দোকানে। ছাতা থাকলেও দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি থেকে বাঁচত না সুবিমল। কী করবে না করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না সে, এমন সময় হঠাৎ কানে এল কেমন মৃদু একটা কণ্ঠস্বর — ভিতরে আসুন না?

রীতিমতো চমকেই তাকাল সুবিমল। ডানদিককার দরজাটা খুলে কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে, তাকেই লক্ষ্য করে পুনরাবৃত্তি করছে তার সম্ভাষণের।

একটা অবিশ্বাস্য ভীতি মুহূর্তে শিউরে উঠে মিলিয়ে গেল স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। মেয়েটি দরজা ছেড়ে দু' এক পা এগিয়ে এল মনে হল যেন। বলল — দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? বসুন না ভিতরে এসে?

বৃষ্টির ধারা তখন আরো ঘন, হাওয়ায় তখন আরো জোর। বৃষ্টি আর বাতাস মিলে সারা গলিটাকে কুয়াশার মতো ঝাপসা করে তুলেছে। অনেকটা স্বপ্নচালিতের মতোই ভিতরে প্রবেশ করল সুবিমল। একফালি উঠোনের মতো, ধারে ধারে ব্যারাকের মতো ঘর। কয়েকটি ঘরের দরজা থেকে উঁকি দিল আরো কয়েকটি মেয়ের মুখ। হয়তো তারা আশ্চর্যও হয়েছে, হয়তো বা হয়নি। কে একটি মেয়ে বলল, — তোর বাবু এল নাকিরে স্বপ্না?

উঠোনে পাতা ইটের ওপর পা দিয়ে দিয়ে মেয়েটির ঘরে ততক্ষণে এসে গেছে সুবিমল। সঙ্গিনীর প্রশ্নে একটু হেসে উত্তর দিল মেয়েটি, — হ্যাঁ।

— ছুঁড়ির ভাগ্য ভালো — মন্তব্য করল আরেকজন।

সুবিমল ঘরে ঢুকে গেছে, দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আরো জোরে জোরে হেসে উঠল মেয়েটি, কিন্তু কিছু বলল না। পরমুহূর্তে দরজাটা দিল টেনে বন্ধ করে। আর অনভিজ্ঞ সুবিমল ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল পাথরে খোদা নিষ্প্রাণ এক মূর্তির মতো। কত-কী কাহিনি শুনেছে সে এদের সম্বন্ধে, কত-কী ভীতিকর রটনা এদের পল্লি নিয়ে! মেয়েটি দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, কয়েকটি উদ্যত ধারালো ঝক্-ঝক্ করা ছুরি ছুটে আসছে তার দিকে। তার পকেট লক্ষ্য করে বহু দস্যুর সুদৃঢ় মুষ্টি! মেয়েটি কাছে আসতেই দু-পকেটে হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল সুবিমল, — টাকা নেই, বোধহয় আনা ছয়েক পয়সা!

মেয়েটি একটু অবাক হল যেন, একমুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওর দিকে, তারপর একটু হেসে মুখ নিচু করে বলল, টাকার কথা কেন? বৃষ্টি পড়ছে, একটু বসে থাকুন, বৃষ্টি ধরলেই চলে যাবেন।

পকেট ছেড়ে পাঞ্জাবির বোতামে হাত দিল সুবিমল, এগুলো সোনার নয়, মেকি।

মেয়েটি কেমন যেন হেসে উঠল, নিজের গলার কাছে হারটা ছুঁয়ে বলল, এ-ও মেকি।

নীল আলোর বদলে জোরালো আলোটা সুইচ টিপে জ্বেলে দিল মেয়েটি, তারপরে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ভিজে গেছে কিন্তু কাঁধ আর বুকের কাছটা!

সুবিমল গায়ের জামার ভিজে জায়গাটুকু হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিল, বলল, — ভিজুক গিয়ে।

মেয়েটি বলল, মাথাটাও ভিজে। গামছা দেব?

না-না, — তাড়াতাড়ি বলে উঠল সুবিমল, তারপরে মাথায় হাত দিয়ে দীর্ঘ চুলগুলি একটু বিন্যস্ত করে নিল।

মেয়েটি বলল, — দাঁড়িয়ে কেন, বসে পড়ুন না খাটের ওপর?

বিছানার ধবধবে নিভাঁজ শুভ্র চাদরের দিকে তাকিয়ে সুবিমল বলল, বসব?

বসুন না!

বসবার পর একটু যেন স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল সুবিমল, একটু সহজ।

মেয়েটি বাইরের জানালার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, টেনে বন্ধ করে দিল ভালো করে, বলল, বৃষ্টির ছাঁট আসছে, আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়েছিল আর কী আজ, ভিজে সপসপে হয়ে যেতেন!

খুব মৃদুস্বরেই সুবিমল বলল — বাড়ল না কি বৃষ্টি?

বাড়ছে মানে? এগিয়ে আসতে আসতে মেয়েটি বলল — রাস্তাঘাট ভেসে যাচ্ছে এতক্ষণে! বড়ো রাস্তায় দেখুন গিয়ে হয়তো এরই মধ্যে জল জমে গেছে, ট্রামগুলি সারি সারি দাঁড়িয়ে গেছে! জল ঠেলে ঠেলে শুধু চলছে বাস!

সুবিমল মেয়েটির দিকে তাকাল এতক্ষণে। সাদা শাড়ি পরা ছিপছিপে গড়নের মোটামুটি সুশ্রী একটি তরুণী। মুখখানাতে কেমন একটা ছেলেমানুষির ভাব মেশানো, চোখের কোণে কিন্তু ক্লান্তির গভীর রেখা, একটা অবসাদের গ্লানিমা নেমেছে যেন চোখ-মুখ-ভঙ্গিমায়। ওর কাছে জীবনের যেন দুর্বিষহ, অথচ সেটা কাটিয়ে ওঠবার প্রয়াস রয়েছে অনুক্ষণ, নতুন করে আশা জাগে মনে, — নতুন করে জীবন সংগ্রামের প্রেরণা!

মেয়েটির মুখে রঙ নেই, হালকা একটা প্রসাধন মুখখানাতে কিছুটা স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য সুবিমলের মনে হল কথাগুলি, মুহূর্তের জন্যই একটা প্রাণ-শক্তির ঝলক যেন দেখতে পেল সে মেয়েটির মধ্যে। সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে।

নাঃ, কিছুক্ষণ আপনাকে বসতেই হল দেখছি, বৃষ্টিটা ধরবার নাম নেই!

সুবিমল বলল — এসে হয়তো অসুবিধাই করলাম আপনার।

অসুবিধা? মেয়েটি ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলল, না। বরং সুবিধাই করেছেন।

কী রকম!

হাসতে-হাসতেই মেয়েটি বলল — আপনি না এলে ঠায় একা বসে থাকতাম ও বসে বসে বৃষ্টি দেখতাম।

হয়তো সেটা ভালো হত।

না। একা-একা বৃষ্টি দেখবার উপায় আছে নাকি? এখুনি ও ঘরের মেয়েগুলো আসত ছুটোপাটি করতে। গত মাস থেকে এ'ঘরে বিজলী এসেছে কিনা, টিমটিমে হ্যারিকেন আর জ্বলে না। জোরালো আলোর নীচে এলে ওদের মধ্যে হইচই পড়ে।

ওদের ঘরে বিদ্যুৎ নেই বুঝি?

না। — মেয়েটি বলল — ওপরের ঘরের এক সরলা ছাড়া কারুর ঘরে নেই। আমার ঘরেই কী আসত নাকি? নেহাত চেহারায় একটা চটক্ ফুটেছে নাকি, তাই ঘরেও একটা শ্রী এল। আমি বলি, ওসব চটক্ ফটক্ কিছু না, আসলে আমার এখন একটু পড়্তা পড়েছে।

বেশ অন্তরঙ্গ সুরেই কথাগুলি বলে যাচ্ছে মেয়েটি। মনে হচ্ছে, অনেক কথা জমেছে ওর, হাওয়া বুঝি অনুকূল, তাই ঝরে পড়ছে ওর কথা-ফুলগুলি।

একটু যেন সরলতাও আছে মেয়েটার মধ্যে। একটু যেন ভাবালুতাও। এটাও অবশ্য সুবিমলের মনে হওয়া, সত্যিও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে।

সুবিমল বলল — নাম বুঝি স্বপ্না?

হেসে ফেলল মেয়েটি, বলল, কোথা থেকে শুনলেন?

ওই মেয়েটি যে আপনাকে ডাকল তখন?

শুনেছেন বুঝি? — মেয়েটি বলল — স্বপ্নাই বটে। নিজেই রেখেছি নিজের নাম, আজকালকার রেওয়াজ বুঝে। কেমন, ভালো না নামটা?

ভালো।

জানেন? মেয়েটি বলল, আজকাল রঙ-টঙ মাখাও কেউ পছন্দ করে না। বড়ো বিশ্রী। বেশিক্ষণ রঙ মেখে থাকলে কেমন অস্বস্তি লাগে, মাথাটাও ধরে যায়।

তাই নাকি?

ও মা, জানেন না? — প্রশ্ন করেই হেসে ফেলল মেয়েটি। জানেন। ভান করছেন।

একটু অদ্ভুতই মনে হচ্ছে মেয়েটিকে। কিংবা হয়তো এ ধরনের মেয়েরা এমনই হয়!

বলল, ধরল বৃষ্টি?

জানালাটা একটু খুলে দেখে নিয়ে ফের বন্ধ করল মেয়েটি, বলল, সে গুড়ে বালি! সমানে বৃষ্টি হচ্ছে! হোক না, কত আর হবে, থামতেই হবে এক সময়!

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেয়েটি আবার বলল — রাস্তায় জল জমলে বেশ মজা না? বেশ পায়ের পাতা ভিজিয়ে-ভিজিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়!

ভালো লাগে বুঝি?

কী, বৃষ্টি।? ভীষণ ভালো লাগে! — বালিকার মতো সারল্যে বলতে থাকে মেয়েটি — বৃষ্টি পড়লে কোনো লোক আসবে না তো, বেশ মজা পাওয়া যায়!

আমি যে এলাম?

আহা! মেয়েটি বলল, একে কি আসা বলে নাকি?

বলেই হেসে উঠল, তারপর বলল, সে সব ধরনের লোক আমরা চিনি। আপনি না।

সুবিমল বলল, দেখুন, একটা কথা বলব?

বলুন না?

কিছু মনে করবেন না তো?

না।

সুবিমল বলল, এই যে আমি বসে আছি, কোনো ভয়ডর নেই তো?

হেসে উঠল মেয়েটি, বলল, ওমা, কেন?

লোকে কত কী বলে, টাকাচুরি, হেন-তেন, কত কী?

বুঝেছি, মেয়েটি বলল, কিন্তু তাতে ক্ষতি কার বেশি জানেন? ধরুন আপনার কাছে কুড়ি টাকা আছে, আমি বা আমার লোক সব কেড়ে নিলাম, কুড়িটা টাকা পেলাম ঠিক, কিন্তু আপনি আর আসবেন কেন? কেমন কি না। ব্যবসা করতে বসে এটা ভাবতে হয় বই কী! কোনটা হয় তাহলে লাভের শেষ পর্যন্ত?

আগ্রহের সঙ্গেই ওর কথা শুনে যায় সুবিমল। মেয়েটির কথা বলার ধরনে একটু কৌতুকও অনুভব করে। এ এক অনাবিষ্কৃত জগৎ ওর কাছে!

কী? ভাবছেন কী এত? এখনও ভয় গেল না?

না, তা নয়, একটু অপ্রতিভ হয়ে সুবিমল বলে, আপনার কথাগুলি শুনতে বেশ লাগছে। বেশ কথা বলেন তো আপনি!

হেসে উঠল মেয়েটি, একটা খুশির হিল্লোল যেন বয়ে গেল সারা শরীরে, বাহু দুটি একবার দুলিয়ে খাটের বাজু ধরে লীলায়িত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল, বলে, জানেন না বুঝি? কথায় আমরা ওস্তাদ।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, কথা-বার্তায় আপনাদের খুশি করতে না পারলে আমাদের চলবে কেন?

সুবিমল একটু হেসে বলল, খুব কথার মালা গাঁথতে হয় বুঝি?

কী বললেন? কথার মালা? বাঃ, বেশ বললেন তো, শিখে রাখলাম।

তা শিখুন, সুবিমল বলল, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা আপনি দিলেন না তো?

কোন প্রশ্ন? ও ওই কথার মালা? — মুহূর্তে যেন বিরস হয়ে গেল মেয়েটির মুখখানা, একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল — যারা আসে, কথা আর শুনতে চায় কই?

চায় না?

মেয়েটি একটু ম্লান হাসে, বলে, অথচ আমাদের তো সাধ যায়, যাকে ভালো লাগে, তার কাছে সুখদুঃখের কথা বলতে!

সেটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু সেটা হয় না। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে কথা বলা শিখি।

ঠিক বুঝলাম না কিন্তু আপনার কথা।

বুঝলেন না? মেয়েটি একটু হাসল মুখ টিপে, যারা আসে তারা শুধু শুনতে চায় ভালোবাসাবাসির কথা, আর কিছু তো নয়! বড়োজোর নামটা, ব্যস্, এই পর্যন্ত।

ভঙ্গির মধ্যে একটা অকপট কথনের সুর আছে মেয়েটির, যেটা বেশ ভালো লাগে! সুবিমল একটু হেসে বলে, ভেবে দেখতে গেলে এর বেশি জানবার আর কী আছে মানুষের সম্বন্ধে মানুষের?

চোখ বড়ো বড়ো করে মেয়েটি উত্তর দেয়, আপনার তাই মনে হয় বুঝি? হয়তো আপনার কথাই সত্যি! আমার কিন্তু ওতেই মন ভরে না।

চুপ করে থাকে মেয়েটি। সুবিমলও চুপ। বাইরে ঝুপঝুপ করে সমানে বর্ষণ চলেছে তখনো। বন্ধ ক্ষুদ্রকায় ঘরখানার মধ্যে শুধু ওরা দু-জন। খাট, আলমারি, বাক্স, আরো কী সব টুকিটাকি জিনিস। পাশেই বোধহয় রান্নাঘর। শাড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে পর্দা তৈরি করে ঝুলিয়ে দিয়েছে দুই ঘরের মাঝখানে। রাস্তার দিক্‌কার বন্ধ জানালাটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জোরে জোরেই হেসে ওঠে মেয়েটি, বলে, দেখেছেন? জানালা টেনে বন্ধ করে দিয়েছি, তবু জল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে আসছে! ওই দেখুন কেমন এঁকে বেঁকে দেওয়াল বেয়ে একটা ধারা নেমেছে। ঠিক যেন একটা সাপ, তা না?

সুবিমল একটু হেসে চুপ করে রইল। মেয়েটি সেই একভাবেই দাঁড়িয়ে। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে যাওয়ার পর মেয়েটি বলল, ভাবছেন কী অত?

একটা কথা ভাবছি।

কী?

সুবিমল মেয়েটির মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, শুনে আশ্চর্য হবেন না তো?

না। বলুন না আপনি?

সুবিমল একটু থেমে থেকে তারপর বলল — আপনাকে নিয়ে গল্প লেখা যায় কি না, তাই ভাবছি।

গল্প! — মেয়েটি বিস্ফারিত নেত্রে ওর দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, গল্প...মানে...

মেয়েটির মুখখানা যেন মুহূর্তে আলোয় ভরে ওঠে, বলে, আমায় নিয়ে!

হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে।

হঠাৎ আবার গ্লানিমায় ঢেকে যায় মেয়েটির মুখ, বলে, কী করে লিখবেন? কতটুকু জানেন আমার কথা?

যতটুকু জেনেছি, তাতে লেখা চলে।

অবাক হয়ে সুবিমলের দিকে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি — লম্বা-লম্বা ঘন চুল, চোখদুটি যেন স্বপ্ন দেখছে! ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে জাগে মেয়েটির, সঙ্গে সঙ্গে অধীর হয়ে ওঠে আগ্রহে আর উত্তেজনায়, বলে, বুঝেছি!

কী?

সিনেমার গল্প, না? ওই যে টকিতে কথা বলে ছবিগুলো, তার গল্প লিখবেন! না? সে বেশ হবে!

আশ্চর্য হয়ে যায় ওর কথা শুনে সুবিমল। গল্প লেখার প্রসঙ্গে সিনেমার কথা হঠাৎ তুলল কেন মেয়েটি? আর এত উৎসাহের সঙ্গে! ঠিক ভেবে পায় না।

মেয়েটির উৎসাহ হয়ে যায় দ্বিগুণিত, আতিশয্যে ওর একেবারে কাছে সরে আসে মেয়েটি, বলে, এতক্ষণে আমি চিনেছি আপনাকে! আমার তখন থেকেই আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি-দেখেছি মনে হচ্ছিল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সুবিমল। মেয়েটির সে পরিচিত? বলে কী ও?

মেয়েটির বুক দ্রুত ওঠা-নামা করছে উত্তেজনায়, বলল, বছর তিনেক আগেকার কথা। আমার এক বাবু আমাকে বেহালার দিকে নিয়ে গিয়েছিল সিনেমা দেখাতে। সিনেমা মানে টকি। কথা বলে। তাতে আপনি পার্ট করেছিলেন না? সেই যে মেয়েটার স্বামী, ওই যে শেষকালে যার সঙ্গে বিয়ে হল মেয়েটার?

কী আবোল-তাবোল বকছে এই মেয়েটি! সিনেমায় সে আবার পার্ট করল কবে?

মেয়েটি আবিষ্টের মতো বলে চলেছে — আমি কোনোদিন টকি দেখিনি জানেন? ওই সেই একবার। কী সুন্দর! দেখেছেন, আপনাকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম!

বুঝতে পারে সুবিমল, মারাত্মক ভুল করেছে এই মেয়েটি। কোন ছবির নায়কের সঙ্গে তার সাদৃশ্য মেয়েটি খুঁজে পেল কে জানে! কিন্তু গল্প লেখার সঙ্গে ছবিতে নায়ক সাজার সম্বন্ধ কী?

চমকটা কেটে যাবার বেশ কিছু পবে সুবিমল প্রশ্ন করে — সিনেমা তো দেখেছেন। বই পড়েন? বই?

বই? মেয়েটি বললে, না ইশকুলে আর ভর্তি হলাম কবে? বাড়ি বসে মা যেটুকু

না না, সে কথা নয়। গল্পের বই-টইয়ের কথা বলছি।

ছোটোবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে দু-একটা পড়তুম। এখন বই পাবই বা কোথায়, পড়বার সময়ই বা কই! ওপরের সরলার কাছ থেকে অনেক সেধে টেধে একটা বই পড়েছিলুম, বিষবৃক্ষ। বুঝলেন? কিন্তু বইয়ের কথা কেন? সিনেমাব কথা বলুন না একটু। বইগুলোকেই তো সিনেমা করে?

তা করে, হেসে সুবিমল বলে, কিন্তু একথা কেন? সিনেমার দিকে খুব ঝোঁক বুঝি?

একেবারে কাছে ঘন হয়ে এসে চুপি চুপি কথা বলার মতন ফিসফিস করে বলে, ওপরের সরলা? ওর এক বাবু সিনেমাব বই লিখেছিল। ওঃ একদিন কী খাওয়া-দাওয়া ওব ঘবে।

বলেই চুপ করে যায়, যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, যেন চোখেব সামনে দেখতে পায় প্রতিযোগিনীব সেই সোনামোড়া দিনেব ঐশ্বর্য-সম্ভাব।

হঠাৎ যেন চমক ভেঙে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়, বলে, চা খাবেন?

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সুবিমল, না না।

তিরস্কারেব ভঙ্গিতে মেয়েটি বলে, না-না কেন? খান না? আমাব তোলা পেয়ালা পিরিচ রয়েছে।

না না, তাব জন্য নয়।

তবে? আমাব হাতে খাবার কথা ভাবছেন? কেন রেস্টুরেন্টে খান না চা? জাত-বেজাত ভাবেন না কি তখন?

না না আমি সে কথা বলছি না।

মেয়েটি মাথাটা হেলিয়ে যেন শাসনের ভঙ্গিতে বলে, অনেক বাব না-না বলেছেন। এবাব শুনব না, আমি এক্ষুনি চা করে আনছি। বসে থাকুন।

সাজানো আলমাবির পুতুলগুলির পাশ থেকে পেয়ালা পিরিচ বাব কবে মেয়েটি, ওব দিকে অপাঙ্গে একবার তাকিয়ে পর্দা সরিয়ে চলে যায় রান্নাঘরে। আর ঘরের মধ্যে অপ্রস্তুতের মতো বসে থাকে সুবিমল। কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কবতে থাকে সে। পত্রিকায় পত্রিকায় লিখে খাওয়া দরিদ্র তরুণ লেখক। পাইস হোটেলের পয়সা জোটানোই তার কাছে কষ্টকব, তাব পক্ষে এই অজ্ঞ উৎসাহী মেয়েটির সামনে অনর্থক একটা আশার আলো তুলে ধরা মারাত্মক অপরাধ। গল্প লেখার কথা তোলাই হয়েছে তার সব থেকে বড়ো ভুল! ধীব পায়ে উঠে দাঁড়ায় সুবিমল, অতি সন্তর্পণে দরজার খিলটা খুলে বাইরের বৃষ্টির অবস্থা নিরীক্ষণ করে। হাওয়াটা কমেছে, বৃষ্টির বক্রধারাও সরল হয়ে এসেছে।

কাঠের উনুনে হাওয়া দিতে দিতে পিঁড়ির ওপর বসে অনেক কথাই ভাবতে থাকে মেয়েটি। ভদ্রলোককে চা খাওয়ার কথা বলে এসে রীতিমতো বিপদেই বুঝি পড়ল সে। চা আছে দুধও একটু আছে, কিন্তু চিনি নেই। রান্নাঘবের আগড়টা খুলে যাবে নাকি কমলার কাছে চিনি ধার নিতে। আগেরটিরই তো শোধ হয় নি, দেবে কি এবার চাইলে? ঘরে বাবু এসেছে শুনলে দিতেও পারে। চায়ের সমস্যা নয় মিটল, কিন্তু রাত পোহালে কাল কী হবে, ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে যায়। ঘরে সব কিছু বাড়ন্ত, হাতে একটাও পয়সা নেই। বাড়িউলি মাসির লোক কাল নির্ঘাত বাল্‌ব খুলে নিয়ে যাবে, ভাড়া বাকি পড়ার দরুন। তার ওপরে যারা টাকা পায়, তারা? খেয়ালের বশে ভদ্রলোককে ঘরে এনে ভালো করেনি সে। ওরা জানবে, বাবু এসেছে, নিশ্চয়ই টাকা পেয়েছে ছুঁড়ি। কাল সকালে ওকে ছিঁড়ে খাবে সবাই টাকা-টাকা করে!

পোড়া বৃষ্টিব জন্যই তো এতো! বৃষ্টি পড়লে কেন যেন মাতাল হয়ে যায় মন। যেন মেতে ওঠে সে।

তা হোক, ভদ্রলোকটি কিন্তু বেশ। কতগুলি মিথ্যা কথাও বলে ফেলেছে সে লোকটাকে। তার পড়তা

পড়েছে হেন-তেন কত কী! লোকটা কেন প্রথম থেকেই তাকে 'আপনি আপনি' করতে শুরু করে দিল। তাদের মতো মেয়েকে কেউ আবার আপনি বলে না কী? হয়তো ভালো লেগেছে তাকে লোকটার। না-না, অন্যরকম ভালো-লাগা, সিনেমার ভালো-লাগা! সত্যিই, সিনেমার লোকগুলোই হয় ওই রকম! সরলার মতো তাকে যদি যাকে বলে 'চান্স'— সেই 'চান্স' দেয় লোকটি, তাহলে ...

তাহলে তার চেহারাই হয়ে দাঁড়াবে অন্যরকম। সরলা-'নিবেদিতা' হয়ে মোটরে মোটরে ঘুরে বেড়ায়, আর সে... না, সে স্বপ্নাই থাকবে।

ওই যাঃ! ভদ্রলোকের নামটা তো জেনে নেওয়া হয় নি। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর নাম। সেই সরলার লোকটার মতো।

ফুটতে থাকুক জলটা কেটলিতে। ও ততক্ষণ ঘুরে আসুক একটু ছেলেটির কাছ থেকে। চুপচাপ বসে বসে করছে কী ও? পর্দা—সরিয়ে ঘরে এল মেয়েটি।

কিন্তু কোথায় সে?

দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরে সে নেই। চলে গেছে চুপি চুপি। বৃষ্টি কমে এসেছে। প্রস্তরমূর্তিবৎ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল স্বপ্না।

দুদ্দাড় করে ছুটে এল কমলির দল -- কী লো বাবু চলে গেল?

হা হা করে হঠাৎ হাসিতে যেন লুটিয়ে পড়ল মেয়েটি — বলল — বাবু!

বাবু কে?

ওই যে লোকটা এসেছিল?

বাবু নয়।

তবে?

তেমনি হাসতে হাসতেই উত্তর দিল মেয়েটি, সিনেমার লোক রে, সিনেমার লোক। আমার সঙ্গে 'কনটাক্ট' করতে এসেছিল। হয়ে গেল কনটাক্ট।

বলে আবার হাসতে লাগল উচ্ছ্বসিত হয়ে বিস্মিত বিহ্বল কয়েকটি সহচরীর সামনে।



শনি

সন্তোষকুমার ঘোষ

বাবরি চুলের নীচে কামানো ঘাড়, পাউডারের ছাপ, ডানধারে বোতামওয়ালা পাঞ্জাবির তিনটে বোতামই খোলা। গোঁফের অতি সূক্ষ্ম অগ্রভাগে কী একটা কুটিল সংকল্পের ইঙ্গিত।

ভয়ে যমুনার মুখ শুকিয়ে গেল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বিনুনি করছিল, আস্তে আস্তে পিছিয়ে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, কপালে এরই মধ্যে ক'ফোঁটা ঘাম জমেছে। আবার একটু ক্রিম ঘষতে হল।

তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে যমুনা নেমে এল নীচে। যদি নিরস্ত করতে পারে, আলের ওপর শুয়ে পড়েও ঠেকাতে পারে সর্বনাশের বেনোজল।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই লোকটা ঢুকে পড়েছে। কপাটটা ভেতর থেকে দিয়েছে ভেজিয়ে।

দরজার বাহিরে ধুলোয় খপ করে বসে পড়ল যমুনা। মেয়াদ তো ফুরিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেক পর এ ধুলোটুকুর ওপরও আর কোনো অধিকার থাকবে না। নরেশ যখন সব জানতে পারবে। যেমন আছে, এই পোশাকেই মাথা নিচু করে বেরিয়ে যেতে হবে, হয়তো ওই লোকটার সঙ্গেই, কালাপাহাড়ি নিষ্ঠুরতা নিয়ে আজ যে হানা দিয়েছে। বিষশ্বাস বাসুকি উঠে এসেছে পাতালের নিমন্ত্রণ নিয়ে।

দরজার ওপর কান পাতল যমুনা। বন্ধ ঘরের কথাবার্তা, কিছু বোঝবার উপায় নেই। কেবল ফিসফিস শব্দে একটা হীন চক্রান্তের ইঙ্গিত।

লোকটা যা বলবার সব বলেছে সন্দেহ নেই। ওর সাপুড়ের ঝাঁপি খুলেছে। যমুনার জীবনে একটিমাত্র মিথ্যা, একটিমাত্র প্রবঞ্চনা ফুল হয়ে উঠেছিল, তার এক-একটি পাপ্‌ড়ি খুলছে।

যমুনার লোভ হল, একবার শোনে উত্তরে কী বলছে নরেশ। সে কি বিশ্বাস করেছে? বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী। লোকটা এত তোড়জোড় করে যখন এসেছে, তখন কি আর উপযুক্ত প্রমাণ-দলিল না নিয়েই এসেছে।

দু একবার মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল নরেশের। কথাগুলো যমুনা বুঝতে পারল না, কিন্তু স্পষ্ট যেন দেখতে পেল, অপ্রত্যাশিত, মর্মান্তিক সত্যের আঁচ লেগে চোখ-মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কঠিন আঙুলের শিরাগুলি উঁচু হয়ে উঠেছে, চেয়ারের হাতল শক্ত মুঠিতে ধরে মাথা নিচু করে বসে আছে। পানপাত্র একবার নিঃশেষ করে লোকে যেমন শূন্যপাত্র এগিয়ে দিয়ে আবার ভরে দেবার নির্দেশ দেয়, তেমনিভাবে একটু একটু শুনছে নরেশ, ওর মাথাটা বুঝি একটু একটু টলছে; বলছে, তারপর, তারপর।

যমুনা জানে তারপর কী। ওই লোকটা বেরিয়ে যেতেই নরেশ উঠে আসবে টলতে টলতে। রাগে, ঘৃণায় আরক্ত চোখে তাকাবে যমুনার দিকে। তারপর? লাথি মারবে, না চুলের ঝুঁটি ধরবে? নাকি গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে সদরে?

দিক। যমুনাও শক্ত করে বেঁধেছে মন। দুদিনের স্বর্গসুখ যদি ঘুচেই যায়, যাক তবে। আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল যমুনা। অল্প অল্প পা টলছে। তবু রেলিং ধরে অনায়াসেই উঠতে পারল ওপরে।

টেবিলের ওপর বিকেলে তুলে আনা ফুলগুলি এখনো অম্লান। বিছানার ওপর নতুন ভাঁজভাঙা চাদরটা পরিপাটি। সমস্ত মুখটা তেতো হয়ে গিয়ে একটা কান্না এল যমুনার। এ বিছানায় আর কোনোদিন শোওয়া হবে না। ফুলতোলা বালিশের মসৃণ ওয়াড়গুলোর ওপর যমুনা একবার হাত বুলিয়ে নিলে, ভিজে-ওঠা কপোল বালিশের ঈষদুষ্ণ কোমলতার মধ্যে ডুবিয়ে চোখ বুজে রইল খানিকক্ষণ। এ স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, থাক না।।

কিন্তু একটু পরেই উঠতে হল তাকে। সারা শরীরে একটা অস্থিরতা, বুক জ্বলছে, গলা জ্বলছে, চোখ জ্বলছে। কতক্ষণে যাবে ওই লোকটা, কতক্ষণে ওপরে উঠে আসবে নরেশ।

আঁচলের চাবির গোছা খুলে যমুনা টেবিলের ওপর মাথা রাখল। গয়না সামান্যই আছে, গায়ে, এগুলো প্রায় সবই নিয়ে যাবে। নতুন ব্যবসায়ের এগুলো হবে পুঁজি।

কিন্তু এই দুল জোড়াটা? এটা নরেশের দেওয়া। এটাকে তো খুলে যেতে হবে। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যমুনা চোখ থেকে গড়িয়ে নামা চোখের জলের ভিজে দাগ ঘষে ঘষে তুলল আঁচল দিয়ে। তারপর দুল জোড়া খুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেঁপে-যাওয়া হাত কেবলি ফসকে গেল। কানের গোড়ার চুলের সঙ্গে দুলজোড়া এমন জড়িয়ে গেছে, যে কিছুতেই খোলা গেল না। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। যাক তবে। নিজে হাতেই নরেশ এটা খুলবে। হয়তো দেবে একটা হ্যাঁচকা টান, কানের লতি যাবে ছিঁড়ে, কয়েক ফোঁটা রক্ত আর চুলে জড়ানো দুলজোড়া নরেশ রেখে দেবে পকেটে। একটু ব্যথা হয়তো করবে যমুনার, শিরশির করবে কান দুটো, শরীরটা যাবে কাঠের মতো নিস্পন্দ হয়ে, দাঁতে চাপা ঠোঁট দিয়ে একটা যন্ত্রণাসূচক অব্যয় বেরিয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তবু সে এমন বেশি কী! যমুনা একবার দেখতে চায় কত নিষ্ঠুর হতে পারে নরেশ।

টাইমপিস ঘড়িটা বাজছে টিকটিক করে। যমুনা তাকিয়ে দেখল সাড়ে ছটা। ওই শব্দ জানান দিচ্ছে, ফুরিয়ে এল, যমুনার বধূজীবনের পরমায়ু ফুরিয়ে এল। ওই শব্দের সঙ্গে তাল মেলে একমাত্র যমুনার আতঙ্কিত হৃৎস্পন্দনের। নিজের বিবাহিত জীবনের এই ক'টা দিনকে মনে মনে থিয়েটারের দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী বিরতির সঙ্গে তুলনা করলে যমুনা। অন্ধকার, রুদ্ধদ্বার প্রেক্ষাগৃহ, হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল, কয়েক মিনিটের জন্যে সব ক'টা দরজা গেল খুলে, কিন্তু তারপরেই আবার অন্ধকার।

অন্ধকার ছাড়া কী! নন্দেরচাঁদ বাই লেনের দিনগুলিকে অন্ধকার ঘরের দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কী মনে হতে পারে। আবার যমুনা ফিরে যাবে সেখানেই। মাকে গিয়ে বলবে, তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনেক সেলামি দিলুম মা, এবার ক্ষ্যামা দাও। আমি যা তাই থাকতে দাও।

তখন কি ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যাবে মাতঙ্গের মুখ? কী যে উদ্ভট খেয়াল হয়েছিল মাতঙ্গের। নিজের সারাজীবন কেটেছে নন্দেরচাঁদ বাই লেনের পাঁকে, যেখানে সন্ধ্যা হতেই বেসুরো হারমোনিয়ামের আওয়াজ আর ঘুঙুরের বোল ওঠে। রাত একটা দুটো পর্যন্ত শোনা যায় রিকশার ঠুন ঠুন। প্রমত্ত নিশাচর বিটের পাহারা-ওয়ালাকে পালিয়ে ফেরে।

কিন্তু এ জীবনে মাতঙ্গের রুচি ছিল না। সে স্বপ্ন দেখত একটি ছোটো নীড়ের, যেখানে সন্ধ্যাবেলা শাঁখ বাজে, ধূপ সুরভি ঠাকুর ঘরে একটিমাত্র স্নিগ্ধ ঘৃতদীপ জ্বলে।

মাতঙ্গের চোখের ওপর টিয়া বাড়ি কিনলে, তারও বয়স হয়েছিল, সেই বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসল মাসি হয়ে। আর মাতঙ্গকে শেষ বয়সে করতে হল বাড়ি বাড়ি দাসীবৃত্তি। সময় থাকতে গুছিয়ে নিতে পারেনি, ওর চেহারাটাই দুষমনি করেছে ওর সঙ্গে। ভারী গলায় গান উঠত না, মোটা আঙুলে বাজত না বাজনা। এখনো বাজে না, কাঁসার বাসনে শালপাতার বাজনা বাজিয়েই মাতঙ্গের জীবন গেল। টিয়া ওকে করুণা করত। বলত, তুই নিজে তো কিছুই করতে পারলিনি মাতঙ্গ, তোর মেয়েটাকে আমায় দে। ভরা-ভরা শরীর, রোজগারের সময় তো এই। গলাটাও মিঠে, ওকে আমি এমন গান শেখাব যে লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজিরাও হার মানবে।

টিয়া মাসির বাড়ির সেই হাতেখড়ির দিনগুলি মনে হতেই গায়ে এখনো কাঁটা দেয়। বিকেল হতেই দল বেঁধে গা ধোওয়া। পাতা কেটে চুল বেঁধে খয়েরি টিপ পরা। তারপর খোলা দরজার দু'পাশের রক ঘেঁষে দু'সার দিয়ে দাঁড়ান। ওদের মধ্যে তরঙ্গ আবার ছিল সবচেয়ে সাহসিকা। মাঝে মাঝে সে বেরিয়ে গিয়ে সদর রাস্তা কি পার্ক থেকে খদ্দের নিয়ে আসত। সুবিধে পেলে রাস্তার লোকের হাত ধরে টানাটানি করতেও পেছপা হত না।

কোলে একটা বেড়ালের ছানা, ডান হাতে বিড়ি, তরঙ্গের চেহারাটাও স্পষ্ট মনে আছে যমুনার।

প্রথম প্রথম যমুনার বুক ঢিপ ঢিপ করত। চৌকাঠ পেরিয়ে সংকীর্ণ প্যাসেজটাতে দাঁড়িয়ে লোকগুলো দেশলাই জ্বালত, কিন্তু সিগারেট ধরানোর পরেও নেভাত না কাঠি। একে একে সবার মুখের সমুখ দিয়ে পুড়ে-আসা কাঠিটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেত। সৌরভী, তরঙ্গরা কুৎসিত একটা গালাগালি দিত, কিংবা খিলখিল হেসে গড়িয়ে পড়ত এ ওর গায়ে। আর যমুনা দু হাত দিয়ে ওর মুখটা দিত আড়াল করে। মনে মনে প্রার্থনা করত, হে ভগবান, আমাকে যেন পছন্দ না করে।

তবু কেউ না কেউ পছন্দ করতই। সেই অপরিচিতদের নিয়ে দরজায় খিল দিতে গিয়ে হাত সরত না, বুক

দুর দুর করত, সমস্ত শরীর আসত অবশ হয়ে। ওদের হাতে জড়ানো বেলফুলের মালার উগ্র সুবাস ছাপিয়ে উঠত পানীয়ের গন্ধ।

পরদিন সকালে আবার যে-কে-সেই। স্নান শেষে শরীরটাকে মনে হত প্রথম বর্ষার ভেজা মাটির মতো স্নিগ্ধ, সরস, নরম।

টিয়া মাসি কোনোদিন নিয়ে যেত গঙ্গায়। ঘাটের উড়ে ঠাকুরের হাতে তিলক কেটে টিয়া মাসি ফিরত এক ঘড়া গঙ্গাজল নিয়ে। ঘরদোর বিছানায় সেই জল ছিটিয়ে দিত মাসি। বলত, পাপ, পাপ, পাপে চারদিক ভবে গেল।

প্রথম প্রথম বিস্মিত হত, পরে শুধু মজা পেত যমুনা। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়াব পর এই টিযা মাসিবই আবার অন্যরূপ। তখন সে তার চুলগুলোকে আলগা একটা গিঁট দিয়ে স্তূপ করে রেখেছে মাথার ওপব, মাংসল শরীরটার আবরণ ঢিলে করে দিয়ে হিসেব নিচ্ছে সকলের কাছে।

সহজ হিসেবের ওপর আরেকটা উপরি হিসেব ছিল টিয়া মাসির। আইনকে নল্‌চের আড়াল দিয়ে চুপে চুপে চোলাই মদের ব্যবসা চালাত। অবশ্য যারা আসত ওদের কাছে তাদের অনেকেই আগে থেকে চুর হয়ে আসত। কিন্তু তবু প্রায়ই এখানে এসে ওদের তেষ্টা পেত। তখন হয়তো নিশুতি বাত। কোথায় আছে নির্ঝরিণী?

আছে। টিয়া মাসির কাছে আছে। ওর তোশক-ঢাকা তক্তপোশের আলগা পাটাতনের নীচে চোরা সিন্দুকে ঝক্‌ঝকে বোতল সর্বদাই মজুত। খিল খুলে এক-একটি মেয়ে বাইরে আসে, টিয়া মাসি বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে। কীরে, কী চাই? কাছে এসে অন্তরঙ্গ সুরে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েরা চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করে, আছে?

আছে। ক' বোতল?

সন্তর্পণে তোশক তুলে, তালা খুলে চোরা সিন্দুকেব রহস্য উন্মোচন কবে টিযা মাসি। আঁচলে দশ-বিশ টাকাব নোট বাঁধতে বাঁধতে বলে, ভাগ্ এবার। পালা। যত সব পাপ জুটেছে এখানে।

মুখ টিপে টিপে হাসে মেয়েরা। আর ক' বোতল আছে টিয়া মাসি? তখন টিয়া মুখ খুলে গাল পাড়তে শুরু করে। বোতল? কীসের বোতল?। সিন্দুক ভর্তি সব তো গঙ্গাজল।

শুধু গঙ্গাজল, মাসি?

হাসতে হাসতে মেয়েরা চলে যায়, টিয়া মাসিও হাসতে শুরু করে। এ মাসে যদি পঞ্চাশ বোতল চালাতে পারিস সৌরভী, তবে তোর কুকুরের বরাদ্দ আধপো মাংস আমি একপো করে দেব।

ক্রমেই সয়ে আসছিল। কিন্তু তবু যেদিন সৌরভীর ঘরে একটা লোক খুন হল, সেদিন ভয় পেয়েছিল যমুনা। পুলিস এল, ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। জেরা করলে কত রকম। সৌরভীকে বুঝি মারধোরও করেছিল। ওদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হল গলির মোড়ের পানওয়ালাটাও।

তারপর ওরা একদিন ছাড়াও পেল। লোকে বলে টিয়া মাসি ঘুষ খাইয়েছিল পুলিসকে। কিন্তু সৌরভীকে ওরা রেখে দিলে। সব কাহিনি যখন জানা গেল, তখন গায়ে কাঁটা দিয়েছিল যমুনার। ওই লোকটা সম্প্রতি সৌরভীর ঘরে কিছু ঘন ঘন আসতে শুরু করেছিল। ফুরফুরে বাবু ছিল লোকটা; পায়ে পাম্পসু, গায়ে মিহি পাঞ্জাবি। দামি সিগারেট ছাড়া খেত না। পকেটের রুমাল সর্বদাই এসেন্সে ভুর ভুর করত। সেই লোকটাকে মোড়ে পানওয়ালার সঙ্গে ষড় করে মারলে সৌরভী। লোকটা রোজ সন্ধ্যাবেলাতেই আসবার আগে ওই দোকান থেকে পান কিনে খেত। পানের সঙ্গে কী একটা ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল সেদিন. লোকটা টলতে টলতে সৌরভীর বিছানা পর্যন্ত এসেই কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর গভীর রাতে সেই পানওয়ালাটা আর সৌরভী—

সৌরভী? উঃ ভাবতেও শিউরে উঠে শরীর। ময়লা ময়লা বোকা বোকা চেহারার এই মেয়েটির সঙ্গেই যমুনার ছিল সবচেয়ে বেশি ভাব। ভারি আমুদে ছিল সৌরভী, কথায় কথায় হাসত। তার পেটে পেটে এত—

দশ বছর জেল হয়েছিল বুঝি সৌরভীর।

সেই থেকে সন্ধ্যা হলেই গা ছম ছম করত যমুনার। প্রায় মাস ছয়েক ও বাড়িতে কেউ আসত না। যতদিন মামলা চলেছিল, পুলিস থাকত দরজার সামনে পাহারা।

টিয় মাসি কিন্তু বেশি ঘাবড়ায়নি। খালি বলত, বাসাটা বদলাতে হবে। এটার বড়ো বদনাম হয়েছে।

তোমার ভয় করে না টিয়া মাসি?

ভয়? মেজেয় পানের পিক্ ফেলে টিয়া মাসি বলেছে—থুঃ। এই চল্লিশ বছরের জীবনে এই নিয়ে কম-সে-কম দশটা খুন দেখলুম।

শেষ পর্যন্ত বাসা আর বদলায়নি টিয়া মাসি। খালি যে ঘরে সৌরভী থাকত সেই ঘরটা চুনকাম করে দিলে। দেয়ালে ঘটা করে দিলে গঙ্গাজলের ছিটে।

মাতঙ্গ মাঝে মাঝে দেখতে আসত ওকে। যমুনা বলত, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল, মা।

আদর করে ওর মাথাটা বুকের কাছে নিয়ে উকুন বেছে দিত মাতঙ্গ, বলত, নিয়ে যাব রে, যাব। তোর বিয়ে দেব।

বিয়ে দেবে! প্রথমদিন কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল যমুনা; সোজা হয়ে উঠে বসেছিল। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা! আমাদের কি বিয়ে হয়, বেশ্যার মেয়েদের?

বেশ্যার মেয়েদের! চোখ দুটো মাতঙ্গের একবার জ্বলে উঠেছিল, তারপর ওর দৃষ্টি সুদূর হয়ে গিয়েছিল।

হয় কিনা জানিনে, তবে আমি তোর বিয়ে দেব, দেখিস। আস্তে আস্তে দৃঢ়তার সঙ্গে মাতঙ্গ বলেছে।

যেদিন থেকে পরের বাড়ির ঝি-গিরির কাজ নিয়েছে মাতঙ্গ, সেদিন থেকেই ওর মাথায় এই ভূত চেপেছে। গৃহস্থবাড়ির রূপ কাছে এসে দেখতে পেয়েছে, আর যত দেখেছে, ততই ওর মনে মোহ জমেছে ফোঁটা ফোঁটা মধুর মতো। তকতকে উঠোন আর সাজানো-গুছোনো ছোটো একটি ঘর—এমনি বাড়ি যদি একটি তার হত! এখানেও কলহ আছে, নীচতা আছে, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আছে অনির্বচনীয় একটু মাধুর্য; পরিপূর্ণ শুচিতা আর শ্রী। এ ঘর মাতঙ্গ কখনো পাবে না; সে বয়স নেই, কিন্তু পায় যেন যমুনা। কিন্তু সে কেমন করে? কোন্ পথে এই পঙ্কজকে সে পৌঁছে দেবে পূজার বেদিমূলে। উপায় যা হোক একটা কিছু স্থির করতে হবে, ততদিন যমুনা থাক নদেরচাঁদ বাই লেনে।

সৌরভীর খালি ঘরে নতুন যে মেয়েটি এল, তার নাম শ্যামা। বেশিদিন আসেনি কলকাতায়। এই বছর চারেক হল।

মোটে চার বছর?

তুমি বলছ ভাই মোটে? আমার মনে হয় এক যুগ হয়ে গেল। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে শ্যামা; কাঁদতে কাঁদতে ওর স্খলনের ইতিহাস বলে, গ্রামের বালবিধবার অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের সম্ভাবনা, কলঙ্কের ভয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসা —

তারপর, তারপর? উৎসুক রুদ্ধকণ্ঠে যমুনা জিজ্ঞাসা করে।

ম্লান একটু হাসে শ্যামা। বলে, তার আর পর নেই।

তরঙ্গ মাঝখানে তীর্থে গিয়েছিল, কয়েকমাস বাদে ফিরে এল ফ্যাকাশে হয়ে।

কী হয়েছিল তোর তরঙ্গ?

কী হয়নি তাই জিজ্ঞেস কর বরং। টাইফেট্, নিমুনিয়া, আরো কত কী।

চেহারা কিন্তু তোর বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে ভাই।

দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় তরঙ্গ। বলে, বেঁচে যে আসতে পেরেছি, এই ঢের। বাবা বিশ্বনাথের কৃপা।

শ্যামার কিন্তু বিশ্বাস হয় না তরঙ্গের গল্প। যমুনাকে বলে, বিশ্বাস করলি তুই ওই মাগির গাঁজাখুরি গল্প? অসুখ হয়েছিল না হাতি। ও নিশ্চয়ই পোয়াতি হয়েছিল, নষ্ট করে এসেছে, আর নইলে ওর ছেলে হয়েছিল, সেটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে জলে।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে যমুনা, বুজে আসা গলায় জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি জানলে কী করে?

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল শ্যামা। কথাটা না শোনার ভান করে দূরের চারতলা বাড়ির ছাদের দিকে চেয়ে ছিল। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন হতে সামান্য একটু হেসে বলেছিল, চেহারা দেখলেই আমরা টের পাই যে। আমারও হয়েছিল।

তোমার ছেলে হয়েছিল? উত্তেজিত গলায়, প্রায় চিৎকার করে, জিজ্ঞাসা করেছিল যমুনা।

পায়ের নখ দিয়ে সিমেন্ট ঘষতে ঘষতে শ্যামা জবাব দিয়েছিল—হয়েছিল।

কী করেছ সেটাকে? জলে ভাসিয়ে দিয়েছ?

না। খুব নিচু গলায় শ্যামা ধীরে ধীরে একবারও না-কাঁপা গলায় বলেছিল, গলা টিপে মেরেছি।

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেনি কেউ। তারপর শ্যামা বুঝি জোরে হেসে উঠেছিল। তোর মনটা এখনো কাঁচা আছে যমুনা। তোকে এখানে মানায় না, গেরস্তের ঘরে মানাত। দিব্যি ঘোমটা টেনে, নোলক পরে বসে থাকতিস।

তরঙ্গের সঙ্গে ঘেন্নায় তিন দিন কোনো কথা বলতে পারেনি যমুনা। বিবর্ণ, ওই পাংশু মেয়েটিই কি তার সদ্যোজাত শিশুকে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে জলে? বিশ্বাস হয় না। শ্যামা বলেছিল, ছেলে তো কেউ চায় না, তাই মেরেছে; এই যদি মেয়ে হত, তবে দেখতিস কোলে নিয়ে হাসতে হাসতে এসে হাজির হত তরঙ্গ, অসুখ-টসুখের কথা আর সাজাতে হত না।

মাথার ঠিক মাঝখান দিয়ে টেরি কাটা এই বাবরি চুলওয়ালা লোকটার সঙ্গে শ্যামার ঘরে আলাপ। লোকটা প্রায় সন্ধ্যাতেই শ্যামার অতিথি হত। শ্যামা নিজে নাচতে জানত না, তাই মাঝে মাঝে যমুনার ডাক পড়ত। লোকটা একদিন ফরাসের ওপরই ঘুঙুরসুদ্ধ পা জোড়া জড়িয়ে ধরেছিল যমুনার। এমন পাখির মতো হালকা পা তোমার, থিয়েটারে নামো না কেন?

থিয়েটার? বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করেছিল যমুনা।

হ্যাঁ, ডায়না থিয়েটারে নাচ শেখায় লোকটা। নাট্যকার হবে শিগগিরি। মাঝে মাঝে বগলে করে একটা এক্সারসাইজ খাতা নিয়ে আসত, সেইটেই ওর স্বরচিত নাটক। সুভদ্রাহরণ কি ওই জাতীয় নাম হবে। শ্যামার ঘরে বন্ধ দরজার আড়ালে সেই নাটকের মহলা হত। লোকটা একটু একটু করে পড়ে শোনায় এক এক চুমুক খায়, আর রক্তিম মুখচোখে যমুনার দিকে চেয়ে ওর অভিনয় কৌশলের তারিফ করে বলে, এ নাটকে হিরোইনের পার্ট তোর বাঁধা। আমি শ্রীকান্তবাবুকে বলে রেখেছি। থিয়েটারে কিন্তু এসব যমুনা-টমুনা চলবে না, তখন তোর নাম হবে মিস্ রোজ।

মিস্ রোজ? গোলাপি রঙের ছিটে লাগত যমুনার গালে, শ্যামা নতুন-কেনা তাকিয়াটার ওপর গড়িয়ে পড়ত হাসতে হাসতে।

শেষ পর্যন্ত যমুনা ডায়না থিয়েটারে হিরোইনের ভূমিকায় নামত কিনা বলা যায় না। কিন্তু মাতঙ্গ একদিন এসে সব ওলট-পালট করে দিল।

দুপুরবেলা একদিন এসে বললে, আয় আমার সঙ্গে।

কোথায় মা? রাত্রি জাগরণের পর সমস্ত শরীরে শৈথিল্য এসেছিল, ফোলা ফোলা চোখ যমুনার, একটা হাই তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় মা?

মাতঙ্গ ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, যা চোখেমুখে জল দিয়ে আয়। এক জায়গায় তোর বিয়ের কথা কয়েছি, চটপট তৈরি হয়ে নে।

সাজতে গিয়ে সেদিন বার বার হাত কেঁপে গেল যমুনার। পছন্দ আর হয় না। ছাপা শাড়ি পছন্দ যদি বা হল, ব্লাউজের সঙ্গে আর মেলে না। চুলটাই যমুনা বাঁধলে কত রকম করে।

সাজগোজ সারা করে বেরিয়ে যখন এল, তখন মাতঙ্গ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, তুই এ কী করেছিস্ বল্ তো যমুনা!

ভয়ে যমুনার মুখ শুকিয়ে গেল। কী মা?

এমনধারা সেজেছিস কেন? ভদ্রলোকের বাড়ি যাচ্ছিস, না বেশ্যাবিত্তি কত্তে যাচ্ছিস লা? খোল, খোল শিগগির ওই রঙচঙে শাড়িটা, একটা ফর্সা লালপেড়ে কিছু পর। অত গয়নাও পরতে নেই, মোছ গালের রঙ।

ভদ্রলোকের বাড়ি কাজ করে রুচিও কিছু ভদ্রলোকের মতো হয়েছে মাতঙ্গের।

যমুনা যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। কম্পিত হাতে মাতঙ্গ যা-যা বললে অবিকল তাই করলে। কলে গিয়ে ফের মুখ ধুয়ে এল। মুছে ফেললে কপালে কাচপোকার টিপ। পাতা কেটে চুল বেঁধেছিল অভ্যাস অনুযায়ী, সেটা খুলে চুলগুলোকে সংবরণ করলে সাধারণ একটি খোঁপায়।

মাতঙ্গ খুশি হয়ে বললে, এই তো দিব্যি মানাচ্ছে। মা আমার যেন সরেস্যতী।

রাস্তায় নামতে যত রাজ্যের সংস্কার এসে জড়িয়ে ধরে পা দুটো, নাছোড় প্রণয়ীর মতো। মোড়ের রহমত গাড়োয়ানের ছেলেটা, পানের দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি দিচ্ছিল, সে কী একটা রসিকতা করলে। ওরিয়েন্টাল খেমটা পার্টির ম্যানেজার রকে দাঁড়িয়ে শিস দিলে একবার। স্পিশাল সেলুনের লম্বা জুলপিওয়ালা কারিগরটা ভ্রূভঙ্গি করলে। অন্যদিন যমুনা হয়তো এক মুহূর্ত দাঁড়াত, মুচকি হাসত একটু; আজ ভ্রূক্ষেপ করল না। একে তো মা সঙ্গে যাচ্ছে, তাতে আবার যমুনা যাচ্ছে ভদ্রলোকের বাড়িতে। চালচলনটাও করতে হবে তেমনি। আজ তো মৃগয়া নয়! লোল কটাক্ষ আর ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, সব রেখে যেতে হবে পেছনে, এই নদেরচাঁদ বাই লেনে।

সারা রাস্তা মাতঙ্গ যমুনাকে তোতাপাখি পড়াতে পড়াতে নিয়ে গেল। দায়িত্ব তো কম নয়, ঝুঁকিও নয় সামান্য। মেকিকে মন্ত্রবলে খাঁটি করে দেবে মাতঙ্গ, লোহাকে স্পর্শমণি ছুঁইয়ে করবে সোনা।

কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের এক গলিতে 'সমাজ সংস্কারক' অফিস। টেবিলের সম্মুখে সম্পাদক কাজ করছিলেন। সৌম্যমূর্তি, সাদাকালো-মেশানো দাড়ির আড়ালে অনিশ্চিত একটা বয়স লুকানো।

মা নমস্কার করলে, মার দেখাদেখি যমুনাও।

মাতঙ্গ বললে, আমার মেয়ে। এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার যমুনাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সম্পাদক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হুঁ। অনেকক্ষণ কী চিন্তা করলেন। নিস্তব্ধ কক্ষ। ওঁর পায়ের কাছে বসে যমুনা ওঁর বুকপকেটের চেন-লাগানো ঘড়িটার অতি ক্ষীণ টিক টিক শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

হঠাৎ খানিকক্ষণ বাদে সম্পাদক সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। একবার ওর, একবার মার, মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে

মাতঙ্গ বললে, যদি কোনো উদার ছেলে পাই তো—

দাড়িতে হাত বুলিয়ে সম্পাদক বললেন, পাবে। কয়েকটি জানাশোনা ছেলে আছে আমার হাতে। এ রকম বিয়ে আমরা গোটাকতক দিয়েছিও। আমরা শুধু কাগজে-কলমেই সমাজ সংস্কার করি না, হাতে-কলমেও করি।

কিন্তু -

কিন্তু কী? না, সামান্য একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। একেবারে গণিকার গর্ভজাত মেয়েকে বিয়ে করতে কোনো পাত্র সহজে রাজি হবে না। তার চেয়ে, চশমা খুলে পকেটে রেখে সম্পাদক বললেন, তার চেয়ে ধর যদি ওদের বলি—

আস্তে আস্তে সম্পাদক ওঁর কৌশলটা ব্যক্ত করলেন। যমুনা দিনকতক থাকবে ওঁদের সমিতি পরিচালিত আশ্রমে। মফঃস্বল থেকে এসেছে, দুর্বৃত্তদের হাতে নিগৃহীতা, স্বজন-পরিত্যক্তা কুমারী, এই ধরনের একটা বিশ্বাস্য গল্প তৈরি করে চালাতে হবে।

আশ্রমে এসে বেশিদিন থাকাও হল না। মা রোজ এসে খোঁজ নিত। আসতেন 'সমাজ সংস্কারকের' সেই প্রবীণ সম্পাদক গিরিজাবাবু। এখানে আরো ক'টি মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে ভালো করে আলাপ হল না। যমুনা সঙ্কুচিত হয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। এখানকার মেয়েরাও মিশুক নয় তেমন। সব যেন কেমন ঠান্ডা, বোবা, স্থির। কথা বললে, শান্ত চোখে তাকায় কেবল। যে অতি তরল, অতি মুখর জীবনের সঙ্গে যমুনার পরিচয়, এ তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

একদিন এক পাত্র এসে দেখে গেল ওকে। পরে শোনা গেল তার পছন্দও হয়েছে। যখন দেখতে এসেছিল তখন তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস করেনি যমুনা, কিছুতেই স্মরণ করতে পারল না তার মুখ। পরে শুনলে, নাম নরেশ, কাছাকাছি মফঃস্বলের কী একটা জায়গার ডাক্তার। বিপত্নীক। শুনেছে যমুনার কল্পিত দুর্ভাগ্যের কাহিনি। বিয়েতে আপত্তি নেই।

বিয়ের সেই নির্দিষ্ট দিনটি এল। সেদিন শ্রাবণ মাস, সারাদিন বৃষ্টি। বিকেল হতেই চারধার অন্ধকার হয়ে এল। আশ্রমের গলিটায় থইথই জল। এমন দিনে কি কারুর বিয়ে হয়! আলো পর্যন্ত জ্বলল না রাস্তায়। এমন দিনে দুর্যোগে লোকে ঘরে বাসি মড়া রাখে, তবু রাস্তায় বার করে না।

শিরশিরে হাওয়া, যমুনা সেদিন গা ধোয়নি পর্যন্ত। কিন্তু তবু গলির বাঁকে সন্ধ্যার একটু পরেই ছ্যাকরা গাড়ি দেখা গেল একটা, আর সেটা থামল আশ্রমের ঠিক সমুখেই।

দরজা খুলে প্রথম নামলেন 'সমাজ সংস্কারক' সম্পাদক গিরিজাবাবু। তাঁর পিছনে আরেকজন লোক কোঁচা হাতে রকে লাফিয়ে উঠল, সন্তর্পণে জল বাঁচিয়ে। এই কি বর?

সন্দেহ কী। হেলে পড়া টোপরটাকে সোজা করে বসিয়েছে মাথায়। মুখে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল, মুছতে গিয়ে চন্দনের ফোঁটাগুলোও গেল মুছে।

তারপর আস্তে আস্তে আলো জ্বলল, শাঁখও বাজল। আশ্রমের মেয়েরা উলু দিল। গিরিজাবাবু পুরুত নিয়েই এসেছিলেন, তিনি মন্ত্র পড়লেন, বিয়ে হল।

নতুন জীবন শুরু হল যমুনার।

পরদিন এসেছিল মাতঙ্গ। দূর থেকেই দেখলে নরেশকে, কেন না নরেশ তার পরিচয় জানে না। যমুনাকে তার নতুন পরিচ্ছদে কত রকম করে যে দেখলে মাতঙ্গ, ঠিক নেই। সিঁথিতে সিঁদুর তুলেছে যমুনা, এ সাফল্য যেন যমুনার একার নয়, মাতঙ্গেরও। সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে মাতঙ্গ ওর সারাজীবনের স্বপ্ন সফল করেছে। যমুনাকে প্রমোশন দিয়েছে ভদ্রসমাজে।

নরেশকে বেশি কিছু দিতে হয়নি; মোট দুহাজার টাকা, সর্বসাকুল্যে খরচ হয়েছে সাতশো। মাতঙ্গের নিজের বলতে আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

তুমি এবার কী করবে মা?

আমি? মাতঙ্গ হেসে বলেছিল, আমার জন্যে ভাবিসনি। আমার চলে যাবে; আমি তো এবার নিশ্চিন্তে! যে ক'দিন শরীরে কুলোবে খেটে খাব, তারপর তীর্থটীর্থ—

যমুনার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল, নিজের বলতে মাতঙ্গ কিছুই রাখেনি, সব উজাড় করে দিয়েছে মেয়েকে।

যমুনার মনে আশঙ্কা ছিল, হয়তো নরেশ ওকে জেরা করবে, ওর অতীত জীবনের খুঁটিনাটি জানতে চাইবে। দুর্বৃত্তদের হাতে ওর অপমানের একটা কাহিনি রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা সব সময় যমুনার ভালো খেয়াল থাকত না। হয়তো কী বলতে কী বলে বসবে, সামঞ্জস্য থাকবে না কাহিনিতে।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হল নরেশের কথায়।

আমি শুনেছি সব, ওর একখানা হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে নরেশ বললে, তোমার দুর্ভাগ্যের কথা। এতে তোমার কোনো লজ্জা নেই, এ লজ্জা আমাদের, আমাদের সমাজের, যারা তোমাকে বাঁচাতে পারেনি।

ঈষৎ উষ্ণ করতল নরেশের, তবু যমুনার হাত যেন হিম হয়ে এল। পুরুষের স্পর্শ জীবনে এর আগেও বহুবার পেয়েছে—বহু পুরুষের স্পর্শ পেয়েছে—কিন্তু নরেশের আজকের এই আশ্বাস বলিষ্ঠ-স্পর্শের সঙ্গে কোনো অনুভূতির তুলনা নেই। পঙ্ক থেকে উঠে এসে প্রথম নবধারা জলে স্নান করার শুদ্ধ অভিজ্ঞতা।

নরেশ আবার বললে, আমি কিছু শুনতে চাই নে। তোমার অতীত ফুরিয়ে গেছে। বর্তমান আর ভবিষ্যতে কোনো ফাঁকি না থাকলেই হল।

মফঃস্বল শহরে ওদের যৌথ জীবনে তৃতীয় কেউ ছিল না। নরেশ কাজের মানুষ, সকাল হতে বেরিয়ে যেত, ফিরত দুপুরে, খেয়ে দেয়ে আবার বেরুত, দেখা হত আবার সেই সন্ধ্যায়। সেই সন্ধ্যাটুকুই ওদের দুজনের যৌথ।

মাঝে মাঝে বুক দুরদুর করত। কী জানি, কোথায় বুঝি ত্রুটি ঘটে যাবে, নরেশ ধরে ফেলে দেবে ও মেকি; ওর আসল পরিচয় ফুটে উঠবে পারদের মতো।

কিন্তু আশ্চর্য, সে সব কিছুই হল না। নরেশ কাজের মানুষ, এ সব খুঁটিয়ে দেখার মতো অবসর নেই তার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার বুড়ি ছুঁয়ে যাবার মতো বাড়ি আসছে; একটুখানি হেসে কি একটু হাসি নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ছে।

আর সন্ধ্যাগুলো? অল্প অল্প হাওয়ায় পাতাগুলো কাঁপে, তির্যক একটু চাঁদের আলো জানালা গলে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে। সে সন্ধ্যা শুধু ঘন হয়ে বসবার, স্তব্ধ চোখে তাকাবার।

বেশ কাটল দুটি মাস।

বৃথাই যমুনা ভয় করেছিল; অশুভ এতটুকু ছায়াও পড়ল না।

কিন্তু কোথা থেকে দিন তিনেক আগে এসে উদয় হয়েছে এই বাবরি চুলওয়ালা লোকটা। কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছে।

নরেশের হাত ধরে আলের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মাঠ পার হয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে খালিপায়ে বালির ওপর দৌড়ে দেখেছে পা বসে যায় কতখানি; একটু একটু দূরে বাব্‌লা গাছ; কাঁটায় আঁচল গেছে জড়িয়ে, হলুদ ফুল তুলে পরেছে খোঁপায়। কোঁচড় ভরে তুলেছে কাশের গুচ্ছ।

তারপর ধরাধরি করে আবার পা টিপে টিপে আলের রেখা ধরে ফিরে এসেছে। নরেশ দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে ক্লাবে না ডিসপেন্সারিতে।

গেট খুলে বাবরিওয়ালা লোকটা চোরের মতো পা টিপে টিপে এসেছিল পেছনে।

নরম মাটিতে পায়ের শব্দ হয়নি। সিঁড়িতে পা দিয়েও যমুনা টের পায়নি পেছনে লোক আছে। দুটো সিঁড়ি পেরুতেই আঁচলে টান পড়ল। চমকে ফিরে দাঁড়াল যমুনা। ভীত, চকিত একটা আর্তস্বর কণ্ঠে অর্ধোচ্চারিত হয়েই থেমে গেল। অন্ধকারে একেবারে মুখোমুখি এসে যে দাঁড়িয়েছে তার বাবরি চুলের নীচে রক্তিম চোখ দুটো জ্বলছে গন্‌গনে উনুনের মতো।

বিচিত্র হাসি খেলে গেল যমুনার মুখে।

কী চাও?

ওর আঁচল তখনো লোকটার মুঠোতে। বললে, তোমাকে ফিরে নিতে এসেছি।

ফিরে নিতে? কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল যমুনার, নিজের কাছেই অপরিচিত শোনাল।

ফিরে নিতে। নিষ্ঠুর নিশ্চিত কণ্ঠে লোকটা বললে। তারপর আপাদমস্তক দেখে নিল যমুনাকে। দেখলে ওর সীমন্তের সিঁদুর রেখা, হাতের শঙ্খবলয়, এয়োতির চিহ্ন। হেসে উঠল ব্যঙ্গশাণিত গলায়। বাঃ ভোল্ তো দিব্যি পালটেছ সুন্দরী। কিন্তু আমি তোমায় ভুলিনি। পোশাক বদলালে ভেতরটা বদলায় না। তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

কোথায়?

ডায়না থিয়েটারে। তোমার হিরোইন হবার কথা ছিল মনে নেই? তোমার মনে নেই, আমার আছে। অনেক খোঁজ নিয়ে তবে নাগাল পেয়েছি।

যমুনার ইচ্ছে হল কেঁদে উঠে লোকটার পা দুটো জড়িয়ে ধরে। নতুন জীবন নিয়ে পরীক্ষা তার, আদর্শ সংসার, উদার দেবতুল্য স্বামী—

কিন্তু স্বর ফুটল না, একটি কথাও বলতে পারলে না। লোকটার চোখ দুটি রক্তাভ, কিন্তু সে তো শুধু নেশাতেই নয়, অনুরাগেও। কী এক অদ্ভুত, সর্বগ্রাসী চাউনি ওর সর্বাঙ্গে রসনা লেহন করছে। এই দুঃসাহসী লোকটা চায় কী।

এখানে তুমি উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। এ তোমার স্থান নয়। সত্যি করে বল যমুনা, তোমার ছিটগ্রস্ত মায়ের খেয়াল মেটাতে তুমি নিজের সঙ্গে লুকোচুরি করছ না? এই সোনার শিকলে কি অস্বস্তি হচ্ছে না? সত্যি করে বল পা দুটি চঞ্চল হয়ে উঠছে না একজোড়া ঘুঙুরের জন্যে? নন্দেরচাঁদ বাই লেনের মেয়ে তুমি, রকে এসে দাঁড়াতে—

থিয়েটারের বই লেখে লোকটা। কথাগুলো লেখে যেমন, বলেও তেমনি সাজানো। আর শুনতে পারেনি যমুনা। ঝুঁকে পড়ে হাতের কাছে শক্ত গোছের কী একটা পেয়েছিল, সেইটা ছুঁড়ে মেরেছিল লোকটার মুখে।

কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল লোকটার গাল বেয়ে। এক হাতে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে বললে, ঠিক লাগল না, ফসকে গেল। হাত তোমার এখনো তৈরি হয়নি।

চাপা, ক্রুদ্ধকণ্ঠে যমুনা বললে, যা-ও।

যাচ্ছি। কিন্তু কাল সকালে আবার ফিরে আসব।

পরদিন সকালে যমুনা উৎসুক হয়ে রইল, ওর মুখটা এক একবার বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নরেশ বেরিয়ে গেল। গদার মা এল বাসন মাজতে। কিন্তু লোকটার দেখা নেই। আশায় আশঙ্কায় যমুনার বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কে জানে, লোকটার মত পরিবর্তন হয়েছে কিনা। হয়তো সে ফিরেই গেছে। কিন্তু এতদূর অবধি খুঁজে খুঁজে এসেছে যে, সেকি ফিরে যাবে এত সহজেই?

স্নান, এমনকি খাওয়া-দাওয়াও শেষ হল। নরেশ এল বেলা দেড়টা-দুটোয়। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে শুয়ে পড়ল বিছানায়। এ সময়টা নরেশ একটু গড়িয়ে নেয়। আজ আর যমুনা নরেশের কাছে বসল না। আজ তার প্রতীক্ষার পালা। কতক্ষণে রাহু আবার এসে দেখা দেবে কে জানে। শেষে বেলাও পড়ে এল। পশ্চিমের রাস্তার ধারের নারকেল গাছটার ছায়া এসে ঘরে পড়ল, তবু যখন লোকটা এল না তখন যমুনা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল; কুগ্রহ হয়তো কেটে গেছে।

চা খেয়ে নরেশ গেছে তৈরি হয়ে নিতে, যমুনা আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, হালকা সুরের একটা গানও এসেছে মনে, এমন সময়—

সেই কামানো ঘাড়, বাবরি চুল আর ভাঁটার মতো দুটি চোখ।

শ্যামার ঘরের সেই লোকটা। নদেরচাঁদ বাই লেনে ফিরে যাবার খেয়ানৌকার মাঝি।

সিঁড়িতে চটিজুতোর পায়ের শব্দ। নরেশ উঠে আসছে। যমুনা অনুভব করল ওর হাত পা হিম হয়ে আসছে। নরেশ জেনেছে সব। জেনেছে, যমুনা দুর্বৃত্তের উচ্ছিষ্ট অথচ নিরপরাধ নারী নয়। সে নিতান্তই পণ্যস্ত্রী। দেহের পবিত্রতা তার নষ্ট হয়েছে একটিমাত্র দুর্ঘটনায় নয়, অর্থের বিনিময়ে আত্মদানের পৌনঃপুনিকতায়।

চটিজুতোর শব্দ চলে এসেছে ওপরে। এখুনি ঘরে ঢুকবে নরেশ। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল যমুনা, বালিশে মুখ গুঁজল। হাত-পা অসাড়, কেবল পিঠটা উঠছে ফুলে ফুলে।

কতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, নরেশ ওর শিয়রে বসে। চোখের পাতা, কপাল চুল কেমন ভিজে ভিজে। বালিশসুদ্ধ মাথাটা নরেশের কোলে। আস্তে আস্তে নরেশ ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ভয় পেয়েছিলে? সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল নরেশ।

মিট মিট করে আরেকবার তাকাল যমুনা। এত সুখ বিশ্বাস করা যায় না। এখনো সে এ ঘরেই আছে, এখনও তাকে তাড়িয়ে দেয়নি নরেশ!

কী হয়েছিল? নরেশ আবার জিজ্ঞাসা করলে।

কিছু না, ক্ষীণকণ্ঠে যমুনা বললে, মাথাটা ঘুরে উঠেছিল একটু। তারপর ভয়ে ভয়ে বললে, শুনেছ সব?

নরেশ ধীরে ধীরে বললে, শুনেছি।

আমাকে এবার তাড়িয়ে দেবে তো?

পাগল, নরেশ বললে. এত ঠুনকো কাবণেই সংসারটাকে ভেঙে দেব— তেমন কাপুরুষ আমি নই। তোমাকে যখন বিয়ে করেছি তখনই কি আমার সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওনি?

বিশ্বাস করতে পারছিল না যমুনা। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, পেয়েছি।

সেই উদারতাকেই আরেকটু প্রসারিত করে দিলাম। তোমাকে তো বারবার বলেছি, তোমার অতীত নিয়ে তো তুমি নও, তোমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়েই তুমি।

আরো কী কী যেন বলছিল নরেশ। পঙ্ক থেকে হাত দুটি তুলে ধরেছে যমুনা সূর্যালোকের দিকে, নরেশ তাকে আবার ঠেলে দেবে না। সুখাবেশে চোখ দুটি মুদিত হয়ে এল যমুনার। নরেশ বড়ো, নরেশ উঁচু, নরেশ মহৎ সে জানত, কিন্তু সে মহত্ত্ব যে এমন অভ্রস্পর্শী তা কখনো অনুমান করতেও পারেনি।

লোকটা চলে গেছে?

—গেছে। আমি দিয়েছি বিদায় করে। তুমি একটু শান্ত হয়ে ঘুমোও মণি।

সেদিন বহুক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছিল যমুনা। পাথরের একটা বোঝা নেমে গেছে। স্বামীর সঙ্গে লুকোচুরি শেষ হয়েছে আজ। মহত্ত্বের শুচিস্পর্শে নরেশ ওর সমস্ত গ্লানি মুছে নিয়েছে। এখন থেকে সুস্থ, সহজ জীবন যমুনার। শেষ হল পদে পদে কুণ্ঠার বিড়ম্বনা। শেষ পাতাটিও খসে গেছে, এবার শুধু নতুন, সবুজ পাতা। ওর স্বর্গ অটুট রইল। লাইসেন্স রিনিউ করে নিয়েছে যেন, অত্যল্পকালের মেয়াদ নয়। নিরেনব্বুই বছরের ইজারা।

কিন্তু সেই নিরেনব্বুই বছর ন মাসেই ফুরিয়ে যাবে, তা কি যমুনা তখন জানত!

সেই ঘটনার দিন তিনেক বাদে 'সমাজ সংস্কার' সম্পাদক গিরিজাবাবু এসেছিলেন। সামান্য একটু রোগা হয়েছেন গিরিজাবাবু, কপালে কিছুটা কুঞ্চন, কিন্তু চোখে যেন দিব্য একটা জ্যোতি এসেছে।

প্রণাম করল যমুনা, নরেশ কলরব করে অভ্যর্থনা করল। যমুনার আনত মাথা সস্নেহে শুধু একবার স্পর্শ করলেন গিরিজাবাবু। স্বরোপিত চারাগাছটিকে সতেজ হয়ে উঠতে দেখে আত্মপ্রসাদের হাসিতে যেন মুখখানা ভরে গেছে তাঁর। বললেন, এদিকে কাজ ছিল একটু। তাই একদিন নেমে তোমাদের দেখে গেলুম।

বেশ, বেশ! ভারি খুশি হয়েছি।

নরেশের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কি খুব কাজ আছে নরেশ? দুটো কথা ছিল।

নরেশ বললে, কিছুমাত্র না। আসুন।

দুজন মিলে আবার ঘরে ঢুকলেন। ততক্ষণ যমুনা রান্নাঘরে বসে নানারকম খাবার তৈরি করলে।

সন্ধ্যার গাড়িতে গিরিজাবাবু চলে গেলেন। যাবার সময় আবার আশীর্বাদ করে গেলেন। সুখী হয়ো। কোনো অকল্যাণ যেন তোমাকে কখনো স্পর্শ না করে।

এরপর আরো দু মাস কেটেছে। মাঝে মাঝে কেবল মায়ের কথা মনে পড়ে মন খারাপ হত! কোথায় আছে মাতঙ্গিনী? এখনো কি দাসীবৃত্তি করছে? যমুনার ইচ্ছে ছিল মাকে কাশী চলে যেতে লিখবে। সেখানে না হয় দু-চার টাকা করে হাতখরচ পাঠানো যাবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। তিনদিন নরেশের অসুখটা চাপা ছিল। অল্প অল্প বুঝতে পারেনি। ক্রমে চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, অল্প অল্প কাশির লক্ষণ দেখা দিল। কীসের পর কী ঘটল ভালো করে বোঝেনি যমুনা। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন এলোমেলো, অসম্বন্ধ।

যখন বুঝতে পারল, তখন হাতের নোয়া খুলে ফেলতে হয়েছে, সিঁথির সিঁদুর গেছে মুছে। আর অপরিমেয় সর্বনাশ ওর পরনের শাড়ির সব রঙ কেড়ে নিয়ে সাদা করে দিয়ে গেছে।

সব হিসেব খতিয়ে দেখা গেল, বেশি কিছু রেখে যেতে পারেনি নরেশ।

অতি সামান্য কিছু নগদ, আর এই বাড়িখানা।

কী করবে, কিছু স্থির ছিল না। ভালোমতো কিছু স্থির করবার আগেই কলকাতার টিকিট কিনে গাড়িতে উঠে বসল।

সঙ্গে বেশি কিছু আনেনি। ... নিত্যব্যবহার্য দু-চারখানা কাপড়, হাত-খরচের টাকা কিছু, আর নরেশের ছবি একটা।

অবলা আশ্রমের গিরিজাবাবু তাঁর ঘরে বসে চিঠি লিখছিলেন। যমুনাকে ঢুকতে দেখে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। প্রণাম করতে বললেন, বসো। আস্তে আস্তে বললেন, কিছু জানতে পারিনি তো?

আশ্রমেই একটা ঘর ওর জন্যে নির্দিষ্ট হল। সেই ঘরের দেওয়ালে নরেশের প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে রাখলে যমুনা। প্রতিদিন ধূপধুনোয় সেই প্রতিকৃতি উপাসনা; তাজা ফুলের মালা ফটোটার গায়ে ঝুলিয়ে দিত।

ক্ষণকালের জন্যেও যে মানুষটি ওকে পূর্ণ মূল্য দিয়েছিল, তার আসন যমুনার মনে চিরদিনের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বেঁচে থাকতে তবু নরেশের দু-চারটে দোষত্রুটি চোখে পড়ত। মর দেহ ত্যাগ করে সে যমুনার কাছে দেবত্ব লাভ করলে।

গিরিজাবাবু একদিন বললেন, তোমার মার বড়ো অসুখ যমুনা, একদিন দেখতে যাও।

খোলার ঘরের মেঝেয় ময়লা বিছানায় পড়ে আছে মাতঙ্গিনী। যমুনা ডাকলে, মা!

চোখদুটো যেন অতি কষ্টে মেলে একবার চাইল মাতঙ্গ। এসেছিস? যমুনার নিরাভরণ হাত দুটির দিকে চেয়ে মাতঙ্গিনীর চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে যমুনার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

যমুনা স্থির করেছিল এখানেই থেকে যাবে, অন্তত মা সেরে ওঠা পর্যন্ত। আশ্রম থেকে ওর জিনিসপত্র আনিয়ে নিলে।

মাতঙ্গ মনে মনে খুশি হল। এখানে তুই থাকবি মা? থাক তবে। কিন্তু একটু অস্বস্তিও যেন বোধ করছে মাতঙ্গ। সর্বস্ব ব্যয় করে মেয়েকে সে সমাজের ওপরতলায় তুলে দিয়েছে, আবার এখানে এসে বাস করলে যমুনা নেমে আসবে না তো! জীবনের আগাগোড়া ফাঁকির মধ্যে ওই একটুমাত্র সান্ত্বনা আছে মাতঙ্গের, তার মেয়ে ভদ্র। বিধবা হলেও ভদ্র।

বিকেলের দিকে দু শিশি ওষুধ হাতে করে যে লোকটা ঘরে ঢুকল তাকে দেখে যমুনার সমস্ত প্রত্যঙ্গ হিম হয়ে এল।

সেই বাবরি চুল, কামানো ঘাড়, লাল চোখ, কালো দাঁত।

চিনে চিনে আবার এসেছে শনি, পথ শুঁকে শুঁকে।

বোঝা গেল লোকটাও কম বিস্মিত হয়নি। আড়চোখে একবার যমুনার দিকে তাকিয়ে সে মাতঙ্গিনীর কাছে গিয়ে বসল। ওষুধের শিশি দুটো রাখল শিয়রে। চাপা গলায় সেবনবিধি সম্বন্ধে কী যেন বললে মাতঙ্গকে।

মাতঙ্গ বললে, যা বলবে আমার মেয়েকে বল বাছা। ওই তো এসেছে। একটু থেমে বললে, কপাল পুড়িয়ে এসেছে।

যমুনার মনে হল লোকটার মুখে বিচিত্র একটুখানি হাসি খেলে গেল যেন; শেষ পর্যন্ত যেন বাজি জিতে গেল সে-ই। অর্থাৎ যমুনাকে আসতে হল তো আবার নদেরচাঁদ বাই লেনে।

মাতঙ্গ বললে, আমার অসুখে গঙ্গাধরই দেখাশুনা করছে। বড়ো ভালো ছেলে গঙ্গাধর।

কিন্তু ততক্ষণে কঠিন হয়ে গেছে যমুনা। মন স্থির করে ফেলেছে। লোকটার ভুল ভেঙে দিতে হবে। সে যে নেমে আসেনি সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। আস্তে আস্তে উঠে সরে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু পালাবে কোথায়? অহরহ সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে গঙ্গাধর। ওষুধের গেলাস ধুতে কলতলায় যমুনা উঠে গেছে যদি, গঙ্গাধরও গেছে পিছনে। যমুনার ওঠা বসায়, চলায়, ফেরায় অনুক্ষণ ওর শিকারি দৃষ্টি যমুনাকে অনুসরণ করছে।

কী চায় লোকটা? এখনও কি ও আশা রেখে যমুনা 'ডায়না থিয়েটারে' যোগ দেবে, ওর লেখা নাটকে হবে হিরোইন?

শ্যামা বললে, তাই। খবর পেয়ে শ্যামা দেখা করতে এসেছিল। যমুনার মুখে আদ্যোপান্ত শুনে বললে, হবে না? ও একেবারে হন্যে কুকুরের মতো হয়ে আছে যে, তোকে ওই থিয়েটারে নিয়ে যাবে কথা দিয়ে থিয়েটারের মালিকের কাছ থেকে টাকা খেয়েছিল যে।

টাকা খেয়েছিল? যমুনা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

খেয়েছিল তো। শ্যামা বললে। ডায়না থিয়েটারের মালিক সুদাম শীলকে আমি চিনি। ওর স্বভাবই ওই। টাকা দিয়ে যেখানে মনের মতন জিনিস পাওয়া যায় সেখানে সে পেছপা হয় না।

—তারপর?

—তারপর তুই চলে গেলি। টাকাটা এদিকে ও ভেঙে ফেলেছে। ফেরত না দিতে পেরে চাকরি যায় যায় সেই থেকে ও কেবল তোর খোঁজ করে বেরিয়েছে। ... একটু হুঁশিয়ার থাকিস্ ভাই।

মাতঙ্গ সেরে উঠছিল। যমুনা সেইদিনই আশ্রমে চম্পট দিলে।

বাঘ এসে উদয় হল সেখানেও।

সন্ধ্যাবেলা সবে নরেশের ফটোতে মালা ঝুলিয়েছে যমুনা। ধূপ জ্বালাতে হবে, এমন সময় বাইরের জানলার কাছে ছায়া পড়ল। কার আবার! গঙ্গাধরের। দুটো শিক ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে যমুনার দিকে। পা দুটো একবার কেঁপে উঠল যমুনার। এক্ষুনি অবশ্য জানলাটা বন্ধ করে দিতে পারে, কিংবা দারোয়ান ডেকে ধরিয়ে দিতে পারে লোকটাকে। কিন্তু তাতে কি নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে? তার চেয়ে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক আজ।

কী চাই? কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে যমুনা।

গঙ্গাধর একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল। —দরজা খোল, বলছি।

আজ নিঃশঙ্ক হয়ে গেছে যমুনা। কোথা থেকে অদ্ভুত একটা সাহস এসেছে। দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে নিয়ে এল গঙ্গাধরকে। ধূপের গন্ধে, দীপের আলোয় রহস্যময় হয়ে আছে ঘরখানা। সেই ঘরের মেঝেয় মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে।

— এবার বল।

— আমার সঙ্গে চল। পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি করলে গঙ্গাধর। নির্বিকার কণ্ঠে, অক্লেশে। এতটুকু বিচলিত হল না।

আর সঙ্গে সঙ্গে যমুনা যেন ফেটে পড়ল। লজ্জা করে না, জানোয়ার! কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছ জান না তুমি!

তবু মিটি মিটি হাসছে গঙ্গাধর— লোকটা আসল শয়তান — কার সমুখে?

হিড় হিড় করে ওকে যমুনা টেনে নিয়ে এল নরেশের ফোটোর সামনে। — চেয়ে দেখ, আমার স্বামী। উনি আজ নেই, কিন্তু আমি ওঁরই। দেবতা ছিলেন উনি, আমাকে টেনে তুলেছিলেন। মহৎ ছিলেন, আমার সবকিছু জেনেশুনেও ওঁর পাশে স্থান দিতে ইতস্তত করেননি। আর তুমি —

নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে গঙ্গাধর বললে, আমি কী?

—তুমি হীন, নীচ, কীট, কৃমি তুমি। টাকা ঘুষ খেয়ে আমাকে থিয়েটারের মালিকের কাছে বেচে দিতে চেয়েছিলে; কিংবা এখনো চাও।

—চাই। অনায়াসে বললে গঙ্গাধর। এখনো চাই। টাকাও খেয়েছি সত্যি। কিন্তু একলা, কিন্তু একলা কি আমি? তোমার স্বামী —

— টাকা খেয়েছিলেন? চিৎকার করে উঠল যমুনা।

— খেয়েছিলেন। শান্ত গলায় গঙ্গাধর বললে, উত্তেজিত হয়ো না, তিনিও টাকার লোভেই তোমাকে বিয়ে করেছিলেন। নতুন ডাক্তার, তখনো পসার জমেনি, পণের টাকায় ডিস্‌পেন্সারি সাজিয়েছিলেন, তোমার মার টাকায়, একটি একটি করে জমানো টাকায়। তখন জানতেন, তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে, অদৃষ্টের ফেরে একবার মাত্র লাঞ্ছিত হয়েছ। তারপর যখন জানলেন, তুমি তা নও, তোমার জন্ম এবং বৃত্তি কোনোটাই গৌরবের নয় —

— তুমিই জানিয়েছিলে, তারপর?

— তখন তোমার দেবতা —

— কী।

না, গ্লানি নয়, আত্মধিক্কার নয়—কেননা তিনি উদার ছিলেন। কিন্তু হয়তো ভেবে দেখলেন, উপরি উদারতাটুকুর জন্যে কিছু উপরি টাকা চাই। ভদ্রঘরের মেয়ের জন্যে যদি তিন হাজার পেয়ে থাকেন, তবে গণিকার মেয়ের জন্যে চাই অন্তত আরো তিন হাজার। সহজ হিসেবে সেই মর্মে দাবি জানিয়ে চিঠিও দিলেন গিরিজাবাবুর মারফত তোমার মাকে। পেয়েও গেলেন। অত টাকা তোমার মার ছিল না। সব কুড়িয়ে কাচিয়ে হল এগারোশো। আরো চারশো টাকা নিজে থেকে দিয়ে গিরিজাবাবু রফা করলেন দেড় হাজারে।

টকটকে লাল দেখাচ্ছে যমুনার মুখ। ধূপ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রদীপের সলতের বুক জ্বলছে। রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বললে, মিথ্যুক।

কর্ণপাত না করে গঙ্গাধর বললে, সেই ব্যাপারটার ফয়সালা করতেই তো গিরিজাবাবু সেবারে তোমাদের ওখানে গিয়েছিলেন।

—মিথ্যুক, মিথ্যুক।

গঙ্গাধর মৃদু হসে বললে, প্রমাণও আছে। জামার পকেট থেকে বার করলে অতি জীর্ণ পুরনো একখানা কাগজ। বাড়িয়ে দিলে যমুনার দিকে।

কম্পিত হাতে যমুনা টেনে নিলে কাগজটা। নরেশের হস্তাক্ষর ঃ

'শ্রদ্ধেয় গিরিজাবাবু, আপনি আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন। ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, সম্প্রতি জানিয়াছি সে জন্মকুলটা। আপনাকে অভিযুক্ত করিতে পারিতাম, জেলেও পাঠাইতে পারিতাম। কিন্তু অতদূর যাইতে চাহি না। ভাবিয়া দেখিলাম, যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে। যদি সমাজচ্যুত নারীকে বিবাহ করিবার সাহস আমার থাকে, তবে পতিতাকে গ্রহণ করিবারও আছে। কিন্তু একটি কথা। আমার এখন কিছু হাত টানাটানি চলিতেছে। যদি যমুনার মাতাকে বলিয়া কিছু টাকা, অন্তত তিন হাজার—'

অক্ষরগুলো ক্রমশ ঝাপসা হয়ে এল। চিঠি থেকে মুখ তুলে একবার গঙ্গাধরের দিকে চাইল যমুনা। নরেশের ফটোর পাশে দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে লোকটা নির্লজ্জ, নির্বিকার বিড়ি টানছে। মুখে পরিচিত সেই বিচিত্র হাসি।

হাতের কাছে ফুলদানি ছিল একটা। যমুনার একবার মনে হল, সেটা তুলে নিয়ে প্রাণপণে আঘাত করে লোকটাকে। কিন্তু আশ্চর্য, সেটাকে তুলতে পারলে না কিছুতেই। ওর সমস্ত জোর নিমেষে যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে, আঙুলগুলোও অবশ। ঝাপ্‌সা চোখে নরেশের ছবি আর গঙ্গাধরের মুখ একাকার হয়ে গেছে।

অশ্লীল



শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চেনাচেনা, এত চেনাচেনা, এত বেশি চেনাচেনা মনে হচ্ছে — অথচ কবে, কোথায়, কী উপলক্ষে দেখেছে কিছুতেই সত্যসুন্দর ঠাওর করে উঠতে পারে না। তাই গলায় কাঁটা বেঁধার মতো অকথ্য একটা অস্বস্তিতে মনে মনে সে ছটফটায়। আঁতিপাতি করে অতীত হাতড়ায় : কে? কে এই মেয়ে?

'আপনার কাজের বড্ড ক্ষতি করলুম। লেখার সময় আসাটা —'

অন্য সময় হলে রাখালের এই ন্যাকামিতে গা জ্বলে যেত : কাজের ক্ষতি করলুম। জাঁকিয়ে বসে ভদ্র বুলি কপচানো! সত্যসুন্দর কি প্রথমেই বলে পাঠায়নি যে সে এখন ব্যস্ত? তা সত্ত্বেও সাক্ষাৎকারের আর্জি জানিয়েছিল কেন? জরুরি প্রয়োজন বলে?

কিন্তু গা জ্বলে যাবে কি সত্যসুন্দরের এখন পাগল হবার জো। লেখা কাগজগুলোয় পেজ মার্ক দিতে দিতে গুছোয় আর আড়ে আড়ে তাকায় একবার রাখাল একবার তার বউয়ের দিকে। তাকায় অবশ্য উদাস চোখেই, শিল্পীজনোচিত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে।

'পুজোর সময় আপনার যা ডিমান্ড!' আপ্যায়নের সুরে রাখাল বলে, 'এখন প্রতিটি মিনিট—'

সত্যসুন্দরের ইচ্ছে হয় বলে, দাঁত বার করে যাই বলো, কথাটা যোল আনা সত্যি। তোমাদের কাছে চরম রিয়াকশনারি হলেও সারা বাংলা আজো সত্যসুন্দরকে চায়। নেহাৎ চক্ষুলজ্জায় তোমরা আসতে পার না, কিন্তু পুজোর মরসুমে আদর্শবাদের বুকনি তোমরাও শিকেয় তুলে রাখ। পুজো সংখ্যায় যা সব লেখা তোমার ছাপো! যাদের লেখা ছাপো!

ইচ্ছেটা মনে ঘাই দিয়ে উঠলেও মুখ ফুটে কিছু বলে না সত্যসুন্দর: সত্যসুন্দর চাটুয্যে হেন মানুষের মুখে কি এরকম কথা মানায়? বলা সাজে? প্রাকৃতজনের মতো কথা কইতে পারে সত্যসুন্দর? ছিঃ!

তাছাড়া কাজের ক্ষতি করছে শুনলে রাখাল যদি 'আজ তবে আসি দাদা' বলে বউ নিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে যায়? সমস্যাটার কিনারা তাহলে হবে না। এবং তা না হলে লেখারও বেজে যাবে বারোটা।

'কাজ তো সব সময়েই আছে রে।' স্বর্গীয় হাসি হাসে সত্যসুন্দর, 'কাজ আর কাজ, ভগবান কাজের জন্যেই সৃষ্টি করেছে। জীবন মানেই কর্ম, কর্মহীনতাই মৃত্যু। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—' বলতে বলতে লেখা কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে সিগারেটের টিনটা তুলে নেয়, 'কাজ থাক এখন। তোর খবর কী বল? অনেকদিন পরে এলি। অবশ্য এ-বাড়ি তোদের কাছে আউট অব্ বাউন্ডস—'

'না না ওকী বলছেন দাদা?'

'বলি কি সাধে রে! তোদের পার্টি — যাকগে নতুন কী লিখছিস? অনেকদিন তোর লেখা দেখি না। বড়ো কিছুতেই হাত দিয়েছিস নাকি? ইদানিং যা রেওয়াজ হয়েছে —'

রাখাল বাধা দিয়ে বলে, 'লেখাটেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি দাদা।'

'ছেড়ে দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'হুম।' বুক ভরে সিগারেটের ধোঁয়া নেয় সত্যসুন্দর। তারপর নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, 'এই হয়! এই হয়! রাজনীতি এইভাবেই সাহিত্যকে গ্রাস করে। নইলে তোর যা হাত ছিল—'

রাখাল বলে, 'রাজনীতি করেও দিব্যি সাহিত্য করা যায় দাদা। আর রাজনীতি বর্জনের রাজনীতি করতে পারলে তো সোনায় সোহাগা।'

সত্যসুন্দর গুম হয়ে যায়।

'তা আমি সাহিত্য ও রাজনীতি দুই-ই ছেড়ে দিয়েছি।'

মনে মনে রাখালের মুণ্ডপাত করে সত্যসুন্দর: সাহিত্য ও রাজনীতি দুই ছেড়ে দিয়েছিস বটে কিন্তু মনটা তোর আদৌ বদলায়নি। নইলে বাড়ি বয়ে এসে খোঁচা দিয়ে কথা? তোর দাদারা যা কাগজে কলমে বলে তুই কিনা তা মুখের ওপর বলতে সাহস পাস?

'দেখলাম' হালকা সুরে রাখাল বলে, 'সবকিছুরই একটা সীমা আছে, তার বাইরে যাওয়া উচিত নয়। আমার লেখার যেটুকু ক্ষমতা ছিল শেষ হয়ে গেছে, রাজনীতি করার সামর্থ্যও। অবশ্য পেশাদার লেখক হলে স্মৃতির জাবর কেটে বাকি জীবনটা বেশ চালাতে পারতুম। কিন্তু সে আমার ধাতে সইল না। তাই বিয়ে-সাদি করে সংসারে মন দিলাম। বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিনি, দাদা?'

হারামজাদা! কাষ্ঠহাসি হেসে দেয় সত্যসুন্দর। মেয়েটির দিকে মুখ ফেরায়।

মেয়েটি এতক্ষণ সত্যসুন্দরের দিকেই চেয়ে ছিল, এবার দেওয়ালে গান্ধিজির দিকে চোখ মেলে দেয়।

ওকী! সত্যসুন্দর চমক খায়: তিল? বাঁ গালে তিল! অতি পরিচিত — অতি পরিচিত — কিন্তু—

মুখের আদল, চোখ-নাক-মুখ, তারপর ওই তিল! এখন আর শুধু চেনা চেনা নয়, মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই চেন। ভালো করেই চেনে। কিন্তু কবে, কোথায় কী উপলক্ষে —

গলায় কাঁটা বেঁধা সেই অস্বস্তিটা ফের চাড়া দিয়ে ওঠে। যে সত্যসুন্দর কোন্ শিশুকালে তিলের নাড়ু কামড়াতে গিয়ে জিভে কামড় খাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার হুবহু বর্ণনা দিয়ে আত্মজীবনীর পাক্কা একটি ফর্মা ভরিয়েছে সে কিনা আজ —

আত্মগ্লানিতে সত্যসুন্দরের মন ভরে যায়। ভাবে, তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়, ঘরের মধ্যেই চরকির মতো ঘুরপাক খায়, পটাপট মাথার কয়েকটা চুল ছিঁড়ে ফেলে কিংবা কোনো অজুহাতে গিন্নির সাথে ঝগড়া বাধায়, কি ছেলেমেয়েদের বকাঝকা করে বাড়ি মাথায় তোলে। নিদেন ছোকরা চাকরটার পিঠে অন্তত ঘা কয়েক হাঁকিয়ে দেয়। তবে যদি —

কিন্তু উঁহু, গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে সমস্যার সমাধান ওভাবে হলেও রক্ত-মাংসের এই মেয়েটির ক্ষেত্রে কি প্রক্রিয়াটা কার্যকরী হবে? না অমন নাটকীয়তা এখন সম্ভব সত্যসুন্দরের?

বারেক মেয়েটির দিকে তাকায় সত্যসুন্দর — গান্ধিজির বদলে এখন অরবিন্দের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। এরপর বুদ্ধদেবের পালা। বুদ্ধদেবের পর বাকি মহাপুরুষদের।

মহাপুরুষ দর্শন সাঙ্গ হলে চারপাশের আলমারি বোঝাই বই, আলমারির মাথায় পোড়ামাটির পুতুল।

বস্তুত দুহাত দূরের সত্যসুন্দর ছাড়া ঘরের সব কিছুই এখন ওর দ্রষ্টব্য হয়ে উঠবে। হাতল-ভাঙা ধূপদানিটাকে পর্যন্ত আশ্চর্য এক কিওরিও ভেবে বসবে।

তাই হয়। সত্যসুন্দর জানে, এই স্বাভাবিক। দর্শনার্থীরা এই ঘরে ঢুকেই অভিভূত হয়ে পড়ে। এমনিতে সত্যসুন্দরের চেহারা অতি সাধারণ, কিন্তু জানলা-দরজা বন্ধ ঘরে শেড দেওয়া আলোয় ফ্যানের একটা কিচমিচ আওয়াজে আর ধূপের ধোঁয়ায়, পরনে গেরুয়া লুঙি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, উলঙ্গ ঊর্ধ্বাঙ্গে যজ্ঞোপবীতের বেষ্টনী, বাহুমূলে সোনার তাবিজ ও মাদুলির তোড়া — সত্যসুন্দরকে আরেক জগতের অধিবাসী বলে মনে হয়।

হতেই হবে, কেননা বাইরে বাধ্য হয়ে আধুনিকতার ভেক ধারণ করতে হলেও ব্যক্তিগত জীবনে সত্যসুন্দর আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয় আদর্শের পূজারী। শুধু তাঁর বই পড়ে নয়, চাক্ষুষ দেখেও এর প্রমাণ সকলে পাক। পেয়ে আরও বেশি তাঁর লেখার ভক্ত হোক।

তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেলেও — যে রকম বাতে ধরেছে বন্ধ একদিন হবেই, সাহিত্যাচার্য বলে দেশবাসী যেন মাথায় করে রাখে। এই সত্যসুন্দরের অন্তিম কামনা।

মেয়েটি তেমনি মুখ ফিরিয়ে আছে। যেচে কথা না বললে কথা ও বলবে না। ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে পায়ে হাত

দিয়ে প্রণাম করেছে, যাওয়ার সময়েও নিঃশব্দে প্রণাম করে চলে যাবে। বড়ো জোর সেকেন্ড কয়েক বেশি সময় পা ছুঁয়ে থাকবে। সত্যসুন্দর জানে, মেয়েরা ভারি নার্ভাস! বড্ড লাজুক অথচ প্রতিভা সম্পর্কে কৌতূহল ওদেরই সীমাহীন। চিঠিপত্রে ওরা বেহদ্দ বাচালতা করতে পারে কিন্তু সামনাসামনি বোবা হয়ে যায়।

'তোমার নাম কী মা,' সত্যসুন্দর গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

মেয়েটি মুখ ফেরায়। কিন্তু তার হয়ে জবাব দেয় রাখাল।

'সুচরিতা।'

'সুচরিতা! বাঃ, সুন্দর নাম! এই নামটি গুরুদেবের বড়ো প্রিয় ছিল। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—

কথার খেই হারিয়ে ফেলে সত্যসুন্দর: সুচরিতা? কই, জীবনেও এই নামের কোনো মেয়েব সান্নিধ্যে এসেছে বলে তো মনে পড়ে না। অথচ —

'নামটা আমি দিয়েছি দাদা।' রাখাল আগ্ বাড়িয়ে বলে, 'বিয়ের আগে অন্য নাম ছিল।'

সত্যসুন্দর বলে, 'বিয়ে হলে মেয়েদের পদবি বদলায় জানি, কিন্তু তুমি —'

'তেমন তেমন বিয়েতে সবকিছু বদলায় দাদা।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসে রাখাল।

দুই চোখে তীব্র ভর্ৎসনা হেনে মুখ নিচু করে সুচরিতা।

এবং রাখালের বেহায়াপনায় আগাপাশতলা রী রী করে ওঠে সত্যসুন্দরের: লাভ করে বিয়ে করেছে, হয়তো অসবর্ণ বিয়ে — কিন্তু কী ভীষণ ভয়ংকর এবং বাহাদুরির ব্যাপার যেন! দেশের চিরন্তন রীতিনীতি ভাঙা যেন মহা গৌরবের কাজ। সাধেই কি দেশের লোক ওদের দেশদ্রোহী বলে! অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা ওদেব রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

তা ছাড়া, লেখক সুবাদে না হয় দাদা বলেই ডাকে, কিন্তু বয়সে রাখাল তার ছেলের বয়সি নয়? সাহিত্য আলোচনায় প্রেম নিয়ে, নরনারীব যৌন সম্পর্ক নিয়ে বেপরোয়া বাক্যালাপ চললেও বাস্তবে তার জের টানা উচিত? নাকি ওরা জীবন ও সাহিত্যকে অভিন্ন মনে করে বলেই এই বেলেল্লাপনা? নাকি বেলেল্লাপনার সুবিধের জন্যেই জীবন ও সাহিত্যকে অভিন্ন মনে কবা? সত্যশিবসুন্দরের শুধুমাত্র কদর্থ সত্যকে মাথায় তুলে নাচার নামই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা?

মনে মনে গজরায় সত্যসুন্দর, সিগারেটে মুহুর্মুহু টান দিতে দিতে।

মনে গজরানো ছাড়া উপায়ই বা কী! মুখ খুললেই রাখাল তর্ক ফেঁদে বসবে। তর্কে ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা দুষ্কর। যুক্তি ছাড়া যারা কিছু মানে না —

'ও আপনার লেখার ভীষণ ভক্ত দাদা।'

'তাই নাকি!' সত্যসুন্দর দেখন-হাসি হাসে: তার লেখার ভক্ত হওয়াটা তাজ্জব খবর। মাসান্তে যাব বইয়ের এডিশন হয়, দিল্লির কর্তারা যাকে সমীহ করে, দেশবিদেশে হরদম যার অনুবাদ হচ্ছে — রাখাল তালুকদারের বউও তার লেখার ভক্ত! তবে আর কি — সত্যসুন্দরের চোদ্দপুরুষ এতে উদ্ধার হয়ে গেল!

'কিন্তু আপনাব বিরুদ্ধে ওর একটা নালিশ আছে দাদা।'

'থাকবে বই কি!' হও আমার লেখার ভক্ত, ভীষণ ভক্ত, কিন্তু রাখাল তালুকদারের বউ বলেই না? অতএব নালিশ আমার বিরুদ্ধে অবশ্যই থাকবে। না থাকলেও গজিয়ে উঠবে। — সত্যসুন্দর মাথা দোলায়। সুচরিতার দিকে না তাকিয়ে টের পায় স্বামীকে সে কনুয়ের এক খোঁচা দিল।

'কী নালিশ মা?'

'না না!'

'লজ্জা কি, বলো। আমি তো দলের জন্যে লিখি না মা, আমি লিখি দেশের জন্যে। মানুষের মঙ্গলের জন্যে। তাই আমার লেখা সম্পর্কে প্রত্যেকের —'

'ও বলে কী জানেন দাদা —'

'আঃ!' রাখলকে ধমক দেওয়াটা আর সামলাতে পারে না সত্যসুন্দর। কোন্ এক রাখাল তালুকদারের বউ তার লেখা সম্পর্কে কী নালিশ জানায় না জানায় বড়ো বয়েই গেল! ওর নালিশে কী আসে যায়?

সে কথা নয়, সলজ্জ ওই 'ন্ না!' ভঙ্গিটাই চমকপ্রদ। পরিচিত, অতি পরিচিত এই ভঙ্গি। গলার স্বরটা ভালো

করে একবার শুনতে পারলেই হয়তো সমস্যাটার কিনারা হয়ে যায়। মাঝখান থেকে তুই কেন রাখাল বাগড়া দিচ্ছিস? তোর কেন কর্তালি? বউ তোর কচি খুকি না, হাবাগোবা না, তোর মতো ছেলেকে যে গেঁথে তুলেছে — মুখোমুখি দুটো কথা সে বলতে পারে না?

'আমার সব বই তুমি পড়েছ, মা?'

সবিনয়ে সায় দেয় সুচরিতা।

সত্যসুন্দর নতুন করে চমক খায়।

'কোন্ কোন্ বই তোমার ভালো লেগেছে আর কোন্ কোন্ বই সম্পর্কে তোমার নালিশ মা?'

সুচরিতা আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়ায়। মাথা হেঁট করে।

আরেক কিস্তি চমকায় সত্যসুন্দর: এই মুদ্রাদোষটাও অতি পরিচিত। আঙুলে আঁচল জড়ানো মেয়েমাত্রেরই একটা অভ্যাস বটে কিন্তু মাথা হেঁট করে ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলা?

না, কোনো সন্দেহ নেই — এ মেয়েকে সত্যসুন্দর চেনে। অতি ভালো করে চেনে। অন্তরঙ্গ ভাবে চেনে। কিন্তু কী করে? কবে, কোথায়, কী উপলক্ষে দেখা হয়েছিল?

'বলো মা বলো,' সত্যসুন্দর অধৈর্য হয়ে ওঠে, 'লজ্জা কি, বলো?'

'আশ্চর্য! নালিশ জানাবে বলে এলে আর এখন — বলো', রাখালও স্ত্রীকে উৎসাহ দেয়।

'তোমার কথায় আমি কিছু মনে করব না। তুমি তো রাখাল নও, দলের ফতোয়া মনে রেখে নিশ্চয় তুমি আমার লেখা পড়োনি। আমার লেখা যখন তোমার ভালো লাগে —'

'এ কী বলছেন দাদা!' রাখাল গাঁইগুঁই করে ওঠে, 'আমি আপনার লেখা —'

'জানিরে জানি।' তিক্ত কণ্ঠে সত্যসুন্দর বলে, 'তোদের দলের সঙ্গে যখন বনিবনা ছিল তখন আমি ছিলাম সেরা সাহিত্যিক। আমাকে তখন তোরা মাথায় করে নাচতি। কিন্তু যেই বিচ্ছেদ হল, সঙ্গে সঙ্গে আমার সব লেখাও বাতিল হয়ে গেল। তোদেব টেকনিক আমার জানা আছে। থাক ও কথা — তুমি বলো তো মা', সত্যসুন্দর সোজা হয়ে বসে। 'বলো!' কাতর একটা ব্যাকুলতা তার গলার স্বরে ফুটে ওঠে।

'সু' গম্ভীর হয়ে যায় রাখাল, 'কেন ইতস্তত করছ। যা বলতে এসেছিলে বলো, তারপর ওঠা যাক। না শুনলে উনিও শান্তি পাবেন না। মিছিমিছি ওঁর সময় আর নষ্ট করো না।'

সুচরিতা স্বামীর দিকে তাকায়। ভীরু ভীরু দুই চোখ তুলে যেন মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেছে বেচাবি কিন্তু নিরুপায়।

'আমার কথায় কিন্তু কিছু মনে করতে পারবেন না — আগেই বলে রাখছি হাঁ।' সুচরিতা মুখে খোলে, 'সাহিত্যের আমি কীইবা বুঝি! পড়তে ভালো লাগে, তাই পড়ি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে—'

আস্তে আস্তে কথা বলে যায় সুচরিতা। একটানা।

সত্যসুন্দর হাঁ করে শোনে। আদুরে আদুরে সুর, সুরেলা স্বর। অতি পরিচিত! অতি পরিচিত! গান জানে? নিশ্চয়। নিশ্চয় গান জানে। হয়তো কোনো সভার সভাপতি বা প্রধান অতিথি হিসেবে এর গান শুনেছে, শুনে মোহিত হয়ে গেছে, মুগ্ধ হয়ে গায়িকার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তাই! তাই মুখের আদল, চোখ-নাক-মুখ, গালের তিলটা অত চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।

'আপনার আগেকার লেখা পড়ে মনে হয় সত্যিকারের জীবনের গল্প। কিন্তু এখনকার লেখা —'

'আচ্ছা তুমি গান গাইতে পার, না মা?'

আচমকা বাধা পেয়ে থতমত খায় সুচরিতা?

'গান? আমি?' বেকুবের মতো সে মাথা নাড়ে।

'জানো না? সত্যি গান জানোনা ?' সত্যসুন্দর ভয়ানক দমে যায়। সভাসমিতিতে দেখা হয়নি, ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করতে আগে কখনও আসেনি, নিকট বা দূর-আত্মীয়ও নয় — তাহলে?

অসহ্য! সত্যসুন্দরের ইচ্ছে হয় গলা ফাটিয়ে এবার চিৎকার করে ওঠে — কে তুমি? কেন তোমাকে আমার এত চেনা-চেনা মনে হচ্ছে? তবে কি আমি জাতিস্মর হয়ে গেলুম? তবে কি আগের জন্মে তোমায় দেখেছিলাম? পেটের গোলযোগের জন্য আমি যোগাভ্যাস করছি, যোগাভ্যাস কি মানুষকে জাতিস্মর করে তোলে? নইলে

— নইলে — শুধু ওই মুখের আদল, চোখ-নাক-মুখ-গালের তিল নয়— তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পর্যন্ত আমার চেনা-চেনা মনে হবে কেন? কেন মনে হবে যে —

'আপনার এখনকার গল্প-উপন্যাস পড়ে মনে হয় আমাদের জীবন থেকে সমস্ত দুঃখ দুর্দশা যেন ঘুচে গেছে, বাস্তব কোনো সমস্যাই আর আমাদের নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? দুমুঠো ভাতের জন্য যখন —'

কুণ্ঠায় যে-মেয়েটি খানিক আগেই মুখ তুলে চাইতে পারছিল না, এখন সে টান টান হয়ে উঠেছে। স্বর এখন আর সুরেলা নয়, সোচ্চার। প্রশ্রয় পাওয়ামাত্র অভিনয়ের মুখোসটা যেন ছুঁড়ে ফেলেছে। যে মেয়ে মধুর মিথ্যের বেসাতি করতে পারে আবার দরকার হলে ফুঁসে উঠতেও পারে— কে এ?

প্রাণপণে দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকে সত্যসুন্দর: অবিকল এমনিভাবেই একদিন একজন — কে যেন — কে যেন— ?

'অবিনাশবাবু এসেছেন।'

সত্যসুন্দর যেন হারানো মানিকের হদিশ পেয়েছিল একটু হলে — হাতেও পেয়ে যেত — হঠাৎ ফসকে গেল। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। 'বসতে বল।' বিরক্ত কণ্ঠে সত্যসুন্দর বলে।

সঙ্গে সঙ্গে চাকর চলে যাচ্ছিল, সত্যসুন্দরের খেয়াল হয় সিনেমার কন্ট্রাক্টফর্ম নিয়ে এসেছে অবিনাশ। ওকে বসিয়ে রাখা ঠিক নয়।

আর, এই সমস্যাটারও কিনারা এখন কোনোমতেই হবে না। সমাধানটা একবার যখন হাতের কাছে এসেও ফসকে গেল, উত্তেজনার মুখে আর তার পাত্তা মিলবে না। বরং সন্ধ্যার পর রাত নেমে এলে, কিছুটা কারণবারি পেটে গেলে হলেও হতে পারে। সুতরাং এ দুটোর জন্যে আর সময় নষ্ট করা নিরর্থক। নিছক একটা সেন্টিমেন্টকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়।

'শোন', চাকরকে ডেকে সত্যসুন্দর বলে, 'অবিনাশবাবুকে এখানেই পাঠিয়ে দে।' বলে সুচরিতার দিকে তাকায়, 'তুমি কী বলতে চাও বুঝেছি। আমার আত্মজীবনীর শেষ খণ্ডটা পড়ো, এর জবাব পাবে। সৎ সাহিত্য বলতে সত্যি কী বুঝায় —'

'আত্মজীবনীর পাঁচটা খণ্ডই আমি পড়েছি।'

'অ।'

'কিন্তু আমার মনে হয়েছে আপনি যেন আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন।'

'তাই মনে হয়েছে বুঝি? হেঁ হেঁ হেঁ!' হাসা উচিত তাই হাসে, নইলে সত্যসুন্দরের সাধ জাগে মাথা দুটো পাকড়ে ধরে আচ্ছাসে ঠুকে দেয় স্বামী-স্ত্রীর। ওটাও কেমন ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছে! 'তা এক কাজ করো, আরেকদিন আগে থেকে এনগেজমেন্ট করে এসো, ধীরে-সুস্থে আলোচনা করা যাবে, কেমন? আজ — ওই দেখ আরেকজন হাজির হয়েছে, ওকে বিদেয় করে ফের লিখতে বসব — আজ আর নাওয়া-খাওয়া —'

'তাই ভালো।' রাখাল বলে, 'আজ তবে আমরা আসি দাদা।'

'আয়।'

ঘরে ঢুকে রাখাল প্রণাম করেনি। কিন্তু এখন বউয়ের দেখাদেখি সে-ও উবুড় হয়! 'আরে থাক থাক' বলে সত্যসুন্দর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

সুচরিতার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে।

এরা বেরিয়ে যায়, ঘরে ঢোকে অবিনাশ। আধা-উত্তেজিত হয়ে।

'মেয়েটা কে সত্যসুন্দরবাবু?'

'আমার এক ভক্ত।'

'ভক্ত? কী নাম বলুন তো?'

'কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে আপনি —'

'আহা, নামটা বলুন না।'

'নাম সুচরিতা। সুচরিতা তালুকদার।'

'সুচরিতা?'

'বিয়ের আগে নাকি অন্য নাম ছিল।'

'তাই বলুন! বিয়ে করে সুচরিতা হয়েছেন! আচ্ছা, স্বামীটা বাউণ্ডুলে না?'

'বাউণ্ডুলে ঠিক নয়। আগে একটু-আধটু লিখত, পার্টি করত।'

'এখন স্রেফ টিউশানি?'

'তা হবে।'

'বাঙাল?'

'সেটা জানি।'

'নোয়াখালিতে মেয়েটার সাথে ছেলেবেলায় ভাব ছিল —?'

'হতে পারে। প্রেমঘটিত বিয়ে বলেই মনে হল। তা আপনি এত সব জানলেন কী করে?'

'আচ্ছা সত্যসুন্দরবাবু, আপনার মতো মানুষ কী বলে ওকে এই ঘরে ঢুকতে দিলেন?'

'মানে?'

'মানে ওই মেয়েটা ছিল রিফিউজি। কিছুদিন টালিগঞ্জ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে। দু-চারটে বইয়ে একস্ট্রার কাজও পায়। কিন্তু ভদ্রভাবে গরিব হয়ে বাঁচা ওদের পোষাবে কেন?'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! ডুবে ডুবে জল খেতে খেতে শেষ অবধি খোদ পাড়ায় গিয়ে ডেরা বাঁধল।'

'অ্যা!' যথাসাধ্য আঁতকে ওঠার চেষ্টা করে সত্যসুন্দর। গলা দিয়ে তার ফ্যাসফ্যাসে একটা আওয়াজ বেরোয় শুধু।

'ছেলেটা নাকি খোঁজ পেয়ে ধরে নিয়ে এসে বিয়ে করেছে। ছোকরার নিজের বলতে কেউ নেই, কিন্তু ওই ছুঁড়ির সংসার এখন ঘাড়ে চেপেছে। সে এক রাবণের গুষ্টি মশায়।'

'ছি ছি ছি।'

'শেষকালে একটা বেশ্যা এসে আপনার এই পবিত্র ঘরে —'

'থাক থাক, আর বলেন না অবিনাশবাবু, আমাকে আর মনে করিয়ে দেবেন না! আমি কী করে জানব?

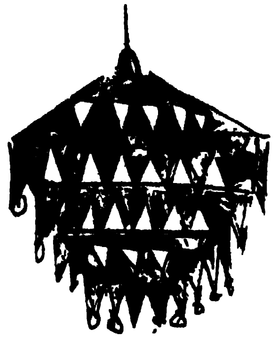
তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী মা!'

কপালে দুই হাত ঠেকায় সত্যসুন্দর।

এবং মনে মনে ফেলে স্বস্তির শ্বাস: যাক, এতক্ষণে সমস্যাটার ফয়সালা হল।



আঙুরলতা



বিমল কর

মনে হল না এইমাত্র অতিবড়ো একটা সর্বনাশ ঘটে গেল আঙুরের— আঙুরলতার ঘরে।

হাউমাউ করে কেঁদে নন্দর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না আঙুর। দুটো ঠান্ডা পা নিজের বুকের মধ্যে দু-হাতে জাপটে ধরে মাথা ঠুকতে শুরু করল না; আধভেজানো দরজাটা হাট করে দিয়ে ছুটে যে বাইরে যাবে, চেঁচামেচি করে কাউকে ডাকবে, তাও না। নন্দর চৌকির পাশে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে একটু কাঁদল না পর্যন্ত।

মধুর সঙ্গে চ্যবনপ্রাশ মেড়েছিল আঙুর। আঙুল দিয়ে নন্দর জিবে আস্তে আস্তে সেটা মাখিয়ে দিতে মানুষটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল একটু আগে। নন্দর যখন সাড়া পাওয়া গেল না, দশ ডাকেও ঠোঁট ফাঁক করল না, জিব বার করল না একটুও— আঙুর তখন তাকিয়ে তাকিয়ে লোকটার বোজা চোখের পাতা দেখল সন্দেহভরে। একটা কালো পিঁপড়ে উঠেছিল। পলকের তলায়। ঘাড়টা একটু কাত্ হয়ে রয়েছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। সমস্ত মুখখানা সেদ্ধকরা বাসি ডিমের মতন শুকনো, শক্ত শক্ত, ফ্যাকাসে। যে-আঙুলে মধু-চ্যবনপ্রাশ মাখিয়ে নিয়েছিল আঙুর নন্দর জিবে ছুঁইয়ে দেবে বলে, সেই আঙুলটাই নন্দর নাকের তলায় ধরল। না, নিশ্বাস পড়ছে না নন্দর। আঙুলটা সরাতে গিয়ে নন্দর নাকের ডগার সঙ্গে ছুঁয়ে গেল। ঠান্ডা। নন্দর বুকে হাত রাখল, কান পাতল। কোনো শব্দ নেই। যাই যাই করছিল মানুষটা। আজ যাই কি কাল যাই। যাক, শেষ পর্যন্ত চলেই গেছে।

মধু-মাড়া খলনুড়িটা কুলঙ্গির মধ্যে রেখে দিতে এসে পশ্চিমের জানলাটা খুলে দিল আঙুর। হিমুদের পুরনো টিনের চালার ওপর এখনও টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। মাটির দেওয়ালগুলো ভিজে সপ্সপ্। ডোবাটার নীল জলে শ্যাওলা থিকথিক করছে। আশশ্যাওড়া আর কচুর জঙ্গলে ক'টা কাক ভিজছে আর ডাকছে।

জানলার কাছ থেকেই ঘুরে দাঁড়াল আঙুর। নন্দর দিকে আর একবার চাইল। নড়বড়ে সরু চৌকিটার ওপর কতকগুলো এলোমেলো হাড় যেন কেউ চিট ছেড়া কাঁথার তলায় চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে। দুটো মাছি এসে বসেছে নন্দর মুখে।

নন্দ তো মরে জুড়োল কিন্তু আমায় যে এই শেষ সময়েও জ্বালিয়ে গেল! আঙুর ভাবছিল ঃ এখন কী করি! কাকে ডাকি, কার পায়ে ধরি, কার কাছে হাত পাতি?

ভীষণ রাগ হচ্ছিল আঙুরের। পাজি নচ্ছারটা যেন বুঝেসুঝেই এসেছিল এখানে। যেন ঠিক করেই এসেছিল, এঁটো পাতটা আঙুরকে দিয়েই তুলিয়ে নেবে। সেই জেদও রাখল।

এখন কী করে আঙুর? এভাবে তো ঘরের মধ্যে মড়া ফেলে রাখা যায় না। ওটাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার, পোড়াবার কী হবে?

খানিকটা ভেবে আঙুর ঘরের পুবদিকের দেওয়ালের কাছে এগিয়ে গেল। তোবড়ানো রঙচটা বাক্সটার ওপর ক'টা পোঁটলা পুঁটলি গুটানো মাদুর চাপানো ছিল। তারই ওপর কালো ছিটকাটা বেড়ালটা মুখ গুঁজড়ে ঘুমোচ্ছিল। চোখে পড়তেই আঙুর যেন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল। খপ করে ধরে বেড়ালটাকে আধভেজানো চৌকাঠের দিকে ছুঁড়ে মারল। থপ্ করে একটা শব্দ, বেড়ালটার সামান্য একটু ককিয়ে ওঠা। দরজার ফাঁক দিয়ে পালাল জন্তুটা।

যেমন করে বেড়ালটার টুটি চেপে ধরেছিল আঙুর, তেমন করেই মাদুর পোঁটলা-পুঁটলি, একটা উদোম বালিশ—মেঝের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ও। যত আপদ সব! আমার কপালেই জোটে গো — এত্ আশ্চর্যি। কেন, তোদের আর জায়গা হয় না! হারামজাদা, নচ্ছারের দল। অন্য ঠাঁই নেই? শুতে পারিস না, মরতে পারিস না সেখানে! না থাকে রাস্তায় যা, ভাগাড়ে যা!'

আঙুরের গলা চড়ল। যখন বেশ চড়ায় উঠল— তখন আঙুর যেন থেমে গিয়ে প্রত্যাশা করছিল এইবার অন্য কেউ কথা বলবে। ম্লান বিষণ্ণ, ভাঙা ভাঙা, চাপা গলায়। কিন্তু কোনো জবাব আসছে না দেখে মুখ ফিরিয়ে নন্দর দিকে তাকাতেই খেয়াল হল, লোকটা মরে গেছে।

রঙচটা, তোবড়ানো বাক্সটা খুলে বসল আঙুর। হাটকাল, হাতড়াল। একটা পাটের ফাঁস-খাওয়া বাহারি শাড়ি বের করল, দুটো তাঁতের—ছেঁড়া পেঁজা। সায়াও একটা, সার্টিনের একটা বডিজ—। কাঠের কৌটো, প্রসাদী ফুল বাঁধা ন্যাকড়া, রোল্ডগোল্ডের মেড়মেড়ে কানপাশা, ঝুটো কাচের মালাও একটা। আর বেরুল একপাতা সিঁদুর। ক'টা মাথার কাঁটা।

আঙুর সিঁদুর আর মাথার কাঁটা ক'টা হাতে করে একটু চুপ করে বসে থাকল। নন্দর দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইল না, কিন্তু চোখ দুটো ওর মনে মনে নন্দকেই দেখছিল। বছর পাঁচেক আগেকার নন্দকে। তখন নন্দর গায়ে মাংস ছিল, হাড়টা চোখে পড়ত না। মুখটা ছিল চোখ-টানা। ভরাট গাল, বড়ো বড়ো চুল।

আঙুরের বুকের মধ্যে এতক্ষণ টনটন করে উঠল। গলার কাছে নিশ্বাসটা একটু সময় চাপ হয়ে থাকল। চোখের সাদা জমি ব্যথা ব্যথা করে জল জমছিল। এক ফোঁটা জল একটা গাল ভিজিয়ে পড়ল টপ্ করে হাতের ওপর। ঠিক কবজির কাছটায়। আর আঙুর সে-দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বাক্সের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দিল।

না, নেই। সেই শাঁখা জোড়া আঙুর কবে যেন টান মেরে খুলে ফেলেছিল হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নর্দমায়। বিয়ের শাঁখা তো নয়, শখের শাঁখা; স্বামীর সিঁদুর তো নয়, যে লোকটা তাকে রেখেছিল মেয়েমানুষ করে তার একচেটিয়া জবরদস্তির সিলমোহর ও-সিঁদুর। আঙুর শাঁখা ফেলে দিয়েছিল, সিঁদুরও মুছে ফেলেছিল। সে অনেকদিন হল।

চোখটা মুছে নিল আঙুর। এই যে তার মনটা খারাপ লাগছে, কান্না আসছে—এর জন্যে নিজের ওপরই তার রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এবার সে ন্যাকামি শুরু করেছে। যেন এই ন্যাকামিটুকু করা উচিত, করলে পাঁচজনে দেখবে, এমনকি নন্দ।

ঘাড় ঘোরাল আঙুর। না, নন্দ দেখবে না। ও মরেছে।

বাক্স হাতড়ে খুঁটে খুঁটে সবসুদ্ধ সাড়ে এগারো আনা জুটল। একটা অচল টাকা আছে। এমনই অচল যে কোনোরকমে চালাবার উপায় নেই। যে হারামজাদা ফাঁকি দিয়ে এটা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সে আর কোনোদিন এল না। এলে আঙুর তার কাছ থেকে টাকাটা ঠিক আদায় করে নিত। ঠাকুরবাড়িতে মানুষ অচল চালায় আর চালাবার চেষ্টা করে তাদের এই পটিতে।

সাড়ে এগারো আনা—আর আঙুর মনে মনে খুঁজে-পেতে দেখল, কুলঙ্গিতে গেলাস চাপা দেওয়া একটা আধুলি আছে, দোক্তার কৌটার মধ্যে একটা দুয়ানি। ও, হ্যাঁ — আর আনা ছয় পয়সা আছে চালের হাঁড়িটার মধ্যে। কত হল সবসুদ্ধ তাহলে। সেই এক টাকা সাড়ে এগারো আনা।

এক টাকা সাড়ে এগারো আনায় কি একটা লোককে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, পোড়ানো-টোড়ানো সম্ভব। আঙুর যদিও এমন ফ্যাসাদে আগে পড়েনি তবু জানা কথাই, গোটা দুয়েক টাকায় শ্মশান খরচ চলে না।

কী করবে, কী করা যায় আঙুর ভাবছিল। কুল পাচ্ছিল না। বিক্রি করবে, বাঁধা রাখবে এমন কোনো জিনিসই আর তার কাছে নেই। কী আছে তার এখন? এক রতি সোনা না, রুপো না, এমনকি কাঁসাও নেই। সোনা কোনোকালেই ছিল না। সোনার পাত পরানো হালকা চুড়ি চারগাছি ছিল এককালে। নন্দই করিয়ে দিয়েছিল তখন, সে চুড়ি কবেই গেছে। কানের দু-তিন আনা সোনা ছিল— এটা অবশ্য আঙুর তার রোজগারে গড়িয়েছিল— সেটাও গেছে মাসদেড়েক আগে নন্দ আসার পর।

নন্দ এল, আর যেন মস্ত বড়ো হাঁ নিয়েই হারামজাদা এসেছিল, আঙুরের কানের তিন আনা সোনা গেল, খাঁটি সোনা, নাকের দেড় আনা— মাথায় গোঁজা রুপোর চিরুনিটা, দুখানা রেশমি শাড়ি, কাঁসার থালা, বাটি, গেলাস— টুকিটাকি আরও কত কি!

কী করবে আঙুর! আহা, সে কি সেধে এনে ঘরে ঢুকিয়ে চৌকি পেতে দিয়েছিল! অত পিরিতের কেষ্ট ছিল না নন্দ তার। বরং ওই ছ্যাঁচড়া, শয়তান, ইতর, স্বার্থপর লোকটা যখন ধুকতে ধুকতে এসে উঠল, আঙুর তো তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে গিয়েছিল।

মুখপোড়া মাগিচাটা তখন আঙুরের পা জড়িয়ে ধরে মেয়েমানুষের মতো কেঁদেছে। আঙুরের নিজেরই তখন ঘেন্না করছিল। নন্দর সর্বাঙ্গে ঘা, পুঁজরক্তে ময়লা ছেঁড়া কাপড়জামা দাগ ধরে কড়কড় করছে; বিকট গন্ধ — দাঁতে পোকা, চুলে উকুন, একমুখ দাড়ি, হলুদ চোখ। আর বৈশাখ মাসের দুপুরের খড়ের গাদার মতন গরম গা। 'দুটো রাত আমায় থাকতে দাও, আঙুর, গায়ের তাপটা একটু কমুক, আমি চলে যাব।' নন্দ বলেছিল আঙুরের পা সত্যি সত্যি জড়িয়ে ধরে।

'না, না, না। যেখানে কাটালে এতদিন সেখানে যাও।' আঙুর রোদজলে পোড়খাওয়া কাঠের মতো শক্ত। 'তোমার পয়সার সুখ যারা লুটেছে, যাদের পায়রা করে পুষেছ এতদিন, শোয়াশুয়ি রঙ্গ করেছ—তাদের কাছে যাও। কেন, তারা এখন রাখল না, লাথি মেরে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিল?'

নন্দ জবাব দিতে পারছিল না। তার জবাব দেবার কিছু ছিল না। শুধু জ্বরের ঘোরে, যন্ত্রণার বিকারে একটা মারাত্মক জখম-হওয়া কুকুরের মতন ছটফট করছিল, মাথা খুঁড়ছিল।

আঙুর থাকতে দেবে না। নন্দও উঠবে না। ওঠার মতন ক্ষমতাটুকুও তার নেই যেন।

অগত্যা।

'থাক্‌ছ, থাক — ; কিন্তু জ্বর ছাড়লেই চলে যেতে হবে।' আঙুর সাফসুফ বলে দিয়েছিল, শাসিয়ে দিয়েছিল। সেই গোড়াতেই।

নন্দ তো জ্বর ছাড়াতে আসেনি, এসেছিল আঙুরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করতে। কী ঝামেলা, কী ঝকমারি নন্দকে থাকতে দিয়ে। জ্বর তো যায়ই না, উপরন্তু বাড়ে। মাঝেমাঝেই নন্দ বেহুঁশ। হুঁশ থাকে যতক্ষণ, কাটা ছাগলের মতো ছটফট করে।

চোখের সামনে জবাই আর কতক্ষণ দেখতে পারে মানুষ। আঙুর বিরক্ত হয়ে, কোনো উপায় নেই দেখে, নন্দকে গালাগাল দিতে দিতে ডাক্তার ডেকে আনল। অম্বিকা ডাক্তারকে। এ-পাড়ার ডাক্তার। যার কাছে আঙুরদের লুকানো-চোরানো রোগগুলো জলের মতন পরিষ্কার। ও জ্বালাটালা, ঘা-টা আপাতত সে চাপাচুপি দিয়ে দিতে পারে।

অম্বিকা ডাক্তার দেখল নন্দকে। আঙুরকে বলল, 'ও আঙুর — খারাপ ঘা-টাগুলো না হয় একটু সারিয়ে সুরিয়ে দিলাম আমি; কিন্তু ওর লিভার যে পচে গেছে মদ খেয়ে খেয়ে। বড়ো কাহিল অবস্থা। সহজে মেরামত হবে না। হবে কি না তাও সন্দেহ! ওকে বরং কলকাতার হাসপাতালে দাও, যদি কিছু হয় — এখানে তো সুবিধে দেখছি না।'

আঙুরকে যেন কেউ উনুনের আঁচ থেকে টেনে চুল্লিতে ফেলল। জ্বলে যেতে লাগল আঙুর। কোথায় আপদ বিদেয় করতে পারলে বাঁচে, তা না নাড়িভুঁড়ি পচিয়ে, গিচিল রোগে সমস্ত রক্তটাকে দুষিয়ে হারামজাদা তার কাছে আরাম করতে এসেছে।

মর, মর। অরুচি আমার। খেলাম, শুলাম, সুখ করলাম পাটে; ছাই ঝাড়তে ওরে পচি, এলাম তোমার হাটে। বেইমান মিনসে কোথাকার! হবে না, শরীর তো পচে পচে গলে গলে ঝরবে। প্রায়শ্চিত্যি এমনি করেই হয়। কেন, যখন আঙুরকে ছেড়ে পথে বসিয়ে পালিয়েছিলে মনে ছিল না? আমার মা না হয় পা পিছলে কাদায় পড়েছিল। কিন্তু আমি তো আর সাত ভাতার করে বেড়াইনি। তখন ফুসফাস করে ভাগিয়ে নিয়ে এলে। কত রস-আদিখ্যেতা, মধুমিছরি কথা—।

আঙুর তখন বড্ড মিষ্টি, রস-টুসটুসে। একাই চাখব, একাই খাব। ফন্দি-ফিকির, ছেনালি কত! শাঁখা পর, সিঁদুর দাও সিঁথিতে। বর-বউ; স্বামী-স্ত্রী আমরা। ভগবান সাক্ষী, যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, এই মাটি সাক্ষী, এই ঘরের চুন, দেওয়াল ছাদের বন্ধন— এরা সাক্ষী।

বছর কাটতেই আঙুরের রস শুষে শুষে ছিবড়ে করে ফেলল নন্দ। আর সুখ নেই, স্বাদ নেই, অরুচি ধরে গেছে। পালাল নন্দ। কিছু না বলে, ঘর দেওয়ালের বন্ধন কাটিয়ে। তারপর চার বচ্ছর আর এ পথ মাড়াল না। আজ এসেছে —মরতে বসে যখন আর কোথাও জায়গা পাচ্ছে না দেহটা রাখে।

আঙুর চিৎকার করে করে শুনিয়ে শুনিয়ে এ-সব দশবার করে বলে। দূর দূর করেই আছে। জিবের রাখঢাক নেই। সারাদিন বিরাগ আর বিরক্তি, রাগ-ঘেন্না উগরে যাচ্ছে।

অথচ নেহাতই যেন এমন এক কলে পড়েছে যেখান থেকে উদ্ধার নেই তার লোকটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত— তাই ভীষণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পাপ বিদায়ের গুণাগার দেবার জন্যেই ডাক্তার আর ওষুধ আর এ পথ্য সে পথ্য।

অম্বিকা ডাক্তার ক'টা সুচ ফুঁড়ল, দু-চার শিশি ওষুধ। ঘা ফোড়ার দাগদাগানি কমল একটু। আর কিছু না। চটকলের সেই বড়ো ডাক্তার— তাকেও একদিন দেখিয়ে আনল আঙুর। তার লিখে দেওয়া ওষুধ খাওয়াল। যে কে সেই। এই ডাক্তারও বলল, কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এস।

বিশ মাইল কলকাতা। যেতে আসতে চল্লিশ মাইলের রগড়ানি, রেল-ভাড়া, বাস-ভাড়া। নন্দর ওঠার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু আঙুর একটা পচাগলা মাছের চেঙারির মতন নন্দকে কাঁখে-কোমরে ধরে তাও কলকাতার দু-দুটো হাসপাতালে ধর্না দিল। কীসের কী, কানে কথাই তুলল না কেউ। দেখল না পর্যন্ত। একনজর চেয়েই বলল, এখানে কেন এসেছ গো, নিমতলায় নিয়ে যাও। আর যদি আঁচলে নোট বেঁধে এনে থাক— টাকা দিয়ে ভর্তি করে দিয়ে যাও।

ফেরার পথে নন্দর সঙ্গে হাসপাতালেরও বাপান্ত করতে করতে ফিরল আঙুর। আর সেই যে এসে পড়ল নন্দ, তারপর আর পাশ ফেরবার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকল না। হোমিওপ্যাথি চলছিল শেষটায়। তবু দু'আনা পুরিয়া পাওয়া যায় কালীকেষ্টর ডাক্তারখানায়। গত পরশু থেকে সত্য কবিরাজের কথা মতন মধু চ্যবনপ্রাশ।

তারও শেষ হল। নন্দ মরল।

আঙুর রঙচটা তোবড়ানো ডালা খোলা বাক্সর অন্ধকারে বেহুঁশ হয়ে তাকিয়ে ছিল। চোখের পাতা পড়ছিল না, মনেই হচ্ছিল না ও আছে, ও কিছু ভাবছে, কিছু ওর করার আছে।

হুঁশ হল মেঘের ডাকে। খুব জোরে একটা মেঘ ডেকে উঠল বাইরে। আঙুর মুখ ফিরিয়ে দেখল, জানলার বাইরেটায় অনেকটা অন্ধকার জমে এসেছে।

বাক্সটা থেকে পাটের বাহারি শাড়িটা বের করে ডালাটা বন্ধ করে দিল। জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। তাকাল বাইরে। খানিকটা কালো মেঘ জমেছে বলে মনে হচ্ছে— কিন্তু বিকেলও হয়ে গেছে। বৃষ্টি অবশ্য আর পড়ছে না।

আঙুর শুনতে পাচ্ছিল তার ঘরের বাইরে চাঁপা, আতা, লাবণ্য, চামেলি, গোলাপ—দুপুরের গা-গড়ানো ঘুম শেষ করে, কেউ জল ভরতে, কেউ হাই তুলতে, উড়ের দোকান থেকে চার পয়সার চা আনতে — উঠোন দিয়ে আসছে যাচ্ছে, কথা বলছে। আতাব গলা আব গোলাপের ভাঙা গলায় বিশ্রী হাসিটা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিল আঙুর।

আতা ছুঁড়িটার কপাল ভালো। পাটকলের একটা ছোঁড়া খুব যাচ্ছে আসছে। আগেরটা ভাগতে না ভাগতেই নতুনটা জুটে গেছে। আঙুর ভাবছিল : আতা কি এই পাটের বাহারি শাড়িটা নেবে? ওর তো এইসব রঙ, বাহার ভালোই লাগে। যদি নেয় আতা, হোক না একটু ফাঁস খাওয়া, তবু এখনও ছ'টা মাস নিশ্চিন্তে পরতে পাববে। আহা, এই শাড়ি পরে তো আর বিছানায় ধামসাচ্ছে না।

যদি নেয়, আঙুর চার টাকাতেই দিয়ে দেবে। আর যদি না নিতে চায়? আঙুরের মনের মধ্যে আতা, পাটের শাড়ি, নন্দ সব এলোমেলো হয়ে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে আঙুর যেন সব ভেবে নিল, পর পর। কী করবে, কার কাছ থেকে কার কাছে যাবে। যা করাব তাড়াতাড়ি করতে হবে এবার। বিকেল তো হয়েই গেল। আর কতক্ষণ ঘরে মড়া ফেলে রাখবে!

যাবার সময় নন্দর মুখের দিকে চেয়ে একটা কুৎসিত গাল আওড়াল আঙুর। বাইরে এসে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

আতা তার ঘরের কাছটিতে পিঁড়ি পেতে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। নিশ্চয় ওর বাবু কাল যাবার সময় ফেলে গেছে। কিংবা আতা সরিয়ে রেখে দিয়েছে নিজেই। সেই সিগারেটের ভাগ পাবার আশায় মানদা আতার চুলের জট ছড়িয়ে দিচ্ছে, চিনু পায়ের কাছটিতে উবু হয়ে বসে ঝামা দিয়ে পা ঘষে দিচ্ছে।

পাটের শাড়িটা আঁচলের তলায় আড়াল করে নিয়েছিল আঙুর আগেই। আতার আশপাশে অত ভিড় দেখে যেন আর যেতে ইচ্ছে হল না। মানদা যতক্ষণ কাছে থাকবে, শত খুঁত বের করবে, আতার ইচ্ছে থাকলেও মানদা কিনতে দেবে না। দর-দাম তো পরের কথা।

তার চেয়ে আগে হিমুর কাছেই যাওয়া যাক। বলতে গেলে হিমুই একমাত্র লোক যার সঙ্গে আঙুরের ভাবসাব আছে ভালোমতন। সুখ-দুঃখের কথা তার সঙ্গেই যা হয়। এত বড়ো বিপদের কথাটা তাকেই আগে জানানো দরকার।

আঙুর উঠোন পেরিয়ে তর তর করে সদর দিয়ে বাইরে চলে গেল। হিমুদের চালাটা পাশে।

চুল বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল হিমু। আঙুর এসে কাছে দাঁড়াল।

বিপদের কথাটা বললে আঙুর। হিমুর হাত থেমে গিয়েছিল। 'কখন ম'ল?'

'দুপুরে।'

'ঘণ্টা তিন চার হল তবে! আজ আবার শনিবার। দোষ না পায়!'

'পাবে পাক, আমি কী করব! আমার কাছে তো চিতেয় ওঠার জমা রেখে যায়নি!'

'কী করবি?' হিমু চুলের খোঁপাটা আবার গুছোতে শুরু করল।

'ক'টা টাকা জোগাড় করতে পারলে হারামজাদাকে চিতেয় উঠিয়ে আসব।' আঙুর দাঁতে দাঁতে পিষে বলল।

'বিশুদের কাছে যা। ওদের বল। তবে মাগনায় মড়া কাঁধে করে পোড়াতে যাবে না ওরা।'

'তা জানি।'

'দেখ তবু হাতে পায়ে ধরে — যদি যায়।'

আঙুর তাকিয়ে তাকিয়ে হিমুর মুখ দেখল। হিমুকে দেখে মনে হচ্ছে, এ-ব্যাপারে তার কোনো গা নেই।

'তুই আমায় ক'টা টাকা দিবি হিমু?'

'টা--কা!' একটুক্ষণ আঙুরের দিকে চেয়ে থেকে হিমু হতাশ, বিষাদ-বিষাদ মুখ করল, 'তোকে বলছিলাম —না সে-দিন! স্যাকরার জন্যে বারোটা টাকা রেখেছি অনেক কষ্টে, আর চারটে হলে —জিনিসটা হয়। তা পোড়া কপাল এমন চারটে টাকাও জুটোতে পারছি না।'

আঙুর হিমুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

কী ভেবে হিমু বললে আবার, 'সিকি, আধুলি, বড়ো জোর টাকাটা হয়, পারি আঙুর। তার বেশি আমাদের ক্ষমতা কী! তা তুই দুটো টাকা নে বরং আমার কাছ থেকে। পরে শুধে দিস।' বলেই হিমু একটু অন্য রকম হাসল, তুই আর শুধবি কি —!'

হাত পেতে আঙুরি দুটো টাকাই নিল। অন্য সময় হলে নিত না, কিছুতেই না।

হিমুর কাছ থেকে বেদানামাসির ঘরে।

মাসি শুনে খেঁকিয়ে উঠল, 'তখন বলেছিলাম ও আপদ ঝেড়ে ফেল গা থেকে। শুনলি না। দরদে একেবারে উথলে উঠলি। যা এবার নিজেই কাঁধে করে নিয়ে যা। ছেনাল মাগী কোথাকার।'

আঙুর কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল শুধু দরদেও উথলে উঠিনি, বিছানা পেতে শুতেদিইনি। নন্দর আমি বিয়ে-করা মাগ নয় যে, না খেয়ে সেবা-শুশ্রূষা করেছি। নেহাত ছিল, একই ঘর; ও চৌকিতে, আমি মেঝেতে; তাই জল চাইলে দিয়েছি, ওষুধটা ঢেলেছি মুখে। পথ্যটা দিয়েছি দায়ে পড়ে।

বেদানামাসি বললে, 'আমি কী করব?'

'মড়াটা ঘরে থাকবে?' আঙুরের গলা যেন আর উঠছিল না।

'তা থাকবে বৈকি— আমার এখানে মড়া ধরা না থাকলে, না পচলে তোদের চলবে কেন! যা-যা— মেথর মুদ্দোফরাসকে খবর দিগে যা--হাতে আধুলিটা টাকাটা গুজে দিস— না হয় একদিন নিয়ে শুস বিছানায়— ওরাই ধড়টাকে পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেবে।'

আঙুরের বুকটা ছ্যাঁক করে উঠল। মেথর মুদ্দোফরাস! জিনিসটা কল্পনা করতে গিয়ে মনে পড়ল, মরা কুকুরকে কীভাবে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় ওরা।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল নন্দর উপাধিটা। ও চক্রবর্তী। বামুন।

কেমন যেন শিউরে উঠল আঙুর। বুকের মধ্যে সত্যি সত্যি একটা অদ্ভুত ব্যথা আর অসহায়তা জমে উঠতে থাকল।

বিকেল পড়ে সন্ধে হয় হয়।

আঙুর তাড়াতাড়ি এল আতার ঘরে। আতা তখন সাজছে। ছেঁড়া সায়ার ওপর আর একটা নতুন লাল সায়া চড়িয়েছে। তা কোমর-টোমর ফুলেছে খুব। বডিজ এঁটে শাড়িটা সবে পরছে। ঘরে কেউ নেই।

কথাটা সরাসরি পাড়ল আঙুর। পাটের শাড়িটা একেবারে বের করে।

আতা দেখল হাতে নিয়ে, খুলে ফেলে, কোমরে পাক দিয়ে, গায়ে ফেলে।

'শাড়িটা তোমার বড্ড সেকেলে, আঙুরদি! পাড় ভালো না।'

আঙুর কী বলবে! তিন বছর আগের শাড়ি সেকেলে হয়ে গেছে! আঙুর শুধু বিড়বিড় করে, 'তোকে মানাবে। বেশ মানাবে।'

আতা হাসল। 'চারুবাবু সে-দিন আমায় একটা ছাপাই এনে দিয়েছে। এ-নিয়ে আর কী করব! বড্ড পুরনো ছেঁড়া ফাটা।'

'নে না—!' আঙুর নিজের অজান্তেই কখন যেন মিনতি করে বসল, 'আমি বলছি আতা, নিয়ে নে। তোকে সুন্দর দেখাচ্ছে শাড়িটা গায়ে ফেলে। আর যদি শুনিস বাপু তবে বলছি এ শাড়ি পরে তো আর ধামসাচ্ছিস না। রেখে রেখে পরিস, বছরখানেক চলে যাবে।'

আতা ভাবল। 'আমার কাছে তিনটে টাকা আছে — আড়াইটে টাকা দিতে পারি। না হলে তুমি নিয়ে যাও, আমার তেমন দরকার নেই।'

আড়াইটে টাকাই নিল আঙুর। ঘরের বাইরে এল। লণ্ঠন আর কুপি জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে সব তৈরি। সাজ-পোশাক শেষ করে ফেলেছে চামেলি, লাবণ্যরা। আকাশ লালচে লালচে, বৃষ্টি হয়তো আরও জোরে আসবে। টিপটিপ পড়তে শুরু করেছে আবার। সেই বৃষ্টিতেই চামেলিদের কেউ মাথার ওপর আঁচল তুলে গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটি ছাতায় দু-তিনটে মাথাও জড়ো।

সরু গলিটা দিয়ে রাস্তায় চলে এল আঙুর। গলির আবছা আলো-অন্ধকারে তখন গোলাপদেব জটলা, বিড়ি ফোঁকা, গা-ঢলাঢলি, হাসি। ঘুরঘুর শুরু হয়েছে সবে খদ্দেরদের।

রাস্তায় এসে মনে মনে টাকাব পুরো হিসেবটা সেরে ফেলল আঙুর। এক টাকা সাড়ে এগারো আনা, হিমুব দুই আর আতার আড়াই— তা ছ'টা টাকা হয়ে গেছে। বিশুরা যদি এখন এই ছ'টাকায় রাজি হয়। মনে হয় না হবে —। কততে যে হবে — তাই বা কে জানে! হন হন করে এগিয়ে গেল আঙুর।

এখান ওখান খোঁজ নিয়ে বিশুকে পাওয়া গেল সাইকেল সারাবার দোকানটায়। টিনের নড়বড়ে চেয়ারে বসে দোকানের দরজার পাল্লায় পা তুলে কাচের গেলাসে চা খাচ্ছিল। কার্বাইডের আলো তাব পাজামা আব মুখে পড়েছে।

আঙুর কাছে গিয়ে ডাকল। ইশারা করল কাছে আসবার।

চা শেষ করে, বিড়ি ধরিয়ে ফুকতে ফুকতে বিশু এল; মিটমিট চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে। 'কী রে পট্‌লি, কী খবর?' বিশুর কাছে আঙুররা সবাই পট্‌লি। কিন্তু আঙুর কিছু বলবার আগেই বিশু সামনের দিকে চেয়ে বলল, 'দাঁড়া আগে মাইরি একটা পান খেয়ে লি। শালা চা নয় তো যেন ঘোড়ার পেচ্ছাপ। জিবটাই বেসাদ হয়ে গেল।' বিশু কথাটা শেষ করেই হাত বাড়াল। অর্থাৎ পান সিগারেটের পয়সাটা আগে ফেল। পরে বাতচিত।

আঙুর এ-সব দস্তুব জানে। গরজ তার। আঁচলের খুঁট থেকে আধুলিটা দিল — আতাব দেওয়া আধুলিটা। বললে, এক খিলি পান, একটা সিগারেট — তার বেশি নয়, কালীর দিব্যি থাকল।'

বিশু হাসল। 'খুব টাইট যাচ্ছে না কিবে পট্‌লি। দিনকাল শালা যা যাচ্ছে — যেন সত্যযুগ। হায— হায শালা আঙুরের রস চাটবে তাও মাছি আসে না।' বিশু হাসতে হাসতে চলে গেল।

এল খানিক পরে, জোড়া খিলি পানে গাল ভরতি করে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। পয়সা কিন্তু ফেরত দিল না। 'বল পট্‌লি কী বলছিলি?'

আঙুর বলল সব। গলায় উদ্বেগ আর মিনতি।

বিশু রাস্তায় ছিঁটেফোঁটা আলোতে আঙুরের মুখটা ভালো করে দেখছে। একটু ভাবল, 'ক'টাকা আছে তোব কাছে?'

'ছ'টাকা।'

'ছ'টাকা! ছ'টাকায় কী হবে রে, একটা ঠ্যাং-ও তো পুড়বে না নন্দর।' হো হো করে হেসে উঠল বিশু।

'কত লাগবে তবে?' আঙুর বিহুল হয়ে দাঁড়িয়ে বিশুর অট্টহাসি শুনতে শুনতে শুধলো।

'দেড় টাকা মন আমকাঠ। তা মন সাতেক লাগবে। দশ টাকা তো তোর কাঠেই লাগবে; তারপর হাঁড়ি কড়ি ধুনো— ধর আরও এক টাকা। নতুন বস্ত্র পরাতে চাস তো —'

'না!' আঙুর তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। ওর বুক শুকিয়ে আসছিল। নতুন বস্ত্রে আর দরকার নেই।

'এই তো আর কি; আর আমরা চারজন যাব চারটে পাঁইট দিবি। তা দু'নম্বরই দিস, দু'টাকা ছ'আনা করে ধরে নে— গোটা দশেক টাকা আর কি!'

আঙুরের পায়ের সাড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, হাতেরও। বিশুর মুখটা পর্যন্ত শুয়োরের মতন ছুঁচলো ঘিনঘিনে দেখাচ্ছিল।

খানিকটা সময় লাগল আঙুরের সইয়ে নিতে। বললে, 'অত টাকা আমি কোথায় পাব? আমার বাপ না ভাতার যে তাকে পোড়াতে বিশ টাকা খরচা চাইছিস?'

'বাপ না, ভাতার না— তো সেরেফ চেপে যা। থানায় গিয়ে খবর দিয়ে দে— ধাঙড় পাঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

আবার সেই ধাঙড়! বুকটা ধক্ করে উঠল। আঙুর নিরুপায় হয়ে বলল, 'আমার খেমতা থাকলে বিশই দিতাম। চামারগিরি করিস না বিশু!'

'তুই মাইরি, অকারণে বিগড়োচ্ছিস পট্‌লি! এই বৃষ্টিবাদলার দিন — এখন শালা শ্মশানে যেতে হলে পেঁচো, বীরে, কেলো— তিন শালাকে খুঁজে বের করে ধরতে হবে। মুফ্‌তি কেউ যেতে চাইবে না। অন্তত গায়ের পায়ের ব্যথাটা মারবার খরচা দিবি তো। আচ্ছা যা, দুটো পাঁইটই দিস — তোর বাপ ভাতার যখন নয় এক রকম মাগনাতেই চিতেয় উঠিয়ে দেব। আর কিছু বলিস না মাইরি, তোর পায়ে পড়ি।'

আঙুর হাঁ হু কিছু বললে না। মাথা নাড়ল না। সায় দিল না। রাস্তার আলো-শোষা অন্ধকার, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি আর বিক্ষিপ্ত লোকজন, দোকানপাটের দিকে নির্জীবের মতন চেয়ে থাকল।

বিশু বললে, 'যা শালা, কাঠ না হয় পাঁচ মনের মধ্যেই সেরে দেব। বাপ, ভাতার কিছুই নয় যখন তোর আধপোড়া হলেও ক্ষতি নেই। টান মেরে গঙ্গায় ফেলে দিলে হবে। আরও গোটা ছ'সাত টাকা জোগাড় করে ঝপ করে আয় দেখি, পট্‌লি। আমি হাঁদুর দোকানে আছি।'

বিশু চলে গেল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। আরও সাতটা টাকা সে কোথায় পাবে, কার কাছে হাত পাতবে!

ফিরতে লাগল আঙুর। যেন ভীষণ জ্বরে তার সর্বাঙ্গ অবশ, অচেতন। কিছু আর দেখতে পাচ্ছে না, ভাবতে পারছে না।

যাক, মেথর মুদ্দোফরাসেই টেনে নিয়ে যাক নন্দকে, টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিক গে। কী করবে আঙুর, কী আর সে করতে পারে! নন্দর ওপর তার এত বেশি রাগ হচ্ছিল যে, লোকটাকে যদি বাঁচা অবস্থায় পেত, আঁচড়ে কামড়ে মেরে-ধরে কুরুক্ষেত্র করত আজ। মরেও আমার হাড়মাস জ্বালাচ্ছে গো! আর এ কী অসহ্য জ্বলন: আঙুরের কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

বড়ো রাস্তা ধরে আবার তাদের পটির কাছে এসে পড়ল প্রায় আঙুর। আসবার সময় চোখ রেখে আসছিল, যদি তেমন কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যার কাছে একটা দুটো টাকা হাত পেতে চাওয়া চলে।

লোক তো অনেক যাচ্ছে আসছে। কিন্তু ওরা কেউ আঙুরের আঁচলে টাকা ছুঁড়ে দেবে না মুফতিতে। না, নন্দর ভাগ্যে আর চিতেয় ওঠা হল না। হবে কোথা থেকে? অমন ঠগ, জোচ্চোর, শয়তান মানুষের কি আর দাহ হবার পুণ্য আছে! একে বলে প্রায়শ্চিত্ত। বামুনের ছেলে — এবার মেথর ধাঙড়ের হাতে যা, যেমন করে কুকুর বেড়াল যায়, তাও আবার কোন ভাগাড়ে যাবি কে জানে!

আঙুরের ঘাড়ের কাছটা ব্যথা করছিল। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করছে, শিরদাঁড়াটা যেন মাঝখানে মচকে যাবে। চোখের সামনে সব ঝাপসা ঝাপসা— অদ্ভুত!

হল না। আর হল না। একটা মানুষ মরল; আর দাহ হল না। কেউ সে-দায় নিল না। কেন নেবে? নন্দ তাদের বাপ, ছেলে, স্বামী, ভাই—কেউ না। . '

হঠাৎ মানিকবাবুর সঙ্গে দেখা। হনহনিয়ে ছাতা মাথায় চলেছে। আঙুরের কী যে হল, প্রায় ছুটে গিয়ে মানিকবাবুর পথ আগলে ফেলল।

মানিকবাবু চিনতেই পারলে না। কে? কী চাও? আঙুরকে দু' হাত তফাতে রেখে মানিক মুন্সি যেন এ-পটির মেয়ের ছোঁয়া বাঁচাচ্ছিল।

আঙুরের অত আর দেখবার সময় নেই। গড়গড় করে বলে গেল আঙুর ঃ 'আপনি বাবু, একদিন এসে আমাদের ভোট কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দাড়িবাবুর জন্যে। বলেছিলেন, আপদ-বিপদ সুখ-সুবিধে দেখবেন। আজ আমার বড়ো বিপদ। ঘরে মড়া পড়ে পচছে, পুড়োতে পারছি না। একটা ব্যবস্থা করে দিন বাবু। অন্তত দাড়িবাবুর ঠেঙে চেয়ে সাতটা টাকা দিন।'

মানিক মুন্সি খিঁচিয়ে উঠল, 'আহা— কী আমার আব্দার রে মাগীর! টাকা দিন। কেন, দাড়িবাবু তোমায়

টাকা দেবেন কেন? তোমার ঘরে লোক মরবে আর মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বারবাবু তাকে খরচা করে পোড়াবে! যাও, যাও—ওসব আব্দার রাখ। দাড়িবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, কিছু বলতে হয়, কাল বেলা দশটার পর অফিসে যেও।'

মানিক মুন্সি চলে গেল। আঙুর থ। কাল বেলা দশটা! মানুষ মরল আজ দুপুরে, তার দাহের জন্যে পা ধরতে যেতে হবে কাল বেলা দশটায়! আর সারারাত ভরে তার ঘরে মড়াটা পচুক!

আঙুর বুঝতে পারছিল, দায়টা আর কারুর নয় — তারই। দায়ের সময় মানিক মুন্সি। তাদের বেশ্যাপট্টির ঘরে ঘরে ঘুরেছে, পান মিষ্টি খেতে জনে জনে টাকা দিয়েছে। আজ তার দায় নেই।

চোখ ফেটে কান্না আসছিল আঙুরের।

কিন্তু কাঁদল না আঙুর। চোখ পড়ল সামনের দোকানটায়। পানের দোকানের মতো এক ফালি দোকান। রাস্তার সঙ্গে মেশান নীচের দোকানটায় বসে মুড়ি ছাতুটাতু বিক্রি করে একজন। ওপরটায় অন্যজনের দোকান। আয়না দিয়ে সাজানো। হরেক রকম শিশির থাক। আতর, জর্দা, সুর্তি আর সুর্মার সঙ্গে মোদকও বিক্রি হয় ও-দোকানে।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতে দেখতে আঙুরের দুটো চোখ হঠাৎ কীসের আঁচে যেন জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, লোকটাকে ভালো করেই চেনে আঙুর। ওর নাম প্রভুলাল। আর এও জানে আঙুর, ওকে দেখলে প্রভুলালের শরীরটা কেমন কিলবিল করে ওঠে। যেন জ্বর লেগে যায়। দাঁত, মুখ, চোখ, গা—সব যেন কসকস করে, কাঁপে ভেতর ভেতর, টসটসিয়ে ওঠে। তখন লোকটার একটা চোখ চকচক করে, ভীষণ চকচক, আর অন্য চোখটা — যেটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, ঝুলে পড়েছে, মাছের পিত্তির মতন গলা গলা সবুজ— সেটা যেন আরও কুচ্ছিত হয়ে ওঠে। প্রভুলালের কালো কুচকুচে ফোলা ফোলা মুখ থেকে দাঁতগুলো তখন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। জিব দিয়ে লালা পড়ে।

আঙুরের দিকে প্রভুলালের নজরটা বরাবরই এইরকম। কেন, কে জানে। আঙুর বুঝতে পারে না। এক একটা লোকের এক একজনের ওপর এ-রকম হয়। দাঁত উঁচু, টোপা-কপাল ঝুমুরের ওপর তা না হলে অমন সুন্দর মানুষটার চোখ পড়ে মন্টুবাবুর। মন্টুবাবু তো ঝুমুরকে এখান থেকে উঠিয়েই নিয়ে গেল।

আঙুর জানে, তার রূপ ঝরে গেছে। অমন ব্যাধি থাকলে না ঝরে উপায় নেই। আর ব্যাধির কি ঠাঁই বিচার আছে? এমন জায়গায় গুছিয়ে বসল যে, আঙুরের আসলটাই গেল। অম্বিকা ডাক্তার বলেই দিয়েছিল, খুব সামলে সুমলে থাকবে। বেশি অত্যাচার করো না। ছেড়ে দিতে পারলেই ভালো। নয়তো একদিন এতেই মরবে।

সেই থেকে আঙুরের অবস্থা পড়ে গেল। নয়তো আতা, চিনু, চামেলির বড়ো মুখ ওকে সইতে হত না। ঈশ্বর যাকে মারেন— তারে আর উপায় কী! তাও একটা বছর আঙুর কত সাবধানে থেকেছে। নেহাত যখন পেট ভরাবার চাল-ডালটুকুই বাড়ন্ত হত— তখনই আঙুরকে গলির মুখে এসে দাঁড়াতে হত সেজেগুজে।

রোগটা ভেতরের তাই ওপরটায় আজও আঙুরের কিছু কিছু আছে। মুখখানাই শুধু যে ভালো তা নয়; বুক কোমর চলন-টলনগুলোও এখন পর্যন্ত ভালো আছে। বিশেষ করে সামনাসামনি দেখলে— আঙুরের এই আশ্চর্য ভরাট গলা-ঘাড়-বুকের দিকে না চেয়ে পারা যায় না।

প্রভুলালের দোকানের দিকে পা পা করে এগিয়ে যেতে লাগল আঙুর। লোকটাকে কী ঘেন্নাই করত ও; প্রভুলালের কালো কুচকুচে, থলথলে মোটা, ভোঁদড়ের মতো শরীর আর ওই কুচ্ছিত মুখ, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা একটা চোখ, যেটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে— দেখলেই আঙুরের গায়ে কাঁটা দিত, ঘিন ঘিন করত সারা গা, ভয় ভয় করত। বেশিক্ষণ তাকাতে পারত না লোকটার দিকে। নয়তো প্রভুলাল কতবারই তো ঘুর ঘুর করেছে — আঙুর এগুতো দেয়নি। মাগো, ওই লোকটার সঙ্গে কি শোয়া যায় নাকি? আঙুর তাহলে মরেই যাবে।

আজ আর অত কথা ভালো করে ভাবতে পারল না আঙুর। বরং ভাবছিল, প্রভুলালও যদি মাথা নাড়ে! না বলে!

ধুক ধুক বুকে প্রভুলালের দোকানের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল আঙুর।

'সুর্মা আছে?' মুচকি হাসল আঙুর। একটু হেলে দাঁড়াল।

প্রভুলাল প্রথমটায় অবাক। তারপর যেন শরীরের কোথাও একটা পালকের সুড়সুড়ি খেয়ে সারাটা গা-মুখ বেঁকিয়ে ফুলিয়ে হাসল। গলার মধ্যে সর্দি-জড়ানো আওয়াজের মতো ভাঙা ভাঙা আবেগ-স্বর উঠছিল।

সুর্মার দিকে হাত বাড়াল না প্রভুলাল। আঙুরের দিকে চেয়ে একটু ঝুঁকে পড়ল, 'কী খবর? আঁ — তুমি কাঁহা ভাগ গিয়েছিলে! শালা সারা পট আন্ধার হয়ে গেল।'

হাসি আসছিল না। তবু আঙুর হাসল। যেন একটা ঝাপটা খেয়ে প্রভুলালের কোলের ওপর পড়তে পড়তে উঠে সোজা হল। এলোমেলো আঁচলটা তো হাতে লুটোচ্ছিল, বুকের কাপড়টাও কখন সরিয়ে একপাশে গুটিয়ে দিয়েছে আঙুর। 'মস্‌করা থাক। সুর্মা আছে কিনা বলো। না থাকে তো যাই।' আঙুর মাঝ-কোমর থেকে বুক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আবার টেনে নিল। ঠিক যেমন লাট্টু ঘুরোতে লেত্তিকে ছেড়ে দিয়ে টানতে হয়। গলা বেঁকিয়ে চোখের পাশ দিয়ে বিভ্রম ছুঁড়ল।

'আছে, আলবৎ আছে।' প্রভুলালের চোখ চকচক করছে, 'তোমাদের আঁখে সুর্মা লাগাতেই তো বসে আছি।'

'থাক, তোমায় আর লাগিয়ে দিতে হবে না। হাতে পিঁপড়ে ধরে যাবে।' আঙুর আর এক দফা হেসে— প্রভুলালের বসবার জায়গাটার কাছে বেঁকে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়াল। গালে হাত রাখল। ঘাড় হেলিয়ে মুখ-চোখ তুলে ধরল।

ঠেলে বেরিয়ে আসা মাছের পিত্তির মতন প্রভুলালের চোখটা যেন গলে গলে পড়ছিল। আঙুর চোখ বুজল।

'কিরপা থোড়ি কুছ হো যাক আঙুরী! শালা কী চোট্‌ যে আছে তুমার বাস্তে।' প্রভুলাল কখন তার গরম হাতটা দিয়ে আঙুরের কনুইয়ের ওপরটা ধরে ফেলেছে।

আঙুর সেই অবস্থায় জোরে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে টেনে টেনে একবার নিঃশ্বাস নিল, আস্তে আস্তে ছাড়ল। বুক উঠল, নামল। ঠোঁট কামড়ে, বাঁ চোখ টিপে হাসল আঙুর।

'তোমার পচা আতরের গন্ধ কদিন থাকবে গো!' আঙুর ঠোঁট উল্‌টাল।

'পচা নেই. আসলি আতর দেব। যে কদিন রাখতে চাও।' প্রভুলাল আঙুরের গালে টোনা মারল।

আঙুর ভাবল। 'দশটা টাকা আজ দাও তবে?'

'দশ —?' প্রভুলাল থতমত খেয়ে গেল, 'দ-শ কি রে?'

'দরকার আছে. দশ দাও। আগাম দাও —।'

'অ'গলি?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল আঙুর 'দশ না পারো সাত আটটা টাকা দাও।' মনে মনে হিসেব করে নিল প্রভুলাল। তারপর নিচু গলায় বললে, 'বহুত আচ্ছা আট টাকা দেব। মাগর —' প্রভুলাল কুচকুচে কালো মুখে, গোঁফের ডগায় হিসেবি একটা হাসি তুলল। আঙুল দিয়ে দেখাল দিনের হিসেবটা। প্রায় সপ্তাহভোর আর কি।

ও সবের দিকে চোখ ছিল না আঙুরের। হাত পাতল আঙুর। টাকা।

প্রভুলাল আঙুরের গালটা টিপে দিল। 'তু যা পাগলি, ঘর যা — সুরতটুরত থোড়া ঠিক করে লিগে যা. একদম্‌ কল্‌কত্তাবালী হয়ে যা। দোকান বন্‌ধ্‌ করে আমি আসছি। টাকা লিয়ে যাব।'

আঙুর ভীষণভাবে চমকে উঠল। সমস্ত শরীরটা হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গেছে। পা পাথর। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল আঙুর প্রভুলালের দিকে।

'কী রে?' প্রভুলাল আতরের শিশিটিশি, জর্দার নিক্তি ওজন গোছাতে লাগল।

আঙুর তার সাদা নিভন্ত চোখ তুলে আস্তে গলায় বলল, 'আমার ঘর না, তুমি অন্য কোথাও বল।'

এ-রকম কথা প্রভুলাল জীবনে আর শোনেনি যেন। 'বাঃ—! টাকা তুমি লেবে আঙুরী— আর ঘর ঢুঁড়ব আমি। তব তো দুসরা আওরাত ভি —।'

আঙুরের চোখের ওপর প্রভুলালের মুখও আর ভাসছিল না। আলো, আয়না, হরেকরকম শিশি— আর ফাঁকা ফাঁকা ঝাপসা সব কী যেন। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে হলুদ বিকারের চোখে মানুষ যেমন কী দেখছে জানে না বোঝে না চেতনায় চিনতে পারে না তেমনি।

একটু পরে আঙুর মাথা নাড়ল। বেশ, তবে তাই, আমার ঘরেই এসো তুমি। তাড়াতাড়ি।

প্রভুলালের দোকানের সামনে থেকে একটা অন্য রকম শরীর আর পা যেন জলো হাওয়া আর অন্ধকার আর পচ্‌পচে রাস্তা গলি দিয়ে নেশার ঘোরে টলতে টলতে মিশিয়ে গেল।

আঙুরের বুকের মধ্যে শব্দগুলো এলোমেলো। সমস্ত মাথাটা ঠাস; কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, চোখে ঠাওর

করতে পারছে না। হাত-পা সাড় পাচ্ছে না। একটা দম-দেওয়া পুতুলের মতন যা হবার হয়ে যাচ্ছে, আপনা থেকেই।

কুপি জ্বেলেছে আঙুর। ধুনো পুড়িয়ে দিয়েছে ঘরে। কটা ধূপও। বাক্স থেকে শাড়ি বের করতে গিয়ে পাটের শাড়িটা খুঁজেছে প্রথমে — তারপরেই মনে হয়েছে আতাকে বিক্রি করে দিয়েছে সেটা খানিক আগেই। তাঁতের ঘোর লাল রঙের ছেঁড়া ছেঁড়া শাড়িটা তাড়াতাড়ি গায়ে পরে নিয়েছে, সেই সাটিনের পুরনো বডিজটা পর্যন্ত। চুল বেঁধেছে। আলতা দিয়েছে পায়। টিপ আর কাজল।

প্রভুলাল এল। ঘরটা বড়ো অন্ধকার। 'লণ্ঠন কী হল? টুট্ গিয়া —?' আতরের গন্ধ প্রভুলালের জামায়। হাতে পানের ঠোঙা। মুখে একগাল পান, জর্দা।

প্রভুলালের চোখ লালচে, চকচকে। মাছের পিত্তির মতন চোখটা যেন গলেই গেল। ওর নাকের নিশ্বাসে হিসহিস শব্দ। লাল দাঁতগুলো তৈরি, খাবারটা পেলেই যেন চিবিয়ে চুষে সাবাড় করে দেয়।

আঙুরের শরীরটা যেন নদীর জলে ভাসছে সাড় হারিয়ে। কী হচ্ছে ও জানে না,বুঝতেই পারছে না। মনটা শুধু সময় গুনছে— রাত কত হল! বিশু কি থাকবে হাঁদুর দোকানে? যদি বৃষ্টি আসে ঝমঝমিয়ে আবার! তবে কী হবে? সারারাত কি ফেলে রাখতে হবে! দোষ ধরল না তো! শনির দুপুরের মড়া।

নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না আঙুর। কুপির আড়াল পড়েছে। একটা ভাগাড়ের খ্যাপা কুকুর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে।

মনের জ্বালাটা আরও বাড়ছে। বাড়ুক। কীসের ওপর, কার ওপর সে প্রতিশোধ নিচ্ছে, তা জানে না। তবে অনুভব করতে পারছে, এই কষ্ট এই যন্ত্রণা অনেকটা তেমনি।

আবার কি বৃষ্টি এল? না, বৃষ্টি নয়। বৃষ্টি যেন আর না আসে, হে মা কালী! কোনগতিকে শ্মশানে পর্যন্ত যেতে দাও। চরণে পড়ি তোমার।

প্রভুলাল খুশি। আঙুর হাত পাতল। চোব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে যেমন হোটেলের দাম মেটায় মানুষ— তেমনি, ঠিক তেমনি আরও দুখিলি পান জর্দা মুখে দিয়ে, রুপোর দাঁত-খোঁটা কাঠিটা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আটটা টাকা দিল প্রভুলাল হেসে হেসে। আঙুরের গালটা আর একবার টিপে দিয়ে চলে গেল।

টাকা আটটা আঁচলে বেঁধে নিল আঙুর। আগের টাকাগুলোও। তারপর বাইরে এসে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। আঁট করে।

আতা চামেলিদের ঘরে তখন আলো, হাসি, হুড়োহুড়ি, ঝুম্ঝুম্, তালি, বেসুরো গান আর দিশি মদের গন্ধ।

আঙুর তর তর করে দাবায় নেমে গেল। তারপর বাইরে। সদর রাস্তায়। হাঁদুর দোকানে বিশু কি আছে এখনও।

বিশুদের নিয়ে ফিরল আঙুর। দরজা খুলে ঢুকল।

পিছু পিছু বিশু।

'কই মড়া কই! আ, খুব বাহারে ধুপ জ্বালিয়েছিস তো, পট্‌লি।' বিশু নাক টেনে গন্ধ নিল ধূপের।

আঙুর লণ্ঠন জ্বালাল।

বিশু তাকাল এদিক, ওদিক। 'মড়া কই?'

আঙুর আঙুল দিয়ে চৌকির তলাটা দেখিয়ে দিল।

বিশু মুখ নিচু করে দেখল। অবাক ও, চোখের পাতা পড়ল না। 'ওর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল কী করে?'

আঙুর সে কথার কোনো জবাব দিল না।

বিশু একটু অপেক্ষা করে সঙ্গীদের ডাকল। ডাকবার আগেই পেঁচো, বীরে ঢুকে পড়েছে।

বিশু বললে, 'বাঁশ এনেছিস তো, লে শালাকে টেনে বের করে বাঁধ।'

মড়া নিয়ে বিশুদের বেরুতে খুব একটা সময় লাগল না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আঙুর দাওয়ায় নামল।

আঙুর বলল, 'হরিবোল দিবি না?'

বিশু জবাব দিল, 'চল, রাস্তায় গিয়ে দেব। এখানে রসের হাটে হরিবোল দিলে শালাদের মেজাজ গণ্ডগোল হয়ে যাবে।'

বিশু, কেলো সামনে— পেঁচো আর বীরে পেছনে। মাদুর জড়ানো দড়ি দিয়ে বাঁধা নন্দর ধড়— বাঁশের ওপর চাপিয়ে চারটে লোক দাওয়া দিয়ে এগিয়ে গেল। চারটে ছায়া। আর আঙুর পিছন পিছন।

আতার ঘরে তখন বস্ত্রহরণ পালার হাসি উল্লাসের ঝাপটা বয়ে যাচ্ছে।

শ্মশানে এসে পৌঁছতে প্রায় মাঝরাত হয়ে গেল। কেলো গেল কাঠ আনতে, পেঁচো পাঁইট আনতে। কাছাকাছি সে-ব্যবস্থা আছে। বিশু বিড়ি ফুঁকতে লাগল। আর বীরে একটা সিনেমার গান গাইতে লাগল, সদ্য-কেনা হাঁড়িটার পছনে বোল তুলে।

আঙুর চুপ করে বসে থাকল একপাশে।

বিশুর দলের বাহাদুরি বলতে হবে— ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিক করে ফেলল। গঙ্গার জলে ধোয়ানো হল নন্দর দেহ। চিতে সাজিয়ে শোয়ানো হল। এবার মুখে আগুন দেওয়া।

পাঁকাটিতে আগুন ধরিয়ে বিশু আঙুরের দিকে এগিয়ে দিল। বললে, 'নে পট্‌লি, মুখে আগুনটা দিয়ে দে।'

আঙুর চমকে উঠল। নন্দর মুখে আগুন দেবে ও? কেন? নন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক কীসের? কিচ্ছু না। কেউ ন নন্দ ওর।

আঙুর মাথা নাড়ল। 'আমি কেন দেব। না-না, তোমরা কেউ দিয়ে দাও।'

'দিবি না তুই? লে কেলো, তুই-ই তবে দিয়ে দে শালার মুখে আগুন।'

কিন্তু কেলো ততক্ষণে একটু পাশে গিয়ে পাঁইটে মুখ দিয়েছে। পেঁচো বলল আঙুরকে, 'আহা দাও না তুমি। তোমার সঙ্গে তবু তো জানাশোনা ভাবসাব ছিল খানিকটা, আমরা তো সব রাস্তার লোক।'

জানাশোনা, খনিকটা ভাবসাব? তা হ্যাঁ, তা ছিল বৈ কি। আঙুর সেটা অস্বীকার করতে পারে না। এতো লোকের মধ্যে একমাত্র আঙুরই তবু নন্দকে চিনত, জানত। ওর সঙ্গে এক ঘরে থেকেছে, খেয়েছে, শুয়েছে। শখের স্বামী-স্ত্রী-খেলা— তাও খেলেছে। শাঁখা-সিঁদুরও পরেছে।

পাঁকাটিটা জ্বলছিল। সে-দিকে তাকিয়ে আঙুর কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেল। তারপর হাত বাড়াল বিশুর দিকে।

জ্বলন্ত পাঁকাটি নিয়ে নন্দর মুখের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আঙুর। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে পাঁকাটিগুলো। সই আলোয় নন্দর শুকনো, তোবড়ানো, বাসি ডিমের মতো সেদ্ধ মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যেন সব যন্ত্রণার শেষ ঘা খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'সামলে রে পট্‌লি, শাড়িতে আগুন ধরে যাবে।' বিশু হাঁকল।

আঁচলটা সামলাতে গেল আঙুর। এক্ষুনি পাঁকাটির আগুন লেগে যেত।

কিন্তু শাড়ির আঁচল সামলাতে গিয়ে— পাঁকাটির আগুনে যেন হঠাৎ কী দেখল আঙুর। দেখে নিথর হয়ে গেল মনের মধ্যে কী যে অস্বস্তি জাগল! গা ঘিন ঘিন করে উঠল।

নিজেকে বড়ো অশুচি অশুচি লাগছিল। এই শাড়ি পরে একটু আগে প্রভুলালের সঙ্গে সে শুয়েছে। এখনো সেই ভাগাড়ে, কুকুরটার—? —না, এই বস্ত্রে কারুর মুখে আগুন দেওয়া যায় না। নন্দ স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে— কে জানে, তবে এই সংসার তো ছেড়ে চললই। এ সময় আর খুঁত থাকে কেন!

পাঁকাটি কটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আঙুর হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছিস আবার?' বিশু অবাক।

'আসছি। গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।' আঙুর তরতরিয়ে ডাইনে ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ধাপ ভেঙে গঙ্গার জলে এসে দাঁড়াল আঙুর। আকাশটা লাল। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হু হু। গঙ্গার জল কালো। একটা শব্দ উঠছে স্রোতের। ঘাটে আছড়ে পড়ার।

জলে পা দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে এই আকাশ এই জল এই নিস্তব্ধতা যেন মনে, বুকে, গায়ে মেখে নিচ্ছিল আঙুর। মাথাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল, ঘোলাটে মনটাকে ধুয়ে নিচ্ছিল। কেমন একটা পচা গন্ধ এসে নাকে লাগল আচমকা। নিশ্চয় কোনো গলা-পচা গরু-ছাগল কি মোষটোষ হবে, জলে ভেসে এসেছে। আধপোড়ানো মানুষ-টানুষও হতে পারে।

বড়ো বিশ্রী গন্ধ। এদিক ওদিক চাইল আঙুর। নাক বন্ধ করল। একটু পরে আবার খুলল। আর ধক্ করে যে

বিশ্রী গন্ধটা নাকে এসে লাগল সেই গন্ধটা বড়ো চেনা চেনা ঠেকল। হ্যাঁ, বিশুর গায়ে এই গন্ধ ছিল, এই গন্ধ আছে আতা, বেদানামাসি, প্রভুলালের গায়। সর্বত্র!

আঙুরের চোখের সামনে সত্যিকারের গঙ্গা যেন এইবার আলো হয়ে উঠল। কোথায় সে পাপ ধুতে এসেছে, অশুচি ছাড়াতে—?

মাথার মধ্যে একটা শিরায় যেন ফস্ করে কেউ দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিল। জ্বলে উঠল সমস্ত শিরা স্নায়ুগুলো। অশুচি, কীসের অশুচি? গঙ্গাজল তার কোন্‌টা ধোবে—বস্ত্র না দেহ না মন! বেদানা মাসি হিমুর গা অনেক ধুয়েছে গঙ্গা। কী দিয়েছে?

গঙ্গার জলে একটা লাথি মারল আচমকা আঙুর। আর তারপর ছুট। ছুটতে ছুটতে এসে জ্বলন্ত পাঁকাটি কটা নিয়ে নন্দর মুখে ঠেসে দিল।

আগুন ধরল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। এখানে আগুন, ওখানে আগুন। আ, সাজিয়েছে বটে বিশুরা চিতা! শুকনো কাঠ বেছে বেছে এনেছিল। চোখের পলকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা।

খানিকটা পিছিয়ে এসে আঙুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশুরা একটা পাঁইট শেষ করে আর একটা খুলল।

আকাশটা লাল। খুব লাল। বৃষ্টি না এসে পড়ে।

নন্দর মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। বীরে খুঁচিয়ে দিচ্ছে এ-পাশ ও-পাশ। লাঠি মারছে।

আঙুর অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে এই অদ্ভুত দাহ দেখছে।

আগুনের হল্‌কাটা হঠাৎ ধক্ করে বেড়ে উঠল। সমস্ত চিতাখানা টকটকে লাল। সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আঙুর আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামে না। যেন মাতাল হয়ে গেছে।

বীরে খোঁচাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে পা ভেঙে দিচ্ছে শবের। পেটাচ্ছে। কাঠ পুড়ে পুড়ে ভাঙছে— মট্ মট্। হাড় ফাটছে নন্দর। ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না!

আর আঙুরের কানে সেই শব্দগুলো লাগছে ভয়ানকভাবে। ছটফট করছে আঙুর। যেন তার বুকের হাড়গুলো মটমট্ করে ভেঙে দিচ্ছে। বুকের মধ্যে থেকে এক খাবলা কিছু নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওই আগুনে।

আঙুর আর পারছিল না। অস্থির হয়ে উঠছিল। কী যে অসহ্য একটা জ্বালা দাপাদাপি করছে তার মধ্যে। মোচড় দিয়ে উঠছে সারাটা বুক। কণ্ঠার কাছে টনটনে ব্যথাটা ফুলছে আর ফুলছে।

আঙুর পারছিল না। ওই চিতা দেখছিল নন্দর। আর মনে মনে ভাবছিল সব—সব তোমরা সমান। সবাই। তুমি, হিমু, বেদনামাসি, হাসপাতাল, ডাক্তার, আতা, বিশু, মানিকবাবু, প্রভুলাল— সবাই। তেমনি তোমাদের গঙ্গা। সবই তো এ সংসারেরই কাদা, মাটি, জল। এক ছাঁচ, একই নক্‌শা।

আঙুরের কষ্ট হচ্ছিল, অযথাই সে একা নন্দর ওপরই রাগ করে ঘেন্না আর জ্বালা নিয়ে থাকল।

আঙুর কাঁদল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে। ঠোঁট কামড়ে ধরে। নন্দর চিতার আগুন যেন তার সমস্ত চোখ মন শরীর জুড়ে জ্বলছে। বড়ো দুঃসহ সে আগুন। বড়ো স্পষ্ট। সবকিছু তার আলোয় ঝকঝকে হয়ে উঠছে। এই সংসার, এখানের ভালোবাসা, ঘর গড়া, ঘর ভাঙা, মানুষ, মানুষের ব্যবহার, মন।

আঙুর ডুকরে উঠল। সকলকে চমকে দিয়ে। এই প্রথম। হঠাৎ, হঠাৎই। বর্শায় খোঁচা খাওয়া একটা পশুর মতো সমস্ত জায়গা কাঁপিয়ে, থরথরিয়ে। তারপর গুমরে গুমরে। কাত্‌রে কাত্‌রে।

আঙুরের ইচ্ছে হচ্ছিল, ওই চিতার কাছে ছুটে গিয়ে নন্দর আধপোড়া ঝলসানো পা দুটো বুকে চেপে ধরে। মাথা খোঁড়ে।

আঙুর সত্যিই ছুটে যাচ্ছিল। বিশু খপ্ করে তার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'কী রে পট্‌লি মরবি না কি?'

না, আঙুর মরবে না। চোখ তুলে বিশুর দিকে চাইল ও। তারপর আকাশের দিকে। এ-পাশ, ও-পাশ। চিতা এবং গঙ্গার দিকেও। যেন এই সংসারের আকাশ, মাটি, মানুষ, জন—সব তার চেনা হয়ে গেল। আর সে মরবেনা, কাঁদবে না!

সুর্মা



রমাপদ চৌধুরী

ওরা সমাজ-ছাড়া, সমাজের বাইরে ওরা। কিন্তু ওদেরও একটা সমাজ আছে। ওদেরও ছেলেমেয়ে আছে, আর ছেলেমেয়েদের বিয়েও হয় কখনো-সখনো। কিন্তু বিয়েটাকে খুব সুনজরে দেখতে পারে না সকলে।

পারে না তার কারণ এ নয় যে ওরা অসামাজিক জীব। কারণটা অর্থনৈতিক। ওদের সমাজে শেষ ভরসা হল একটি ভরা-বয়সের মেয়ে। নিজের হোক পরের হোক, তফাত নেই কোনো। মা-মাসির রোজগারে ভাটা পড়লে ভয় কীসের? মেয়ের যৌবনের জোয়ার মানেই তো রোজগারেও জোয়ার।

কিন্তু দু-একটা মেয়ে হঠাৎ একসময় বেঁকে দাঁড়ায়।

চোখ কপালে ওঠে বিপত্তারিণীর। বিপত্তারিণী অবশ্য নাম নয়, আসল নামটা যে কী ছিল তা আর মনেই নেই কারও। বয়সকালে যতবার পাড়া বদলেছে ততবার নাম, তারপর এ তল্লাটে যখন ব্যবসা জাঁকিয়ে বসল তখন থেকে সবাই ঠাট্টা করে নাম দিল — বিপত্তারিণী। ব্যবসাটা মন্দ চলে না। আইনকানুনের যত কড়াকড়ি হচ্ছে, বিপত্তারিণীর ততই লাভ। দিশি বিলিতি পাঁচ রকমের মদ রাখে বিপত্তারিণী। রাত্তিরে মদের দোকানগুলো যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন অনেকে ছুটে আসে তার কাছে। বাড়তি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। লুকোচুরির কাজ, কিন্তু থাকে দুপয়সা। সত্যি বলতে কি, শেষ বয়সে মেয়ের রোজগারে খাবার লোভও নেই, প্রয়োজনও হবে না বিপত্তারিণীর। তা বলে সমাজ ছাড়া হবে কেন তার মেয়ে!

চিরকাল যা দেখে এসেছে, বাকি দিন কটাও তাই দেখে যেতে চায় বিপত্তারিণী। উঠতি বয়সে অমন অনেক কথা মনে হয়, অনেক স্বপ্ন ও নিজেও দেখেছিল। তারপর ঘা খেয়ে খেয়ে ভুল ভেঙে গেছে, বুঝেছে যে যার নিজের নিজের ফুটপাথ ধরে চলাই ভালো। তাই সুর্মাকে ভুল করতে দিতে চায় না। সোনাদানায় গা মুড়ে বেশ ববরবা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে মেয়ে তার, এইটুকু দেখে যেতে পেলেই যেন খুশি হয় বিপত্তারিণী। আর বিয়েই যদি করতে হয় তো শেঠেদের সেই ছোকরা বাবুটি

তা নয়, সুর্মার মন পড়েছে রতনের ওপর। এ পাড়ারই ছেলে, এ পাড়াতেই গান শিখিয়ে বেড়ায়। গলির মধ্যে চায়ের দোকানটা চালায় রতনের মা। দোকানটা ছিল এক হিন্দুস্থানির, রতনের মার কাছে আনাগোনা ছিল তার। কলেরা না বসন্ত কী হয়ে যেন মারা যায় লোকটা, তারপর থেকে ওটা রতনের মা চালিয়ে আসছে।

রতনের দোকান-টোকান ভালো লাগত না। গান গাইতে পারত ভালো, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শেখাত পাড়ার মেয়েদের।

যে যা পারত দিত মাইনে, রোজগার মন্দ হত না।

সবচেয়ে বড়ো রোজগার হয়ে গেল সুর্মা।

সুর্মাকে গান শেখাতে শুরু করেছিল সে খুব ছেলেবেলা থেকে। তারপর ধীরে ধীরে কখন যে সকলের অজ্ঞাতে হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠেছে, সুর্মা, তা রতন লক্ষও করেনি।

ও-সব অত লক্ষ করেও না রতন। এই পাড়ায় মানুষ, জন্মে থেকে অনেক কিছু দেখছে, অনেক কিছু শিখছে, তাই সবই গা-সওয়া হয়ে গেছে। কার বয়স বাড়ল, কার বয়স ছাড়ল — এসব খোঁজই রাখে না।

তবু হঠাৎ একদিন তার মনটা কেমন যেন আনচান করে উঠল। সুর্মার চোখে, সুর্মার হাসিতে, এমনকি তার গলার স্বরেও কী যেন একটা নতুন নতুন ঠেকল। রতন যাকে রোজ দেখে, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, এ যেন সেই সুর্মা নয়। অন্য কেউ।

গান শেখাতে শেখাতে এক এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রতন। কী যেন ভাবে। আর তা দেখে মুচকি হাসে সুর্মা।

এমনিভাবেই চলছিল। বিপত্তারিণীর যে চোখে পড়েনি তা নয়। কিন্তু এমন ধারার ইয়ারকি ফাজলামিকে কোনো গুরুত্ব দিলে চলে না ওদের। তাই দেখেও দেখেনি।

কিন্তু এমন একটা সাংঘাতিক কথা সুর্মার কাছে শুনতে পাবে, বিপত্তারিণী কোনোদিন কল্পনাও করেনি।

দুম্‌ করে একদিন সুর্মা বলে বসল, রতন বলেছে আমাকে বিয়ে করবে।

চোখ কপালে উঠল বিপত্তারিণীর ঃ কী করবে? বিয়ে? ওই রতন?

অট্টহাসি হেসে উঠল বিপত্তারিণী। মোটাসোটা খসখসে চেহারাটা কেঁপে কেঁপে উঠে আরও কুৎসিত দেখাল। নিজের মেদবহুল দু হাতে চেপে বসে আছে সোনার তাগা, গলায় মোটা বিছে-হার, সেগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বিপত্তারিণী বললে, তা এগুলো পরিয়ে দিতে হবে তোকে, তাই না!

ঠাট্টা বুঝে চুপ করে রইল সুর্মা।

বিপত্তারিণী হেসে বললে, তারপর এগুলো বেচে দুদিন পরে আবার ফিরে আসবি, এই তো!

মেয়ের কথা শুনে তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। বিয়ে করবে সুর্মা? তাও রতনকে?

সুর্মা ধীরে ধীরে বললে, কিছু চাই না তোমার কাছে, ফিরেও আসব না কোনোদিন।

—অ, রতন বুঝি বাসা করে নিয়ে যাবে? কথাগুলো বিছুটির মতো ছিটিয়ে দিলে বিপত্তারিণী।

কিন্তু গায়ে মাখল না সুর্মা। বললে, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না আমি। এ পাড়াটা আমার বিষ লাগে।

হঠাৎ যেন একটা ঘা খেল বিপত্তারিণী। রাগে জ্বলে উঠল তার সর্বশরীর। বললে, দেখ সুর্মা, নাটক-নবেলের মতো কথা বলিসনে, হাড় জ্বলে যায় শুনলে। বলে দপদপ করে পা ফেলে চলে গেল বিপত্তারিণী চায়ের দোকানটার দিকে। অর্থাৎ রতনের মায়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

কিন্তু রতনের মায়ের কোনো আপত্তি নেই। এমন বিয়ে তো কতই হয়েছে তাদের পাড়ায়। হবে না কেন? বিয়ের পর কেউ সরে গেছে, ঘর সংসার করেছে, আবার কেউ বিয়ে করেও ব্যবসা ছাড়েনি। রতন যদি বিয়ে করে এখান থেকে চলেই যায় তো কী অন্যায় হবে?

সুর্মা দেখতে একটু সুশ্রী ছিমছাম তাই এত আপত্তি বিপত্তারিণীর, তা বোঝে সবাই।

পর পর দিনকয়েক কান্নাকাটি ঝগড়া বিবাদ চলল। তারপর একদিন সকলের চোখের সামনে দিয়েই সুর্মা আর রতন চলে গেল।

ও-পাড়া ছেড়ে দিয়ে এসে বাসা করল। গলির মধ্যে নীচের তলায় একখানা ঘর, একেবারে বস্তির গায়ে।

নতুন ঘর-সংসার পাতার স্বপ্ন দেখল সুর্মা। রতনের উৎসাহও কম নয়।

রতনের মা এসে জোগাড়যন্তর করে দিয়ে গেল, উপদেশ দিয়ে গেল একরাশ। কিন্তু ফিরে গিয়ে সাতটা দিনও পার হল না। খবর পেয়ে ছুটে গেল রতন। কিন্তু তখন সব শেষ।

চায়ের দোকানটা নিয়ে বিপদে পড়ল রতন। গান শেখাবে, না দোকান দেখবে?

সুর্মা বললে, না। ও-পাড়ায় আর গান শেখানো হবে না।

রতন হাসল ঃ ও-পাড়ায় না শেখালে আর কোথাও কাজ পাব নাকি? ভদ্দর পাড়ায় অচেনা অজানা লোক রাখবে কেন?

সুর্মা বললে, তবে দোকানটা এদিকে কোথাও তুলে আন, দোকানের রোজগারে বেশ চলে যাবে।

রতন আপত্তি করলে ঃ চালু দোকান ছেড়ে দিয়ে এদিকে করলে চলবে কিনা কে জানে!

—চলবে, চলবে। সুর্মার কথাটাই যেন সবচেয়ে বড়ো যুক্তি।

বোঝাবার চেষ্টা করল রতন। বললে, ও দোকানটাই চালাই এখন, ধীরে ধীরে টাকা জমিয়ে এদিকে একটা শুরু করা যাবে। এ দোকানটা দাঁড়ালে তখন ও-পাড়ারটা তুলে দেব।

সুর্মার কিন্তু তাতে আপত্তি। যে পাড়াটাকে ও মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, যে জীবনকে ছেড়ে চলে এসেছে, তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রাখতে চায় না।

অনেক ভেবেচিন্তে রতন চলে গেল শেঠেদের সেই ছোকরাটির কাছে। গঙ্গাধরকে ও-পাড়ায় একদিন রতনই পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বড়োলোকের ছেলে, তিন-তিনটে বাড়ি, টাকার শেষ নেই। দু-একটা ভালো খবর-টবর দিলে দু-চার টাকা রতনকে দিত গঙ্গাধর।

বৈঠকখানায় বেরিয়ে এসে রতনকে দেখে গঙ্গাধর প্রথমটা তাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল, কোনো নতুন খবর-টবর।

গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবির হাতাটা সরিয়ে হাতে রিস্ট-ওয়াচের সোনার চেনটার কড়া লাগাতে লাগাতে গঙ্গাধর প্রশ্ন করলে, কী খবর রতন?

হাত কচলাতে কচলাতে রতন বললে, আজ্ঞে, খবর একটা আছে। বিয়ে করেছি।

— বিয়ে! তুই! আঁতকে উঠল যেন গঙ্গাধর।

বোকা-বোকা হাসি হেসে রতন বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই যে রাত-বিরেতে মদ বেচত বিপত্তারিণী, তার মেয়ে সুর্মা।

—হুঁ। বলে চুপ করল গঙ্গাধর। অর্থাৎ আরও কিছু শুনতে চায়।

রতন বললে, তা বউটার জন্যে ও-পাড়া ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। রোজগারপাতি নেই —

— তা আমি কী করব? গঙ্গাধর যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে।

রতন হাত কচলাতে কচলাতে বলে, কিছু টাকা দিতেন তো একটা চায়ের দোকান করতাম।

গঙ্গাধর তাকাল রতনের মুখের দিকে, কী যেন খুঁজল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, কোথায়?

- আজ্ঞে, আমার ওই বাসার সামনেই একটা ঘর আছে খালি, ওইখানেই করব ভাবছি।

- কত টাকা লাগবে?

রতন বললে, উপস্থিত একশো টাকা পেলেই —

কথা শেষ করতে দিল না গঙ্গাধর। বললে, ঠিক আছে, কাল গিয়ে ঘরটা দেখে আসব, তারপর —

-- আজ্ঞে, কখন আসব তাহলে?

বিনয়ে গলে পড়ল রতন। এত সহজে টাকাটা পেয়ে যাবে ভাবতেও পারেনি সে। তাই মনটা খুশি হয়ে উঠল। এত খুশি হল যে পরের দিন গঙ্গাধরকে দোকানঘরটা দেখিয়ে এনে একেবারে তার একতলার ছোট্ট ঘরখানার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল।

গাড়ির দরজা খুলে বললে, আজ্ঞে, একটু চা-টা খেয়ে যাবেন না?

— তাই চ। নেমে পড়ল গঙ্গাধর।

তারপর সুর্মাকে দেখল। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন ছিমছাম সুন্দর মেয়েটা এতকাল ও-পাড়ায় ছিল অথচ খবরটা দেয়নি রতন? মনে মনে একটু রাগও হল, একটু ঈর্ষাও হয়তো বা।

রতন পরিচয় করিয়ে দিল ঃ ইনি গঙ্গাধরবাবু, টাকা দিচ্ছেন তোমার সেই দোকান করবার।

ইনিই তাহলে টাকাটা দিচ্ছেন? কৃতজ্ঞতার চোখে তাকাল সুর্মা। বললে আপনাদের মতো লোক থাকতে আমাদের আর ভয় কী বলুন?

— না, না। গঙ্গাধর অন্তরঙ্গ স্বরে বলে ওঠে, আমরা থাকতে তোমাদের কোনো ভয় নেই।

ভয় নেই বলল বটে গঙ্গাধর, কিন্তু ভয় যেন বেড়ে গেল সুর্মার।

শেঠেদের এই ছোকরা বাবুটিকে দূর থেকে কয়েকবার দেখেছে সে এর আগে, ও পাড়ার অনেকে দু-একটা রসিকতাও করত গঙ্গাধরকে নিয়ে।

কিন্তু সামনাসামনি এই প্রথম দেখল সুর্মা। না, লোকটা ভালোই।

রতনের বন্ধু নিশ্চয়ই, তা না হলে দোকান করার জন্যে এতগুলো টাকা দিয়ে দেয়!

রতন ফিরে আসতেই সুর্মা বললে, বাবুটি লোক ভালো। তোমার বন্ধু বুঝি?

রতন বললে, হ্যাঁ, বন্ধু বলতে পার, অনেকদিনের। তবে খুব বড়োলোক তো। তাই একটু আপনি-আজ্ঞে করি, এই আর কী!

সুর্মা বললে, তা টাকা যখন দিচ্ছেন, দোকানটা ভালো করে চালাতে হবে।

বলে নিজেই উঠে-পড়ে লাগে সুর্মা। দোকানঘরের চুনকাম থেকে শুরু করে কাচের গেলাস কেনা পর্যন্ত সব-কিছু নিজে দেখেশুনে করে দেয়।

প্রথম প্রথম নিজেও দোকানের দু-একটা কাজ করেছিল, খদ্দেরগুলো বড়ো বেশি খিদে-খিদে চোখে তাকায় বলেই পর্দার আড়ালে চলে গেল সুর্মা।

ও যেখানে মানুষ হয়েছে সেখানকার মেয়েরা কারও চোখকে ভয় পায় না। কিন্তু সুর্মা যে সে জীবনটাকে ভুলে যেতে চায়।

সুর্মা বোধহয় সত্যিকার ভালোবেসে ফেলেছে রতনকে। এমনভাবে ভালোবেসে ফেলেছে যে অতীতের আতঙ্ক দেখলেই ভয় পায়। সব ভুলে গিয়ে ও নতুন করে ঘরসংসার বাঁধতে চায়। সুখী হতে চায় শুধু রতনকে নিয়ে।

চায়ের দোকানটায় লাভ কিন্তু তেমন হয় না। একটু একটু করে ধারের অঙ্ক বেড়ে ওঠে আর একটু একটু করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে গঙ্গাধর।

মাঝেমাঝেই আসে সে রতনের বাড়িতে। আর সুর্মাও বেশ বুঝতে পারে কার টানে ছুটে আসে গঙ্গাধর। দোকানের ভালোমন্দ নিয়ে সুর্মার সঙ্গে. রতনের সঙ্গে এমনভাবে আলোচনায় মেতে ওঠে গঙ্গাধর, যেন তারই দোকান, যেন লাভ লোকসানের ওপর তার ভবিষ্যতও নির্ভর করছে। প্রথম প্রথম কোনো সন্দেহ হয়নি সুর্মার। রতনের বন্ধু, টাকা ধার দিয়ে রতনকে দোকান করে দিয়েছে, ভয় পাবার কারণ নেই। আর ভয় সত্যিই কাউকে পায় না সুর্মা। নিজের ভালোমন্দ নিজেই বোঝে। বিরক্ত হয়ে ও যার দিকে তাকায় তার সাধ্য নেই ফিরে তাকাবার। আসল ভয় রতনকে। কখন কী ভুল বোঝে।

সুর্মা জানে. ও ও-পাড়ার মেয়ে। ওর মা সারা জীবন ব্যবসা করেছে।

ছেলেবেলা থেকে সকলকেই ব্যবসা করতেই দেখেছে ও। তাই ওর সব সময়ে ভয়, রতন না ওকে ভুল বোঝে, ওকে অবিশ্বাস করে। ভুল বোঝা অসম্ভব নয়, অবিশ্বাস করারই কথা। তবু সুর্মা যে অন্য ধরনের. অন্য জাতের মেয়ে তা রতন বুঝবে কী করে!

এদিকে ঘন ঘন যাতায়াতের ফাঁকে গঙ্গাধর যেন কেমন কেমন চোখে তাকায় তার দিকে। যেন ইশারায় ইঙ্গিতে কী বলতে চায়।

এক এক সময় রাগ হয় সুর্মার। ইচ্ছে হয় তার মুখের সামনে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে। পারে না। কেমন একটা সঙ্কোচ

দু একদিন ভেবেছে রতনকে বলবে, তোমার বন্ধু লোক ভালো নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি। কী জানি. যদি রতন তারই দোষ দেখে! যদি ভাবে, ও পাড়ার মেয়ে. তার আবার এত সতী-সতী ভাব কেন!

অনেক ভেবেচিন্তে শেষপর্যন্ত আর বলতে সাহস পায়নি। আর বলেনি যে, ভালোই করেছে।

চায়ের দোকানটা আর চলে না। রেখে লাভ নেই। শুধু ধারের অঙ্কই বেড়ে চলেছে। আর যতই ধার বাড়ে ততই গঙ্গাধরকে ভয় পায় সুর্মা।

রতনকে বলে, ও দোকান তুলে দাও তোমার। অন্য কিছু চেষ্টা কর।

হাসে রতন। অনেক কিছু স্বপ্ন দেখেছিল ও। সুর্মাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে ভেবেছিল।

এদিকে একটা ছেলে আসছে সুর্মার কোলে। কিন্তু সুর্মার চেহারায় সে জলুস নেই। চোখ দুটো যেন বসে যাচ্ছে ক্রমশ। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারা হয়ে গেছে তার।

সবই দেখতে পায় রতন। দেখেও কিছু করবার নেই।

বলে, ও পাড়াতেই ফিরে যাও সুর্মা, তোমার মায়ের কাছে।

ক্রুদ্ধ চোখ তুলে তাকায় সুর্মা। যেন সম্ভব হলেই দৃষ্টি দিয়ে পুড়িয়ে ফেলত সে রতনকে। তিল তিল করে যদি না খেয়ে মরতেও হয় তবু ও পাড়ায় ফিরে যাবে না সুর্মা। ওদের হাসি-ঠাট্টা, বিপত্তারিণীর শ্লেষ সহ্য করতে পারবে না বলেই কিনা কে জানে! হয়তো তা নয়। ওই জীবনটাই পছন্দ নয় তার। ওই জীবনের চেয়ে মৃত্যু ভালো।

নতুন বাসাটায় উঠে এসে সেই সত্যটা যেন নতুন করে চোখে পড়েছে তার। আশপাশের পাঁচটা বাড়ির বউ-ঝিদের সঙ্গে দেখা হয়, গল্প করে। দুপুরে দু-একজন বেড়াতে যাবার জন্যে ডাকে।

নানান উপদেশ দেয় তারা। এ সময় কী খাওয়া উচিত, কোন্‌টা উচিত নয়। তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এক-এক সময় সুর্মা ভুলে যায় যে. সে এ পাড়ার লোক নয়, অন্য পাড়ার। ভুলে যায় যে এত অন্তরঙ্গতা, এত হাসিঠাট্টা সব বন্ধ হয়ে যাবে এক মুহূর্তে. যদি কেউ জানতে পারে এ জীবনের অধিকার নিয়ে সে জন্মায়নি।

এখানে যেন অনেক বেশি আনন্দ, অনেক বেশি মর্যাদা। তাই এই জীবনটার ওপর এতখানি লোভ তার। তাই ফিরে যেতে বললেই চটে যায় সুর্মা।

বলে, না-খেয়ে মরব, তবু —

হাসে রতন। দুর্বল অসহায় মানুষের মতো হাসে।

কী করবে বেচারি! সুর্মা বোঝে দোষ রতনের নয়। দোষ ভাগ্যের। যে ভাগ্য নিয়ে এসেছিল ও, সে পথ থেকে সরে আসতে গিয়েই তো এমন অবস্থা।

গঙ্গাধর আসে। বলে, অন্য কিছু ব্যবসা শুরু কর্ রতন — কথার সঙ্গে একটু ইশারাও ছুঁড়ে দেয়।

জোড় হাত করে রতন। বলে, ও-কথাটা বলবেন না আজ্ঞে, সুর্মা ও-লাইনে যেতে দেবে না।

কিন্তু কোন্ লাইনে যে যাবে তা ঠিক করতে পারে না রতন। দিনকয়েক একটা ছাপাখানায় কাজ পায়। তারপর আবার বেকার। এটা-ওটা ব্যবসা করার চেষ্টা করে।

এমনিভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে চলে। এদিকে দু-দুটো ছেলে হয়েছে সুর্মার।

চেঁচায় আর কাঁদে ছেলে দুটো। খিদের জ্বালায়।

সুর্মার চেহারাও একেবারে শুকিয়ে কালি হয়ে গেছে। মেয়েছেলে বলে মনেই হয় না।

গঙ্গাধর মাঝে মাঝে আসে। খোলাখুলিই বলে, আমার কাছে থাক তো বল সুর্মা, সব ব্যবস্থা করে দেব।

বিরক্ত হয়, ভয় পায় সুর্মা। কিন্তু রাগে না। রাগবার মতো শক্তিটুকুও যেন নেই তার!

হাঁপাতে হাঁপাতে কোনো রকমে বলে, আপনি আসবেন না আর, আসবেন না এখানে।

তবু রতনকে কিছু বলতে পারে না সুর্মা। বলতে পারে না, তোমার বন্ধুটিকে আসতে বারণ করো।

বললেও বারণ করতে কি পারত রতন? সে সাহস কোথায় তার, সোজা হয়ে দাঁড়াবার জোর কোথায় শরীরে?

রতনের নিজেরই মাঝে মাঝে মনে হয়, সুর্মাকে বিয়ে করে তাকে ও-পাড়া থেকে নিয়ে এসে ভুল করেছে সে। তা না হলে হয়তো গঙ্গাধরের মতোই কারও কাছে থাকতে পেত সুর্মা, কিংবা তার মা বিপত্তারিণীই সব বিপদ তাড়াত।

ক্রমশই যেন ভেঙে মুষড়ে পড়ে রতন। সুর্মা তবু মনে জোর আনতে চায়। রতনকে খুশি করার জন্যে এক-একদিন পুরনো হারমোনিয়ামটা টেনে এনে গান গাইতে বলে।

গান গায় রতন। কিন্তু সে গলা নেই। তবু সেই পুরনো দিনের রেশটা মনে পড়ে যায়। মুগ্ধ হয়ে শোনে সুর্মা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্বপ্নে-ঘেরা মধুর দিনগুলো -- যখন গান শেখাত রতন আর শিখত সুর্মা।

এমনিভাবে চলছিল দিনগুলো।

তারপর হঠাৎ একদিন ফিরল না রতন।

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল সুর্মা। ভাবল, কোথাও কোনো কাজে আটকে পড়েছে। হয়তো কাজ পেয়েছে কোনো।

সে-রাতটা আশায় আশায় কাটল। কিন্তু পরের দিনও ফিরল না রতন। পরের পরের দিনও।

এমনি করে আশায় আশায় রতনের পথ চেয়ে দিনের পর দিন কেটে গেল। রতন আর ফিরল না।

কেউ ভাবলে, গাড়িচাপা পড়ে মারা গেছে। কেউ ভাবলে, বউকে ফেলে পালিয়েছে।

ও-পাড়ায় বিপত্তারিণীর কাছেও কী করে যেন খবর পৌঁছে গেল।

ও-মেয়ের আর মুখ দেখবে না ভেবেছিল সে, তবু মেয়ের বিপদের কথা শুনে এল দেখা করতে।

বললে, ফিরে চ সুর্মো।

সুর্মা হাসল। বলে, যাবার হলে অনেক আগেই যেতাম। তুমি ফিরে যাও। আমি না খেয়ে মরব, তবু —

সেই এক প্রতিজ্ঞা।

উপায় না দেখে গালাগালি দিতে দিতে চলে গেল বিপত্তারিণী।

বিপত্তারিণী যেতে না যেতে বিপদ নিজেই এসে হাজির হল।

গঙ্গাধর এসে বললে, আমার কাছে থাকবে তো চল সুর্মা, রতন আর ফিরবে না।

হাসল সুর্মা। বললে, আপনার বাড়িটা তো চিনি। যাবার হলে আমি নিজেই গিয়ে হাজির হব। বলে গঙ্গাধরকে বিদেয় করে দিল সুর্মা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল না সে। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখল ছোটো ছেলেটা নড়ছে না। বুকে হাত দিয়ে টের পেল না কিছু।

তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল সুর্মা। বুঝতে পারল ছেলে তার নড়বে না। না-খেয়ে আর আধপেটা খেয়ে মরে গেছে ছেলেটা।

মরে গেছে?

চোখ মুছল সুর্মা। তারপর বড়ো ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল একেবারে গঙ্গাধরের বৈঠকখানায়।

ঠিক এমনিভাবেই একদিন রতন এসে দাঁড়িয়েছিল। আর এমনিভাবেই ঘড়ির চেনটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে এসে দাঁড়িয়েছিল গঙ্গাধর।

সুর্মাকে দেখে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল গঙ্গাধর। ঠিক এমনটি যেন কোনোদিনই আশা করতে পারেনি।

সুর্মা হাসল ম্লানভাবে। বললে, এলাম।

খুশি হয়ে উঠল গঙ্গাধর। এ মেয়েটা একদিন তার মনে নেশা ধরিয়েছিল। তখন রূপ ছিল সুর্মার। কিন্তু রূপ হারিয়েও দারিদ্র্যের মধ্যেও মেয়েটা কীসের জোরে সব লোভ জয় করেছিল ভেবে পায় না গঙ্গাধর। যে বার বার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তার রূপ নেই আজ, তবু তাকেই হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয় না।

সুর্মা বললে, আমাকে নয়, আমার ছেলেকে বাঁচান।

সুর্মাকে আশ্রয় দিল গঙ্গাধর। দিল যা কিছু চাইতে পারে সুর্মা, যা কিছু বাসনা।

এতদিন শুধু ভালোবাসার স্বপ্ন দেখেছিল সুর্মা। এবার দেখতে পেল ঐশ্বর্যের সুখ।

এমনি করেই বছরের পর বছর কেটে গেল। চেহারা বদলে গেল সুর্মার। বিলাসে বৈভবে সারা দেহে তার নতুন করে যৌবন এল যেন। আর সেই যৌবনকে বিকশিত করে তুলল গঙ্গাধরের ঐশ্বর্য। জড়োয়া গহনায়, বহুমূল্য বসন ভূষণে অপ্সরীর রূপ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে একদিন থমকে দাঁড়াল সুর্মা।

- কে? রতন?

রতন কিন্তু তখনও যেন চিনতে পারছে না সুর্মাকে। এই তার সুর্মা? এমন রূপ তার?

অথচ রতনের চেহারা শীর্ণ ভিক্ষুকের মতো। নোংরা শতচ্ছিন্ন কাপড়। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উশকোখুশকো চুল, চোখ দুটো পাগলের মতো ঘোলাটে।

রতন চাপা গলায় বললে, হ্যাঁ সুর্মা।

নিজের ঘরে নিয়ে গেল সে রতনকে, বললে, এস, আমার ঘরে এস।

সুর্মার ঘরে ঢুকল রতন, সঙ্কোচের সঙ্গে। তাকাল চারপাশের দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে, দামি দামি আসবাবপত্রের দিকে।

বললে, সুর্মা, এ সব তোমার? এ-সব?

— হ্যাঁ। বিষণ্ণ হাসল সুর্মা।

রতন ধীরে ধীরে বলল, আমি সব দেখেছি সুর্মা, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি।

সুর্মা প্রশ্ন করে, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি এতদিন? কেন ফেলে গিয়েছিলে আমাকে?

চুপ করে থাকে রতন, দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। বলে, তোমার জন্যেই গিয়েছিলাম সুর্মা, ভেবেছিলাম, যেমন করেই হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর এসে নিয়ে যাব তোমাকে —

সুর্মার চোখ দুটোও চিকচিক করে উঠল।

বললে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে না কেন?

-- অনেক কষ্ট, সে অনেক দুঃখ সুর্মা। কিন্তু পারলাম না, এত চেষ্টা করেও পারলাম না। কান্নায় ভেঙে পড়ে রতন।

হঠাৎ রতনের পিঠে হাত রাখল সুর্মা। বললে, ভেঙে পড়ো না। শোন —

মুখ তুলে তাকাল রতন। বললে, চলে যাবার আগে একবার ছেলেটাকে দেখে যেতে চাই সুর্মা। দেখাবে?

ম্লান হাসি হাসল সুর্মা। সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল। তারপর বললে, শোন, চল, আমাকে নিয়ে চল। আবার জীবন শুরু করব আমরা, নতুন করে চেষ্টা করবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার।

— যাবে, যাবে সুর্মা? কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না রতনের। এমন নির্ঝঞ্ঝাট, এমন আরামের জীবন ছেড়ে সত্যিই যাবে সুর্মা?

— হ্যাঁ, যাব। যাব আমি।

উঠে দাঁড়ায় সুর্মা। তারপর দ্রুতপায়ে ভিতরে চলে যায় : বোস তুমি। এখনই যাব, যাব তোমার সঙ্গে।

বিস্মিত হয় রতন। মনে মনে খুশি হয়। এত ভালোবাসা? এত গভীর টান তার ওপর?

না, রতন আবার দাঁড়াবে, আবার —

সুর্মার এত টাকা, এত অলঙ্কার, এই মূলধন নিয়ে আবার ব্যবসা শুরু করবে সে, জীবন শুরু করবে। সুখী হবে। নানা কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে রতন। আনন্দে ফুরফুর করে ওঠে তার মন।

—চল।

সুর্মার কথায় চমকে চোখ তোলে রতন। ছেলের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছে সুর্মা।

দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নেয় রতন, কিন্তু পরমুহূর্তেই সুর্মার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে চমকে ওঠে। এ কী! সমস্ত গহনা খুলে ফেলেছে সুর্মা, পোশাক বদলে এসেছে। একখানা সাদাসিধে শাড়ি আর দু হাতে শাঁখা।

সুর্মা আবাব বললে, চল।

বিস্মিত হল রতন : কিন্তু তোমার গায়ের গয়নাগুলো কী হল সুর্মা? তোমার জিনিসপত্তর?

হাসল সুর্মা : দুঃখ-কষ্টকে তো আমি ভয় পাই না। যত দুঃখই পাই, যত কষ্ট হোক, তোমার সঙ্গেই চলেছি, এই তো সবচেয়ে বড়ো সুখ।

– কিন্তু —কিন্তু সুর্মা, তোমাব টাকা, তোমার গয়না এসব না দিলে কী নিয়ে ব্যবসা করব, কী করে দাঁড়াব আবার?

হঠাৎ যেন চিৎকার করে উঠল সুর্মা। বললে, না না, যে আমাকে সব দিয়েছে, তাকে তো কিছুই দিইনি আমি। কী দিয়েছি? না, না, তার দেওয়া কোনো কিছুই আমি নিয়ে যেতে পারব না—পারব না।

— পারবে না? কেমন যেন বিরক্ত হল রতন।

অট্টহাসি হেসে উঠল সুর্মা : না, পারব না, পারব না। যে আমাকে বিশ্বাস করে সব দিয়েছে, আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছে, তার দেওয়া একটা কানাকড়িও আমি নিতে পারব না।

রতন স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সুর্মার মুখেব দিকে।



বিষের ঝাড়



সমরেশ বসু

মান্ধাতার আমলের পুরনো নোনাধরা দোতলা বাড়িটা পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে এমনভাবে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ার মুহূর্তে হঠাৎ ঠেকো দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। বাড়িটা পুবমুখো। সেদিকের দরজার ঠিক মাথার উপর দিয়ে একটা অশ্বত্থের শিকড় বাড়িটার একটা পাশ দীর্ঘদেহ অজগরের মতো বেড় দিয়ে সেই পশ্চিমে ডালপালাপত্রপল্লবে ঝাঁকড়া হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। বাদবাকি একটা অংশ ভেঙেচুরে স্তূপ হয়ে উঠেছে যেন আধলা ইটের। বাড়িটার চারপাশ ঘিরে আছে আগাছা জঙ্গলে আর বড়ো বড়ো আম-জামের ছায়ায় কেমন একটা ভূতুড়ে অন্ধকার থমথমিয়ে আছে। পুবদিকের ভাঙাচোরা ফাটল-ধরা রকটা ছাগলনাদিতে ভরা। সদর দরজাটার সামনেই একগাদা গোবর। আগাছার মাঝখান দিয়ে একটা সরু পথ দরজা থেকে পাড়ার গলিপথটায় গিয়ে মিশেছে।

সন্ধ্যা প্রায় ঘনায়। বাড়িটার রূপ বদলায়। ঝুপসিঝাড়ের কোল থেকে অন্ধকার গলে গলে পড়ে বাড়িটাকে ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে।

মনে হয় বাড়িটাতে মানুষ নেই। অথচ পোড়োবাড়ির মতো বাতাস এখানে হাহাকার তোলে। নৈঃশব্দ্য নিরেট নয়, যেন ছটফট করছে। সেই ছটফটানি টের পাওয়া যায় আচমকা শিশুকণ্ঠের দুর্বোধ্য স্বরে কিংবা যেন হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে আসা কিশোরী গলায় গানের সুরে আর সেই সুরের কোনো বৈচিত্র্য নেই। একই সুর, একই কথা। ... ধনধান্যেপুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা—

সদর দরজার চৌকাঠ আছে, পাল্লা নেই। সেই দরজা দিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল হারাধন চক্রবর্তী, এ বাড়ির বাসিন্দা। মালিক নয়, ভাড়াটিয়া। মালিকেরা চার শরিক, চার মুলুকে থাকে। মাঝে মাঝে তারা এসে তম্বি করে হারাধনের উপর এবং যাওয়ার সময় শুনিয়ে যায়, দাঁড়াও মামলাটা হোক, তখন তোমাকে দেখব। কিন্তু মামলা আর তাদের হয় না, সেজন্য কোনো গতিও হয় না ভাগের মায়ের। সেই পড়ে-থাকা ভাগের মায়ের কোল আঁকড়ে পড়ে আছে হারাধন। দুই পুরুষের ভাড়াটে তারা। এক পুরুষ ভাড়াটা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে গেছে, কারণ তখন চার শরিকের একটা বাপ ছিল। শরিক বলেই কথা নয়, হারধন ভাড়া দিতে পারে না। সে বলে, মুরোদ বড়ো মান, তার ছেঁড়া দুটো কান। মামলা হয়ে যদি কোনো বিলিব্যবস্থা হয়ে যায়, তবু ওই চার শরিকের বাড়িটা ভাগাভাগি করে গড়তে হবে তো! সে হবেও না আর এ বাড়ি না ধসলে আমারও ছেরাদ্দ হবে না। এ সব বৈষয়িক বিষয়ে হারাধন মাথা ঘামায় না।

দরজার মুখে পিছল মাটির উপর গোবর দলাটা দেখেই খিঁচিয়ে ওঠার মতো তার এক পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল, হিংস্র জানোয়ারের যেমন সামান্য বিরক্তিতে ভয়ংকর দাঁতগুলো একবার চমকিয়ে ওঠে। তা ছাড়া হারাধনের সিংহরাশি কি না জানা নেই, চেহারার মধ্যে পশুপতির ছাপ আছে খানিকটা। তবে উপবাসী এবং সেইজন্য খেপাটে পশুপতি। দাঁত খিঁচিয়েই আছে। শক্ত মতো হাড়ের চওড়া শরীর, লম্বাও নেহাত কম নয় কিন্তু মাংস নেই। তার মাঠের মতো পাথুরে পথটার ঠিক মাঝখান থেকে সূক্ষ্মাগ্র তিরের মতো উঠে সারা মাথায় সিংহের পাকানো কেশরের মতো চুল ছড়িয়ে পড়েছে। এককালে এ চুল কালো ছিল। এখন হয়েছে খানিকটা মেটে আর জায়গায় জায়গায় পাক ধরে সাদা কালোর মাঝামাঝি ধোঁয়া ধূসর বর্ণ। নাকটা মন্দ ছিল না কিন্তু নীচের দিকে একেবারে থ্যাবড়া হয়ে গেছে। চোখ দুটো সামান্য গোলাকৃতি, তাতে গাছের শিকড়ের মতো লাল ছড়ের ছড়াছড়িতে কিছুটা হিংস্র হয়ে উঠেছে। অনবরত কুঞ্চনের ফলে ঠোঁটের ডান পাশটা কুঁচকে বেঁকেই থাকে। শরীরটা সব সময়েই ঝুঁকে থাকে সামনের দিকে। পরিশ্রম হলে তো কথাই নেই তখন এই চার শরিকের বাড়িটার মতো হারাধনকেও মনে হয় মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়ে কোনো রকমে চলেছে। আর এই হারাধন, যার আঠারো-

বিশে হয়তো শরীর ছিল সটান, আজ তার জঙ্ঘা থেকে ঠ্যাং দুটো নেমেছে যেন পাকা বাঁশের বাঁকা গোড়া। গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকলে দু পায়ের মাঝখানে একটা বিরাট ফাঁক থেকে যায়। বয়স মাত্র চল্লিশের কোঠা ধরব ধরব করছে। এই হল হারাধন চক্রবর্তী। সব নয়, চেহারায়। কাজের মধ্যে গল্প, সর্বদর্শন, এবং ডাক্তারি। হ্যাঁ, ডাক্তারিটাই প্রধান। ডাক্তারিও আজব। সৃষ্টিছাড়া। তার কোনো ডিসপেনসারি নেই, তার ঘরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না একটা ওষুধের শিশি বা কোনো সরঞ্জাম। সে তো অনেক দূরের কথা, ঘরের মানুষের রোগে এক ফোঁটা ওষুধ কেউ হারাধনকে হাতে করে আনতে দেখেনি। কোনো রোগীকে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়নি আজ অবধি ওই চার শরিকের ফাটা ভাঙা রকের উপর, হারাধন ডাক্তারের অপেক্ষায়। তার জীবনে সে কারও নাড়ি দেখেনি, দেখেনি জিভ চোখ বা পেট টিপে। তবু হারাধন ডাক্তার। পাড়ার ফক্কড় ছোঁড়াগুলি বলে, ডবল এম বি, ডাক্তার বলেন, ব্যাটা আমেরিকা ঘোরা ভি-ডি স্পেশালিস্ট। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার নন্দদুলাল বলেন, মরা হ্যানিমানের ভূত হারাধন। ওর জুড়ি নেই। বলেই অবশ্য তাড়াতাড়ি জরি দিয়ে বোনা হ্যানিমানের কোটের কলারের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন হাত জোড় করে। অর্থাৎ হ্যানিমানের আত্মা যেন ক্ষুণ্ণ না হন।

আর হারাধন মাঝে মাঝে চৌমাথার জনারণ্যের ভিড়ে কিম্বা দু-ধারে কারখানার উঁচু পাঁচিলের আড়াল-করা শহরের পাকা সড়কে আচমকা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায় দেড় ফুট ঠ্যাং ফাঁক করে। ঠোঁট কুঁচকে মনে মনে বলে, এঃ সত্যি সত্যি ডাক্তার হয়ে গেছি!....

তারপব ঘাড় ফিবিয়ে তাকায় ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসের চিমনি চারটের দিকে, আশেপাশের কারখানা বাড়িগুলো দিকে। দুনিয়াজোড়া মানুষ এসে একটা গতি করে নিয়েছে এখানে কিন্তু তার সামনে সমস্ত ফটক বন্ধ হয়ে গেছে কেবলি। বাপ ছোটোকাল থেকে যজমানের বাড়ি নিয়ে নিয়ে ঘুরেছে। ছেলেকে একটি অকালকুষ্মাণ্ড করে দিয়ে মরেছে। সে বলে, শালা মন্তর বলাটাও ভালো করে শিখিয়ে দিয়ে যায়নি। যজমানি করা দূরের কথা, হপ্তার নারানপুজোটার জন্যও কেউ ডাকে না। দুটো চালকলা এলেও বা...। না, সে তার জীবনের প্রথম দিকেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বাপের মৃত্যুর পর যজমানেরা ডেকেও জিজ্ঞেস করেনি। বলেছে, বামুনের ঘরের আকাট। ও কোযাকুষিতে হাত দিলে তা অপবিত্র হবে।

গোবর দলাটার দিকে আর একবার দেখে সে উপরের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন ডাকতে উদ্যত হয়ে থেমে গেল। তাব কানে এল সেই গানের কলি, ধনধান্যে পুষ্পে ভবা...নিজেই সে উবু হয়ে তাড়াতাড়ি খাবলা খাবলা গোবর হাতে তুলে নোনা-ধরা ইটের গায়ে চাপটি মেরে দিল। বাড়ির পেছনে পানাপুকুরটায় হাত ধুয়ে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে চলতে শুরু করল বড়ো রাস্তার দিকে। আশেপাশে দেখে না, সামনে মুখ তোলে না। দূর থেকে দেখে মনে হয় পিঠে বোঝা নিয়ে বুঝি একটা মানুষ আসছে।

আশপাশ থেকে নানান কথা ছিটকে আসে ওকে উদ্দেশ করে। উৎকট এবং কুৎসিত সব মন্তব্য। সিনেমার ধারের চা-খানাটার কাছ থেকে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—

হারাধনের দশটি রোগী, ঘোরে বাজারময়
একটি মল গরমি রোগে রইল বাকি নয়।

হারাধন নির্বিকার। কোনোদিকে দৃকপাত না করে রোজকার মতো লাইটপোস্ট গুনতে গুনতে এগোয় সে। সতেরো, আঠারো .... তেত্রিশটা হলেই ডানদিকের অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এমনি সে রোজ। কেমন করে যেন এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বোধ হয় সামনে তাকায় না বলেই।

অচেনা লোককে হঠাৎ হকচকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় গলিটার মোড়ে। মনে হয় একটা অন্ধকার গুহা, তার মধ্যে দূরে দরে কতকগুলি জোনাকি জ্বলছে পিট-পিট করে। আর অশরীরী ছায়ার মতো যেন কারা ঘোরাফেরা করছে সেখানে, ভিড় করে আছে কারা সারবন্দি হয়ে গুহার গায়ে পাথরের মূর্তির মতো। নিঝুম নয়। হাসি, গান, গল্প, মারধোর, কান্না, হাঁক, হল্লা, কী নেই। তবু যেন হাওয়া নেই, আকাশ নেই গলিটার মাথায়। রুদ্ধশ্বাস, দমবন্ধ, পাথরের দিকে ঠেসে ধরতে চাইছে।

'সেলাম হো ডগদরবাবু।' জং-ধরা গলায় প্রথমেই একজন অভিনন্দন জানায় হারাধনকে।

লোকটাকে এ মহল্লার মালিক বলা চলে। মোষের মতো বিশাল কালো লোমশ চেহারা, গলায় সোনার সরু চেন, কানে দুটো সোনার মাকড়ি।

হারাধন সে কথার জবাব না দিয়েই এগুল।

মাতাল মেয়ে-গলার বেসুরে গান এক কলি শোনা গেল—

প্রেমের বাজারে যাব লো সজনী,
দেখেশুনে আনব কিনে প্রেমের পশরাখানি।....

কে একজন মুখ জিভ দিয়ে তবলা বাজিয়ে উঠল, তাক্ ডিমা ডিম্।...

শ্লথগতি হয়ে এল হারাধনের। দাঁতে দাঁত চেপে প্রায় ভেংচে উঠল চাপা গলায়, 'প্রেমের পশরাখানি!'

'বাউনবাবা নাকি গো', একটা মধ্যবয়সি মেয়েমানুষ রকের উপর হারাধনের কাছে এসে দাঁড়াল। 'এই তোমার জন্যেই বসে আছি। সময় আর তোমার হয় না আজকাল।'

সামান্য আলোর একটা রেখা পড়েছে হারাধনের মুখে। মুখটা তার আরও বিকৃত হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো তীক্ষ্ণ, খোঁচা খোঁচা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র জন্তুর মতো। বলল, 'কেন, এখনও তো মরোনি, তবে এত তাড়াতাড়ি কেন?'

'উর্বশী নাচুনির বোন না আমরা? আমাদের কি মরণ আছে?' মোটা গলায় হাসল মেয়েমানুষটি।

'তবে আর তাড়া কীসের। তোদের না মেরে তো আমি মরছি না।' বলে হারধন লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফাঁক করে এগুল সামনের অন্ধকারের দিকে।

'কী হল, আসবে না?' মেয়েমানুষটি আবার বলল।

'আসছি, পুতুলের ঘরটা ঘুরে।'

আশপাশ থেকে অনেক মেয়েই বাউনবাবাকে ডেকে ডেকে ওঠে, অকারণ দুটো কথা বলে জবাবের প্রত্যাশা না করে। যে সব পুরুষেরা ভিড় করেছে, তাদের কেউ কেউ মুখ লুকোবার চেষ্টা করছে হারধনকে দেখে, কয়েকটা পাড়ার ছোকরা ছুটে পালায় এ-দিক ও-দিক দুড়দাড় করে।

হারাধন এপাড়ায় বাউনবাবা বলে পরিচিত, আসলে এখানেই সে ডাক্তারি করে। সে কয়েক বছর আগের কথা, হারাধনের তখন ছ-মেয়ের পর একটি ছেলে হয়েছে। তার বিশিষ্ট বন্ধু, ইতর শ্রেণির মহাপুরুষ বলে যার খ্যাতি সেই পরান ভট্চায এসে বলল, 'দেখ্ হেরো, কারখানার দরজা ধাক্কিয়ে তো সেই মন্দিরের দরজা খুলতে পারলিনে, মাঠের ঘোড়াও তোকে খালি ল্যাং মেরেই গেল আর বড়ো বড়ো কথা বলে কার পেট ভরাবি? তার চে এক কাজ কর। ছুঁচ ফুঁড়তে পারবি?

হারাধন প্রথমটা ঠাওর করতে পারেনি। বলেছিল, 'ছুঁচ ফুঁড়ব মানে?'

'মানে ডাক্তারি করতে হবে'। বলে পরান ভট্চায বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, বাজার ঘরের মেয়েদের তো চিকিৎসার কোনো বালাই নেই। অথচ সবগুলোই ব্যামোতে ভোগে। ওদের যারা কর্তা, তারা রোজের টাকাটা উঠিয়ে খালাস। কে মরল বাঁচল সে-সব ওরা দেখে না। তা মেয়েগুলোর তো আর রোগ পুষে রাখা চলে না, রোজগার করতে হবে যে! লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু পয়সা ওরা রেখে দেয়, সেটা দিয়ে ওরা ওষুধ কেনে। তবে কর্তারা তা জানে, বিশেষ কিছু বলে না। আর বাজারের ডাক্তারদের খাঁই মেটানো ওদের পক্ষে সম্ভবও নয়। আমি ওদের বুদ্ধি দিয়েছি, তোরা পয়সা দিয়ে বাপু ওষুধগুলো কিনে আনিস, আমি ফুঁড়ে দেব। যা হয়, দিস্ আমাকে, আর যদ্দিন পারিস রোগ সারিয়ে বেঁচে থাক। তা ফলটা কিছু খারাপ হয়নি রে। তবে বাজার সবখানেই মন্দা, খদ্দের আছে কাঁড়ি কাঁড়ি, পয়সা নেই। ছুঁচ ফোঁড়াও কিছু খারাপ নয়, লক্ষণটা একটু বুঝে নেওয়া। সে দু-একদিন দেখলেই হয়ে যাবে। বাজারের ডাক্তারে তাও দেখে না।'

হারাধন প্রথমটা পরান ভট্চাযের কথা বিশ্বাস করতে পারেনি, খোঁচা খোঁচা দাঁতগুলো বের করে হাসবার চেষ্টা করেছিল পরানের রসিকতায়। কিন্তু পরান রসিকতা করেনি। রেগে বলেছিল, 'তবে ঘরভরা মা-ষষ্ঠীর কৃপা নিয়ে বসে থাক। ঘোড়ার লাথি আর পাঁচজনের ভিক্ষেতে শালা পো-পেটা পড়ে থাক্‌গে। ব্যাটা বামুনের ঘরের আকাট হয়েছিস, বেশ্যার ডাক্তার হতে পারবিনে?'

সত্যি, ঘোড়া ঠিক দৌড়াতে পারলে ভাগ্য ফেরে, তার ল্যাং খাওয়া যায়। গয়লার ছেলে কেনোও একটু চা দিতে হলে জাত নিয়ে গালাগালি দেয়। কেউ কেউ তাকে দু-চার আনা পয়সা দিত, যাদের ঘোড়ার টিপ্ ধরে দিত সে। যারা পেয়েছে এক-আধবার, তারা হারাধনকে একটু ভালো নজরেই দেখে। তা ছাড়া মিছে মামলার

হকদার সাক্ষী সে বাঁধা, সত্য বই মিথ্যা না বলবার প্রতিজ্ঞা বোধ করি তার জীবনের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল। তবু বড়ো মানুষ ছোটোজাতের যজমানি হারাধন নেয়নি। বামুনে শুয়োরের ব্যবসা করে, তা বলে রাঢ়ী কখনও বারেন্দ্র হয় না, নিজেকে ভঙ্গ করে। আর খিদের সময় নিজের সন্তানদের কাড়াকাড়ি, বাপ হয়ে বাটপাড়ি, তার ফাঁকে ফাঁকে বউয়ের মাটির পুতুলের মতো চোখজোড়ার বিচিত্র অবাক অলস চাউনি, এ-সব ভেবে গয়লা কেনোর আর না চাওয়ার দিব্যি দেওয়া চা গিলে সে উঠেছিল এসে পরান ভট্চাযের কাছে।

সেই থেকে শুরু। পরান ভট্চায সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে কবে কোথায় উধাও হয়ে গেছে, রয়ে গেছে হারাধন। মেয়েরা পরানকে বলত ভট্চায, কেননা সে ছিল তাদের বন্ধু। হারাধন বন্ধু হয়েও বাপ হয়েছে। তাই সে হয়েছে বাউনবাবা।

এখনকার বস্তির বাইরে থেকে ভেতরটা বোঝা যায় না। সেখানে আছে অনেকগুলো হ্যারিকেনের আলো, একটা লম্বা-চওড়া কাঁচা উঠোন, তার মাঝখানে তুলসীমঞ্চ ও ছোদ ফো· ড়ের মধ্যে জ্বলছে সন্ধ্যাপ্রদীপ। বাইরের চেয়েও বেশি লোক, বেশি হল্লা-হাসি-গান। চারপাশ জুড়ে ঘর।

উঠোনটা ভেজা ছিল। তার উপরে একটা মাতাল পড়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর গান গাইছে।

প্রথম প্রথম এ-সব দেখেছে হারাধন। এখন দেখা দূরের কথা, মনেই থাকে না। সে দেখে খালি মেয়েগুলোকে, চেনে মেয়েগুলোকে, কথা বলা কেবল ওদেরই সঙ্গে এবং কোনো দিনও হেসে কথা বলেনি। যেটা হাসি বলে মনে হয়েছে সেটাকে দাঁত খিঁচোনো বলাই ভালো।

পুতুল গান করছিল ঘরের মধ্যে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে মুখের কাছে একটা বালিশ নিয়ে। হারাধনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

হারাধন মুখ খিঁচিয়েই আছে। বলল 'গান হচ্ছে? বলি কো· সুখে?'

'ব্যামোর।' ম্লান হেসে বলল পুতুল। ব্যামোতে মানুষ গান গায় তা বুঝি জানো না, বাউনবাবা?'

'জানি বই কী। পাগলে ছেলে মলেও হাসে। ঢিল খেলেও হাসে। এখন ওষুধ বের কর দিনি।'

হারাধন এখন একজন প্রকৃতই ডাক্তার। বলল, 'খেয়েছিস কখন?'

'সেই দুকুরবেলা!'

খ্যাঁক করে উঠল হারাধন, 'মিছে কথা বলিস কেন? গাদা বমি করে মরবি। বিকেলে কিছু খাসনি?'

পুতুল অমনি আদুরে মেয়েটির মতো ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'সে তো কোন বেলায় দুটি মুড়ি আর চা খেয়েছি।'

'তবু কতক্ষণ আগে?'

'তা চার ঘণ্টা হবে।'

'ঠিক তো?'

'তো কি, তোমাকে মিছে বলব?'

'পাগল, তা কখনও বলতে পারিস।' দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল হারাধনের বিকৃত মুখটা বিস্ফারিত করে।

আবার চকিতে গম্ভীর হয়ে পুতুলের নাড়ি দেখল গভীর অভিনিবেশ সহকারে। একটুও সে জানে বোঝা গেল। তারপর পকেট থেকে একখানি ছোটো পিচবোর্ডের বাক্স বার করে সিরিঞ্জ নিল, স্পিরিট তুলো বার করল, টকাস্ করে ভাঙল ইনজেকশনের অ্যামপিউল।

পুতুল তাড়াতাড়ি হাঁক দিল, 'ও পুঁটি, একটুস্ আমাকে ধরবি আয় ভাই।'

পুঁটির জবাব এল, 'হ্যাঁ, পেথম রাত্তির, আমার কি দরজা ছেড়ে যাওয়া চলে?'

পুতুলের গলায় আরও খানিক ভয় ও মিনতি ফুটে ওঠে, 'তোর পায়ে পড়ি পুঁটি।'

হারধন সিরিঞ্জে ওষুধ পুরতে পুরতে বলে উঠল, 'এখনও মরনের ভয়? বাঁচতে সাধ?'

'তা বাউনবাবা, মরতে পারলে কি আর গঙ্গার জল কিছু কম ছিল?'

'থাক।' বলে নিঃশেষিত অ্যামপিউলটি ফেলে দিয়ে চোখ তুলে সে পুতুলের দিকে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের আঁকাবাঁকা রেখাগুলো উঠল সরল হয়ে। বলল, 'একটু দেখেশুনে মানুষ ঘরে তুলতে পারিসনে, অ্যাঁ?'

পুতুলের মুখটি পুতুলের মতোই হয়ে উঠল। 'তা কি হয় বাউনবাবা? খদ্দের কানা হোক, খোঁড়া হোক, সে যে ভরসা!' পরমুহূর্তেই মুখটা বিকৃত করে বলল, 'তা রোগ-ব্যামো কি মুখপোড়াদের ধরা যায়?'

পুঁটি এল মুখ গোঁজ করে। উপায় তো নেই। ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, এমন দিন সবারই আসে। পুঁটিকে একদিন ধরতে হবে হয়তো পুতুলকে এসে।

একটা পাকা ডাক্তারের মতো শিরা খুঁজে প্যাঁক করে হারাধন ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল। 'কষ্ট হলে বলিস্।'

ইনজেকশনের পর, খানিকক্ষণ পড়ে থেকে পুতুল চার আনা পয়সা বাড়িয়ে দিল হারাধনের দিকে। 'ওষুধ এনে এই ছিল বাউনবাবা, পরে আবার দেব।'

হারাধনের ক্রুদ্ধ মুখটার দিকে চাওয়া যায় না। চিবিয়ে বলে, 'তোরা মরবি কবে, কবে?'

নিশ্চুপ পুতুল তেমনি পড়ে রইল। হারাধন তার হাত থেকে ছোঁ মেরে পয়সা চার আনা নিয়ে গেল বেরিয়ে।

বাইরে গজগজ করছে পুঁটি। কে জানে এই দশ মিনিটের মধ্যে হয়তো একটা খদ্দের মিলত তার।

একটা লোককে কয়েকটা মেয়ে মিলে পিটছে। লোকটা নাকি পয়সা ফাঁকি দেয়।

অবসর নেই কিছু দেখবার হারাধনের। সে চষছে সারা মহল্লাটা পাকা বাঁশের মতো বাঁকা পাঁ বকের মতো ফেলে ফেলে, ঘর থেকে ঘরে।

কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত হুতোশে মন দৌড়চ্ছে মেয়েদের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দুরু দুরু বুকে শিকারির মতো অপলক চোখে তারা পথের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কে যে শিকারি, তা বোঝবার জো নেই। যে দেখছে, না, যে দেখাচ্ছে?

গান তেমনি চলছে, প্রেমবাজারে যাব লো ...। আর দম-দেওয়া পুতুলের মতো হারাধন ফিসফিস করে চলেছে ভেংচে। প্রেম না পেম। ... কেউ ওষুধ কিনে রাখেনি, কেউ না। অথচ রোজই বলে, রাখবে। তারপরে আর পয়সা থাকে না। থাকলেও নেশা করে বসে থাকে, নয়তো কিছু খেয়ে বসে থাকে ভালোমন্দ। কিন্তু বেশির ভাগই পয়সা জমাতে পারেনি। একটা অজানা রাগে তার আঙুলেব টিপুনিতে সিকিটাই না ভেঙে যায়।

'চণ্ডী, চণ্ডী কোথায়? সে তো মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিস ওষুধ এনে রাখবে।...' চণ্ডীর দরজাব কাঁছে এসে দাঁড়াতেই খুট্ করে দরজাটা খুলে গেল আর চামচিকের মতো ফুড়ুৎ করে একটা লোক গেল ছুটে বেরিয়ে।

চণ্ডীর গায়ে কাপড় নেই। হারাধন বিকৃত মুখটা ফিরিয়ে বলল, 'কাপড় পর্।'

মদ খায়নি, তবু যেন নেশাচ্ছন্ন চণ্ডী তার কালো মোটা শিথিল শরীরটা ঢাকল ধীরে ধীরে, নিস্তেজ গলায় ডাকল, 'এসো বাউনবাবা।'

ঢুকেই হারাধন তার দাঁত বের করে খিঁচিয়ে উঠল, 'তবে তোর ব্যামো সারবে কবে? খুব তো এনতার...'

বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কোথায় বাবা, সবে তো দুজন।'

কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে হারাধনের। মনে হল এখুনি এক ঘুষিতে অর্বাচীনা চণ্ডীর মুখটা ভেঙে ফেলবে। কিন্তু মুখ কই!

চণ্ডীর তো মুখ নেই! মাটির ড্যালা তো একটা। বলল, 'ওষুধ এনেছিস?'

'এনেছি।'

'বার কর।'

সেই এক কথা, এক ভাব, এক ব্যাপার।

ইনজেকশানের শেষে একটা পুঁটলি বড়িয়ে ধরল চণ্ডী হারাধনের দিকে। 'এইগুলো নেও বাউনবাবা, পয়সা নেই।'

'কী এগুলো?'

'চাল একসের।'

চাল? হঠাৎ যেন হারাধনের শূন্য পেটটা পাক দিয়ে উঠে মুখটা রসালো হয়ে উঠল। ভাতের গন্ধ লাগল যেন তার নাকে। তবু বলল, 'চাল, কলা আমার বাপ আনত মন্তর পড়ে, আমি কী করব?'

'খাবে।' নিরুপায় গলায় বলল চণ্ডী, 'এর জন্যেই তো সব বাউনবাবা। শরীলে যে এত বিষ ধরি...'। কিন্তু কী যে মোহিনী গন্ধ চালের। হারাধন ততক্ষণে একমুঠো চাল কটর মটর করে চিবোতে আরম্ভ করেছে। তার চিবোনো মুখের খুশি দেখে মনে হল সে সব ভুলে গেছে বুঝি। তারপর হঠাৎ চণ্ডীর দিকে নজর পড়তেই অপ্রস্তুত হয়ে চালের দলাটা গিলে ফেলল কোঁত করে। মুখটা বিকৃত করে বলল, 'শালা চাল নিতে হবে? আচ্ছা, তাই সই।'

বলে পুঁটলিটা নিয়ে আবার ফিরে বলল, 'তোর চাল আছে তো?'

'চালিয়ে নেব কোনোরকমে।' চণ্ডী এলিয়ে পড়ল বলতে বলতে।

মুখটাকে আরও কুঞ্চিত করে পুঁটলিটা মাটিতে রেখে বলল হারাধন, 'তবু বাঁচতে হবে।'

হেসে ফেলল চণ্ডী, 'তোমার কী কথা মাইরি, বাউনবাবা। বাঁচতে না হলে তুমিই বুঝি এ ছুঁড়িদের দেখতে?'

'হয়েছে থাক।' খ্যাঁক করে উঠে হারাধন বলল, 'ওর থেকে দুটো রেখে বাকিটা আমায় দিয়ে দে।'

চণ্ডী সংশয়ান্বিত চোখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রাগ করবে না তো বাবা?'

হারাধন তখন আপনমনে বিড়বিড় করছে, 'শালা পরান ভট্চায যে কী আপদের কাজে রেখে গেল আমাকে। এর থেকে আমার ...'

অমনি তার মনে আবার প্রশ্ন ওঠে, কী? চেয়ে-চিন্তে, মিছে ধার করে আব মরীচিকার মতো ঘোড়ার পেছন পেছন ছুটে জীবনধারণ? না-ই বা হল। কিন্তু এ কোন বিদ্‌ঘুটে জীবনের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে তার ভাগ্য? একদল প্রতিমুহূর্তে গণ্ডুষ গণ্ডুষ বিষ পান করছে, কী ক্ষমতা আছে হারাধনের সে বিষ শুষে নেবে?

চণ্ডী এক কুন্‌কে চাল রেখে আবার পুঁটলিটা তুলে দিল হারাধনের হাতে। হারাধন চলে যেতে যেতে বলল, 'দু একটা রাত একটু কামাই দে, কামাই দে।'

চণ্ডীর সেই মাটির ড্যালা মুখটাতে যেন আচমকা আগুন ধরে গেল। সত্যিই একটা মুখ ফুটে উঠল এবাধ এবং বিতৃষ্ণায় রাগে ঘৃণায় তা যেন জ্বরবিকৃত। 'এ জীবনে কামাই দেওয়া আর হবে না। এক রাত্রিও থামতে পারা যাবে না।এ শরীরেব বিশ্রাম নেই। পারলে কি নিজের মুখের ভাত কেউ তুলে দেয়। ...'

কোলাহল পড়েছে ঝগড়ার। একটা ছুতোর অপেক্ষা মাত্র। ঝগড়া তাদের, যাদের পশার নেই আর যাদের আছে তাদের মধ্যে।

সবলা বসে আছে রকের উপর। সেজেছে, রং মেখেছে, কাজল টেনেছে চোখে, কপালে বসিয়েছে টিপ। কিন্তু পথেব ধারে যায়নি। কাপড় এলিয়ে খাটো জামাটা শরীবটাকে আরও কটুদৃশ্য করে তুলেছে। হারাধনেব দিকে তাকিয়ে আছে ভিক্ষুকের মতো যন্ত্রণাকাতব মুখে।

হারাধন পাথরের মতো শক্ত মুখে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু খানিকটা গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'তাকিয়ে আছিস কেন, কীসের জন্যে? আমি কি ভগবান যে তোর রোগ সারিয়ে দেব? ওষুধ না পেলে কিছু হবে না।'

সরলা কাছে এসে বললে, 'কী করব বাউনবাবা, রোজগারে কুলোয় না যে!'

রেগে কটূক্তি করে ওঠে হারাধন, 'শালা ভিক্ষুকের ডেরা নাকি এটা? তাদেরও তো রোজগার আছে, আর ...। আমি কী করব? আমার কী আছে?'

এই একই ব্যাপার ঘরে বাইরে। কোনো ফারাক নেই ঘরের বউটার সঙ্গে এদের। তার রোগ নেই, কিন্তু সেও যেন এমনি অবস্থায়, প্রাণভীত চোখে হারাধনের সামনে এসে দাঁড়ায়। চালের পুঁটলিটা শক্ত করে ধরে সে সরে গেল।

উপায় নেই। আগুনের হলকা লেগে যেন সরলা ছুটে পথের উপর চলে যায়।

'বাবা। বাউনবাবা।' ...'

কচি গলার ডাক শুনে ধ্বক্ করে উঠল হারাধনের বুক। যেন তার সেজ মেয়েটি এসে ইজের পরে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। রোগা, লম্বা, সরলরেখার মতো অপুষ্ট কাঁচা মেয়েটা। ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর বাউনবাবার প্রকৃতি ওর জানা নেই তাই হারাধনের হাত জাপটে ধরে মেয়েটা বলে উঠল, 'শরীলে আমার রোগ হয়েছে, সারিয়ে দেও, সারিয়ে দেও।'

হারাধনের মনে হল কে যেন গান গাইছে কচি গলায়, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা ...

'এই-এই ছোকরি!' হাঁকছে সেই মোটা লোমশ চেহারা, গলায় সোনার চেন দেওয়া লোকটা। মেয়েটা শুনল না সে ডাক। লোকটা হেসে উঠল। 'আচ্ছা, আচ্ছা ডাক্তার, কাল এসে ওকে দাবাই দিয়ে যেয়ো, আমি আনিয়ে রাখব। চলে আয় ছোকরি, চলে আয়।...'

মেয়েটা শুনল না।

'কিষণ!' মোটা লোকটা জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

সেই ডাক শুনে চকিতে মেয়েটা কাদার মতো দলা পাকিয়ে যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল। কিষণ এখানকার বেয়াদপ মেয়েদের যম। মোটা লোকটা কেশো গলায় হেসে উঠল, 'তুমি ডাক্তার, মেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছ!'

দড়াম করে একটা ঘরের দরজা খুলে রানি একটা সুবেশ ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এল চেঁচাতে চেঁচাতে। 'আরে আমার কোথাকার পুঁটিকে ভাতার এলোরে। দ্যাখো দিনি কাণ্ড। বলে আমার নেই সময়, ছোঁড়া কাজ মিটিয়ে পালাবি,তা না, বলে তুমি কেন বেবুশ্যে হয়েছ? এ কী যাত্রার ঢং রে বাবা। এখন আমি ওর সঙ্গে গল্প ফাঁদি আর কী। কেন হয়েছি সে তোর বাড়িতে জানে।' ...বলে অগোছাল রানি অশ্রাব্য কটূক্তি শুরু করল।

ছেলেটার দিকে একমুহূর্ত দেখে হারাধন এগিয়ে গেল সেদিকে। নরম শান্ত নবীন যুবক। হারাধন তার চিবুক ধরে বলল, 'কাকে খুঁজছ বাবা? চন্দ্রমুখী না পিয়ারিবাইজি?'

ছেলেটা সন্ত্রস্ত বড়ো বড়ো চোখে হারাধনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে, ঠোঁট দুটো নড়েচড়ে উঠছে।

হারাধন তার খোঁচা খোঁচা দাঁতে বোধ হয় হেসে বলল, 'এরা সব মেয়ে কুলি, ফুরনে খাটে। ও-সব গপ্পেই ভালো জমে, নয়তো জায়গা বাছতে হয়। এখানে সে সময় নেই। বাড়ি যাও, বাবা।'

ছেলেটার চোখে তখন প্রায় জল দেখা দিয়েছে। সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল।

রানি খিলখিল করে হসে উঠে বলল, 'ছোঁড়ার মরণ ধরেছে। চন্দ্রমুখীটা কে বাউনবাবা?'

'সে এক গল্পের বেবুশ্যে। শরৎ চাটুজ্যের নাম শুনেছিস?'

'নরসিং চাটুজ্যেকে তো চিনি, ও নাম তো জানি না।'

হারাধন বলল, 'তিনি বেবুশ্যেদের গল্প লিখতেন, খুব নামি লোক ছিলেন রে।' পরমুহূর্তে মুখটা খোঁচ করে বলল, 'তা বলে তিনি তোদের মতো হাভাতেদের কথা লেখেননি, তাদের একটা প্রাণ ছিল।'

'সে পেরান নিয়ে তোমরা থাকো গে, জান বাঁচলে বাঁচি।' মুখ বেঁকিয়ে রানি সরে গেল।

'জান থাকলে বাঁচি।' বিড়বিড় করতে করতে হারাধন এগোয়। ছোঁড়াটা বোকা, তাই এখানে এসেছে প্রেমের সন্ধানে। ব্যাটা মুখে দুটো তুলে দিয়ে প্রেম কর, জমবে। সবই জমবে। তা না, নভেলিয়ানা! চালের পুঁটলিটা নাকের কাছে ঘষতে ঘষতে পথে এল হারাধন।

সারাক্ষণ ঘুরে তার বারো আনা আর ওই চালটুকু রোজগার হয়েছে। তাও আট আনা পয়সা ভবিষ্যতের জন্য একটা মেয়ে জমা রেখেছে।

'প্রেমবাজারে যাব লো সজনী ...' সেই গান চলছে। হারাধন অন্ধকারে ঠাওর করে দেখল, গান গাইছে মতিবালা। বয়স বেশি নয়, কিন্তু চামড়াগুলো ছাইপানা হয়ে কুঁচকে ঝুলে পড়েছে, চুলগুলো হয়েছে পাঁশুটে, দাঁত নেই একটাও। চোখ আছে দুটো সাপের মতো। বলল, 'কী, বাউনবাবা? এই আঁধারে বসে গাইছি। দেখি যদি কেউ আসে।'

হারাধন মুখ ভেংচে বলল, 'প্রেমের শখ এখনও মেটেনি?'

মতি মাড়ি বের করে বলল, 'যা পেলেম না তা মিটবে কী করে? আর পেটটা তো ভরাতে হবে। গান শুনে একবার উঁকি তো দেবে?'

'দিলই বা।'

'তখন ঘরে না যায় দুটো পয়সা চেয়ে নেব।'

'তবু মরবে না ...', ছিটকে গলিটা থেকে বেরিয়ে এল হারাধন। এক, দুই ...লাইটপোস্ট গুনতে আরম্ভ করেছে সে। রাতটা এখন ফাঁকা। দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘাড় গুঁজে হেলে পড়ে ছায়া ফেলে চলেছে হারাধন। মাঝে মাঝে হঠাৎ থমকে পড়ছে। কেবল মনে হচ্ছে সামনে এসে কে যেন দাঁড়াচ্ছে। কে?.. কেউ না। রাতে পুলিশের বুটের শব্দ আসছে। তবু যেন একটা কীসের দেওয়াল এসে পথরোধ করছে বার বার হারাধনের। ... হঠাৎ মনে হল রাস্তাটা একটা কুৎসিত ব্যাধির মতো দলা পাকিয়ে উঠে এসেছে তার সামনে। ধাক্কা দেওয়ার মতো এগিয়ে গেল সে। আঙুলে যেন সিরিঞ্জ ধরেছে। ফিসফিস করে উঠল, দেব শালা ছুঁচ ফুঁড়ে? দেওয়া যায় না ইনজেকশন করে এক হাতে দুনিয়াটাকে সাপটে ধরে? ... উনত্রিশ ত্রিশ ...।

গলিটাতে ঢুকে তার গতি শ্লথ হয়ে আসে। ঘাড়টা আরও খানিক ঝুঁকে পড়ে। বাঁকা পায়ের পদক্ষেপের তালে তালে যেন সে বলছে, ধরণী দ্বিধা হও। দ্বিধা হও।

গলিটাতে আলো নেই, কিন্তু শুক্লপক্ষের চাঁদ ছিল আকাশে। অষ্টমীর চাঁদ বোধ করি, এক বিচিত্র কুহেলিকাপূর্ণ আলো-আঁধারে ভরা সমস্ত গলিটা। কোথায় একটা গো-সপিণী উলু দেওয়ার মতো লু লু করে ডেকে উঠছে গো-সাপকে।

ডোবার ধারের সরু ধার দিয়ে ঝুপসিঝাড়ে ছাওয়া হেলে-পড়া বাড়িটার সামনে এসে হারাধন দাঁড়াল। ভূতুড়ে বাড়ি, ছিটেফোঁটা ঝাপসা আলোয় মনে হয় নিশ্বাস আটকে হেলে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা।

হারাধনের পায়ের শব্দে কীসে যেন ফোঁস করে উঠল। সে দেখল দেওয়ালের ফাটলে অর্ধেক বেরিয়ে আছে কালনাগ, চক্চক করছে রং। কিন্তু হারাধন যেন চেনা মানুষ। মাথা নামিয়ে তাড়াতাড়ি গর্তে ঢুকে গেল। বাস্তুসাপ এটা। একজোড়া আছে। ওরা চার শরিককে চেনে না, চেনে হারাধনকে। পোড়ো বাড়িতে ভূতের মতো নিঃসাড়ে ঢুকল হারাধন। ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। উঠানটাতে আগাছার ঝাড় — তার ব্যাপ্তি উপরে নীচে সর্বত্র। উপরে সব ঘরগুলোই ভাঙা, আধভাঙা, একটা ঘর আস্ত। হারাধন সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। দাঁতগুলো তার বেরিয়ে পড়েছে বুক খোলা জামাটার ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে পইতাটা।

ঘরটাতে জানলাও ভাঙা, ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকছে। সেই আলোয় দেখা গেল সারি সারি তার ন'টি ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে। আটটি মেয়ে, একটি ছেলে। বড়ো মেয়ে দুটোর সারা গায়ে রঙের জাদু লেগেছে। হারাধনের মুখের এলোমেলো কোঁচগুলো যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল। সে উবু হয়ে সকলের ধার দিয়ে একবার হাত বুলিয়ে গেল। ছেলেটার কাছে এক মুহূর্ত থমকাল।

আলোয় যেন নীল দেখাচ্ছে ছেলেটার মুখটা। ছেলে মাত্র একটি। মুখের কষ বেয়ে নাল পড়ছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ে গেল। ... কিছুদিন আগে পাড়ার কে দু-কোয়া কাঁঠাল দিয়েছিল ছেলেটাকে। ছেলেটা ডোবার ধারে বসে তা খাচ্ছিল। হারাধন হঠাৎ কী মনে করে খেলাচ্ছলে কাককে দিয়ে দেবে বলে খেপাতে খেপাতে কপ্ করে কাঁঠালের কোয়াটা মুখে দিয়ে গিলে ফেলেছিল। ... আর ছেলেটার সে কী চিল চেঁচানি! হারাধন ভয় পেয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল তার বউয়ের সেই একজোড়া অপলক চোখের অলস চাউনি। তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল গয়লা কেনোর দোকানে একটা বিস্কুট দিয়ে ঠান্ডা করতে।

কিন্তু বউটা কোথায়? একেবারে অন্য গলায়, নরম সুরে ডাকল, 'ন' বউ! ন'বউ কোথায় গেলিরে?'

সে ডাকে যেন সারা ঘরটায় একটা মায়া ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কোনো জবাব এল না। হারাধন ঘর থেকে বেরিয়ে এ-দিক ও দিক করে পুবদিকের ছাদটার দিকে গেল!

সেখানে জামরুল গাছটার পাশে, আল্‌সের ধারে ন' বউ নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। ... হঠাৎ দেখলে মনে হয় ন' বউ অপরিসীম সুন্দরী। এই আলোয় গায়ের রং যেন ধপধপ কবছে, রূপময়ী হয়ে উঠেছে ন' বউ। মাথায় ঘোমটা নেই, ময়লা কাপড়টা শরীরটা ঢেকে রেখেছে। ...

কিন্তু সামনে এলে দেখা যায় সমস্ত শরীরটা একটা সরলরেখা। কোথাও তার নেই উঁচু-নিচু বঙ্কিম রেখা। মুখটা কঙ্কালের মতো সাদা ও ছোটো। সেই হাড়-কপালে একটা মস্ত লাল টিপ। চোখ দুটো যেন পোয়াতি গাভীর।

হারাধন চালের পুঁটলিটা রেখে বউয়ের হাত ধরে ডাকল, 'কী করছিস এখানে ন' বউ, খুঁজে আর পাই না।'

ন' বউ তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হারাধনের দিকে ফিরে দু-হাত ধরে তাকে বসায়। জামাটা খুলে নেয়, বলে, 'কখন এসেছ?'

'এই তো কিছুক্ষণ!' হারাধন একটা নিশ্বাস ফেলে, ন' বউয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, চাঁদ দেখছিস?'

'চাঁদ কোথায়?' ন-বউ অবাক হয়ে দেখল সত্যিই তো চাঁদ রয়েছে আকাশে।

হারান বলল, 'চোখেও পড়েনি না রে? এ সব বুঝি আর চোখেই পড়বে না কোনোদিন। ন' বউ, এ বাড়িটার মতোই আকাশটা কোনদিন ভেঙে পড়বে।

ন' বউয়ের মুখটা যন্ত্রণাকাতর হয়ে উঠল। হারাধনের হাড়-বের-করা মুখটায় হাত বুলিয়ে বলল, 'তোমার যে শরীরটা —'

'বলিস নে!' বাধা দিয়ে বলে উঠল হারাধন। 'বলিস নে ন' বউ! তুই গায়ে হাত দিয়ে বলছিস। আমি যে তোদের দিকে আর তাকাতে পারি নে। ..এই তো রোজগার করেছি বারো আনা পয়সা তিন পো চাল। কী দিয়ে তোদের ছোঁব, বল্!'

বুঝি রাত থেমে গেছে, চাঁদ ঢেকে গেছে, হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

ন' বউ বলল, 'তা হলে তোমাকে দুটি রান্না করে দিই?'

'আজ আর নয়, কাল দিস। চল ঘরে যাই।' বলে ন' বউয়ের হাত ধরে কাছে টেনে নিল সে।

ন' বউ উঠল কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে রইল। হারাধন ডাকল, 'চল, রাত যে পুইয়ে এল?'

যেন দারুণ অপরাধিনীর মতো ন' বউ হঠাৎ হারাধনের পায়ের কাছে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল, 'উঠানের ওই তেলাকুচোর ঝাড়টা তুমি কেটে দিয়ো।'

হারাধন অবাক হয়ে বলল, 'কেন রে?'

'ওখান থেকে কী একটা ফল খেয়ে ছেলেটা মরে গেছে।...

হারাধনের মনে হল সত্যি আকাশটা ভেঙে পড়েছে তার মাথায়, বাড়িটা টলছে, চাঁদটা ছিটকে পড়ছে আকাশ থেকে। ন' বউ তখন বলছে, 'সন্ধ্যাবেলা কেবলই খেতে চাইছিল আর কাঁদছিল। ওদের জন্য তখন ক-খানা রুটি করছিলাম। সেই ফাঁকে খোকার খিদে মানল না। ... দেখলাম, কী খেয়ে বোবা ছেলে শুয়ে আছে। ....'

হারাধনের চোখের উপর ভেসে উঠল ছেলেটার নীল মুখ, নাল গড়াচ্ছে। যেন আকাশের বুক থেকে বলল, 'ও! তবে জন্মের মতো দেখে এসেছি তাকে? ...তবু চল ন' বউ, সে যে একলা রয়েছে !... আমার যে আরও জ্যান্ত আটটা মেয়ে রয়েছে।'

পরদিন ছেলেকে শ্মশানে পুঁতে এসে হারাধন পইতেটা কোমরে গুঁজে একটা একটা মস্ত ঠ্যাঙা দিয়ে ঝাড়টাকে পিটে পিটে দুমড়ে দিতে লাগল, আর মনে মনে বলতে লাগল, আমার মেয়ে আটটা যেন আর না মরে।

সেই ঝাড়ে ঘা লেগে ছরকুটে যেতে লাগল সবুজ লাল সব বিচিত্র ফল। পালাল কতগুলো ঢোঁড়া, হেলে সাপ, পোকামাকড়। শিকড়ে ঘা লেগে সারা বাড়িটার দেওয়ালের বিস্তৃত শিরা-উপশিরায় টান পড়ে যেন নড়ে উঠল বাড়িটা।

ন' বউ উপরে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তাই দেখছে। মেজোমেয়েটা কোলের বোনটাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে দোলাচ্ছে আর সরু মিষ্টি গলায় গাইছে, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা .....

পঙ্কজ



মিহির সেন

ভাই শোভন,

অত্যন্ত দুর্বল একটা মুহূর্তে তোমাকে এ চিঠি লিখছি। আসার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে আসার ইচ্ছে ছিল, প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু সময় করে উঠতে পারলাম না।

আজ তোমাকে একজনের জীবনের ছোটো একটা কাহিনি শোনাব। যাক্‌গে, খুলেই বলি, সে কাহিনি আমারই জীবনের। আমি কবি, তোমাদের মতো গল্প-লিখিয়ে না, বানানো মধ্যম পুরুষে শুরু করলেও সামলে শেষ করতে পারব না হয়তো, তাই স্বীকার করে নিচ্ছি, উত্তম পুরুষ আমিই সে কাহিনির নায়ক। কিন্তু নায়িকার সত্যি নামটি তোমাকে বলছি না, আমার আপত্তির জন্যে নয়, তার ওপর পাছে অবিচার করা হয়, তাই। নাম ধরে নাও তার সীতা (কারণ সীতা নামটার সঙ্গে একটা ধূসর বিষণ্ণতা জড়িয়ে আছে যেন)।

কিন্তু আমার জীবনের সে ঝড়েব কাহিনি শুরু কববার আগে আর একটা অনুরোধ আছে। মেয়েটির ওপর অবিচার না হয় এমনি ভাবে তোমায় একটা গল্প লিখতে হবে কাহিনিটি নিয়ে। তোমার গল্পেব কিছু উপকরণ খুঁজে পেতে পার ভেবেই তোমাকে এ কাহিনি বলা, না হলে আজ পর্যন্ত আর কেউ জানে না এ ইতিহাস। আগেই বলেছি, তোমাদের মতো সাজিয়ে গুছিয়ে গল্প লেখা আমার আসে না। সত্যিই যেটুকু ঘটনা, সেটুকুই তোমাকে পর পব বলে যাচ্ছি। প্রয়োজনবোধে ছাঁটকাট দিয়ে নিতে পার তুমি।

কলেজ ছাড়ার পর থেকেই আমি বেকার তুমি জান। আর এও জান নিশ্চয়ই (নিজে সাহিত্যিক যখন) যে, সে বেকারত্ব ঘোচাবার জন্যে যতখানি পরিশ্রম করা প্রয়োজন আজকের দিনে, বাইরে তার অভিনয় করে পরিবারকে সান্ত্বনা দিলেও, সত্যি সেটুকু করা হয়ে ওঠে না আমাদের। স্বতঃসিদ্ধভাবে টিউশানিগুলোই মনোযোগ সহকারে রক্ষা করে যেতে হয় অন্তত হাত খরচটা তুলবার জন্যে।

মাস চারেক আগে অসীম (আমাদের রিপনের সেই লাস্ট বেঞ্চের বন্ধু) হঠাৎ আমাকে পাকড়াও করলে রাস্তায়। তার দূর-সম্পর্কের এক ভাগনিকে যদি পড়াই তাহলে নাকি সে খুব উপকৃত হয়। কারণ, মেয়েটি নাকি বাংলায় একটু কাঁচা, আর আমি নাকি বর্তমান তরুণ বাংলার একজন প্রথিতযশা কবি (বিশেষণটা অসীমেব উদ্ধৃতি)। তুমি তো এ লাইনেরই লোক, সবই জান), সুতরাং এ মণিকাঞ্চনযোগটা নাকি খোঁজও করেছে ও এজন্যেই।

আমার সীমানা ছিল স্কুল পর্যন্ত। কলেজের ছাত্রছাত্রী কতদিন পড়াইনি। তবু দুটি ছাত্র ছাত্রীর ম্যাট্রিক হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছুটা টানাটানি চলছিল। টাকার অঙ্কটা অন্তত স্কুলের সীমার ওপরে হবে ভেবেই রাজি হয়ে গেলাম। জান তো আজকাল ব্যবসা করছে অসীম। তাই Time is money তার কাছে। আমাকে একটা চিরকুট লিখে দিল ভাগনির উদ্দেশ্যে। আর ঠিকানাটাও। বলল, টাকার জন্যে ভাবিস না, যা বাজার দর তাই পাবি (অসীম আজকাল ব্যবসা করে)!

পরদিন অনেক গলির জট ছাড়িয়ে যখন কাম্য নম্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, কনেদেখা আলো তখন কলকাতা থেকে বিদায় নিচ্ছে। অন্ধগলির গ্যাসবাতি দুটো জ্বলল বলে।

কড়া নাড়লাম। বছর ছয়-সাতের একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। কোনো বাড়িতে গিয়ে সে বাড়ির কোনো মেয়েকে সরাসরি ডেকে আনতে বলাটা কেমন যেন বাধো বাধো লাগে। কিন্তু ঠিকানায় কোনো ভদ্রলোকের নাম না থাকাতে একটু আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করেই বসলাম, (দাঁড়াও দেখেনি মিথ্যে নামটি যেন কী দিয়েছিলাম,... হ্যাঁ ঠিক আছে) সীতা দেবী আছেন? এই চিঠিখানা তাকে একটু দিয়ে এস গে।

মেয়েটি কিন্তু একটুও অবাক হল না। মাথা দুলিয়ে বলল, দিদি তো এখনও ফেরেনি। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি মাকে জিজ্ঞেস করে আসি।

বাধা দিলাম মেয়েটিকে, আচ্ছা ওই চিঠিটাই বরং তোমার মাকে দিয়ে এস।

মেয়েটি চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

খুব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল না। পেছন থেকে মিষ্টি সুরের জিজ্ঞাসা এল, কাকে চান?

বললাম।

কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করল মেয়েটি, বলল, কোত্থেকে এসেছেন বলুন তো।

তাও বললাম।

এবার স্বস্তি নেমে এল ওর চোখে, ও বুঝেছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে একতলা পেরিয়ে দোতলায় উঠলাম, দোতলা পেরিয়ে তিনতলায়। পর পর তালাবন্ধ দুটো ঘর পিছে ফেলে একেবারে কোণের একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মেয়েটি বলল, আসুন, ভেতরে আসুন। ভেতবে ঢুকে মেয়েটি সসম্মানে একটি চেয়ার এগিয়ে দিল।

বলল, বসুন। আমারই নাম সীতা। দুপুরে আমাকে ফোনে সব বলেছেন অসীম মামা। আমাকেই পড়াতে হবে আপনাকে।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর বোধহয় কিছুদিন পড়েনি মেয়েটি. চেহারা যেটুকু বয়সের আভাস দিল তাতে তাই মনে হল।

এ বয়সের মেয়ে জীবনে এই প্রথম পড়াচ্ছি। কেমন যেন একটু নার্ভাস বোধ করি। আম্‌তা আম্‌তা করে জিজ্ঞেস করি, কাল থেকেই পড়বেন তো?

কুণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে তাকাল ও — আমাকে আপনি বলছেন কেন, বরং —

বলেছিলাম যে অসংকোচে তাও নয়। ছাত্রীকে, বয়স সে যতই হোক, আপনি বলতে সঙ্কোচ বোধটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটি বিশেষ বয়সের পর মেয়েরা এমন আত্মসচেতন হয়ে ওঠে যে সম্বোধনে তখন সাবধানতা অবলম্বন করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

একটু হেসে বললাম, আচ্ছা তাই হবে। কাল তবে কখন আসব? তুমি প্রাইভেট দেবে তো, দুপুরে অসুবিধে হবে?

একটু সঙ্কুচিত হল যেন সীতা। বলল, দুপুরে আমার অফিস থাকে, বরং সন্ধ্যার পর, আপনার অসুবিধা নাহলে, সন্ধ্যার পরই আসবেন।

একটু অবাক হলাম — ওঃ তুমি চাকরি কর নাকি? কোথায়?

একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে। স্তিমিত কণ্ঠে জবাব দিল ও, স্টেনোগ্রাফার সেখানকার। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি একটু বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি।

আমার আপত্তির মুখেই বেরিয়ে গেল সীতা ঘর থেকে।

তুমি নিশ্চয়ই ওর রূপ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছ শোভন। তোমার গল্পের প্রয়োজনে তোমার ইচ্ছেমতন রূপ দিয়ে নিও, কিন্তু সীতা সুন্দরী নয়। কালো ছিপছিপে, লম্বাটে। চেহারায় এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা মনকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই সর্ব-রিক্ততার মধ্যেই যেন মেয়েটির সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল। একে সহানুভূতি বলে ভুল কর না, যদি প্রয়োজন হয় বরং কবি-কল্পনা বলে ভেবে নিও।

তুমি হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠছ শোভন। এত খুঁটিনাটি গল্পের জন্যে মোটেই প্রয়োজনীয় নয় বলে। কিন্তু জান তো, প্রেমে পড়লে তুচ্ছতম ঘটনাকেও মনে হয় যেন এক একটা ঐতিহাসিক সংবাদ। তবু সংযমী হয়ে ক'টা দিন পেরিয়ে আসছি বিনা-উল্লেখে। আসল বক্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

প্রথম প্রথম সীতা ভীষণ সঙ্কুচিত হয়ে থাকত। ওদের ঘর মাত্র এই একটাই। ওর মা তাই এ সময়টুকু রান্নাঘরেই কাটাতেন। ছোটো বোনটা নিচের তলায় সমবয়সিদের সঙ্গেই মত্ত থাকত প্রায়ই। মাঝে মাঝে ওপরে আসত। কিন্তু দরজার ওপার থেকে উঁকি মারার বেশি স্বাধীনতা সে দাবি করবার চেষ্টাও করত না কোনোদিন। অতএব, একেবারে একা একঘরে মুখোমুখি বসে পড়তে হত সীতাকে আমার কাছে। (একটি রোমান্টিক গল্পের একেবারে সাজানো পরিবেশ বলে মনে হচ্ছে, না শোভন)?

কিন্তু খুব বেশিদিন লাগল না, সঙ্কোচের সীমাটা ক্রমেই গুটিয়ে এল। তারপর কবে যে সেটা অবারিত স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্তিত হল, দিনক্ষণ গুণে বলতে পারব না। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার মতোই মেয়ে-চরিত্রের এ প্রস্ফুটনটুকু সম্পূর্ণ অলক্ষ্য অধ্যায়।

আরো কিছুদিন পর দেখলাম, মেয়েটিকে যা ভেবেছিলাম ঠিক তার উলটো। অত্যন্ত সজীব ও আচার ব্যবহারে। পরিচয়ের প্রথম ধাপটা কোনো ক্রমে পেরোতে পারলেই অসঙ্কোচ পদক্ষেপে বেশ দ্রুত ও এগিয়ে আসতে জানে। প্রয়োজন হলে অন্তরের অন্দরমহলেও।

এ পর্যায়ে এসে, বুঝলে শোভন, বরং আমিই যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি। তুমি তো জান, এদিকে আমি অত্যন্ত অনভ্যস্ত। ছোটো মেয়েদের পুতুল খেলার মতো, কল্পনার নানান রং চড়িয়ে মেয়েদের নিয়ে মানস বিচরণে মন্দ লাগে না, কিন্তু খুব বেশি সামনাসামনি ওরা এত বেশি বাস্তব, যে ঠিকমতো আচরণ বজায় রাখতে যতটুকু সচেতনতা প্রয়োজন সেটুকু আমাদের কবিদের প্রায়ই কষ্টকল্পিত।

কিন্তু এরই ভেতর একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যে আমি হেন গুটিয়ে-থাকা ব্যক্তিরও মনে চিড় ধরে গেল। পর পর দুদিন পয়সার অভাবে পড়াতে না গিয়ে তৃতীয় দিনে গিয়ে বললাম, শরীর খারাপ ছিল।

ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে তাকাল সীতা, বেশি কিছু হয়নি তো? তাহলে না এলেই পারতেন।

ভেবেছিলাম অনুযোগ শুনতে হবে। আশ্বস্ত হই। আর, ওর উৎকণ্ঠাকে চেষ্টাকৃত সৌজন্য বলেই ধরে নিলাম।

পড়িয়ে উঠবার সময় ও হঠাৎ আমতা আমতা করে বলল, মাস্টার মশায়, আমার জন্যে একটা ইংরাজি নোট নিয়ে আসতে পাববেন? আমি একেবারেই সময় পাইনা, পরশু পয়লা তারিখেই দামটা দিয়ে দেব।

ভীষণ অসুবিধেয় পড়ি। তারপর সমস্ত সঙ্কোচ ঠেলে বলেই ফেলি, কিন্তু আমারও তো সে একই সমস্যা, মাসের শেষ বলে দুদিন পড়াতে আসতেই পারলাম না।

কিন্তু বলেই ভীষণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি। গভীর দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ভেতরে গিয়ে একটা দু'টাকাব নোট এনে সামনে রেখে বলল, বললেই পারতেন। মাস্টার বলে শুধু ব্যবসার সম্পর্কটাই কি সব।

রঙিন মনতো, কথাটাকে নিয়ে সারাটা পথ লোফালুফি খেললাম। এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম, কথাটা থেকে কোনো বিশেষ রং ঝিলিক মেরে ওঠে কিনা! তারপর ফিরে এসে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত সে নেশা কাটল না সেদিন। তবে বরাবরই আমি যে একটু নিরাসক্ত ধরনের, সেতো তুমি জানই। যে জন্যে আমার নির্লিপ্ত হাঁসের পালক মনকে তুমি ঈর্ষা করতে। একটা ঘুম দিয়ে উঠে সকালেই আবার বেশ সুস্থ মনে হল নিজেকে। নিজের বোকামিতে, ছেলেমানুষিতে, নিজের মনেই কিছুটা হাসলাম। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, যাক, এতদিনে ধার করবার একটা নিশ্চিন্ত উৎস পেলাম।

তুমি বোধহয় বিরক্ত হচ্ছ শোভন, গতানুগতিক এ প্রেমের পাঁচালিতে। কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছি, সাধারণ এ প্রেমের ঘটনা যাতে তোমার হাতে অসাধারণ প্রেমোপাখ্যান হয়ে ওঠে, সেজন্যেই এ কাহিনি তোমাকে বলা। তবে এখন থেকে কাহিনিটা কিছুটা বাঁক নেবে। বৈশিষ্ট্য পাবে।

মাস কয়েকের ঘটনা বাদ দিয়ে শুধু ফলশ্রুতিটুকুই জানাই তোমাকে। আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ হয়ে এসেছে সীতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা। ছাত্রী হিসেবে ওর প্রাপ্ত অধিকারের চেয়েও কিছুটা বেশিই যেন ইতিমধ্যে আদায় করে নিয়েছে ও। কোনোদিন ব্যক্তিগত কোনো কারণে গুম্ মেরে বসে থাকলেও ও হয়তো জবাবদিহি চেয়ে বসত, গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? শরীর খারাপ?

হয়তো বললাম, না, সেসব কিছু না।

—ও, ছাত্রীকে বুঝি সেসব বলা যায় না, একটু অভিমান হয়তো সীতার স্বরে।

হয়তো বললাম, না, সেরকম কিছু নয় অবশ্য।

—তাহলে বলতেই হবে। সশব্দে বইটা এবার বন্ধ করে দেয় সীতা। উদগ্রীব একজোড়া দৃষ্টি তুলে ধরে আমার চোখে।

ধীরে ধীরে আমিও তার সে অধিকার মেনে নিচ্ছিলাম। হয়তো বয়সের ধর্মেই অনেক না-বলতে-পারা উচিত কথাও ওকে বলতাম, আলোচনা করতাম; পরামর্শ নিতাম ও দিতাম।

মাঝে মাঝে আবার ভয়ে ভয়ে ভাবতাম, মেয়েটা এমন অমন নয়তো। নিজেকেই ধমক দিতাম আবার, ব্যতিক্রম

দেখলেই বাঁকা চোখে বিচার করাটা এ সমাজেরই ব্যাধি যেন। এরপর কখন যে নিজের অজ্ঞাতে ওকে নিজের জীবনেও স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছি। (তোমার ভাষায় লেডিজ সিট্‌টা ছেড়ে দিয়েছি), ক্যালেন্ডারের তারিখ মেপে তার সঠিক দিনক্ষণ জানানো সম্ভব নয়। তবে একদিন এক আশ্চর্য অনুভূতির ভেতর দিয়ে অনুভব করলাম যে অবিস্মরণীয় সত্যটি। মনে হল যেন সীতাও তাই।

শোভন, এ পর্যন্ত কাহিনিটা অত্যন্ত গতানুগতিক স্বীকার করছি। বিচারে কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখানে অন্য কোনো প্রতিবন্ধক না এলে হয়তো, এধরনের ঘটনাগুলোর স্বাভাবিক গতিপথ ধরেই, পঞ্জিকার একটি বিশেষ শুভদিনে পরিসমাপ্তি হতে পারত কাহিনিটার।

কিন্তু এর কিছুদিন পর থেকেই হঠাৎ সীতার আচরণে এমন কতগুলো পরিবর্তন ও আপাতবৈষম্য দেখা দিল যাতে রীতিমতো ভাবিত হয়ে উঠি আমি। শাশ্বত সাদাকে সাদা বলে চিনে নিতে অসুবিধে নেই কোনো, চিরন্তন কালোকেও কালো বলে রায় দেবার ভেতর নেই কোনো দায়িত্ব। কিন্তু একটা জিনিস যদি মুহুর্মুহু রং বদলাতে থাকে, তবে মূলত সেটা সাদা না কালো তার বিচারে বসলে বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে হয় বইকি।

পর পর গল্পের মতো সাজিয়ে গুছিয়ে সামঞ্জস্য আনতে পারব না বলে চেষ্টাও করছি না, শুধু দুচারটে উদাহরণ উল্লেখ করছি তার সে ব্যবহারের। তুমি প্রয়োজন মতো সুর-সংগতি এনো।

একদিন হয়তো হঠাৎ বলে বসল, মাস্টার মশাই, কাল তো মাসের প্রথম, সবকটা টিউশনিরই টাকা পাচ্ছেন: একটা সিনেমা দেখান না কাল।

এতে মতিভ্রম হয়না এমন যদি কেউ থাকেন তবে তিনি শিক্ষক নন, সন্ন্যাসী। পরদিন বেশ ভালো টাকা নিয়েই হয়তো বের হলাম। যাবার সময় সীতাকে নিয়ে কফি হাউসটাও ঘুরে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ হয়তো দেখলাম একটু আগেই চটুলতায় যে চোখ চকচক করছিল চাঞ্চল্যে আসন্ন একটা ঝড়ের প্রস্তুতি যেন থমথম করছে সে চোখে। তারপর হঠাৎই হয়তো সিনেমা হলের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ও, বলল, সিনেমা দেখব না, বড়ো বিশ্রী লাগছে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, সেকী? কী হল?

ভুরু কুঁচকে জবাব দিল ও, তাই যদি বুঝবেন তা হলে এভাবে সিনেমা দেখাতে আনতেন না।

মনে মনে ঘাবড়ে যাই আমি। জীবনে এ পর্ব এই প্রথম, নিয়ম-কানুনগুলো ঠিক জানা নেই তাই। এসব ক্ষেত্রে কি তবে ট্রামে বাসে আসা নিষেধ! ট্যাক্সিই প্রশস্ত। নাকি বক্স ব্যালকনিতে না গিয়ে নিছক এক টাকা চার আনার সিটে নিয়ে যাচ্ছি বলেই মনে মনে ক্ষুণ্ণ ও।

অপরাধী স্বরে আবার অনুনয় করি, ঠিক বুঝছি না, খুলেই বল না কেন? টিকিটটা বদলে নেব?

হতবাক করে দিয়ে ও হয়তো প্রায়-কান্নায়-ভেঙে-পড়া স্বরে জবাব দিল, আচ্ছা, আপনারা কি সবাই সমান? একজনও ব্যতিক্রম হতে নেই?

কথাটা ভালো করে উপলব্ধি করার আগেই একটা দশটাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সামনের যে কোনো একটি ট্রামে বাসে উঠে পড়ে সে বলে, সিনেমার টিকিটের দাম। বাকিটা কাল ফেরত দেবেন, খরচ করে ফেলবেন না যেন।

পরদিন হয়তো পড়াতে গিয়ে দেখলাম ও পড়তে আসেনি শরীর খারাপ বলে। বোনকে দিয়ে চেয়ে পাঠিয়েছে বাকি টাকাটা।

আবার হয়তো মাসের শেষে এই সীতাই জোর করে পকেটে গুঁজে দিয়েছে পাঁচ দশ টাকা ট্রাম বাসের জন্যে।

শোভন, সীতা চরিত্রের এদিকটার ওপর ভালো করে লক্ষ রেখ। আমার মনে হয় এর ভেতরই খুঁজে পাবে তোমার সম্ভাব্য গল্পের আসল উপকরণ। আর সেখানেই তোমার পরীক্ষা। তোমার সুবিধের জন্যে আরো বলছি।

হয়তো কোনো রবিবার ধরে বলবে, মাস্টারমশাই কাল একটু মার্কেটিং-এ বেরুব, আপনি সঙ্গে যেতে পারবেন? তোমাকে বলা হয়নি শোভন, বর্তমানে আমাদের সম্পর্কটা ঠিক ছাত্রী-শিক্ষকের সীমায় আর আটকে ছিল না। কী নাম দেব তার জানি না, তবু অন্য কিছু। তবে সেটাকে বান্ধবী পাতিয়ে আবার ভুল কর না।

যাই হোক রাজি হলাম। ওর সঙ্গে ঘুরলাম দোকান থেকে দোকান। মনে মনে ভাবি, আশ মিটিয়ে এত কেনাকাটার টাকা ও কোত্থেকে পায় কে জানে। হয়তো ভালোই মাইনে পায়।

কিন্তু ভাববার মতো অবকাশ ও খুব বেশি দিত না। এত কথা যে কোত্থেকে পায় মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতাম। কথার তোড়ে যেন ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

আমি বললাম, আর কত দেরি? সমস্ত বাজারটাই কিনবে নাকি?

চটুল দুটো চোখে একটি আশ্চর্য মাদকতা মেখে কী যেন বলতে গিয়েও হঠাৎ হয়তো থেমে যায় ও। একটু হেসে বলে, এবার বরং আপনি কিনুন। একটি পেন প্রেজেন্ট্ করুন না, আমার পুরোনোটা হারিয়ে গেছে।

একটু আম্‌তা আম্‌তা করে হয়তো রাজি হলাম। কিন্তু পেনটা নিয়ে রাস্তায় এসে নামতেই দেখি আশ্চর্যভাবে পালটে গিয়েছে সীতার মুখ। কে বলবে একটু আগেই ও হালকা ডানায় আশ্বিন-আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। কালো হয়ে আসে ওর মুখ। আতুর হয়ে আসে দৃষ্টি। একসময় আমাকে অবাক করে দিয়ে কান্না-ভেজা অভিযোগে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, কেন আপনারা না করতে পারেন না। মাসের শেষেও কি আবদার রাখতেই হবে! অদ্ভুত!

বলেই হয়তো ফিরে দাঁড়ায় ও। বলে, দাঁড়ান আসছি আমি। সেই দোকানটাতেই গিয়ে ঢোকে আবার। ভাবলাম, বুঝি ফেরত দিয়ে আসছে। কিন্তু এসে দেখি ফেরত নিয়ে এসেছে আরো অনেক দামি একটি পেন। হেসে আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে বললে, পেনের জন্যে কবিতা লিখতে পারছিলেন না বলেছিলেন; এ পেন দিয়ে লেখা প্রথম কবিতাটা আমাকে উৎসর্গ করবেন কিন্তু।

বুঝলে শোভন, এভাবে ক্রমেই যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে লাগল সীতা। ব্যবহারের অসঙ্গতি বেড়েই চলতে লাগল। মাঝে মাঝে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ লক্ষ করতাম, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে! মোটেই শুনছে না। কেমন বেদনাতুর দৃষ্টি।

এ অবস্থায় একদিন হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি বইটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, কিছু বলবে?

চকিতে উঠে দাঁড়াল ও। ঠোঁট দিয়ে উদগত কান্নাকে চেপে ধরে এক নিশ্বাসে বলে গেল, ও মাস্টারমশাই, আপনার কাছে আমার অনুরোধ কাল থেকে আর এ বাড়িতে পড়াতে আসবেন না। কেন এলেন আপনি আমাকে পড়াতে? বলেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থেকে যখন উঠতে যাব দেখি প্রকৃতিস্থ হয়ে ফিরে এসেছে সীতা। হঠাৎ আমার পা ছুঁয়ে ও চোখ তুলে তাকাল, আমাকে ক্ষমা করবেন মাস্টারমশায়, আমি প্রকৃতিস্থ ছিলাম না।

তাড়াতাড়ি ধরে তুলি ওকে, ছি ছি একি করছ? আচ্ছা তোমার কী হয়েছে বলতো?

সে প্রশ্নের ধার দিয়েও যায় না ও। হঠাৎ একটি আশ্চর্য প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা মাস্টার মশায় আপনার এত প্রতিভা থাকতে প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করেন না কেন? এভাবে মাস্টারি করে কি আজীবন চলবে? আপনি উন্নতি করুন—এ আমার নিঃস্বার্থ কামনা।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। — আজ থাক, কাল শেষ করে দেব টাস্কটা। ও আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এল। তারপর অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে স্তিমিত কণ্ঠে বলল, আচ্ছা! মাস্টার মশায়, আমাকে পড়িয়ে যা পান, আমার ছোটো বোনটাকে পড়িয়ে যদি তাই পান তবে কি অপমানিত বোধ করবেন আপনি? আজ না, কদিন ভেবে বলবেন কিন্তু আমাকে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হল আমায়। ইচ্ছে করে নয়, ঘুমাতে পারিনি বলে। সমস্তক্ষণ ভাবলাম সীতার কথা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করলাম নিজেকে; সীতাকেও। আর সেদিনই প্রথম সিদ্ধান্তে এলাম, ওকে জীবনের পথে সহযাত্রিনী হবার আহ্বান জানানোটা এখন আমার কর্তব্য। সম্মতি দেওয়া না দেওয়াটা অবশ্য ওর বিচার। মনে হল, নিশ্চয়ই ওর জীবনের কোথাও একটি বড়ো রকমের ক্ষত আছে। সাধারণ মেয়েদের মতো তাই ওর ব্যবহার সরলরেখাগামী নয়। নিজের সঙ্গে সমঝে চলতেই বাঁক নিতে হয় তাই মাঝে মাঝে। এই বাঁক পেরিয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে তাই দেরি হচ্ছে ওর। আমার স্বীকৃতি হয়তো ওর সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সহায়ক হতেও পারে।

কিন্তু পরদিনই পড়াতে গিয়ে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল যেন। ও আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, এসেছেন তাহলে! তাও ভাগ্যি কালকের 'ঠাট্টাটাকে সত্যি বলে ভেবে নেননি।' —পড়াতে পড়াতে আবার

বলল, আজকাল কিন্তু ভীষণ ফাঁকি দিচ্ছেন আপনি, প্রায়ই তো আসছেন না। টাকা নিয়ে এমন ফাঁকি দিলে কিন্তু ... অনর্গল বকে চলে হয়তো আবার।

আশা করি এ ক'টি উদাহরণ থেকেই যেটুকু দরকার তা সংগ্রহ করতে পারবে শোভন। চিঠি বড়ো করে লাভ কী। এবার কাহিনির শেষাংশে আসার চেষ্টা করি। এটাই শেষাঙ্ক।

তুমি জান শোভন, কবিতাকে আমি কতখানি ভালোবাসি; সেটি পড়তেও, পড়াতেও। কবিতা পড়াতে পড়াতে আমি ছাত্রর চেয়েও তন্ময় হয়ে যাই। সেদিনও সীতাকে শেলির একটি কবিতা পড়াচ্ছিলাম। পড়াতে পড়াতে একেবার তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল, টেবিলের ওপর শোয়ানো আমার হাতের আঙুলগুলো ও পেন্সিল দিয়ে আলতোভাবে নাড়াচাড়া করছে কেমন অন্যমনস্কে। সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে যেন একটি শিহরন বয়ে যায়। তবু টের না পাবার ভান করি। একটু পরে দেখি ওর হাতটা আমার হাতের কাছে এসে ইতস্তত করছে। বইটি শব্দ করে বন্ধ করে দিলাম। চমকে উঠল ও। উঠে দাঁড়ালাম আমি। তারপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, কাল বিকালে একটু আমার সঙ্গে বেরোতে পারবে? কটা কথা আছে। সাড়ে পাঁচটায় আমি কাফেটেরিয়ায় থাকব।

এবার হয়তো গল্পটা কিছুটা জমে এসেছে, না শোভন? এর পরের কাহিনিটুকুতে বৈচিত্র্য আরো বেশি, বৈশিষ্ট্য আরো অনেক। ঠিক এ মুহূর্তে আমার মনের অবস্থা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না শোভন। একটি তরুণের প্রথম প্রেমের পরম মুহূর্তের এ মানসিকতাটুকু ফুটিয়ে তোলবার ভার তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম। সে বিশ্বাসও তোমার কলমের ওপর আমার আছে।

পরদিন সাড়ে পাঁচটার আগেই সীতা এসে কাফেটেরিয়ায় হাজির। বলল, আজ আফিসে যাই নি। দুকাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। কী কথা বলার জন্যে এ প্রস্তুতি সেটা না বোঝার মতো বয়স মোটেই নয় সীতার। কিন্তু আশ্চর্য গম্ভীর আর অবিচল দেখাল সীতাকে। সমস্ত চেতনাকে সজাগ রেখে সেকথা শোনবার এতটুকু চাঞ্চল্য নেই ওর চোখেমুখে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমাকে অনুসরণ করে চলেছে।

গঙ্গার একটা নির্জনতম কোণে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, সন্ধে তখন সুযোগের আবছা পর্দা টেনে দিয়েছে আমাদের চারপাশে। প্রায় জল ছুঁয়ে এসে বসলাম আমরা।

কথা হারিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি দুজনে। সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণের কনে-দেখা আলোতে এর আগেও গঙ্গাকে দেখেছি বহুদিন। কিন্তু আজকের গঙ্গা যেন অন্য গঙ্গা। অন্য সুর তার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে; অন্য স্বর দূর-বন্দর জাহাজের ডাকে আর অন্য স্বাদ এর ঝিরঝির বাতাস-বুলানো পরিবেশে।

কেন এসেছিলাম যেন ভুলে গেলাম। হারিয়ে ফেললাম আবার প্রায় খুঁজে পাওয়া কথার রেশ। নতুন করে তারা ওঠা দেখলাম গাঙ্গেয় আকাশে। নতুন করে আলো জ্বলা দেখলাম দূর গঙ্গার কালো বুকে।

টক করে কী যেন পড়ল পায়ের কাছে। ছন্দপতন। সজাগ হয়ে ফিরে তাকাই।

অন্যমনস্কে চুড়িটা হাত থেকে খুলছিল আর পরছিল বোধহয় সীতা। হাত ফসকে পায়ের কাছে একটা পাথরের ওপর পড়েছে সেটা।

হঠাৎ খেয়াল হল,তাই তো, কিছু বলা হল না যে। এবার বলা উচিত। কতক্ষণ আর বসিয়ে রাখব এভাবে ঝড়-তোলপাড় সীতাকে।

মনে মনে আমি প্রস্তুত হচ্ছি কী করে শুরু করব, আচম্‌কা ও কান্নায় ভেঙে পড়ল আমার কোলের ওপর, কেন আপনি আমায় ভালোবাসতে গেলেন। জানেন, এখানেই এ সময়েই আরো অনেকদিন আমি অনেকের পাশে ঠিক এমনি অন্তরঙ্গ ভাবে এসে বসেছি। হয়তো কালকেও আবার আসব নতুন কারো সঙ্গে।

ঠিক এ মুহূর্তের আমাকে আমি বোঝাতে পারব না তোমাকে শোভন। শুধু মনে আছে বজ্রহাতের মতো শ্লথ-চেতন অবস্থায় বসেছিলাম কতক্ষণ যেন। ধীরে ধীরে ও আমার হাত দুটো তুলে নিল। নিজের গালটা চেপে ধরল হাতে না, না এ হতে পারে না। জানেন, এই বোধহয় আমার জীবনের প্রথম পুরুষ যাকে আমি অস্বীকার করছি। অবলীলায় ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সে শুধু আপনি বলেই! কেন জানেন, হ্যাঁ জেনে যান, নাহলে হয়তো ভুল বুঝবেন আমাকে। আর, একটা বিরাট সামাজিক অভিশাপের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে যান। আপনারা সাহিত্যিক, হয়তো প্রয়োজন হবে। তারপর বাড়ি গিয়ে বিচার করবেন এ অভিশাপের জন্যে দায়ি কে?

তারপর বলে গেল সীতা ওর নিজের কাহিনি। বাবা ওর মাকে ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ওর

ছেলেবেলাতেই। জমিজমার স্বল্প সংস্থান থেকে এরপর কী দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন মা সীতাকে তা আজো সীতা জানে না, মাঝে মাঝে ভেবে শুধু বিস্ময়ে অবাক হয়েছে। তারপর ম্যাট্রিক পাস করল সীতা। ঠিক এসময় ওদের ঘাড়ে এসে পড়ে মাসিমার মৃত্যুর পর তার একমাত্র মেয়ে, যাকে সীতার আপন বোন বলে ভেবেছিলাম আমি। কিন্তু ততদিনে সীতাও দুটো একটা টিউশনি করে কিছু রোজগার করতে শুরু করেছে। কোনোমতে তিনটি প্রাণীর চলে যায় আর কি। কিন্তু ঠিক এ সময়ে হল দেশবিভাগ। দেশ ছেড়ে চলে আসতে হল ওদেরও। তারপর এঘাটে ওঘাটে ধাক্কা খেতে খেতে কী করে যে এসে এখানে ঠেকেছিল সে কাহিনি ইচ্ছা করেই বলল না সীতা, আর দশজনের মতো,গতানুগতিক না হলেও, একই কাহিনি বলে। তবু কপালগুণে একটা চাকরি পেয়ে গেল সীতা এ দুর্দিনে। টাইপ আর শর্টহ্যান্ড দেশে থাকতেই শেখা ছিল বলেই, না হলে হয়তো আরো কত ঘাট ঘুরতে হত কে জানে।

স্বপ্নের জোয়ারে তখন ভাসছে সীতা। স্বপ্নের ইমারৎ গড়ছে কল্পনায়। নিঝুম কুমারী রাতে আগামি জীবনের কত স্বপ্নই না দেখত সে। একা একাই কখনও লজ্জায় লাল হয়ে উঠত ওর কান, কখনও বা খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠত স্বপ্নালু চোখদুটো। সংসারের হালও ফিরতে শুরু করল দিনে দিনে। কিন্তু সমস্ত স্বপ্নই চুরমার হয়ে গেল কদিন পর। বড়ো সাহেবের পার্সোন্যাল এ্যাসিস্টেন্ট ছিল সীতা। বিশেষ কাজ ছিল বলে রাত্রে একদিন অনেকক্ষণ থাকতে হল ওর। আর ভোরে যখন ফিরে এল সঙ্গে করে নিয়ে এল পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি। কিন্তু পিছে ফেলে এল ওর স্বপ্ন-ইমারতের ধ্বংসচূর্ণ। একটি জীবনকে চুরমার করে দেবার পক্ষে একটি রাত্রিই কত শক্তিশালী!

তারপর সত্যিই চাকরির উন্নতি হয়েছে সীতার। আর, পুনরাবৃত্তি হয়েছে ক্রমাগত সে রাতটির। এর পর থেকেই কেমন যেন বদলে গেল সীতা। কিসের যেন এক নেশা পেয়ে বসল ওকে। এতদিন ও ছিল শিকার, এবার হয়ে বসল শিকারী। দুদিনে সংসারের, নিজের হাল ফিরিয়ে ফেলল সীতা। এখনও জীবনের নবাগতদের হয়তো কোনো দুর্বল মুহূর্তে ভালো লাগে ওর, কিন্তু তখনই ঝেড়ে ফেলে দেয় সে ক্ষণ-মোহ। এগিয়ে যায় রিক্ত-মন শুধু দেহ নিয়ে। আর ওর জীবনেও যারা এসেছে, তারা সকলেই প্রায় এসেছে একটি বিশেষ প্রয়োজনেই। কোনো ব্যতিক্রম দেখেনি ও এ-পর্যন্ত।

কাহিনি শেষ করে আবার আমার হাত দুটো চেপে ধরল সীতা। না, না, এর পরও আমায় আর ভালোবাসবেন না আপনি। বাড়ি ফিরে যান। নিষ্কলঙ্ক মেয়ে দেখে বিয়ে করুন, নতুন সংসার পাতুন। সমাজে প্রতিষ্ঠা পান। এই আমার একান্ত কামনা।

মন্ত্র-মুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াই। অমান্য করতে পারি না ওর আদেশ। কিন্তু একটু যেতেই ও ডাকল আবার, কাছে এসে বলল, মাস্টারমশায়, আমাকে পড়াবেন না আর? আমায় যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এ জীবন আমি কার হাতে তুলে দেব?

কেমন যেন এক বিতৃষ্ণায় ছেয়ে আসছিল মনটা। বললাম, ভেবে দেখব।

আবার পা বাড়ালাম! কিন্তু কিছুদূর যেতেই দেখি দৌড়ে আসছে সীতা। দাঁড়ালাম। কাছে এসে ও অদ্ভুত দুটো চোখ তুলে ধরল আমার মুখের ওপর। বলল, আর একটি কথা, এই শেষ কথা, আচ্ছা আমাকে আপনি ঘৃণা করবেন? আমাকে ঘৃণা করবেন না আপনি?

কোনো উত্তর না দিয়ে ফিরে এলাম।

এ কাহিনির এখানেই শেষ। পরদিনই আচম্কা চাকরি পেয়ে চলে আসি শিলং। এ রকম একটা পরিণতি হয়তো ঠিক সাজানো গল্পের পরিণতির উপযুক্ত নয়। কিন্তু আগেই বলেছি শোভন, একে ঢেলে সেজে সত্যি গল্প তৈরি করার জন্যেই শুধু কিছুটা উপকরণ তোমার হাতে তুলে দিলাম। আর একটি অনুরোধ, দেখো মেয়েটির ওপর যেন অবিচার না করা হয়। আজ এখানেই থাক। অনেক বড়ো হয়ে গেল চিঠিটা। শুভেচ্ছান্তে—

শান্তনু

পুঃ- জানি না তোমার কাজে লাগবে কিনা, কিন্তু আমার তরফ থেকে আর একটি কথা তোমাকে জানানো প্রয়োজন মনে করছি — অনেক চেষ্টা করেও আমি ঘৃণা করতে পারছি না সীতাকে। অনেক চেষ্টা করেও না।

পরিণাম রমণীয়



ইন্দ্রমিত্র

কতদিনে আসবে কে জানে। যতদিন না আসে ততদিন দুর্গতির অন্ত নেই। রান্না থেকে আরম্ভ করে সব কাজ উদয়াস্ত নিজের হাতে করে যেতে হচ্ছে। এ কি মানুষে পারে?

মিসেস ঘোষাল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সকাল থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার পর্যন্ত সময় পাওয়া যায়নি। এখন এতক্ষণে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিঞ্চিৎ স্বস্তি পাওয়া গেল।

বলা বাহুল্য, ঘোষাল সাহেব আপিসে। ডেপুটি ম্যানেজার থেকে সদ্য ম্যানেজার হয়েছেন, খুব সুখের কথা। তা বয়স একটু হয়েছে বইকি। কিন্তু বয়স হলেও পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নেই। হাজার বুড়ো হলেও পুরুষমানুষ চিরকাল কচিডাবের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে। বয়স যত বাড়ে, কচিডাবের জন্য জিভ যেন তত বেশি লকলক করে। ঢের-ঢের দেখা আছে।

মিসেস ঘোষাল আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিন্তু আগের দীর্ঘশ্বাসটির সঙ্গে এই দীর্ঘশ্বাসটির কোনো মিল নেই— একেবারে আলাদা গোত্রের দীর্ঘশ্বাস।

হঠাৎ টেলিফোন তুললেন। অভাবনীয় কাণ্ড, ডায়ালটোন পাওয়া যাচ্ছে। এমন দুর্ঘটনা তো আজকাল টেলিফোনে ঘটে না। এবং, বিস্ময়ের পর মহাবিস্ময়, লহমার মধ্যে পাওয়া গেল ঘোষাল সাহেবের গলা— হ্যালো।

মিসেস ঘোষাল বললেন— শোনো, আমি বলছি।

—বলো।

—তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ?

—হ্যাঁ, একটা কনফিডেনশিয়াল নোট দিচ্ছি। খুব আর্জেন্ট। কেন?

— না, তেমন কিছু নয়। দুপুরে কি কোথাও বেরোবে?

—না।

—তাহলে গাড়িটা পাঠিয়ে দাও। একটু টুকিটাকি মার্কেটিং আছে, দুপুরেই সেরে ফেলব।

—এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে মিসেস ঘোষাল ভাবলেন আর্জেন্ট কনফিডেনশিয়াল নোটের কথা। গোড়া থেকে সতর্ক না হলে এই আর্জেন্ট কনফিডেনশিয়াল নোট থেকে অনেক কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। সকলের মনে রাখা ভালো, বহু সর্বনাশের মূলে থাকে আর্জেন্ট কনফিডেনশিয়াল নোট।

গাড়ি এসে গেল। ড্রাইভারের নাম পরিতোষ। মিসেস ঘোষাল তাকে ডেকে আনলেন নিজের ঘরে। বললে— পরিতোষ খবর কী?

বাড়িতে যদিও আর কেউ নেই তবুও পরিতোষ এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে বলল— সাহেব আর্জেন্ট কনফিডেনশিয়াল নোট দিচ্ছেন।

—নোট নিচ্ছে কে?

যেন নিজের সমূহ সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে এমনি আর্ত গলায় পরিতোষ বলল— মিস ভৌমিক।

— সেই মিস ভৌমিক ?

—হ্যা, সেই মিস ভৌমিক।

বড়ো-বড়ো নিশ্বাস ফেলে মিসেস ঘোষাল বললে— কেন? সেই মিস ভৌমিক ছাড়া আপিসে কি আর স্টেনোগ্রাফার নেই?

—থাকবে না কেন, গণ্ডায়-গণ্ডায় আছে। কিন্তু তাদের সকলেরই পরনে কোটপ্যান্ট, কারও-কারও জমকালো গোঁফ, কেউ-কেউ দাড়ি পর্যন্ত রাখেন। ঘরের সামনে লালবাতি জ্বালিয়ে কি আর তাদের আর্জেন্ট কনফিডেনশিয়াল নোট দেওয়া যায়?

মিসেস ঘোষাল আপনমনে বললে— হ্যাঁ, তখন মিস ভৌমিক, মিস ভৌমিক, মিস ভৌমিক। আর্জেন্ট কনফিডেনশিয়াল নোট...

পরিতোষ বাক্যটি সম্পূর্ণ করে দিল— মানেই মিস ভৌমিক।

—তা সে যাই হোক, পরিতোষ, তুমি কিন্তু সবসময়ে কড়া নজর রাখবে।

— তা তো রাখি। কিন্তু লালবাতি জ্বললে আমি তো আর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারি না।

— তা তো বটেই। কিন্তু এমনভাবে নজর রাখবে যেন ঘোষাল সাহেব ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে না পারেন। তিনি যেন কিছুতেই বুঝতে না পারেন যে তোমার কাছ থেকেই আমি সব খবর পেয়ে যাচ্ছি।

পরিতোষ আশ্বাস দিয়ে বলল, আমি খুব সাবধান হয়ে কাজ করি। কারও কিছু ধরবার সাধ্য নেই। খুব হুঁশিয়ার।

ভিজে-ভিজে গলায় মিসেস ঘোষাল বললেন— পরিতোষ, আমার এই দুঃসময়ে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।

গলা নিচু করে পরিতোষ বলল— জানি। আর তাই আমি এমনভাবে কাজ হাসিল করে যাচ্ছি যেন কিছুতেই ধরা না পড়ি।

—জানি। তবু সবসময়ে সাবধান থাকা ভালো। সাবধানের মার নেই।

কথাটা ষোলোআনা খাঁটি। পরিতোষ সায় দিয়ে বলল— ঠিক কথা। লাখ কথার এক কথা।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিসেস ঘোষাল বললেন— পরিতোষ, মিস ভৌমিককে তো তুমি নিজের চোখে দেখেছ। তার চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারো?

পরিতোষ গড়গড় করে বলল— হর্ন ভালো, স্টিয়ারিং সুন্দর, সিট পরিপাটি, মডার্ন ডিজাইন, রঙের কাজ নিখুঁত কিন্তু এঞ্জিন কেমন বলতে পারব না।

এইরকম স্টেনোগ্রাফারকে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোষাল সাহেব ঘরের সামনে লালবাতি জ্বালিয়ে আর্জেন্ট কনফিডেনশিয়াল নোট দিয়ে যাচ্ছেন! রাগেদুঃখে মিসেস ঘোষাল জ্বলতে লাগলেন। নিরুপায়, সব সহ্য করে যেতে হচ্ছে। উদ্ধারের কোনো রাস্তা তো দেখা যাচ্ছে না। এ-বিষয়ে কারও কাছে নালিশ নিষ্ফল কারণ ঘোষাল সাহেব কাজের অছিলা দেখিয়ে চমৎকার পার পেয়ে যাবেন। লাভের মধ্যে পাঁচজন মিসেস ঘোষালের কলচরের অভাব নিয়ে আড়ালে হাসাহাসির কলচর করবেন।

টেলিফোন বেজে উঠল। বাঁ হাত বাড়িয়ে মিসেস ঘোষাল রিসিভার তুলে নিলেন— হ্যালো।

ওপার থেকে ঘোষাল সাহেবের গলা ভেসে এল— এখনও মার্কেটিং-এ যাওনি?

—এখনই যাচ্ছিলাম।

—ও, আচ্ছা। তা শোনো, একটা সুখবর আছে।

—কী?

ঘোষাল সাহেব নকশা করে বললেন— বলো তো কী। খুব সুখবর। বিশেষ করে তোমার পক্ষে।

কী সুখবর হতে পারে! মিসেস ঘোষাল বললেন— আমার তো কিছুই মাথায় আসছে না। খুলে বলো।

ঘোষাল সাহেব খুলে বললেন— কদিন থেকে বলছিলে না রান্না থেকে আরম্ভ করে সব কাজ উদয়াস্ত নিজের হাতে করতে তোমার অসহ্য হয়ে উঠেছে?

—বলছিলাম।

—তা আমিও আমাদের হেডক্লার্ককে সেকথা বলেছিলাম। তিনি কথাটা মনে রেখেছেন। আজ একেবারে মেয়েটিকে আপিসে এনে হাজির করেছেন।

—খুব ভালো খবর। কাজকর্ম যদি ঠিকমতো করতে পারে তো আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

—আরে তোমাকে বাঁচানোর জন্যেই তো আমি হেডক্লার্ককে বলে-কয়ে ব্যবস্থা করলাম। তবে একটা অসুবিধা আছে। খুবই অসুবিধা। কিন্তু সবরকম সুবিধা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন...

—কী অসুবিধা?

— মেয়েটি রান্না থেকে সব কাজ করতে পারবে কিন্তু মাছ-মাংস-ডিম রান্না করতে পারবে না।

— কেন? মেয়েটি বিধবা নাকি?

—আরে না, না। বিধবা হওয়া কি এতই সোজা, বিয়েই হয়নি তো বিধবা হবে কোত্থেকে, গাছে না উঠতেই এককাঁদি? হয়েছে কী, মেয়েটি বহুদিন একজন সাত্ত্বিক বামুন পণ্ডিতের বাড়িতে কাজ করেছে, ফলে মাছ-মাংস ডিমের গন্ধে চোখে অন্ধকার দেখে।

অগত্যা মিসেস ঘোষাল বললেন, যাকগে মাছ-মাংস-ডিম না হয় আমিই রান্না করে নেব। তুমি মেয়েটিকে পাঠিয়ে দাও।

ঘোষাল সাহেব বললেন— একা-একা কেমন করে বাড়ি চিনে যাবে? তুমি মার্কেটিং সেরে ...।

মিসেস ঘোষাল বললেন— মার্কেটিং এখন থাক। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি পরিতোষের সঙ্গে মেয়েটিকে পাঠিয়ে দাও। তুমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি আসছ তো?

দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শুনিয়ে ঘোষাল সাহেব বললেন— বোলো না, বোলো না। ম্যানেজার হওযার অনেক জ্বালা। একটা আর্জেন্ট কনফিডেনশিয়াল নোট শেষ হতে-না-হতেই আরেকটা এসে পড়ে। উপায় নেই, বাড়ি ফিরতে দেরি হবে।

মিসেস ঘোষাল ঝপাং করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

পরিতোষ গাড়ি নিয়ে চলে গেল। মেয়েটিকে নিয়ে আসতে সময় লাগল না। মিসেস ঘোষালের দরবারে মেয়েটিকে দাখিল করে দিয়ে আবার গাড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি আপিসে ফিরে গেল পরিতোষ। সাহেবের ঘরের সামনে লালবাতি। সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

আর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন মিসেস ঘোষাল। অসামান্য রূপসি। মিসেস ঘোষাল মনে-মনে মানতে বাধ্য হলেন যে এমন রূপসি সহসা চোখে পড়ে না। এই মেয়ে বাড়িতে কাজ করবে— রান্না থেকে আরম্ভ করে সব কাজ?

ধাতস্থ হয়ে মিসেস ঘোষাল জিজ্ঞেস করলেন— তোমার নাম কী?

হাতজোড় করে নিখুঁত একটি নমস্কার করে মেয়েটি হাসল— আগে আমার একটি কদর্য নাম ছিল। পণ্ডিতমশাই সেটি লুপ্ত করে দিয়ে আমার নতুন নাম রেখেছেন 'বিশাখা।' পণ্ডিতমশাই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত নামটি আমি সযত্নে লালন করতে চাই। আপনি আমাকে 'বিশাখা' বলেই ডাকবেন।

এ যে একেবারে সাধুভাষায় কথা কইছে।

মিসেস ঘোষালের মনের কথা আন্দাজ করে বিশাখা বলল— আমার মুখের ভাষা শুনে বিস্মিত হচ্ছেন? বিস্মিত হবে না। পণ্ডিতমশায়ের সাহচর্যের ফলে আমার ভাষায় অশুদ্ধতা অল্প। আমাকে মার্জনা করবেন।

মিসেস ঘোষাল ব্যস্ত হয়ে বললেন— না, না, না, মার্জনা-টার্জনার কথাই ওঠে না। শুদ্ধ ভাষা খারাপ কী? তা তুমি রান্না— মাছ-মাংস-ডিম বাদ, যদিও উনি প্রোটিন খুব পছন্দ করেন— থেকে আরম্ভ করে সব কাজ পারবে তো?

বিশাখা নম্রভাবে বলল— আত্মপ্রশংসা ভালো নয়, আপনি দু-একদিন পরীক্ষা করে দেখুন। আপনাদের দুজনের সাজানো-গোছানো সংসার, রান্না আর শয্যারচনা ছাড়া কী আর এমন কাজ।

মিসেস ঘোষাল আঁতকে উঠে বললেন— না, না, শয্যা তোমাকে রচনা করতে হবে না, ও আমি নিজেই করে নেব, বিছানার ধারেকাছে তোমার আসবার দরকার নেই।

বিশাখা মুখ নিচু করে বলল— আপনি যেমন আদেশ করবেন তেমনি হবে।

বিশাখাকে তার ঘর দেখিয়ে দিলেন মিসেস ঘোষাল। কিন্তু মনের মধ্যে নতুন অশান্তি এসে গেল। ঘোষাল সাহেব প্রোটিন খুব পছন্দ করেন। বিশাখা যদিও মাছ-মাংস-ডিমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না কিন্তু ও যে নিজেই আগাগোড়া জলজ্যান্ত প্রোটিন।

আপিসে আর্জেন্ট কনফিডেনশিয়াল নোট। বাড়িতে আগাগোড়া জলজ্যান্ত প্রোটিন। আপিসে পরিতোষ ভরসা। বাড়িতে, মিসেস ঘোষাল মনে-মনে ভাবলেন নিজেকেই কড়া নজর রাখতে হবে।

আচ্ছা, বিশাখা কি জানে যে সে দারুণ রূপসি।

বিশাখাকে ডেকে পাঠালেন মিসেস ঘোষাল। জিজ্ঞেস করলেন— বিশাখা, নিজের রূপ সম্পর্কে কি তোমার কোনো ধারণা আছে?

বিশাখা ঘাড় নেড়ে বলল— না। কিন্তু পণ্ডিতমশাই বলতেন যে আমার মতো কাউকে দেখেই নাকি মহাকবি কালিদাস মর্মে-মর্মে অনুভব করেছিলেন কাকে বলে পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চরিণী পল্লবিনী লতা, কাকে বলে তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যেক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা। আমি আর কী বলব।

বিশাখা চলে গেল। মিসেস ঘোষাল অবাক হয়ে ভাবলেন, মেয়েটা সাংঘাতিক তো, গড়গড় করে একগাদা সংস্কৃত আউড়ে দিল।

দু-একদিনেই টের পাওয়া গেল বিশাখা কাজকর্মে অসম্ভব পটু। মিসেস ঘোষাল বিছানার ধারেকাছে যেতে দিচ্ছেন না বিশাখাকে, কিন্তু বিশাখার অন্য সব কাজকর্ম তাকিয়ে দেখার মতো। কোনো কথা দুবার বলতে হয় না, সব কাজ নিখুঁত, সুন্দর, পরিষ্কার।

আর রান্না? সে-বিষয়ে লিখে কিছু বোঝানো অসম্ভব। যে না খেয়েছে সে বুঝবে না। নিরামিষ যে এমন অমৃত হতে পারে মিসেস ঘোষাল কোনোদিন তা কল্পনাও করতে পারেননি। রান্না খেয়ে মিসেস ঘোষালের জল আসে— জিভে আর চোখে। হায়! এই রান্নার জোরেই বিশাখা যদি ঘোষালসাহেবকে উড়িয়ে নিয়ে যায়!

খেতে-খেতে সেদিন ঘোষালসাহেব বললেন— বিশাখা, মুগডাল আর আছে? থাকলে আমাকে আরেকটু মুগডাল দিয়ে যাও তো।

বিশাখা নিয়ে এল মুগডাল। সন্তর্পণে ঢেলে দিল ঘোষাল সাহেবের বাটিতে। মুগডাল দিয়ে ভাত মেখে গোগ্রাসে খেতে লাগলেন ঘোষালসাহেব। মিসেস ঘোষালের নিজের হাতে রাঁধা রুইমাছের কালিয়া পড়ে আছে একদিকে, সেদিকে যেন হুঁশই নেই।

গোড়াতেই তাড়াহুড়ো করা অবিবেচনার কাজ। মিসেস ঘোষাল আস্তেসুস্থে বললেন — তোমার রুইমাছের কালিয়া যে পড়ে রইল। কেবল মুগডালই যদি খাবে তো রুইমাছ কখন খাবে?

খেতে খেতে ঘোষালসাহেব বললেন— রুইমাছ আজ আর খাব না। পড়ে থাক, বেড়ালে খাবে। ঢের রুইমাছ খেয়েছি, এমন মুগডাল জীবনে কখনও খাইনি।

নিজেকে সামলে নিয়ে মিসেস ঘোষাল বললেন— কিন্তু মাছ না খেলে ..

— প্রেটিনের অভাবের কথা তো? - - ঘোষালসাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন— ভালো রান্না পেলে প্রোটিন-ফ্রোটিনের হিসেব রাখার দরকার হয় না। ডাক্তারদের ওসব বাঁধাবুলি ভুলে যাও।

দু-একদিন হলে কিছু যেতে-আসত না, কিন্তু দিনের পর দিন যাচ্ছে, ঘোষাল সাহেব ক্রমশ নিরামিষের দিকে ঢলে পড়ছেন। মাছ-মাংস-ডিম ছাড়া যার একেবারেই চলত না এখন যেন মাছ-মাংস-ডিমের দিকে তার কণামাত্র টান নেই। আঃ, আজ পটলের ডালনাটা কী চমৎকার হয়েছে!— বিশাখা, পটলের ডালনা আর আছে? থাকলে আমাকে আরেকটু পটলের ডালনা দিয়ে যাও তো।

আপিসের কাজের চাপও মনে হচ্ছে আগের থেকে কমে গেছে। আজকাল ঘোষাল সাহেব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসছেন। মিসেস ঘোষালের চোখে কিছুই এড়াচ্ছে না।

আর ঘোষাল সাহেবও যেন দিব্যদৃষ্টি পেয়েছেন। একদিন বললেন— বাড়ির চেহারা কেমন যেন বদলে গেছে। জানালার পর্দা থেকে আরম্ভ করে ঘরের মেঝে পর্যন্ত সবকিছু চকচকে হয়ে আছে। বিশাখা কাজকর্ম তাহলে ভালোই করছে, কী বলো?

কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। মিসেস ঘোষাল শুকনো গলায় বললেন— ভালোই তো মনে হচ্ছে।

ঘোষাল সাহেব খুশি হয়ে বললেন— হেডক্লার্ক তাহলে আমাকে ঠকায়নি, ভালোই জোগাড় করে দিয়েছে। ঠিক আছে, নেমকহারামি করব না, হেডক্লার্ককে এবার তিনটে অ্যাডভান্স ইনক্রিমেন্ট দিয়ে দেব।

অল্পদিনের মধ্যেই, কী কাণ্ড, বাড়িতে মাছ-মাংস-ডিমের পাট উঠে গেল। ঘোষাল সাহেব পুরোপুরি নিরামিষ খাচ্ছেন তারিয়ে-তারিয়ে। কার জন্য আর মাছ-মাংস-ডিম রাঁধন, মিসেস ঘোষাল রান্নাঘরে যাওয়া ছেড়ে দিলেন, রান্নাঘর পুরোপুরি বিশাখার দখলে চলে গেল।

বিশাখা আসার আগে রান্না থেকে আরম্ভ করে সব কাজ মিসেস ঘোষালকে উদয়াস্ত নিজের হাতে করে যেতে হত, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার সময়ের পযন্ত অনটন ছিল। কিন্তু এখন বলতে গেলে কুটোটিও নাড়তে হয় না, প্রায় সব কাজই বিশাখা অবলীলায় করে দেয়। হাতে এখন অফুরন্ত সময়— হাজার-হাজার দীর্ঘশ্বাস ফেলেও সময় আর ফুরোয় না।

দুপুরবেলা। বিশাখা কাছে এসে দাঁড়াল।

মিসেস ঘোষাল বললেন— কী চাও?

বিশাখা অবাক হয়ে তাকাল মিসেস ঘোষালের মুখের দিকে। বলল— আমি? আমি কী চাই? আমি চাই স্বারাজ্য।

—কী?

—স্বারাজ্য।

– স্বারাজ্য কী?

দুচোখ বন্ধ করে বিশাখা বলল— পণ্ডিতমশায়ের মুখে শুনেছি, মনু বলেছেন, সর্বভূতেষু চাত্মনং সর্বভূতানি চাত্মনি— সমং পশ্যনাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।— অর্থাৎ, যে সর্বভূতে নিজেকে এবং নিজের ভিতর সর্বভূতকে দেখতে পায় সেই আত্মযাজী স্বারাজ্য লাভ করে।

মিসেস ঘোষাল বিকেলের মতো তাকিয়ে রইলেন। এইপ্রথম তাঁর মনে হল যে সংস্কৃত ভাষা সমূলে তুলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুব ভালো কাজ করেছে।

মিসেস ঘোষালের চোখমুখ দেখে বিশাখা বলল— মনু বুঝি আপনার ভালো লাগল না? বেশ, তাহলে ভাগবত থেকে শুনুন। ভাগবতে আছে; ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্— কাময়ে দুঃখতপ্তানং প্রাণিনামার্তিনাশনম্। —অর্থাৎ, আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, পুনর্জন্মনিবৃত্তিও চাই না, দুঃখতপ্তনাংপ্রাণিগণের আর্তিনাশই চাই।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে মিসেস ঘোষাল মনে-মনে বললেন— পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জয় হোক। সংস্কৃত ভাষা নিপাত যাক।

রাত্তিরে গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনে ঘোষাল সাহেবের ঘুম বেমক্কা ভেঙে গেল। বেডসুইচ টিপলেন। মিসেস ঘোষাল চোখ উলটে পড়ে আছেন, মুখ ফেনা, সম্বিৎ নেই।

ঘোষাল সাহেব তক্ষুনি ডক্টর সান্যালকে টেলিফোন করলেন। হ্যাঁ, এক্ষুনি চলে আসুন। পরিতোষ ছুটে এল। বিশাখা ছুটে এল।

অবিলম্বে চলে এলেন ডক্টর সান্যাল। পরীক্ষা করে বললেন— হাইপ্রেসার, মনে হচ্ছে মাইল্ড কার্ডিয়াক অ্যাটাক, দারুণ নার্ভাস ব্রেকডাউন। এক্ষুনি নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হবে।

নার্সিংহোমে একটানা তিনদিন অজ্ঞান হয়ে রইলেন। ডক্টর সান্যাল বললেন— জ্ঞান না ফিরলে কিছু বলতে পারছি না। অজ্ঞান অবস্থায় প্রচুর ভুল বকছেন, নিদারুণ গালমন্দ করছেন নিরামিষকে, সংস্কৃত ভাষাকে, হেডক্লার্ককে।

ঘোষাল সাহেব অসহায়ভাবে বললেন— নিরামিষ ভালো জিনিস। সংস্কৃত খারাপ ভাষা নয়। আমার হেডক্লার্ক পরোপকারী জীব— তিনটে অ্যাডভান্স ইনক্রিমেন্ট দিয়েছি। তবে?

—তবে-টবে কিছু নয়।— ডক্টর সান্যাল হাত নেড়ে আশ্বাস দিলেন— অজ্ঞান অবস্থায় মানুষ কত কী বলে। ওসবের কোনো মানে নেই।

তিনদিন বাদে জ্ঞান ফিরে এল। বললেন— আমি কোথায়?

ঘোষাল সাহেব মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন— তুমি নার্সিংহোমে আছ। ভয় নেই।

— তোমার বিছানা কে পেতে দিচ্ছে?

— বিশাখা। ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। বিশাখা চমৎকার বিছানা পাতে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস ঘোষাল পাশ ফিরে শুলেন। হায়, বিছানাও বিশাখার হাতে চলে গেল!

ঘোষাল সাহেব দেখা করলেন ডক্টর সান্যালের সঙ্গে। ডক্টর সান্যাল বললেন— ভয় নেই। ডেঞ্জার ইজ ওভার। দিন পাঁচেক বাদে বাড়ি নিয়ে যাবেন।

ডক্টর সান্যালের কথামতো নার্সিংহোম থেকে ছুটি হয়ে গেল। সকালবেলা ঘোষাল সাহেব বাড়ি নিয়ে এলেন মিসেস ঘোষালকে।

ঘোষাল সাহেব আফিসে যেতে চাইলেন না. কিন্তু মিসেস ঘোষাল জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন— যাও। আমি ঠিক আছি। তুমি না গেলে হয়তো অনেক আর্জেন্ট কনফিডেনশিয়াল নোট জমা হয়ে থাকবে. শেষে তোমারই অসুবিধে হবে।

এবার মিসেস ঘোষাল মনস্থির করে ফেলেছেন। সবদিক যখন সামলানো যাবে না তখন আপিসে যা হওয়ার হোক, বাড়ি অন্তত নিষ্পাপ থাক। ঘোষাল সাহেব বাড়িতে থাকলে হয়তো নিজের মনের মতো কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যাবে না।

মিসেস ঘোষাল ডাকলেন বিশাখাকে। জিজ্ঞেস করলেন— তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?

-হ্যাঁ।

- তোমার জিনিসপত্তর বাঁধাছাদা করে নাও।

—আজ্ঞে?

—এক কথা কতবার বলব? তোমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিচ্ছি, তোমার জিনিসপত্তর নিয়ে এইমুহূর্তে চলে যাও. তোমাকে আমার আর দরকার নেই।

যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল। কিন্তু বিশাখা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। চটপট তৈরি হয়ে নিল। যাওয়ার আগে শান্ত গলায় বলল— আমি জানতাম যে আমাকে এখান থেকে অবিলম্বে চলে যেতে হবে।

মিসেস ঘোষাল চমকে উঠলেন— কী করে জানতে!

বিশাখা বলল — আপনি আমাকে সহ্য করবেন না, কারণ আমি আপনার চেয়ে ঢের ভালো ঘরদোর গুছোতে জানি।

—তুমি আমার চেয়ে ঢের ভালো ঘরদোর গুছোতে জানো, একথা কে তোমাকে বলেছে?

বিশাখা সদর্পে বললে— একথা সাহেব আমাকে বলেছেন। তারপর রন্ধনে আমি আপনার চেয়ে ঢের বেশি নিপুণা।

—একথা কে তোমাকে বলেছে?

বিশাখা গাঢ় গলায় বলল— একথা সাহেব আমাকে বলেছেন। তারপর আমি আপনার চেয়ে ঢের বেশি রূপসি।

কপালের ঘাম মুছে নিয়ে মিসেস ঘোষাল বললেন— একথা কে তোমাকে বলেছে?

বিশাখা নির্ভয়ে বলল— একথা সাহেব আমাকে বলেছেন। তারপর শয্যারচনায় আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশী গুণবতী।

মিসেস ঘোষাল নির্জীব গলায় বললেন—একথা কে তোমাকে বলেছেন?

বিশাখা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল —একথা সাহেব আমাকে বলেছেন। তারপর শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে আমি আপনার চেয়ে ঢের বেশি ভালো।

মিসেস ঘোষাল প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন— একথাও সাহেব তোমাকে বলেছে?

— না— ঘন ঘন ঘাড় নাড়ল বিশাখা— একথা সাহেব আমাকে বলেননি। পরিতোষ বলেছে।

বাগাল



সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ধানু মোড়লের খড়কাটার কুঠুরিতে ওপরে খড় নীচে খড় মধ্যিখানে বছর আষ্টেক বয়সের এক মানুষ শীতের লম্বাটে রাতগুলোকে ভোর করে। একখানা চটও আছে। গুটিয়ে পড়ে থাকে একপাশে। মোড়ল বলে, 'তু এত খ্যাদোড় ক্যানে রে হরিবুলা?'

সেই খুদে মানুষ শুধু দাঁত বের করে।

খ্যাদোড় মানে নোংরা। মোড়লগিন্নি সন্দিগ্ধভাবে খড়গুলোর দিকে তাকাতে আসে। মানুষের হিসিমাখা খড় গোরুকে খেতে দেওয়া অধর্ম। 'বল্ সত্যি করে, বিছানা লষ্ট করেছিস নিকি?' মোড়লগিন্নি তর্জনগর্জন করেন।

হরিবোলা নিজের কান ছুঁয়ে তিনসত্যি করলেও সন্দেহ ঘোচে না।

ধানু মোড়ল বলে, 'উই হুদ্‌মুসলোর তিনসত্যির কিছু মুইল্লো আছে? ছেড়ে দাও বরঞ্চ।'

হুদ্‌মুসলো মানে গোঁয়ার। এবার মোড়লগিন্নি তাকে মোক্ষম আখ্যাটিতে ভূষিত করে, 'হাসতে লজ্জা করে না রে ক্যালাগোবিন্দা?'

অর্থাৎ নির্বোধ। হরিবোলার এই তিনি আখ্যা। খ্যাদোড়, হুদ্‌মুসলো ক্যালাগোবিন্দা। আঞ্চলিক ভাষায় নিকৃষ্ট এই শব্দগুলি রোজ সকালে হরিবোলার উপহার লাভ। এরপর তার কাজ শুরু বাসিমুখে গোয়ালঘর থেকে গোরুগুলোকে বের করে বাইরে বেঁধে এসে ঘর পরিষ্কার। জমাট গোবর যাবে গোয়ালঘরের পেছনে— গোলাকার স্তূপ হয়ে থাকবে, চারদিক ঘিরে বড়ো বড়ো ফুলন্ত মেথো ঘাস। সেই ঘাসের মাথায় একটা গাব্দামোটা ধানফড়িং দেখতে পেলে সে তার শালিখ ছানাটির জন্য ধরার চেষ্টা করবেই। এতে দুদণ্ড সময় যাবে। তখন মোড়লগিন্নি খিড়কির দোরে উঁকি মেরে আবার খ্যাঁক করবে। হরিবোলা গোবরমাখা ভাঙা বালতি আর ফড়িংটাকে মুঠোয় ধরে আবার দাঁত বের করবে। যখন সে তরল গোময় আর মেঝের কাদার মিশ্রণে বালতি ভরছে, তখন ফড়িংটা তার হাফপেন্টুলের দড়ির খোপে ঢুকে গেছে।

এরপর ডোবার ঘাটে হাতপা ধোয়া। বাসনমাজার ছাই পড়ে থাকে সেখানেই। মোড়লগিন্নির ছায়া দেখলে সে ঝটপট সেই ছাই তুলে দাঁতে ঘষতে থাকবে। গিন্নিমা নোংরা একেবারে সইতে পারে না। বলবে, 'রগুড়ে মাজ্ দাঁতগুলান— নৈলে আজ খাওয়াদাওয়া বন্ধ।' কিন্তু গিন্নিমার নিজের দাঁতগুলো কালো কেন, সে কথা তুললেই রাক্ষুসী হয়ে তেড়ে আসবে।

একবোঝা খড় কেটে তবে খাওয়া। অর্থাৎ এককোঁচড় মুড়ি। একটুখানি গুড়ের ডেলা। নইলে আধখানা পেঁয়াজ।

গোরুগুলো রোদ্দুরে তখনও ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে পৃথিবী দেখছে। একটু তফাতে বসে হরিবোলা মুড়ি চিবোচ্ছে। শালিখছানাটি তার কাঁধে। তারও ঘাসফড়িংটা খাওয়া হয়েছে। তার চোখদুটোও নিষ্পলক পৃথিবী দর্শন করছে।

তারপর এল হেমা গয়লানি দুধ দুইতে। মোড়লগিন্নির কোমরে বাত বলে পা দুমড়ে বসতে পারে না ইদানিং। হেমা যতক্ষণ দুইবে, হরিবোলার কাজ বাছুরটিকে কান ধরে টেনে রাখা। বাছুরটি দুপা ঠোকে। কান ছাড়িয়ে নিতে মাথা এদিক-ওদিক করে। হরিবোলা খিটখিট করে হাসে।

কেন হাসে সেই জানে। হেঁমা ধমকায়, 'অত হাসি কীসের রে ছোঁড়া সাতসকালে?' তারপর দুধ দোহানো শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। হাতে পেতলের চোঙায় দুধের ফেনা। কী মনে করে হরিবোলাকে দেখতে দেখতে বলে, 'তুর কি শীত-খরা বলতে নাইরে ড্যাকরা ছোঁড়া? এই শীতে মোষের শিঙ নড়ে যায়, আর খালি গায়ে দাঁত ক্যালাচ্ছিস কী করে বাপু?'

পেছন থেকে মোড়লগিন্নির অভিমানে আহত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'উয়াকে কি জামাকাপড় দেওয়া হয়নি— জিগ্যেস করো না একবার! উটা কি মানুষ ভাবছ তুমি?' মোড়ল গিন্নি ওর বিছানার শোয়ার বিবরণ দিতে থাকে। সেই চটখানির গুটিয়ে পড়ে থাকার বৃত্তান্ত। ভিজে খড়ের কুচ্ছো। লাল গেঞ্জি কিনে দিয়েছিল, দুদিনেই ছিঁড়ে ফেলাফালা। বড়োই হদ্দমুসলো। বেজায় খ্যাদোড়। একের নম্বর ক্যালাগোবিন্দা।

হেমা দুধের পাত্র সমর্পণ করে বলে, 'তাই বটে বাপু! হ্যাঁ গো, আঙাদাসীর কুনো খবর নাই?'

আঙাদাসী মানে রাঙাদাসী। এই হরিবোলার মা। গতবছর হঠাৎ মোড়লবাড়ি থেকে চলে গেল তো গেলই। গিন্নির সঙ্গে নাকি ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। গিন্নি বলেছিল, 'রোজ চাল চুরি করে বেচে আসত। তার ওপর খানকির স্বভাব। কেমন সাজের ঘটা দেখতে না মাগির? বাজারি! বেউশ্যে!'

এমন মেয়ে রাঙাদাসীর খবর রাখার দায় পড়েছে কার? মোড়লগিন্নি চটে যায় হেমার কথায়। 'আবার সাতসকালে ওই অলুক্ষণে পাড়ামাতানীর নাম? অত দরদ থাকলে তুমি লিয়ে এস খবর!' দুধের পাত্রটি নিয়ে থম থম করে বাড়ির ভেতর যায়। ভেতরে গিয়েও রাঙাদাসীর খেউড়।

হেমা বাঁকা মুখে গুম হয়ে থাকে। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে চাপা গলায় বলে, 'আর তু ছোঁড়ারও বলিহাবি যাই রে! হাজার হলেও মা জননী! ধন্যি বাবা, উই পক্কীটিও মা মা করে চ্যাচায়।'

সেও চলে যায়। তখন হরিবোলার চোখ মাঠের দিকে। মাঠের ওপর কুয়াশা জমে আছে। ওই কুয়াশার ভেতর আছে এক নদী। নদীর পারে কাশফুলের বন, বিল-বাঁওড়, হিজল ভাঁড়ুলে বাবলা গাছের টুঙ্গি। কখন সেখানে যাবে, সেই প্রতীক্ষা শুধু। নদী পেরুলেই তো হরিবোলা আর এই হরিবোলাটি থাকে না। তখন যেন চিতে বাঘের বাচ্চা। চেরা গলায় গান জুড়ে দেয়, 'দড়কা লধির উধারে/যৈবন পড়্যে আছে হে...' যৌবনের বৃত্তান্ত না জেনেও।

ধানু মোড়ল নদী পর্যন্ত সঙ্গে যায়। হরিবোলার তখন পান্তা খেয়ে পেটটি ঢোল। বাকি দিনটার খিদের জন্য বরাদ্দ ফের এক কোঁচড় মুড়ি। কিন্তু হরিবোলা তার বদলে দুমুঠো চালই পছন্দ করে। দুধসর নামে এক নালা আছে। তার ধারে ভাঁড়ুলেগাছের নেমে-যাওয়া শেকড়বাকড়ে ন্যাকড়ার একদিকটা বেঁধে অন্যদিকে বাঁধা চালগুলো জলে ডুবিয়ে রাখে। দুপুর গড়িয়ে এলে সেই চাল তখন দুধের মতো সাদা, ফুলো খই যেন, আর কী স্বাদ! চড় মারলেও মুখ থেকে ছাড়ে না।

নদীর ধারে বাঁধের বটতলায় দাঁড়িয়ে মোড়ল হরিবোলার নদী পেরুনো দেখে তারিয়ে-তারিয়ে।

গমক্ষেতের মুনিশকে শুনিয়ে বলে, 'ইঃ! যেন চিতেবাঘের বাচ্চা! যতক্ষণ লদির ইধারে, ততক্ষণ নিমুনমুখো যষ্টি— যেন ক্যালাগোবিন্দাই বটে। যেই লদিটি পেরুলো আর উইরকম। চেহারিটিও বদলে যায়।'

মুনিশ মুখ তুলে বলে, 'কার কথা বুলছেন মুরোলমশাই?'

'এই হরিবুলা হে।'

'অ, হরিবুলা।'

হরিবোলার চেরা গলার গান ভেসে আসে ওপারের প্রান্তর থেকে, 'দড়কা লধির উধারে/যৈবন পড়্যে আছে হে...' মোড়লমশাই প্রত্যঙ্গ চুলকোতে চুলকোতে খিকখিক করে হাসে। 'অই, শুনছ শালোব্যাটার রসের কথা? এখনও গুয়োর ডিম ভাঙেনি। যৈবন চিনেছে।'

মুনিশ বলে, 'আচ্ছা মুরোলমশাই, হরিবুলার মায়ের খবর কী?'

'শুনেছি টাউনে আছে—ওইটুকুনই।'

'হরিবুলা মায়ের কথা কিছু বুলে না মুরোলমশাই?'

'নাঃ!' ধানু মোড়ল মুখ বাঁকা করে গম্ভীর হয়। 'আমার কাছে কি কষ্টতে আছে? থাউক না। টিকতে পারলে বিভা দুবো। বাড়ির পেছনে জায়গা-থল দুবো। থাউক।'...

রাঙাদাসী এক আশ্চর্য মেয়ে। আশ্চর্য— কারণ তার গায়ের রংটা ছিল বাবুবাড়ির মেয়েদের মতো ফর্সা। চোখদুটো কয়রা— বিড়ালচোখী বলে যাদের। সাজতেগুজতে ভালোবাসত। ভালোমন্দ জিনিসটাতে ছিল প্রচণ্ড লোভ। গউরের মতো একটা লোক কেমন করে তাকে ভাগিয়ে এনেছিল, সেও এক আশ্চর্য। গউরও অবশ্য একটু শৌখিন এবং টাউনমুখো মানুষ ছিল। রিকশোও চালিয়েছিল মাসকয়েক। তারপর হাঁপের অসুখ বাঁধিয়ে ঝটপট মরে গেল। রাঙাদাসী কোলের ছেলেটাকে নিয়ে সেই থেকে ধানু মোড়লের বাড়ি কাজকর্ম করত।

ভিটেমাটি বেচে মোড়লবাড়িতে উঠেছিল শেষে। গিন্নির সঙ্গে কলহ করে টাউনে চলে গেল। গউর তাকে টাউন চিনিয়েছিল, নাকি সে গউরকে, এও একটা আশ্চর্য।

আরও কিছু আশ্চর্য আছে।

রাঙাদাসীর নাকি আরেক নাম ছিল হরিমতী। গউর ডাকত হরিমতী বলে। সেই শুনে সদ্য মুখফোটা ছেলেটাও হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ভিটেয় চরতে চরতে দুঃখকষ্ট পেলে চেঁচিয়ে ডাকত আধো-আধো 'হয়ি' বলে। রাঙাদাসী হাসতে হাসতে বলত, 'আরে আমার হরিবুলা সোনা রে! হরি বলতে শিখেছে আমার ময়না পাখি রে!' সেই থেকে ছেলেটা হরিবোলা হয়ে গিয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে চাউর হয়, মেয়েটা ছিল মল্লারপুরের ঝুমুরদলের। — সেই যারা মেলার আসরে মাঝরাতে কোমর মুচড়ে নাচে এবং গায়, 'বঁধু, লাও বা না লাও/মুখ দেখে যাও/বাসি কাচের আয়না।' বাসি ভাতের বাসি ফুলের মতো আয়নাও বুঝি বাসি হয়। নিঝুম দুপুরে মোড়লের ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে আনমনে রাঙাদাসী বা হরিমতী গুনগুন করে গান গাইত। মোড়লগিন্নি কান করে শুনে বলত, 'গাইবি তো ঝেড়ে গা দিকিনি বাপু!' রাঙাদাসী থতমত খেয়ে বলত, 'উ কিছু লয় গিন্নিমা!' সে বুঝত, গিন্নি বলছে বটে মুখে, পরে তাই নিয়ে খোঁটা দেবে। বাজারি গানেউলি, ঝুমরি-টুমরি বলতেও বাধবে না।

হরিমতী র‍্যাশংকাডে হয়েছিল রাঙাদাসী। সেই র‍্যাশংকাড ধানু মোড়লের জিম্মায় আছে। চিনিটা আর ক্যারাচ্‌তেলটার খুব আকাল পাড়াগাঁয়ে লেগেই আছে। লরেন্দ মাস্টের ডিলার। ঠাট্টা করে এখনও বলেন, 'কী মোড়লমশাই, রাঙাদাসীর কোটা আর কতকাল নেবে? ছেড়ে দিলে আরেক গরিবগুবরোর বেনিফিট হয়।'

মোড়ল হ্যা হ্যা করে হাসে। 'আঙাদাসী নাই। উয়ার ছেলেটা কি মিথ্যে মশাই? তার চিনিটা তালটা লাগে না?'

লরেন্দ চোখের নৃত্যে বলেন, 'তোমার বাগালকেও চিনি দাও বুঝি? কিসে দাও মোড়ল? সরবতে, না গুড়ে?'

ধানু মোড়ল মনে মনে চটে। বলে, 'ক্যানে? চা। চা খায়।'

'বলো কী! চা খায় তোমার বাগাল?'

লোকে হাসলেও রাখাল বাগাল, মুনিশ-মহিন্দার আজকাল চা খায়, এও সত্যি। ধানু মোড়লের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু রাঙাদাসীও চা খেত। তার ছেলে হরিবোলাও মায়ের বাটির তলানিটুকু চুকচুক করে টানত। পরে সেও মায়ের কাছে রোজ সকালবেলা বাটিভরা চায়ের দাবি তুলত। তবে ছেলেটা যখন দ্বারকা নদীর ওপারে যেতে শিখল, তখন তার কাছে চা তুচ্ছ হয়ে গেল। দিনে দিনে বদলে গেল সে। রাঙাদাসী অবাক হয়ে তার ছেলের বদলে যাওয়া দেখত।

রাঙাদাসী গউরের কুঁড়েঘরের উঠোনে যে ছেলেকে পায়ের ওপর শুইয়ে তেলকাজল দিতে দিতে সুর ধরে বলত, 'আমার ধোন ইস্কুলে পড়বে রে! নেকাপড়া শিখে চাকুরি করে আমাকে খাওয়াবে রে!'— সেই ছেলে যায় দ্বারকা নদীর ওপারে গোরুর পাল নিয়ে। তার চুলে থাকে ট্যাসকোনা পাখির পালক। তার কাঁধে থাকে শালিখপাখির ছানা। নুড়ি দিয়ে ঘাসফড়িং খোঁজে। কতরকম নাম জানে ঘাস-ফড়িঙের— ঘরপোড়া, তল্লা, বাজ। রুক্ষ কাঁকরে ডাঙায় বেঁটে লালরঙের ফড়িংগুলো ঘরপোড়া। কুপির আলোয় বাঁশের চোঙা থেকে সারাদিনের সংগ্রহ সে মাকে দেখাত। লম্বাটে সবুজ ফড়িং দেখিয়ে বলত, 'ইগুলান তল্লা।' বেঁটে, ধূসর ডানা, তলার দিকটা ফিকে সবুজ আর পেট জুড়ে ফুটকি— 'ই দ্যাখো মা, বাজ।' তার পাখিটাও ছিল পেটুক। খাঁচা ছিল না বলে তাকে বেড়াল এসে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হরিবোলা দুদিন পরে আবার একটা নিয়ে আসবেই। তার তখন পাখি-ঘাসফড়িংদের পৃথিবীতে চলাফেরা! ইস্কুলের উলটোদিকে সেখানে যাবার রাস্তা, সেই রাস্তায় রাঙাদাসীর চোখের সামনে হেঁটে গেল তার হরিবোলাটি। দেখতে দেখতে একটুকুন হয়ে মিলিয়ে গেল কাশকুশের বিশাল প্রান্তরে।

আর প্রতিদিন ফিরে এসে সে মায়ের কাছে সেখানকার গল্প বলত। সিঙাকুড়ির জামগাছটার কাছে কী ঘটেছিল, বাঁওড়ের ধারে কত কুল পেকেছে (সেই কুলের কিছু নমুনাসহ), আজ বলাই সিঙ্গির সঙ্গে মেছুনিদের ঝগড়া হয়েছিল কী নিয়ে— এই-সব। সে বলত কাশবনের কথা। জলে শাপলার ঝাঁকের কথা। একলা কোনো হিজলগাছের অন্ধ পেঁচার কথা, বুড়ো যোগীবর আর একটা হট্টিটি পাখির কথা। দিনমান সে ট্টিট্টি করে ডেকে বেড়ায়। যোগীবরও জানে না তার বৃত্তান্ত। 'ক্যানে বেড়ায় মা?' রাঙাদাসী জানে না। চিমটি কেটে বলত, 'মুখ ধরে যায় না তুর? ইবারে লোক্‌ করে ঘুমোদিকিনি।'

হরিবোলা লোক্ (চুপ) করবে না। এরপর বলবে মাঠকুড়োনি মেয়েদের কথা। শেষে পরামর্শ দেবে। 'তু ক্যানে যাস নে মা লধির উধারবাগে! বীণামাসিরা যায়। সম্মাই যায়। ভাদুর মা যায়। তু ক্যানে যাস্ নে মা?'

রাঙাদাসী রাগ করে বলবে, 'আমার মরণ!'

'ক্যানে মা, মরণ ক্যানে?'

রাঙাদাসী আস্তে বলবে, 'আমি মাঠঘাটে কখনও ঘুরিনি বাছা। ছরতে ওদবাতাস সয় না। চেরটাকাল টাউনবাজারে মানুষ হইছি— পারি না।'

প্রেম হরিমতীকে পাড়াগাঁয়ে ভাসিয়ে এনেছিল। সে রাঙাদাসী হযেছিল। তার প্রেমেব বয়স চলে যায়নি, কিন্তু প্রেমিকটি মারা পড়েছিল। এই ছেলেটা না থাকলে রাঙাদাসী আবার হরিমতী হবার জন্য পা বাড়াত। কিন্তু কোলে ছেলে থাকলে হরিমতী হওয়া বড়ো সমস্যা। সে যেন হরিবোলার বড়ো হওয়ার দিন গুনছিল। বড়ো হতেই চলে গেল..

মাঘে যখন দ্বারকা নদীর শিয়রে বুড়ো শিমুল গাছটা মাথায় লাল ফেট্টি জড়াল, ধানু মোড়লের আমের গাছে ফুটল লালহলুদ শিসালো মুকুল, তখন একদিন লরেন্দ মাস্টেরের ভাই মলিন্দ এসে বলল, 'ও মোড়লমশাই, তোমার বাগাল কোথা?'

ধানু মোড়ল মোড়ায় বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল ঢ্যারা ঘুরিয়ে। অবাক হয়ে বলল, 'ক্যানে বাবা মলিন্দ?'

মলিন্দ চোখে ঝিলিক তুলে বলে, 'রাঙাদাসীর সঙ্গে কাল দেখা হল মেদিগঞ্জেব বাজারে।'

মোড়ল শুধু বলে, 'অ'।

মলিন্দ খিক খিক করে হাসে। 'সে রাঙাদাসী আর নাই মোড়লমশাই। এক্কেবারে ফিলিম-ইস্টাব!'

'অ।'

কী পবনেব ডেরেস, কী জেকচাব পশ্চার! ঠোঁটে লিপিস্টিক! বুঝলে তো?'

'অ'

মলিন্দ আবও হেসে বলে, 'ধুত্তেবি! খালি অ অ করে। বুঝলে কিছু?'

ধানু মোড়ল একটু হাসে। 'তা না হয় বুইলাম। কিন্তুক কী কথাবাত্তা হল তুমার সঙ্গেতে?'

'প্রথমে তো চিনতেই পারে না, এমন ন্যাকামি মাগির। তো আম্মো বাবা ছিনে জোঁক। শেষে নিরিবিলি জাযগায গিয়ে দাঁড়াল।' মলিন্দ বারান্দার চৌকিতে গিয়ে বসে। বিস্তারিত বলার ইচ্ছায় একটা সিগারেট ধরায় এবং মোড়লকেও দেয়।

মোড়ল ফুকফুক করে টেনে বলে, 'হরিবুলার কথা জিগোস কল্লে না?'

'বলছি, শোনই না।' মলিন্দ লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলে। 'প্রথমে তো একথা, সেকথা— গাঁয়ের কার কী খবর। তাবপব বললে, হরিবোলা কেমন আছে, কী করছে এইসব। আমি বললাম, মোড়লমশাইয়ের বাড়িতে আছে, ভালোই আছে। খাবাপ থাকবার তো কথা না। তবে তুমি এখানে কী করছ, তাই বলো।'

'জিগ্যেস কল্লে তুমি?'

'হ্যাঁ-অ্যাঁ। আমি বাবা ছিনে জোঁক। না শুনে ছাড়ুব না। সেও কিলিযার করে বলবে না। শেষে বলল, এক বাবুর বাড়ি কাজ করছে। টাউনবাজারে আজকাল ঝিয়ের অভাব —ভালোই মাইনেকড়ি পাচ্ছে।'

মোড়ল বলে, 'মিথ্যে।'

'মিথ্যে তো বটেই -- সে কি আমি বুঝি না? ঠোঁটে লিপিস্টিক!' মলিন্দ খ্যা খ্যা করে হাসে। শেষে বললাম, 'তা তুমি তো দেখছি ভালোই আছ। ছেলেটাকে দেখে আসবে না একবার? চলো আমার সঙ্গে।'

'ত্যাখন কী বল্লে?'

'বললে সময় পাই না — এত কাজ। পেলেই যাব। নিয়ে আসব।'

মোড়ল নড়ে উঠে সোজা হয়। 'কী বল্লে, কী বল্লে?'

মলিন্দ আশ্বস্ত করে বলে, 'নিয়ে যাবে কোথা?' ছেলে সঙ্গে থাকলে ও বিজনেস তো পণ্ড। বুঝলে না? শেষে আমাকে সঙ্গে করে জামাকাপড়ের দোকানে গেল। এই দেখ, কীসব কিনে দিয়েছে হরিবোলার জন্যে।'

এতক্ষণে ধানু মোড়লের চোখ পড়ে প্যাকেটটাতে। তাচ্ছিল্য করে তাকিয়ে বলে, 'কী আছে বলো দিকিনি?'

'একটা পেন্টুল, একটা জামা। বললে, পায়ের মাপ জানা থাকলে জুতোও কিনে দিতাম। একবার সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও বললে। বলে আবার কী মনে হল বললে, 'থাক। নিজেই যাব একদিন।' মলিন্দ জামা আর

হাফপেন্টুল মোড়লকে দেখিয়ে আবার ভাঁজ করে প্যাকেটস্থ করে। চাপা হেসে বলে, 'ঠিকানা নির্ঘাৎ বাগানপাড়ার গলি — সে ঠিকানা দেবে কোন মুখে? তাই আসবে বলল।'...

যাবার সময় হঠাৎ ফিরে এসে একটা ছোট্ট ঠোঙাও দিয়ে যায় মলিন্দ। ভুলে গিয়েছিল, রাঙাদাসী তার ছেলের জন্য লজেন্সও কিনে দিয়েছে। নগ্ন চৌকিতে সেগুলো পড়ে থাকে কতক্ষণ। ছুঁতে ইচ্ছে করছিল না ধানু মোড়লের। মোড়ল-গিন্নি জানতে পারলেও সমস্যা। তার বড্ড ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক।

কিন্তু না জানিয়েও থাকা যায় না। দড়ি পাকানো শেষ করে আস্তেসুস্থে উঠে দাঁড়ায় ধানু মোড়ল। কাঁচাপাকা চুল আর গোঁফে হাত বোলায়। তারপর প্যাকেট দুটো বাঁহাতে তুলে চালের বাতায় গুঁজে রাখে।

নদীতে স্নান করে এসে খেতে বসার সময় মোড়ল ফিক করে হাসে। 'একটা খবর শুনলে গো? আঙাদাসী মেদিগঞ্জতে আছে। যা বলেছিলে তুমি, তাই। বেউশ্যেতে নাম নিকিয়ে বসে আছে। মলিন্দ বলে গেল।'

নাক বাঁকা করে মোড়লগিন্নি বলে, 'মরুক, বারোভাতারি। খাবার সুময়ে উ কী কথা?'

'নাঃ -- বলছি কী, হরিবুলার জন্যেতে জামাপেন্টুল আর লেবেনচুষ পাঠিয়ে দিয়েছে মলিন্দর হাতে।'

মোড়লগিন্নির চোখ বড়ো হয়ে যায়। বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, 'সত্যি নাকিন?'

'সত্যি বৈকি। বাইরেকার ছাঁচবাতায় গুঁজে থুয়েছি। দ্যাখো গে— পেত্যয় না গেলে।'

মোড়লগিন্নি থম থম করে উঠে যায়। মোড়ল কতক্ষণ তার ফেরার অপেক্ষা করে! ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সন্দিগ্ধভাবে দ্রুত আহার শেষ করে নেয়। তারপর যখন উঠোনের কোনায় লেবুগাছটার কাছে ঘটি থেকে জল ঢেলে আঁচাচ্ছে, তখন মোড়লগিন্নি তেমনি থম থম করে ফিরে আসে। মুখখানা জ্বলছে দাউ দাউ করে। নাসারন্ধ্র স্ফীত।

মোড়ল একটু হেসে বলে, 'দেখলে?'

প্রৌঢ়া জবাব দিল না। টিউকলে গিয়ে রগড়ে হাত ধুতে থাকল।...

দিনকতক পরে সন্ধ্যাবেলায় দ্বারকা নদীর ওপার থেকে গরু চরিয়ে বাগাল হরিবোলা ফিরে এসেছে। চেবা গলায় বাইরে যথারীতি 'গিন্নিমা, আলো' বলে চিক্কুরও ছেড়েছে। গিন্নিমা লণ্ঠন দেখিয়েছে এবং সে গোরুবাছুর গোয়ালে বেঁধে ফেলেছে। তারপর অন্ধকারে ডোবার জলে হাত-মুখ-পা ধোয়াপাখলা করে সর্ষের তেলটুকুনও চেয়ে নিয়েছে। গায়ে-গতরে মেখে উঠোনের কোনায় বসে তেমনি চিক্কুর ছেড়েছে, 'গিন্নিমা! ভাত দ্যাও।'

উঁচু দাওয়ায় লণ্ঠন জ্বলছে। নিচের উঠোনে সেই আলোর হলদে চকরাবকরা ছটা খানিকটা। একটু তফাতে বাড়ির কুকুরটার বিরাট ছায়া পাঁচিলের গায়ে, লেজটা নড়ছে, মুখটা হাঁ। হঠাৎ একমুঠো গিলেই হরিবোলা আরেক চিক্কুর ছাড়ে, 'গিন্নিমা, গিন্নিমা! আমার জামাপেন্টুল? আমার লেমুনচুষ!'

মোড়লগিন্নি গুম হয়ে বলে, 'খাবি তো খা দিকিনি বাপু! পরে উসব কথা।'

হরিবোলা হুদ্‌মসুলো, সে তো মিথ্যে নয়। দিনমান জানোয়ারের সঙ্গে বনেপ্রান্তরে বাস, বাগগাল। বাগালের গোঁ। একটু পিছিয়ে গিয়ে চ্যাঁচায়, 'আগে দ্যাও, তমে খাব।'

মোড়লগিন্নি ফুঁসে ওঠে। 'শুনছ, শুনছ তোমার বাগালের কথা? কেমুন বুলি ফুটেছে শুনছ?'

দাওয়ায় মোড়া থেকে ধানু মোড়ল খুক খুক করে হাসে। 'অ হরিবুলা? কে তুকে বল্লে জামাপেন্টুলের কথা?'

হরিবোলার দাঁত চকচক করে। মাস্টেরের ভাই মলিন্দবাবু বুললে, তুর মা তুকে জামাপেন্টুল দিয়েছে। লেমুনচুস দিয়েছে'! সুর ধরে আওড়ে সে এঁটো হাতটাও ওপরে তুলে নাচতে থাকে।

মোড়লগিন্নি বেগতিক দেখে চাপা গলায় বলে, 'উ জিনিস ছুঁতে নাই, হরিবুলা। বয়েস হলে বুইতিস, ক্যানে ছুঁতে নাই। ভাতগুলান খা দিকিন দয়া করে। মুড়ল তুকে লতুন জামাপেন্টুল কিনে দিবে।'

মোড়ল ঘোষণা করে, 'দুবো। কটা দিন অপিক্ষা কর! ক'বস্তা চাল বেচতে যাব আড়তে। তুকে লিয়ে যাব। এখন যা কচ্ছিস, তাই কর।'

কালাগোবিন্দা বাগাল অমনি শান্ত হয়ে বলে, 'লিয়ে যাবা তো মুরোল?'

'হুঁ, হুঁ, লিয়ে যাব। তুর মা-জননীকেও দেখে আসবি।'

ঝোঁকের বশে ধানু মোড়ল একথাও বলে ফেলে এবং তারপর ভাবে, বলেই যখন ফেলেছে, মুখের কথা বই নয়। কোথায় রাঙাদাসী থাকে, সঠিক জানা নেই — মলিন্দেরও। তবে জানা থাকলেও সাধুগিরি করে মায়ে-ছেলেতে মিলিয়ে দিলে উলটে হয়তো নিজেরই বিপদ বাধবে। পেটভাতায় এমন খাঁটি বাগাল পাওয়া সহজ নয়।

বছর সন মাইনেকড়ি আছে, তার ওপর বাবা-মাকে ধান ধার দাও, এটা দাও, ওটা দাও— সম্বচ্ছর ঝামেলা। হরিবোলার সে ঝামেলা নেই।

রাতে বিছানায় শুয়ে মোড়ল বউকে চুপিচুপি বলে, 'জিনিসগুলান আস্তাকুড়ে না পুঁতলেও পারতে। মেয়েটা বেউশ্যে হয়েছে, জিনিসগুলান তো হয়নি।'

মোড়লগিন্নি গর্জন করে বলে, 'থামো তুমি! বুইতে পাল্লে না ক্যানে দিয়েছে, এত যে মুড়লি মেরে বেড়াও গাঁয়ে!'

মোড়ল কেঁচো হয়ে বলে, 'ক্যানে দিয়েছে বলো দিকিনি?'

'নোভ দেখাতে। ক্রিমে ক্রিমে নোভ বাড়বে জামাপেন্টুল পরে। তখন আর তুমার বাগালী করবে ভেবেছ নাকিন? টাউনবাগে দৌড়ুবে না?'

মাথা নেড়ে মোড়ল বলে, 'ঠিক, ঠিক।'

'মাগি টোপ ফেলেছিল।' শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে মোড়লগিন্নি পাশ ফিরে বলে, 'তমে সত্যি যদি ই বাগে আসে, উয়ার চুল কেটে ন্যাড়া করে ফেরত পাঠাব। নখাই, যদু, মকুন্দ —সবাইকে বলে রেখেছি। ই মাটিতে পা দিয়ে একবার দেখুক না কলঙ্কিনী!'

বিবেচক মোড়ল আস্তে বলে, 'আহা, ছেলেটা তো উয়ার। চাইলে আইনত ধম্মত ...'

মোড়লগিন্নি বাঘিনীর গর্জনে বলে, 'তুমি থামো। ভালোমানুষী কত্তে হয়, বারোয়ারিতলায় যাও।'

'আহা, হবিবুলা যদি যেতে চায়?'

'যাচে না।' হঠাৎ শান্ত অথবা নিস্তেজ হয়ে যায় প্রৌঢ়া মেয়েটি। 'লদির উধারে হরিবুলার মন বসে যেয়েছে। তুমি দেখো, উ কক্ষনো যাবে না।' ..

যাবে না, কারণ দ্বাবকা নদী পার হলেই সে এক অন্য হরিবোলাটি। দিনমান তার চোখে ছবির মতো আঁকা হয় কাশকুশের ধূসর ব্যাপকতা, দাগড়া দাগড়া হলুদ সর্ষে ফুলের ছোপ কাছে এবং দূরে, শালিক পাখির ডিম হয়ে থাকা চিত্রিত নীলাভ আকাশ, আব ওই একলা ওড়া হট্টিটি পাখিটার টি টি টি ডাক। বিলের জলে আকাশ থেকে বাঁকা এক বেখা ঝপাং করে পড়তেই একঝাঁক জলহাঁস ফুটে ওঠে। কখনও বন্দুকের শব্দে বিশাল নিঃশব্দ খান খান হয়ে যায়, এবং বাতাসে কিছুক্ষণ বারুদের কটু গন্ধ। তারপর আবার সব শান্ত, চুপচাপ। আবার ঘাসফড়িংয়ের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে বাগালছেলের চেরা গলায় চিৎকার, 'বীণামাসি গো! নে-দে-ছে এ-এ!' মোড়লের গোরু নাদলে বীণামাসি ছাড়া আর কাউকে দেবে না হরিবোলা। পা দিয়ে গোবরটা থুপথুপ করে গুছিয়ে রাখবে। মাঠকুড়োনি মেয়েটার আসতে দেরি হলেও ওটা আর কেউ ছোঁবে না। অলিখিত আইন এই মাঠের পৃথিবীতে।

এর মধ্যে দিনটা কেটে যায় হরিবোলার। তার ইচ্ছে করে একটা দলের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু মোড়লের কড়া নিষেধ। পাঁচজন বাগাল দল বাঁধলেই খেলাতে মন দেবে। তখন গোরু গিয়ে কার ফসল খাচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি থাকে না। তাই হরিবোলা একলা হয়ে ঘোরে। বাঁওড়ের ধারে গিয়ে যোগীবরের কাছে নানারকম গপ্প শোনে। গোরুগুলো আপন খেয়ালে চড়ে বেড়ায়। ক্রমশ গোচর মাটির সীমানা কমে যাচ্ছে। আবাদ বাড়ছে। বুড়ো যোগীবর বহুদূর দৃষ্টি চালিয়ে বলে ওঠে, 'সব আবাদ হয়ে যাবে, বুইলি হরিবুলা। বাঁধ হবে-হবে শুনছি। হলে পরে উই উলেকাশের বোন, উই বিল, ই বাঁওড় — সবখানে লাঙল পড়বে। ত্যাখন হরিবুলা, ত্যাখন গোরু চরাবি কতি রে, অ্যাঁ?'

খুব হাসে যোগীবর। হরিবোলা বলে, 'যাঃ!'

'যাঃ লয়। দেখবি কী হয়'।

হরিবোলা ওসব ভাবে না। কিন্তু বিলের জলে লাঙল পড়ার কথা শুনে সে ভারি অবাক হয়। বলে, 'যুগীকাকা, ওগো যুগীকাকা! বিলের জলে লাঙল পড়বে কেমুন করে? বলদ ডুবে মরবে না?' তার টানাটানা চোখ বিলের দিকে প্রসারিত হয়।

'ওরে বাছা, ত্যাখন কি জল থাকবে? বাঁধ পড়লে বছরে বছরে শুকিয়ে যাবে।'

হরিবোলা অত ভাবতে পারে না। সে যখন হবে, তখন হবে। 'অ যুগীকাকা, হেজলতলার পেত্নিটার কথা বুলো না। আর দেখা হয়নি তুমার সঙ্গে?'

যোগীবর হাসে। মাথা নেড়ে বলে, 'হয়েছিল বইকি! তবে উই দ্যাখ বাপ্‌, তুর ধলি গোরুটা বুঝি মুখ দিলে গমের চারায়।'

হরিবোলা নড়ি তুলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দৌড়তে থাকে। মেহদু কসাইয়ের নাম করে শাসায়। বলে, 'মেহদুকে দুবো — হ্যাঁ!'

গোরুগুলোকে সে ভালোবাসে। খুঁটিয়ে তাদের শরীর দেখে। ঘা থাকলে দুব্বো ঘাস মচলে ঘসে দেয়— যোগীবরের পরামর্শে। গোঁদল পোকা ছাড়িয়ে দেয় পেট থেকে। কমবয়সি বাছুর গোরুটাকে সে কোলে নিয়েই পার করে নালা খানাখন্দ। তখনও তার কাঁধে শালিকছানা। চুলে ট্যাঁসকোনা পাখির পর গোঁজা। কোথাও এই পর পেলে সঙ্গে সঙ্গে সে কুড়িয়ে নেয়। মোড়লের খড়কাটার কুঠুরির নিচু চালে অনেক পর গোঁজা আছে।

এই জীবন হল বাগালের। তারও আছে অনেক রীতিনীতি, অনেক প্রথা, ইতিহাস। হরিবোলা তার অন্তর্গত। তার কপালে আঁকা আছে রাখালফোঁটা। নড়ির ডগায় ঘষে ঘা করে সেই ঘা শুকোলে ওই গোল ফোঁটা কালো হয়ে ফুটে থাকে দুই ভুরুর মধ্যিখানে। এই ফোঁটা দিয়ে দ্বারকার ওপারে রাখালের একদিন অভিষেক হয়। হরিবোলারও হয়েছে। রাখালী ছেড়ে কোথাও যাবে না। গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলেই সে নদীপারের এই ব্যাপকতায় উড়ে বেড়ায় পাখপাখালির মতো। এখানে অবাধ স্বাধীনতা তাকে চিতাবাঘের বাচ্চা করে ফেলে। তার চলার ভঙ্গি যায় বদলে। চাহনিতে ফুটে ওঠে বন্যপ্রাণীর চাঞ্চল্য। সে গলা ছেড়ে গান গায়, 'দড়া লধির/ যৈবন পড়ো আছে হে ...' যদিও তার যৌবন এখনও বহুদূরে। সেই যৌবন এলে কী ঘটবে, তাও সে ভাবে না। ফাঁড়িঘাসের বনে, হিজল জারুল-ভাঁড়ুলে গাছের জঙ্গলে, কিংবা বাঁওড়ের ধারে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে তার মনেও হয় না যে একদিন এই বাগালিজীবনের পর তাকে মুনিশ হয়ে খেতে নামতে হবে এবং তার এই সিধে মেরুদণ্ড বেঁকে যাবে ফসলের শীষের দিকে। যে মাটিতে সে পা দিয়ে ছুঁয়েছে, সেই মাটি হাত দিয়ে তাকে ছুঁতে হবে — একথাও বোঝে না সে।

এখন হরিবোলা সে-হরিবোলাটি নয়। তার আদুর শরীরে এখন ঘাসের গন্ধ, বিলের জলের গন্ধ। খড়কাটা ঘরে কুঁকড়ে শুয়ে নিজের বুকের ওইসব প্রাকৃতিক গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। তার অবচেতনায় সারা রাত দ্বারকা নদীর ওপারের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি বুড়ো যোগীবরের মতো পাহারা দেয়। ...

চৈত্রে ধানু মোড়লের মেয়ে-জামাই এসেছে। জামাই খুব সিগারেট খায়। সকালে হরিবোলাকে ডেকে বলে, 'অ্যাই ছোঁড়া, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দে তো! শোন্‌, এই প্যাকেটটা নিয়ে যা। বলবি এই সিগারেট দাও।'

হরিবোলা টাকা নিয়ে দৌড়ুতে থাকে। নরেন্দ মাস্টেরের ভাই মলিন্দ সম্প্রতি মনোহারি দোকান দিয়েছে গ্রামে। সিগারেট সেই বেচে। হরিবোলাকে দেখে বলে 'দাঁড়া হরিবুলা, কথা আছে।'

হরিবোলা বলে, 'টক করে সেকরেট দাও বাবু, গোচ্চরাতে যাব।'

মলিন্দ হাসে। 'দাঁড়া না বাঞ্চোত! কথা আছে।' সে হরিবোলার হাত থেকে টাকা নেয়। কিন্তু সিগারেট দেয় না। গলা চেপে বলে, 'সেই যে তোর মা জামাপেন্টুল দিয়েছিল, পরিসনি?'

হরিবোলা মাথা নাড়ে। নির্বিকার মুখে বলে, 'মুরোলগিন্নি দেয়নি। লেমুনচুষও দেয়নি।'

'হুঁ। যাবি তোর মাকে দেখতে?'

হরিবোলা নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে।

মলিন্দ চাপা ধমক দেয়, চোখে হাসি। বল না, যাবি নাকি মাকে দেখতে? তোর মায়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। আমাকে বলে তোকে নিয়ে যেতে। যাবি?'

হরিবোলা আস্তে বলে, 'মুরোল বকবে।'

'ধুর ব্যাটা! লুকিয়ে যাবি।'

হরিবোলা একটু হাসে এবার। 'গোরুগুলান কে চরাবে?'

'আর কোনো বাগালকে গছিয়ে দিবি। তারটা একটা দিন চরিয়ে শোধ করবি।'

এমন প্রথা অবশ্য আছে। তবু হরিবোলা ভাবে। শেষে হাত বাড়িয়ে বলে, 'জামাইদাদার সেকরেট দ্যাও।'

'তাহলে যাবি না? অ্যাই ছোঁড়া, মাকে দুঃখু দিবি? তুই তো বড্ড নেমকহারাম।'

হরিবোলা মুখ নামিয়ে পায়ের বুড়ো-আঙুলে মাটিতে আঁচড় কাটে।

মলিন্দ ফিসফিস করে বলে, 'তোর মা খুব কান্নাকাটি করছিল। গাঁয়ে আসতে সাহস পায় না মোড়লগিন্নির ভয়ে। তাছাড়া ... ওসব তুই ছেলেমানুষ, বুঝবি না। মোটকথা, তোর মায়ের আসা কঠিন। তুই আমার সঙ্গে যাবি, চলে আসবি দেখা করে। কেমন?'

হরিবোলা অবশেষে আস্তে মাথাটা দোলায়। তারপর গলার ভেতর বলে, 'কবে যাবা তুমি?'

'কাল মাল আনতে যাব। খুব সকাল-সকাল যাব। নদীর ব্রিজে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। তুই চলে আসবি। ...'

এদিন হরিবোলার কেমন ভাবুক চেহারা। গোরু নিয়ে গেল কেমন তুম্বো মুখে। মোড়লগিন্নির থাপ্পড় খেয়েও সে মুখ খোলেনি। কিন্তু নদীর ওপারে গিয়ে তার মনটা ভালো হয়ে গেল। যোগীবরের কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল না। নিরিবিলি ঘুরে বেড়াল গোরুর পালটা নিয়ে। মায়ের কথা ভেবে খুব খুশি হচ্ছিল হরিবোলা। মায়ের কথা বেশি করে মনে পড়ছিল। মায়ের সেই গানখানাও গেয়ে ফেলল সে 'বঁধূ লাও বা না লাও / মুখে দেখে নাও/ বাসি কাচের আয়না ...'

তারপর গেল দুধসরের ধারে। বাগালদের জোট সেখানে ভাঁড়ুলে গাছে ঝাল-ঝুল্লা খেলছে। নালার জলে চিহ্নিত শেকড় থেকে ভিজে চালের ন্যাকড়াটা তুলল সে। তারপর দলটার দিকে তাকাল।

পাতকুড়োকে খুঁজছিল সে। পাতকুড়োর সঙ্গেই তার যত বন্ধুতা। ছেলেটা খুব লক্ষ্মী। চোখে চোখে পড়তেই হরিবোলার চালের লোভে দৌড়ে এল খেলা ছেড়ে। দলপতি তাকে শাসাচ্ছিল, 'শালোকে পাল থেকে বেংড়ে দুবো!' কিন্তু গ্রাহ্য করল না সে।

পাতাকুড়ো হাসিমুখে বলল, 'ইদিক বাগে দেখেই বুঝেছি, হরিবুলার চাল ভিজুনো ছিল ন্যালায়। ইঃ, জান্‌লে পরে খেয়ে শ্যাষ করে দিতাম।'

হরিবোলা মিঠে গলায় বলল, 'দিতিস তো দিতিস! এই লে!'

দুজনে কুড়মুড় করে চাল খায় নাটাকাঁটার ঝোঁপের আড়ালে। তারপর কথাটা তোলে হরিবোলা। যাবে আর বেলাবেলি ফিরে আসবে। মায়ের কাছে বাসমোটরের ভাড়া চেয়ে নেবে। সাঁকোর কাছে নেমে সোজা এখানে চলে আসবে। গোরুগুলো বুঝে নিয়ে বেলা যদি থাকে, চরাবে — নইলে ডাকিয়ে নিয়ে ফিরে যাবে।

পাতকুড়ো রাজি। গেরস্থর চোখের আড়ালে বাগালে-বাগালে এমন বোঝাপড়া চিরকালের।...

পরদিন সকালে তর সইছিল না হরিবোলার। বাড়িতে জামাই বলে ধানু মোড়ল আজ আর নদী পর্যন্ত আসেনি। নদীর ওপারে পাতকুড়োকে পালটা বুঝিয়ে দিয়ে হরিবোলা দৌড়ুতে থাকে নদীর ধারে-ধারে।

ব্রিজের মাথায় মলিন্দ সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তার বড়ো গরজ। রাঙাদাসী এখন মেদিগঞ্জের বাগানপাড়ার গলিতে মধুবালা হয়েছে। মলিন্দ তার প্রেম পেয়েছে। যখন রাঙাদাসী গ্রামে ছিল, তখনও মলিন্দ ঘুরঘুর করত বটে, পাত্তা পায়নি। তাছাড়া মেয়েটার মতিগতিও অন্যরকম ছিল।

শুধু অবাক লাগে মলিন্দের, প্রস হয়েও ছেলের জন্য টান থাকে সে কল্পনাও করেনি। বাগানপাড়া গলিতে ঢোকার অভ্যাস তার অনেকদিনের। সেখানে গউরের বউকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। কিন্তু মোড়লকে তো এসব কথা বলা যায় না।

টাউনবাজারে এই প্রথম আসা হরিবোলার। সে একেবারে জড়োসড়ো এতটুকুনটি। মলিন্দ সাইকেল থেকে নেমে তাঁর কাঁধ ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়। অনবরত বোঝায়, যেন গ্রামের কাকপক্ষীটিও টের না পায়। বারবার বলে, 'কাউকে বলবিনে তো হরিবোলা? বললে তোকে কেটে ফেলব কিন্তু।'

বন্যপ্রাণীর চাউনিতে হরিবোল রঙবেরঙের ঘরবাড়ি আর মানুষজন দেখে। ভেবে কূল পায় না এখানে তার মা থাকে!

কতদূর হেঁটে একটা আড়তে সাইকেল জিম্মা দিয়ে মলিন্দ বলে, 'আয় হরিবোলা!'

এ-গলি ও-গলি আরও কতদূর গিয়ে একটু দাঁড়ায় সে। আবার বলে, 'আয়।'

গলির দুধারে খোপবন্দি ঘর। টালি বা খাপরুলের ছাউনি। দরজায় বসে ও দাঁড়িয়ে আছে নানাবয়সি মেয়েরা। হরিবোলা পিটির পিটির তাকিয়ে হাঁটে। একটা ঘরের দরজায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছিল এক মেয়ে, পরনে লালরঙের শাড়ি। মলিন্দ আস্তে 'মধুবালা' বলে ডাকতেই সে ঘোরে।

সেই কয়রা বেড়ালচোখ। সেই রাঙা ছিপছিপে গড়ন। তবু হরিবোলা চিনতে পারে না। মলিন্দ বলে, 'কী রে ছোঁড়া? মাকে চিনতে পারছিস না! এজন্যেই মোড়ল বলে ক্যালাগোবিন্দা।'

রাঙাদাসী খপ করে হরিবোলাকে ধরে একটানে ঘরে ঢুকিয়ে ভেতর থেকে বলে, 'মলিন্দবাবু, তুমি এখন এস।'

মলিন্দ অবাক। খ্যা খ্যা করে হাসে। 'বাঃ! তোমার বেশ বিবেচনা মাইরি!'

'না, ন'। তুমি এখন এস তো। জ্বালিও না।'

'হরিবোলাকে মোড়লের কাছে পৌঁছে দিতে হবে না?'

'না। আমি বাসে তুলে দেব। তুমি যাও।'

'ঠিক আছে।' ... মলিন্দ বেজার হয়ে পা বাড়ায়। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে রাঙাদাসী। মনে মনে মলিন্দ অশ্লীল গাল দিতে দিতে কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়। উদাস চাউনিতে তাকে দেখতে থাকা একটি মেয়েকে কাঁপ-কাঁপা গলায় বলে 'রেট?' মেয়েটি দুহাতের দশটা আঙুল দেখায়।

'গরজ!' বলে মলিন্দ তার ঘরেই ঢুকে পড়ে। ...

দরজা বন্ধ করে পেছনের একটা ছোটো জানালা খুলে দিয়েছে রাঙাদাসী। জানালার ওধারে খালে শুয়োর চরছে। ওপারে ঝোপঝাড়, তারপর একটা পুরোনো বিশাল বাড়ি। ঘরের ভেতরটা ক্রমশ স্পষ্ট হলে হরিবোলা দেখে, তার মা তাকে জড়িয়ে মাথায় গাল রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মায়ের শরীর থেকে বা শাড়ি থেকে মিষ্টি গন্ধ মউমউ করছে। গন্ধটা তার চেনা লাগে। কিন্তু সে নির্বিকার মুখে ঘরের ভেতরটা দেখতে থাকে।

তক্তাপোসের ওপর পুরু বিছানা। এমন বিছানায় কখনও সে বসেনি। দেয়ালে অনেক ছবি ঝুলছে। মা-কালীর ছবিটা সে চিনতে পারে। মোড়লের ঘরে এই ছবি আছে। মেঝের ওধারে একটা কেরোসিনকুকার। এনামেলের হাঁড়িকুড়ি। একটা সাদা চওড়া থালা। কেটলি। অনায়াসে ইটের ওপর বসানো সেই চেনা সুটকেস তার ওপরে একটা বড়ো কালোরঙের থলের মতো — হয়তো বাক্স। তাতে কী আছে, দেখতে ইচ্ছে করে হরিবোলার।

দড়ির আলনায় শাড়ি সায়া ব্লাউস এইসব ঝুলছে। তারপর কোনার দিকে দুটো ইট এবং নর্দমার ঘুলঘুলিতে চোখ পড়ে হরিবোলার। ঘরের ভেতর পেচ্ছাপ করে বুঝি? তার মা এমন 'খ্যাদোড়' তো ছিল না।

'হরিবুলা।'

ধরা গলার ডাক শুনে হরিবোলা এবার মুখ তোলে।

'কী খেয়েছ সকালে?'

'মুড়ি, গুড়। আর ..' একটু ভেবে হরিবোলা বলে, 'মরোলের জামাই বতিচুরের নাড়ু এনেছিল। তাই আধখানা দিয়েছিল।'

'ভাত খাওনি?'

'হঁউ পান্তা খেয়ে গোচ্চরাতে গেলাম। তাপরে...'

গালে গাল ঘষে রাঙাদাসী বলে, 'আমাকে তুর ঘেন্না করছে, বাছা?'

'উঁ?' হরিবোলা বোঝে না।

শ্বাস টেনে এবং ছেড়ে রাঙাদাসী বলে, 'চাট্টি ভাত খা। মাছ আন্না করেছি। আজই তুকে আনবে, জানি না তো!'

রাঙাদাসী মেঝেয় একটুকরো আসন পেতে ছেলেকে ভাত বেড়ে দেয়। হরিবোলা প্রথমে একটু অনিচ্ছা করে, পরে খুশি হয়ে খায়। রাঙাদাসী তাকে খাওয়ায়। মুখে ভাত গুঁজে দেয়। জামাপ্যান্টের কথা জিজ্ঞেস করে। হরিবোলা মোড়লের দোষ ঢাকতে মিথ্যে করে বলে, 'দিয়েছিল।'

'ই ছিঁড়া পেন্টুল, খালি গা করে এলি যে?'

হরিবোলা দুধের দাঁতে হাসে 'মাঠ থেকে এলাম বুলছি না?'

'খেয়ে নে। তাপরে লতুন জামাপ্যান্টজুতো কিনে দুবো।'

সেই সময় দরজায় খটখট শব্দ আর ডাক, 'মধু! অ মধুবালা! অসময়ে আবার কোন নরকখেকোকে ঢোকালি লা? বিদেয় করে বেরো! বড়োমানুষ এনেছি।'

রাঙাদাসী গর্জন করে বলে, 'যাও তো মাসি। হবে না এখন!'

'আচ্ছা লা, আচ্ছা! দেখব, গুমোর কদ্দিন থাকে।'

হরিবোলা জিগ্যেস করে, ' কে ঝগড়া করছিল মা?'

'ওই এক মাগি।' বলে সে ছেলের মুখে গেলাস ধরে। হরিবোলা ঢকঢক করে জল খায়, কিন্তু গেলাসের দুপাশ দিয়ে দুটো বন্যচোখে মায়ের মুখখানা দেখতে থাকে। রাঙাদাসীর বুকটা ধক ধক করে ওঠে চাউনি দেখে।

তারপর রাঙাদাসী ছেলের চুল আঁচড়ে দেয়। ভিজে তোয়ালেতে মুখ মুছিয়ে দেয়। আঙুলের ডগায় করে স্নো তুলে ঘষতে গেলে হরিবোলা মুখ সরায়। কিছুতেই মাখতে চায় না।

ঘরে তালা এঁটে ছেলেকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে বলে, যখন মন খারাপ করবে, তক্ষুনি চলে আসবি। যেমন আছ মুরোলবাড়ি, তেমুনি থাকো এখন। ভগবান যদি মুখ তুলে তাকায়, মা-বাছা মিলে টাউনে দোকান দুবো।'

এইসব কথা অনর্গল। হরিবোলা কিছু বোঝে না। টাউন বাজারের ভিড়ে হারিয়ে যাবার ভয়ে মাকে আঁকড়ে ধরে হাঁটে। ...

বাঁওড়ের কাছে খানিকটা উচু টুঙ্গির ওপর যুগীবরের কুঁড়েঘর। খড়-বাঁশের একটা ঝুপড়ি, সামনে খানিকটা মাটি ঝকমক করছে। হিজলগাছের ডালে ঝুলছে দড়ির সিকে, তার মধ্যে দুটো হাঁড়িকুড়িতে তার খাদ্যদ্রব্য। গুঁড়িতে ঝুলছে তার হুঁকো। এই তার সংসার। বহুবছর আগে সে গ্রাম থেকে এখানে এসে নিরিবিলিতে এই সংসার গড়েছে। একটুকরো খেত ছড়িয়ে আছে সামনে। এই তার সম্পত্তি। সারাবছর সে বিবিধ ফসল ফলায়। তাকে বেচতে যেতে হয় না, নিকিরিরা এখন থেকেই কিনে নিয়ে যায়। গ্রামে সে কখনও-সখনও যায়, সেও নুনতেল কিনতে, হাটবারে একখানি কাপড় কিনতে। সেও এক হুদ্‌মুসলো,— গোঁয়ার মানুষ। কোমরে কোনোরকমে গামছা জড়ানো। শীতকালে বড়োজোর গেঞ্জির ওপর তুলোর কম্বল। মাথায় পুরনো কাপড়ের টুকরো দিয়ে পাগুড়ির মতো একটা কিছু বানিয়ে নেয়। যখন তার খেতের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সে এক দাম্ভিক সম্রাট। বাগালরা তাকে খুব ভয় পায়। শুধু হরিবোলাকে সে পাত্তা দেয়, পছন্দ করে এবং হরিবোলা কাছে এলেই তার মুখ খুলে যায়। হাঁটুদুমড়ে গমের চারার ভেতর বসে আগাছা ওপড়াতে ওপড়াতে সে মুখ তুলে বহুদূরে তাকিয়ে অন্বেষণ করে তাকে।

এদিন ছেলেটাকে দেখতে না পেয়ে ভাবছিল জ্বরজারি হয়েছে বুঝি। কিন্তু পড়ন্তবেলায় যখন সে হুঁকো হাতে পা ছড়িয়ে বসে সুখটান দেবার উপক্রম করছে, তখন তার গায়ে এক দীর্ঘছায়া। মুখ ঘুরিয়ে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চোখে রোদের ছটাও বটে। চিনতে পারে না।

হরিবোলার গায়ে রাঙা জামা, আনকোরা হাফপেন্টুল, পায়ে সত্যিকার স্যান্ডেল। ফিক করে হেসে বলে, 'যুগীকাকা, ইগুলান মা কিনে দিয়েছে। মেদিগঞ্জতে যেয়েছিলাম, বুইলা না যুগীকাকা?' সে দৌড়ে এসে হাঁটু দুমড়ে সামনে বসে পড়ে। কলকল করে বৃত্তান্ত বলতে থাকে।

যোগীবর খালি 'হুঁ' দিয়ে যায়। তারপর হরিবোলা তার হাতে একটা লেমুনচুষ গুঁজে দিলে সে মুঠোয় ধরে রাখে জিনিসটা। একটু পরে বলে, 'তুর মা মেদিগঞ্জতে থাকে?'

হরিবোলা খিটখিট করে হাসে। 'তমে তুমি এতক্ষুণ শুনলা কী?' বলে সে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখার পর জামা খুলে ফেলে। স্যান্ডেল দুটো খোলে। পেন্টুলটা খুলতে যায় কুঁড়ের পেছনে। ফিরে আসে আগেকার বাগাল হয়ে। পরনে, ধানু মোড়লের ছেঁড়া পেন্টুলখানা মাত্র। চাপা গলায় বলে, 'ইগুলান নুকিয়ে থোব তুমার কাছে। মুরোল জানলে মারবে, বুইলা না?'

যোগীবর মাথা নেড়ে বলে, 'বুইলাম।'

হরিবোলা জামা-পেন্টুল-স্যান্ডেল গুটিয়ে যোগীবরের হাতে গুঁজে দেয়। তারপর চিতেবাঘের বাচ্চার মতো দৌড়ুতে থাকে। তার চেরা গলার গান ভেসে আসে কুয়াশামাখানো নরম রোদের ভেতর থেকে, 'বঁধু লাও বা না লাও/মুখ দেখে যাও/বাসি কাচের আয়না ...'

যোগীবর সাধুর মতো উদাসীন হেসে হরিবোলার জামা-পেন্টুল-জুতো দেখতে থাকে। একবার শোঁকেও। নতুন কাপড়ের গন্ধটা বেশ। টাউনবাজারের কথা মনে পড়ে যায়। কতকাল সে টাউনবাজারে যায়নি। শিগগির একদিন যাবে।

দুধসরের নালার কাছে পাতকুড়ো মুখ চুন করে দাঁড়িয়েছিল। হরিবোলা কাছে গেলেও সে কথা বলে না। গোরুবাছুরের পাল তখন সবে ঘরমুখো হচ্ছিল। বাগালরা হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিল নালার এধারে। বাগালদের দলপতি এসে হরিবোলাকে দেখেই নিষ্ঠুর হেসে ঘোষণা করে, 'হরিবুলা, আজ তুর মরণ মুরোলের হাতে। তুর পাল ডাকিয়ে খোঁয়াড়ে লিয়ে যেয়েছে দ্যাখ্‌ গা যা! গম খেয়ে বিনেশ করেছে, যা তা কথা?'

হরিবোলা চেঁচিয়ে ওঠে, 'শালা পাতকুড়ো!' তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাতকুড়োর ওপর। দুজনে পড়ে যায় ব্যানার ঝোপে। জড়াজড়ি খামচা-খামচি চলতে থাকে।! দলপতির বয়স বেশি। গায়ে জোর বেশি। সে দুজনকেই চাঁটি মেরে ছাড়িয়ে দেয়। দাঁত বের করে বলে, 'মা-সোয়াগির ব্যাটা হয়েছে! যাও, এখন মাকে বুলে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে লিয়ে এস।'

পাতকুড়ো কী বলতে যাচ্ছিল, দলপতির থাপ্পড় দেখে থেমে যায়। হরিবোলা কী বলবে ভেবে পায় না। সে শুধু চোখ কচলায়। বাগালদলের চোখে-চোখে ইশারা আর বাঁকা হাসি দেখে সে শুধু আঁচ করতে পারে, যেন ইচ্ছে করে তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। পাতকুড়োকে তার গোরুগুলো চরাতে দেওয়া হয়নি হয়তো। তাই তারা গমখেতে ঢুকেছিল।

যোগীবর হুঁকো টানা শেষ করে কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়িয়েছে, হরিবোলা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। যোগীবর বলে, 'কী রে বাছা? গেলি তো হাসতে হাসতে উঁ?'

তারপর সব শুনে সে অভ্যাসমতো বহুদূরে দৃষ্টিপাত করে। গোরুর পাল নিয়ে বাগালেরা ফিরে চলেছে। সূর্য লাল চাকা হয়ে ডুবছে দোমোহানীর দিকে। দূরের ডহরে ধূলো, কাশবনের মাথায় কুয়াশা, বিল থেকে মেছুনিরা উঠে আসছে কাঁধে বিশাল প্রজাপতির ডানার মতো জাল নিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক — প্রতিদিন দিনশেষের একই ছবি। যোগীবর আস্তে আস্তে বলে, 'মুরলকে যেয়ে বুলগা বা, কী আর করবি?'

হরিবোলা ভাঙা গলায় বলে, 'মুরোল মারবে?'

যোগীবর ঘড় ঘড় করে কেশে এবং হেসে বলে, 'তাইলে মায়ের কাছে চলে যা বরঞ্চ।'

'মা বুলেছে মুরোলেব কাছে থাকতে।' হরিবোলা আবাব ফুঁপিয়ে ওঠে। 'মা বুলেছে, য্যাখন খবর দুবো, ত্যাখন আসবি — লৈলে আসবি না।'

'তুর মা বুলেছে?'

'হুঁ। বুলেছে য্যাখন-ত্যাখন কক্ষুনো আসবি না।'

যোগীবর বুঝতে পারে না। রাগ করে বলে, 'তাইলে যা ইচ্ছে কর্ গা বাছা! দেখি, বাঁওড়ে জালখানা পেতে আসি— রেতে যদি দুটো মাছ-টাছ পড়ে।' সে হিজলডালে টাঙানো খোপ-জালখানা পেড়ে নিয়ে থপথপ করে চলে যায়। আর পিছু ফেরে না।

হরিবোলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে চোখ কচলায়। ....

ধানুমোড়লের খবর পেতে দেরি হয়নি, দোমোহানীর লোকেরা তার পাল ডাকিয়ে খোঁয়াড়ে নিয়ে গেছে। ছাড়াতে পনেরো-ষোলো টাকার ধাক্কা। এদিকে বাড়িতে জামাই, সেও মোড়লের মেয়েকে টাকার জন্য লেলিয়ে দিয়েছে। ধানু মোড়ল যত, তত তার গিন্নিও টাকা-অন্ত প্রাণ। ধানু মোড়লের মাথার ভেতর আগুন জ্বলে গেছে। গিন্নির তো গলা শুকিয়ে গেছে গাল দিতে দিতে। ঘরে জামাই, তাতে কী? দোমোহানীর খোঁয়াড় থেকে গোরুগুলো ছাড়িয়ে আনতে মাঝরাত হয়ে গেল।

মোড়ল গোয়ালে গোরু বেঁধে টিউকলে হাত-পা ধুতে ধুতে চোখের কোনা দিয়ে কী একটা দেখতে পায় পেয়ারাগাছের লাগোয়া। ভিজে হাতে লণ্ঠন তুলে দেখার চেষ্টা করে বলে, 'উটা কী?'

মোড়লগিন্নি বলে, 'বেউশ্যের পুত থাউক বাঁধা।'

পেয়ারাগাছের সঙ্গে গোরুবাঁধা দড়িতে খুদে বাগালটা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছে দেখে মোড়লও গলার ভেতর বলে, 'খানকির পুত থাউক বাঁধা।'

কিন্তু রাত আরও গভীর হলে সেই মোড়ল বিবিধ বিবেচনার পর লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে উঠোনে নামে। একটু বুক কাঁপে। মরে-টরে যায়নি তো? কাছে এসে দেখে বাগালের কঠিন প্রাণ— মাঠেঘাটে জলজঙ্গলে রোদ বৃষ্টি-শীতের ধারাবাহিক প্রহারে কালক্রমে শামুকের খোলের চেয়ে দড়।

তার লিকলিকে বাহু খামচে ধরে মোড়লমশাই তাকে খড়কাটার কুঠুরিতে ঠেলে দেয় এবং নিজের বিছানার ওমে ফিরে যায়। ওপরে খড়, নিচে খড়, মধ্যিখানে কুঁকড়ে পড়ে থাকে হরিবোলা। আজ রাতে তার অবচেতনায় সেই বিশাল তৃণভূমি রাঙাদাসী হয়ে ফিসফিস করে কথা বলে। তার চিমসে ফাটা ঠোঁটদুটো কেঁপে ওঠে। ঘুমের ঘোরে সে মায়ের দেওয়া লেমুনচুষ চুষতে থাকে। তার দুই ভুরুর মধ্যিখানে আঁকা রাখালফোঁটাটি এখন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। সে এখন প্রকৃতই রাঙাদাসীর ছেলে হয়ে ঘুমোয়। ...



দখল

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা থেকে ছেচল্লিশ কিলোমিটার গিয়ে রেল লাইন শেষ। তারপর কয়েকখানা লঞ্চ আছে। সেসব না-থাকারই মতো। কেননা, এদিকটায় এত নদী, এত খাল, তারই ফাঁকে ফাঁকে এখানে সেখানে এত ঘর-গেরস্থালি যে, সব জায়গায় লঞ্চ যায়ও না। জায়গাগুলোর নানা রকমের নাম। লাট অঞ্চল। কেউবা বলে বাদা এলাকা। কেউ বলে আবাদ। বর্ষাকালে ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ কমে যায়। শীত এলে চলাচলের পথ নিরাপদ হয়ে ওঠে। কেনার লোক নেই — তাই ওখানে দুধ সস্তা। নতুন ধান উঠলে দর খুব কম থাকে। সেই একই কারণ। কেনার লোক নেই। বলা দরকার, ডাঙা মানে যেখান থেকে রেললাইনের শুরু। তা যাই হোক, বাদা হোক — যাই হোক — ওদিকটায় এখন পশারের আশায় ডাক্তারও গিয়ে বাসা বাঁধছে। সরকারি পরিবার পরিকল্পনার তাঁবুও পড়ে মাঝে মাঝে। এমনকি সিনেমাও যাচ্ছে।

ডাঙায় গোলমাল করে ওদিকটায় গিয়ে লোকে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। ফেরার সময় কারও বউ বা বোন ভাগিয়ে ফেরে। পথে এক একটা নদী পড়ে যায়। বেশির ভাগই ভাঁটার সময় বুজে আসা বুক তুলে লঞ্চ কোম্পানির বাবুদের ভাবিয়ে তোলে — আর খানিক খানিক স্মৃতি মুছতে মুছতে মেয়েমানুষেরা পিছটানের সবটুকু ঝেড়ে ফেলে ডাঙায় পা দেয়। রেল চড়ে। তারপর আস্তে আস্তে কলকাতার পথে ভিখারি হয়। ঝি হয়। তেমন সুযোগ-সুবিধা থাকলে চাইকি কেউ কেউ রক্ষিতাও হয়।

ছেলেছোকরারা এদিকটায় বসে ব্যবসা বলতে ট্রেনের কামরায় পাউরুটি বেচে। ক'দিন পরে তারাই প্ল্যাটফর্মে তক্কে তক্কে থেকে ছিনতাই করে। দু'একজন বেরিয়ে গিয়ে ওয়াগন ব্রেকার হয়েছে। নয়তো বেশির ভাগই ভোরবেলা পাঞ্জাবি হোটেলের ঢাউস ঢাউস চুলোর ছাই ঘেঁটে কয়লা খোঁজে। তারপর আস্তে আস্তে বয়স হতে দেখা যায় এরাই কেউ পুরনো কাগজ কিনে বেড়ায়। কেউবা পুরনো গ্রামোফোন, টাইপরাইটার, টায়ার।

ন্যাশনালাইজেশনের পরে আমাদের এদিকটায়ও একটা ব্যাঙ্ক হয়েছে। তার বাবুরা দশটা দশের ট্রেনে এখানে এসে নামে। ডিপোজিট বিশ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ায় একজন অ্যাকাউন্টান্ট আসবে শোনা যাচ্ছে। এখানে এত টাকা জমা পড়ার কারণও আছে। আবাদের সস্তার দুধের ছানা নিয়ে আমাদের গাঁয়ের উপর দিয়ে ট্রেন ভোরে কলকাতায় যায়। ফিরতি ট্রেনে এখানকার নতুন কলেজের মাস্টারমশাইদের নিয়ে ফেরে। আসলে আমাদের হল গিয়ে কেনাবেচার জায়গা। আটজন এম বি বি এস, সতেরোজন উকিল, একুশজন প্রাইমারি টিচার, একজন করে পোস্টমাস্টাব, হেডমাস্টার, স্টেশনমাস্টার থাকায় আমাদের এই স্টেশনবাজার এলাকার বিরুদ্ধে অনেকেরই হিংসে। তাছাড়া একটি হেলথ সেন্টার আছে। আছে পঞ্চানন অপেরা পার্টি। উপরন্তু ফি শনিবার গোহাটা বসে। তাতে দাড়িঅলা কাবলি ছাগলও আমদানি হয়।

বলতে গেলে অনেক কথা আছে আমাদের। শুধু এইটুকু বলি, আমাদের এখান থেকেই মাছ, মুড়ি, তাড়ি, ঠিকে ঝি, ভিখারি, ঢেড়স ফার্স্ট লোকালে কলকাতায় যায়। কলকাতা থেকে লরিতে গম এলে এখানকার একান্নটা দশঘোড়ার গমকল গোঁ গোঁ আওয়াজ করে তাকে আটা বানায়। আবার এখানেই লোকের ওপর ভর হলে মাথায় ভরা-কলসি নিয়ে পঞ্চাননতলায় আসে। বিয়ের বাজারে একটা পার্টিই সব কটা রিক্সা সাইকেল ভাড়া নিয়ে ফেলে। তখন আর উপায় কী! হাঁটো একা একা। রবিবার ভাগা দিয়ে মাংস বিক্রি হয়। আমাদের এখানে কসাই তিনজন। থানা এখান থেকে পাঁচমাইল। ফাঁড়িতে একজন জমাদার থাকে। তার নাম তারাপদ মালাকার। বয়স কম। দিনে-দুপুরে পরিষ্কার ঘুষ খায়, কোনো ছাপাছাপি নেই।

একটা খাল আছে আমাদের এখানে। তা ঘুরে ঘুরে মগরমপুর পর্যন্ত গেছে। জল নোনা বলে চাষে লাগে না।

মাছ হয়। লোক সারাদিন ঘাঁটাঘাঁটি করে চাবলি, চিংড়ি, ট্যাংরা —যাহোক কিছু পায়। এই খালটাই তবু এখানকার কিছু আদি দৃশ্য ধরে রেখেছে। জায়গাটা নতুন হয়ে যাচ্ছে। তার ভেতর এখানকার যা-কিছু পুরনো— তা এই খালেরই গায়ে। যেমন, বয়স্ক বিষধর সাপেদের গর্তগুলোর বেশির ভাগ এই খালেরই তোলা মাটির বাঁধে। বাঁধটার নাম অবশ্য কোম্পানির বাঁধ। কেন যে তা কেউ বলতে পারে না।

দূর থেকে দেখা যাবে — বিশাল মাটির বাঁধ আকাশের সঙ্গে মিশে থেকে পেছনটা আড়াল করে আছে। তা এই খালেরই গায়ে রেল কোম্পানির একেবারে গোড়ার দিককার ইট বানানোর পুকুরমার্কা সব গর্তগুলো জলে বোঝাই হয়ে পড়ে থাকে। এখানেই এত লতাপাতা, জঙ্গল যে চরতে বেরিয়ে পাতিহাঁস শেয়ালের পেটে যায়। এই পথেই রেলের স্লিপার চুরি হয়ে জলে জলে ভাসিয়ে নিয়ে লোকে রাতারাতি করাতকলে চেরাই করে নির্দোষ তক্তা বানিয়ে ফেলে।

এখানে দিনের বেলা ছ' সাতশো বিঘা জুড়ে রোদ্দুর হাসে। বেশি রাতে চাঁদ এখানেই আলাদা রকমের তেরছা জ্যোৎস্না ফেলে। শান্ত স্তব্ধ গম্ভীর চৌকো জ্যোৎস্না। তার ভেতরে গভীর রাতের বাতাসে বুনো লতার ডগাগুলো তির তির করে কাঁপে। তখন মালগাড়ি শান্টিংয়ের আওয়াজ ইটখোলার জলেও কাঁপনি তোলে। গাছপালা ছাড়া এসব দেখার কোনো সাক্ষী থাকে না তখন। দিনের বেলা হলে গরু চরাতে এসে বাখালরা তবু দেখে।

তা এখানে ভবেন এল। লোকটাকে লোকে ভবেন বলেই ডাকতে লাগল। মাথার টাক জুড়ে কিছু কাঁচাপাকা চুলের রেলিং। নোনাজলের পোড়খাওয়া গর্ত গর্ত মুখ। নাকের পাটা বাঁকানো বাঁকানো। গায়ে একটি রংচটা গলাবন্ধ গেঞ্জি। পরনে হাঁটুঝুলের ঢোলা হাফপ্যান্ট। খালি পা। তার দুটি আঙুলে আবার নখ নেই। চওড়া হাত জুড়ে জেগে ওঠা শিরার লাইন। চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। তা এই ভবঘুরে প্যাটার্নের লোকটি এক শনিবার দুপুরে আবাদের দিক থেকে ট্রেনে এসে ডাউন প্ল্যাটফর্মে নামল।

সঙ্গে একটি মেয়েছেলে। কাপড়ের পুঁটুলিতে কিছু বরবটি। আর একটি মাটির হাঁড়ি। সবাই বলল, ও হল গিয়ে ভবেনের ভাগানো মেয়েমানুষ। দ্যাখো গিয়ে লাট অঞ্চলের কারো বউটউ হবে। সেখানে নাকি আইন, সভ্যতা এখনো পাকাপাকি শেকড় নামাতে পারেনি। সবই শোনা কথা। এদিককার বেশির ভাগ ভদ্দরলোক-ক্লাশের লোকজন ভোর-ভোর জুতোপায়ে কলকাতায় চাকরি-বাকরি করতে যায়। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে সকালের কাগজ মন দিয়ে পড়ে। আর খালিপায়ের লোকজন জন খাটে। পাঁচ মাইল হেঁটে মেলায় যায়।

ক'দিন কলকাতার ডেলিপ্যাসেঞ্জাররা দেখল, ডাউন প্ল্যাটফর্মে হাফপ্যান্ট-পরা একটা লোক ইটের চুলোয় কাঠকুটো গুঁজে ভাত সেদ্ধ করছে মাটির হাঁড়িতে। তার পাশে ঘোমটা টেনে একটি মেয়েছেলে ঘট হয়ে বসে থাকে।

ক'দিন বাদেই প্ল্যাটফর্ম আবার ফাঁকা। ওদের আর দেখাই গেল না। আমাদের এখানে আগের মতোই লোকাল ট্রেনগুলো নিয়মিত লেট হতে লাগল। সূর্য টাইম মতো উঠতে লাগল। ফাল্গুন-চৈত্রে আমাশার প্রকোপ কম বলে লোকাল ডাক্তারদের মুখগুলো শুকনো। পেশেন্ট কম।

ওদের দেখা আবার যে প্রথম পেল বছর তিনেকের তফাতে সেদিনই সবে সে এখানে ফিরছে। আমাদের এখানকার সবেধন আধা-ডাকাত আধা-চোর। এমনি দেখতে মিনমিনে। চাদ্দিক-আঁধার-করা বর্ষার রাতে এই মানুষই সড়কি হাতে গোলা কেটে ধান সরায়। আমাদের আদরের সন্তোষ টাকি। মাথা-মুখ ছোবড়া ছাড়ানো পুজোর নারকেলটি। দু'টি ফিকে ভ্রূ ছাড়া ও তল্লাটে কোথাও একগাছি চুল নেই। তাই সন্তোষ টাকি।

আলিপুরে খালাস পেয়েছিল ভোরবেলা। দশটা দশের ট্রেনের এখানে নেমে দেখে অনেক কিছু পালটে গেছে। তিন বছর আগে জেলে যাবার সময়কার স্টেশনমাস্টার, পোস্টমাস্টার, হেডমাস্টার— তিনজনই বদলি হয়ে গিয়ে নতুন লোক বসেছে। একটা ব্যাঙ্কবাড়ি হয়েছে। লোকে সেখানে টাকা রাখে। একটা কলেজও বসেছে। হাতে ঘড়ি দিয়ে ছেলেরা পড়তে যায়।

তখন দুপুরবেলা। জুতো পায়ের লোকজন সব তখন কলকাতায়। জনখাটার লোকজন যে যার বাড়িতে খেতে গেছে। বিড়ি-তামাকের দোকানদাররা ভয়ে ভয়ে একটা দুটো বিড়ি এগিয়ে দিল সন্তোষ টাকিকে।

কেউ বলল, এ-বেলাটা এখানে শুয়ে থাক।

কেউ বলল, আর ও সব পথে না গিয়ে এবার খাটাখাটি করে খাও।

আরও অনেক কথা ঘুগনি খেতে খেতে সন্তোষ টাকি শুনল। যেমন· এবার একটা ঘরদোর বানিয়ে থিতু হও। বয়স তো বসে নেই।

তুমি তো ঝাড়া হাত পা। একটা পেটের জন্যে এত ঝামেলায় জড়ানো কেন? বেশ তো দোকান-ঘরটর করে থেকে যেতে পার।

আমি তো অন্য কোনো কাজ জানিনে। লেকচার না দিয়ে একটা গ্লাস জল দে তো। গলায় আটকে যাচ্ছে ঘুগনি। জেলের সাঙাতরা বোধহয় মনে নিচ্ছে।

বেলাবেলি নিজের কাজের জায়গায় রওনা দিল সন্তোষ টাকি। শীতে ভুগে ভুগে রোদটা এখন সবে কড়া হতে শুরু করেছে। মাটি এই সময় ফেটে ফেটে নুন তুলে দেয়। সেই গুঁড়ো মাটি ঝিনুক দিয়ে চেঁছে মাটির মালসায় তুলে নিয়ে বাড়ি গিয়ে জলে ফোটালে নুনটা তলানি হয়ে জমে। সেই নুন ভাতের পাতে খায়। আবার অভাবে পড়ে মুদি দোকানে দিয়েও আসে লোকে। তাতে পঞ্চাশ ষাট পয়সা যা আসে তাই লাভ।

খাল কাটার সময়কার কোনকালের সেই তোলামাটি লোকের মুখে মুখে কোম্পানি বাঁধ। রাখালরা গোরু চরাতে এসে বলে — খালধার কিংবা খালপাড়। বিশাল ঢাল তুলে এবড়ো-খেবড়ো সে-মাটি সিধে দ্বাবিকপোতাব দিককাব আকাশে উঠে গেছে। সেখানটায় খালটা দু' ফাঁক হয়ে দু' দিকে চিরে গেছে।

এখানটা নির্জন। লোকে বলে খালের তেমাথানি। এখানেই জানাশুনো গর্তে সন্তোষ টাকি যন্ত্রপাতি রাখে। দু' একবাব সাপখোপ তাড়িয়েও যন্ত্রপাতি রাখতে হয়েছে। জিনিসপত্র পেলে ওখানকারই আশাপাশের ঝুপসি জঙ্গলে দিনে দিনে সেঁধিয়ে রেখে রাতারাতি হাবিশ করতে হয়েছে তাকে। এই কোম্পানি বাঁধেবই প্রায় আধাআধি অব্দি লোক নুনমাটি কুড়োতে আসে। জ্যোৎস্নারাতেও পায়েচলতি পথটাকে নুন ফুটে উঠে সাদা করে রাখে। বর্ষার জল দাঁড়ায় না। কিন্তু এঁটেল মাটি বলে পা ভীষণ হড়কায়।

কোম্পানি বাঁধে উঠে সন্তোষ টাকি তো অবাক। সেই সে প্রায় তেমাথানিব কাছাকাছি গিয়ে কে এখন নুনমাটি কুড়োচ্ছে। কাব বুকে এত সাহস? এই অবেলায়। অমন নির্জনে? সূর্য সবে কাত হয়ে পড়েছে। বাঁধের আধাআধি পৌঁছে বুঝল মেয়েছেলে। দিব্যি বসে পড়ে মাটি কুড়োচ্ছে।

আরও এগিয়ে সন্তোষ টাকি বুঝল, মাটি কুড়োচ্ছে না। আসলে ঝোড়ায় করে মাটি বয়ে দিচ্ছে। প্রায় চল্লিশ হাত রাস্তা হেঁটে গিয়ে মাটির ঝোড়া মাথা থেকে নামিয়ে দিল। আর সেখানে হাফপ্যান্ট-পরা একটা লোক খালের জল দিয়ে সে-মাটি পায়ে মাড়িয়ে জাব করছে। একটা ঘরের দেওয়াল উঠেছে অনেকটা। পাশেই তালপাতার ঝুপড়ি। তার গা দিয়ে লাউচারা সবে সিধে হচ্ছে। কোত্থেকে দু'টো বাবলা গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে খালের জলে ঘাটলাও তৈরি। সেখানে মাটি-মাখানো ভাতের হাঁড়ি উপুড় করে বসানো। ভালো করে তাকালে গোড়ালি জলে আরো দু' একখানা জিনিস ভেজানো অবস্থায় দেখতে পেত সন্তোষ টাকি। কিন্তু সে তখন অনেক জিনিস একসঙ্গে দেখছিল। জাব মাটি চড়িয়ে চড়িয়ে দেওয়াল তোলা, লাউচারা, মেয়েছেলেটিব মাটি বয়ে আনা, বিকেলবেলার কোম্পানি বাঁধ।

জায়গাটি ভালো বেছেছ।

ভবেন কোনো জবাব দিল না। শুধু একবার মেয়েছেলেটির দিকে চেঁচিয়ে বলল, এই দাক্ষী! ঢেলা ভেঙে গুঁড়ো মাটি আনবি বলে দিলাম।

সন্তোষের এই প্রথম একটি নতুন কথা জানা হল। মেয়েছেলেটির নাম—দাক্ষী। পুরুষটার নাম তো জানা গেল না এখনো। ঢেলা মাটি মাড়িয়ে জাব বানাতে পায়ে তো লাগবেই। পুরুষ লোকটা, সন্তোষ টাকি ভালো করে দেখে বুঝল, হাফ-ভিখারি, হাফ-গুণ্ডা। তেড়েমেড়ে ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে। এক একবার খরচোখে তার দিকে তাকিয়ে টেকে রাখছে। এখানে তালপাতার ঘরে থেকে ঘর বানাচ্ছে যখন, সাহস আছে নিশ্চয়। সন্তোষ নিজে এদিকটায় রাতবিরেতে চলাফেরা করেছে। কিন্তু রাতে থাকেনি কখনো।

লোকটা জাব মাটি চড়াচ্ছিল দেওয়ালে। এইভাবেই খানিক গেঁথে জিরেন দিয়ে দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিয়ে আবার গেঁথে তুলতে হয়।

সন্তোষ হা হা করে ছুটে গেল। কী হচ্ছে? মাটির ভেতর ছন দিলে না? বর্ষায় তো দ্যাল গলে যাবে —

একটা বর্ষা তো।

বাঃ! বছরে দুটো বর্ষা আসে নাকি! কী ধারার লোক বাপু তুমি?

ঝোড়া ফেলে দাক্ষীও কাছে এগিয়ে এল। আমিও তাই বললাম। তা কানে নেবে নাকি। শুধু বলে, একটা বর্ষা তো মোটে!

নদীর নোনা বাতাস খেয়ে খেয়ে লোকটার সারা গা তামাটে। ক্ষয়া দাঁতে বুজ-বুজ করে হাসি কেঁপে উঠতে লাগল। এক বর্ষার বেশি কুথাও তো থাকিনি। সন্তোষ টাকি দেখল, লোকটার হাসিমুখ, মাথার পেছনে বিকেলের বাড়তি রোদ মাখানো ঝাঁকড়া খিরিশ গাছটা খালের ওপারেই দাঁড়িয়ে। তার ওপাশে দ্বারিকপোতা পড়ে আছে। ওরা তিনজন এখন আকাশে উঠে যাওয়া কোম্পানি বাঁধের ওপর।

একটা হেঁসো দাও তো দেখি। ছন ঘাস কেটে এনে দিচ্ছি। কুটি কুটি করে জ্যাব মাটিতে মিশিয়ে নেবে। তারপর গাঁথো। ছ বর্ষাতেও দ্যাল কাবু হবার নয়।

বেশ খেলা খেলা লাগছিল সন্তোষের। কোম্পানি বাঁধে হাফ-ভিখারি হাফ-গুণ্ডা একটা লোক হাফ-প্যান্ট পরে দ্যাল গাঁথছে। দাক্ষী তার হয়ে ঝোড়ায় মাটি বয়। বিকেলের রোদ্দুরে মায়া ছিল। বাঁধের ঢাল বেয়ে সন্তোষ টাকি হেঁসো হাতে ঘাস কাটতে নেমে গেল। বেশ মজা তো। সন্তোষ টাকির এমন আরাম আগে কোনোদিন হয়নি।

তারপর কিছুদিনের ভেতর জুতো পায়ে দেওয়া ভদ্দরলোক ক্লাশের লোকজনদের বউ-ঝিরা বিকেল বিকেল বেড়াবার অছিলায় কোম্পানি বাঁধে পায়চারি করতে আসতে লাগল। স্টেশনমাস্টারের বউ পোস্টমাস্টারের বউকে বলল, চলুন না দিদি — দু'জন পুরুষ একজন মেয়েছেলের দখল নিচ্ছে কী করে, দেখে আসি এক-বারটি —

এইভাবে কোম্পানি বাঁধে ক্রমে ক্রমে লোক সমাগম হয়। বেশির ভাগই মেয়েলোক। তারা এদিকে-ওদিক নিরামিষ চোখে তাকিয়ে বিশেষ কিছুই দেখতে পায় না। মাটির দেওয়ালে বাঁশের দরজা। ওপরে খড় চাপানো। একজন আরেকজনের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে আঁচল ঢেকে হাসে। এ ম্যাগো! একখানা ঘর! দু'জন পুরুষ। ঘেন্না! ঘেন্না!

দাক্ষী হয়তো তখন উবু হয়ে ন্যাকড়ার ওপর বড়ি শুকোতে দিচ্ছিল। কিংবা কোম্পানি বাঁধের যে জায়গাটা একেবারে আকাশে উঠে গেছে— সেখানে দাক্ষী বিকেলের মোলায়েম রোদে চুল মেলে দিয়ে শুকোবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনই দ্বারিকপোতার আকাশে একখানা মেঘ ঝুলে পড়ে। এ সব দেখার মতো চোখ ভবেনের নেই। এ সব দেখার মতো চোখ সন্তোষ টাকি কোত্থেকে যেন ফিরে পাচ্ছিল। বাবুদের বউ-ঝিরা এ সব দেখে শুনে আঙুল মটকে মুখে বলেছে, ঢঙ! আমরা কিছু আর বুঝি না? হেডমাস্টারের সুতিকায় সারা বউ মনে মনে তিনবার বলেছে, গতর! গতর!! গতর !!! যেদিন থাকবে না?

পুরুষদের সময় কম। তারা যাওয়া-আসার পথে যেটুকু দেখতে পেল, তা হল : হাফ-প্যান্ট ভবেন সাড়ে পাঁচ টাকা রোজে জয়াধানের বীজ ভাঙছে। রোয়া কেমন এখনো জানা যায়নি। কিছু ন্যালা খ্যাপা আছে। লোকে এইটুকু যা বলল।

ভদ্রেশ্বর পরামানিক বাবুদের গাল কামাতে কামাতে হেসে বলে, সন্তোষ টাকি এখন কোম্পানি বাঁধে ঘর সারে। সারাদিন ঠুক্‌ঠাক। এখানে খড় চাপাচ্ছে। ওখানে মাটি লাগাচ্ছে। দিনি একবার মোটে বাজারে হাজিরে দেয়। বিড়ি, দেশলাই, আলুটা, মুলোটা! এই আর কি!

বাবুরা আর ভদ্রাকে ঘাঁটায় না। কী বলতে কী বলে বসবে। মুখের তো কোনো লাগাম নেই। সবাই জানে, ডাকাতির সুলুক-সন্ধান ভদ্রা গিয়েই সন্তোষকে দিত। দিয়ে ভাগা পেত।

তোর না গুরু?

সে ছিল এককালে! এখন কী আর পুরুষমানুষ আছে? তারপর ক্ষুরখানা চেটোয় মুছে গুনগুন করে তান দিল আর দাড়ির দানা দেখে দেখে খুর বোলাতে লাগল। কোম্পানি বাঁধের বাইরে আর বেরোচ্ছে কোথায়!

ভবেন মানুষ না পাথর বোঝার উপায় নেই। জনখাটুনির মাঝে হনহন করে হেঁটে গিয়ে বেলা বারোটা

নাগাদ পাউরুটি আর আলুর দম খায়। সঙ্গে ছেলেছোকরাদের টিটকিরি থাকে। আজ গিন্নি রাঁধেনি। না! বড়ো জামাই নে আছে!

ভবেন সোজা আকাশের দিকে তাকিয়ে পাঁউরুটিচিবোয়। কাজের সময় কথা বলে না। হাফ-প্যান্টটা কোমরে নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা। কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথার চারদিকে কাঁচাপাকা চুলের রেলিং। নাকের পাটা বাঁকানো বাঁকানো। লম্বাপানা লোক। রাস্তায় হাঁটবে ঠিক সোজা তাকিয়ে। গুঁতো খেলে ব্যথায় কাতরায় না। চোখ কুঁচকে একবার মোটে পায়ের দিকে তাকায়। আবার লম্বা পা ফেলে ফেলে হাঁটে। রিলিফের আটা বিলির সময় লাইনেও অমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ধাক্কা খেয়ে এগোয় পিছোয়। কিন্তু কোনো কথা বলে না। পা মাড়ালে গালমন্দ দেয় না। কালচে মুখের ওপর সাদাটে গোঁফ চকচক করে। সবসময় ভাবছে। ভাবছে। বাঁশি দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন গেলেও চমকায় না।

সন্ধেবেলা বিড়ি দেশলাই জোগাড় করতে এসে সন্তোষ টাকি তুলসীর দোকান থেকে একখানা সাবান সরাল। তারপর সরকার অয়েল মিলে গেল খানিকটা সরষের তেল চাইতে। ওদের টিনের তলানি ঝরিয়ে নিতে দিলেই একটা শিশি ভরে যাবে। বেরোবার সময় দাক্ষী বলেছে, খালের মাছ তো সবাই ধরতে পারে। তেল কোথায়?

কেরোসিনটা, ভুট্টা, আটাটা ভবেন কষ্টেসৃষ্টে জুটিয়ে আনে। মাছ, আনাজপাতি — সে যেরকমই — সন্তোষ টাকি জোগাড় করে ফেলে। কাঠকুটো দাক্ষী সবসময়েই কুড়িয়ে এনে রাখে। কিন্তু সরষের তেলটা আর হয়ে ওঠে না। সন্তোষ টাকি দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সরকার অয়েল মিলের বড়োজন বলল, তুই কেন পল' পেতে নিবি। ইদিক আয়। পাত্র এনেছিস —

শিশি দেখাতে সন্তোষকে বড়ো ট্যাঙ্কের ওপাশে নিয়ে গেল। এ হল গিয়ে যাটভাগ লাল সর্ষে। বাকিটা শ্বেত সর্ষে। এমন তেল বড়োবাজারেও পাবিনে —

বড়োবাবু। আমার হাতে কিন্তু পয়সা নেই।

তাতে কী। তুই এট্টা দেশের লোক। তাতে কী। তারপর বাড়তি তেলটা হাতের পাতায় মুছে খুব অন্তরঙ্গ গলায় বড়োবাবু বলল, হ্যাঁরে, তোদের ওই মেয়েছেলেটার নাম যেন কী?

দাক্ষী। নাম দিয়ে কী হবে আপনার?

নাম না হলেও হত বটে। তবে কিনা, শুনেছি, ডাকিনী মন্ত্র জানে। তুকতাক করে। কী বলিস। হ্যাঁ —

তা করে। মজা পেয়ে সন্তোষ বলতে লাগল। বেশ করে —

কীরকম? গান-টান গায়?

শুধু গান! পূর্ণিমে রাতে কোম্পানি বাঁধে একা একা নাচে। চুল অ্যালায়ে দে —

সন্তোষ জানত, এই লোকটির দু'টি সরকারি বউ। তাছাড়া শেয়ালদায় পৃথক বাসায় একটি মেয়েমানুষও আছে। তার জন্যে শনিবার শনিবার বৈঠকখানা বাজার থেকে পৃথক বাজার করে। বড়ো বড়ো টমেটো। বড়ো বড়ো কই। এখানকার অনেকেই দেখেছে।

এট্টু দেখাবি?

তেল তো নেওয়া হয়ে গেছে। সন্তোষ দোকান থেকে রাস্তায় নেমে বলল, বাঁধে উঠলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

তা দিস বাপু। এ ঠ্যাং আর রেখে লাভ কী। একবারটি দেখাস। কাছ থেকে। কথা বলব না। দেখব একটু। গান শুনব। নাচ হয়তো নাচ দেখাস খানিক। কী বলিস। হ্যাঁরে বাপু!

এ যে একদম গুড়ের মাছি। বলতে বলতে সন্তোষ সটকে এল।

ভবেনকে কেউ বিশেষ ঘাঁটায় না। দেখেছে ঘাঁটিয়ে। কোনো লাভ নেই। কথা কয় না। চুপচাপ শূন্যে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধে সন্ধে সেদিন তিনজনই খেয়ে নিল। দাক্ষীর রান্না। অনেকদিন পরে ভাত। রিলিফের চালের গরম গরম ভাত। সঙ্গে খালের মাছ। খাওয়া হতেই দাক্ষী এক ফুঁয়ে কুপিটা নিবিয়ে দিল। নয়তো এতক্ষণ খেতে বসে একজনের মুখে কাঁকড় পড়লেই আরেকজন কুপিটা এগিয়ে দিচ্ছিল। মুখে কোনো কথা নেই। ভবেন দেয়

সন্তোষকে। সন্তোষ ভবেনকে। দাক্ষী খেতে বসেছিল একটা কলাই বাটি নিয়ে। আর সবাই এখানে মাটির। নয়তো পাতা। কাণ্ড দেখে বাটির উঁচু কানাৎ দিয়ে মুখ ঢেকে ভাতের গ্রাসের ফাঁকে ফাঁকে দাক্ষী মিটির মিটির হাসছিল। তারই জন্যে দু'টো জ্যান্তমানুষের কথাবার্তা কমে গেছে। একি কম মজার!

সেদিন আকাশের গায়ে ফোস্কা পড়েছিল। থেকে থেকেই কালচে মেঘে বিদ্যুৎ ঝলকে যাচ্ছিল। ভবেন খালের তেমাথানির ঢালের দিকে বসে বিড়ি ধরাচ্ছিল আর নিবে যাচ্ছিল। সন্তোষ ঘরের সামনে উঁচু ঢিবিটায়। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেই দাক্ষী যে জায়গাটায় বসল — সন্তোষ টাকি জানে, অনেকদিনই জানে, ওখানে তেনারা থাকেন। মাঝে মাঝে ছানাপোনা হয়। বংশ বাড়ে। তবু বুড়োবুড়ি জায়গা পালটায় না। মাঝেমধ্যে বুড়োটা বেরোয়। কখনো বুড়িও বেরোয়। বয়স হয়েছে। মাথা হাতের চেটোর চেয়েও চওড়া। ঠেলে দাঁড়ালে চিক চিক করে।

সরে বোস, জায়গা ভালো না।

কাটে কাটুক। বলেই অন্য কথায় চলে গেল দাক্ষী। তোমাদের এখানে নদী নাই কেন?

সব জায়গায় কি নদ হয়!

আমাদের দেশে — সব জায়গায়। বলতে বলতে দাক্ষী একটা বুনো সুর তুলে নিল গলায়। সেই গানের ভেতরেই চাঁদ উঠে এল আকাশে। ভবেন দু'বার কাশল। দু'বারই বিড়ি ধরানোর শুকনো কাশি। দাক্ষী বলল, আমাদেব আবাদে ভাঁটায় জল সরে যায়। তখন নদীগুলো মাঠ। সেখানে জোলোঘাস খেতে গরু নেমে আসে। আবাব জোয়ারের তাড়ায় গরুগুলো পাড়ে ফিরে আসে। এ নিত্যিকার কাণ্ড —

ভবেন হন হন করে ঘরে ঢুকে গেল।

কোথায় যাওয়া হচ্চে শুনি?

আমি ঘুমোব না?

তা ঘুমোও এখন। তবে ঘুম পেলে জায়গা ছেড়ে দিও।

ভবেন ভেতরে যেতে যেতে বলল, তুমি তো দিনি দিনি ঘুমোও। সারাদিন মাঠে খাটুনি। এখন একটু শোব না?

দাক্ষীর এসব ভালোই লাগছিল। কে তার সঙ্গে শোবে তাই নিয়ে রোজ এরকম কাণ্ড।

কাছাকাছি থাকে সুধন্য। জিপিও-তে সর্টার। ভোরে বেরিয়ে সন্ধে রাতে ফেরে। সে তামাক খেতে বসে সন্তোষের চড়া গলা পরিষ্কার শুনতে পেল। তা সন্ধে রাতে শুয়ে নাও। পরে উঠে গেলেই হল।

দিনি খেটে ভাত জোগাব! আর রাতে রাতে বাইরে বসে পাহারা দেব?

তা গরমের রাতে না হয় বাইরে শুলে —

রাতভোর শিশির পড়ে। ঘুম হয় নাকি? এবারে ভবেন দাক্ষীর দিকে ফিরে তাকাল। অন্ধকার সন্ধ্যা। কেউ কারও চোখ দেখতে পায় না। সুতরাং মনও দেখা যায় না। গলার স্বর শুনে যে যেটুকু পারে ভেবে নিতে পারে। তুই কিছু বলবি না দাক্ষী? রোজ চুপ করে থাকবি?

দাক্ষী এবার সত্যিই ডাকিনীর মতো খ্যা খ্যা করে হাসল। অনেকক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ চমকে মাঝে মাঝেই দাক্ষীকে একটা আঁটোসাঁটো বড়ো সাইজের শুয়োর লাগছিল। হাসি থামিয়ে বলল, আমি বাপু কারও দিকে নাই। যে পারো জিতে লও! আপত্তি নাই! কেউ তো দুধের খোকাটি নও। দাঁতের পরিচয় আমি পাই নাই?

কথাটা খুবই সত্যি। ভবেনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষও মিইয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে, ভবেনদা, তুমি একটা ভাতঘুম দিয়ে নাও। এখন তো আমাদের ঘুম নাই চোখে —

তা থাকবে কোত্থেকে। সারা দুপুর ঘুমাইলে — বলতে বলতে ভবেন ঘরে ঢুকে গেল। মাটির। মাটির নিকানো মেঝে। কোণে মেঝে খুঁড়ে চুলো। এক দেওয়ালের গায়ে লম্বালম্বি বাঁশের চৌকি। সন্তোষ টাকির রাতে রাতে কেটে আনা বাঁশে তৈরি। ভবেন শুতেই ক্যাচকোচ শুরু হল। খালি আড়মোড়া ভেঙে ভবেন ডাক ছেড়ে চেঁচাতে লাগল, দাক্ষী-দাক্ষী—

উত্তর দিল সন্তোষ টাকি। এখন দাক্ষী ঘুমোবে না। তোমার ঘুম পেয়েছে — তুমি ঘুমিয়ে নাও।

বাঁশের চৌকিতে উঠে বসল ভবেন। ঘুমোবোই তো। সারাদিন তো আঁচল ধরে থাকি না। জন খাটি।

ক'দিন ধরেই চারদিকের মাঠগুলো সদ্য রোয়া ধান চারায় জুড়ে যাচ্ছিল। আর ফাঁক নেই কোথাও। যেটুকু আছে — তাও থাকবে না। দিনের আলোয় এ-ছবি আর ভবেনের দেখতে ভালো লাগে না। অথচ একটা চিন্তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। তার থেকে কোনো মুক্তি নাই। রোয়া শেষ হলে দেশ-গাঁয়ে কাজ খতম। তখন কোথায় জন খাটবে? কী খাবে? সন্তোষটা আজকাল ডাকাতি দূরে থাক —চুরিটা পর্যন্ত করে না। তিনটে প্রাণীর আহার জোটাবে কোত্থেকে? সারাদিন যদি ঘরেই থাকে। এই দাক্ষী —

দাক্ষী ছুটতে ছুটতে ঘরে গেল। কেন?

দুয়ারটায় হুড়কো দে —

দরকার নাই। এখন আঁধার —

দে হুড়কো। বলছি দে। একটা হায়া নাই। কীরকমের মেয়েমানুষ তুই।

মুখের ওপর দরজা বন্ধ হওয়াতে সন্তোষ গজরাতে লাগল। এইমাত্র দেখতে পেল, দ্বারিকপোতার আকাশে একজোড়া তারা খসে পড়ছে।

ভবেন তখন দাক্ষীকে জানবার চেষ্টা করছিল। সন্তোষ কেমন রে? আমার মতো?

দাক্ষী বলতে যাচ্ছিল, খারাপ কী। কিন্তু মুখে এসে গেল, তোর চেয়ে অনেক ভালো।

ভবেন ঢোক গিলে বলল, তাতো হবেই। ওর তুলনায় আমার যে বয়সটা অনেক বেশি। আমি কী করে ওর মতো —

নাও কথা বাড়িয়ো না। যা করছ কর।

খানিক পরেই ভবেন নিজের হাতে হুড়কো খুলে ধাই ধাই হাঁটতে লাগল কোম্পানি বাঁধে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তহশীলদারের খাতায় খাড়ুপাতাল মৌজায় এই বাঁধের জমির পরিমাণ একশো একাশি বিঘে। এতটা জায়গা এখন ওই তিনজনের বৈঠকখানা।

দাক্ষী বেরিয়ে এসেও সন্তোষকে খুঁজে পেল না। তখন সেই সুরটা তুলে নিল গলায়। কিছু বুনো। বেশিদূর যেতে হল না। খালের জলে সন্তোষ আটল বসিয়েছিল। সেখানে খুঁটিয়ে দেখছিল, কোনো মাছ পড়েছে কি না। কোম্পানি বাঁধে দাক্ষী এসে দাঁড়াতেই সন্তোষ টাকি হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, তুই কে দাক্ষী? তুই আসলে কে?

দাক্ষী হাসল না। কাঁদল না। আমরা নদীর ওপারের লোক। আয় ঘুমোবি চল —

গলার বুনো সুরটার ফাঁস পরিয়ে সন্তোষকে ওপরে তুলে নিয়ে এল দাক্ষী। আমি কি একটুও ঘুমব না? সারাদিন লোকে দেখতে আসে। আমি ঘট হয়ে বসে থাকি। এখন আমার ঘুম চাই।

তুই আসলে কে দাক্ষী?

কাল বলব।

দুয়ারে হুড়কো দেওয়া হল না। ওরা ঘুমোল। ভীষণ ঘুমোল। অর্ধেক রাতে বাইরে এসে সন্তোষ ভবেনকে পেল। সন্ধেরাতে দাক্ষী যেখানটায় বসেছিল সেখানটায় বসে ভবেন অন্ধকারের ভেতর মাটিটাকে দু'ভাগ করার তাল খুঁজছে। সন্তোষকে দেখে বলল, ঠিক এখানটায় — পরিষ্কার বোঝা যায় — মাটির নিচি কারা চলাফেরা করে —

তেনারা করেন। সরে বোস।

ভবেন জায়গা না পালটে বলল, কাটে কাটুক।

এরপর বারান্দায় বসে কাশতে কাশতে সুধন্য শুনল, ফাঁকা কোম্পানি বাঁধে দু'দুটো পুরুষলোক যাচ্ছেতাই খিস্তি করে একজন আরেকজনকে তাড়া করছে। জানে, একজন ভবেন। অন্যজন সন্তোষ টাকি। কিন্তু অন্ধকারে ছুটন্ত ছায়া থেকে কাউকেই আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। সেইসঙ্গে রোঁয়া তোলা হুলো বেড়ালের ঝগড়া।

এর ভেতর দাক্ষী একবার উঠেছিল। বেশিরাতের কাঁচা জ্যোৎস্নায় একমেটে দু'টো অসুর তখনো হুটোপাটি করে কোম্পানি বাঁধটাকে জাগিয়ে রেখেছে। চোখে ভীষণ ঘুম ছিল দাক্ষীর। তাই দুয়ারের হুড়কো তুলে আবার বাঁশের চৌকিতে গিয়ে টান টান হয়।

ভোর ভোর তিনজনেরই যে ঘুম ভাঙাল — তাকে চেনে শুধু সন্তোষ টাকি। সে নিজে ছাড়া আর যে

কোম্পানি বাঁধের আগানেবাগানে ঘোরাঘুরি করে সে হল আশু বৈদ্য। বাড়ি কেশপুর। ফি-বছর এ সময়টায় এদিকে এসে হানা দেয়। তার শিকার—বিষধর সাপ। পুষে পুষে বিষ বেচে। মরে গেলে ছাড়িয়ে চামড়াটা বেচে দেয়। ধড়টা এক ঝটকায় পগার পার। ধরা অভ্যেস গড়বেতার ওদিককার শাল-জঙ্গলের কেউটে। এ সময়টায় শুধু এদিকে আসে। ভিজে মাটির সাপদের স্বভাব-চরিত্র তখন ওর অনেকখানি জানা।

দ্বারিকপোতার শেষে আকাশ জুড়ে আলতা। সেখান থেকে সূর্য উঠবে। সেদিকে তাকিয়ে আশু বলল, ঘর বানালে কবে?

এমন সময় দাক্ষী এসে দুয়ার খুলে দাঁড়াল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে আড়মোড়া ভাঙল দাক্ষী! তখনই আশু খলবল করে বলল, বে করলে কবে! বলবে তো —

দাক্ষী কটমট করে তাকাল। সেখান থেকে চোখ সরাতেই ভবেনের ওপর চোখ পড়ল। ছেঁড়া হাফপ্যান্ট। এই লোকটাই তো কোম্পানি বাঁধে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার পাশে তেরছা হয়ে চোখ বুজে পড়েছিল সন্তোষ টাকি।

সন্তোষদা। এই তোমার শউরো?

আঃ সক্কালবেলাতেই কী মুশকিল। শ্বশুর কেন হবে। ও তো আমাদের ভবেনদা। আগে দ্যাখোনি তো। নতুন এসেছে। ওই তো তার বউকে দেখলে। এখানে সন্তোষ টাকির মুখ ফসকে বেরিয়ে এল ভাগানো-বউ।

ভবেন একটা চড় তুলল। তার আর সন্তোষের মাঝে আশু বৈদ্যের মাথাটা পড়েছে। হাত নামিয়ে নিতে হল। আশু তাই দেখে বলল, এখন তো চড় তুলেছিলে। কিন্তু সারারাত কোথায় শুয়ে কাটালে ঠিক আছে?

কোথায়?

ওদের পুরো ফেমিলির ওপর শুয়েছিলে —! নড়াচড়া টের পাওনি? কী ঘুমরে বাবা!

টের পেছিলাম একবার। কিন্তুক কোথায় খোন্তা। কোথায় শাবল।

না খুঁড়ে ভালো করেছ। খুঁড়লে আর রক্ষা পেতে না। বুড়োবুড়ি একসঙ্গে ছুবলে দিত। তারপর সকালবেলাব বাতাসে রূপকথার মতো পাতলা পাতলা গল্প ছড়িয়ে দিতে লাগল আশু। এখন ছানাপোনায় ওনাদের ডেরা বোঝাই। বুড়োবুড়ি ওদের এখন বড়ো করে যাবে। আরেকটু বড়ো হলে ওদের দিয়েই জলখাবার করবে —

দাক্ষী তো অবাক। নিজের ছেলেমেয়ে! নাতিপুতি?

হ্যাঁ গো। এখন বড়ো করে যাবে। খাবার মতো হলে খেতে শুরু করবে।

তাও ওদের বাঁচানো যায় না?

সাপ কেউ বাঁচায়? হাসালে।

ধাড়ি দু'টোকে ধরতে পারলে —

সেজন্যই তো আসা আমার —

তা তুমি ছোটোগুলোকে নিয়ে গিয়ে পুষে বড়ো করতে পার।

অতগুলো সামলাব কী করে! তুমি তো দু'টোর মোকাবিলায় আছ। কেমন লাগে?

তারপর ওদের চারজনের এক নতুন কাজ হল। সারা কোম্পানি বাঁধ জুড়ে বুড়োবুড়ির সন্ধান। এক-একটা গর্ত এত নির্দোষ দেখতে। তাতে খোঁচাতেই একদিন বুড়ি তার লেজ গুটিয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। আর একদিন দুপুরে মাথাভাঙা ঘাসের ডগা দেখে আশু বলল, বুড়োর তো বয়স হল। এখন ওজনও বেশ। এই পথে খালে নেমে ওপারে খাবারের সন্ধানে গেছে। যাবার বেলায় ঘাসের ডগাগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে। এপথে ফিরলে নির্ঘাৎ ধরে ফেলব।

বুড়ো সেদিন ওপথে ফিরল না। ফিরল বুড়ি। কিন্তু বড় চালাক। আশু বৈদ্যের কলকাঠি বানচাল করে দিয়ে দিব্যি বাসায় ঢুকে গেল। ঢোকা কী মনোহর। মাথাটা ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে দিব্যি ভেতরে চলে গেল।

আশু আজ গোসাপ ধরে। কাল ঘুঘু মারে। পরশু খালের জল থেকে দু'কেজির শোল মাছ তোলে। বুড়োবুড়ি এই দঙ্গলে যোগ দিতে না পারলেও পরিষ্কার বোঝা যায় — ওরা কাছাকাছি থেকে এই চারজনের ওপর নজর রেখেছে। এর ভেতর আবার দাক্ষীর সঙ্গে কে কখন শোবে — তাই নিয়ে রীতিমতো লড়াই বাঁধে এক এক রাতে। তখন সুধন্যর কাশিটাও বাড়ে।

এর ভেতরেও আশুর বাণিজ্য খারাপ হচ্ছে না। নুন-বেচা পয়সার আড়াই টাকা দিয়ে দাক্ষী আশুর কাছ থেকে একটা ছ-কোনা ফল কিনেছে। ফলটার নাম শিবলিঙ্গ। হাতে থাকলে সাপ মাথা নত করে।

ভবেন কিনেছে একখানা শঙ্খলাগা বস্ত্র। জনখাটুনির এগারো টাকা দিয়ে। বিক্রি করবার সময় আশু ফিসফিস করে বলেছে, একবার দাক্ষী ঠাকুরুনকে এই বস্ত্রের ওপর বসিয়ে দেখো —কী ধারার বশ হয়ে যাবে ভাবতে পারবে না—

সে বস্ত্রে দাক্ষীকে বসাবার তাল খুঁজে বেড়াচ্ছে ভবেন। সন্তোষ টাকি আছে নতুন আমোদে। একটা কোম্পানি বাঁধ। চারটে মানুষ। ফেমিলিসুদ্ধ দুটো বুড়োবুড়ি। দ্বারিকপোতার আকাশ। সব নিয়ে একটা বড়ো সাইজের ছবি। যেদিকে ইচ্ছে ছুটে চলে যায়। জেলখানায় অত লোকের সঙ্গে থেকেও এ-জিনিস সে পায়নি।

আশুরও মন্দ লাগে না জায়গাটা। আগে এখানে দিনে দিনে ধরতে এসেছে। এখন এখানে রাতেও থাকার আস্তানা আছে। প্রথম দিককার তালপাতার ঘরখানা এখন লাউডগায় ঢেকে ফেলেছে। কটকটে দুপুরে এক-একদিন আশু তার ভেতর চিৎ হয়ে পড়ে থাকে। তখন গর্ত খোঁড়ার খোন্তা দিয়ে নাড়াচাড়া করে দাক্ষী।

সকাল সকাল বেরোতে গিয়ে বুড়োবুড়ি একদিন আশুর চোখে পড়ে গেল। কিন্তু ধরা অত সহজ নয়। অনেকদিনের জিনিস। খেলাধুলোও জানে নানারকমের। ওরা তিনজনে মিলে এই ওদের দু'জনকে পায় পায় — আবার হারায়।

বেলাবেলি কোম্পানি বাঁধে উঠে দাক্ষী দেখল ভবেন, সন্তোষ আর আশুকে এই এতটুকুন দেখাচ্ছে। ওরা তিনজনে মাটির ওপর পড়ে কী যেন করছে। তখন দাক্ষী আশুর খোন্তাখানা নিয়ে তেনাদের জায়গাটা খুঁড়তে বসল।

বেশিক্ষণ লাগল না। একদম কিলবিল করছিল। অনেকগুলো। সবে মাথা তুলতে শিখছে। কী তেজ এক একটার! ধামা পেতে সব ক'টাকেই তুলে নিল দাক্ষী। তার ওপর কুলো চাপা দিয়ে ঘরের কোণে ধামাটা রাখল।

শেষে মাটি চাপা দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিল।

গর্তের আসল চেহারা আজ দেখতে পেয়েছে দাক্ষী। দেখে তার বুক কেঁপে উঠেছে। মাটির নীচে বুড়োবুড়ির কত সুড়ঙ্গ। তেলতেলে সরু পথ। এরকম একটা পথ দাক্ষীর ঘরেও চলে গেছে।

বুড়োবড়ি ওদের তিনটেকে এলোপাথাড়ি দৌড় করিয়ে সন্ধে সন্ধে ফেরত আনল। তখন অন্ধকারে আশুর চোখেও পড়ল না— ফেমিলিসুদ্ধ জায়গাটার মাটি আগাগোড়া খোবলানো। আশু কোম্পানি বাঁধে কাঠকুটোর উনুন ধরিয়ে দিয়ে বলে, ঠাকমা আমাদের খুব রসিক। এই ধরা দেয়। আবার পালায়। কী দৌড়টা করাল সারাদিন! কী দাক্ষী ঠাকরুণ। একবার বাইরে আসবে নাকি!

ভেতর থেকেই জবাব দিল দাক্ষী। নাগো নাতি। শরীরটে বড়ো খারাপ।

সে খবর শুনে ভবেন অন্ধকার ঘরে আরেকটু হলে পা দিয়েছিল আর কি। শঙ্খলাগা বস্ত্রখানা তো তার কোমরেই আছে। একবার তার ওপর দাক্ষী বসলেই হল।

বাঁশের চৌকির ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল দাক্ষী। একদম ঝা ঝা করে।

ভবেন পেছিয়ে এল। তখন আশু গল্প জুড়েছিল। নৈহাটির শ্মশানে অমাবস্যার রাতে এক কোপে মড়ার মুণ্ডু কেটে নিয়ে বস্তাবন্দি করতে হবে। তখন চারিদিক থেকে কত লীলা এসে ঘিরে ধরবে। তাতে ভুলেছ কি মৃত্যু। পাখনা-লাগানো অজগর উড়ে যাবে। যে-পুকুরের ওপর দিয়ে উড়বে নিমেষে তার জল শুকিয়ে যাবে। চোখের সামনে গাছপালাসুদ্ধ আকাশখানাকে শতরঞ্জি করে গুটিয়ে দেবে। পাহাড়ের চোখে জল।

শুয়ে শুয়ে বেশ শুনতে লাগছিল দাক্ষীর। এর ভেতরে সন্তোষের গলা পেল। সন্তোষ বলছে, রান্না করে কী হবে! তার চেয়ে ভালো মাছ এনে পুড়িয়ে খাই —

ভবেন বলল, সেই ভালো।

সন্তোষ টাকি দোরগোড়ায় এসে বলল, মশলাপাতিগুলো একটু এগিয়ে দেবে —

দাক্ষী তখন টের পেয়েছে। পরিষ্কার টের পেয়েছে। তাই বাঁশের চৌকিতে ক্যাচকোচ তুলে চেঁচিয়েই সন্তোষকে ভাগাল।

সন্তোষ পিছিয়ে আসার সময় বাঁশের দুয়ারটা টানতে টানতে বলল, তুই কে দাক্ষী? তুই কে আসলে?

দাক্ষী কোনো জবাব দিল না। ঘরের ভেতর টানা অন্ধকার। তার ভেতরে বুড়োবুড়ি ফেমিলির লোকজন খুঁজতে বেরিয়েছে। খুঁজতে? কে জানে! যারা আজ সারাদিন ওদের দুজনকে দৌড় করিয়েছে— তারা এখন বাইরে একটা বড়ো বান মাছ লম্বালম্বি আগুনে ধরে পোড়াচ্ছে। একটু পরে নুনলঙ্কা মাখিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

ঘরের ভেতরে দাক্ষী একটা মিঠেন গন্ধও পাচ্ছিল। ঢাকা-দেওয়া ধামার ভেতরটা নড়েচড়ে গেল। সাবধানে শিবলিঙ্গ ফলটা মুঠোয় নিল। কোথায় কী! বুড়োবুড়ি দিব্যি তাদের পথ দিয়ে ঘরে চলে এসেছে। এখন দাক্ষী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, ধামার চারদিকে ওরা দু'জন পাক দিয়ে ফিরছে। দাক্ষী বুঝল, ওদেরও তো খিদে পায়। পা ঝোলানো ছিল। এখন বাঁশের মাচায় তা তুলে বসল দাক্ষী।

তখন বাইরে থেকে আশুর গলা আসছিল। এক এক মন্ত্রের এক এক জোর। তুমি যারে ইচ্ছে চাও — তারে পাও। কাঠকুটোর আগুনে ওদের তিনখানা মুখ এখন তিনটে বাঘ।

বর্ষা চলে গেছে অনেকদিন। যাবার সময় একটা বড়ো বানমাছকে পাঁক মতো মাটিতে রেখে গিয়েছিল। সেটা সামনের বর্ষার জন্য এতদিন ধুকপুক করে বেঁচেছিল। আজ সন্তোষের হাতে ধরা পড়ে এক রাত্তিরে খাবার হয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর আর আশুর দম ছিল না। সে নিজেই ঢলে পড়ল।

তখন শুরু হল নিত্যিকারের মতো। এই সময়টাতেই সুধন্যর কাশি বাড়ে।

একখানা চৌকো জ্যোৎস্না নেমে এসে জায়গাটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কীসে কী হবে। সন্তোষ টাকি চেঁচিয়ে উঠল, আজ আমি আগে ঘুমাব। চোখ ভেঙে যাচ্ছে—

ভেতর থেকে দাক্ষীর গলা এল, যে যার মতো আকাশের নিচি ঘুমোও। আজ রাত্তিরটে অন্তত। বলছিল, আর দাক্ষী দেখতে পাচ্ছিল, ফেমিলিসুদ্ধ ঢাকা ধামাটাকে দু'জনে কীভাবে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। আর পিছলে পিছলে মেঝেতে ধমাস করে পড়ছে। ওদেরও তো খিদে পায়।

সন্তোষ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, তুই কে দাক্ষী? তুই কে?

ভবেন ফোড়ন দিল। ডাকাতি দূরে থাক — একদিন চুরি পর্যন্ত করে না। নে সর। এট্টু ঘুমোব আর উঠে আসব। দরজায় চাপ পড়তেই অন্ধকার বাঁশের চৌকির ওপর থেকে দাক্ষী ফেটে পড়ল। আজগের রাত্তিরটা আকাশের নিচি শো —

আশু জেগে থাকলে দেখতে পেত একবার ভবেন সন্তোষকে, আরেকবার সন্তোষ ভবেনকে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। সুতো পরানো দুটো পুতুল তেরছা চৌকো জ্যোৎস্নায় এরই ভেতর এক একবার বন্ধ দরজার কাছে যায় আর ছিটকে পিছিয়ে আসে।

ওরা দু'জন জানেও না — তখন দাক্ষী পা গুটিয়ে অন্ধকার মেঝের ওপরকার ধামাটা দু চোখে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর ধামা থেকে পিছলে পড়ার একটা জোড়া শব্দ প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছিল।

গরল



চিত্ত ঘোষাল

উঠোনের বারোয়ারি কলে ঝুপঝাপ জল ঢেলে গায়ে কোনোমতে একটা গামছা জড়িয়ে উঠে এল পাপিয়া। ভেজা শায়া-ব্লাউজ-শাড়ি দড়িতে মেলে দিল। শরীরটা প্রায় আধ-ন্যাংটা। ওতে এখন আর যায় আসে না, হুঁশও থাকে না। কে দেখল না-দেখল, কার চোখ কতখানি লোভাত্তি নিয়ে আন্দাজ নিল শরীরের খাঁজ-ভাঁজের — এসব ফালতু হিসেব অনেককালই মিটিয়ে দিয়েছে। এ বাড়ির খান বারো মেয়ে সবাই এই রকম —অজানা অচেনা ভদ্দরলোক থেকে ঘেন্না-ধরানো সব মানুষজনের সামনে শরীর মেলে ধরতে ধরতে লাজলজ্জা এখন, বেশি হলে, খদ্দেরের ধাত বুঝে, মালের সঙ্গে চাটের রসান খানিক।

ভাবতে বসলে হয়তো পাপিয়ারও মাঝে মাঝে মনে পড়ে, বিশ-বাইশ বছর আগে লজ্জাটা ভারি চাদরের মতো জড়ানো থাকত শরীরে। মনটাও সর্বদা সজাগ থাকত, এই বুঝি অজানতে কোনো ফাঁক দিয়ে কারো লোভের চোখ চেটে গেল শরীরটা। তারপর শরীর-বেচা ব্যবসায় এসে চাদরটা জ্যালজেলে হতে হতে খসেই গেল একেবারে। মাছ-বেচুনির কি মাছ দেখাতে লজ্জা থাকে? থাকলে চলে?

ঘর দোর দিয়ে গায়ে জড়ানো গামছাটা একটানে খুলে ছুঁড়ে দিল দড়ির ওপর। নি-সুতো শরীরটা নিয়ে দাঁড়াল ড্রেসিং-টেবিলের সামনে। চোখ কুঁচকে তাকাল আয়নার ছবিটার দিকে। খদ্দেরের চোখে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। ঠিক মনে পড়ে না কেমন ছিল মুখের চেহারাটা গাঁ ছাড়বার সময়ে। সে তো আজ বিশ বচ্ছর আগেকার কথা। আয়নার মুখটায় ছিরিছাঁদ এখনো যে একেবারে নেই তা নয়। বয়েস কতটা দাগ কেটেছে বুঝতে চাইল। হল তো প্রায় পঁয়তিরিশ। মন্দ না, বয়সের তুলনায় খারাপ না মোটেই। শক্ত গড়নের শরীরে এইটে থাকে। ঢিলেঢালা হলে থুম্বো গাল ঝুলে নামত অ্যাদ্দিনে। অনায়াসে এখনো নিজেকে সাতাশ বলে চালাতে পারে পাপিয়া। তবু বয়েস আর কুড়িটা বছরের অত্যেচার, নেশা, অশান্তি, হুজ্জোত দাগ তো রেখে গেছেই। আয়নার চোখ দুটোতে কী যেন খোঁজে, প্রায়ই খোঁজে পাপিয়া। সেই হারিয়ে-যাওয়া নরম আলো, বিশ্বাস, অভিমানের চিকচিকে জল-জল ভাব অভিনেত্রীর মতো ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে, পারে না। গেছে, একেবারেই গেছে। দেখে— হিসেব, অবিশ্বাস, ছলনা। চোখ নামায়, মাপে শরীরটাকে। ঠিকই তো আছে মোটামুটি। বুকের গড়ন একটু আলগা হলেও এলিয়ে পড়েনি একেবারে, সামান্য ভারি হয়েছে তলপেট, কোমরের খাঁজ থেকে পাছাউরুতের ঢাল এখনো খদ্দেরকে দেখিয়ে লজ্জা পাবার মতো নয়। নিজেকে বিকোতে পারবে আরো কিছুকাল। ভেতরের বিষ এখনো বাইরেটা ক্ষইয়ে ধসিয়ে দিতে শুরু করেনি।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আলনার কাছে এল পাপিয়া। ব্লাউজ-শায়া-শাড়িতে শরীরটা মুড়ে নিয়ে আবার এল আয়নার সামনে। হালকা করে মুখে পাউডার বোলাল। এখন আর কাজল লিপস্টিক নয়। ভেজা চুলে খোঁপাও বাঁধল না, আঁচড়ে নিল শুধু। দেখা যাক দুকুরের উটকো খদ্দের দু'একটা জুটে যায় যদি। শ'তিনেক টাকা তুলতেই হবে পরশুর মধ্যে। সাড়ে চারশো রাখা আছে তোরঙ্গের তলায়, আরো দেড়শো লাগবে ঘরভাড়া মেটাতে। তুফানের দলও রসিদ ধরিয়ে গেছে একশো টাকার। মা-শেতলার ছেরাদ্দ করবে হারামির ছাগুলো। না দিয়ে নিস্তার নেই। ওরা চেহারা দেখে রসিদে টাকা লেখে।

রোয়াকে এসে বসল পাপিয়া। বিলাসী রংচং মেখে অনেক আগে থেকেই দরজায়। পাশেই পানওলা লাল্টুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সরস্বতী খেউড়ের পালা জুড়েছে ক'টা ছোঁড়ার সঙ্গে। সিগ্রেট টানছে ফুকফুক। ওই এক ধারা সরস্বতীর। অত কীসের লা? হারামিগুলো ছাড়ে তোকে? তোকেও তো ধরিয়েছে পঞ্চাশ টাকার রসিদ একখানা। বিলাসী যে বিলাসী, দিনে এখন যে কুল্লে তিরিশ-চল্লিশ টাকা ঘরে তুলতে পারে কি না সন্দ, তারও কি ছাড়ান আছে, তাকেও তো তিরিশ টাকার কাগজ একটা দিয়ে গেছে। দিতে না পারলে ছাড়বে? এ পাড়ায় জুলুমবাজির ঠিকেদারি নিয়েছে ওরা। ঠিকেদারিটা দিল কে সেটাই কথা। জোরজবরদস্তি এক একটা মেয়েকে

কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে ভাতার সেজে বসেছে ক'টা ছোঁড়া। গতর ভাড়া দিয়ে পয়সা তোলে বউ, সেই পয়সায় সোয়ামি ভাত গেলে, পাতা-চুল্লুর নেশা করে। সারারাত্তিরের খদ্দের ঘরে উঠলে সোয়ামি বারান্দায় কী চিলেকোঠায় মাদুর পাতে, তালে থাকে কখন খদ্দেরের পয়সায় কেনা মাল থেকে এক পাত্তর সরিয়ে এনে দিয়ে যাবে বউ। ঘেন্না, ঘেন্না! পাড়ার জামাই সব! বাইরে থেকে একপাল হতচ্ছাড়া এসে জোটে এদের সঙ্গে। কারো বলার নেই কিছু। বাড়িওলা-বাড়িউলিদের হাতধরা সব। বেপাড়ার গুন্ডাবদমাশের হুজ্জোত সামলাতে কাজে লাগে এরা। মন্‌তিরিদের যেমন থাকে রাইফেল-ধরা বডিগার্ড, জমিদারদের যেমন থাকত লেঠেল, এ পাড়ার মালিকদেরও এরা তেমনি। মালিকদের এত জোর কোত্থেকে আসে তা কে জানে? তবে এটা ঠিক, ভগমানের মতো আড়ালে থেকেই ভীষণ ভীষণ তাগতওলারা এদের বল-ভরসা জুগিয়ে যাচ্ছে। নইলে শয়ে শয়ে বাড়ি, হাজার হাজার মেয়ে নিয়ে বড়ো বড়ো তল্লাট জুড়ে এই কারবার চলতে পারত নাকি? আইনের হিসেবে যা কিনা বিলকুল বেআইনি? কুড়ি বচ্ছর ধরে বোম্বাইতেও একই কাণ্ড দেখে এসেছে পাপিয়া। অবশ্য তখন ও পাপিয়া ছিল না, ছিল বিন্দি—বিন্দি বাই। তারও আগে টুকানি...নিতপুরের জগৎবল্লভ বিশ্বাসের পাঁচ মেয়ের ছোটোমেয়ে...

মাঝবয়সি লোকটার নিপাট ভদ্দরলোকি গোলগাল চেহারা আর চোরা চাউনি লক্ষ করেই ভাবনা ঝেড়ে সোজা হয়ে বসল পাপিয়া। নজর দিয়ে নজর বাঁধতে চোখ রাখল ওর মুখের ওপর। চোখে চোখ মিলতেই মাধুরী দীক্ষিতের কাছ থেকে রপ্ত-করা বিলোল হাসিতে ঝট করে বেঁধে ফেলল লোকটাকে, চোখের পাতা একটু নাড়িয়ে ডাকল কাছে। লোকটা সামনে পেছনে পাশে ঝটপট একবার দেখে নিয়ে তুরন্ত পাপিয়ার পাশ দিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতরে, আস্তে বলে গেল 'এসো।' সরস্বতী একটা আঁশটে খিস্তি করল, হাসি দিয়েও হিংসের তাতটা ঢাকতে পারছিল না ও। বিলাসীও বিড়বিড় করে কী বলল যেন। ওর অদ্দেষ্টকেই গাল দিল বোধ হয়। এসব গায়ে মাখে না পাপিয়া, মাখতে নেই। তারও হাল কিছু ভালো নয়। হাজার হাজার মেয়ে, রোজই নতুন নতুন কচি কচি সব এনে তুলছে আড়কাঠিরা। হ্যাঁ, একসময় চড়া বাজার পাপিয়ারও ছিল। না, পাপিয়ার নয়, বিন্দি বাইয়ের। একবার তো সেই কাদের পার্টির একশো বছর বয়েস হতে মোচ্ছব বসেছিল বোম্বাইতে। সারা দেশ থেকে তাদের লোকজন এসেছিল। দেশের সেবা করতে করতে হেদিয়ে গিয়ে শরীরমাথা হালকা করতে শয়ে শয়ে আসত সব মাগিপাড়ায়। বিন্দির তখন কচি বয়েস, নজরে ধার, শরীরের যেটুকু উদলা তাতেই বাকি জায়গার মার মার কাট কাট বিজ্ঞাপন। বলতে গেলে লাইন পড়ে গিয়েছিল দরজায়। মনে আছে একদিন তেত্তিরিশ জনকে তুলেছিল ঘরে।

লোকটা ধরা-পড়া চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার একটা কোণ নিয়ে। পাপিয়া ওর কাছে যেতে যেতে ভাবল, এ ব্যাটার সঙ্গে আগে দরদস্তুর না করলেও চলবে। ভদ্দরলোক, ভীতু, ভ্যাবলাকান্ত। শরীরের ঝোঁকে আসে, এসে বাঁদরামি-হুজ্জোতি করে না। লোকটাকে বলল —'চলো'। আপনি-টাপনি না। শুরুতেই তুমি। পিরিতের প্রাণকানাই যে! ভরদুকুরে প্রেম কিনতে এয়েছে, ভালো দামই আদায় করতে পারবে মনে হয়।

দোর খুলে আলো-পাখা চালিয়ে লোকটাকে খাটে বসতে বলল। কিছু নেই-কাজ নেড়ে-চেড়ে ওকে থিতিয়ে নিতে সময় দিল একটু। লোকটা বসেছে, আড়ষ্ট হয়ে আছে। এই ধাঁচের লোকগুলোকে অদ্ভুত লাগে পাপিয়ার : এদের চেহারা-হাবভাব দেখে বোঝা যায় লজ্জা-ভয় ভালোমতোই রগড়াচ্ছে ভেতরটাকে। ঘরে হয়তো বউ আছে, ছেলেপুলে আছে, পাড়ায় অফিসে মান্যিগণ্যি লোক বলে হয়তো নামও আছে। তবু যে কেন এই পাঁকে ডুব দিতে আসা? শরীর বেচার কারবারে বিশ বছর থেকেও শরীরের এইসব নিয়ম বুঝতে পারে না পাপিয়া। বুঝে দরকারও নেই, মনে মনে একটু হাসে, খদ্দের হিসেবে এই মানুষগুলো বড়ো ভালো এটাই সার কথা।

পয়সাকড়ির ব্যাপারে এবার লোকটাকে একটু বাজিয়ে নিতে হয়।

—কত দেবে গো? বাণিজ্যের আসল কথাটা টুক করে ছাড়ে পাপিয়া।

— তুমি বলো। আমি আর...। লোকটা থেমে গেল মাঝপথে।

— দেখেই বুঝেছি তুমি ভালোমানুষ, তোমার সনে দরদাম করবুনি বাপু। সাঁঝের দিকে একশোর কমে নিই না, এখন বে-টাইম, তুমি বাপু মানুষটাও ভালো, মনে ধরেছে আমার, পঞ্চাশ টাকাই দিয়ো, আর ঝিয়ের পাঁচ টাকা। ঠকবেনি, দেখো...

অসমাপ্ত বাক্যটির সঙ্গে শরীরী ভাষায় একটু মিষ্টি অশ্লীলতা লোকটাকে উপহার দিল পাপিয়া।

মিনমিন করে সামান্য আপত্তি জানাল লোকটা —পঞ্চাশ টাকা? একটু কম করো-না...

খদ্দের কাত হয়েছে বুঝেই পাপিয়া ওর সামনে গিয়ে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ায়, দু'হাত বাড়িয়ে কাঁধে রাখে। হাতের সূক্ষ্ম কাজে আঁচলটা কাঁধের ওপর থেকে অনেকটাই সরে গিয়ে লোকটার চোখের সামনে মেলে ধরেছে ভরাবুকের আন্দাজ। গলায় আপনজনের সোহাগ ঢালে পাপিয়া — দিনকাল কী পড়েছে তুমিই বলো। পঞ্চাশ টাকার কোনো দাম আছে। চা খাবে?

— না। এই গরমে...

—তবে দুটো কোল ডিরিংক আনা করাই? ওর দরেই লোকটা রাজি বুঝে পাপিয়া ফাউ আদায়ের চেষ্টা করে।

—না। এক গ্লাস জল দাও বরং।

ফুলকাটা কাচের ইস্পিশাল গেলাসে লোকটাকে জল দেয় পাপিয়া। লোকটা জল খায়। ওকে অনেকটা ধাতস্থ দেখায় এখন।

টাকাপয়সাব কথা মিটেছে। এবার ছোট্ট কিন্তু জরুরি একটা কাজ বাকি। মাঝে মাঝে খদ্দের এতেই কেঁচে যায়, তবু পাপিয়া নিরুপায়, জেনে-বুঝে এত বড়ো পাপ তো করতে পারে না। কুলুঙ্গি থেকে একটা নিরোধের প্যাকেট নামিয়ে লোকটার পাশে খাটের ওপর রাখে। চোখের পাশ দিয়ে ওব মুখ দেখে। মুখ ঘুরিয়ে প্যাকেটটা দেখল লোকটা। কোনো কথা বলল না। যাক বাবা, হাঁপ ছাড়ল পাপিয়া। কেউ কেউ যেমন 'ও দিয়ে কী হবে? ওতে কি আরাম হয় নাকি' বলে বেঁকে বসে, লোকটা তা করল না। করলেই এক কাণ্ড। পাপিয়া ওর জ্ঞানের ভান্ডাব উজাড় করে এটা ব্যবহার করা যে কত জরুরি বোঝাতে চেষ্টা করে। বেশির ভাগই মুখ ব্যাজার করে হলেও মেনে নেয়। দু'একটা মহা টেটিয়া। তাদের ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সনাতনী-বাবলিদের সঙ্গে পাপিয়াও আছে। ডাক্তারবাবুরা এসেছে, ওদেব এড্স এর বিপদ বুঝিয়ে বলেছে। পনেরো জন মেয়ে এখন পাড়ায় ঘুরে ঘুবে মেয়েদের বোঝায়, বেশি করে খেয়াল রাখে নতুন মেয়েদের ওপর। সনাতনী ওদের লিডার। প্রায়ই মিটিন বসে। 'দ্যাখো ভাই, আমরা সাধ করে এ লাইনে আসিনি। পেটের জ্বালায় আসতে হয়েছে। এ কাজে আমাদের সবচে বড়ো শত্তুর রোগ। সব রোগ ওষুধে সারে ভাই, সারে না শুধু এড্স। এ রোগ যাকে একবার ধরে মরণ ছাড়া তার নিস্তার নেই। সে বড়ো কষ্টের মরণ ভাই, তিলে তিলে কষ্ট পেয়ে পেয়ে মরা। এ বোগ শরীলে নিয়ে কোনো লোক যদি তোমার ঘরে আসে, সে দিয়ে যাবে তোমাকে। আবার তোমার শরীলে যদি থাকে সে নিয়ে গিয়ে দেবে আর পাঁচজনকে। বাঁচার উপায় একটাই ভাই। নিরোধ এ রোগ হতে দেয় না। খদ্দের যত জেদাজেদি করুক, যত অবুঝ হোক, তোমরা কেউ ও ছাড়া রাজি হবে না। তা নইলে ভাই, এ পাড়ার পেত্যেকটা বাড়ি একদিন শ্মশান হয়ে যাবে। তোমরা তো জান নিরোধ পেতে কোনো অসুবিধে নেই।' এসব খবর আজ শোনেনি পাপিয়া। নিতপুরের টুকানি পনেরো বছর বয়েসে বোম্বে গিয়ে হয়েছিল বিন্দি বাই, সেখানে প্রায় কুড়িটা বছর কাটিয়ে পড়ন্ত বেলায় পালিয়ে এসে এই পাড়ায় পাপিয়া রানি বিশ্বাস—র‍্যাশন কার্ডে লেখা। হ্যাঁ পালিয়েই আসতে হয়েছিল। না পালিয়ে উপায় ছিল না যে। ময়লা ঘাঁটা তো কম হল না জীবনে। সনাতনী-বাবলিদের ডাকে তাই এগিয়ে গিয়েছিল পাপিয়া। সনাতনীদের দলের সবাই হাফ-হাতা ফিকে আকাশি রংয়ের একটা করে কোটের মতো পেয়েছে। ওরা কাজে বেরোবার সময় ওটা গায়ে চাপিয়ে নেয়। আজই ঘরে কোটটাকে ইস্তিরি করে আলনায় গুছিয়ে রেখেছে পাপিয়া। সনাতনী লিডার হবার ক্ষমতা রাখে। দাপট আছে। ওকে চট করে কেউ খচাতে চায় না। কালো টানটান লম্বা শরীর। পাথর-কাটা চোখা-চোখা নাকমুখে যেমন ধার তেমনি চিকচিকে হাসির মতো কী একটা মাখানো থাকে সর্বক্ষণ। ওকে ফিরিয়ে দেওয়া শক্ত। সবাইকে ও বোঝায়, কিন্তু দলের কাজে বেছে বেছে তুলে নেয় তাদেরই যাদের দিয়ে কাজ হবে মনে করে। পাপিয়া এ পাড়ায় ঘর নেবার সাত দিনের মধ্যেই ওকে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিল। 'তুমি এখেনে নতুন হলে কী হবে ভাই, অনেক ঘাটের জল-খাওয়া সে তো বোঝাই যাচ্ছে, যাকে বলে অভিজ্ঞতা সে তোমার আছে। তোমার চেহারায়ও সেইটে আছে যা দেখলে হুট করে ভাগিয়ে দেওয়া যায় না। তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে।' সনাতনীর কথাই শুধু নয়, পাপিয়ার নিজেরও মনের সায় এ কাজে তৈরি হয়েই ছিল।

বিলকুল অচেনা একটা মানুষের কাছে নিজের শরীরটা ভাড়া খাটানোর সময় প্রথম প্রথম বুকের ভেতরে ভারি যন্তনা হত। তারপর আস্তে আস্তে একটা মজার অভ্যেস তৈরি করে নিয়েছিল, হয়তো করে নিতে হয় না, নিজে থেকেই তৈরি হয়ে যায়। যা ঘটছে তার সঙ্গে যেন বিশেষ সম্পর্ক নেই নিজের, সাত-সতেরো অন্য কথা

ভাবতে ভাবতে পাকা মিস্তিরির আপসে-চলা হাতের মতো কাজ দিয়ে যাওয়া, যার যেমন পাওনা ঠিকঠাক। লোকটাকে তার পঞ্চাশ টাকার হিসেব ভালোভাবেই মিটিয়ে দিয়েছে পাপিয়া। গেরস্ত-গেরস্ত মানুষটাকে এখন কেমন বোকা-বোকা শান্ত বুড়ো একটা ছাগলের মতো দেখাচ্ছে। পাপিয়া মনে মনে আওড়ায় —'যা শালা, খুব জোর বেঁচে গেলি।' প্রতিবার খদ্দের বিদেয়ের সময় একথাটা মনে মনে বলবেই পাপিয়া।

আবার তখনই মনে হয় বেঁচে কি গেল সত্যিই? শুধু নিরোধের মালা জপলেই ঠেকানো যাবে এই মহামারি? কদ্দুর, কদ্দিন ঠেকানো যাবে? নেশায় চুরচুর মাতাল, পাতাখোর, চোর-গুন্ডা-বদমাশ—বেপরোয়া বজ্জাত এইসব লোকজনেরই তো আসা-যাওয়া এখানে বেশি। তাদের বোঝানো যাবে? বুঝবে তারা? বোঝাবার মতো মুখের জোর, মনের জোরই বা আছে ক'টা মেয়ের? কবে রোগে ভুগে মরবে সেই ভয়ে আজকের ভাতের থালাটাকে গেরাহ্য করবে না এমন মেয়ে ক'জনা? পেটের জ্বালা আছে, বাড়িওলা-বাড়িউলির পাওনাগন্ডা মেটানোর দায় আছে, তাদের পোষা হারামখোরগুলোকে ঠান্ডা রাখতেও গাঁটগচ্চা আছে। এরা কেউ রেয়াত করবে? এরা জ্ঞানের কথা শুনে চুপ করে থাকবে? বলে, মরেছি না মরতে আছি। আজকের দিনটা তো ঠেকাই, কালকের কথা কাল—এই যাদের কপাল তাদের শেষতক্ এভাবে রক্ষে করা যাবে না। সত্যিই যদি রোগটাকে দেশ থেকে তাড়াতে চাও তবে তুলে দাও এই মাংস-বেচা কারবার। পারবে? যাদের শরীরে ওই রোগের বিষ ঢুকেছে তাদের আরামে মরবার ব্যবস্থা করে দাও। পারবে? যাদের শরীরে এখনো ঢোকেনি তাদের যে-যেমন-পারে কাজে লাগিয়ে দু'মুঠোর ব্যবস্থা করে দাও। পারবে? পারবে না বাপু সে তো জানাই আছে। শরীর বেচা-কেনার ব্যবসা বেআইনি করেছ। কই, তুলে তো দিতে পারলে না। এ কী রে বাবা, ভাত না দিয়ে শুধু জ্ঞান দিয়ে মহামারি ঠেকাবে? নোংরা কাজ, বেআইনি কাজ করছ করো, রোগ-ভোগ বাঁচিয়ে করো। তা কি হয়? যারা মরতে মরতে বেঁচে আছে তাদের বাঁচার হিসেব এক্ষুনি, মাস-বছরের হিসেব করলে তাদের চলে না। এ লোকটাই যদি দু'তিনখানা বড়ো পাত্তি সামনে ধরে বলত, 'ওসব খাপ-টাপ আমার চলবে না বাপু, রাজি হও তো আছি, নইলে চললুম'—কী করত পাপিয়া? ভাবত না যে দু'তিন দিনের সব মুশকিলের আসান তো পাঁচ-দশ মিনিটেই হয়ে যাচ্ছে। পড়ে যেত না মহা দোটানায়? পারত ফিরিয়ে দিতে? সন্দ আছে। নিজের কী খোয়াবার আছে তার? আর, খদ্দেরের ভালোমন্দ নিয়ে অত ভাবতে গেলে এ ব্যবসায় টেকা যায় না।

উদোম শরীরটাতে লোকটার সামনেই জামা-কাপড়ে মুড়ে নিতে নিতে, যেন খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে বসে-থাকা ওই লোকটা কুকুর বেড়ালের মতনই একটা, ভদ্রতা দেখাল পাপিয়া, যেটা আসলে বিদেয় হতে বলাই—বসবে নাকি আর একটু?

—না, এবার উঠি।

—আবার এসো কিন্তু ...

চিটচিটে-রস-মেশানো আবার আসতে বলার কিছু ধরতাই বুলি আওড়ে যেতে যেতে লোকটাকে রাস্তায় নামিয়ে দিল পাপিয়া। মুখের কালচে খসখসে চামড়ায় খড়ি ওড়ার মতো পাউডার, বিলাসী চোখের গর্ত থেকে খরখরে নজরে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কোনো মানে হয় এই হিংসের? পাপিয়া গেটে না থাকলে লোকটা ওর কাছেই যেত—এমনি ভেবেছে নাকি বিলাসী? যে এক কথায় পঞ্চাশ টাকা বের করে দিতে পারে তার পছন্দ-অপছন্দের বালাই থাকবে না? সরস্বতী এখন ওখানে নেই, থাকলে সেও একটা ফুট কাটত ঠিকই। অন্য মেয়েরা এমন হলে কোমর বেঁধে ঝগড়া করে, এ পাড়ার ধারা মেনে সেসব ঝগড়া গড়ায়ও অনেকদূর। পাপিয়া সয়ে যায়। কী হবে ঝগড়া করে? আসলে এই হিংসেটা তো পেটের খিদেরই আর একটা চেহারা।

ছোঁড়াগুলোর গুলতানি চলছেই। আরো ক'টা জুটেছে এসে। তুফানও আছে। তাগড়াই চেহারা, লম্বা, নোংরা ঝাঁকড়া চুলে মাথাটাকে মস্ত দেখায়, চোখের সাদা জমিতে ছিটে ছিটে লাল দাগ। কত আর বয়েস হবে? বেশি হলে বাইশ-তেইশ। এরই মধ্যে সবরকম নেশায় চোস্ত, কোনো বদামিই বাকি নেই।

তুফানকে দেখেই পাপিয়া আবার ঢুকে যাচ্ছিল বাড়ির ভেতরে। কিন্তু তুফান ওকে দেখেছে ঠিকই, হাঁক দিল —এই পাপিয়া, চাঁদাটা দিলি নে?

—দুব, কাল-পরশু দুব।

—খদ্দের তো ভালোই পাচ্চ বাওয়া। দুপুরেও নাং আসছে তোর ঘরে।

একটা কড়া জবাব পাপিয়ার ঠোঁটের কাছে এসে থেমে গেল অম্বুলে রুগির মতো তেতো-টক একটা টেঁকুর গিলে নিল যেন। এদের সঙ্গে কথা বাড়ানো মানেই বে-ইজ্জত হওয়া। মা-মাসির জ্ঞান নেই। মা না হোক মাসির

বয়েসি তো পাপিয়া হতেই পারে হারামজাদাটার। থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে থাকে ও। আবার উটকো কেউ এসে যাবে সেই আশায় নয়, এমনিই মাথার মধ্যে একটা বিরক্তির ভার নিয়ে আনমনা দাঁড়িয়ে থাকা।

উঠোন থেকে মান্‌দা মাসির ডাকে হুঁশ ফেরে ওর — পাপিয়া, শুনে যা ইদিকে। পাপিয়া আঁচলটা কোমরে পেঁচিয়ে আস্তে ঘোরে।

বেঢপ মোটা শরীরটার ওজন রাখতে বেতো পা দুটোকে অনেকটা ফাঁক করে কেতরে কেতরে হাঁটে মান্‌দা মাসি। দাপুটে বাড়িউলি। এক রইস জমিদার ওর মাকে দশ বচ্ছর রেখেছিল। সে-ই মান্‌দা মাসির বাপ। বাপের গপ্প শোনাতে পেলে আর কিছু চায় না মাসি। কী বড়োলোকি মেজাজ ছিল বাপের! মাসির মাকে ছেড়ে অন্য মেয়েমানুষ বাঁধা রাখবার শখ হতে এই বাড়িখানাই দিয়ে গিয়েছিল তাকে। অমন বড়োলোকি মেজাজ, অমন ভালোমানুষ নাকি তিভুবনে আর দেখা যায়নি। শুনতে শুনতে কান পচে গেছে এ বাড়ির সব্বার। পাপিয়ার বলতে ইচ্ছে করে —'বাপের বড়োলোকি গপ্প তো খুব শোনাও মাসি, তা তুমি অমন হাড়-চিপ্পুস রক্তচোষা কেন? ছ'শো টাকা ভাড়া হয় ওই ঘরের?' কিন্তু বলা তো যায় না। বললে বলবে —না পোষায় অন্য ঘর দেখে নাও বাপু। এ আমার নক্ষ্মীমন্ত বাড়ি, বাপের আশীর্ব্বাদে এ বাড়িতে কাউকে নক্ষ্মী ছেড়ে যায় না।

পাপিয়া গিয়ে কাছে দাঁড়াতে মান্‌দা মাসি বলে — এ মাসের ট্যাকাটা তো দিলিনে পাপি, তিন তারিখ হয়ে গেল। আমার বড়ো টানাটানি যাচ্ছে বাপু।

মনে মনে হিসবে করে পাপিয়া, এই পঞ্চাশ জুড়লে হয় পাঁচশো। এখনো একশো বাকি। শয়তানের বাচ্চাদের একশো টাকার হিসেবও মাথায় রাখতে হবে। বলে—দুটো দিন সময় দাও মাসি। ঠিক দিয়ে দুব। তোমায় বলতে হবেনি।

— তোরা বড়ো ঝামেলি করিস বাপু। নে, যা পারিস দে তো এখন...

আর কথা বাড়ায় না পাপিয়া। বাড়িয়ে লাভ নেই কোনো। ঘরে গিয়ে চারশো টাকা নিয়ে আসে। তোরঙ্গের তলায় পড়ে থাকে একশো টাকা।

আবার ঘরে ঢোকে। উঠোনে চৌবাচ্চা ঘিরে মেয়েদের খেউড়-কেত্তন চলছে। ইচ্ছে করে দোরটা দিয়ে দিতে। থাক, আবার ভাবে, এখানে নিজেকে বেশি আলাদা করে রাখলেও বিপদ। এই লাইনে এলে কেমন যেন হয়ে যায় মেয়েগুলো। নোংরা কাজে থাকতে থাকতে মনমেজাজ নোংরা হবেই—না হলে কেউ বাঁচতেও পারে না। মনের সঙ্গে কত আর যুদ্ধু করতে পারে মানুষে! তাই কাজের যেমন ধারা মনের ধারাটাও তেমনি করে নেয়—হয়ে যায় আপসেই। আর একটা যা হয় সেটাই বড়ো অদ্ভুত লাগে পাপিয়ার। বোম্বেতেও একই জিনিস দেখেছে। জীবনে সত্যিকারের আঁকড়ে ধরার মতো কিছু নেই বলেই হয়তো এদের বেশিরভাগই ছোটোখাটো একটা কিছুকে ধরেই চড়া চড়া কথার পাহাড় বানাতে ভালোবাসে। তা সে কারো শাড়ি পরার কায়দাই হোক কী অসময়ে ঘরে দোর দেওয়াই হোক। নিজে সে কেমন ছিল আগে? কতটা পালটেছে? এইসব ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে খাওয়াটা সেরে নেয় পাপিয়া। খদ্দের পাওয়ার ধান্দায় ভাত-ডাল যে ঠান্ডা জল হয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল ছিল না। তেলাপিয়ার তেল-ঝাল, কলাইয়ের ডাল, ঠান্ডা ভাতে সোয়াদ আনতে বেশ ক'টা কাঁচালংকা ডলে নেয়।

ঘর নিকিয়ে বাসন-কোশন ধুয়ে ঘরে এসে লেবু দিয়ে জারানো জোয়ান মুখে দেয় একটু। কিছুদিন ধরে দেখছে খিদেটা মরে যাচ্ছে, অল্প খেলেই পেট ভরে যায়, জিবে তার লাগে না খাবারের। একবার ভাবে গেটে গিয়ে একটু বসলে হয়। একটা-দুটো উটকো যদি জুটে যায় কপাল-গুণে। শ'দুত্তিন টাকা তুলতেই হবে দু'দিনের মধ্যে। কিন্তু শরীরটা যেন পাথরের মতো ভারি ঠেকছে, গড়িয়ে পড়তে চাইছে বিছানায়। দু'চার মাস আগেও এমন হত না। ভাতঘুম দিতে সবারই ভালো লাগে। দুপুরে ঘুমোলে বিকেলের দিকে শরীরটা একটু রসায়, চিকচিকে দেখায়—সেটাও একটা কথা। কিন্তু হালফিল যা হচ্ছে সেটা অন্যরকম। দুটো খেলে পরেই তাবুত থাকছে না শরীরে একটুও। কে জানে কী হচ্ছে ভেতরে? জেনেই বা কী হবে! বিছানায় গিয়ে শরীর ছেড়ে দেয় পাপিয়া।

চারটে নাগাদ সনাতনী এসে ডেকে তুলল ওকে।

—কাল সকালে ন'টার সময়ে একটা মিটিন হবে, এসো। অনেক ক'টা নতুন মেয়ে এয়েছে হালে, ওদের বুঝিয়ে বলা দরকার।

—যাব, হাই তুলতে তুলতে পাপিয়া বলে—বসো, চা করি, খেয়ে যাও।

—না ভাই, অনেককে খপর দিতে হবে।

ব্যস্তসমস্ত সনাতনী চটি ফটফটিয়ে চলে গেল। পাপিয়া আপনমনেই মাথা নাড়ে। ভালো লাগে সনাতনীর উৎসাহ, মানুষের ভালো করার ইচ্ছে। কিন্তু কতটুকু ভালো যে এতে হবে সেটা ভাবলেই সব যেন মিথ্যে ঠেকে। সান্নিপাতিক জ্বর কি শুধু মাথায় জলপট্টি দিয়ে সারানো যায়? গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে। কপাল হাত ঠান্ডা, কিন্তু ভেতরে যেন ঘুষঘুষে জ্বর। এটাও হালের উৎপত্তি। ডাক্তারের কাছে যায় না পাপিয়া, যেতে ভয় করে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোলে, তখন?

সাজতে বসল পাপিয়া। আজকে যে ক'টা পারা যায় ষাঁড়কে টানতেই হবে। মান্‌দা মাসির টাকা, তুফানের সেলামি, দু'তিনশো টাকা তুলতেই হবে কালকের মধ্যে। মুখে কিরিম ঘষে ঘষে একটা ঝিলিক-দেওয়া চকচকে ভাব নিয়ে এল। কিরিমটা দামি, ষাট টাকা দাম নিয়েছে ছোট্ট কৌটোটার, মাঝে-মধ্যে মুখে দেয় পাপিয়া। পেলাক-করা সরু ভুরু কাজল-পেনসিল দিয়ে কালো করল। দুই ভুরুর মাঝখানটায় মাঝারি সাইজের সবুজ টিপ লাগাল একটা। মাথায় চুল আছে পাপিয়ার। সোনালি ফিতে দিয়ে জড়িয়ে লম্বা বেণি ঝুলিয়ে দিল কোমর ছাড়িয়ে। সামনের কিছু কুচো চুল কায়দা করে সাজাল কপালে। গোলাপি খোলে কালো বুটির তাঁতের শাড়ির সঙ্গে বুলু রঙের বেলাউজ পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। হাসল ঠোঁটের কোণা দিয়ে। শাহরুখ খান কী গোবিন্দার মনে ধরবে না, কিন্তু এ পাড়ায় গতর শুঁকতে আসা কুত্তাগুলোর মন টানতে না-পারার মতো নয়।

কালী, গণেশ আর লক্ষ্মীর ছবিতে পেন্নাম করে, ঘরে দোর দিয়ে পাপিয়া দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক সাড়ে পাঁচটা তখন। বেশ কিছু মেয়ে এরই মধ্যে জমে গেছে দরজায়। হাসি, ফুট-কাটাকাটি চলছে। পাপিয়া ওর জায়গা নিয়ে দাঁড়াতেই পানের দোকানের দিক থেকে একটা লম্বা ধারালো সিটি উড়ল। মুখ না ঘুরিয়ে চোখের পাশ দিয়ে দেখল ও, তুফানের মস্ত মাথাটা নজরে এল। এদের কি ঘরদোর বাড়ির লোকজন কিছু নেই? আঁশটে চাপা নোংরা গুমসানো গলিটাতে পুরোনো-পুরোনো ধসা-ধসা বাড়িগুলোর গা লেপটে, এখানে-ওখানে ডাঁই-করা জঞ্জালের তোয়াক্কা না করে চোপ্পর দিন কেমন করে কাটায় এরা এখানে? কেমন বেবুদো এগুলো? একটা সিগ্রেট ধরাতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু দোকানের গোড়ায় ওই ছোঁড়াগুলো। সিগ্রেটের ধোঁয়া গেলার ইচ্ছেটা চেপে রাখল পাপিয়া।

বিলাসী শুকনো বসা মুখে দাঁড়িয়ে। ও কি সেই তখন থেকেই এখানে?

—আজ বড়ো সেজেছ যে? হেসে বলতে চাইলেও বিলাসীর হিসকুটি ভাবটা চাপা থাকে না।

পাপিয়া গায়ে মাখে না—ওই... সাধ হল একটু।

এ গলিতে আঁধার নামে তাড়াতাড়ি। মান্ধাতার আমলের পুরোনো বাড়িগুলো যেন দু'পাশ থেকে সরু গলিটার ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে। এমনিতেই রোদ ঢুকতে পায় না। লালুর দোকানে আলো জ্বলছে —একটা টিউব-বাতি। দু'এক বাড়ির দরজায় অল্প পাওয়ারের বাল্‌ব থেকে কমজোরি হলুদ আলো। সন্ধের মুখে লোকজন আসতে শুরু করেছে। মেয়েরা গল্পগাছা করতে করতেও সজাগ চোখ রাখছে আসা-যাওয়া লোকের ওপর, চোখে চোখ পড়লে ডাক দিচ্ছে ইশারায়। পছন্দের মাংস পেলেই টুক করে ঢুকে যাচ্ছে খদ্দের। ঘাগিরা লজ্জা-শরম খেয়ে বসে আছে, কে দেখল না-দেখল থোড়াই পরোয়া তাদের, রাস্তায় দাঁড়িয়েই ফষ্টিনষ্টি জুড়েছে মেয়েদের সঙ্গে। সুটসাট বেআইনি নেশার জিনিস এধার-ওধার হাতবদল হচ্ছে। যারা জানে তাদের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে।

শার্ট-পেন্টুল-পরা চিমড়ে-পারা একটা লোক এসে দাঁড়াল পাপিয়ার সামনে। ও কথা না বলে প্যাসেজের ভেতরে এগোল। এগিয়ে দাঁড়াল। লোকটা সামনে।

—কত নেবে গো? লোকটা বলল।

—কতক্ষণ থাকবেন?

—কতক্ষণ আর...

—একশো দেবেন।

—বল কী?

—ঠিকই বলছি।

—না না, ঠিক করে বলো।

—তাহলে আপনার দরটাই শুনি।

—তিরিশ টাকা দেব।

—হল না তবে।

বলেই পাপিয়া দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল। চট করে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল একটা।

—শুনুন, এখন বেরোতে যাবেন না। খোচর ঘুরছে। আপনারা ভদ্দরলোক। থানায় নিয়ে গেলে অপমানের একশেষ।

—কী করি তবে? লোকটা একটু ভড়কেছে মনে হয়।

—আমার এক বন্ধুকে ডেকে দিচ্ছি। ওই টাকাতেই হবে। খুব ভালো মেয়ে। ঠকবেন না। পরে ও-ই ফাঁক বুঝে আপনাকে বড়ো রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসবে।

লোকটা চুপ করে আছে, কী করবে কী বুঝতে পারছে না, সেই তালে বিলাসীকে ডাকে পাপিয়া—এই বিলাসী, বিলাসী....

বিলাসী কাছে আসতে বলে—বাবুকে ঘরে নিয়ে যা। তিরিশ টাকায় কথা হয়েছে। বাবু যখন বেরোবে বড়ো রাস্তায় পৌঁছে দিস ভাই, খোচর ঘুরছে তো...

বিলাসী কথা না বলে পাপিয়ার কনুইয়ের কাছে হাতের আলতো চাপ দিয়ে লোকটাকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোয়।

দরজার দিকে যেতে যেতে মনে মনে হাসে পাপিয়া। খোচরের ভয় দেখিয়ে মাঝে মাঝে খদ্দের আটকানো একটা মজার খেলা। কিন্তু গোটা খেলাটা আরো মজার। 'ব্যবসাটা বেআইনি, তবে তুলে আমরা দেব না। বরং তোমরা যাতে ভালো থাক, রোগ-ভোগে না পড়ে যাও সেদিকে নজর রাখব।' 'তবে কেন পুলিশ আমাদের হেনস্তা করে? রাস্তা থেকে ঘরের দোর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পয়সা চায়? পয়সা দিতে না পারলে আটকে রেখে কেস দেয়? খোচররা খদ্দেরকেও পাকড়ে তোলে জাল-গাড়িতে? হয় মোটা মাল ছাড়ো, নয়তো বেইজ্জতির শেষ থাকবে না।' পাপিয়া সত্যিই বুঝতে পারে না এই অদ্ভুত খেলাটা। যাদের রোগ-জ্বালা থেকে বাঁচাতে, যাদের ভালো করতে এত মাথাব্যথা তোমাদের, তাদেরই আবার পুলিশ দিয়ে হেনস্তা করানো কেন? খদ্দেরদেরই বা পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছনা করে কেন? আইন বেআইন সব যে মিলে-মিশে ভুনিখিচুড়ি হয়ে যাচ্ছে বাবা!

দরজায় গিয়ে জায়গা নেয় পাপিয়া। লোক ঘুরছে অনেক। ক'টা আটকাবে সেইটেই চিন্তা। দেখতে দেখতে সাতটা বাজল। একটাও গাঁথেনি এখনো। এত যত্ন করে সেজে এই হল! নাকি চেহারায় যেটুকু রোশনি সে নিজে দেখছে আয়নায় সেটাও তার ভুল দেখা? খানিক বাদে একটা গাঁথল। কিন্তু পঞ্চাশের ওপরে ওঠানো গেল না কিছুতেই। নম নম করে লোকটাকে বিদেয় করে আবার দরজায় এসে দাঁড়াতে কেমন একটা গোলমালের আঁচ পেল পাপিয়া। গুলতানি-করা ছোঁড়াগুলো এ ওর সে তার কানে কানে ফিসফিস করছে। এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে। ফ্যাসাদ একটা বাধলেই হল। এ পাড়ায় গোলমাল তো আকছার লেগেই আছে। সিগ্রেটের জন্যে মনটা আনচান করছে। রাস্তায় নেমে সরু গলিটা যেখানে বড়ো গলিটায় মিলেছে সেদিকে এগোল পাপিয়া। মোড়ের দোকান থেকে একটা ফিলটার-দেওয়া গোলফেলেক নিল। ধরিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে যেই ঘুরছে অমনি হুড়পাড় দুদ্দাড় শুরু হয়ে গেল। দুড়ুম করে একা পেটো ফাটল। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল গলিটা। ঠাসঠাস করে দরজা-জানলা বন্ধ হচ্ছে। দিশেহারা মানুষজনের ছোটাছুটি। তারই মধ্যে খেটো-হাতে অনেক পুলিশকে তাড়া করতে দেখল পাপিয়া। জোরে পা চালাল বাড়ির দিকে। দশ পা এগিয়েছে কী না, একটা পেটো পড়ল সামনে। কপালে হাতে ছুরির মতো বিঁধল কিছু। তারপরই চোখের সামনে ঘন ধোঁয়া ঘন কালো অন্ধকার হয়ে জমে গেল। হুঁশ হারাল পাপিয়া।

জ্ঞান ফিরতে দেখল বিলাসী বসে আছে বিছানায়, মান্‌দা মাসি ঘরের একটামাত্র চেয়ারে।

পাপিয়া উঠে বসতে যাচ্ছিল।

মাসি হাঁইহাঁই করে উঠল—উঠিস না, উঠিস না।

আবার বালিশে মাথা রেখে পাপিয়া বলল—কী হয়েছিল মাসি?

—ওই যা হয়, কে-একটা খুনেকে ধরতে পাড়া ঘিরে তাড়া করেছিল পুলিশ। তাপ্পর পেটোবাজি। তুই অজ্ঞান হয়ে গেছিলি। কপাল আর কনুয়ের কাছটা কেটে গেছে। ভাগ্যিস তুফান ছেল। পাঁজাকোলে করে তোকে ঘরে তুলে দিল। পুলিশের হাতে পড়লে মহা ঝামেলিতে পড়ে যেতিস। হাসপাতালে নিয়ে যেত, কেস লেখাত। তাপ্পর সাক্ষি দিতে ছোটো রোজ রোজ। তুফানেটা যা-ই বলিস কাজের ছেলে।

মাসি বলে যাচ্ছিল। পাপিয়া শুনছিল কী শুনছিল না। ঘোর কেটে মাথাটা আবার পরিষ্কার হতেই সেখানে জুড়ে বসছিল টাকার চিন্তা।

—গনা ডাক্তারকে নিয়ে এসেছিল তুফান। দুটো ইনজিশন দিয়ে, ওষুদ লাগিয়ে দিয়ে গেছে। দু'রকম খাবার ওষুদ নিকে দিয়েছে। তুফান নিয়ে আসবে, ট্যাকা দিয়ে দিয়েছি। গনা ডাক্তারই একশো ট্যাকা নিল। হ্যাঁ, ডাক্তার বলছিল তোর ভেতরটা খুব দুব্বল, ভালোমতো চিকিচ্ছে করানো দরকার।

টাকার অঙ্কটা শুনেই মাথার ভেতরটা চড়াৎ করে উঠেছিল পাপিয়ার। গনা ডাক্তারের একশো টাকা, ও থেকে অন্তত তিরিশ টাকা যাবে তুফানের পকেটে। ওষুধের দামও কম হবে না। কোথা দিয়ে কী হবে? কে সোহাগ দেখিয়ে ডাক্তার ডাকতে বলেছিল? ডাক্তারের কাছ থেকেও তো বাবা দালালি তুলবি। বলতে গেলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে।

বিলাসী বলল—তুই ঘুমো পাপি, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আমি যাচ্ছি। তুই আর রাঁধতে যাসনি। তোর জন্যে দুটো চাল আমি চাপিয়ে দুব।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। ব্যথা-যন্ত্রনা নেই তেমন, কিন্তু শরীরটা যেন অবশ, মাথাটা লোহার তৈরি, উঠতে গেলেই ঘুরে পড়ে যাবে মনে হয়। এ বোধ হয় কড়া-কড়া ওষুধেরই ধাক্কা —ভাবল পাপিয়া। রয়ে-সয়ে নামল খাট থেকে।

খানিক বাদে সনাতনী এল।

পাপিয়াকে ঘরের কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল —সব শুনেছি আমি। তোমাকে আজ মিটিনে যেতে হবে না। আর একটা কথা বলে দিয়ে যাই। পুলিশের কিছু ঠিক নেই, তোমাকে নিয়েও টানাটানি কবতে পারে।

—আমি কী করেছি!

—কিছুই করনি। এখানে সব আছে, খোচর আছে, ইনফরমার আছে, কথাটা পুলিশের কানে তুলে দিলেই হল। শুধোবে—বোমায় চোট লেগেছে, থানায় জানালে না কেন? তারপর আসল কথা, মাল ছাড়ো, নইলে ভোগাব।

পাপিয়াকে চুপ করে মাথা নামিয়ে বসে থাকতে দেখে সনাতনীই আবার বলে—হয়তো কিছু হবে না। তবু সাবধান থাকা ভালো। পিন্‌কেটা হারামির বাপ-হারামি একটা।

—পিন্‌কে? সে কে?

গলা আরো নামল সনাতনীর—ওকে নিয়েই তো হুজ্জোতি। মান্‌দা মাসি সব জানে। তুফানেটা তো মাসির একেবেরে নাড়িছেঁড়া মানিক! পিন্‌কের সাথে তুফানের খুব পিরিত। চিড়িয়া একখানা। কোথায় একটা খুন করে এ পাড়ায় লুকিয়ে ছিল। পুলিশ সন্দ করে পাড়ায় ঢুকেছিল কালকে।

—ধরতে পেরেছে?

—না, ব্যাটা সটকেছে মনে হয়।

খবরটা একটু স্বস্তি দিল পাপিয়াকে। ধরা পড়লে পাড়ায় পুলিশি ঝামেলা চলত বেশ কিছুদিন। এখনো যে হবে না তা নয়, তবে পাশ-কাটানো কথা বলার রাস্তা থাকল সবারই। একটা দাগি আসামি ধরা পড়ল না, আর তাতে কিনা খুশি হচ্ছে সে, মজা বটে—মনে মনে তেতো একটু হাসল পাপিয়া। এ পাড়ার হাজার মজার এও একটা!

—চলি ভাই, কাজ আছে মেলাই।

সনাতনী চলে গেল, কিন্তু বেশ ভাবনায় ফেলে গেল পাপিয়াকে। কপালে পট্টি, কনুইয়ে পট্টি, লোকের চোখে তো পড়বেই। অথচ ঘরে বসে থাকলেও তো তার চলবে না।

মান্‌দা মাসি খবর নিতে এল—তুফানে যখন অষুদ নিয়ে এল তুই ঘুমোচ্ছিলিস, তাই আর ডাকিনি। এই নে দু'রকমের —আটটা ক্যাপচুল, আটটা বড়ি। চার দিনের অষুদ। খাস ঠিক মনে করে করে। সাতচল্লিশ ট্যাকা লেগেছে। তালে গিয়ে হল তোর দু'শো আর একশোয় তিনশো, আর এই সাতচল্লিশ। খেয়াল রাখিস বাপু, আমার আবার অত মনে থাকে না।

সবাই ভুললেও তুমি ভুলবে না, শালা মাদি শকুন—মনে মনে বলল পাপিয়া। ওষুধের দাম থেকেও কমসে কম দশটা টাকা তুফানে আর মাসির গভ্‌ভে গেছে। হিসেব চাইবার সাহস হবে কার!

মাসি চলে যেতে গুম মেরে বসে রইল পাপিয়া। রাঁড়পাড়ায় বিশ বচ্ছর যার ঘর করা হল তার কাছে নতুন নয় এসব। কিন্তু পাপিয়ার যে অন্য ফাঁপর। মাত্র দুটো কী তিনটে দিন সময় পাবে। তারপর চারটে দিন নষ্ট হবে মাসের পাপে। মাঝখানের দু'তিন দিনে তিন-চারশো টাকা না তুলতে পারলেই নয়। মাসি হাঁ করে বসে আছে। তুফানও ছাড়বে না। কপালে হাতে পট্টি নিয়ে গেটে দাঁড়ালেও সবার নজরে পড়বে।

ভেতরে তাপ জমতে থাকল পাপিয়ার। উঠে গিয়ে আয়নার সামনে বসল। কপালের ওপর একটু তুলো দিয়ে আড়াআড়ি দু'টুকরো প্লাস্টার লাগানো। আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিল পট্টির ওপর, চাপ বাড়াল, লাগল না তেমন। রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে আয়নায় নিজের মুখটার দিকেই একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর প্লাস্টার দুটো আস্তে আস্তে খুঁটে তুলে ফেলল। তুলোটা উঠে এল প্লাস্টারের সঙ্গে। সামান্য কেটেছে। সাদা গুঁড়ো ওষুধ একটু লেগে আছে। ও যা চোট পট্টি না লাগালেও চলবে। কনুইয়ের পট্টিটাও খুলে ফেলল। এটা বরং একটু বেশি কেটেছে, তবে এমন নয় যে ব্যান্ডেজ বেঁধে লোককে দেখিয়ে বেড়াতে হবে। ঘরে একটা শিশিতে খানিক লাল ওষুধ আছে। ওষুধটা ভালো। ওটা লাগিয়ে রাখলেই হবে। এভাবে একটা সমস্যার সমাধান করতে পেরে মনের ভার সামান্য কমার মুখেই অন্য একটা চিন্তা এল মাথায়। এই তো চোট! এতেই মুচ্ছো গিয়ে চোখ উলটে পড়ে রইল অতক্ষণ? আশপাশে একটা বোমা ফাটলে,কী কারো হাতে ছুরি-চেম্বার দেখলেই নাড়ি ছেড়ে যাবার ধাত তো ছিল না তার। অত পলকা হলে টিকতে হবে না এ পাড়ায়। ভেতরে ভেতরে শরীরটা কি এতই ফোঁপরা হয়ে গেছে? গেলেই বা কী করার আছে! নিজেকেই একটা গাল দিয়ে কলঘরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল পাপিয়া।

'ও কিছু না, মাথাটা এমনি ঘুরে গিয়েছিল'—মেয়েদের পিরিত-কচলানো প্রশ্নের এই ধাঁচের উত্তর দিতে দিতে চান-টান সেরে ঘরে এল। সাড়ে দশটা। বাজার-টাজার আজ আর নয়। ঘরে চাল ডাল আলু আছে, তা-ই দিয়ে চালিয়ে নেবে। গেটে ঘণ্টা দুই দাঁড়ালে হয়। কালকের মতো বে-টাইমের উটকো এক-আধটা যদি লেগে যায়। কিন্তু পালিশ লাগানোর আগে রাস্তার হালটা একবার দেখে আসা দরকার। দোর দিয়ে গেটে গেল। যা ভয় করেছিল তা-ই। রাস্তা ফাঁকাই প্রায়। লাল্লুর দোকানের সামনে একটা চ্যাংড়ারও টিকি দেখা যাচ্ছে না। গলির বাঁকটায় চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিতে দুটো পুলিশ বসে। গলির মুখে পুলিশ দেখলে খদ্দের আর ঢুকবে না। দোরে দোরে ক'টা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের তড়বড়ানিও বন্ধ আজ। নাঃ, এ বেলাটা বরবাদেই গেল। সন্ধের ঝোঁকে যদি কিছু হয়। পাপিয়া ঘরে এসে দোর দিল। আজ অসময়ে দোর দিলে কথা উঠবে না। তার তো শরীর খারাপ!

বিকেল-বিকেল উঠে সাজতে বসল। কনুইয়ে লাল ওষুধ লাগাল। কপালের কেটে-যাওয়া জায়গাটায় দিতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। নাঃ, থাক, বিচ্ছিরি দেখাবে। ও এমনিতেই সারবে।

গলিতে মানুষজন এখন একটু বেড়েছে। পুলিশ দুটো বেঞ্চিতে দুটো ছুঁড়ির গা লেপটে বসে খুব গুলতানি জমিয়েছে। মেয়ে দুটোরও খুশি আর ধরে না। হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে পুলিশদের গায়ে। কতকালের পিরিতের নাঙ যেন সব। জানিস না তো শালিরা, এ ওদের উপরি আদায়। ওই যা একটু গতরে গতরে ঠেকাঠেকি, রসের খিস্তি-মেশানো কথা চালাচালি। ওতে ভোলার পাত্তর নয় এরা, একবারও ভাবিসনি থানা-পুলিশের ফেরে পড়লে তোকে বাঁচাতে আসবে।

চাপা গলির ছায়াগুলো ঘন হতে হতে সন্ধের রং ধরছে। দু'চারটে দোকান যা আছে গলিতে তারা আলো জ্বালিয়েছে। পুলিশ দেখলে ভড়কায় না এমন খদ্দের কিছু আছে, তাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। এমনি মানুষজন আর খদ্দেরে ফারাক বোঝার চোখ পাপিয়ার আছে, এখানকার সব মেয়েরেই ওটা তৈরি হয়ে যায়। পাপিয়ার মনটা একটু ভালো-ভালো ঠেকে। জুটে যাবে মনে হয় কিছু। ভাবতে ভাবতেই জুটে গেলও একটা। আপিস-ফেরতা বাবু বোধ হয়, মাগিবাড়ির খেপ সেরে বউয়ের পছন্দের তিনশো জর্দা এক কৌটো কিনে নিয়ে তার হাতে দিয়ে ভালোবাসার দাঁত ক্যালাবে। ধুরতুমি-ভরা চোখ লোকটার। খুব ঘুষ খায় আপিসে বোধ হয়। বেশি দরাদরি না করে আশি টাকায় রাজি হয়ে গেল পাপিয়া। শুরুটা খুব খারাপ হল না।

পাপিয়ার তো তাড়া ছিলই, থাকেই, লোকটারও তাড়া ছিল। বউ বুঝি মাংসের সিঙাড়া বানাবে আজ, সোয়ামি ঘরে ফিরলে গরম গরম ভেজে দেবে। মনে মনে 'যাঃ শালা, খুব বেঁচে গেলি' আর মুখে মধু-জাবড়ানো 'আবার এসো কিন্তু' দিয়ে লোকটাকে কাটিয়ে দরজায় এসে ফের দাঁড়াল পাপিয়া। এখনো অনেক সময় আছে, আরো

অন্তত চার-পাঁচটা গাঁথতে হবে আজ। দোকানদারি হাসি মুখে মাখিয়ে একটা একটা করে গলি-চলতি মানুষের আন্দাজ নিতে থাকল।

ঠিক তখনই কাণ্ডটা শুরু হয়ে গেল। এঁকেবেঁকে-থাকা গলিগুলোতে হঠাৎই যেন বিশ-পঞ্চাশটা বোমা দুমদাম ফেটে গেল, ফটাস ফটাস করে গুলির শব্দও। পড়িমরি দৌড়োতে শুরু করেছে লোকেরা। তুফানেরই চ্যালা একটা দৌড়তে দৌড়তে চেঁচিয়ে বলে গেল —ভেতরে যা সব, দোর দে, গুলি চলছে।

সদরের খিল তুলে দিতে দিতে ফুঁসে উঠল পাপিয়া—শালা বেদো খানকির বাচ্চা সব..

ধান্দা চৌপট। রাত গড়ায়। নটা...দশটা...এগারোটা। উড়ো উড়ো খবর আসছে। পিন্‌কে পাড়াতেই কোথায় লুকিয়ে ছিল, পালাতে পারেনি। পুলিশের কাছে পাকা খবর ছিল আজ। চুপচাপ পুরো পাড়া ঘিরে ফোর্স ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর যা হয় আর কী। পিন্‌কে ঘায়েল, সঙ্গে আর একটাও। তিন-চারটে পুলিশও চোট পেয়েছে। পিন্‌কের আরো গুণের খবর পাওয়া গেছে। একটা নয়, ছ-ছ'টা খুনের আসামি ও। পাপিয়ার মাথার ভেতর এক-উনুন আগুন। কাজ-কারবার সব লাটে উঠল ক'দিনের মতো কে জানে।

রান্নাবান্না করতে ইচ্ছে নেই। 'ধেত্তেরি' বলে পাপিয়া আলমারি খুলে একটা সস্তা 'বিলিতি' মালের বোতল বের করে আনল। খদ্দেরের জন্যে রাখা থাকে। খেতে চাইলে দুটো পয়সা এ থেকেও আসে।

বোতল থেকে ঢকঢক করে অনেকটা গিলে, গলা-পোড়ানো ঝাঁঝে মুখ কুঁচকে বোতলটা আলমারিতে রেখে একটা বিড়ি ধরিয়ে চেয়ারে বসল।

কতক্ষণ এভাবে বসে আছে বা ক'টা বিড়ি টেনেছে খেয়াল ছিল না। হুঁশ ফিরল ভেজানো দরজা ঠেলে তুফান ঘরে ঢুকতে। ঘরে ঢুকেই ও দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

আড়চোখে একবার তাকিয়ে পাপিয়া নির্বিকারভাবে বলল —কী চাই?

উত্তর না দিয়ে পাপিয়ার মুখোমুখি খাটের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসল তুফান। এবার ওকে ভালো করে দেখতে বাধ্য হল পাপিয়া। নেশায় চুর হয়ে আছে। ভারি হয়ে নেমে-আসা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ঘোলাটে লালচোখ। সাপের ফণা দোলানোর মতো দুলছে মাথা, শরীর। বিচ্ছিরি একটা দম-বন্ধ-করা গন্ধ সঙ্গে নিয়ে এসেছে জানোয়ারটা। মদ, ঘাম, রক্ত, বারুদ, ময়লা—কী আছে আর কী নেই সে গন্ধে!

—কী চাই? একইরকম ভাবে আবার বলল পাপিয়া।

— তোকে চাই, তোকে শরীরটা বড়ো চাইছে আজ, তোকেই চাইছে। জড়িয়ে জড়িয়ে এড়িয়ে এড়িয়ে বলল তুফান।

এ রকম বায়না নিয়ে আগে কখনো আসেনি ও। মদের কুয়াশা কেটে গিয়ে আগুন জ্বলে উঠল পাপিয়ার মাথায়। দুনিয়ার তামাম পাপ-অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের নিশান হয়ে যেন বসে আছে সামনের ওই জানোয়ারটা।

—চাস তো পাবি। চোখের হাসিতে যেন দু'পাত্র কড়া মদই ঢেলে দিল পাপিয়া।

অক্লেশে মেলে ধরল নিজেকে —আজ তোর আশ মিটিয়ে দুব রে তুফান। মরা ইস্তক মনে থাকবে, দেখিস!

—তোদের তো আবার কী সব নিরোধ-ফিরোধের ফ্যাচাং আছে! গাছের ছাপা-গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে বলল তুফান।

—দুর, ওসব কি তোর জন্যে নাকি? ওতে কী সুখ হয়! বলতে বলতে নিজের উলঙ্গ অলস শরীটাকে খাটে তুলে আনল পাপিয়া।

তারপর বুকের ভেতরে দাউদাউ আগুনের দহন নিয়ে অবাধ অবারিত সঙ্গমে লিপ্ত হল এইচ আই ভি পজিটিভ কেস বিন্দি বাই ওরফে পাপিয়া রানি ওরফে.... নাঃ, আর কোনো ওরফে নেই!



নরকের পোকা

প্রফুল্ল রায়

শহরের এই অঞ্চলে কিছু ধানচালের আড়ত, কাঠের গুদাম, করাত-কল আর টালিখোলা এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। সামনে দিয়ে চলে গেছে এবড়োখেবড়ো খোয়ার রাস্তা। দু'ধারের কাঁচা নর্দমা থেকে অনবরত দুর্গন্ধ উঠে এসে বাতাসে বিষ ছড়িয়ে যায়। চাপ-বাঁধা মশার ঝাঁক সারাক্ষণ নর্দমা দুটোর ওপর উড়তে থাকে।

খোয়ার রাস্তা থেকে করাত-কলের পাশ দিয়ে একটা সরু গলি ডাইনে ঢুকে যে হতচ্ছাড়া চেহারার বস্তিটায় গিয়ে ঠেকেছে, সেটাকে নরকের খাস তালুক বলা যায়। টুটোফুটো টিনের চালের নোংরা কুৎসিত এই বাস্তিটা হল পৃথিবীর সবচেয়ে ওঁচা ক'টা মেয়েমানুষের শেষ আস্তানা। সুখী, ভদ্র মানুষের ভূগোল থেকে অনেক, অনেক দূরে নরকের এই সংরক্ষিত এলাকা।

বস্তি থেকে বেরিয়ে এসে দুটো মেয়েমানুষ করাত-কলের বাড়ানো টিনের শেডের তলায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে।

পউষের মাঝামাঝি। এ বছর এই শহরটায় দুর্দান্ত শীত পড়েছে।

এখন কত রাত কে জানে। আকাশ থেকে ঘন হয়ে নামছে পৌষের হিম। নীচে মাটির লক্ষ কোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে মারাত্মক শীতলতা।

মিউনিসিপ্যালিটি অসীম উদাসীনতায় এ রাস্তায় দু-আড়াই শো গজ দূরে দূরে কটা কাঠের খুঁটি পুঁতে সেগুলোর গায়ে বাল্ব ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। প্রায় সবগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে। দু একটা অবশ্য টিম টিম করে এখনও জ্বলে।

মেয়েমানুষ দুটো যেখানে বসে আছে তার কাছাকাছি একটা আলো জ্বলছে। গাঢ় হিম এবং কুয়াশা বাল্বটার চারপাশে এমন জমাট বেঁধে আছে যে তিন হাত দূরত্বের কিছুই প্রায় দেখা যায় না।

খোয়ার রাস্তাটা উত্তর থেকে খাড়া দক্ষিণে চলে গেছে। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, এখন সব সুনসান।

এমনিতে সন্ধের পর দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য চোর গাঁটপাড় মাতাল এবং গুণ্ডারা ঝাঁকে ঝাঁকে পেছনের বস্তিটায় হানা দিতে থাকে। তারপরও যে মেয়েমানুষেরা নিজেদের বিকোবার মতো খদ্দের জোটাতে পারে না, সোজা সামনের রাস্তায় চলে আসে। ততক্ষণে ধানচালের আড়ত, কাঠের গুদামটুদাম বন্ধ হয়ে যায়।

রাত একটু বাড়লে ভদ্রপাড়ার মানুষজন পারতপক্ষে এ রাস্তা মাড়ায় না। ক্বচিৎ দু-একটা মড়া কাঁধে নিয়ে কিছু লোক চিৎকার করে গোটা এলাকা কাঁপাতে কাঁপাতে শ্মশানের দিকে চলে যায়— 'বল হরি, হরিবোল। আবার বল, হরিবোল।'

এখান থেকে মাইল দেড়েক তফাতে একটা মজা নদী সাপের খোলসের মতো পড়ে আছে। শ্মশানটা তার পাড়ে।

যে মেয়েমানুষ দুটো করাত-কলের শেডের তলায় বসে আছে, তাদের গায়ে রোঁয়াওলা খেলো উলের চাদর জড়ানো, চাদর দুটো বহুকালের পুরনো, এখানে ওখানে অজস্র তালি। পৌষের হিম চাদর ভেদ করে তাদের হাড়ের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। অসহ্য ঠান্ডায় হাত-পা অসাড় তো হয়ে গেছেই, দাঁতে দাঁতও লেগে যাচ্ছে।

তাদের নাম টগর আর চাঁপা। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। তবে ভাঙাচোরা মুখ, কর্কশ চামড়া, চোখের তলায় চিরস্থায়ী কালির ছোপ, ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখলে মনে হতে পারে তারা চল্লিশ পেরিয়ে গেছে।

টগর বলে, 'শীতে একেবারে কালিয়ে গেলাম। এট্টু গা গরম করে লিই।' শীতার্ত শরীরে খানিকটা উত্তাপ নিয়ে আসার জন্য একটা ছোটো টিনের কৌটো থেকে দুটো আধপোড়া বিড়ি এবং দেশলাই বার করে একটা চাঁপাকে দেয়।

বিড়ি ধরিয়ে টানতে টানতে চাঁপা উত্তর থেকে দক্ষিণে হিমে-মোড়া ঝাপসা রাস্তাটা একবার দেখে নেয়। না, একটা লোকও চোখে পড়ছে না। এমনকি বেওয়ারিশ কুকুর-টুকুরগুলো পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে। প্রচণ্ড দুর্যোগে বা অন্য কোনো বিপর্যয়ের সময় কেউ না বেরুলেও মাতাল এবং লম্পটেরা পোকার মতো বুকে হেঁটে এখানে হাজিরা দেবেই। কিন্তু আজকের এই মারাত্মক ঠান্ডায় মানুষের আদিম জৈব প্রবৃত্তিও বুঝি সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। আজ আর খদ্দেরের আশা নেই।

চাঁপা বলে, 'মড়াগুলোন সব আজ ব্রেহ্মচারী হয়ে গেল নাকিন লা টগরী?'

টগর বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে নাকের ফুটো দিয়ে নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'তা-ই তো মনে হচ্চে। কিন্তন সব্বাই সন্নিসি হয়ে গেলে আমাদের চলে কী করে? উপোস দিয়ে মরতে হবে।'

চূড়ান্ত ক্ষয় এবং গ্লানির শেষ সীমান্তে পৌঁছেও রসিকতার বোধটুকু এদের একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। চাঁপা বলে, 'য্যাদ্দিন গতর আচে উপোস দেব কেন লা? আজ ঠান্ডায় বেরোয়নি, কাল নচ্ছারগুলোন ভাদ্দরমাসের কুত্তোর মতো জিভ লক লক করতে করতে ঠিক দৌড়ে আসবে।'

'তা যা বলেচিস। এ পবিত্তির (প্রবৃত্তির) তো মরণ লেই।'

মানুষ সম্পর্কে টগরদের অভিজ্ঞতা একটাই। নরকের একেবারে শেষ স্তরে পৌঁছে তারা জেনেছে, জৈব প্রবৃত্তির বিনাশ নেই। একমাত্র এরই জোরে তারা টিকে আছে। যতদিন কামুক পুরুষেরা এই পৃথিবীতে রয়েছে, তারাও থাকবে।

বহুদূরে জগতের সব সুখী, সোহাগিনী নারীরা উষ্ণ লেপের তলায় কাম্য পুরুষদের বুকের ভেতর মুখ রেখে যখন ঘুমিয়ে আছে তখন দুটি জঘন্য মেয়েমানুষ কুয়াশা এবং হিমের ভেতর আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে।

একসময় টগর বলে, 'চ, ফিরে যাই। এই ঠান্ডায় বসে থাকলে নিমুনি ধরে যাবে।'

চাঁপা বলে, 'তা-ই চ।'

ওরা করাত-কলের শেডের তলা থেকে সবে নিচে নেমেছে, দূরে কীসের যেন আওয়াজ পাওয়া যায়। মিউনিসিপ্যালিটির যে দু-চারটে আলো এধারে ওধারে জ্বলছে তাতে কিছুই চোখে পড়ে না।

দৃষ্টিকে ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ করে চাঁপা এবং টগর ডাইনে এবং বাঁয়ে অনবরত তাকাতে থাকে। গাঢ় কুয়াশায় এবং হিমে চারপাশের সবকিছু ঢাকা। না দেখা গেলেও শব্দটা কিন্তু কানে আসছে। সেটা ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসে।

সৃষ্টিছাড়া দুনিয়ার দুই বাসিন্দার মনে সামান্য দুরাশাই বুঝি দেখা দেয়। টগর বলে, 'কীসের আওয়াজ বুজতে পারচিস?'

চাঁপা কান খাড়া করে বুঝবার চেষ্টা করে। তারপর চোখ কুঁচকে বলে, 'মনে হচ্চে মানুষের পায়ের আওয়াজ। কেউ ইদিকে আসচে।'

'এট্টু দেঁড়িতে যাই, কি বলিস?'

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্চে, আজকের রোজগারটা মার যাবে না।'

টগর কিছু বলে না। তবে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথাটা একদিকে সামান্য হেলিয়ে দেয়।

আরো কিছুক্ষণ বাদে দু-আড়াই শ গজ দক্ষিণে মিউনিসিপ্যালিটির যে বাতিটা জ্বলছে তার তলায় ঝাপসা ক'টা চেহারা দেখা যায়। মনে হয় মানুষই। চাঁপারা রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

টগর বলে, 'আগিয়ে দেকবি?'

চাঁপা বলে, 'না, এখেনেই দেঁড়িয়ে থাকি।'

কুয়াশা এবং হিমের মধ্যেও ক'টা মানুষের কাঠামো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কিছু একটা যেন তারা বয়ে নিয়ে আসছে।

এ পাড়ায় যারা মজা লুটতে আসে তারা কেউ ঘাড়ে মালপত্র চাপিয়ে আনে না। বড়ো জোর তাদের বগলে বা হাতে কালীমার্কা দিশি মদের বোতল থাকতে পারে।

টগর চাপা গলায় শুধোয়, 'এই মড়াগুলোন কারা? কাঁধে করে কী নে আসচে?'

চাঁপা বলে, 'ভগমান জানে। কাচে আসতে দে।'

কাছাকাছি আসার আগেই লোকগুলো হঠাৎ রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে ভারি কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় তখনই আধফোটা কাতর গোঙানির শব্দ ভেসে আসে, সেইসঙ্গে অস্পষ্ট কিছু কণ্ঠস্বর—যার একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

মেয়েমানুষ দুটো নিজেদের অজান্তেই উদ্বেগ বোধ করতে থাকে।

টগর বলে, 'কী হল, বল দিকিন?'

চাঁপা বলে, 'ঠিক বুজতে পারচিনি।'

'দেঁড়িয়ে না থেকে, চ ওখেনে গিয়ে দেকি—'

চাঁপা সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে বলে, 'যেতে তো চাইচিস। আবার কোনো হ্যাঙ্গামে গিয়ে পড়ব না তো?'

টগর নিরাসক্ত মুখে বলে, 'হ্যাঙ্গাম আর লতুন করে কী হবে? আমাদের মতো মেয়েমানুষের ক্ষেতি যা হবার তা তো হয়েই গেচে। চ —'

চাঁপা আর কোনো প্রশ্ন করে না। খানিকটা কৌতূহল এবং খানিকটা উৎকণ্ঠা নিয়ে পায়ে পায়ে দু'জনে এগিয়ে যায়। করাত-কলের পর তিন চারটে কাঠের গুদাম পেরিয়ে যেতেই ওরা তিনজন জ্যান্ত মানুষ এবং একটি মৃতদেহ দেখতে পায়। জীবন্ত মানুষদের তিনজনই পুরুষ। একজনের বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন। বাকি দু'জনের কম। একজন বাইশ-তেইশ বছরের যুবক. অন্যটি অল্পবয়সী কিশোর। মৃতদেহটি একজন মধ্যবয়সি মহিলার। যুবকটি মাটিতে শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে। প্রৌঢ় এবং কিশোরটি তাকে তুলে বসাবার চেষ্টা করছে।

একধারে খেলো কাঠের একটা খাটিয়া কাত হয়ে রয়েছে। এই ধরনের খাটে চাপিয়েই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। খাটিয়াটির পাশে রাস্তার ওপর মহিলাটির নিষ্প্রাণ শরীর পড়ে আছে।

টগররা বুঝতে পারে. যুবক কিশোর এবং বয়স্ক লোকটি মহিলার মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছিল। তার ভার ধরে রাখতে না পেরে যুবকটি হয়তো পড়ে যায়, সেই সঙ্গে খাটিয়াসুদ্ধ মৃতদেহটি। দূর থেকে এই পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিল তারা।

মারাত্মক শীতের বাতে আচমকা কুয়াশা এবং হিম ফুঁড়ে দু'টি মেয়েমানুষকে কাছে আসতে দেখে বয়স্ক লোকটি আর কিশোব চমকে ওঠে, ভীত চোখে তাদের লক্ষ করতে থাকে।

টগর আর চাঁপা প্রৌঢ় এবং ছেলেটাকে দেখছিল। টগর জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েচে?'

প্রৌঢ় লোকটি ভাঙা ভাঙা গলায় যা জানায়, টগররা মোটামুটি তা আগেই আন্দাজ করেছিল। নতুন যে খবরটুকু পাওয়া যায় তা এইরকম— মৃত মহিলাটি বয়স্ক লোকটির স্ত্রী। যুবক এবং কিশোর তাদের ছেলে। ভয়াবহ ঠান্ডায় স্ত্রীকে শ্মশানে নিয়ে আসার মতো লোক পাওয়া যায়নি। নিরুপায় হয়ে সে আর দুই ছেলে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে আসছিল। কিন্তু বড়ো ছেলেব দু'দিন ধরে প্রচণ্ড জ্বর, তার ওপর মায়ের মৃত্যুশোক। ধুঁকে ধুঁকে মৃতদেহ বয়ে আনতে আনতে তার জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হয়ে আসে। এই পর্যন্ত এসে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। এখন এই ছেলেকে কী করে সুস্থ করে তোলা যাবে এবং কীভাবেই বা স্ত্রীকে শ্মশানে নিয়ে সৎকার করবে, ভেবে পাচ্ছে না বয়স্ক লোকটি। এই জনমানবহীন রাস্তায় এমন একটি মানুষ নেই যার সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

সব শোনার পর টগর এবং চাঁপা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কিছু পরামর্শ করে নেয়।

একসময় টগর জিজ্ঞেস করে, 'আমরা যদিন মা নক্ষীকে শ্মোশানে নে যাই —' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে যায়।

মেয়েমানুষ দুটোকে আচমকা দেখার পর সেই প্রাথমিক ভীতি এবং সংশয় খানিকটা কেটে এসেছে প্রৌঢ়ের। তারা যেচে যেভাবে সাহায্য করতে চাইছে তা মেনে নেবে কিনা, সে সম্পর্কে প্রৌঢ় হয়তো দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এতক্ষণে সে বুঝে ফেলেছে টগররা কোন স্তরের জীব এবং তাদের ক্ষয়াটে ভাঙাচোরা মুখে কীসের ছাপ মারা।

টগর ফের বলে, 'আপনারা বেপদে পড়েচেন, তাই বল্লতে ভরসা পাচ্চি। লইলে বুজতেই পাচ্চেন, আমরা হলুম গে লরকের পোকা —'

প্রৌঢ় এবারও চুপ।

চাঁপা বলে, 'আমরা ছুঁলে মা নক্ষীর যদিন পরকালের ক্ষেতি হয়ে যায়, তা হলে আর ছুঁচ্চি না। যাই —'

সত্যিই চাঁপারা যখন চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, প্রৌঢ় বিচলিত হয়ে পড়ে। যত জঘন্যই হোক আর গায়ে যত পাঁকই মাখানো থাক, তবু দুটো জীবন্ত মানুষ তো। এই দুর্জয় শীতের রাতে নির্জন রাস্তায় অসুস্থ ছেলে এবং মৃত স্ত্রীকে নিয়ে যখন সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে তখন এই মেয়েমানুষ দুটো এগিয়ে এসেছে। তাদের সাহায্য না নিলে বাকি রাত এই হিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সেটা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার, ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

প্রৌঢ়রা ব্রাহ্মণ। নিজেদের জ্ঞান বিশ্বাস এবং সংস্কার অনুযায়ী সৎভাবেই তারা জীবনযাপন করে এসেছে। বেশ্যারা ছুঁলে সাধ্বী স্ত্রীর স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা কতটা দুর্গম হয়ে উঠবে, এই মুহূর্তে তা চিন্তা করার মতো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই তার। প্রৌঢ় রুদ্ধ গলায় ডাকে, 'শোন—'

টগররা থেমে যায়।

প্রৌঢ় বলে, 'তোমরা যা ভালো বোঝ, কর।'

টগর এবং চাঁপা উত্তর না দিয়ে ক্ষিপ্র হাতে প্রথমে মৃতদেহটি খাটিয়ার ওপর তুলে সযত্নে শুইয়ে দেয়। তারপর বেহুঁশ যুবকটিকে ধরাধরি করে সামনে একটা গুদামের শেডের তলায় নিয়ে আসে। প্রৌঢ় এবং কিশোরটিও অবশ্য তাদের সঙ্গে হাত মেলায়।

এরপর যুবকটির কপালে বুকে হাত দিয়ে তাপ পরখ করতে করতে টগর বলে, 'হিমে গা কালিয়ে গেচে। শরীল গরম না হলে হুঁশ ফিরবে নি।' একটু চিন্তা করে চাঁপাকে বলে, 'ঝট করে আমার ঘর ঠেঞে (থেকে) হারকেন্ (হারিকেন) আর ছেঁড়া ন্যাগড়া (নেকড়া) নে আয়। যাবি আর এসবি।'

চাঁপা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হেরিকেন টেরিকেন নিয়ে ফিরে আসে। এবার টগর ছেঁড়া কাপড়টা চার ভাঁজ করে হেরিকেনের মাথায় বসিয়ে গরম করে করে যুবকটির গালে গলায় কপালে সেঁক দিতে থাকে। আর চাঁপা তার হাত এবং পায়ের তেলো ঘষে ঘষে উত্তপ্ত করে তোলে।

কিছুক্ষণ পর যুবকের জ্ঞান ফেরে। আস্তে আস্তে উঠে বসে সে।

টগর বলে, 'এবেরে মা নক্ষীকে নে শ্মাশানে যাওয়া যাক।'

প্রৌঢ় এবং কিশোরটি একধারে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে টগরদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কোথাকার দুটো অধঃপতিত মেয়েমানুষ যে এভাবে সেবা করতে পারে, কে ভেবেছিল! প্রৌঢ় বলে, 'তোমরা অনেক করেছ, আর কষ্ট দেব না। আমরাই শ্মশানে নিয়ে যেতে পারব।'

দুই ওঁচা মেয়েমানুষের ওপর এই শীতের রাতে অপার্থিব কিছু যেন ভর করে বসে। মৃতদেহটি শ্মশানে পৌঁছে দেওয়া যেন তাদের দায়। যুবকটিকে দেখিয়ে টগর বলে, 'এই মাত্তর হুশ ফিরেচে। এই শরীলে মা নক্ষীকে বয়ে শ্মোশানে নে যেতে পারবে নি।' প্রৌঢ় এবং কিশোরকে বলে, 'আপনারা খাটের এক মুড়ো ধরুন, চাঁপা আর আমি আরেক মুড়ো ধরি।'

আপনি করার কিছু নেই। সবে হুঁশ ফিরেছে। এই অবস্থায় দুর্বল রুগ্‌ণ শরীরে মায়ের মৃতদেহ বয়ে দেড় কিলোমিটার দূরের শ্মশানে নিয়ে যাবার শক্তি তার নেই।

টগরের পরিকল্পনামাফিক খাটের সামনের দিকটা তুলে ধরে প্রৌঢ় এবং কিশোর, পেছন দিকটা টগর আর চাঁপা। এইভাবে তারা এগিয়ে চলে। টগরের হেরিকেন হাতে ঝুলিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে যুবকটি।

শ্মশানে পৌঁছে দেখা যায়, কেউ কোথাও নেই। একপাশে প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মেটে ঘরে ঝড়ু ডোম একাই থাকে। সে দরজা বন্ধ করে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এই প্রচণ্ড শীতের রাতে প্রৌঢ়র স্ত্রী ছাড়া আর বোধহয় কেউ মরেনি। একটি রাতের জন্য মৃত্যুও হয়তো তার হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

শ্মশানের গায়েই মজা নদী, তার ওপারে ঘন গাছপালার ভেতর চাষা-ভুষোদের গাঁ। কিন্তু এখন কিছুই চোখে পড়ে না, গাঢ় কুয়াশা এবং হিম সমস্ত চরাচর মুড়ে রেখেছে।

শ্মশানের এক ধারে মৃতদেহসুদ্ধ খাটিয়া নামানো হয়।

টগর বলে, 'আপনারা বসুন, আমরা ঝড়ুকে ডেকে আনচি।'

খাটিয়ার পাশে প্রৌঢ় তার দুই ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাশে হেরিকেনটা টিমটিম করে জ্বলে।

টগর আর চাঁপা প্রচুর ডাকাডাকি করে এবং দরজায় ধাক্কাটাক্কা দিয়ে ঝড়ুকে জাগায়। বাইরে বেরিয়ে দুই জঘন্য মেয়েমানুষকে দেখে ঝড়ুর মাথায় খুন চড়ে যায়। কর্কশ গলায় চিৎকার করে বলে, 'শালিরা, মাজ রাত্তিরে জ্বালাতে এয়েচিস কেন?' টগরদের সঙ্গে তার অনেক দিনের জানাশোনা।

টগর বলে, 'মড়া নে এইচি।'

ঘুম ভাঙবার জন্য বেজায় খেপে গেছে ঝড়ু। বলে, 'মরবার আর সময় পেলনি?'

চাঁপা বলে, 'তুই ঘুমুবি বলে কেউ মরবেনি? যম তোর কাচে দাসখত নিখে দেছে —না?'

গজগজ করতে করতে ঝড়ু বলে, এই রাতের বেলায় হুজ্জুত না করলে চলছেল না? কাল সকালে মড়াটা আনলে কী ক্ষেতিটা হত?'

'তোর ঘুমের নেগে (জন্য) নোকে মড়া বাসি করে ফেলে রাকবে?'

'ও, টাটকা মড়া জ্বালিয়ে সগ্‌গে পাঠাতে চাইচিস নাকিন রে মাগিরা?' বলে কদর্য কিছু খিস্তি দেয় ঝড়ু।

টগররাও চুপ করে থাকে না। কিছুক্ষণ বেপরোয়া গালিগালাজের আদানপ্রদান চলতে থাকে। তারপর হয়রান হয়ে পড়ে ঝড়ু। টগরদের জিভে এমন ধার এবং তাদের ভাঁড়ারে এত অফুরন্ত খিস্তিখেউড় জমানো যে দু'হাত তুলে সে বলে, 'ঠিক আচে বাবা, এবাব ক্ষ্যামা দে। কোতায় তোদের মড়া?'

ঝড়ু রণে ভঙ্গ দেওয়ায় টগর আর চাঁপা খিস্তি থামায়। টগর শ্মশানের কোণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওখেনে–'

'চ—'

টগবদেব পাশাপাশি চলতে চলতে ঝড়ু বলে, 'তোদেব পাড়ার কে মবল?'

টগর বলে, 'আমাদের পাড়ার মড়া লয়।'

ঝড়ু অবাক হয় থাকে খানিকটা সময়। তারপর শুধোয়, 'তবে কার মড়া লিয়ে এলি?'

সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানিয়ে দেয় চাঁপা।

ঝড়ু হাঁ হয়ে যায়। তার বিস্ময় এক লাফে কয়েক গুণ বাড়ে। সে বলে, 'এই জম্পেশ ঠান্ডায় লিজেদের পাসিঞ্জাব (প্যাসেঞ্জার) না ঢুকেই (ঢুকিয়ে) রাস্তার মড়া নে এলি!'

চাঁপা তাকে কড়া ধমকে থামিয়ে দেয়।

একটু পরে ওরা প্রৌঢ়দের কাছে চলে আসে।

নদীর দিক থেকে শীতের উলটোপালটা বাতাস ছুটে আসছিল। প্রৌঢ় এবং তার দুই ছেলে অসহ্য হিমে হি হি করে কাঁপছে।

ঝড়ু একবারে খাটে শায়িত মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ়কে বলে, 'সাট্টিফিট এনেচেন?' অর্থাৎ ডাক্তার বা হাসপাতাল থেকে আনা ডেথ সার্টিফিকেট। চিতা সাজাবার আগে মহিলাটির মৃত্যু যে স্বাভাবিক, সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাইছে ঝড়ু। একবার মাঝরাতে একটা অল্প বয়সের বউকে খুন করে ক'টা লোক পোড়াতে এনেছিল। এই নিয়ে পরে প্রচুর হুজ্জুত হয়েছে। সেই থেকে ডেথ সার্টিফিকেট না আনলে মড়া পোড়ায় না ঝড়ু। দারুণ হুঁশিয়ার হয়ে গেছে সে।

প্রৌঢ় বলে, 'এনেছি।' ডেথ সার্টিফিকেটের একটা নকল বার করে দেয় সে।

ঝড়ু এবার বলে, 'কাঠের দাম আর আমার মুজরিটা দ্যান। দেড়শো ট্যাকা।'

কিছুক্ষণ বাদে ক্ষিপ্র হাতে চিতা সাজিয়ে ফেলে ঝড়ু। তারপর প্রৌঢ় এবং দুই ছেলে ধরাধরি করে মহিলার মৃতদেহ চিতায় তোলে।

মারা গেলেও এতক্ষণ মা চোখের সামনেই ছিল। দুতিন ঘণ্টার মধ্যে তার নশ্বর দেহ শ্মশানের মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দুই ছেলেই একেবারে ভেঙে পড়ে। তাদের কাতর করুণ কান্নার আওয়াজ শীতের ভারী বাতাসে বিষাদ ছড়িয়ে দিতে থাকে। প্রৌঢ়টি অবশ্য শব্দ করে কাঁদছে না, তবে তার চোখ থেকে গাল বেয়ে ঢল নেমে আসছে।

একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে টগব আর চাঁপা। প্রৌঢ় যুবক কিশোর বা মৃত ওই মহিলা কাউকেই তারা চেনে না। টগরদের যা জীবন তাতে কারো জন্য শোক বা দুঃখ করার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। তাদের যাবতীয় কোমল অনুভূতি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তবু দু'জনেই টের পায়, কী এক কষ্টে বুকের ভেতরটা ক্রমশ ভার হয়ে উঠছে। নিজেদের অজান্তেই তাদের চোখ জলে ভরে যায়।

শুধু কোনোরকম প্রতিক্রিয়া নেই ঝড়ুর। মৃত্যু তার কাছে আলাদাভাবে লক্ষ করার মতো কোনো ঘটনাই নয়। একটা বিড়ি ধরিয়ে অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সে প্রৌঢ়কে বলে, 'আর দেঁড়িয়ে থাকবেন নি বাবা, কাজটা শ্যাষ করে ফ্যালেন। রোদ ফুটলে ঝাঁক বেঁইধে মড়া আসতে লাগবে। আপনাদের কাজ শ্যাষ হলে এট্টু জিরিয়ে লেবো। তারপর সারাদিনই তো ঝঞ্ঝাট।'

প্রৌঢ় উত্তর দেয় না। বিড় বিড় করে কী মন্ত্র পড়ে বড়ো ছেলেকে দিয়ে মুখাগ্নি করায়। সেটা শেষ হবার সঙ্গে ঝড়ু চিতায় আগুন ধরিয়ে দেয়। আর তখনই ব্যাকুল চিৎকার করে কিশোরটি মায়ের মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'মা, মা গো —'

প্রৌঢ় উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে, 'রাজা, রাজা —'

সে এগিয়ে আসার আগেই টগর এবং চাঁপা কিশোর অর্থাৎ রাজাকে টেনে সরিয়ে আনে। কিন্তু তাকে কি ধরে বাখা যায়! পাগলের মতো চিতার দিকে সে দৌড়ে যেতে চাইছে। কিন্তু টগররা যেতে দেয় না। শক্ত করে দু'জনে তাব দু হাত ধরে রাখে। অনেক কষ্টে তাকে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে বসায়। নিজেরা তার দু'পাশে বসে পিঠে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভারি গলায় বলে, 'কেঁদো নি বাবা, কেঁদো নি। বাপ-মা কি কারো চেরকাল থাকে।'

রাজা উত্তর দেয় না। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফোঁপাতেই থাকে।

শেষবাতে চিতার আগুন নিভে যায়। মহিলার শরীর বিলীন হওয়ার পর প্রৌঢ় তার দুই ছেলেকে নিয়ে নদীতে স্নান কবে আসে।

টগর এবং চাঁপার মধ্যে কয়েক ঘণ্টায় কিছু একটা ওলটপালট ঘটে গিয়ে থাকবে। তারাও প্রৌঢ়দের সঙ্গেই নদীতে নেমে ডুব দিয়ে এসেছিল।

প্রৌঢ় এবাব দশ টাকাব পাঁচটা নোট বার করে টগরদের দিকে বাড়িয়ে কৃতজ্ঞ সুরে বলে, 'এটা ধব। মায়েরা, তোমরা আমাদের জন্যে যা করেছ তার —' বলতে বলতে তার গলা বুজে যায়।

টগর এবং চাঁপা চমকে তিন হাত পিছিয়ে হাতজোড় করে বলতে থাকে, 'ওটা নিতে পারব নি বাবা। সারাটা জেবন লরকে মুখ গুঁজে আচি। রোজই তো গায়ে নোংরা মেখে রোজগার করি। একটা দিন না হয় বাদই থাক ছেলেদের নে ঘরে যান বাবা। এই শীতে ভেজা কাপড়ে থাকলে অসুক করবে। আমরা যাই—'

টগববা আব দাঁড়ায় না, লম্বা লম্বা পা ফেলে শেষরাতেব ঝাপসা অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতব অদৃশ্য হয়ে যায়।



ছদ্মবেশিনী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

খানিকটা আগে এক পশলা জোর বৃষ্টি এসে পথ-ঘাট খালি করে দিয়ে গেছে। রাত প্রায় সওয়া দশটা। রাস্তায় গাড়ি খুব কম। কাছাকাছি কোথাও ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে না। চেম্বার থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তার দত্ত চলে এলেন চৌরঙ্গিতে।

দুটো-একটা ট্যাক্সি আসছে, কিন্তু হাত তুললেও থামছে না। আবার বৃষ্টি আসতে পারে। ডাক্তার দত্ত ভুরু কুঁচকোলেন। তাঁব গাড়িটার ইঞ্জিন বোর করার জন্য দেওয়া হয়েছে। এক মাসের আগে পাওয়া যাবে না। এই একটা মাস খুব দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কলকাতা শহরে ট্যাক্সির ওপরে নির্ভর করা যায় না।

একটা বাসে উঠতে পারলেও হত। বাসের দেখা নেই। ট্যাক্সি না পেলে বাসেই উঠবেন ঠিক করে, তিনি রাস্তাটা পেরিয়ে দাঁড়ালেন ময়দানের দিকে। তাঁকে যেতে হবে উত্তরে।

কাছেই ময়দানের অন্ধকারে একটা বড়ো গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে। তার পরনে একটা লাল শাড়ি, তাই এই অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায় তাকে। কিন্তু ডাক্তার দত্ত তাকে দেখতে পেলেন না। যদিও তিনি অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন।

মেয়েটি তখন এগিয়ে এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল। ডাক্তার এবার লক্ষ করলেন তাকে। ভাবলেন, মেয়েটিও বোধহয় বাসে উঠবে।

কিন্তু বাস আসছে না। আবার বৃষ্টি নামল ছিরছির করে। মহা জ্বালাতন তো! ডাক্তারের সঙ্গে ছাতা নেই। তিনি দেখলেন মেয়েটিও ভিজছে। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। সে সোজা তাকিয়ে আছে ডাক্তারের মুখের দিকে। সে মিটিমিটি হাসছে।

একটা ট্যাক্সি উলটোদিকে আসতে আসতে গতি মন্দ করল। ডাক্তার সাগ্রহে এগিয়ে যেতেই ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বার করে জিজ্ঞেস করল, কোনদিকে?

ডাক্তার বললেন, আমহার্স্ট স্ট্রিট।

ড্রাইভার আর উচ্চবাচ্য না করে হুস করে জোরে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার এত রেগে গেলেন যে সম্ভব হলে তিনি ছুটে গিয়ে গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলতেন। কিন্তু সম্ভব হল না। তাকে পিছিয়ে এসে আবার বাস-স্টপেই দাঁড়াতে হল।

সেই সময় মেয়েটি খুব আলতো গলায় জিজ্ঞেস করল, যাবেন?

ডাক্তার শুনলেন যে মেয়েটি যেন তাঁকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি কোথায় যাবেন?

তিনি বললেন, আমি যাব আমহার্স্ট স্ট্রিট আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে।

—আপনি কোথায় যাবেন?

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে মেয়েটিকে দেখলেন ভালো করে। তার খোঁপায় ফুল গোঁজা। পায়ে সবুজ রঙের প্লাস্টিকের চটি। এই চটিতেই মেয়েটির জাত চিনিয়ে দেয়। কিন্তু ডাক্তার সারাক্ষণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, অনেকদিন তিনি এরকমভাবে একা বেশি রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। ঠিক ব্যাপারটা তিনি তখনো বুঝলেন না। তিনি ভাবলেন, ওর মাথায় কিছু গোলমাল আছে।

আপনি ছেড়ে তুমিতে নেমে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে একলা একলা কী করছ?

মেয়েটি বলল, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।

—এত রাত্রে? কেন?

মেয়েটি একবার ইচ্ছে করে বুকের আঁচলটা ফেলে দিয়ে আবার সেটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর বলল, রোজই তো দাঁড়িয়ে থাকি। যাবেন তো চলুন। ঘর না থাকে, আমার চেনা ঘর আছে।

এবার আর ডাক্তারের বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর মতন একজন ব্যস্ত সম্মানিত লোককেও রাস্তায় মেয়েরা এরকম কুপ্রস্তাব দিতে পারে? ডাক্তারের বয়েস পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে যুবকের মতন দেখায়। যদিও সব সময় তিনি মুখে একটা গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে থাকেন। ব্যস্ত ডাক্তারদের যেমন থাকতে হয়।

তিনি কড়া গলায় বললেন, তোমাকে আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে শব্দ করে হাসল। সে ডাক্তারের ব্যক্তিত্বকে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না।

— তোমাকে আমি কোথাও দেখেছি আগে?

— দেখতে পারেন। আমি তো রোজ এখানেই দাঁড়াই।

— কিন্তু আমি তো এখানে আগে কোনোদিন দাঁড়াইনি।

— তাহলে কে জানে।

ডাক্তার হঠাৎ একটু শিউরে উঠলেন। এবার মনে পড়েছে। মাসছয়েক আগে তাঁর চেম্বারে এইরকম সময়ই একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে বলেছিল, ডাক্তারবাবু শিগগির একবার চলুন।

সেটা ছিল গায়ে আগুন লাগার কেস। অফিসপাড়ার মধ্যেই একটা ফ্ল্যাটে রাত্তিরবেলা একটা মেয়ে নিজেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল নিজের শাড়িতে। চিকিৎসার বিশেষ কিছু ছিল না, পাঠাতে হয়েছিল হাসপাতালে। সে মেয়েটি বাঁচেনি। সেই মেয়েটির মুখখানা ছিল যেন ঠিক এই মেয়েটির মতন।

ডাক্তারের পক্ষে মৃত রোগীদের মুখ মনে করে রাখলে চলে না। কিন্তু ডাক্তারের মনে আছে ও মেয়েটির একটা কথা। মেয়েটি যন্ত্রণায় দারুণভাবে ছটফট করছিল। তাকে একটা সিডেটিভ দেবার আগে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি এরকম করলেন কেন? শাড়িতে আগুন লাগিয়ে...

মেয়েটি মুখ বিকৃত করে বলেছিল, ঘেন্না ধরে গেছে। পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

মৃত্যুপথযাত্রিনী সেই মেয়েটির মুখে ফুটে উঠেছিল তীব্র ঘৃণা! সেই কথাটাই ভোলা যায়নি।

সেই মেয়েটিই যেন ফিরে এসে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিশোধ নিতে। ডাক্তারের মনে হল, স্বয়ং মৃত্যুই যেন লাল রঙের ওপর শাড়ি পরে দাঁড়িয়েছে রাস্তার ওপরে।

মেয়েটি বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, যাবে কিনা বল।

ডাক্তার খপ করে মেয়েটির একটা হাত চেপে ধরে বললেন, চল!

মেয়েটি বলল, কতক্ষণ? একঘণ্টা?

ডাক্তার বললেন, ওসব জানি না, চল আমার সঙ্গে!

--- অত জোরে হাত ধরেছেন কেন? যাচ্ছিই তো। কতদূর যেতে হবে? সেই আমহার্স্ট স্ট্রিট পর্যন্ত যেতে পারব না।

ডাক্তার কোনো উত্তর দিলেন না, হাতও ছাড়লেন না মেয়েটির। আবার রাস্তা পেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন নিজের চেম্বারের দিকে।

যে দু-একটা লোক চলছিল পথ দিয়ে, তারা অবাক হয়ে তাকাল।

ডাক্তারের ভ্রুক্ষেপ নেই।

চেম্বারে তাঁর সহকারী এবং কম্পাউন্ডার আগেই বাড়ি চলে গেছে। রয়েছে শুধু দারোয়ান, সে রুটি পাকাতে বসেছিল।

হঠাৎ ডাক্তারকে একটি মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ফিরে আসতে দেখে সে বিস্মিত এবং তটস্থ হয়ে উঠল।

ডাক্তার বললেন, দরজার তালা খুলে দে!

ভেতরে এসে সব ক'টা আলো জ্বেলে তিনি পেসেন্টের চেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে হুকুমের সুরে মেয়েটিকে বললেন, বসো।

মেয়েটি আলগাভাবে বসে কনুইতে থুতনি ভর দিল।

আলোতে তিনি মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন ভালো করে। বছর তিরিশেক বয়েস মেয়েটির, রোগা, মুখে সস্তা পাউডার। চোখের নীচে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির কালি।

তিনি আ৲.র হুকুম করলেন, উঠে দাঁড়াও।

বিনা প্রতিবাদে সে উঠে দাঁড়াল। তিনি আঙুল দিয়ে তার থুতনি উঁচু করে দেখলেন গলা। দেখলেন হাত দুটো। তারপর মেয়েটিকে ঘুরিয়ে দিলেন। দেখতে লাগলেন পিছন দিকটা।

মেয়েটির পিঠে, কোমর আর ব্লাউজের মাঝখানটায় একটা ক্ষত। বেশ পুরনো। তিনি আঙুল দিয়ে তার ব্লাউজটা একটু উঁচু করে তুলে দেখলেন ওরকম ক্ষত আরেকটা রয়েছে।

—কতদিন এ লাইনে এসেছ?

—এই তো সেদিন। একমাসও হয়নি। আমি এ লাইনে নতুন।

—মিথ্যে কথা বলো না।

—মাইরি বলছি, রাস্তায় দাঁড়িয়েছি বলে খাস্তা মাল নই।

—চুপ করো! পিঠের ওই ঘাগুলো কতদিনের?

—ওগুলো ঘা নয়। দেয়ালে পিঠ ছড়ে গিয়েছিল। এক মুখপোড়া নিয়ে গিয়েছিল এক ভাঙা বাড়িতে।

— কতদিন ধরে ওরকম হয়ে আছে?

— কে জানে। না, না, এই দুতিন দিন।

— ফের বাজে কথা! কতজন পুরুষের সর্বনাশ করেছ এর মধ্যে?

— আ মরণ! সব সর্বনাশ তো আমারই! যাক এত কথা দিয়ে কী হবে? শুধু শুধু রাত হয়ে যাচ্ছে।

রুগিদের পরীক্ষা করার জন্য যে উঁচু বেঞ্চের ওপর বিছানা পাতা আছে সেটা দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, ওখানে শুয়ে পড়।

মেয়েটি ছোট্ট একটা হাই তুলল। তারপর হাসল চওড়া ভাবে। বুকের আঁচল ফেলে দিয়ে সে ব্লাউজের বোতাম খুলতে লাগল।

ডাক্তার বললেন, জামা খুলতে হবে না। যেমন আছ তেমনি শুয়ে পড়।

মেয়েটির আঙুল থেমে গেল ব্লাউজের বোতামে। তারপরই ফট করে খুলে ফেলল শাড়িটা। তার সায়াটার রং ক্যাটকেটে সবুজ।

— এ কী করলে?

— বাঃ শাড়ি খুলে রাখব না? ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাবে।

ডাক্তারও হেসে ফেললেন এবার। গলার আওয়াজ নরম করে বললেন, আমি তোমায় পরীক্ষা করে দেখব। তোমার শরীরে অসুখ আছে। চিকিৎসার দরকার।

তিনি শাড়িটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন মেয়েটির গায়ে। মেয়েটি উঠে বসে বলল, আমার চিকিৎসার দরকার নেই। এত রাতে উনি আমার চিকিৎসা করতে এলেন! ভারী আমার ইয়ে!

— আমি ডাক্তার, রুগি দেখলে আমি চিকিৎসা না করে পারি না।

— কে বলেছে আমি রুগি? বাজে কথা বলবে না। বেশি ডাক্তারি ফলাতে এসেছে! তোমার মতন কত রকম ডাক্তার আমি পার করে দিয়েছি। আর ফষ্টি করতে হবে না, এবার আলো নিভিয়ে দাও।

— আমি সে জন্য তোমাকে এখানে ধরে আনিনি। তুমি রোজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকো.... তুমি মানে, তুমি রোজ ক'জন পুরুষমানুষের সঙ্গে .....

— তা জেনে তোমার লাভ? ওসব কথা বলে কি রাত কাবার করবে নাকি?

— জিজ্ঞেস করছি, কারণ আমার দরকার আছে।

— দুজন তিনজন... কোনোদিন একজনও যেমন জোটে না। আজ যেমন তুমিই প্রথম।

ডাক্তার মনে মনে আবার শিউরে উঠলেন। মেয়েটির খুব সম্ভব সিফিলিস আছে। প্রতিদিন দু-তিনজন পুরুষের মধ্যে সেই রোগের বীজাণু ছড়িয়ে চলেছে। এই কি প্রতিশোধ? সেই আগুনে-পোড়া মেয়েটি যেমন তীব্র ঘৃণা দেখিয়েছিল পুরুষ জাতের ওপরে। যেন সেই মেয়েটির আত্মা এসে প্রতিশোধ নিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আবার বললেন — শোন, তুমি যে এই রোগ অন্যদের মধ্যে ছড়াচ্ছ তাই নয়, তোমার নিজেরও সাংঘাতিক বিপদ হবে, শরীরটা পচে যাবে—।

এই কথাটা শুনেও হাসতে লাগল মেয়েটি। যেন একটা চমৎকার ঠাট্টা। সে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। তারপর শাড়িটা সরিয়ে ফেলে নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল আমায় দেখতে খারাপ? তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের মুখটা ধরে ফেলে বলল, এসো না বাবা! দেরি করছ কেন?

ডাক্তার চমকে পিছু হটে ছাড়িয়ে নিলেন নিজেকে। তাঁর মায়া হল। মেয়েটি বড়ো সরল। ও জানে না মৃত্যু কত ভয়াবহ। ওকে অন্তত একবার বাঁচবার সুযোগ দিতে হবে।

তিনি বললেন—শুয়ে থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি।

চেম্বারের পাশেই আর একটি ঘরে ডাক্তারের নিজস্ব প্যাথোলজিক্যাল ইউনিট। সেখান থেকে তিনি সিরিঞ্জ আর টেস্টটিউব নিয়ে এলেন।

মেয়েটি শুয়ে শুয়েই দেয়ালে ঝোলানো একটা ক্যালেন্ডারের ছবি দেখছিল পাতা উলটে উলটে। জার্মানির রাইন নদীর পাড়ের দৃশ্য। কালো অরণ্য। নীল রঙের তুষারের ওপর হলুদ স্কার্ট পরা এক দেবদূতীর মতন তরুণী।

ডাক্তার বললেন — দেখি তোমার হাতটা।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিল।

-- তোমার রক্ত নেব একটু। ভয় পেয়ো না!

মেয়েটি কোনো আপত্তি করল না এবার। চুপ করে রইল।

ডাক্তার স্পিরিট ভেজানো তুলো দিয়ে হাত ঘষলেন মেয়েটির। তুলোটা ময়লা হয়ে গেল। মেয়েটি নিয়মিত সাবান মাখে না। যেখানে সেখানে শোয়। তার হাতে তো ময়লা থাকবেই।

তারপর তিনি শিরাটা খুঁজে নিয়ে সিরিঞ্জের সুচটা ঢুকিয়ে দিলেন। মেয়েটি কোনো ব্যথার শব্দ উচ্চারণ করল না। বরং সে পাশ ফিরে ডাক্তারের চুলের মধ্যে অন্য হাতটা ডুবিয়ে দিয়ে বলল — এত বড়ো বড়ো চুল, তুমি অনেকদিন চুল কাটোনি বুঝি?

ডাক্তার একটু হকচকিয়ে গেলেন। এরকম কথা তাঁকে কেউ বলে না কক্ষনো। তাঁর স্ত্রীও ডাক্তার। দুজনেই সর্বক্ষণ ব্যস্ত। পয়সা রোজগারের মহোৎসবে দুজনে মেতে আছেন, কথা বলারও সময় নেই।

ডাক্তার বললেন — হাত সরাও।

মেয়েটি তবু হাত সরাল না। খুক্‌খুক্ করে হাসতে লাগল।

সিরিঞ্জটায় রক্ত ভরে ডাক্তার সরে এলেন। চলে গেলেন পাশের ঘরে। একটা স্লাইডে কয়েক ফোঁটা রক্ত নিয়ে সলিউশান মিশিয়ে সেটা ধরলেন মাইক্রোস্কোপের নীচে। তাঁর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

পরে ভালো করে ডব্লু আর দেখতে হবে। কিন্তু এখনই তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে গেছেন যে মেয়েটির সিফিলিস আছে।

চেম্বারে ফিরে এসে তিনি বললেন—দিনে দুবার পাঁচ লাখ করে অন্তত দশ দিন পেনিসিলিন ইঞ্জেকশান নিতে হবে তোমাকে। সকালে বিকেলে। ইচ্ছে করলে আমার এখানে এসে ইঞ্জেকশান নিয়ে যেতে পার। আমার কম্পাউন্ডারকে বলে দেব।

মেয়েটি চোখ বড়ো বড়ো করে শুনল। কোনো উত্তর দিল না।

— এবারে উঠে পড়ো, আর শুয়ে থাকার দরকার নেই।

— হয়ে গেল?

— মেয়েটি উঠে পা ঝুলিয়ে বসল। খোলা শাড়িটা সরিয়ে রাখল পাশে। অকারণেই একবার শায়ার দড়িটা খুলে আবার বাঁধল। ব্লাউজের একটা বোতাম খোলা ছিল, টিপে দিল সেটা। দু'হাত তুলে চুল ঠিক করল। তারপর মুচকি হেসে নেমে দাঁড়াল মাটিতে। শাড়িটা পরতে লাগল এবার।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন— কোথায় থাকো তুমি?

— বেলেঘাটায়।

— এত রাত্রে সেখানে ফিরতে পারবে?

— কেন পারব না? রোজই তো ফিরি। আমার তো গাড়ি-ঘোড়া লাগে না, আমি হেঁটে যাই। দাও।

— কী দেব?

— বাঃ, আমার টাকা দেবে না?

ডাক্তার আপাদমস্তক চমকে উঠলেন। এ মেয়েটা টাকা চাইছে? তাঁর কাছে কেউ কখনো টাকা চায় না। সবাই দেয়। এ মেয়েটা অকৃতজ্ঞ এমন? তিনি বিনাপয়সায় ওর পরীক্ষা করলেন। অন্য রুগি হলে, অন্তত পঞ্চাশ টাকা চার্জ করতেন।

তিনি বললেন—কীসের টাকা?

—বাঃ আমার টাকা দেবে না? আমার সময়ের দাম নেই?

ডাক্তার চটে গেলেন এবার। একটা সামান্য রাস্তার মেয়ে, সে বলে কিনা তার সময়ের দাম! সে জানে না, কত বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে সে কথা বলছে। সন্ধেবেলা লাইন দিয়ে রুগিরা বসে থাকে। এক একদিন রুগিরা ফিরেও যায়। তাঁকে এই মেয়েটা বলে কিনা সময়ের দাম!

— যাও, বাইরে যাও। আমি দরজা বন্ধ করব।

— আ-হা-হা, যাও মানে? আগে আমার টাকা দাও। এতক্ষণ ফুর্তি করলে।

— ফুর্তি?

— আলবত! কেউ শুয়ে শুয়ে ফুর্তি করে, কারুর শুধু জড়াজড়ি আর চুমু খেয়েই ফুর্তি পুরো হয়ে যায়। তোমার ফুর্তি দেখাদেখিতে। তুমি ছুতো করে এতক্ষণ আমায় দেখলে। আরও কিছু দেখতে চাও তো বলো, দেখিয়ে দিচ্ছি।

-- চুপ! এসব কথা আমি একদম শুনতে চাই না।

— চোখ রাঙিয়ো না। আমিও রোজগার করতে বেরিয়েছি। তুমি না ডাকলে আমি অন্য লোকের সঙ্গে যেতুম। দাও, আমার টাকা দাও।

— বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

মেয়েটি এবার অন্য মূর্তি ধরল। কোমরে হাত দিয়ে বেঁকে দাঁড়াল সাপের মতন। বিষাক্ত চোখে তাকিয়ে বলল—আমার টাকা দেবে না? আবার চোখ রাঙাচ্ছ? দেখবে আমি টাকা আদায় করতে পারি কিনা? আমার ন্যায্য পাওনার টাকা। আমার একঘণ্টার দাম! বাড়িতে কি আমি শুধু হাতে ফিরব? তোমার মতন লোক ঢের দেখেছি আমি। টাকা দেবে না ফুর্তি করবে? এঃ! মামার বাড়ি।

—চুপ, চুপ!

— কেন চুপ করব। পকেটে নেই কানাকড়ি, দরজা খোল বিদ্যেধর। কেন ডেকে এনেছিলে আমায়? আমার হক্কের টাকা না পেলে আমি পাড়া মাথায় করব।

মেয়েটি ক্রমশ গলা চড়াচ্ছে। ডাক্তার সন্ত্রস্ত হলেন। দারোয়ান আছে বাইরে। এ ছাড়া পাশের বাড়ির লোকজন শুনে ফেলতে পারে। রাত দশটার পর ডাক্তার কোনোদিন চেম্বারে থাকেন না। এখন যদি লোকজন টের পায় যে তিনি এত রাত্রে একটা খারাপ মেয়েছেলের সঙ্গে খালি চেম্বারে রয়েছেন —

পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তিনি মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করলেন—কত?

— আমার একঘণ্টার রেট পনেরো টাকা!

থরে থরে সাজানো নোটগুলোর মধ্য থেকে দু'খানা দশটাকার নোট আলগোছে তুলে নিয়ে তিনি মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিলেন।

মেয়েটি বলল—আমার কাছে খুচরো নেই।

—থাক!

মেয়েটি খপ করে দশ টাকার নোট দুটো নিয়ে আট ভাঁজ করে ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর তার রাগ-করা মুখেই ফিকে হাসি ফুটিয়ে বলল—চলি।

ডাক্তার তার দিকে ফিরেও তাকালেন না।

মেয়েটি বেরিয়ে যাবার পরও তিনি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চেম্বারের মধ্যে। তিনি আরও পরে বেরুবেন। যাতে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর আর দেখা না হয়। রাগে তাঁর শরীর জ্বলছে। কুড়িটা টাকা এমন কিছু নয়। কিন্তু মেয়েটি বেইমানের মতন তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিল।

রক্ত নেবার সময় মেয়েটিকে স্পর্শ করতে হয়েছিল বলে তিনি ঘৃণা বোধ করলেন এখন। বেসিনে গিয়ে হাত ধুতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, সেই মেয়েটির কথা যে নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়েছিল। তার ঝলসানো মুখেও ফুটে উঠেছিল তীব্র ঘৃণা। পুরুষদের সম্পর্কে। হাসপাতালে গিয়েও মেয়েটি বাঁচেনি। মেয়েটির স্বামী সেদিন তাঁকে ফি দিয়েছিল বত্রিশ টাকা। তিনি একটু আপত্তি করেছিলেন, ঠিক নিতে চাননি। তবু ওরা জোর করে দিল। রোগের চিকিৎসা করাই ডাক্তারের পেশা, জীবন-মৃত্যুর ভার তার হাতে নয়। তিনি এরকম ভেবেছিলেন।

মৃত্যু আজ ছদ্মবেশে এসে তাঁকে একটু শিক্ষা দিয়ে গেল।

শরবতির পাশ ফেরা



সৈয়দ শামসুল হক

রমণীটি আমাদের শহরে আজ এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, রমণীর নাম শরবতি। শরবতিকে আমরা পাগল বলেই জানতাম, জলেশ্বরীর পথেঘাটে আমরা তাকে বহুবার বহুদিন দেখেছি, তার সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হবার কোনো কারণই আমাদের ছিল না, সে কোথা থেকে এসেছে, কোন নদীতীরে কোন গাঁয়ে কোন জননীর কোলে তার জন্ম, আমরা জানি না কোনো বৃত্তান্ত; সত্য এই, শরবতির মতো পথে-ঘুরে-বেড়ানো মাথা-খারাপ একটি রমণীর বিষয়ে জানবার আগ্রহ কারই বা থাকে?— এই শরবতি আজ আমাদের মনোযোগের সবটুকু শুষে নেয়।

হজরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনেব মাজারে উঠে যাবার চওড়া সিঁড়িতে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন অবস্থায় শরবতিকে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখা যায়, সে নিদ্রিত কিম্বা নিদ্রিত নয়, বোঝা যায় না; তার চোখ মুদিত, ঠোঁটে পাতলা হাসি, হাসিটুকু যেভাবে খেলা করছে তাতে মনে হয় শববতি জেগে আছে, কিন্তু তার দেহ নিস্পন্দ, হাত পা এমন শিথিল যেন বা সে গভীর ঘুমে বহুক্ষণ আগেই গলে গিয়েছে।

শরবতি কখন এসে মাজারের সিঁড়িতে অবস্থান নেয, কখন সে তাব বস্ত্র ত্যাগ করে, কখন সে শুয়ে পড়ে, কেউ কিছু বলতে পারে না। শরবতিকে হঠাৎ সকলেই প্রত্যক্ষ করে ওঠে, যেন জাদুবলে, আজ এই ঝনঝনে দুপুর বেলায়, সনসনে রোদের আলোয়, জোহরের নামাজের ঠিক পরেপরেই। মুসুল্লিদের চোখেই পড়ে প্রথম, তাঁরা নামাজ শেষে মাজারের আঙিনা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেযে সড়কে নামবেন, সিঁড়ির ধাপে শরবতি শুয়ে, শরবতিকে মাড়িয়ে দিতে দিতেও তাঁরা কোনোবকমে সামলে নেন নিজেদের, দাঁড়িয়ে যান, স্থির হয়ে যান, কিছু একটা চিৎকার করবার জন্যে তাঁরা হাঁ করেন, কিন্তু কোনো স্বর বেরোয় না, যেন বা জগতে সমস্ত কিছুই শীতল ও প্রস্তরীভূত হয়ে যায় অকস্মাৎ।

চোখ ফিরিয়ে নেয়া উচিত হয়, কিন্তু চোখ ফেরে না, চোখ রমণীর দেহ থেকে ফেরে না, ফিরলেও আবার ফিরে যায় রমণীরই দেহের ওপরে। ক্রমে ক্রমে জলেশ্বরীর যত চোখ আছে সব চোখ শরবতির উলঙ্গ দেহের উপরে ওড়াউড়ি করে, যেন বা হলদে প্রজাপতির বুনো ফুলেব চারদিকে। ভিড় বাড়ে, মানুষেরা পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করে, চাপা অসহিষ্ণুতায় ফেটে পড়তে চায় পুরুষেরা, বালকেরা বয়স্কদের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যাবার চেষ্টা করে অনবরত, বৃদ্ধেরা আশা করে পথ তাদের জন্যে ছেড়ে দেয়া হবে যাতে তারা গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে পারে কিন্তু তারা বড়ো নিরাশ হয়; অচিরে সিঁড়িতে তিল ধারণের জায়গা আর থাকে না, অচিরেই মাজারের সমুখে সড়কটিতে এখন জনস্রোত স্তম্ভিত হয়ে থাকে, দু-চারটে ছোটোখাটো মারামারি হাতাহাতিও হয়ে যায়, কিন্তু সবই বড়ো চাপা স্বরে মৃদুভাবে, নিশ্বাস চেপে, চোখে চোখেই যতটা সম্ভব; হয়তো এই কারণেই শরবতির ঘুম ভাঙে না, সে আগের মতোই নিশ্চল শুয়ে থাকে, তার চোখ মুদিত, ঠোঁটে সেই পাতলা হাসিটি খেলা করে।

সিঁড়ির পাশেই বুড়ো অশথ গাছটি এতক্ষণ তবু শরবতির উর্ধ্বাঙ্গে ছায়া দিচ্ছিল, হঠাৎ সে ছায়াও সরে যায়, যেন অশথ গাছটিও শরবতির শরীর দেখবার জন্যে ছায়া সরিয়ে ঝুঁকে পড়ে। আমরা সকলেই দেখি এবং দেখে যেতে থাকি— এক জোড়া মাংসপিণ্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রোদ, ওই যুগল পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই এখন চোখে পড়ে না আমাদের, আমরা দেখি কীভাবে রোদে পুড়ে যাচ্ছে, লাল হয়ে উঠছে, শক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের স্পষ্ট মনে হতে থাকে যে আমাদেরই চোখের সমুখে স্তন দুটি ক্রমশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে।

শরবতি নির্লজ্জের মতো চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, একটি রমণী বস্ত্রহীন অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, এক

যুবতি একটি পবিত্র জায়গায় শরীর সাজিয়ে শুয়ে আছে—যেনবা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। জনতা চঞ্চল হয়ে পড়ে, আমাদের অনেকেই কী করবে বুঝে না পেয়ে আপন আপন হাত চোখের সমুখে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দ্যাখে যেন এগুলো কি সত্যই আছে অথবা জানতে চাই এর ব্যবহার কি আমরা বিস্মৃত হয়ে গেছি ইতোমধ্যেই?

আমরা আবার তাকাই, ফিরে তাকাই শরবতির দিকে, আমরা কি জানতাম শরবতির যৌবন এখনো অটুট এবং তার শরীরের রঙ কাঁচা হলুদের মতো? যুবকেরা, যারা রমণীর অভিজ্ঞতায় এখনো পূরিত নয় তারা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে এবং শ্রুত সমস্ত উপকথার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে থাকে; প্রৌঢ়েরা, যারা রমণীর সঙ্গে বহুকাল এই সংসার ছেনে দেখেছে এবং এখনো মাঝে মাঝে ধারাজলের শব্দ শুনে যাদের কান খাড়া হয় তারা প্রশস্ত চোখে তাকিয়ে থাকে, কারণ তারা জানে দর্শন ছাড়া এই দৃশ্যের আর কোনো পরিণতি নেই। এবং আমাদের ভেতরে যারা এইমাত্র জোহরের নামাজ পড়ে উঠে এসেছি, তাদের অনেকেই এখন বড়ো পর্যুদস্ত হয়ে পড়ি; এমনিতেই সংসারের সঙ্কট, রাষ্ট্রের সঙ্কট, সমাজের সঙ্কট — তা থেকে মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের দিকে অবনত হওয়াটা বড়ো কঠিন কাজ, মন কিছুতেই ফিরতে চায় না, মাথা ঠিক নত হতে চায় না, স্ফুলিংগের মতো আমাদের বিরক্তি ও হতাশাগুলো চারদিকে একরোখা ওড়ে, তারপর যদিও বা কোনো ক্রমে মন স্থির করা গেল, যদিও বা এক ধরনের একাগ্রতা রচনা করা গেল, নামাজটি শেষ করা গেল, নামাজ থেকে উঠেই যদি চোখের ওপর দেখা যায় জীবন্ত এক যুবতির নগ্ন এক দেহ, হোক সে পাগল কিংবা অপরিচ্ছন্ন, কার মাথা ঠিক থাকে? নামাজিরা অতএব দ্রুত স্থান ত্যাগ করে এবং নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে থাকে, যে হজরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মতো একজন আউলিয়ার মাজারে এ ধরনের ঘটনার মোকাবিলা কীভাবে করা উচিত। কেউ বলে, অবিলম্বে রমণীটিকে প্রহার করে বিদায় দেওয়া কর্তব্য হয়। আবার কেউ বলে, পাগলকে সর্বদা পাগল বলে ধরে নিতে নেই, বহু সাধক পাগল বেশে দেখা দেন বটে, এবং কে জানে শরবতি কোনো কামেল তাপসী কিনা? কারণ তার পূর্ব পরিচয় আমরা কেউই জানি না, একদিন সে জলেশ্বরীতে উদ্ভিদের মতো মাটি।

দূরে বা নিকটে কেউই শেষ পর্যন্ত কোনো পথ দেখতে পায় না, শরবতি শুয়েই থাকে, তার চোখ আমরা আগেই বলেছি মুদিত, এখনো সেই মুদিত এবং এখনো সেই পাতলা হাসিটি ঠোঁটের ওপর খেলা করছে। ধীরে আমাদের সন্দেহ হয়, শরবতি আসলে জেগে আছে—ঘুমোয়নি, ঘুমোয় যে নি ঠোঁটের ওই পাতলা ও সচল হাসিটি তার প্রমাণ; এমনও হতে পারে যে চোখের পাতা ঈষৎ ফাঁক রেখে সে আমাদের সকলই দেখে নিচ্ছে, কোনো একটা কারণে সে আমাদের এই আতান্তরে ফেলেছে আজ।

শরবতি কেন এই খেলা খেলে? শরবতি কেন এই পবিত্র জায়গাটিই বেছে নেয় তার খেলার জন্যে? এবং কেন সে এমন সময় বেছে নেয় যখন কেবল শেষ হয়েছে দিবাভাগের দীর্ঘতম নামাজ? যে কোনো খেলাতেই দুই পক্ষ থাকে, একপক্ষ যদি শরবতি হয়, তবে অপর পক্ষ কে? আমরা গভীর একটা সঙ্কটের ভেতরে পড়ে যাই। হজরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজারে যাবার সিঁড়ি বলেই জায়গাটি যে বিশেষভাবে পবিত্র, এই ধারণাটিও আমরা পরীক্ষা না করে আর গ্রহণ করতে পারি না; কারণ, শরবতি যদি অন্যত্র, ধরা যাক কাছারির মাঠে হাকিম সাহেবের এজলাসে উঠে যাবার সিঁড়িতে এমনি উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকত, কী হত? নামাজিরা কি বর্তমানের মতোই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়তেন? না, হাকিম সাহেবের এজলাসের সিঁড়িতে নগ্ন যুবতি শুয়ে থাকাটা তেমন কিছু মোটেই নয় বলে মুসুল্লিরা আমাদেরই মতো ভিড় করে শরবতিকে দেখতেন, দূরে সরে যেতেন না?

নামাজিরা একে একে সকলেই আবার ফিরে আসেন সিঁড়ির ওপরে, কেউ দ্রুতবেগে, কেউবা ইতস্তত করতে করতে, কেউ অপরের হাত ধরে যেনবা ভর না দিয়ে চলবার ক্ষমতা তার নেই। আমরাও শরীরের ভার এক পা থেকে অপর পায়ে বদল করে নিই, আমরাও নতুন জোট ও গোষ্ঠী রচনা করে শরবতিকে ঘিরে দাঁড়াই এবং দাঁড়িয়ে থাকি। আমরা কীসের আশায়, কী আকাঙ্ক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকি জানি না, কিংবা এ প্রশ্ন আদৌ আমাদের মনে উদিত হয় না।

আমরা কেউ আমাদের অবস্থান ত্যাগ করি না, আমরা ক্রমশ শরবতির স্তনযুগলের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠি, সত্যই যেন ওই যুগলপিণ্ড এই কিছুক্ষণের ভেতরেই অনেকখানি বড়ো হয়ে গেছে, আমরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকি। আমাদের প্রত্যেকের মনে এই রমণীটি বিশেষ ও ব্যক্তিগত হয়ে ধরা দেয়। বস্তুত শরবতি আর একটি রমণী এখন থাকে না, উপস্থিত যতজন তাকে ঘিরে আছে ঠিক ততজন শরবতি দুপুরের রোদের

ভেতরে এখন উলঙ্গ হয়ে চিৎ ও চমৎকার শুয়ে থাকে। দুটি পা টানটান সমুখে ঠেলে দেয়া, কিন্তু পায়ের অগ্রভাগ পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে বলে দুপায়ের পাতা দুটি ঈষৎ যুক্ত হয়ে ত্রিভুজের ছোট্ট একটি শূন্যক্ষেত্র রচনা করেছে, নাভির থেকে ব্যাঙের ছাতার মতো মাংস ফুলে ঠেলে উঠেছে, তার নীচেই পাটের ফেঁসোর মতো লালচে কেশ— যেনবা প্রকৃতি নিজেই নিয়েছে ভার এবং সমস্ত লজ্জা ঢেকে রেখে আছে, বুকের পরে কাঁচা হলুদের রঙ যেন প্রতিযোগিতা করছে রোদের সঙ্গে— রমণীদেহের সমস্ত কিছুই বিশ্বের সমস্ত কিছুর প্রতিযোগী বটে, ঠোঁটে পাতলা হাসি, অবিকল যে হাসি আমরা যৌনকাতর হয়ে সমস্ত রমণীর ঠোঁটে প্রত্যক্ষ করি।

আমরা অগ্রসর হই।

ঠিক সেই মুহূর্তে শরবতি পাশ ফেরে, সে আমাদের দিকে পাশ ফেরে, তার নীচের পা টানটান থাকে, ওপরের পা ঈষৎ গুটিয়ে এসে স্থির হয় এবং বুকের কাঁচা হলুদ যেন ঢল হয়ে বহে যেতে থাকে। শরবতির স্তনদুটি পাশ ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে পড়ে; আমাদের জননীরা কতবার পাশ ফিরেছেন, সত্য সত্যই আমাদের জননীরা যেন এখন আবার প্রকাশিত হয়ে পাশ ফেরেন এবং স্বাস্থ্য ও বলের দিকে আহ্বান করেন।

শরবতির ঠোঁটের সেই হাসিটি বিদ্যুতের মতো খেলা করে ওঠে।

আমরা ভীত হয়ে পড়ি, কারণ আমরা বহুকাল আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছি, আমরা আমাদের জননীকে ব্যবহার করেছি বটে, অথবা ব্যবহৃত হতে দিয়েছি।





জলবেশ্যা

আল মাহমুদ

পেঁয়াজ আর রসুনের মরশুমে লালপুর হাটের চারপাশের গ্রামগুলোতেও পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। হাটের দু'মাইল দূর থেকেও বাতাসে কাঁচা পেঁয়াজের ঝাঁঝালো গন্ধটা বেপারিদের নাকে এসে লাগে। গন্ধটা তখন আর শুধু পেঁয়াজের গন্ধ থাকে না। রসুনেরও একটা অহংকারী গন্ধ আছে যা বাতাসে পেঁয়াজের গন্ধের সাথে মিশে বাতাসকে স্বাদযুক্ত করে তোলে।

এ ধরনের কাঁচা মশলার মরশুমে শুধু যে যে বাজার আর বাতাসেই গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ে তা নয়। হাটের চারপাশের এলাকার মানুষের শরীরেও এ গন্ধটা থাকে। কথা বললে তাদের মুখ থেকেও পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বেরোয়। তাদের ঘামে, বগলের নীচের চুলে গন্ধটা এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে, কোনো লোক যে পেঁয়াজ-রসুনের ব্যবসা করে না, তার পক্ষে এ পরিবেশে তিষ্ঠানো দায়।

হাটের মধ্যে, মানুষের পায়ে-চলা পথের পাশে পেঁয়াজের খোসার আস্তরণ জমে এমন উঁচু হয়ে থাকে যে কাঁচা মসলার মরশুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবারের হাটের পসারিরা পেঁয়াজ-রসুনের স্তূপীকৃত খোসার ওপরই তাদের বেসাত বসায়। এর ওপরই কেনাবেচা চলে। যারা চার-পাঁচ মাইল দূর থেকে হাটে তাদের বেসাত নিয়ে আসে, তাদের অনেকেই বেচাকেনা শেষ করে রাতে ঘরে ফিরতে পারে না। একে তো তারা হাট করে এমনিতেই ক্লান্ত থাকে, তার ওপর রাতেরবেলায় মেঘনা পাড়ের পূর্বাঞ্চলটা কোনো বেপারির জন্যই তেমন নিরাপদও নয়। চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে। দিনের বেলাতেই বেপারিরা চোরবাটপারের ভয়ে দল বেঁধে হাটে মাল নিয়ে আসে। চার-পাঁচজন বেপারির এক একটি ছোটো ছোটো দল হাটবারের সকাল থেকে মাধান অবধি মাথায় পসার নিয়ে হাটে আসতে থাকে। রাত বারোটা পর্যন্ত তাদের দাম-দস্তুর, মাল গছানো, ফাও মারা চলতে থাকে। রাত দুটোর দিকে হাট যখন স্তিমিত হয়ে আসে, হাটের নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা কেনাকাটা শেষ করে গাঁয়ে ফিরে যায়, বেপারিরা তখন তাদের বড়ো বড়ো কুপির আলোয় পয়সা গোনা শুরু করে। আর এই হিসেবের কাজটা তারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলে। তখন তাদের চেহারায়, হাতের নড়াচড়ায় এমন একটা সতর্কতার পরিচয় ফোটে দেখলে মনে হবে, কোনো অদৃশ্য তস্কর এখুনি বুঝি তাদের পুঁজি কেড়ে নেবে। খুতির মুখটা ভালো করে বেঁধে কোমরে না পেঁচানো পর্যন্ত তাদের মন থেকে অস্বস্তিটা দূর হয় না। প্রত্যেক বেপারির বাঁ কাঁধে সাবানে-কাচা একটা করে আধময়লা শার্ট থাকে। সাধারণত মাল নিয়ে হাটে আসার সময় কিংবা বেচা-বিক্রির ঝামেলায় তারা জামাটা পরে না। পরে তখনই, মাল কাবারের পর খুতিটা কোমরে বাঁধা হয়ে গেলে হাটের হোটেলে ভাত খাওয়ার খুচরা দু-তিনটে ভাঙা টাকা রাখার যখন আর জায়গা থাকে না। তখন তারা তাদের কাঁধের ঘামে-ভেজা কুঁচকানো শার্ট কিম্বা পিরহানগুলো গায়ে দিয়ে পকেটে ভাতের টাকাটা রাখে। তারপর বিড়ি ধরাতে ধরাতে আজিজ মিয়ার ভাতের দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে।

রাত বারোটার পরই আজিজ মিয়ার চুলা থেকে মেঘনার তাজা বোয়াল কিম্বা গজার মাছের ঝাল সরুয়ার প্রকাণ্ড ডেগটা নামে। কাঁচটা মশলার বেপারিদের মনমতো খাবার পরিবেশনের ব্যাপারে আজিজ মিয়ার বেশ নামডাক আছে। আগুনের মতো ঝাল ঝোল দিয়ে বেপারিরা যখন লাল করে ভাত মাখিয়ে নিয়ে নলা তুলতে থাকে আজিজ মিয়া তখন আদবের সাথে তার বসার গদিটা ছেড়ে নেমে এসে খদ্দেরদের খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়। জগ থেকে কারো গেলাসে পানি ঢেলে দিতে দিতে ছোকড়া চাকরটাকে বলে, 'কান্দু বেপারিরে আরও দুইডা কাঁচামরিচ দে।' কিংবা পাশের ভোজনরত বেপারির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'খালেক ভাইয়ের পাতে একটু সওরা দে রইস্যা।' দোকনের ছোকরাটা মহাজনের কথা শেষ হবার আগেই গজার মাছের 'ভাঙাচুরার' কড়াই থেকে একহাতা তপ্ত ঝোল খালেক বেপারির পাতে ঢেলে দেয়। খালেক বেপারি 'বহু বহু' করতে করতে

টিপা নুনের মুছি থেকে নুন নিয়ে ভাতের ওপর ছিটাতে ছিটাতে পরিতৃপ্তির হাসিতে ঘর্মাক্ত মুখটা ভরিয়ে তোলে। খাওয়া হয়ে গেলে বেপারিরা পেঁয়াজ রসুনের খোসার আস্তর পড়ে থাকা হাটের আনাচে-কানাচে তাদের ছালা গামছা বিছিয়ে রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দেবার জন্য গোল হয়ে বসে আড্ডা জুড়ে দেয়। কেউ তাস খেলে। কেউ আবার দলের কাছে খুতিটা নিরাপদ রেখে পেঁয়াজের বাকলের বিছানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

এ হল যারা হাঁটাপথে দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে হাটে কাঁচা মশলা নিয়ে আসে তাদের অবস্থা। কিন্তু যারা নদীপথে নৌকা নিয়ে মাল কিনতে আসে তাদের কাজকারবার আবার আলাদা। প্রতি হাটবারে তাদের অসংখ্য পালতোলা নৌকা ভাটিয়ালি গাইতে গাইতে তর তর করে বাজারের বিস্তৃত ঘাট অঞ্চলকে ঘিরে ফেলে। নৌকার মাঝিরা ঘাটে ভিড়বার আগেই পালের দড়ি খসিয়ে নৌকার গতিবেগ স্তিমিত করে দিলে গলুইয়েব মাথাগুলো এমন সতর্কতার সাথে নৌকার সারির ফাঁকফোকে ঢুকে যায়, দেখলে মেঘনার মাঝিদের হাল ধরাব প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঠোকাঠুকির কোনো ব্যাপার নেই। মাঝিরা একজন আরেকজনের নাওকে জায়গা করে দিচ্ছে। যেন মাঝিদের মাধ্যে এমন একটা অলিখিত নিয়ম আছে যাতে প্রতিটি নৌকা ঘাটের ঘেরের মধ্যে নিজেব উদ্যত মাস্তুল নিয়ে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে। বাজারের ঘাটটাকে ঘিরে নৌকার সার যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, দূর থেকে দেখতে বেশ লাগে। মনে হয়, প্রাচীন যুগের কোনো পোতাশ্রয়। প্রতিটি মাস্তুল আকাশের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে আছে। বাতাসে দড়িদড়া নড়ছে। মেঘনার ঢেউয়ের বাড়িতে প্রতিটি নৌকা একটু একটু কাঁপছে। আর আহত জলের শব্দ চারিদিকে একটা একটানা মাতনের রোল তুলছে।

এসব নৌকা আশেপাশের বড়ো বড়ো বাজার ছাড়াও ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট থেকে আসে। পেঁয়াজ রসুন, মুগ-মসুর আর মিষ্টিজলের শুঁটকির জন্যে এ হাট প্রসিদ্ধ। ভৈরব আশুগঞ্জ, আজমিবিগঞ্জ, নবীনগবেব পবই লালপুর হাটের কথা লোকে বলে। যদিও হাটবারের লোক-সমাগমের দিক দিয়ে ভৈবব-আশুগঞ্জেব কাছে এ হাট কিছুই না। তবু প্রতি হাটবাবে চার-পাঁচশো বড়ো বড়ো নাও এ হাটেই মাল কিনতে ভিড জমায়। দেশের পযসাওলা মুদি, মবিচ-মশলার দালাল, শুঁটকির কারবারি, তাঁতে বোনা মোটা নীলাম্ববী শাড়ি আব লুঙ্গি ব্যবসাযীদের বেহেশ্‌ত হল লালপুর হাট। এ হাটের পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ, সিদল শুঁটকির খুশবাই নাকে লাগলেই হাটবারের উঠকো দালালদের জিভে পানি ওঠে। তারা নাও বাইতে বাইতে বৈঠা কাঁপিয়ে বাতায় ঠুকে বসালো গান ধরে।

আর আসে বেদেরা। তাদের ঝাঁকবাঁধা নৌকাগুলো মেঘনার বুকে ভাসমান ছোটো গ্রামের মতো দেখায় তাবা সহজে ঘাটে ভিড়ে না। যে পাড়ে হাট, তার ঠিক উলটোদিকে, অপর পাড়ে তীবের মাটি থেকে তিরিশ চল্লিশ গজ নদীর ভেতবে তারা তাদের বহর আটকায়। নদীর পাড়েও নয়, আবাব নদীর মধ্যেও নয় এমন একটা জাযগায় তারা অবস্থান নেয়। তারপর ছোটো কোষা নৌকায় এরা হাটের ঘাটে এসে লাগে। বেদে যুবাবা হাটে কাচের বাংড়ি, আয়না, গন্ধের সাবান, সাপের তাবিজ, দাঁতের মাজন আর ছুরি-চাকু বিক্রি করে। মেয়েরা যায় গ্রামে। তাদের হল সাপ নাচানো, সিঙ্গা লাগানো আর দাঁতের পোক খোলার ব্যবসা। হাটের দিন সকালে তারা আসে আর পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই বহর ভাসিয়ে অন্য হাটের দিকে চলে যায়। আগের দিন সন্ধ্যায় যেখানে একটা গ্রামের মতো দেখা যেত, দেখা যেত নদীর কোল ঘেঁষে জ্বলে উঠেছে অসংখ্য আলোর ফুটকি, রান্নাব আগুন আর ধোঁয়া, কিংবা শোনা যেত শিশুর কান্না আর বেহুলার রূপ বর্ণনা করে পুরুষেব গলা ছেড়ে দেওয়া গান, পরের দিন সেখানে উন্মুক্ত জলের বিস্তারে ঢেউয়ের মাতামাতি ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

লালপুর হাটের তরুণ দালালদের নেতা হল আবিদ বেপারি। সব হাটেই যেমন নিজের পুঁজি ছাড়া ব্যবসা জমানোর একদল লোক থাকে, লালপুর হাটও পাটের মরশুম থেকে শুরু করে পেঁয়াজের মরশুম পর্যন্ত আবিদ বেপারির ইয়ারেরা হাঁকডাক করে বেড়ায়। বাইরের বেপারিদের মাল খরিদ করতে হলে দালালেব সাহায্য না হলে চলে না। দরদস্তুর ও মাল ধরার কাজটা দালালেরা আগেই করে রাখে। এজন্য অবশ্য মহাজনরা আগেই দালালদের পয়সা দেয়। দালালেরা যাতে বাজারে আসামাত্রই চাষিদের ঝুড়ি আর ছালা ভর্তি পেঁয়াজ রসুনটা হাতাতে পারে সেজন্য অগ্রিম শ'খানেক টাকা প্রত্যেক মহাজনই দালালদের দিয়ে রাখে। মাল কেনা হয়ে গেলে মহাজনরা কুলি দিয়ে নৌকায় মাল উঠিয়ে নেয়। প্রথম এরা খুতি খুলে কুলি বিদেয় করে। পরে সন্ধেটা পার হয়ে গেলে, যখন নদীর ঘাটটা একটু অন্ধকার হয়ে আসে তখন একে একে দালাল মহাজনের নৌকায় উঠতে থাকে। পান বিড়ি খেতে খেতে দালালির পয়সার হিসেব চলে। দালালরা তাদের পয়সাটা কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিয়ে

তারপর নাও থেকে নামে। যেদিন মহাজনদের মনমতো দামে দালালরা মাল ধরতে পারে সেদিন তাদের খুব আদর হয়। মহাজনরা নৌকায় বসিয়ে দালালদের খাওয়ায়। সাধারণত মহাজনরা খাবারটা নিজেদের মাঝিদের দিয়ে নৌকার মধ্যে 'নাইয়া' চুলায় রাঁধে। হাটের দিন তারা মুরগি খায়। খাওয়ার ব্যাপারে এই মহাজনদের বেশ একটু দিলদরিয়া ভাব আছে। যেসব মুদি-মহাজনদের বয়স কম, তারা আর হাটে আসবার সময় পাটাতনের নীচে 'বঙ্গেশ্বরী'র বোতল নিয়ে আসে। কিংবা গাঁজার পুরিয়া। দিশি মদকেই মাঝি-মহাজনরা 'বঙ্গেশ্বরী' বলে সম্মান জানায়। রাত আটটার পর মহাজনদের নৌকার কাছে গেলে পেঁয়াজ-রসুন আর শুঁটকির গন্ধ ছাড়াও মাংসের স্বাদু গন্ধের সাথে মদ আর গাঁজার কড়া গন্ধ মিশ্রিত হয়ে একটা অদ্ভুত রাসায়নিক সৌরভ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে থেকে আসা বড়ো নৌকার মহাজনরা আজিজ মিয়ার ভাতের দোকানে যায় না। যারা যায়, তারা হাড়কিপটে।

আজকের হাটে বেচাবিক্রি বেশি না হলেও আবিদ বেপারি তার দালালির পয়সা নিয়ে সকলের শেষে বেশ একটু রাত করে মহাজনের নাও থেকে নামল। প্রায় একশো মন পেঁয়াজ আজ দু'জন মহাজনকে আবিদ বেপারি ধরিয়ে দিয়েছে। আড়াইশো টাকা আজ আবিদ বেপারির খুতিতে বাঁধা। এ হল তার এক হাটের রোজগার। এখন এক সপ্তা স্রেফ আজিজের হোটেলে ঝাল ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়া আর হাটের গলিতে পেঁয়াজ-রসুনের বাকলের ওপর সঙ্গী-সাথীদের সাথে তাস পেটানো ছাড়া আবিদ বেপারির কোনো কাজকাম রইল না।

ঘাটপাড়ের ফ্যাচফ্যাচে কাদামাটি এড়িয়ে আবিদ বেপারি বাজারের এক প্রান্তে শুঁটকিহাটার উঁচু জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নদীর দিকে। হাটের এ দিকটায় নদীর প্রস্থ প্রায় মাইল চারেক হবে। নদী মোটামুটি শান্ত। ছোটো ছোটো ঢেউ থাকলেও মেঘনাকে এ সময়টায় প্রশান্তই বলা যায়। ওপাড়ে গ্রামগুলোকে একটা ক্ষীণ কালো রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। রেখার মধ্যে দু-একটা আলোর ফোঁটা, দুধের ফোঁটার মতো স্পষ্ট হয়ে আছে। বেদেদের ঝাঁকবাঁধা নাওগুলোর আলো নদীর ছোটো ছোটো ঢেউয়ে প্রতিবিম্ব তুলে একটা অখণ্ড আলোর মালার মতো ভাসমান মনে হচ্ছে। কিংবা মনে হচ্ছে, নদীর ভেতরে নুয়েপড়া কয়েকটা হিজল গাছকে যেন একঝাঁক অতিকায় জোনাকি ঘিরে ধরেছে।

আবিদ বেপারি বেদের বহরটার দিকে চোখ রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বহরটার প্রতিটি নৌকার ছইয়ের ভিতরে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে অথবা ছইয়ের বাইরে আলো দেখা যাচ্ছে। বেদে-বেদেনিরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে তাদের রান্নাবান্নার কাজ সেরে খেতে বসেছে। কারণ একটু আগেও নৌকাগুলোকে ঘিরে যে ধোঁয়ার আস্তরণটা ছিল এখন আর তা নেই। রাতও অনেক হয়েছে। সময় সাড়ে দশটার কম হবে না।

আবিদ বেপারি একটা সিগ্রেট ধরাল। চোখ তার এখনও বেদে বহরটার দিকে স্থির হয়ে আছে। সিগ্রেটটা টান দেওয়া মাত্রই একটা ঢেকুর উঠল বেপারির গলা দিয়ে। দিশি মদ, ঝাল মুরগির মাংস আর পানের রসের মিশ্রিত ঝাঁঝালো মোদো গন্ধ। টক, বিস্বাদ ছড়িয়ে পড়ল ময়লা জিভের ওপর। অন্ধকারে মুখটা বিকৃত করে বেপারি চোখ নামিয়ে আনল তার আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগ্রেটটার ওপর। কড়া মিনার সিগ্রেটের ধোঁয়া পেটে গিয়েই এই অশুভ, দুর্গন্ধযুক্ত চুকা ঢেকুরটা ডেকে এনেছে। একবার ভাবল সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলবে। আবার কী মনে করে সিগ্রেটটা ঠোঁটের ওপর এনে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিল। অনেকটা সুখটানের মতো করে। তারপর এক বুক ধোঁয়া উগড়ে দিয়ে আবার নদীর দিকে চোখ ফেরাল।

হাঁ, বহরটা থেকে বেশ দূরে, একটু দক্ষিণে একটা নৌকা বাঁধা। ঢেউয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে দুলছে। নৌকার ভেতরে কোনো বাতি দেখা যাচ্ছে না। আবিদ বেপারির মুখটা পুলকে প্রসন্ন হয়ে উঠল। নৌকাটিকে দেখা যাচ্ছে ভাসমান একটা কালো চোখের মতো। আবিদ বেপারি জানে বহরের অন্যান্য নাওয়ের বাতি যখন নিভে যাবে তখন অন্ধকারে কালো চোখের মতো এই নৌকার বাতি জ্বলে উঠবে। প্রথমে ছই-এর ভেতরে এক বিন্দু আলো। তারপর আলোটা গলুইয়ের কাছে এগিয়ে একটু স্থির হয়ে থাকবে। তারপর মানুষের মাথাসমান উঁচুতে উঠে বাতিটা তার প্রতীকী বার্তা ব্যক্ত করে ডানে-বাঁয়ে দুলতে থাকবে। তখন মনে হবে অমাবস্যায় আচ্ছন্ন পৃথিবীর এক অংশে ভাগ্যক্রমে একটা আদিম অগ্নিকণা জলেস্থলে পুরুষদের ডাকছে।

আবিদ বেপারি হাটের দিকে আর গেল না। বরং হাটের ডান হাতের রাস্তায় নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। পথটা অন্ধকার। তবে জলের সম্ভবত নিজস্ব একটা ক্ষীণ দ্যুতি আছে যাতে নদীর শরীরটা অন্তত বুঝে ওঠা যায়। আর এই উপলব্ধি থাকলে পানির পাশে কোথায় অন্ধকার মাটির ওপর দিয়ে পায়ে-চলার পথটি আছে তাও

রাতের পথিকরা ঠাহর করে ফেলে। বেপারি যেহেতু আশৈশব এপথে চলাফেরা করেই বেড়ে উঠেছে, সেজন্যে পথ চলতে গিয়ে তাকে মাটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে না। আসলে তার চোখটা এখনও সেই নদীর ওপর ভাসমান অতিকায় কালো চোখের স্থির দারুদৃষ্টির দিকেই নিবদ্ধ।

বেপারি নদীর পাড় ধরে প্রায় মাইলখানেক পথ পার হয়ে একটি গ্রামের ঘাটের কাছে এসে দাঁড়াল। জেলেদের গ্রাম। জেলে-বউরা দিনমান এই ঘাটে জটলা বেঁধে জলের কাজ করে। এখন এই ঘাটটাকে বড়ো নিস্তব্ধ আর শীতল মনে হল। ঢেউ এসে কাপড় কাচার কালো পাথরটার ওপর ছল ছল করছে। কেমন এক ধরনের শীতলতা আবিদ বেপারির শরীর স্পর্শ করল। বেপারি ঘাটের পৈঠায় দাঁড়িয়ে বেদে বহরের পাশে নিঃসঙ্গ নৌকাটির দিকে তাকাল। কাত হয়ে পড়া একটি বিশাল মাখনার মতো আয়তলোচন এখনও বেপারিকে দেখছে। চোখে চোখে তাকাতে না পারা বয়োসন্ধির কিশোরের মতো আবিদ বেপারি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। ঘাটের কাছেই জেলেদের জাল রং করার শূন্য গামলাগুলো পড়ে আছে। এখন গাব ফল পোক্ত হওয়ার ঋতু। তাই ঘাটের পেছনে বহুদূর পর্যন্ত গাবের কষ সিদ্ধ করার বড়ো জালা আর গামলার ছড়াছড়ি। কাঁচা গাবের কষটে গন্ধ জেলেপাড়া থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত বাতাসকে কেমন বিবমিষায় ভরিয়ে রেখেছে। অন্য সময় এ পাড়ার পাশ দিয়ে গেলে মাছের আঁশটে গন্ধ নাকে এসে লাগত। কিন্তু এখন গাবের কাঁচা রসের গন্ধে নাকে রুমাল দিয়ে ভদ্রলোকেরা ঘাট আর পাড়াটা পার হয়ে যায়।

আবিদ বেপারি দেখল ঘাটের একটু দূরে যেখানে বড়ো কাঁঠালি বটগাছটা আছে সেখানে একটা লম্বা জেলে নাও খাড়া লগির সাথে বাঁধা। নাওটা খাড়া লগির সাথেই বাঁধা কিনা তা যদিও আবছা অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, তবুও এতদঞ্চলের লোক বলে বেপারি তার সহজাত অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝল নৌকাটা নিশ্চয়ই চইরের সাথেই বাঁধা থাকবে। নাওটা দেখেই আবিদ বেপারি খুশি হয়ে গেল। আসলে বাজরের ঘাট থেকে অন্ধকারে জেলেপাড়া পর্যন্ত আসা যে শুধু একটা জেলে নৌকার জন্য তা যেন বেপারির অবচেতনা তার নিঃশব্দ সচেতনতার কাছে ব্যক্ত করল। যেন বেপারি বুঝতে পেরেছে, নিরর্থক নয়, এটা নৌকার জনাই তার এই মাইলটাক পথ পেরিয়ে আসা। খুশি হয়ে গেল বেপারি। ঘাট পার হয়ে কাঁঠালি বটের প্রসারিত জটিল শিকড়ের ওপর গিয়ে আস্তে আস্তে বসল। তার এখন অনেকটা সময় অতিবাহিত করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বেদেদের ভাসমান গ্রামটা তাদেব সবগুলো বাতি নিভিয়ে জল হয়ে যায়।

নদীর বাতাসে কাঁঠালি বটের পাতাগুলো মাথার ওপর সড়সড় শব্দ তুলছে। স্তব্ধতাকে বিশদ করার জন্যই যেন শব্দটা একটানা আবিদ বেপারির কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছে যাচ্ছে। গাছের সবচেয়ে বড়ো শাখাটায় সম্ভবত শকুনেব বাসা আছে। কারণ একটা পাখির কান্নার মতো শব্দ অকস্মাৎ আবিদ বেপারির কানে বেজেই থেমে গেল। বেপারি একবার মুখ তুলে গাছের বড়ো ডালটার দিকে তাকাল। পরিচ্ছন্ন আকাশের দিকে গাছের পত্র-পল্লবকে একটা মস্ত বড়ো কালো ছাতা ছাড়া আবিদের আর কিছুই মনে হল না। আর ছাতাটাকে যেন কোনো অদৃশ্য হাত বেপারির মাথাতেই ধরে থাকবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রকৃতির এই অনুকম্পায় আবিদ বেপারি কিছুটা অভিভূতের মতো পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট খুলে একটা সিগ্রেট ধরাল।

এবার সিগ্রেটটা আর তত খারাপ লাগছে না। বিস্বাদ অবস্থাটা কেটে গিয়ে তামাকের স্বাদটা পাওয়া যাচ্ছে। বেপারি আস্তে, মৃদু টানে টানে সিগ্রেটটা শেষ করতে লাগল। এই বটগাছটার আঁকাবাঁকা শিকড়ের সাথে বেপারির কৈশোরের কয়েক বছরের আনন্দময় স্মৃতিও জড়িয়ে ছিল।

বারো-তেরো বছরের এক বালক তার এক রখাটে সঙ্গীর সাথে স্কুলের নাম করে এখানে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে বলত, 'পড়া কইরা আইছি।' আর আনন্দে বিগলিত এক চাষি-বউ তার ছেলেকে যত্ন করে করে ভাত খাইয়ে দুধেব বাড়তি সরের পেয়ালাটা ছেলের মুখের কাছে তুলে ধরত। হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ায় আবিদের মনটা ভিজে গেল। যে বড়ো শিকড়টার নীচে বইপত্র লুকিয়ে রেখে আবিদ তার সঙ্গীর পেছন পেছন জেলেপাড়ায় গিয়ে মার্বেল খেলত, গাছের সেই বড়ো শিকড়টার ওপরই এখন সে বসে আছে। আর গাছের মাত্র তিরিশ গজ দূরেই তার মায়ের কবর। কৈশোরের সুখের দিনগুলো শেষ হবার আগেই মা তার উলাওঠায় মরে যায়। মার কথা মনে পড়ায় বেপারি শিকড়ের আসন ছেড়ে নেমে এল। তারপর চলল কবরস্থানটার দিকে।

কবরস্থানের উঁচু জায়গাটায় উঠে দাঁড়াতেই, একটা ঠান্ডা ভয়ের বাতাস এসে আবিদের শরীর ও মনকে

কাঁপিয়ে দিল। মদের নেশা নেশা ভাবটা কেমন যেন কেটে যাচ্ছে। আর নেশার শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যই যেন কবরের গর্তগুলোতে বহুতা বাতাস বাড়ি খেয়ে আবিদের শরীরের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল। ভয়ে শিউরে উঠল আবিদ বেপারি, আগের সেই বারো-তেরো বছরের বালকের মতো। একবার তার মায়ের কবরটা জিয়ারত করার কথা মনে উঠল। কিন্তু কবর ও নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার যে আতঙ্ক আছে তা সম্ভবত কোনো বয়স মানে না। পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক আবিদ বেপারি স্কুল-পালানো বারো বছরের বালকের মতো হঠাৎ এক দৌড়ে কবরস্থানটা ছেড়ে আবার বটগাছটার কাছে ফিরে এল। যদিও নদীর পাড়ের এই নিঃসঙ্গ গাছটার নীচে ভয় থেকে পালানোর কোনো কারণ অথবা সত্যিকারের নিরাপত্তা নেই— তবুও আবিদের মনে হল এখানে কোনো ভয় নেই। এক আবিদ ছাড়া জায়গাটা আগের মতোই জনমানবশূন্য। শুধু শকুনের বাচ্চাটা বোধহয় আরও একবার মানুষের শিশুর কান্নার মতো শব্দ করে কেঁদে উঠল।

আবিদ বেপারি বুঝতে পারল না কেন সে তার মায়ের কবর থেকে এভাবে দৌড়ে পালিয়ে এসেছে। সাধারণত বেপারি ভিতু লোক নয়। ভূত বা জিনটিনের ভয় সে করে না। এছাড়া এখন সে আর বারো বছরের স্কুলপালানো নিতান্ত বালকও নয়। তবু কেন এমন হল? বেপারি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল। পরে অবশ্য সে আপন মনেই এ প্রশ্নের একটা জবাব খুঁজে বের করতে চাইল। তার মনে হল, কবরটা হল মরা মানুষের জায়গা। এরা আর পৃথিবীর কেউ না। আজ যেমন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সারারাত অপেক্ষা করলেও এদের কথা শোনা বা দেখা যাবে না, তেমনি কাল প্রভাতেও কবর কবরই থাকবে। জ্যান্ত মানুষের কোনো কাজে এদের আর কিছু করার নেই। জীবন ত্যাগ করে যা পাওয়া যায় এই কবরের মৃতরা নিশ্চয়ই তা পেয়েছে। যারা প্রাণবন্ত তারা তা জানে না। জীবনধারণ করে তা কোনোদিন কেউ জানতে পারেনি। কবরের লোকেরা, এমনকি তার মা-ও জীবনের জানা শেষ করে জীবনের অতিরিক্ত যে মৃত্যু তার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকায়, আবিদ বেপারি তাদের ভয় পেয়েছে। আর এখন যে গাছটার নীচে সে নিজেকে নিরাপদ বোধ করছে, হোক তা রাতের মধ্যভাগে জনমানব অথবা কলরবশূন্য কিন্তু তা জীবনের মধ্যে রয়েছে। এই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে যেমন তাদেব অস্তিত্ব আছে আগামীকাল সকালেও তারা থাকবে। জীবন ও জগৎ ত্যাগ করে মৃত্যুব রহস্য তারা আবিদ বেপারির মতো অনবহিত বলেই এদের মধ্যে আবিদ বেপারির নিরাপত্তা। এ ধরনের একটা রক্তহীন দার্শনিক চিন্তায় আবিদ বেপারিব মতো আধ-মাতাল হাটবাবের দালালও আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। মনে হল তার ভীতিটা অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। সে আবার মুখ ফিরিয়ে কবরস্থানের দিকে তাকিয়ে, জোরে চিৎকার করে বলল, 'মায়ো, বাজান আবার এক বেডিরে বিয়া কইরা আমারে খেদাইয়া দিছে। জমি জিরাত কিছু দেয় নাই। আমি বাজারে ব্যবসা করি, দালালি করি। ভালাই আছি। তুই হুনছ মায়ো, আমার কতা? হুনছ?'

অন্ধকার কোনো জবাব দিল না। কোনোপ্রকার জবাবের আশায় নয়, বরং কীভাবে তার কাঁপা কাঁপা সম্বোধনগুলো অন্ধকারের আবরণের মধ্যে মিশে যাচ্ছে তা উপলব্ধি করার জন্যই আবিদ বেপারি কতক্ষণ তাকিয়ে রইল।

বেদেবহরের বাতিগুলো কখন নিভে গিয়ে পুরো বহরটা একটা কালো দাগের মতো হয়ে গেছে তা আবিদ বেপারির খেয়াল ছিল না। যখন নদীর ওপর চোখ পড়ল, দেখল সব কিছু কেমন ঠান্ডা জল হয়ে আছে। আব সেই নৌকাটা যা এতক্ষণ আবিদ বেপারিকে চোখে চোখে রাখছিল তাও-ও কেমন যেন ঢেউয়ের ওপর ঠান্ডা চুপ মেরে ভাসছে। তবে কি কোনো অসতর্ক মুহূর্তে কালো কাঠের চন্দ্রবিন্দুর মধ্যে কোনো আলোর কণা জ্বলে উঠে অন্ধকার দিকবিদিকে তার প্রতীকী আহ্বান জানিয়ে এখন চুপ মেরে গেছে? মহা ভাবনায় পড়ল আবিদ বেপাবি। তার মনে হল নৌকার বাতি তাকে আকুল হয়ে ডেকেছিল। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে এখন নিভে গেছে। কিংবা হাটের কোনো তরুণ দালাল বাতিটার ডাক শুনে নিশ্চয়ই আবিদ বেপারির আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে।

দারুণ অস্বস্তির মধ্যে আবিদ বেপারি আরও কতক্ষণ বসে রইল। আর কালো চোখের মতো নৌকাটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'আমি যামুই। কেউ গিয়া থাকলেও যামু। মাইরা ভাগাইয়া দিয়া ভিতরে হামামু।'

এবার তার চোখ গেল ঘাটের অদূরে বাঁধা জেলে-নৌকাটার দিকে। এ নৌকাটাকেও বেপারির কাছে একটা তির্যক দৃষ্টির কালো চোখের মতোই মনে হল। যেন নদীর বিশাল দু'টি আয়তলোচন কেউ জলের ললাটের

দু'পাশে জোর করে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে নদীর ওপার থেকে একটা চোখ যেমন এক দৃষ্টিতে আবিদ বেপারিকে দেখছে, তেমনি এপারেও অপর চোখটা টেরচা চাওনিতে তাকে অবলোকন করছে বলেই বেপারির মনে হল।

বেপারি গাছের শিকড়টা ছেড়ে নীচে নেমে এল। একবার তাকাল বেদে বহরটার দিকে। বেদেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে নৌকাটার কাছে এসে লগির বাঁধন খুলতে খুলতে একবার আকাশের দিকে, আবার নদীর দিকে দেখল। আকাশের প্রভাবে পানির ওপর অস্পষ্ট দ্যুতি প্রতিফলিত হচ্ছে। নিশ্চয়ই একটু পরই চাঁদ উঠবে। যদিও অস্পষ্ট আকাশের ঈশানে একটুকরো মেঘ জমে আছে, তবুও আবিদ বেপারি নির্ভয়ে নাও ভাসাল। অবশ্য এরই মধ্যে নদীর ওপরে বাতাসের বেগটা একটু বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢেউয়ের দাপানি বেড়ে গিয়ে নৌকাটাকে বেশ দোলাচ্ছে। বেপারি নৌকা ভাসিয়েই টলমল করতে লাগাল। লগিটা সারাদিন জল খেয়ে পাথরের মতো ভারি। নৌকাটাকে ঠিকমতো সামলাতে না সামলাতে তা একটু ডানদিকে বাঁক ঘুরে চলতে লাগল। বেপারি পাকা মাঝির মতো ঠোঁট কামড়ে প্রাণপণ শক্তিতে আবার এটাকে বাঁয়ে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে বেশ একটু হাঁপিয়ে পড়েছে। শুধু লগি ঠেলে এত বড়ো নদী পাড়ি দিয়ে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো সোজা ব্যাপার নয়। তবু বেপারি শুধু গায়ের জোরে নৌকাটাকে যথাসম্ভব সোজা রেখে যেতে লাগল। একবার লগি ঠেলে দিয়ে কোমর সোজা করে সামনের দিকে তাকাতেই দেখল বহুদূরে ভাসমান কালো চোখের ওপব একটি আলোর বিন্দু বিরামহীন ভাবে ডানে-বাঁয়ে দুলছে। সতেজ ঢেউয়ের ওপর দোদুল্যমান আবিদ বেপারির শরীরের প্রতিটি সন্ধি যেন এক আনন্দময় শিহরনে অকস্মাৎ কেঁপে উঠল।

'অই, ডাকতাছে।' মনে মনে বলল আবিদ বেপারি।

ততক্ষণ আবিদ বেপারির নৌকাটা মাঝনদীতে পৌঁছাবার আর বেশি দেরি নেই। আবিদ বেপারির মনে হতে লাগল নদীর একটা অন্ধকার চোখ যেন আকস্মিক জলের ঝাপটায় দৃষ্টি ফিরে পেয়ে হারিয়ে যাওয়া অপর একটি চোখকে ডাকছে। আর এই মায়াবি আহ্বানে, মন্ত্রবলে বেপারিও ললাটভ্রষ্ট এক আয়তলোচনকে নদীর দুঃখিত মুখমণ্ডলের কাছে একটু একটু ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকাল বেপারি। আকাশব্যাপী তারাব ঝালরের মধ্যে সাপের ডিমের মতো সাদা চাঁদ দেখা দিয়েছে। পানখ সাপের ডিমের মতোই চাঁদের মধ্যভাগটা একটু ঘোলাটে আর এবড়ো খেবড়ো। এখন আর ঈশান কোণে পুঞ্জীভূত মেঘের পাহাড়টা নেই। যদিও নদীর ওপর দিয়ে বাতাসের বেগটা এখনও স্তিমিত হয়নি। বেপারি আবার অন্ধকার চোখের সাদা মণির মতো কম্পমান আলোর ফোঁটার দিকে তাকাল। আলোটা এখনও নড়ছে। আর যে হাত আলোর ইশারা নিয়ে এতক্ষণ নড়াচড়া করছিল, এখন অস্পষ্ট হলেও আবিদ বেপারির দৃষ্টিগোচর হল। কালো একটা গাছ যেন একটিমাত্র সোনালি ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবিদ বেপারি তাড়াতাড়ি ব্যবধানটা অতিক্রম করতে চাইল। কিন্তু জোরে লগি ঠেলেই বুঝল এখানে থই নেই। নৌকা এখন মাঝনদীতে। এখানে আর নদীর তল পাওয়া যাচ্ছে না। এ জায়গায় নদী খুব গভীর তা বেপারির অজানা ছিল না। এতক্ষণ লগিটার প্রায় মাথায় আঙুলের টিপ রেখে বেপারি নৌকা বেয়ে এসেছে। এই অথই অবস্থায় কী করবে হঠাৎ বেপারি যেন তা সমঝে উঠতে পারছে না।

এদিকে আহ্বানকারী চোখের মণিটা হঠাৎ স্থির হয়ে আছে। কাঁপুনি থামিয়ে আলোময় চোখটা যেন মায়াভরা চাহনিতে তার সহোদর চোখটাকে দেখছে। আর নদীর অথই ললাটের ওপর দিশেহারা একটা চোখ তার উদ্দিষ্ট যুগলের কাছে পৌঁছতে না পেরে ঢেউয়ের দুলুনিতে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে খেতে ভাসতে লাগল।

বেপারি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর লগিটাকে মাঝামাঝি ধরে নৌকার দু'পাশে জলের ওপর অনেকটা বাড়ি দেওয়ার মতো করে জল টানতে লাগল। হাঁ, এবার ঢেউয়ের ওপর দিয়ে কমজোর চলায় নাওটা এগোচ্ছে। আস্তে আস্তে বেপারি মাঝনদী পেরিয়ে যাচ্ছে। নৌকা যতই আগে বাড়ছে, ঢেউয়ের দাপানিও ততই কম লাগছে। শেষে নৌকাটা যখন স্থির গতি পেল, আবিদ বেপারি দেখল সে আর বেশি দূরে নেই। আলোর গাছটা বেশ স্পষ্ট হয়ে এসেছে। আলোর ফুলটা যা এতক্ষণ অদৃশ্য বৃক্ষের উঁচু শাখায় ফুটন্ত মনে হচ্ছিল তা সহসা ঝরে পড়ার মতো বৃক্ষের মূলে পড়ে আছে। গাছটাও আর অস্পষ্ট নয়। দীর্ঘাঙ্গিনী এক নারীমূর্তি নদীর উদ্দাম বাতাসে চুল খুলে দিয়ে নৌকার প্রান্তভাগে দাঁড়ানো। তার পায়ের কাছে একটা ঘোলাটে লণ্ঠন সর্বশক্তি নিয়ে আলো ছড়াচ্ছে। নারীমূর্তির মুখ যে বেপারির জেলে নৌকার দিকেই ফেরানো তা বেপারি বুঝল। নৌকা আর একটু এগিয়ে যেতেই মূর্তির সর্বাঙ্গ বেপারির নজরে এল। বেপারির মনে হল, বহুদিন আগে, তার কিশোর

বয়সে গ্রামের মাতব্বরের পুকুরকাটার সময় মাটি কাটার মজুররা মাটির নীচে একটা মূর্তি পেয়েছিল। গাঁয়ের লেখাপড়া -জানা লোকেরা বলেছিল মূর্তিটা হল গঙ্গার। হঠাৎ বহুদিন আগে দেখা সেই গঙ্গামূর্তির কথা আবিদ বেপারির মনে পড়ল। গঙ্গার মতোই একটা হাত কাঁখালে রেখে শরীরটা দাঁড়িয়ে আছে। সুগঠিত ও সরল। শুধু চুলগুলোই খোঁপায় বাঁধা না থেকে বাতাসে পিছন দিকে উড়ছে। এই বেমিল দেখে আবিদ বেপারি মনে মনে ভাবল. 'তা অইলে তুমি গঙ্গাদেবী না, মেঘনাদেবী।' এ ধরনের একটা উপমা প্রয়োগের ক্ষমতা থাকায় আবিদের হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল।

আবিদের নাওকে কাছে আসতে দেখে মেঘনা তার বাতিসহ নৌকার ছইয়ের ভিতর ঢুকে গেল। তারপর একটা খিলখিল হাসির ঢেউ বয়ে গেল আরেক মেঘনার ঢেউয়ের ওপর দিয়ে। আবিদ বেপারি তার নাওটাকে সামনের নৌকার বাতার কাছে এনে লগিতে ভর রেখে দাঁড়াতেই নদী যেন নয়ন মেলে দিল আকাশের দিকে। এখন চোখ দু'টি আর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নেই। সোজা চাঁদের দিকে মাত্রাজ্ঞানহীনের মতো চোখ মেলে আছে।

লগিটাকে নদীর তলদেশে সহজেই পুঁততে পারল বেপারি। লগির সাথে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল নাওটাকে। তারপর অসঙ্কোচে গিয়ে ঢুকল সামনের নৌকায়। এক নৌকা থেকে অন্য নৌকায় উঠলে যে দুলুনি ওঠে, সে দুলুনিতে বেপারি বুঝল এ নৌকাটা হালকা জামকাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ভেতরে আলোর পাশে বসা মেঘনার কাছে গিয়ে বসা সত্ত্বেও নাওটা সমানে দুলছিল। লগি ঠেলে আবিদ বেপারি রীতিমতো ঘামে নেয়ে উঠেছে। বাইরে নদীতে বাতাস থাকায় শরীরের ঘামটা এতক্ষণ চামড়ার ওপর ফুটে বেরুতে পারেনি। এখন বন্ধ নৌকায় তা সুযোগ পেয়ে দরদর করে সারা গতর ভিজিয়ে সপসপে করে দিল। বেপারি নৌকার ছইয়ের চটায় গুঁজা শাড়ির পাড়ের সুতোয় তৈরি একটি হাতপাখা দেখে তা তুলে নিল। পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'কী নাম বাইদানির?' প্রশ্ন শুনে একটা খিলখিল হাসির শব্দে ঢেউয়ের দোলায় উথাল-পাতাল নৌকাটাও বুঝি মুহূর্তের জন্যে গমগম করে উঠল।

'নাম জিগাইয়া কী অবি? নাম আমার বেউলা সুন্দরী!'

কথা ক'টি বলেই আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। হাসির চোটে বুকের কাপড় কেঁপে কেঁপে নেমে গেলে একহাতে কাপড়টা ছতরের ওপর ধরে রাখল বেউলা সুন্দরী। ব্লাউজহীন পরিচ্ছন্ন কালো শরীর। বক্ষস্থলের ওপর ভাগটা কণ্ঠার দুটি প্রসারিত হাড় পর্যন্ত জলের মতো কালো হলেও একটু বেশি উজ্জ্বল এবং নির্মল। তার ওপর ঝুলে আছে গাঢ় সবুজ দু'গাছি পুঁতির মালা। মালার গোটাগুলো এত ছোটো যে প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে মেঘনায় মাঝে মাঝে যে সোনালি মাগুর মাছ ধরা পড়ে বুঝি সেসব মাছের সবুজ ডিম দিয়ে কেউ দু'গাছি মালা গেঁথে দিয়েছে।

হাসির লহরটা সশব্দে আছড়ে পড়ে কয়েকটা গমকে ভাগ হয়ে থামতে না থামতেই বেউলা সুন্দরী বেপারির দিকে মুখ কাত করে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমার নাম তো হুনলেন মহাজন, অখন আপনের নামডা কন?'

'আমার নাম আবিদ আলি বেফারি। আমি অই হাডে দালালি করি।' চিবুকটা চুলকাতে চুলকাতে বলল আবিদ বেপারি।

'অ আল্লা, আপনে তইলে লখিন্দর না! আর আমি ভাবতাছি, আমার নাওয়ে লখাই আইছে।'

আবার হাসতে লাগল বেউলা সুন্দরী। তবে এখন আর তেমন সশব্দে না বরং ঠোঁট টিপে একটু গা কাঁপিয়ে।

মেয়েটির নিগূঢ় হাসি সংক্রামিত হল বেপারির ঠোঁটেও। বেপারিও বোকার মতো হেসে ফেলল। বলল, 'তইলে ধইরা নেও আমিও চান্ সদাগরের পোলা লখাই। তোমার লখিন্দার।'

'হেই কথা কন। আপনে তো লখিন্দারই, আমি জানি। রাইত নিশিতে যারা আমার ভরায় উডে, বাত্তির ডাহে উইড়া আইয়ে, তারা হগলইত লখাই।'

এবার মেয়েটির হাসিতে তার দাঁতের পাটি নজরে পড়ল বেপারির। ফকফকে সাদা আর নিখুঁতভাবে দৃঢ়। মাড়ির যেটুকু আভাস পাওয়া গেল তাও চকচকে কালো আর সুন্দরভাবে সংবদ্ধ। বেউলা সুন্দরীর হাসিটা বড়ো ভালো লাগল বেপারির।

'একটা পান খাইবেন মহাজন? জর্দা আছে জর্দা দিয়া দিমু।'

বেপারিকে বেশ নরম সুরে, কথায় মায়া মিশিয়ে জিজ্ঞেস করল বেউলা। বেপারি হেসে বলল, 'আমারে মহাজন কও কেরে, আমি না তোমার লখাই!'

'অমা, আবার রসও আছে দেহি। বেইশ বেইশ, আমার ভুল অইছে। অখন থিকা ঠিকঠাক কথা কমু। কমু লখাই মহাজন! লখিন্দারও মহাজনই আছিল। সদাগরের পুত সদাগর। সদাগরের তো মহাজনই কয়। কয় না মহাজন?'

'হ কয়।' বেউলার মুখনাড়ার কাছে হেরে গেল আবিদ বেপারি, হাসল, 'তোমার অত বুদ্ধি। অতকথা জানলা কেম্‌নে সুন্দরী? পানির মাইয়ারা এমুন চালাক অয়, হিডা তো জানতাম না।'

'কেরে জানতেন না লখাই মহাজন? অতদিন বুঝি হগল হাডবারে ভরার নৌকা বিচরাইয়া হুদা পানির মতো মাইয়া দেখছেন। পানির ভিতরে ঢেউ দেখেন নাই?'

বেউলার পটাপট জবাবে বেপারি একটু লজ্জিত ও স্তিমিত হয়ে গেল। তার কেন যেন মনে হল সে এক কালনাগিনীর গর্তে এসে পড়েছে যার ফণা এখন তার মাথার ওপর বিস্তৃত। বেপারির এমন অকস্মাৎ দমে যাওয়া দেখে মেয়েটিও যেন হঠাৎ শরমিন্দা হয়েছে। বলল, 'কী অইল, কথা কন না ক্যান্? কথা কন, আমি পান বানাই।'

আবিদ বেপারির দিকে পেছন ফিরে পিঠ দেখিয়ে বসে বেউলা নৌকার একটা পাটাতন তুলে ভেতর থেকে পানের ডাবর বের করে আনল। ডাবরে হাত ঢুকিয়ে খয়েরের দাগে ভরা একটা তেনায় পেঁচানো একগুচ্ছ পান বের করল।

এ অবসরে আবিদ মেয়েটির পিঠ, বাহু, কোমর আর চিনা হাঁসের মতো বাঁকানো গ্রীবাভঙ্গি দেখার সুযোগ পেল। যদিও লণ্ঠনটা ধোঁয়াটে আলো ছড়াচ্ছে, তবুও তা ছইয়ের বাঁশের চটায় ঝোলানো থাকায় সম্মুখবর্তিনীর সর্বাঙ্গে আলো পড়ছে। পেট আর বুক দিয়ে হাঁটু আর উরতের ওপর চেপে বসায় পেছন থেকে তার পিষ্ট স্তন দু'টির ফুলে ওটা পর্যন্ত আবিদ বেপারি লোভাতুরের মতো দেখতে লাগল। যেন কোনো নায়রী নাওয়ের বালক মেঘনার বুকে আতকা ভেসে ওঠা গাঙ শুশুকীর সুডৌল বুকের এক অংশ দেখে ফেলে অবাক হয়ে মনে মনে ভাবছে, অমা মাছেরও আবার বুনি আছে।

বেউলা সুন্দরী তখন ছুরাতার ফাঁকে একটা আস্ত সুপারি রেখে ধীরে চাপ দিয়ে কুচি কুচি করে কাটছিল। আর এই চাপের শিহরন তার মাংসের ওপর এমনভাবে কাঁপন তুলছে যে বেপারির মনে হল মেয়েটির ঘাড়ের পেশি আর দাপ্‌নার দুলুনি যেন দাঁড়াশ সাপের দ্রুতগামী কামলীলা। পেছন থেকে তার পাছা আর পিঠের নীচের অংশ অনেকটা চালকাড়ার হালকা ঢেঁকি উলটে রাখার মতো। নিখুঁত আর তেলতেলে। বেউলা সুন্দরীর পরনে মোটা কালোপেড়ে সাদা শাড়ি। এ ধরনের শাড়ি সাধারণত বেদে মেয়েদের পরতে দেখা যায় না। তারা রঙচঙে কাপড়ই পছন্দ করে। বেউলার সাদাসিধা শাড়ি আর শাড়ির গোঁজন-গাজন দেখে তাকে বেদেনি বলে মনে হচ্ছে না। বরং তার শাড়ির অস্বাভাবিক সাদা জমিন আর কালো পাড় দেখে তাকে কোনো পরমাসুন্দরী জেলে-বউ বলেই ভুল হবে। দু'হাতের কবজিভরা সবুজ বাংড়ি টুংটাং শব্দ করছে। বাঁ হাতের কনুইয়ের একটু ওপরে মোটা কালো তাগায় একটা চ্যাপটা মতন বড়ো রুপোর তাবিজ। বাতি নিয়ে নৌকার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যে কেশরাশি বাতাসের সাথে বইতে দেওয়ার জন্য ছেড়ে রেখেছিল নৌকার ভিতর তা সংবরণ করে নেওয়ায় তার মাথার প্রায় সমান সমান এক বিশাল খোঁপার সৃষ্টি হয়েছে। যেনো দূর থেকে দেখা নদীপাড়ের কোনো গ্রামের বাড়ির বনের কুঞ্জি। আবার সেই পুকুরে পাওয়া গঙ্গামূর্তির কথা মনে পড়ল বেপারির।

বেউলা সুন্দরী ততক্ষণে পান বানিয়ে বেপারির দিকে ঘুরে বসেছে। তার চোখে চোখ পড়ার লজ্জা এড়াবার জন্য বেপারি দৃষ্টি সরিয়ে নৌকার ভেতরে আসবাবপত্র দেখতে লাগল।

'লন পান।' হেসে বেউলা ছোটো একটা পিতলের তস্তরিতে দু'খিলি পান এগিয়ে দিল।

খিলিজোড়া একসাথে হাতে তুলে বেপারি প্রশ্ন করল, 'কেমুন জর্দা, সুন্দর খুশ্‌বাই বারুইতাছে।'

'কস্তুরী জর্দা মহাজন। কেল্লা শহিদের মাজার থিকা আনছি। খাইয়া দেখেন, ঘামে বুকের পশম ভিজ্জা যাইব।' হেসে বলল বেউলা সুন্দরী। তার কথায় আবিদ বেপারিও না হেসে পারল না। তারপর পানের খিলি দু'টি একসাথে মুচড়ে মুখে পুরে দিল। তার পান খাওয়ার নমুনা দেখে মেয়েটি আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। আবিদ বেপারিও হাসতে হাসতে আবার নাওয়ের আসবাবপত্রের দিকে চোখ ফেরাল। মেয়েটি যেখানে বসেছিল, তাঁর

পেছন দিকে তিনটি সাপের ঝুড়ি। একটার ওপর আরেকটা বসানো। ঝুড়ির পাশে একটা কাঠের ডেউয়া। তার সাথেই কাত করে রাখা একটা ছোটো বটি-দাও। মেয়েটির ঠিক মাথার ওপর ছইয়ের ধনুকের মতো বাঁকা চূড়াটা থেকে একটা সাপের হাড়ের মালা ঝুলছে। ছইয়ের একপাশের বেড়ায় একটা বড়ো শিঙ্গা গাঁথা। এরকম শিঙ্গা দিয়ে বেদেনিরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বয়স্ক বেতো নরনারীর রক্তমোক্ষণ করে বাত সারায়। কলকিসহ একটা নারকেলের হুকাও বেড়ায় ঝুলছে। বেড়ার সাথে বাঁধা দড়িতে দু'টি ময়লা শ্রীহীন সাদা শাড়ি। ছেঁড়া, পাড়হীন। এতক্ষণে আবিদ বেপারির চোখে বেউলা সুন্দরীকে ঘিরে ধরা মমতাহীন দারিদ্র্যের বেষ্টন ধরা পড়ল।

'কী দেখতাছেন মহাজন, পানিখাওড়ি পক্ষির বাসা দেখেন।'

হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল বেউলা সুন্দরী। বেপারি কিছু বলার আগেই আবার ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'ঘরে বউ-বাচ্চা আছে?'

'না, বিয়া করি নাই।'

'অ, ল্যাজ কাড়া হাপ।' বলেই বেউলা সুন্দরী আবার হাসতে লাগল। এবার তার হাসিতে ঠাট্টার গমক বেশি। বেপারি মেয়েটির টিটকারির রেশটা বুঝতে পেরে বলল, 'ল্যাজ দিয়া কী করুম, ল্যাজ থাকলে টানুন লাগে।'

'অ টানাটানির মাইজে নাই, খালি ছোপ্ মাবার তালে ঘুরেন? ইয়ানে হিয়ানে গিয়া খালি ছোপ্ মাইরা পলাইয়া যাওন। বাপ্‌রে, সোজা মানুষ না, একবারে পানখ হাপের মিজাজ।'

মেয়েটির মুখ নাড়া কথার ভঙ্গিতে এবার বেপারিও জোরে হেসে ফেলল। বলল, 'তোমার লগে কথায় পারুম না সুন্দরী। তুমি বাকসিদ্ধা বাইদানি।'

আবিদ বেপারির এই সহজ পরাজয়ে বেউলা বেশ পুলকিত হয়েছে বলেই মনে হল। সে ঠোঁট টিপে আবার একটু হেসে কথা ঘুরিয়ে বলল, 'আর বুঝি তর সইতাছে না লখাই মহাজনের, তাড়াতাড়ি খালি মরণের ঢেউ বুকে লাগাইবার মন চায়।'

কথা শুনে আবিদ হেসে মেয়েটির একটি হাত ধরল। হাত সরিয়ে না নিয়েই বেউলা সুন্দরী বলল, 'শুনেন লখিন্দার মহাজন, আগে কন দেন্‌মোহর কত দিবাইন?'

আবিদ বেপারি খুশি হয়ে বলল, 'শুদা দেন্‌মোহর কেরে, তুমি চাইলে কাবিন পর্যন্ত লেইখ্যা দিমু সুন্দরী।'

বলেই দু'বাহু দিয়ে বেউলাকে জড়িয়ে ধরল বেপারি। এবং বিদ্যুতের মতো দ্রুতগতিতে মাথা নুইয়ে তার কণ্ঠার হাড়ে গভীরভাবে সশব্দে চুম্বন করল। বেপারির এই আকস্মিক ব্যবহারে মেয়েটি একটুও অবাক হল না। এবং ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বেপারির মাথাটা একটু ঠেলে দিয়ে বলল, 'কেমুন কাবিন, মেঘনার পানিত লেখা ঢেউয়ের কাবিন নিহি? না মহাজন, আমি কাবিন চাই না, আমারে দেন্‌মোহরের টেহাডা হাতে দেন আগে, পরে গতর হতাইবেন।'

কথা শেষ করেই বেউলা সুন্দরী বেশ ভদ্রভাবে কিন্তু সবলে আবিদের বাহুর বেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। আবিদ উপলব্ধি করল, এই ছিপছিপে গড়নের কালো মেয়েটির দেহে এক যুবাপুরুষের জোর লুকিয়ে আছে।

আবিদ সতর্ক হয়ে তাকাল বেউলার দিকে। তার ছতর থেকে শাড়িটা লুটিয়ে পড়েছে মাজার ওপর। খুঁতহীন ছোটো কটোরার মতো বুক দুটিকে মনে হচ্ছে গর্ভবতী গাঙশুশুকীর শরীরের ওপরভাগের নিটোল দুটি স্তনের মতোই স্ফীত, পরিপূর্ণ।

আবিদ বেপারি নিজের কোমরে হাত দিয়ে প্রথম খুতির ওপর বাঁধা গামছাটা খুলে দড়িতে ঝোলানো মলিন শাড়িগুলোর ওপর রেখে, পরে খুতিটা বের করল। খুতির মুখ ফচ্‌কা গিরোতে শক্তভাবে বাঁধা থাকলেও বেপারি কায়দা করে একটানে খুলে ফেলল। হাত দিয়ে বের করে আনল তাড়া বাঁধা নোট। সব দশ টাকার। গুনে গুনে পাঁচটা নোট আলাদা করে, তাসের মতো ছড়িয়ে সে বেউলার দিকে মেলে ধরল, 'লও সুন্দরী, তোমার দেন্‌মোহর পঞ্চাশ টেহাই দিলাম।' বেউলা বেপারির অন্য হাতে ধরা আরেক তাড়া নোটের ভাঁজের দিকে আড়চোখে এক ঝলক তাকিয়ে হেসে সামনের তাসের মতো ছড়ানো দশ টাকার পাঁচটা নোট ধরল। হেসে বলল, 'মেঘনা পাড়ের হাট বাজারে দালালিরও বেইশ্ পইসা আছে দেখতাছি।'

আবিদ কোনো কথা না বলে বাকি টাকাটা খুতিতে ভরে মুখটা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর তা কোমরে

না বেঁধে গামছাটা যেখানে রেখেছিল সেখানেই খুতিটা রাখল। মেয়েটিও বেপারির খুতি রাখার মধ্যে একটা পূর্বপ্রস্তুতির আভাস পেয়ে তার হাতে ধরা পাঁচটা দশ টাকার নোট দ্রুত ভাঁজ করে পেছনের সাপের ঝুড়ির ডালাটা মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করে নোটগুলো গুঁজে দিয়ে পলক ফেলতে না ফেলতেই ডালাটা আবার চাপিয়ে দিল। তবুও ডালা স্পর্শ করা মাত্রই ভেতরে সাপের ফোঁস্‌ফোঁসানি শুনতে পেল আবিদ বেপারি। জিজ্ঞেস করল, 'কী হাপ?'

'পানোখি। মাইনষে কালনাগিনী কয়।'

বলে সোজা বেপারির মুখের দিকে তাকাল বেউলা। জর্দা দিয়ে কড়া পান খেয়ে বেপারির কপাল ঘামছে। ঠোঁট দুটি একটু কালচে লাল। বেউলাকে তার দিকে তাকাতে দেখে বেপারি জানতে চাইল, 'তুমি হাপ নাচাও?'

'না। আমি হাপ পালি, আর মানুষ নাচাই।'

কথাটা বলেই বেউলা হেসে হাঁটুর ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে দেহের চারদিকে হাত ঘুরিয়ে শাড়ির প্যাঁচ খুলতে লাগল। এখন বেউলার বুক দু'টি আবিদের মুখের কাছে ফলের মতো নুয়ে পড়েছে। সদ্য চেরাই-করা জামকাঠের গন্ধের মতো একটা গন্ধ মেয়েটির শরীর থেকে আবিদ বেপারির নাকে এসে লাগল। বেপারি ঘাড় উঁচু করে একটি ফলের ওপর আলতোভাবে তার জর্দাতাপিত ঠোঁট দুটি ছোঁয়াল। বেউলা শাড়ির প্যাঁচ গুটিয়ে নিয়ে উরতের ফাঁকে রেখে ওপরকার শক্ত গিঁটটা নখ দিয়ে খুঁটে খুলতে চেষ্টা করছে। বেপারি বলল, 'আমি খুইলা দিমু?'

বেউলা খিলখিল শব্দে হেসে উঠে বলল, 'বান্‌ যে বড়ো শক্ত লখাই মহাজন, দাঁত দিয়া খুলন লাগব। পারবাইন্‌ খুলতে?'

এ সুযোগ আবিদ বেপারি ছাড়তে চাইল না। সোজাসুজি মুখটা নামিয়ে আনল বেউলার নাভির কাছে। শাড়ির গিঁটে দাঁত বসাবার আগেই ঠোঁট ছোঁয়াল গভীর নাভিমন্ডলের গর্তের নিম্নভাগে। বেউলা তলপেটে পুরুষের তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ পেয়ে শরীর কুঁচকে বসে যেতে যেতে বেপারির মাথায় হাতের ধাক্কা মারল, 'আরে করেন কি আপ্‌নে আমার ক্যাতুকুতি লাগে না?'

'ক্যাত্‌কুতি আছে নিহি মাইয়ালোকের? আচ্ছা দেও বান্‌ডাই খুইলা দেই। আর চুমা দিমু না।'

কথাগুলো বলে আবিদ বেপারি অনেকটা গায়ের জোরে বেউলার উরতে হাতের চাপ দিয়ে তাকে আবার হাঁটুর ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। বেউলার ফের উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কোমরের গিঁটের দু'পাশের শাড়ি সরে গিয়ে তার তলপেট থেকে হাটু পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। দুটি ছোটো কলাগাছের কান্ডের মতো উরুমূল তার যুগল বাহু জ্যামিতির কাঁটার মতো বিস্তার করে থাকায় বেউলার অধোদেশকে একটি সুন্দর তোরণের মতো মনে হতে থাকল আবিদের। আবিদ আবার মুখটা নামিয়ে আনল মেহগনি কাঠের আলো পিছলে যাওয়া কালো রঙকে হার মানাবে এমন সুন্দর নাভিমন্ডলের কাছে। চুম্বনের ইচ্ছায় ঠোঁটের মাংস কুঞ্চিত হতে থাকলেও বেপারি গিঁটের একটা কুঁচকানো অংশে দাঁত চেপে আস্তে টান দিল। প্রথম টানেই গিঁটের পাকানো আঁচলটা খুলে গেলে আবিদ বলল, দেখলা সুন্দরী, আমি কেমনে আঁট গিঁরো খুলতাম পারি।'

কথা বলার সময় আবিদের চোখ বেউলার মুখের দিকে ছিল না, বরং শাড়ির বাঁধন মুক্ত হয়ে পড়ায় তার অধোদেশ সম্পূর্ণ নিরাবরণ থাকায় বেপারি কালো গুল্মময় ত্রিভুজাকৃতি এক ঈষদুচ্চ ব-দ্বীপের মোহময় সৌন্দর্য অবলোকন করতে ব্যস্ত। আবিদের মনে হল যেন এক ফণা মেলা সাপিনী তার ফণাসহ গর্তে ঢুকতে গিয়ে গর্তের মুখে মুখ আটকে থমকে আছে।

'নেন, জাগা ছাড়েন, আমি হুতি।'

বলে বেউলা সুন্দরী বেপারির অভিভূত মুখের ওপর তর্জনীর টোকা মারল। বেপারি নাওয়ের মধ্যভাগের দখল ছেড়ে ছইয়ের কাছে সরে যেতেই বেউলা সুন্দরী চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল পাটাতনে। তার বুক, পেট আর উরতের মাংসপেশিকে মনে হচ্ছে কোনো পারদর্শী শরীরচর্চাকারিণীর প্রদর্শনরতা একটি অপরূপ কৌশলের মতো।

আবিদ বেপারি লুঙ্গিটা খুলে দড়ির কাপড়ের ওপর রেখে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'একটা সিগ্রেট খাইয়া লমু?'

'আ মরণ। এমুন সময় আবার কেউ সিগ্রেট ধরায়? রাইত আর বেশি নাই মহাজন, জলদি করেন। হুনতাছেন না কিনারের গাঁওয়ে মোরগা ডাকতাছে। পহর ধলা মারলে আমার বহর ছাইড়া যাইব। আইয়েন।'

বেপারির দিকে না ফিরে বরং ছইয়ের বাঁকা তুঙ্গে ঝোলানো সাপের হাড়ের সাদা মালাটার ওপর চোখ রেখে তাড়া দিল বেউলা সুন্দরী।

আবিদ বেপারি গায়ের জামাটা খুলে স্তূপ করে দড়ির ওপর রেখে সাপের ঝুড়িগুলোর কাছে যেখানে বেউলা তার কদলীকাণ্ডের মতো নগ্ন উরুযুগল ভাঁজ করে শুয়ে আছে সেখানে গিয়ে বসল। তার সামনে গম্বুজের মতো বেউলার সুডৌল হাঁটুর চূড়া উঁচু হয়ে আছে। আবিদ বেপারি নিজের হাঁটুর ওপর নিজেও একটু উঁচু হয়ে উঠল। তার মাথা সাপের সাজানো ঝুড়িগুলোর সমান হলে সে দেখল বেউলা চোখ মুদে গম্ভীর, থমথমে ভাবে শুয়ে আছে। আর তার বুকের ওপরে গোল আতাফলের মাঝে বসা দুটি ভ্রমরের মতো স্তনের বোঁটা সদাজাগ্রত কালো আঁখিতারার মতো স্থিরভাবে বেপারির উলঙ্গ দেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে স্তম্ভিত, অভিভূত।

কোমল স্পর্শে বেপারি বেউলার গম্বুজের মতো হাঁটুতে হাত রাখলে মেয়েটি অতি ধীরে তার ভারি উরুযুগলের একটি ফাঁক করে দিল। যুগলের বাম স্তম্ভ জংঘার একপাশে আস্তে নেমে গেলে বেউলা তার ভাঁজ-করা বাম পায়ের ভাঁজ খুলে পাটাতনের ওপর নিঃশব্দে স্থাপন করল। বেশ আরামের সাথে রাখল পা'টা। অন্য পা'টাও এভাবেই রাখবে ভেবে বেপারি অপেক্ষা করছে। কিন্তু স্তম্ভটা অনড়। বেপারি তার ডান হাতটা আবার স্তম্ভের চূড়ায় রাখতে গিয়ে বুঝল হাত কাঁপছে। ঠিক জালি লাউয়ের মোটা লতার মতো কাঁপছে। বেপারির স্পর্শে বেউলা ঘুম-জড়ানো ধানচেরা চোখ দু'টি মেলল। দৃষ্টিতে গভীর ঘুমের অলসতা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি বোঝা গেল না। কালো মাংসল ঠোঁটজোড়ায় কোনো বাসনার কুঞ্চন নেই। বরং কেমন দৃঢ়তায় সংবদ্ধ।

বেপারি কাঁপা গলায় বলল, 'পাও সরাও বাইদানি।'

বেপারির বাইদানি সম্বোধনে বেউলার চাপা ঠোঁটের ওপর হাসির একটু মৃদু ঝিলিক খেলে গেল। সে অনুমান করল তার মহাজনের অবস্থা কাহিল। বেউলা তার ডান উরু একটু ডান দিকে হেলিয়ে প্রসারিত করতে লাগল। তবে তা পাটাতনের ওপর না বিছিয়ে অকস্মাৎ তুলে দিল বেপারির বিস্তৃত কাঁধের ওপর। পায়ের পাতা কাঁধ অতিক্রম করে গিয়ে সাপের ঝুড়ির ডালায় ঠেকল। বেপারি বেউলার এই উদার সম্প্রসারণে কৃতার্থ হয়ে তার ডান হাঁটুর পাশে ঠোঁট ঘষতে লাগল। দর দর করে ঘাম ঝরছে আবিদের পেশিবহুল পিঠ আর বুকের পশম ভিজিয়ে। তার কোমরে মোটা ঘুন্‌সির তাগাটা ভিজে আঁট হয়ে আছে। বেপারির নগ্নতাও এখন শিল্পিত পাথরের মতো সুন্দর আর ঋজু। যেন জাদুঘরে রাখা পালযুগের কোনো অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি ধরাচূড়া ফেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছে।

ওদিকে আবিদের অলক্ষ্যে তার পিঠের ওপর রাখা বেউলার ডান পায়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ পায়ের পাতা ও আঙুল অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ রাজহাঁসের চঞ্চুর মতো ঠোকর মেরে সাপের ঝুড়ির ডালাটা ফেলে দিল। আর চক্ষের নিমেষে একটা অকথ্য ফোঁসফোঁসানি তুলে ঝুড়ির অধিবাসিনী কালনাগিনী দ্রুত হিলহিল করে বেউলার পা বেয়ে নেমে এসে আবিদের ডান বাহুতে ছোবল হানল। বাহুর ওপর সাপের মুখের ভেজা শীতল স্পর্শে ঘাড় ফিরিয়েই বেপারির চোখের তারা ভয়ে স্থির হয়ে গেল। সাপটা বেউলার উরতের ওপর থেকে ঘাড় বাঁকিয়ে আবিদের দু'চোখের মধ্যিখানে ফনা তুলে একটু একটু ডানে-বাঁয়ে দুলছে। আর মুখ থেকে কালো সুতোর মতো সরু জিভটা দ্রুত পিছলে পিছলে আসা-যাওয়া করছে। বুঝি নড়লেই আবার ছোবল হানবে। বেউলা একদৃষ্টে সাপটার দিকে তাকিয়েই চোখ বড়ো বড়ো করে চিৎকার করে উঠল, 'খাইছে মহাজন, আপনেরে কালে খাইছে। সব্বোনাশ অইছে— এই হাপের যে দাঁত তোলা অয় নাই গো!'

তার চিৎকার আর উরতের কাঁপুনিতে সাপটা ক্রুদ্ধ হয়ে আবিদের দু'চোখের মাঝখানে নাসিকার গোড়ায় সজোরে ছোবল মারল। বেপারি দুচোখের পাতা থর থর করে কয়েকবার কেঁপে শেষে স্থির বিস্ফারিত হয়ে রইল। তারপর অজ্ঞান দেহটা উবুড় হয়ে পড়ল বেউলার বুকের ওপর। এমনভাবে পড়ল, দেখলে মনে হবে কোনো রমণরত পুরুষ তার অংশভাগিনীকে মধুরতম পুলকের মাঝে আলোড়িত করতে করতে দাঁত দিয়ে বক্ষবর্তুল মর্দন করছে।

আবিদের জ্ঞানহীন দেহটা বুকের ওপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে খিলখিল করে হেসে উঠল বেউলা সুন্দরী।

তার বাহুর ওপর থেকে ফণা মেলে রাখা কালনাগিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার লখিন্দরের কাম অইয়া গেছেলো নেংটা বাইদানি। অখন তোর ফোঁসফোঁস থামা।'

বলেই আবার খিলখিল করে হাসতে লাগল বেউলা। মুখমন্ডল উঁচু করে আবিদ বেপারির কপালের নীচে নাসিকার গোড়ায় যেখানে সাপটা ছোবল বসিয়েছিল, সেখানে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন করল। পরে বেপারির দেহটাকে কায়দা করে বুকের ওপব থেকে ঠেলে পাশে চিৎ করে শুইয়ে দিল ঠিক একটা বাচ্চা ছেলেকে শুইয়ে দেওয়াব মতো। বেপারির ঠোঁটজোড়া একটু ফাঁক হয়ে আছে। তার ধীরগতি নিশ্বাসের দুলুনিতে পেশল বুক আর নেতিয়ে-পড়া পেট পরস্পরের সাথে তাল রেখে ক্রমাগত ওঠাপড়া করছে। শিশ্নটিকে মনে হচ্ছে হাত ফস্‌কে বেরিয়ে পড়া 'টাকি' মাছের মতো লম্বমান।

বেউলা সুন্দরী উঠে বসে নগ্ন জংঘাপ্রান্তে দু'হাত রেখে আড়মোড়া ভাঙল। লুটিয়ে পড়া কেশরাশি খোঁপা করে বাঁধল। কিন্তু শাড়ি পরল না। সাপটাকে তখনও ফণা ধরে থাকতে দেখে হাত বাড়িয়ে কালনাগিনীর ঘাড়টা খপ করে ধরল।

'দাঁত নেই বাইদানির আবার ফোঁস্‌ফোঁসানি কত। লো নেংটা বাইদানি, তুই আমার লখিন্দররে করলি কী? দিমু মাথা ছেইচা।'

সাপটাকে কপট তিরস্কার করতে করতে কোমর উঁচু করে বেউলা উঠল। কালনাগিনী তখন বেউলার হাতে লতার মতো ঝুলছে। সাপটা যাতে দেহ মুচড়াতে না পারে সেজন্য অপর হাতে তার কোমরটা ধরে ফেলল বেউলা। শেষে তুলে এনে ঝুড়ির ভেতর নামিয়ে দিয়ে ডালা চাপিয়ে দিল। তার হাতের নড়াচড়ায় কোনো তাড়াহুড়া আছে বলে মনে হল না। বরং ধীরে সুস্থে ছইয়ের বেড়ায় কাপড় ঝোলানোর দড়িটার কাছে বসে বেপাবির গামছা দিয়ে মুখটা মুছল। টাকার খুতিটা খুঁজে বের করে তা সাপের ঝুড়ির ডালার ভেতরে গোল করে গুজে দিল। এবারও সাপটা ফোঁসফোঁসানির শব্দে তার ক্রোধ ব্যক্ত করছে।

টাকাব খুতিটা সামলানো হয়ে গেলে বেউলা গামছাটা দিয়ে বেপারির জ্ঞানহীন দেহের নগ্নতা ঢেকে বেশ সাহসের সাথে তাকে পাঁজা কোলে তুলে নিয়ে নৌকার গলুইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। আবিদ বেপারির ভারি দেহের ভারে বেউলার মতো শক্তিস্বরূপিনীও একটু বাঁকা হয়ে আছে। নদীর ওপর জোর বাতাস আর অনর্গল ঢেউ থাকায় আবিদ বেপারির জেলে নৌকার হালকা গলুইটা মাছের মতো লাফাচ্ছে। বেউলা নাওয়ের দাপানিতে পানিতে পড়ে যাওয়ার ভয়ে একটা সুযোগের অপেক্ষায় নৌকার কিনারার কাঠে পা রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আবিদ বেপারির ভারি দেহের ভার তার হাতে আর সইছিল না। শেষে ঢেউয়ের দুলুনির মধ্যেই সে জেলেনৌকাব গলুইয়ে পা রেখে চিব অভ্যস্তের মতো উঠে গেল। আর জেলেনৌকার দুটো তক্তার ওপর বেপারিকে শুইয়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে নদীর পানি তুলে বেপারির চোখে একটা ঝাঁপটা মেরে দ্রুত ফিরে এল নিজের নৌকায়। তারপর মুহূর্ত বিলম্ব না করে লগির বাঁধন খুলে নাও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল বেদে বহরটার দিকে। যেন মেঘনার ললাটের ওপব থেকে এক অতিকায় কালো চক্ষু স্ব-ইচ্ছায় তার সহোদরা লোচনকে ত্যাগ করে ভেসে যাচ্ছে। আর ঢেউয়ের ওপর আটকে রাখা দোদুলামান পরিত্যক্ত নয়নটি এক নগ্ন গঙ্গামূর্তির চাতুরি দেখে অথই ঢেউয়ের ওপর ছলছল করে কাঁদতে লাগল।

রঙ্গিনী



শওকত আলী

নটবর সাহার দোকানে সারাদিন বসে রয়েছি। ইচ্ছে ছিল, বৃষ্টিটা ধরে এলে পিরগঞ্জে চালকলের মালিকের কাছে যাব। যদি মওকা পাই তো পঞ্চাশ ষাট বস্তার একটা ব্যবস্থা করে আসব। মালিক আশা দিয়ে গেছে, নিজের বুদ্ধিতে যদি বর্ডার থেকে কিছু বেশি মুনাফা আনতে পারি তাহলে তাতে আমারও আধা শেয়ার থাকবে।

সেই আশায় বসে আছি দুদিন ধরে। সেই মঙ্গলবার বেরিয়েছি, আজ বৃহস্পতিবার। দুদিন ধরে গাড়িটা খোঁটায় বাঁধা বেওয়ারিশ গোরুর মতো খোলা মাঠের মাঝখানে জবুথবু হয়ে ভিজছে। বনেটের ওপর যদিও তিরপাল ঢাকা, তবু নিশ্চিত জানি দুদিন বৃষ্টিতে ভিজে ইঞ্জিনের গায়ে লালচে রঙের মরচে ধরবে। গরুর যেমন বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ করে, গাড়িরও তেমন অসুখ করবে। কিন্তু উপায় তো কিছু নেই। কী আর করা যাবে!

এক উপায় ছিল। সোজা পিরগঞ্জে গিয়ে হলট্ করা। তারপর ফাঁক বুঝে চালের বস্তা নিয়ে এই পথে এসে রাতারাতি বর্ডার পেরুনো। উপায় ছিল, কিন্তু সাহস হয়নি। বাইরের গাড়ি, ফুল-লোড চাল নিয়ে এপথে আসবে হাটুরে মানুষের চোখের ওপর দিয়ে তা কি আর মানুষের চোখে পড়বে না। দু'দুখানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাট পার হয়ে যেতে হবে, তখন যদি কেউ পিছু নেয়! তখন তো রাজ্যের ঝামেলা। ফুড্ ইন্সপেক্টর, থানা, পুলিশ, উকিলের পেছন পেছন দৌড়াদৌড়ি তার ওপর আবার মালিকের মুখ খিস্তি।

সেইজন্যেই সাত-পাঁচ ভেবে এমনি বসে রয়েছি।

যদি গাড়ি ভালো থাকত, যদি কারবুরেটরটা অমন ট্রাবল না দিত। কিম্বা গিয়ার বক্সটা অমন জখম না থাকত তাহলে চেষ্টা করে দেখতাম, অন্তত ভয়টা কম হত। ঝড় বৃষ্টি জল কাদা মানতাম না। রাতারাতি যেতাম, রাতারাতি চলে আসতাম। কিন্তু খোঁড়া গাড়ি নিয়ে সে সাহস করতে যাওয়াই তো বোকামি! বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কী!

বুঝতে পারছি অন্যান্য বার যা হত এবার তা হচ্ছে না। অন্যান্য বার এমনি কপাল হাতে করে আসমানের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হত না। একদিন কি জোর দুদিন, এরই মধ্যে নটবর সাহার মুদিখানার পেছনের খুপড়িতে বসে বসে শলাপরামর্শ হত, সুযোগসন্ধান চলত, দেনা পাওনা মিটত। তারপর সোজা পিরগঞ্জ। সেখান থেকে ট্রাকবোঝাই চাল নিয়ে রাতারাতি পাড়ি। রানি সংকৈল-হরিপুর বর্ডার দিয়ে নয়তো আরো উত্তরে পূর্ণিমা রোড ধরে। এবার তা হচ্ছে না। হত যদি বৃষ্টি না নামত, যদি গাড়ি জখম না থাকত।

এখন আমি শালা আলসে বড়োলোকের মতো নটবর সাহার গদিতে বসে আয়েস করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। দোকানটা যেন আমারই, যেন আমার অন্য কোনো কাজ নেই।

নটবল কাল থেকে বিরক্ত হতে আরম্ভ করেছে। মাঝে মাঝেই বলছে, এ বিষ্টি ছাড়বে না হে। চলে যাও। দেরি করে লাভ কী।

কিন্তু আমি কেমন করে যাই। যত বিরক্তই হোক, ও শালা কী বোঝে গাড়ির! মাঝপথে গাড়ি কাদায় আটকালে ও তো আর আসবে না গাড়ি তুলে দিতে। মরব তো আমিই।

আমি জানি ওর অমন উসখুশির কারণটা কী। কেন ও অমন ভেতরে ভেতরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারণ জানি বলেই আমার মজা লাগছে লোকটার অবস্থা দেখে। তাই জুত করে গদিতে এসে বসছি। মঙ্গলবার সন্ধেবেলা এসেছি, আর বুধবার সকাল থেকেই তেল-কালি মাখা প্যান্ট আর গোলগলা গেঞ্জি ছেড়ে পাজামা শার্ট পরছি। হাতের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধতে ভুলিনি। অনেকক্ষণ ধরে নিখুঁত করে দাড়ি কামিয়েছি। মাথার চুল আঁচড়াচ্ছি পরিপাটি করে। তাক বুঝে খুশবুদার সিগ্রেট ফুঁকছি।

অন্যান্যবার নটবর দিল-খোলা আলাপ করে। বছর দুয়েক হল ছেলেবউ হিন্দুস্তানে রেখে এসেছে। অন্যান্যবার আমি এলেই মেয়েমানুষের গল্প করত। নতুন কোনো মেয়ের সঙ্গে ফুর্তি জমাবার চেষ্টায় আছে, কার বউ রাতের বেলা স্বামীর বিছানা ছেড়ে ওর বিছানায় এসে শুয়েছে, কোন বিধবা যুবতি কখন ওকে কী ইঙ্গিত করেছে — এইসব আজগুবি গল্প শোনাত। বলার সময় ওর কেমন গর্ব হত। দেখতাম, ওর চোখেমুখে অশ্লীল গর্বের জলুস জ্বলজ্বল করছে।

এবার কিন্তু তেমন দেখিনি। পয়লা রাতে ও কারুর গল্প করল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল উসখুশ করল। ঘুমাল না। আমি দেখলাম, অবাক হলাম। পরে অবশ্যি ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে। বুঝেছি ওর উস্‌খুশির কারণটা কী।

নটবরের চুলে পাক ধরেছে। ভুঁড়িটা দেখতে বিশ্রী রকমের লাগে। গোলগাল নয় ঠিক, সামনের দিকে কিছুটা ঠেলে বেরিয়ে আসা। একটা মাংসপিণ্ড যেন প্রবল শক্তিতে পেটের ভেতর থেকে সুমুখের দিকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশ হল। কিন্তু তাতে কী, নটবর বয়সের কথা ভাবতে চায় না। রসালো আলাপের আসরে এখনো সে হাসতে হাসতে গলে যায়। এখনো ওর মনের ভেতরে রসের চুসকুঁড়ি বুড়বুড়ি কাটে। বেহাটের দিনে কোনো সাঁওতাল যুবতি ওর দোকানে সওদা করতে এলে ফাঁক বুঝে গালে টোনা মেরে হাসতে সে ভুল করে না।

এসব আমার নিজের চোখে দেখা। কেষ্টদাস বাবাজির আখড়ায় মেয়েরা এপথে হেঁটে যাবার সময় নটবরের কৃষ্ণপ্রেম উথলে ওঠে। ভাবে আত্মহারা হয়ে চণ্ডীদাসের পদ গেয়ে উঠতে তার ভুল হয় না, 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।' যদি মেয়েদের মধ্যে কেউ অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়েছে তো নটবর সাহা চোখের ইশারা করতে দেরি করেনি। আশপাশের গ্রামের সব বাড়িতে ওর অবাধ গতি। যুবতি বিধবা মেয়েদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক পাতানো চাই। কারুর মামা, কারুর কাকা, কারুর পিসে, কারুর মেসো। সধবা মেয়ে ছাড়া কারুর সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্ক পাতায় না। এসব দিকে খুব হুঁশিয়ার নটবর।

আমি ওর এসব ব্যাপার ভালো করে জানি। ভেবেছিলাম, একই রকম দেখব ওকে এবারও। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। হাসিখুশি অমন ফুর্তিবাজ লোকটা বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। গত দুদিনে মেয়ে খদ্দের এসেছে তার দোকানে, কিন্তু নটবরের সেদিকে যেন খেয়ালই নেই। মেয়েমানুষ দেখলেই যেমন আগে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে যেত এখন আর তেমন দেখলাম না।

মনে হচ্ছে, মনের ভেতরে ভেতরে মানুষটা কোথায় একরোখা হয়ে রয়েছে। বুড়ো জেদি ঘোড়ার মতো দেখতে লাগছে একেক সময়। সর্বক্ষণ বুকের ভেতরকার অস্থির একটা দাপাদাপি অতিকষ্টে চেপে রাখছে আর থেকে থেকেই উসখুশ করে উঠছে। আমি রয়েছি বলে স্বস্তি পাচ্ছে না একবিন্দু।

ওর এই অস্বস্তির কারণটা আমার কাছে এখন পরিষ্কার। আর সেজন্যেই মজা লাগছে। আধবয়সি মানুষটা কেমন অস্থির ছটফট করছে ভেতরে ভেতরে অথচ মুখে কিছুই বলতে পারছে না দেখে আমার সময় সময় হাসি পাচ্ছে। জুত করে বসে বসে সিগ্রেট ফুঁকছি আর মনে মনে হাসছি।

এবার এসে নতুন জিনিস দেখলাম। আর তাই দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছি ওর এখনকার উসখুশির কারণ কোথায় লুকনো, আমি এখানে রয়েছি বলে কেন ও বিরক্ত হচ্ছে। অন্যান্য বার এমন হত না। অবশ্যি অন্যান্য বার এমন দুতিন দিন ধরে ওর ঘাড়ের ওপর চেপে বসে থাকিনি। সন্ধেবেলা এসে একটা রাত থেকে পরের দিন বিকেলে পথে নেমেছি। ওই এক রাতের মধ্যেই দেখেছি মেয়েমানুষের দরকার হলে আমাকে গদিতে এসে শুতে হত। আমার কাছে লুকোত না। লুকোবার প্রয়োজন বোধ করত না হয়তো। যেসব মেয়েমানুষ ওর ঘরে এসে শুত, তাদেরকে পাবার জন্যে তার কোনো ভাবনা ছিল না, খবর দিয়ে পাঠালেই এসে রাত কাটিয়ে যেত।

নটবরের কী ভব্যতা জ্ঞান! আমাকে ও বলেছে কতবার, মিস্তিরি তোমার দরকার থাকে তো বল।

আবার এও দেখতাম, একেকদিন ক্লান্ত আর বিরক্ত হয়ে পড়ত মানুষটা। নিজেকেই গালাগাল দিত। বলত, দ্যাখো মিস্তিরি, কী বাজে নেশায় মজে গিয়েছি। মেয়েমানুষগুলো কাদার মতো গায়ে গায়ে লেগে থাকতে চায়। একটু লজ্জা থাক। বাজারের হলেও, মেয়েমানুষ তো, কাঁহাতক ভালো লাগে, দিনের পর দিন একই রকম।

আমি তখন শুনেছি শুধু, কিছু বলিনি। লোকটা দিনের পর দিন ওই একটা নেশাতেই মেতে আছে, বিরক্তি লাগবারই কথা। আমার নিজেরই মদের নেশার জন্য কত খারাপ লাগে সময় সময়। একই ঝাঁঝ ঝাঁঝ উত্তেজনা,

শরীরে ভেতরে ভেতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে, মাথার ভেতরটা ভারী হয়ে উঠছে, তার পরের দিনে তেতো স্বাদের ভোরবেলা। একই রকম —একই রকম, দিনের পর দিন শুধু একই রকম— ও কি ভালো লাগে?

তবে নতুন কিছু হলে মন্দ লাগে না। যেদিন মালিক বিলিতি জিনিস খাওয়ায় সেদিন নতুন স্বাদ মেলে, তেষ্টা নিভতে চায় না বুকের ভেতরে কী যেন হা হা করে ওঠে। বুঝতে পারি, নটবরেরও হয়েছে সেই অবস্থা। একটা কিছু নতুন কিছু ব্যাপার ঘটেছে। যেখানে দিনের পর দিনের পুরনো আর বিরক্তিকর অভ্যাসের বাইরে নতুন কিছু উত্তেজনার স্বাদ পেয়েছে লোকটা।

সেটা যে কী বস্তু প্রথম দিনেই চোখে পড়েছে আমার। হাটের কাছে গাড়ি থামিয়ে নামতেই দেখি নটবর দোকানে একটি রসবতী যুবতি মেয়ের সঙ্গে মস্করা করছে। হ্যাঁ, রসবতী কথাটি তখনই মনে পড়েছিল আমার। কথাটা শোনা ছিল, কিন্তু তখনই প্রথম মনে হয়েছিল রসবতী মেয়ে এইরকমই হবে। দোকানের কাছাকাছি দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। মেয়েটা খোলা রাস্তায় রাখা নুন হাত নিয়ে ছিটোচ্ছে নটবরের গায়ের ওপর আর খিলখিল করে হেসে যাচ্ছে, নটবর ধমক দিচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কোনো পরোয়া নেই মেয়ের।

অজ পাড়াগাঁয়ে বেহাটের দিনে হাটের মাঝখানে যে একখানা মোটরগাড়ি এসে থামল, একজন শক্তসমর্থ পুরুষমানুষ যে সে গাড়ি থেকে নামল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করল না মেয়েটা। সে তখন হাসছে আর দেখছি শাড়ির আঁচল-ঢাকা আদুল গায়ের ওপর দিয়ে পুরুষের বুকে জ্বালাধরানো ঢেউ দুলে যাচ্ছে। পুরুষমানুষের বুকের ভেতরকার যত থরথর অস্থির পিপাসা —তাই যেন হাসির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার শরীর ঘিরে ঢেউয়ের মতো দুলছে।

একেবারে দোকানের ঝাঁপের নীচে গিয়ে দাঁড়ালে তবে মেয়েটা মাথায় কাপড় তুলে ধীরে ধীরে সরে গেল। তারপর আমাকে দেখতে পেল নটবর। ডাকল, আরে মিস্তিরি যে—এসো, এসো, তা কেমন আছ।

আমি তখন পেছন ফিরে লক্ষ করছি। মেয়েটা কোথায় যায় দেখি। দেখলাম হাটের পাশে রামদাস ঝাড়ুদারের বাসা ছিল, সেই বাসায় গিয়ে ঢুকল।

নটবরের কুশল প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, রামদাসের মেয়ে নাকি?

না রামদাসের মেয়ে নয়, নটবর পরিচয় দেয়, একমাস হল রামদাস হরিপুর হাটে ডেরা বেঁধেছে। নগেনদাস এসেছে নতুন ঝাড়ুদার, তারই বউ।

তা ভালো, আমার হাসিমুখে হাসি ফুটেছে তখন। জানতে চেয়েছি, নগেনদাসও কি বুড়ো হাবড়া নাকি?

আরে না না, নটবর আশ্বস্ত করতে চেয়েছে, বুড়ো হবে কেন সুস্থ জোয়ান তাগড়া মানুষ পালকি বয়ে বেড়ায় রাতবিরেতে, মাঝে মাঝে একদিন বাড়িতে ফেরেই না, মেয়েটা একলা একলা ঘরে থাকে। কথা বলার লোকজন নেই, বুঝতেই পার কী অবস্থা। মেয়েমানুষ হলেও মানুষ তো, সেজন্যেই মাঝে মাঝে আসে, অন্য কিছু না।

তা আসুক, আসবে না কেন, কিন্তু নটুদা, তুমি শালা মুফোতে ফুর্তি লুটছ মনে হচ্ছে!

আরে না না, কী যে বল তার ঠিক নেই। সবারই সঙ্গে সবকিছু হয় নাকি? যা দেখলে ওই পর্যন্তই। আসলে জানো মেয়েটার মাথাটাও খারাপ। হেসে হেসে যত খুশি, যা খুশি কথা বল, বাড়িতে গেলে খাতির যত্নও করবে। কিন্তু একটু বেচাল হয়েছ কি টাঙি নিয়ে ছুটে আসবে।

এসব কথা পরশুদিন নটবরের মুখে শুনেছিলাম। দেখছিলাম একখানা কালো চোয়াল-তোলা চৌকোনো মুখ নিঃশব্দে কী করে মনের ভেতরকার লোভটাকে লুকোচ্ছে। ঘষা কাচের মতো ঘোলাটে আবিল চোখ দুটোতে কী ভালোমানুষি স্বচ্ছতা আনতে চেষ্টা করছে।

আমাকে বিশ্বাস করাবার জন্যেই কি না কে জানে, শেষটা বলল, জানো আমাকে মেয়েটা ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে।

তখন আবার পেছন ফিরে তাকিয়েছি। দেখছি শাড়ির আঁচল দুলছে আমগাছের আড়াল দিয়ে। আমি তখন নটবর সাহার কথা শুনছি, আঁচল দেখছি আর হাসছি।

তুমি বিশ্বাস করো মিস্তিরি, শালী কী হারামি, নটবর তখনও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। আমার কম পয়সা খেয়েছে! একেক সময় মনে হয় ওর পাগলামিটা একটা মস্ত চালাকি, লোক ঠকাবার কায়দা।

এ সবই সেই প্রথম দিন, যেদিন গাড়ি থেকে নেমে দোকানের ঝাঁপের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর

দুদিন ধরে দেখছি। দেখে এখন বুঝে ফেলেছি। এখন বুঝি এখান থেকে শিগ্‌গির সরে না গেলে নটবর স্বস্তি পাচ্ছে না। আমার নজর দেখে এখন ওর বড়ো ভয়। বড়শিতে গেঁথে মাছকে লম্বা সুতোয় অনেক খেলিয়ে পাড়ে এনে ডাঙায় তুলতে ভয়। যদি এখন অন্য কেউ এসে মাছটাকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

দেখেছি মেয়েটা যুবতি। হাটের ঝাড়ুদারের বউ হলে কি হবে। মেয়েটার শরীর পাকা ফলের মতো টসটসে। চামড়ার ওপর ছিল্লছিলে চেকনাই। আর অমন ঠোঁট, অমন চোখ কোথাও দেখিনি আমি। কত শহর বন্দর ঘুরেছি কিন্তু অমন উঁচু বুক, অমন গোলগোল হাত পা আর অমন উরুর গোছা —শালা আমি জীবনে দেখিনি। আমাকে ছোটো মালিক বে-সোডা এক গেলাস বিলিতি মদ খেতে দিয়েছিল একবার। সেই গেলাস খাওয়ার পর আমার আরো খেতে ইচ্ছে করেছিল। বুকের ভেতর জ্বালা ধরেছিল আগুনের মতো, তবু বোতলটার দিকে তাকিয়ে দারুণ লোভ হচ্ছিল।

এ মেয়েও যেন টলমল কানা-ছলকানো একটা বিলিতি মদভর্তি গেলাস। যা প্রাণভরে খেয়ে নেবার পরও বুকজোড়া পিপাসা হা হা করে ওঠে।

বুঝতে পেরেছি মেয়েটাকে এই হারামজাদা নটবরই নষ্ট করেছে। এতদিন ধরে নানান কায়দায় ফাঁদে ফেলে এখন ফূর্তি করতে চায়।

সবচাইতে অবাক লাগল, নগেন দাসকে একবারও দেখলাম না। রঙ্গিনীকে সেদিনও জিজ্ঞেস করেছি, তোর বাড়ির মানুষটা কি এখানে নেই!

আছে তো, রঙ্গিনী জবাব দিতে একটুও দেরি করেনি।

তবে দেখি না কেন?

ওকে দেখার কিছু নাই। আমাকেই তো দেখছেন, কেন আমাকে পছন্দ হয় না?

কথাটা শেষ করতে না করতেই খিলখিল করে হাসিতে ভেঙে পড়েছে রঙ্গিনী।

এমনি মনে হয় মেয়েটা বাচাল। কিন্তু ও যখন চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলে, ওর চোখের ভেতরকার কালো অন্ধকার তখন পুরুষমানুষকে ডাক দিতে থাকে। যখন এ অবস্থায় নটবরের মতো মানুষেরা বেতাল মাতাল হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময়ই মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠতে পারে। এমনি অবস্থায় সেদিনও নটবরের কাছে বলতে শুনেছি, কী মহাজন, তুতু ডাকা কুত্তার মতোন দেখছ কি গো!

আমি শুনেছি। শুধু শুনিনি। দেখেওছি। অমন চোখা চোখা কথা বলার পরও ফাঁক বুঝে মেয়েটা দোকানঘরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নটবরকে নিজের নরম শরীরে হাত বুলোতে দিয়েছে! মিটি মিটি হেসে বলছে, তুমি আমার বুড়ো কেষ্ট গো মহাজন।

নটবর কিন্তু সজাগ, চোখ সজাগ, কান সজাগ। কখন আমি রঙ্গিনীর সাথে কোন কথা বলি।

তবে নটবরকে আমার থোড়াই পরোয়া। ও আমায় কী করবে? ওর সামনেই রঙ্গিনী আমাকে এসে বলেছে, তুমার এ বন্ধুটা বড়ো বক্‌খিল হে, তুমি ওর মতো নহে তো?

না না আমি কেন ওর মতো হতে যাব? একটা খুশবুদার সিগ্রেট সুমুখে এগিয়ে ধরেছি। নাও খাও।

খুশি হয়েছে মেয়েটা। দামি জিনিস খাও হে তুমি। সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে টানতে তৃপ্তির ভঙ্গি এসেছে মুখে। একটু পর কী ভেবে জিজ্ঞেস করেছে, কী খবর মিস্তিরি। তুমিও কি আমার পিরিতে ফাঁসলে, আমাকে এত খাতির করছ ক্যানে?

আরে রাম বলো, আমি আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করছি নটবরের দিকে তাকিয়ে। বলেছি, কী যে বলো, তুমি হলে গিয়ে আমার বন্ধুর পিরিতের মানুষ। তোমার সঙ্গে তো আমার ঠাট্টা মাজাকের সম্পর্ক। আমি নটবরকে শুনিয়েছি কথাটা। আমিও কম ছেলে নই বাবা হুঁ, বুঝতে বাকি নেই, এ দফা মাছটা আর নটবরের হাতে উঠবে না। ওর কপাল খারাপ তো আমি কী করব।

নটবর এসবই দেখেছে, ওরই সুমুখে কথাবার্তা। না দেখে করবে কী। চোখ কান বুজে তো আর বসে থাকতে পারে না।

এসব দেখেই আসলে মানুষটার মাথার কল বিগড়েছে। যতই দেখছে ততই মাথার কল বিগড়ে যাচ্ছে লোকটার। স্পষ্ট বুঝতে পারছি লোকটা ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠছে। ওর জ্বলুনি দেখে আমার মজা লাগছে।

দেখছি ওকে, আয়েস করে ওর দোকানের গদিতে বসে বসে ধোপ ধোয়া জামাকাপড় পরে সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে। দেখছি আর, অতিষ্ঠ, অধৈর্য স্থূলাঙ্গ মানুষটাকে দেখতে দেখতে আমার কেবলই হাসি পাচ্ছে। ও সর্বক্ষণ ভাবছে, কোন্ সময় আমি নগেন দাসের বাড়িতে ঢুকি। চোখে চোখে রাখছে আমাকে, ওর ভোগের জিনিস শেষটায় আমিই না খেয়ে ফেলি। যতক্ষণ এখানে থাকব, লোকটা নিজেকে গুটিয়ে রাখবে একদিকে আর অন্যদিকে সন্দিগ্ধ চোখ রাখবে আমার ওপর। আমাকেই এখন ওর সবচাইতে বড়ো ভয়। একমাস ধরে শরীরের ভেতরে যে পিপাসাটা ধিকিধিকি জ্বলছে, সেই পিপাসার এবার বিমুখ হয়ে ফিরে আসার ভয়।

বৃষ্টি কিন্তু থামছে না। একটুখানি যদিবা থামছে, কয়েক মিনিটের জন্যে। তারপরই আবার নামছে দ্বিগুণ জোরে। আমি বসে বসে নটবরের দোকানদারি দেখছি, আর সিগ্রেট খাচ্ছি। নটবর বারে বারেই বলছে, এবার রওনা দাও হে, এ বৃষ্টি আর ছাড়বে না।

ও যতই বলুক, যতই বিরক্ত হোক, আমি ওর কথামতো রওনা দিতে পারছি না। মেটে রাস্তায় নতুন মাটি দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে সেই রাস্তায় এখন হাঁটুসমান কাদা। কে মরতে যাবে সে পথে গাড়ি নিয়ে! তার চাইতে এই তো বেশ আছি।

বিকেলের দিকে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করল নটবর। তারপর জিজ্ঞেস করল, যাবে নাকি মিস্তিরি?

কোথায়?

চলো তো আগে, পরে বলছি। যমুনাকে মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম সাধু সেজে। বললাম, না ওসব খারাপ জায়গায় আর যাব না। আর ভালো লাগে না ওসব, ছেড়ে দিয়েছি।

যমুনাকে আমার স্পষ্ট মনে আছে। বলরাম মুচির মেয়ে যমুনা। একবার সেই মেয়েকে নিয়ে খুব মেতেছিল নটবর সাহা। দোকানটা পর্যন্ত রেগুলার খুলত না। তুমি বিয়ে সাদি করেছ নাকি? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল নটবর।

হ্যাঁ, গম্ভীর গলায় জবাব দিলাম, বউ-এর ছেলেপুলে হবে এবার।

তাহলে ছেড়ে দিয়েছ? নটবর কেমন ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল।

হ্যাঁ, আর কত, ছেড়ে দিতে হল। আমি কিছুটা উদাস হতে চেষ্টা করলাম।

আমি টের পেলাম, নটবর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভেবে তারপর বলল, আমারও একেক সময় ওসব ভালো লাগে না। বয়েস হয়েছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে এবার। তোমার জন্যেই যাচ্ছিলাম, দুদিন ধরে এখানে উপোস মেরে পড়ে আছ।

আরে আমার কথা ছেড়ে দাও, নটবরের জন্যে যেন দরদ উথলে উঠল আমার। বললাম, তুমিই বরং একটা কিছু করো। ঝাড়ুদারের বউকে ডাকলে আসবে না?

লোকটা স্থির হয়ে গেল আমার কথা শুনে। চোখে চোখে তাকাল। তারপর নজর ফিরিয়ে নিয়ে হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠল, কী যে বলো তার ঠিক নেই। ও মেয়েমানুষের ঠিক আছে কিছু? মাথাখারাপ মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করা যায় কখনো? মিস্তিরি, তোমারও দেখছি ভুল হয়।

রঙ্গিনী এল ভরসন্ধ্যায়। ডেকে বলল, কইগো মহাজন, কেরাচিনের তেল দাও।

মেয়েটা বৃষ্টিতে ভিজেছে খুব। ভেজা কাপড় সুগোল উঁচু বুকে সেঁটে লেগে আছে। আমি তাকিয়ে রয়েছি দেখে আমার চোখে চোখ রেখে হাসল। কাপড় টেনে টেনে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করল।

ওর হাতে তেলের বোতল ফিরিয়ে দিতে দিতে নটবর জিজ্ঞেস করল, আজ যে দু আনার তেল নিচ্ছ?

আর বলো না, আমার কপাল গো মহাজন। মানুষটা কি আজ আর ঘরে থাকবে! সারা রাত কুপি না জ্বালিয়ে রাখলে ডর করে আমার।

কথাটা বলেই সে আমার দিকে তাকাল। হাসল একটু। আমার মনে হল, এটা ইশারা! ইশারায় জানিয়ে দেওয়া, তুমি এলে আসতে পার।

বুঝলাম, যা ভেবেছিলাম তা নয়। এ মেয়ে জাঁহাবাজ, পাকা খেলোয়াড়। রঙ্গিনী চলে যেতেই আমি রাস্তায়

বার হলাম। বৃষ্টিটা থেমেছে বেশ কিছুক্ষণ হল। আকাশের গতিক একেবারে খারাপ নয়। শেষরাতের দিকে বেরিয়ে পড়লেও ভোর ভোর নাগাদ বর্ডার পার হওয়া যাবে।

বাইরে কিছুক্ষণ খোলা মাঠে বেড়ালাম। আমার নিজেরই ভেতরে কী যেন একটা অস্বস্তি চাপা রয়েছে। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থাকলাম অনেকক্ষণ। ফিরে এসে দেখি নটবর মুখহাত ধুয়ে ফর্সা জামাকাপড় পরছে। ধুতিটা ধবধবে পরিষ্কার লাগছে দেখতে। নিশ্চয়ই ওপারের ধোলাই কাপড়।

কী ব্যাপার, রাতে কাপড় পরছ যে? জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

চৌধুরীদের বাড়ি নেমন্তন্ন আছে, তুমি খেয়ে নিও, চৌকির নীচে আম আছে, টিনে মুড়ি। দুধটা উনুনের উপরেই থাকল।

নটবর কাপড় পরছিল আর কথা বলছিল। চেষ্টা করছিল যাতে কথা বলার সময় সহজ আর স্বাভাবিক ঢঙটা আসে। যেন আমি বুঝতে না পারি ও কিছু গোপন করছে।

আমার তখন মানুষটার ওপর রাগ হতে লাগল। জিজ্ঞেস করতে ছাড়লাম না, নেমন্তন্নটা চৌধুরী বাড়ি না অন্য কোথাও নটুদা?

নটবর কী বলতে যাচ্ছিল। না বলে কেমন থতমত খেল। একটু সামলে নিয়ে শেষটা হেসে ফেলল। বলল, যখন বুঝেই ফেলেছ, তখন লুকিয়ে আর লাভ কী। শোন, তোমাকে খুলেই বলি তাহলে। পাগল টাগল কিছু না, মেয়েটা হচ্ছে এক নম্বরের শয়তান। গত এক মাস ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি, তা শালী কেবলই এড়িয়ে যায়। ইদিকে আমি অন্যদিকেও কোথাও নজর দিতে পারছি না। জানোই তো কোনো মেয়েমানুষ চোখে ধরলে আর অন্যদিকে নজর যেতে চায় না। আমার এখন রোখ চেপে গেছে। দেখা যাক, কত ক্ষমতা ওর।

তা আজ এত সহজে রাজি হয়ে গেল, আমার অবাক লাগে।

মিস্তিরি, টেনে টেনে কথা বলল নটবর, মেয়েমানুষকে চিনলে না। এমনি কি আর রাজি হয়েছে? রীতিমতো গচ্চা দিতে হচ্ছে। তা যাক, যে ফুলে যে দেবী তুষ্ট থাকে।

নটবর ব্যাখ্যা করেই বোঝাতে চাইল ব্যাপারটা। বলল, আমার কাছে একখানা লাল শাড়ি চেয়েছিল। শাড়ির দাম ধরো কমসে কম পঁচিশ টাকা। একমাস ধরে ওই শাড়িখানার জন্যে কেবলই আমাকে খেলাচ্ছে।

তুমিও শেষ পর্যন্ত রাজি হলে?

হ্যাঁ হলাম, না হয়ে উপায় কী, নন্দ বৈরাগী আর ফসিউল্লা দুপেটি কাপড় নিয়ে এসেছিল ওপার থেকে। যাবার সময় একখানা দিয়ে গেছে। ভাবছি ওটাই দিয়ে দেব।

একটু থেমে আবার বলল নটবর, আমার এই নেশাটার জন্যেই কিছু করতে পারলাম না হে। খালি টাকা ওড়ালাম। এ শালা চৌদ্দপুরুষের রক্তেরই দোষ। আমাকে জানোয়ার বলে ডাকতে পার। ইচ্ছে করলে ভাদুরে কুত্তার নাম দিতে পার। আমার কিছুই বলার থাকবে না। শত্তুরেরও যেন এই অবস্থা না হয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার মুখে নটবর ফের জিজ্ঞেস করল, তুমি ঘরেই থাকবে, নাকি কোথাও বেরুবে?

না, ভাবছি এবার রওনা দেব। বিষ্টি বোধহয় আর নামবে না।

আজ আর গিয়ে কী লাভ, নটবর সাহা উদার হয়ে গেল হঠাৎ। বলল, আজ থেকে যাও। কালই যেও। রোববার শহরে গিয়েছিলাম, দুটো বোতল এনেছি। যদি চাও তো যমুনাকে খবর পাঠাই, রাতটা কাটিয়ে যাও।

ও কথা বলছিল, আমি শুনছিলাম। বুঝছিলাম, এই হাড়কঞ্জুষ, নোংরা, লুচ্চা, মাঝবয়সি লোকটা প্রথমে আড়াল করতে চেয়েছিল নিজেকে। এখন তাতে কোনো লাভ নেই দেখে খোলাখুলি কথা বলছে। তাই আমার জন্যে দয়া উপচে পড়ছে এখন। বুঝে বসে আছে রঙ্গিনীর ওপর ওর অধিকার আমি স্বীকার করে নিয়েছি। এখন আর ওর ভোগের জিনিসের ওপর হাত বাড়াব না।

এই মানুষ সহজে হাতের মুঠো খোলে না, সহজে ওর চিতানো হাত উপুড় হয় না। সাজ হল। দেখলাম লোকটার দুচোখে কী রকম সবুজ আলো ধিকি ধিকি জ্বলছে। ভগবান জানে কতদিন থেকে। সে ভেবেছিল অন্য মেয়েদের বেলাতে যা হয়েছে, এবারও তাই হবে। খবর দিলেই ঝাড়ুদারের বউ ঘরে এসে যাবে। খরচ যদি হয়েই তবে দু চার টাকার ওপর দিয়ে যাবে। তাই ধীরে সুস্থে অপেক্ষা করছিল। এখন আর বুড়ো হাড়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন জোয়ার এসে ধাক্কা মারে না। অনেক হুঁশিয়ার সে। তাকে টাকা চিনতে হয়েছে অনেকদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। সেই যে, লোকটা ভয় পেয়েছে। বড়ো ভয় তার। এত খেলিয়ে ডাঙার কাছে আনা মাছটা কখন হাতছাড়া হয়ে যায়। এত করে সাজিয়ে তোলা ভোগের থালাটা কখন অন্যে ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়। এতদিনের উসকে উস্কে তোলা আগুনটা গনগনে হয়ে ওঠার মুখে কেউ পানি ঢেলে দিয়ে না যায়।

তাছাড়া আর কত সহ্য হবে! দাঁতে দাঁত চেপে অনেকদিন সহ্য করেছে। কত ফাঁদ পেতেছে, কিন্তু মেয়েটাকে কোনোদিন বাগে পায়নি। হয়তো আরো অপেক্ষা করত। কিন্তু এখন বোকা বনে যাবার ভয়ে চেপে ধরেছে তাকে। একরকম মরিয়া হয়েই সে পঁচিশ টাকা দামের শাড়ি দিতে চেয়েছে ঝাড়ুদারের বউকে।

মেয়েটার তারিফ করতে হয়। বাহাদুর মেয়ে বটে। কী পাকা খেলোয়াড়। শরীর দেখিয়ে আমার সামনে দুচারবার বেরিয়ে, দুটো কথা বলে নটবরের মতো এ লাইনে পোক্ত মানুষকে পর্যন্ত অস্বস্তি আর হিংসায় নাজেহাল করে দিয়েছে। হাড়কৃপণ মানুষটা টাকার মায়া পর্যন্ত ভুলে গেছে।

এসব ব্যাপার দেখে কার না হাসি পায়।

আমি হাসছি নটবরের অবস্থা দেখে। দ্যাখো, কী নাজেহাল অবস্থা বুড়োর। ওর দিকে দেখছি আর নিজের দিকে তাকিয়ে, নিজের কথা ভেবে, মনের ভেতরে গর্ব হচ্ছে। এক গোঁয়ার বেপরোয়া পাকা খেলোয়াড় মেয়েমানুষ যার পায়ের কাছে অন্য অনেক পুরুষমানুষের রক্তমাংসের বাসনা, অনেক রাতের ঘুম, অনেক দিনের ঈর্ষা আর লোভ মাথা কুটে মরেছে, সেই মেয়েমানুষ আমাকে দেখে মজেছে, রাতের বেলা তার ঘরে যাবার নেমন্তন্ন জানিয়ে গেছে। একথা ভাবলে কার না গর্ব হয়।

তবু ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে দিতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কে জানে বাবা, ও মেয়েমানুষের মনে কী আছে।

যাব কি যাব না—এ ভাবনা সন্ধেবেলা থেকেই ভাবছি। বারবার করে বিচার করে দেখছি মেয়েটা সত্যি সত্যি ডাক দিয়েছে না এটাও ওর ছলাকলা।

আমার দরাজ হাতের পয়সা খরচও গত দুদিন ধরে দেখছে। দেখছে আমি ফর্সা জামাকাপড় পরে থাকি। খুশবুদার সিগ্রেট খাই। বয়স আমার অনেক কম, আমার দুহাতের কবজি, টান টান ঘাড়ের চামড়া—সবই দেখেছে মেয়েটা। তাই কেরোসিন তেল কিনতে এসে ইশারায় যে নেমন্তন্ন করে গেল তা আর কার জন্যে হতে পারে, আমি ছাড়া?

নাকি এটাও একটা চাল। দুজনকেই লোভ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে তুলতে চায়। দুজনের মধ্যে বিবাদটা বেধে উঠলে তখন দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দেবে।

নটু'দা! এক সময় আমি নিজের থেকেই ডাকলাম। সে তখন পুরনো খবরের কাগজে রঙিন একখানা শাড়ি জড়াতে ব্যস্ত। কাপড় জড়াতে জড়াতে মাথা না তুলেই সাড়া দিল, কিছু বলবে?

আজ তুমি রঙ্গিনীর ঘরে যেও না। বরং চল বর্ডার পার করে দিয়ে আসি তোমাকে, বউ ছেলেমেয়েদের দেখে এস।

আমার কথা শুনে লোকটা সাড়া দিল না। লক্ষ করে দেখলাম কোনো ভাবান্তর হয় কি না। লোকটা মাথা তুলে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখে আবার উবু হয়ে শাড়ি জড়াতে ব্যস্ত হল।

শোন, আমি আবার ডাকলাম। বললাম, আমার সঙ্গে থাকলে বর্ডার পুলিশ কিছু বলবে না। পরশু তো আরেকবার যাব, তখন আবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব।

না না, কী দরকার অত হ্যাঙ্গামে। বাড়ির খবর পরশু দিনই পেয়েছি। সবাই ভালো আছে, নটবর আমাকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

তুমি শালা বুড়ো শালিক, ঘাড়ে রোঁয়া উঠেছে তোমার। আমার তখন রাগ হয়েছে, বিড় বিড় করে গালগাল করছি ঘাড়ের রোঁয়া না ছাড়ালে তুমি কি আর এমনি এমনি শায়েস্তা হবে!

কিছু বলছ নাকি মিস্তিরি? নটবর হাসে।

হ্যাঁ, বলছি তুমি শালা বুড়ো শালিক ঘাড়ে রোঁয়া গজিয়েছে তোমার।

তা তুমি ভাই যাই বল। আমার স্বভাব নষ্ট হয়েছে তা আমিও বুঝি। কিন্তু কী করব বল, যে মেয়েকে চোখে লাগে তাকে যতক্ষণ কাছে না পাই ততক্ষণ যে কী জ্বালা তা তুমি বুঝবে না, নটবর আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

আমার তখন রোখ চেপে গিয়েছে। গম্ভীর হয়ে উঠেছি। রাগী মালিক যেমন হুকুম করে চাকরের ওপর, তেমনি হয়ে গেছে আমার গলার স্বর। তার চোখে চোখ রেখে বললাম, তুমি যেতে পারবে না, আমি যাচ্ছি আজ রঙ্গিনীর ঘরে।

কী বললে! হতভম্ব নটবর ঠিক বুঝতে পারে না।

আমার নিজের ভেতরে তখন কী একটা সূক্ষ্ম জ্বালা কাজ করে চলেছে। রক্তের ভেতরে পুরনো একটা উত্তেজনা কবে থেকে যেন ধোঁয়াচ্ছিল। আমি নিজেই স্পষ্ট করে টের পাইনি। এখন বুঝতে পারছি তা কী। এখন সেই অস্পষ্ট ধোঁয়ানো উত্তেজনাটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে, অস্থির হয়ে দপদপ করছে। ড্রাইভার মানুষ আমি, অল্পেতে বাগলে, কি বিরক্ত হলে আমার চলে না। কিন্তু এখন আর ধীরস্থির হয়ে যে নিজেকে শান্ত রাখব সে অবস্থা নেই। রক্তের সেই জ্বালা এখন মন অবধি পৌঁছেছে। রঙ্গিনীর শরীরের গরম আর নরম উত্তাপ এই ঘরের অন্ধকারেও যেন ছড়ানো। চোখ বুজলেই এখন রঙ্গিনীকে দেখতে পাচ্ছি। মেয়েটাকে কাপড় ছাড়িয়ে কুপির লালচে আলোয় কেমন দেখাবে সেই ছবিটা মনে মনে ভাবতে ইচ্ছে করছে।

নটবরও সম্ভবত আমার অবস্থা লক্ষ করে থাকবে। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। তার মুখের ওপর বললাম, রঙ্গিনী আমাকে ডেকেছে আজ রাতে, তুমি কেন যাবে!

না, তুমি যেতে পারবে না, ছোটো ছেলের মতো কাঁদ কাঁদ গলায় কথা বলল নটবর।

আমি তখন কিছুই বুঝতে চাই না। বললাম, দ্যাখো নটুদা, আমিই যাব আজ ওর ঘরে। মাঝরাতে ওকে নিয়ে বর্ডার পার হয়ে চলে যাব ওপারে। দিন দুই থাকব সেখানে। দরকার হলে দুদিনের জন্যে দুশো টাকা খরচ করব, মালিকের মালসুদ্ধ বেচে লোপাট করে দেব। পারবি তুই, অমন হিম্মত আছে?

নটবর তখন হাতের মুঠো শক্ত করছে আর খুলছে। বলছে দ্যাখ, গণ্ডগোল পাকাস না, এমনি বেচাল দেখলে জান নিয়ে নেব।

আমি তখন হাসছি। চামচিকের তড়পানি দেখে হাসছি। বললাম, দেখ চেষ্টা করে। কতদূর পারিস। কিন্তু তার আগে? তার আগে তুই কি বেঁচে থাকতে পারবি? পুলিশের হাতে তোকে ফাঁসিয়ে দিতে কতক্ষণ?

নটবর সাহা এতক্ষণ রাগে আপসাচ্ছিল। এবার যেন কিছুটা মিইয়ে গেল। ওর ভয় দেখে আমার আরো হাসি পেতে লাগল। বেদম হাসিতে ফেটে পড়লাম ঘরের বাইরে এসে।

আমি নিজে তো শালা পয়লা নম্বরের লুচ্চা। বাপ যদি বা দু'কলম লিখতে পড়তে শেখাতে চেয়েছিল—আমি তো বাপের সে ইচ্ছেটাকে বিড়ির ধোঁয়ায় ফুঁকে দিয়েছি। অমানুষ হয়ে রয়ে গেলাম। এখন বেপাড়ায় যাই, রোজগারের টাকা জুয়োর টেবিলে উড়িয়ে দিই। গলা অবধি মদ টেনে মাঝরাতে রাস্তার ধারে উদোম হয়ে পড়ে থাকি। আমি হলাম গিয়ে এক নম্বরের না-চিজ। কিন্তু মজা দ্যাখো, আমার চাইতেও এই নটবর শালা দুগুণ বেশি কালতু। যে মানুষ বুজদিল, তার কি দাম আছে সংসারে?

নেশার জিনিস খাইনি। কিন্তু তবু যেন মাতাল হয়ে গেছি। চিন্তাভাবনাগুলোও কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। কেবলই মনে হচ্ছে তখন, নটবর সাহা নোংরা জানোয়ারের চাইতেও অধম জীব। তার মতো মানুষের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ছোটো কাজ করে হাত ময়লা করার সামিল।

একটু পরে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। মাথার ওপরে মস্ত আসমান ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। দু একটা তারা চোখে পড়ে। গাড়ির কাছে গেলাম। সেল্ফ স্টার্টার কাজ করছে না পরশু দিন থেকে। এক্সিলেটরের ওপর ইটের ঠেস রেখে হ্যান্ডেল মারলাম। ঘুমন্ত ইঞ্জিন ডাক ছেড়ে জেগে উঠল।

জিতা রহো বেটা, মনে ফুর্তি এসে গেল।

ড্রাইভারের জিন্দগিতে গাড়িই হল আসল। গাড়ির তনদুরস্তি থাকলে ড্রাইভারও ফুর্তিতে থাকে। দরাজ দিলে তখন সে হাসতে পারে।

গাড়িতে উঠতে যাব, লক্ষ করলাম নটবর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। বোধ হয় ভেবেছে, ওকে মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।

চিৎকার করে ডেকে বললাম, কোথাও যেও না নটু'দা, গাড়িটা দুদিন ধরে ভিজছে। একবার ট্রায়াল দিয়ে দেখে নিই।

গাড়ি তো নয়। পক্ষীরাজের বাচ্চা। আমার মালিক শিউনারায়ণ নাম দিতে চেয়েছিল জয় লছমী। আমি নাম বদলে রেখেছি পক্ষীরাজ। পক্ষীরাজের মতোই গাড়ি যেন উড়ে উঠতে চাইল।

বড়ো রাস্তায় কিছুক্ষণ গাড়ি দাবড়ে ফিরলাম। গাড়ি ঠিক আছে। হাতের ঘড়িতে ন'টা বাজে এখন। নটবরের দোকানে ফিরে এসে দেখি সে ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গেছে। তালা লাগায়নি। বোধহয় ভেবেছে, যদি আমি ফিরে আসি তাহলে দরজা খোলা পেয়ে ওকে আর খুঁজতে যাব না।

নিঃশব্দ রাত। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আমার এখন বেরিয়ে পড়া উচিত। চলে যাওয়ার কথাটা ভাবতেই মনে পড়ল নটবর সাহার কথা। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ল রঙ্গিনীকে। চলে যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম। শরীরের ভেতরকার সেই অস্থির ভাবটা আবার নতুন করে জেগে উঠছে। আসলে রক্তের ভেতরকার জ্বালাটা শান্ত হয়নি। সেই জ্বালাটাই এতক্ষণ ঘরের বাইরে খোলা রাস্তায় টেনে এনেছে আমাকে। কিছুক্ষণ ঘুরিয়েছে এলোমেলো। কিন্তু তবু শান্ত হয়নি। জ্বালাটা এখন আবার প্রখর হয়ে উঠেছে। রঙ্গিনীর চেহারাটা বারবার দেখতে পাচ্ছি মনের ভেতর। কুপীর লালচে আলোয় রঙ্গিনীর ভরাট উপচে-পড়া শরীরটা কেমন লাগবে দেখতে। বারবার সেই ইচ্ছে দাপাদাপি করছে মনের ভেতরে।

আমার রাগ হতে লাগল। হিংসায় জ্বলতে লাগল সারা শরীর। নটবর নিশ্চয়ই এতক্ষণে ফুর্তি জমিয়ে ফেলেছে। কথাটা মনে হতেই মাথায় কেমন রক্ত উঠে এল। আর কোনোকিছু ভাববার মতো অবস্থা থাকল না। যা থাকে কপালে, শালা নটবর সাহাকে আমি দেখে নেব। দরকার হলে খুন করে পালাব। অমন মেয়েমানুষের জন্যে একটা কেন, দশটাও খুন করা যায়। গাড়ির সিটের তলা থেকে হ্যান্ডেলটা বার করে হাতে নিলাম।

আমি জানি না, কেন এমন হয়। মেয়েমানুষের শরীরের ভেতরে কী আছে ভগবান জানে। সব নেশার চাইতে বড়ো নেশা হল এই মেয়েমানুষ। যখন পুরুষমানুষকে এই নেশা টানে তখন বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা কোনো কিছু করার শক্তি থাকে না। তখন জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না। আমার কাজ, আমার ভবিষ্যৎ, আমার সাধ, সুখের চিন্তা, মুনাফার লোভ—সবকিছু তখন তালগোল পাকিয়ে গেছে। চোখের সামনে একাকার অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে একটা কুপী জ্বলছে, আর সেই কুপীর আলোয় একটা মেয়েমানুষের উদোম শরীর কেবলই ঝলমল করছে। তখন মগজের ভেতরে কোথায় যেন ছুরি বিঁধে গেছে। আর আমি তখন টালমাটাল হয়ে সামনের দিকে ছুটছি।

রঙ্গিনী কোন ঘরে থাকে জানি না। পাশাপাশি তিনখানা ঘর। একঘরের পাশে কান পেতে দাঁড়ালাম। কারা যেন কথা বলছে ভেতরে। ঘরে বাতি নেভানো, জানালা দিয়ে টর্চের আলো ভেতরে ফেললাম। দেখলাম, হ্যাঁ, দুজনেই বসে রয়েছে বাঁশের তৈরি খাটের ওপর। আমার সাড়া না পেয়েও রঙ্গিনী চিনতে পারল কেমন করে, ভগবান জানে। ঘরের ভেতরে বসে থেকেই ডাকল, এসো মিস্তিরি। তোমার বন্ধু আমার ঘরে এসে ঢুকেছে, দ্যাখো শখ কত বুড়োর।

ঘরের ভেতর গেলাম। আমাকে দেখতে পেয়েও নড়ল না লোকটা। ডাকলাম তো শালা সাড়া পর্যন্ত দিল না।

দু' পা এগিয়ে গিয়ে ওর ঘাড়ে হাত রেখে বললাম, যাও এবার চলে যাও।

নটবর স্থির, যেন শুনতেই পায়নি।

দ্যাখো মিস্তিরি, রঙ্গিনী কুপী জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, তোমার বন্ধু ঘরে ঢুকেই কুপী নিভিয়ে দিল।

কুপীর শিখা লালচে আভা ছড়িয়ে জ্বলে উঠল। সেই আলোয় দেখা গেল মেঝের ওপর নতুন শাড়িখানা পড়ে। রঙ্গিনী সেদিকে নজর ফিরিয়ে আবার বলল, একখানা শাড়ি দিয়ে নাগর আমার সঙ্গে রাত কাটাতে চায়! বলে, তোকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

নটবরের বৃত্তান্ত বলে হেসে উঠল। সে কী হাসি, হাসি তার সর্বাঙ্গে ঢেউ দিয়ে যেতে লাগল।

আমার রক্তে তখন ঘোর লেগেছে। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার হাত ধরলাম। শরীরের ভেতরকার সেই ঝাঁ ঝাঁ প্রখর উত্তেজনাটা এখন আর নেই। পাহাড়ে আছড়ানো প্রখর ঝর্নার স্রোতটা এখন যেন বড়ো দরিয়ার ঘোলাটে পানির সঙ্গে মিশেছে। কেমন বোবা আর এলোমেলো হয়ে গেছে মনের ভেতরটা। উত্তেজনা যখন শরীর মনকে কাঁপাতে কাঁপাতে একসময় ভোঁতা করে দেয় মানুষকে। আমারও এখন হয়েছে সেই অবস্থা।

নটবর তখনও একনজরে তাকিয়ে দেখছে রঙ্গিনীকে।

খাটের একপাশে মৃতসঞ্জীবনীর বোতল। সেদিকে নজর ফিরিয়ে বলল রঙ্গিনী, জানো হে মিস্তিরি, আমাকে নেশা করতে বলছিল একটু আগে, এমনিতে তো গায়ে হাত দিতে পারত না, তাই মদ খাইয়ে বেতাল করে তবে গায়ে হাত দিত। রঙ্গিনী কথা বলতে বলতে হাসল। বলল, বুড়োর গতরে বড়ো বেশি গরম। কত বলি, আমার পেছনে না ঘুরে, বউ ছেলেমেয়ে আনিয়ে রাখ, তা শুনবে না। রোজগার করবে এখানে মজা লুটবে এখানে আর ঘরসংসার সাজিয়ে রাখবে হিন্দুস্থানে, কীরকম ঘোড়েল লোক, দ্যাখো।

আমি দেখলাম নটবরের চোখের দৃষ্টি স্থির, পাথরের মতো। তার স্থির ভাবলেশহীন মুখের ওপরে শীতল আর কঠিন কেমন একটা ভাব জমেছে বলে মনে হল। আমি এক পা এগিয়ে রঙ্গিনীকে ডাকলাম, চলো।

কোথায়! মেয়েটা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

আমার সঙ্গে যাবে, আমার ভারী গলায় তখন অধীর উত্তেজনা কাঁপছে।

শরীর মুচড়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে উঠল মেয়েটা। এক লহমার জন্যে বুকের কাপড় আলগা হয়েছিল, সামলে নিল ত্রস্ত হাতে। ও হাসছে, আর আমার ভেতরে ভেতরে কেউ যেন আগুনের আঁচ দিয়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। অতিকষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, তোমার তো ঘরটাও নাই। এ বুড়োর তবু যাহোক একটা ঘর আছে, তোমার তো কিছুই নাই। শুধু গতরের গরম মেটাবার জন্যে গাড়িতে নিয়ে তুলতে চাও।

ওর কথার জবাব না দিয়ে হাত ধরে টেনে আনতে গেলাম কাছে আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল নটবর।

এমন অবস্থায় জীবনে বহুবার পড়েছি। একটু সামলে উঠে দাঁড়িয়ে গাড়ির হ্যান্ডেল তুলে ঘা দিতে দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

রঙ্গিনীর গলা দিয়ে অস্ফুট চিৎকার বেরুল। বলল, লোকটাকে মেরে ফেললে!

মরে যায় তো যাক, ওর বেঁচে থাকা উচিত নয়।

রঙ্গিনীকে টেনে রাস্তায় বার করলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম নটবর মরেনি। অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। একটু পরই ওর জ্ঞান ফিরবে। রঙ্গিনীকে নিয়ে গাড়িতে উঠলে আমি ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব। নটবর যে পুলিশে খবর দিতে পারবে না সে তো ভালো করে জানা।

মেয়েটা কথা বলছে না, আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আমাকে লক্ষ করছে শুধু। আমি কী করি দেখছে।

গাড়িতে উঠতে বললাম তো বেঁকে দাঁড়াল, কোথায় যাব তোমার সঙ্গে?

আমি যেখানেই যাই, দুদিন পর রেখে যাব। দুদিনের জন্যে পঞ্চাশ টাকা দেব।

রঙ্গিনী আমার কথা শুনে আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। হেসে হেসে গড়িয়ে পড়তে চায়। বলল, নটবর সাহা বুড়ো হাবড়া আর তুমি ছেলেমানুষ মিস্তিরি।

আমার ভেতরে তখন একটা প্রচণ্ড জেদ রুখে উঠেছে, ধৈর্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েছি তখন। মেয়েটার গলা চেপে ধরতে ইচ্ছে করছে। বুকের কাছে টেনে আনলাম। গলার শব্দ খসখসে আর নিষ্ঠুর শোনাল। বললাম, ওঠো, না হলে জোর করব।

সেই অন্ধকার আকাশের নীচে মেয়েটা খান খান হাসিতে একেবারে ভেঙে পড়ল। বলল, তুমি একেবারে দুধ-খাওয়া বাচ্চার মতো করছ। আমার ঝাড়ুদারকে দেখেছ। তুমি? দ্যাখোনি, দেখলে এমন জোর তোমার থাকত না। রাতবিরেতে সে পালকি বয় না, ডাকাতি করে!

আমার হাতের বাঁধন তখন শিথিল হয়ে গেল হঠাৎ তবু রঙ্গিনী সরে গেল না। কী যেন ভাবল একটুখানি। তারপর নিজের মনে বলতে লাগল, মানুষটা কত রাতে ঘরে ফেরে না, আমার এসব ভালো লাগে না। খুন, জখম, ডাকাতি, পুলিশের ভয়—এসব দেখে দেখে থ'কে গিয়েছি। আর সহ্য হয় না। ভাবছিলাম পালাব। যদি মনের মতো মানুষ পাই। এখন দেখছি তুমি তো ঝাড়ুদারেরও বাড়া। সে তবু ঘরে রেখেছে। তুমি তো আমায় বিনি পয়সার মাল ভাবছ। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো গাই বকরির সমান ভেবে বসে আছ—

আরো কিছু হয়তো বলত, কিন্তু আমি ততক্ষণে আবার অধৈর্য হয়ে উঠেছি। বললাম, ওসব কথা রাস্তায় শুনব, এখন গাড়িতে ওঠো।

নাঃ, কোথায় যাব? পথ ছাড়ো, ঘরে যাই।

উঠবে কিনা বলো, আমার গলা হিস হিস করে উঠল।

না মিস্তিরি আর দিক ক'রো না, আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে ঘুমোও গিয়ে।

আমি এবার জোর করব। জেদি একরোখা গলা আমার কেঁপে উঠল।

কর জোর। রঙ্গিনী হঠাৎ রুখে দাঁড়াল। তারপর শান্তগলায় বলল, নগেন দাসের বল্লম নিশান ভুল করে না। তার শহরের মেয়েমানুষ পুষ্পবালার গায়ে হাত দিয়েছিল এক শহরের ধনী লোক। নগেন দাস খবরটা জানার পার লোকটাকে আর খুঁজে পায় নি কেউ।

একবার মনে হল, মেয়েটা মিছিমিছি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ও এখন দরাদরি করতে চায়। কিছু টাকা বেশি দিলে হয়তো বা খুশি হবে। বললাম, আরো কিছু টাকা দেব, নাও ওঠো গাড়িতে।

টাকা নিয়ে কী করব মিস্তিরি? যদি ঘর বাঁধতে আমাকে নিয়ে তাহলে অন্যকথা ছিল। তুমি হাসালে মিস্তিরি।

কথায় কথায় এক পা দু পা করে একটু দূরে সরে গিয়েছিল মেয়েটা! এগিয়ে গেলাম, হাত ধরে শরীরটা কাছে টানলাম। কোনো বাধা দিল না। ওর নরম আর উঁচু বুকের ওপর হাত পড়ল। হাত সরিয়ে দিল। বলল, কেন দিক করছ? তুমি ভুল বুঝেছ মিস্তিরি, আমি পয়সা দিয়ে গতর বেচি না।

আমি তোকে বিয়ে করব। সহ্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে কথা ক'টা উচ্চারণ করলাম।

রঙ্গিনীর হাসি আর থামে না। হাসিটা এখন তীব্র তীক্ষ্ণ আর নিষ্ঠুর। হাসি থামলে বলল, আর সেসব হয় না মিস্তিরি। এখন এসব কথা বলে কোনো লাভ নেই, আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। এই দেহটা দেখে তোমার মন উল্লসে উঠেছে। এখন কত কথা শোনাবে তুমি। সবাই তোমরা একরকম। শুধু শরীরটার জন্যে ছোঁক ছোঁক কাছে আস। কিন্তু মন? মনের কথা ভাবতে পার না। সেটার কথা ভাবতে ভয় লাগে।

অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। জোর করে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম, তারপর বললাম, ওঠো গাড়িতে।

মেয়েটার সর্বনাশা হাসি ফুরোতে চায় না। বলল, ছেড়ে দাও মিস্তিরি, কী ছেলেমানুষী করছ। এখন যদি চিৎকার করি তো ঝাড়দার ছুটে আসবে। নটবর সাহার দোকান এতক্ষণে সাফ হয়ে যাবার কথা।

মেয়েটার কথা আমার তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। রঙ্গিনী বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল। বলল, আমাকে ছেড়ে দিয়ে ভাগো এবার। আমিই তোমাদের দুজনকে ইশারা করে ঘরে এনেছিলাম। নটবরের দোকানে দু'পেটি হিন্দুস্থানি মাল এসেছে। তুমিও নড়ো না, সেও নড়ে না। সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। যতক্ষণ তোমরা দুজনে আমার ঘরে লড়াই করবে ষাঁড়ের মতো, ততক্ষণে ঝাড়দার কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে আসবে।

একটু থেমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা। আমার দুহাতে তখন কোনো শক্তি নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এবার ঘরে যাই, অনেক রাত হয়েছে।

আমি তখন আর কিছু করতে পারছি না। আমার রক্তের ভেতরকার এত জ্বালা, বুকভরা এত পিপাসা - এখন সেসব কিচ্ছু নেই। বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি। মেয়েটা টলমল অঙ্গ কাঁপিয়ে হাসল। আমারই সামনে দাঁড়িয়ে কাপড়টা ঝেড়ে ঝুড়ে গুছিয়ে পরল। গাঢ় ছায়ার মতো ওর শরীরের নিখুঁত ভাঁজ রেখায় রেখায় অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখলাম কিন্তু হাতটা পর্যন্ত বাড়াতে পারলাম না।

রঙ্গিনী তখন দাঁড়িয়ে বলল, মিস্তিরি, মেয়েমানুষ চেনা বড়ো শক্ত। আমাকে দেখে এত বড়ো ভুলটা যদি না করতে, তাহলে আমি বেঁচে যেতাম

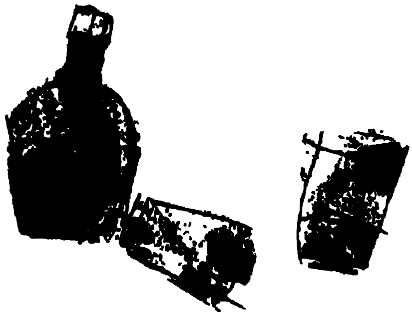
মন খারাপ ক'রো না গো মিস্তিরি, মানুষ চেনা বড়ো দায়।

আরো কী সব কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে মেয়েটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ওর সব কথা বুঝবার মতো ক্ষমতা তখন আমার মাথায় নেই। বেকুব হয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সামনে আমার পক্ষীরাজ। মনের ভেতরে একটা আশঙ্কা কাঁপতে আরম্ভ করেছে তখন। নটবর যদি মনে করে আমিই ওকে মেরে ফ্লাট করে মালপত্র নিয়ে ভেগেছি। আর যদি সেই কথা মালিকের কানে তোলে! তাহলে তো কোনো মালিকই আমায় আর বিশ্বাস করবে না। তখন, তখন কী করব!

কিন্তু এখনই বা কী করতে পারি, এই মুহূর্তে। পালাব, না থেকে যাব!

বৃষ্টি নামল আদিগন্ত আয়োজন করে। ইঞ্জিনের ওপর তিরপল টেনে দিয়ে আবার ছুটলাম নটবরের দোকানে। বোঝাতে হবে কী সর্বনাশা মেয়ের পাল্লায় পড়েছে ও।

বৃষ্টি, বৃষ্টি। তখন চারদিক থেকে তিরের মতো বৃষ্টির ফোঁটা এসে গায়ে বিঁধছে। আমি ছুটছি প্রাণপণে, একখানা খড়ো চালার নীচে মাথা গুঁজবার জন্যে। চারপাশে শুধু শোঁ শোঁ শন শন শব্দ। সেই হাওয়া আর বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও বহুদূর থেকে একটা মেয়ের তীক্ষ্ণ হাসি আমার কানে বাজতে লাগল।



কুচিলা-খাঁই

বুদ্ধদেব গুহ

জিপের স্টিয়ারিং-ধরা বাঁ হাতের কবজির দিকে তাকালাম।

ঘড়ির রেডিয়ামে আড়াইটা চকচক করেছে। সেই দুপুর দুটোয় কটক শহর ছেড়েছি। তারপর মহানদী আর বিরূপার অ্যানিকাট পেরিয়ে ঢেনকানলের উপর দিয়ে এসে, হিন্দোল পেরিয়ে অঙ্গুলে এসে পৌঁছেছি। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার রওয়ানা হয়ে পূর্ণাকোটের মোড়ে এসে বাঁয়ে ঘুরেছি। তারপরও চলছি— পাহাড়ে জঙ্গলে, চড়াইয়ে উতরাইয়ে! পথের রাঙাধুলোয় গা মাথা সব একাকার হয়ে গেছে। জার্কিনের জলপাই রংটার উপর ধুলোর আস্তরণ এমনভাবে পড়েছে যে, ড্যাশবোর্ডের মৃদু আলোয় রঙটাকে খয়েরি বলে মনে হচ্ছে।

জিপের হেডলাইটে দেখলাম, সামনেই একটা শালের খুঁটির গায়ে সাদা একফালি তক্তার উপর কালোতে লেখা 'টুলকা ফরেস্ট রেস্টহাউস।'

একটি প্রায় সমকোণিক বাঁকে চাকাগুলো আপত্তি জানিয়ে কিচ্ কিচ্ করে উঠল—ঢুকে পড়লাম টুলকার বাংলোর হাতায়। সামনে পড়ে রইল হিমেভেজা ভুরাণ্ডির রাস্তা। গাঢ় অন্ধকারে একটা ফ্যাকাশে স্বপ্নের মতো।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

ভোর হয়েছে।

কুচিলা খাঁই ডাকছে পাহাড়ের উপরের কুচিলা গাছ থেকে। হঁক হঁক হঁক, হঁ কঁক্ক, হ কক্ক, কঁ হ্যাঁক্ হ্যাঁক্।

দিল ঘুমটার বারোটা বাজিয়ে।

এমন অসভ্য অভদ্র পাখি ভারতবর্ষের পাহাড় জঙ্গলে আর দুটি নেই। অন্য অনেক পাখি ডাকে বটে, তবে তাদের ডাক এমন শ্রুতিকটু কিংবা অপ্রয়োজনীয় নয়। কোটরার বাচ্চা যেমন বিনা কারণে লাফায়, এরা তেমনি বিনা কারণে ডাকে। সব সময় খাই খাই করছে, আর বিরাট বিরাট ডানা আর বিশ্বলোভী ঠোঁট দিয়ে যা পাচ্ছে তাই ঠোকরাচ্ছে। এমন লম্ফঝম্পমান পাখির তেলে বাত সারবে না, তো বাত সারবে কীসে?

ভেবেছিলাম অনেকক্ষণ ঘুমুব। হল না তা।

জানালা দিয়ে ডিসেম্বরের সুনীল আকাশ দেখা যাচ্ছে।

এমন আশাবাদী আকাশ বহুদিন দেখিনি। ঝক-ঝক রোদ্দুর হাওয়ায় উড়ছে— ছুটি-ছুটি—ছুটি। কম্বলটা সরিয়ে উঠে বসলাম চৌপায়াতে। উঠে বসতেই দেখলাম, বাংলোর পাশের ফাঁকা জায়গাটাতে, কুয়োতলার কাছে, কাপড় শুকানোর দড়িতে কী একটা গোলাপি পদার্থ ঝুলছে।

চোখ কচ্‌লে ভালো করে দেখলাম। প্রথমে বিশ্বাস হল না। ভাবলাম কাল রাতের নেশা কাটেনি। কিন্তু আবার ভালো করে চাইতেই ইচ্ছা না করলেও পদার্থটির উপস্থিতি বিশ্বাস করতে হল। একটা গোলাপি-রঙা নাইলন প্যান্টি। এই নিবিড় জঙ্গলে, হাতি-বাইসন-বাঘ অধ্যুষিত পাহাড়ে, এ কোন মেমসাহেব যে এই ভেঙে-পড়া, ছুঁচোয়-ভরা বাংলোয় এসে রয়েছে?

ঘরের বাইরে যেতে সাহসে কুলোল না। ঘর থেকেই হাঁক দিলাম— 'চৌকিদার'!

'কইস্তু আইজ্ঞাঁ', বলে চৌকিদার এসে দাঁড়াল।

সে আমাকে আগেও দেখেছে অনেকবার। আঙুল দিয়ে রমণী-বাসটি দেখাতেই সে কাছে এসে বলল, ছিস্তিয়া মেম্বসাহেব। কাল রাত্তির আইলা, আর মতে কহিলা সাতদিন রহিব।

মনে মনে ভাবলাম জ্বালালে দেখছি।

কোথায় একটু নিরিবিলি খেয়ালখুশি-মতো দিন কাটাব না কোত্থেকে ছিস্তিয়া মেম্বসাব এসে জুটল।

হাত-মুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় পরে বারান্দায় আসতেই দেখলাম, বারান্দার সামনের ঝাঁকড়া চেরিগাছটার পাশে, যেখানে অসম্ভব উদার একরাশ রোদ আর একঝাঁক ছাতার পাখি লুটোপুটি করেছে, ঠিক সেইখানটিতে বেতের চেয়ার পেতে একটি বিদেশি মেয়ে বসে আছে বাংলোর সামনের পাহাড়টার দিকে চেয়ে। পাহাড়টি বলতে গেলে একেবারে বাংলোর গেটের গা ঘেঁষে উঠেছে। অনেকগুলো কুচিলা-খাঁই হুঙ্ক হুঙ্ক করছে, কুচিলা গাছগুলোতে পাখা ঝাপটাচ্ছে, উড়ছে, বসছে, এককথায় এই সুন্দর শান্ত শীতের সকালের সবটুকু সৌকুমার্য ওদের কদর্য সশব্দতায়, চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে।

মেয়েটি কুচিলা-খাঁইগুলোকে দেখছিল, এক-দৃষ্টে চেয়ে ছিল। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখলাম। ছিস্তিয়া মেমসাহেবকে দেখে নাস্তিকের মতিভ্রম হল।

এমন স্নিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত সৌন্দর্য আগে আমি আর দেখিনি। মেমসাহেবের যে এমন বাঙালি মেয়ের কমনীয়তা থাকতে পারে আমার ধারণার বাইরে ছিল। একটি কচি-কলাপাতা রঙের গরম পোশাকে সে বসে ছিল। পায়ের উপর পা দিয়ে। তার গ্রীবাহেলনের মনোরম ভঙ্গি, তার বসার ভদ্রভাব, তার আত্মতন্ময়তা সমস্ত মিলেমিশে আমার একটি চমক লাগল। এই সুস্নাতা, সুগন্ধি, বিদেশি মেয়েটি প্রকৃতির অন্য অনেক সুন্দরী ফুলের মতো এখানে এই টুলকার জঙ্গলে আমার চোখকে তৃপ্ত করবে বলে কাল রাতেও ভাবতে পারিনি

ভাবলাম, ওকে 'ডোন্ট-কেয়ার' করে বন্দুক-কাঁধে বেরিয়ে পড়ি। আজকের খাওযার সংস্থান করতে হবে।

এই ভেবে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, চেরি গাছটাকে বাঁয়ে ফেলে হন্‌হনিয়ে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু মেমসাহেব পেছন থেকেই সুপ্রভাত জানাল।

অতএব ভদ্রতার খাতিরে ফিরতে হল।

মেমসাহেব অহেতুক ফর্মালিটি এড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ওই যে পাখিগুলো চেঁচামেচি করছে, ওগুলোর নাম কী? চৌকিদার বলছিল 'কুলা খাঁই'।

আমি হেসে বললাম, কুলা খাঁই নয়, কুচিলা খাঁই, বাংলায় আমরা বলি ধনেশ পাখি, ইংরিজি নাম, The Great Indian Hornbill

মেমসাহেব খুলে বলল, They are a nuisance to this serenity

তক্ষুনি বেরুনো হল না।

ওখানে বসে আর একবার কফি খাওয়া হল।

সিস্থিয়া জোনস বলল, আমি এসে পড়াতে নাকি খুব ভালো হল। এক ধরনের বিশেষ লতা সম্বন্ধে গবেষণা করছে ও।

আমি শিকারে প্রায়ই এখানে আসি শুনে ও বলল, তাহলে তো খুব ভালোই হল, আপনার এখানের জঙ্গল পাহাড় সব চেনা আছে। তাছাড়া কাল তো আমি বিকেলে হাতির তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেঁচেছি। শিকার তো প্রত্যেক বারই করেন, এবার একটু অবলার সহায় হোন! নইলে, আমায় শূন্য হাতে ফিরতে হবে। লতা সংগ্রহ হোক আর না হোক্ ভয়-মুক্ত হয়ে জঙ্গলে পাহাড়ে বেড়িয়ে বেড়ানোটাও তো একটা আনন্দের মতো আনন্দ।

আমি বললাম, তথাস্তু। তবে একটু-আধটু শিকার তো করতেই হবে — পটহান্টিং নইলে খাবেন কী?

সিস্থিয়া বলল, কেন টিনের খাবার? সব সঙ্গে আছে।

আমি বললাম, টিনের খাবারে আমার অরুচি। এখন উঠি, গোটা দুই মুরগি মেরে আনি।

কিন্তু তক্ষুনি ওঠা হল না। সিস্থিয়া উঠতে দিল না—বলল, বসুন না একটু—এমন সুন্দর সকাল, গল্প করা যাক।

সিস্থিয়া অনেক কথা জিজ্ঞেস করল, আমার নাম কী, কী পেশা, শিকার করতে ভালোবাসি কেন, আর কোনো নেশা আছে কি না, কী কী জানোয়ার মেরেছি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচুর ছেলেমানুষি প্রশ্ন।

অন্য জায়গা এবং অন্য লোক হলে হয়তো সব কথার উত্তর দিতাম না— কিন্তু লোকে যখন আমার মতো ছুটি কাটাতেই আসে তখন একটা অকেজো ছেলেমানুষির রেশ মাখানো থাকে সেই সমস্ত ছুটিটাতে। বরঞ্চ এখন বুড়োমানুষি করতেই মন চায় না।

শেষকালে আড্ডার মায়া কাটিয়ে উঠলাম। বন্দুকটা নিয়ে বাংলোর হাতা পেরিয়ে পাহাড়ের নীচের সুঁড়িপথে হারিয়ে গেলাম।

আসবার সময় সিম্বিয়া বলল, তাহলে মারবেনই মুরগি, ছাড়বেন না?

আমি বললাম, আগে মারিই।

ও বলল, তবে মারুন, রান্না কিন্তু আমি করব।

ভাবলাম, আরে এ যে গৌরীপুরি বউদি আমার। কোথায়, কোন থালায়, কার হাতে যে কার ভাত বাড়া থাকে তা কি কেউ জানতে পায়?

পরদিন বিকেলে চা খাওয়ার পর সিম্বিয়াকে বললাম, চলুন মাছ ধরে আসি।

— কোত্থেকে?

— কেন? ভুরান্ডির পথে যে জলপ্রপাতটা আছে, সেখান থেকে।

— আছে বুঝি জলপ্রপাত?

— নেই নাকি। দেখেননি এখনো?

— না তো।

— চলুন নিয়ে যাচ্ছি। বাংলো থেকে বড়ো জোর দু ফার্লং হবে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম লালমাটির রাস্তার উপরের সেই জলপ্রপাতে। বেশ উঁচু থেকে জল পড়ছে, ঝরঝরিয়ে! নীচে বেশ গভীর জল। একটা পুকুরের মতো হয়েছে সেখানে। সেখান থেকে জল তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে চলে গেছে জঙ্গলের গভীরে। জলটা উপর থেকে যেখানে পড়ছে সেখানে হাজার হাজার শ্বেত সাপের মতো ফেনা কিল্‌বিল্ করছে। আর বড়ো বড়ো মহাশোল মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে জলের স্বচ্ছ ফোয়ারায়।

সিম্বিয়া তো দেখে অবাক। বাংলোর এত কাছে এমন সুন্দর জায়গা অথচ আগে আসেনি।

আমি বললাম, একা একা বেশি না-আসাই ভালো। বলে ওকে সঙ্গে করে, যেখানে ঝর্নাটা বিভিন্ন ধারায় ভাগ হয়ে গড়িয়ে গেছে উপত্যকায় সেখানে নিয়ে গিয়ে জলের ধারে সম্বরের পায়ের দাগের সঙ্গে বাঘের পায়ের দাগও দেখালাম। সিম্বিয়া একটুও ভয় না পেয়ে বলল, আমাকে একদিন বাঘ দেখাবেন?

হেসে বললাম, বাঘ দেখাব কিনা হলপ করে বলতে পারি না, তবে দেখতে চাইলে, বাইসন-চরুয়া মাঠে নিয়ে গিয়ে বাইসন দেখাতে পারি।

বাচ্চা মেয়ের মতো ভুরু নাচিয়ে বলল, তবে তো আরো ভালো হয়।

আমি বললাম, বেশ তো দেখাব বাইসন —পুরো দলটা—নিশ্চয় দেখাব।

একটা বড়ো পাথরের উপর বসে আমরা ছিপ ফেলছিলাম। হাত ছিপ! তবে সুতো মজবুত। আস্তে আস্তে বেলা পড়ে আসছিল। শীতের বনে, জঙ্গল-পাহাড়ে, আসন্ন সন্ধ্যায় কী যে সে এক করুণ রাগিণী বাজতে থাকে তা কী বলব। ঘরের মানুষকে সে-সুর ঘরে ডাকে, প্রিয়জনকে সে-সুর কাছে টানে, আর আমার মতো খোদার ষাঁড়কে আরো বাউন্ডুলে করে তোলে।

জলপ্রপাতের উপরের পাথরগুলো শুয়ে শুয়ে আদিবাসী ছেলের বুকের চেটোর মতো বুক চিতিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কখন সন্ধ্যাতারা উঠবে সেই ক্ষণ গুনছে। সেখান থেকে একটি ময়ূর বার বার ডেকে উঠছে কেঁয়া, কেঁয়া। একটা কোটরা হরিণও জলপ্রপাতের ডানদিক থেকে ডাকছে, ব্বাক্, ব্বাক্, ব্বাক্। রাইফেলটাকে হাতের কাছে টেনে রাখলাম।

এই টানছে, টানছে, ফাতনা ডুবল— চেঁচিয়ে উঠল সিম্বিয়া।

আমি বললাম, টানো টানো— এক হ্যাঁচকা টান মারল সিম্বিয়া। মাছটা শেষ সূর্যের আলো আর জলপ্রপাতের জলের ছটায় মুক্তির জন্যে শেষ বারের মতো ঝিকমিক্ করে উঠল। তারপর সঙ্গের বেতের ঝুড়িতে তাকে পুরে ফেলা হল।

সিম্বিয়া আনন্দে লাফাচ্ছিল। একটা আকাশি নীল-রঙা স্কার্ট আর ফিকে গোলাপি হাতওয়ালা উলের সোয়েটার পরেছে ও। ওর নরম, স্বপ্নিল সোনালি চুলে জলের গুঁড়ি হাওয়ায় এসে জমেছে— তার উপর ক্লান্ত পৌষের বিষণ্ণ রোদের চুমু লেগেছে— মনে হচ্ছে সিম্বিয়া জোন্স নয়, যেন এক প্রাচীনা আর্যকন্যা তার উদ্ধত কোমল গ্রীবাভঙ্গিতে এই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন জানি না আমার ওকে ভীষণ পেতে ইচ্ছা করল। ওর মতো

সুগন্ধী, সুহাসিনী, স্বচ্ছতোয়া নারী আমার জীবনে এলে, ভাবলাম; হয়তো আমার এই রুক্ষ পৌরুষের দুর্গন্ধময় জ্বালা আর থাকবে না।

এই ভাবনাটা মনে ব্যাপ্ত হতে না হতে কোথা থেকে একঝাঁক ছাতার পাখি, ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করতে করতে কোনাকুনি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

আমার ছিপেও একটা মাছ উঠল। বেশ বড়ো মাছ।

এদিকে সন্ধ্যা এসে জলপ্রপাতের মাথায় তার কালো চুল মেলে দাঁড়িয়েছে দেখলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সন্ধ্যাতারাটি পিদিম হাতে পথ দেখাতে এল। বনের পাতায় শিরশিরানি তুলে তার পিছু পিছু একটা হাওয়াও এল।

আমি আর সিম্থিয়া বাংলোর দিকে চললাম।

চলতে চলতে সিম্থিয়া বলল, গোটাম্, চল আমরা এখানে সাঁতার কাটব। আপত্তি আছে তোমার?

আমি বললাম, আপত্তির কিছু নেই। তবে সাঁতার কাটার চেয়ে শুধু স্নান করাটাই ভালো হবে। ওখানের পাথরগুলো ভারী অসমান আর জলের তলায় কোথায় যে উঁচু আর কোথায় নিচু তা তো তুমি দেখতে পাবে না। গতবার আমার এক পাইলট-বন্ধু এইখানে এসে সাঁতার কাটতে গিয়ে কলারবোন ভেঙে ফিরেছিল। বেচারার ক্যারিয়ারটাই খতম হয়েছিল একটু হলে।

সিম্থিয়া ওর ডানহাতের পাতায় আমার বাঁ-হাতের পাতাটি নিয়ে বলল, আমাকে ভয় দেখিও না—তা ছাড়া তুমি তো আছ। তুমি থাকতে আমার ভয় কী?

এমনভাবে সিম্থিয়া কথাটা বলল, যেন আমার উপর ভরসা করেই এই অবলা নারী এই রকম জায়গায় লতা খুঁজতে এসেছিল। তবু, যাকে ভালো লাগে, যার সঙ্গ ভালো লাগে; যার হাতে হাত ছোঁয়ালে শিশুবয়সে মা'র স্তনে হাত ছোঁয়ানের মতো আশ্বস্ত মনে হয়, সে যদি এমন করে বলে যে আমি আছি জেনে সে নিশ্চিন্ত, তবে তার চেয়ে বড়ো কিছু প্রাপ্তি আছে বলে তো আমি জানি না। যাকে ভালো লাগে কিংবা যাকে ভালোবাসি, তার সবটুকু বিশ্বাস যদি আমার উপর ন্যস্ত হয়, তাহলে আমি তার জন্যে কীনা করতে পারি। হয়তো প্রাণও দিতে পারি। তাছাড়া একটা প্রাণের জন্ম তো একটা জৈব দুর্ঘটনা বই নয়, কিন্তু ভালোবাসা তো দুর্ঘটনা নয়, সে যে এক স্বেচ্ছারোপিত ব্যথার ফুল। যার অবয়ব নেই। তবু, নড়লে-চড়লে সে ঝুমঝুমিয়ে বাজে।

সিম্থিয়াকে দেখে যে আমার ভারতীয় বলে মনে হয়েছিল, তার কারণ ছিল। ওর মা ভারতীয়, বাবা ইতালীয়। পরে অবশ্য বিচ্ছেদ হয়ে গেছিল দুজনের। তার বেশি কথা ওর সম্বন্ধে জানতে পারিনি এবং জানতেও চাইওনি। তাছাড়া ও নিজের থেকে খুশিমনে নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিল, তাই শুনেছিলাম।

গতকাল সকালে ওর সঙ্গে পাহাড়ে গেছিলাম। এই পাহাড়-জঙ্গলে একা একা ঘোরা ওর পক্ষে সত্যিই সম্ভব হত না। হাতি প্রচুর আছে, তাছাড়া বাইসন, এবং ভাল্লুকও আছে। এদের কাছ থেকেই অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। কালকে তো প্রায় আমাদের গায়ের উপর দিয়ে একটা ভাল্লুকের বাচ্চা ডিগবাজি খেয়ে চলে গেছিল। সিম্থিয়া খিলখিলিয়ে হেসে বলল, দেখো দেখো একটা ভাল্লুক-খাঁই।

আমি ওর কথার ধরন দেখে হাসি চাপতে পারলাম না। কুচিলা-খাঁই নাম দেখে, সব জানোয়ারের পেছনেই ও খাঁই বলতে শুরু করেছে।

জঙ্গলে পাহাড়ে চৈতন্য হবার পর থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনেক গাছ দেখেছি, অনেক ফুল দেখেছি, অনেক লতা দেখেছি অথচ তাদের সকলের বৈজ্ঞানিক নাম কখনও জানিনি। তাদের স্থানীয় নাম জেনেছি; তাদের ভালোবেসেছি, এই পর্যন্ত। এই যে জঙ্গল, এতে আসন, শাল, পিয়াশাল, সেগুন, কুচিলা, মহুয়া এবং নানারকম বাঁশে ভরা।

একরকম মোটা-সোটা, গাঁট্টা-গাঁট্টা বাঁশ দেখিয়ে সিম্থিয়া বলেছিল, এদের নাম কী জান? Bamboosa Robusta আর ওইটা কী বলত? Bamboosa Ardensia যখনি ফুল ধরতে শুরু করবে, তখনি এদের মরবার পালা শুরু হবে। শুকিয়ে যাবে ধীরে ধীরে।

আমি বললাম, বাঃ চমৎকার নিয়ম তো। মানুষদের জীবনেও এরকম হওয়া উচিত। ফুল ধরবার পরে বেঁচে থাকবার কী মানে হয় জানি না। মৃত্যু, সার্থকতার অনুগামী হওয়াই উচিত। সার্থকতার পর বাঁচবার মতো কোনো যথেষ্ট অনুপ্রেরণা আমাদের নেই। সার্থক হবার চেষ্টাই তো জীবন। তুমি কী বল?

সিম্বিয়া নীল-রঙা একগুচ্ছ ফুল দোলাতে দোলাতে বলল, মৃত্যু যদি সার্থকতার অগ্রগামী হয় তা হলে?

আমি কিছু বলি না। আমি শুধু শুনি।

গাছপালার মসৃণ গা বেয়ে উদার সূর্যের সহস্র সোনালি আঙুল সমস্ত বনভূমির শরীরে তাদের ছোঁওয়াচ্ছিল। আমরা হাঁটছিলাম। শিশির-ভেজা ঘাস, লতাপাতা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরুচ্ছিল। তার সঙ্গে কত শত নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ মিশে মন্থর শীতার্ত হাওয়ায় রোদের আঙুল কাঁপছিল। নানারকম হিবিস্‌কাসের মুখে সকালের মুখের ছবি দেখছিলাম। সিম্বিয়া আপনমনে এক-একটা বিরাট উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নাম বলছিল প্রায় স্বগতোক্তির মতো, আর সেই নামের বহর শুনে যে লতা, যে ফুলকে ছোটোবেলা থেকে দেখেছি, তাদের খুব হঠাৎ রাশভারী বলে মনে হচ্ছিল।

আমি বললাম, Emerson-এর সেই কবিতাটা পড়েছ?

—কোন্ কবিতা?

সিম্বিয়া বলল।

যতটুকু মনে ছিল, আমি তাই আবৃত্তি করলাম—

> ' But these young scholars who invade our hills
> Bold as the engineer who fells the wood
> Love not the flower they pluck and know it not
> And all their Botany is latind names-'

সিম্বিয়া বলল, Superb! Superb! আচ্ছা গোটাম, তুমি এই জঙ্গল পাহাড়কে খুব ভালোবাসো না? যদি তোমার মতো করে ভালোবাসতে পারতাম।

আমি বললাম, তোমার ভালোবাসা জঙ্গল-পাহাড়ের মতো নির্জীব বস্তুতে অপচয় করবে কেন? ভালো যদি বাসতে চাও, তো তোমার কি পাত্রের অভাব?

সিম্বিয়া কথাটার জবাব দিল না, এড়িয়ে গেল, এবং কেমন ব্যথিত ও চকিত হয়ে আমার দিকে ওর নিভৃত চোখ তুলে চাইল।

আমার সিম্বিয়া মেমসাহেবকে ভীষণ ভালো লাগছিল। জীবনে যা আমি বরাবর ভয় করে এসেছি, সরবে যার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছি, সেই নীড়-বাঁধার মতো লজ্জাকর ও স্থাবর মনোবৃত্তিটা আমারও মনের কোণে উকিঝুঁকি মারতে লাগল। মনে মনে তাকে অনেকবার বন্দুক উঁচোলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ভয় পেল না।

রাত আটটা হবে। বারান্দায় বসেছিলাম। বাংলোর সামনে কিছুই চোখে পড়ে না। জমাটবাঁধা কালো অন্ধকার চোখের সামনে মনের জমাটবাঁধা ভাবনার মতো ভারী হয়ে বসে আছে। পাহাড়টাই বেশি ভারী, না অন্ধকারটাই বেশি— ঠাহর করতে পাচ্ছি না। পাহাড়ের নীচের সেগুন গাছের জঙ্গলে জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে আর নিবছে! অমাবস্যার রাতের ঢেউয়ের বুকের ফসফরাসের মতো। এই ঘনান্ধকার ভয়গর্ভ রাতের একটা সুপুরুষ ব্যক্তিত্ব আছে। এই অন্ধকার রাতে, বন-পাহাড় যেমনভাবে অদৃশ্য ও অসাধারণভাবে ব্যক্ত হয় তেমনি আর কোনো সময়ে নয়! প্রকৃতির বুকের কোরকে যে শক্তিমান পুরুষ বাস করেন, সেই পুরুষ এই অন্ধকারে প্রতীয়মান হন, যাদের চোখ আছে তারাই তাঁকে দেখতে পায়।

বাংলোর পেছনের সারি সারি আলপনা-দেওয়া ছোটো ছোটো মেটে ঘর। ছোটো উঠোন, পাতকুয়ো, দু-একটি শান্ত বিজ্ঞ গরু, গুটিকয় চঞ্চল পোষা মুরগি, এবং অনেক নগ্ন, অসুস্থ অথচ সদাহাস্যময় শিশু। এই নিয়ে টুল্‌কা গ্রাম। এখন রাত নেমেছে। কালো রঙের তুলির আঁচড়ে সব মুছে গেছে। নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। গ্রামের পেছনের ধানখেতে হাতি নেমেছে। মাচায় বসে ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে ছেলেরা, শীতের রাতে পায়ের নীচের সরায় কাঠের আগুন নিয়ে। শালকাঠের মশাল করে তাতে আগুন জ্বেলে আন্দোলিত করছে। হাতির দল বৃংহন করতে করতে আবার পাহাড়ে ফিরে যাচ্ছে।

সিম্বিয়া চৌকিদারেরা হাতে বাসনপত্র দিয়ে বাবুর্চিখানা থেকে বারান্দায় এসে উঠল। বলল, শিগ্‌গিরি এসো, সব ঠান্ডা হয়ে গেল!

নড়বড়ে কাঠের টেবলে খাবার সাজিয়ে, কম্পমান লণ্ঠনের আলোয় আমার উলটোদিকের চেয়ারে বসে, আমার জঙ্গলের প্রেমিকা বলল, খাও, গোটাম, শুরু কর!

মুসুরির ডালের স্যুপ, ফ্রায়েড রাইস্ এবং মুরগির রোস্ট্! এ জঙ্গলে রোজ রোজ এমন খাবার খাব, আর শুধু তাই নয় এমনভাবে খাব, কে ভেবেছিল? খেতে খেতে আমি বললাম, তুমি আমার অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছ। আর চারদিন পরে যে চলে যাবে, তখন কী খাব? সিম্ভিয়া বলল, কেন? এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি, তাছাড়া তোমার ঘোড়া-মার্কা রাম্ তো আছেই। তোমার মতো লোক মানুষ না হয়ে ঘোড়া হয়ে জন্মালেই পারত। বলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। তারপর গম্ভীর এবং নিচু গলায় আমাকে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, তুমি খুব মজার ছেলে। তোমার মধ্যে খুব প্রাণ আছে। যে মেয়ে তোমাকে বিয়ে করবে সে খুব সুখী হবে।

মুরগির ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বললাম, দেখো এই জ্ঞানের ভয়ে লোকালয় ছেড়ে থাকি। জঙ্গলেও যদি জ্ঞান দাও, তো পালাবার জায়গা দেখি না।

সিম্ভিয়া বলল, আমি ঠাট্টা করছি না, যা বলছি তা সত্যি কিনা দেখো।

ভাবলাম, এও তো আব এক জ্বালা। যাকে মনে মনে ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে, যাকে প্রেয়সী বলে ভেবে আকাশকুসুম কল্পনা করছি, সে হঠাৎ পিসিমা বনে উপদেশ দিতে আরম্ভ কল্পল। পড়াশুনাটা করলে, কী করে কথা গুছিয়ে বলতে হয় তা লিখতে পারতাম। একে তো কাউকে আমার আদপে কিছু বলারই থাকে না, যদি বা বলাব মতো কোনো কথা জমে, তাও মনে মনে হাঁড়ির মধ্যে খিচুড়ির মতো টগবগ করে। তা বলা হয় না।

আমি কিছু বললাম না। উত্তবে চুপ করেই রইলাম। কারণ আমি জানতাম. বলার সময় এখনো আসেনি। জীবনে একটা ভীষণ রকম প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্যে একটু মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, অন্তত আমার পক্ষে।

আমরা চুপচাপ খাচ্ছিলাম। সিম্ভিয়া, চাম্‌চে করে একটু একটু ফ্রায়েড রাইস্ আলতো করে মুখে তুলছিল, তারপর নিঃশব্দে চিবোচ্ছিল। ওর হাঁটায়, কথা বলায়, চোখেব চাউনিতে, এমনকি খাওয়াতেও এমন একটা শান্ত শ্রী, এমন একটা সহজিয়া রেশ আছে যে ওকে দেখে আমাব মনে হত ওর জীবনে বোধ হয় কোনোদিন ওকে নিজের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে চলতে হয়নি, নিজে যা ভালো বলে মনে করেছে সেই শুভবুদ্ধি থেকে নড়তে হয়নি। তাই ও পাহাড় থেকে প্রথম বেরুনো ঝর্নার মতো পবিত্র ও স্বচ্ছতোয়া। কোনো বাঁধা বাঁধা হয়নি এপর্যন্ত ওর ইচ্ছা বা রুচিব বিরুদ্ধে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত ও যখন হাসত! প্রথমে চোখের তারায় একটু বিদ্যুতের ছটা দেখা যেত, তাবপর সেই ছটা ছড়িয়ে যেত সমস্ত মুখময়, পাতলা দুটি জিনিয়া ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁটে, দু'সারি সুচারু দাঁতে, সুকুমারি চিবুকে।

আমি ভাবতাম এমন করেও কি কেউ হাসতে পারে—কিংবা কোনো মেয়েব হাসি এমন ভাবে কোনোদিন দেখিনি বা দেখবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন হয়তো বা।

সিম্ভিয়া যতক্ষণ কাছে থাকত ততক্ষণ আমার সমস্ত সত্তা ঘিরে একটি সুগন্ধ উঠত অনুক্ষণ। ওর সান্নিধ্যে কোনো জ্বালা ছিল না, কোনো কামনার ধারালো ছুরি কখনো আমাকে ফালা ফালা করত না। ওর সান্নিধ্য, আমার অনেক নৈরাশ্যের অতল গহ্বর আলোকিত করে রাখত, আমার অনেক ভালোলাগাকে মৌসুমী ফুলের মতো সমস্ত সত্তা জুড়ে ফুটিয়ে তুলত। মনে মনে, আমি নিজে যা নই, তাই মনে হত। মনে হত আমিও ওর মতো শুচি, পবিত্র, ওর মতো সরল। মাঝে মাঝে এমন হত যে আমার ওকে নিয়ে নীড় বাঁধবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে এমন ধারণাও আমার মনের মধ্যে শিকড় গাড়বার চেষ্টা করত। তখন সত্যিকারের ভালোবাসার সন্তান যে বিনয়, সেই বিনয় এসে আমাকে তুড়ে বলত 'তুই একটা অপদার্থ'। অমনি 'মুই অতি ছার' ভাব নিয়ে নিজের নৈরাশ্যের খনির ভেজা-সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে, অনিশ্চয়তায় আবার নেমে যেতাম।

আর যাই হোক, বোকা আমি কোনোদিনই ছিলাম না। আমি জানতাম, আমি বুঝতে পারতাম যে, সিম্ভিয়া যে-কোনো কারণেই হোক আমাকে পছন্দ করে। মানে, নিছক পছন্দ করার জন্য নয়। আমাকে ওর বিশেষ একভাবে ভালো লাগে।

আমি বুঝতে পারতাম।

ওর চাউনি, ওর কথার সুর আমার সামান্য সুখের জন্য ওর উৎকণ্ঠা সবই বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারতাম আর অবাক হয়ে যেতাম যে এই ছাত্রীটির পড়াশুনার চেয়ে আমার প্রতি আগ্রহ বেশি ছিল। ওর মধ্যে কোনো সস্তা জিনিস ছিলনা, কোনো ন্যাকাপনা ছিল না। আমার এই উদ্দাম জংলিপনা ওকে আকৃষ্ট করেছিল। ওর

দু'চোখে আমি আমার এই আলো হাওয়া বন পাহাড়ের জীবনকে শুষে নেওয়ার আকুতি দেখতে পেতাম। ভারী ভালো লাগত। এত ভালো আমার কোনোদিন লাগেনি।

খাওয়ার পর, বারান্দায় বসে, আর একটু গল্প করা হল।

সিম্বিয়া বলল, তুমি রোজ আমাকে ঠকাচ্ছ। কাল আমাকে চান করতে নিয়ে যেতেই হবে সেই জলপ্রপাতে!

আমি বললাম, হবে'খন, রাত তো পোয়াক্!

তারপর যে যার ঘরে শুতে গেলাম।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, সিম্বিয়া প্রায়ই আমাকে বলে you are a darling. you are so sweet ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ এমন করে বলে, যেন পাশের বাড়ির মহিলা তার পাশের মহিলার ছেলেকে বলছেন।

ওকে আমি বুঝতে পারি না। ওকে আমার ভীষণ ভালো লাগে! বলতে গেলে পাগলের মতো ভালো লাগে। ওরও যে আমাকে ভালো লাগে তা বুঝতে পারি, অথচ কথাবার্তায় এমন একটা সম্মানজনক ও সম্ভ্রান্ত দূরত্ব ও বজায় রাখতে চায় যে, আমার ভালো লাগে না। ও বোধ হয় ভয় পায়; পাছে এই জঙ্গল পাহাড়ে দুরন্ত বেপরোয়া ছেলে, এমন কিছু আবদার করে বসে, যা ওর দেবার সাধ্য নেই। জানি না, কিছুই জানি না!

কুচিলা-খাঁই-এর ডাকের জন্যে কোনোদিন ভালো করে ঘুমুনোর জোটি নেই। রোজ সকালে, আর শুধু সকালে কেন? সমস্ত সময়ই তো হঁক্ক, হঁক্ক, হঁক, হ্যাঁক্ হ্যাঁক করছে!

ঘুম থেকে উঠতেই, সিম্বিয়া বাইরে থেকে আমায় ডেকে বলল, গোটাম্, you better shoot a couple of these noisy filthy birds they are telling on my nerves

চৌপায়েতে বসে বসেই বললাম, কেন? তোমার কি বাত হয়েছে না কি?

সিম্বিয়া রেগে বলল, না না সত্যি বলছি, এই পাখিগুলোকে আমি আসা অবধি সহ্য করতে পারছি না।

প্রাতরাশ খেয়ে সিম্বিয়ার সাদা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডে চেপে আমরা ঝর্নাটায় গিয়ে পৌঁছলাম।

তখনো জল বেশ ঠান্ডা। আমি বললাম, আর একটু পরে নেমো, অসুখ করে যাবে।

সিম্বিয়া বলল, বেশ, তবে আগে চল, জলপ্রপাতের মাথায় যে সুন্দর জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে উঠি। জলটা কোথা থেকে আসছে দেখব।

আমি বললাম, চল, ঝোঁক যখন হয়েছে, তখন তো আর বাধা শুনবে না।

জলপ্রপাতটা বেশ উঁচু, মাথা থেকে নীচের পুকুর প্রায় একশো ফিট্ হবে। তবে সেখানে তিন চারটে প্রপাত। কমবেশি পনেরো কুড়ি ফিট উঁচু, একের মাথায় আর এক। পাকদণ্ডী ঘুরে উপরে উঠতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। আমিও কোনোদিন উপরে উঠিনি। গভীর জঙ্গল আর লতাগুল্মর আড়াল থেকে চওড়া পাথরের খয়েরি আর কালো চাতাল বেয়ে জলধারা কুল্ কুল্ করে বেয়ে আসছে , এসে শীতের সকালে ক্রীড়াচ্ছলে, রামধনু চুল উড়িয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে নীচে। উপরে দু'ধারে লতাপাতা ঝুঁকে পড়েছে। দু'ধারই চমৎকার ছায়া শীতল। রোদে পাথর যতটুকু গরম হয়েছে, তাতে তার উপর শুয়ে থাকতে ভারী আরাম। জলধারার দু'ধারে থোকা থোকা কী একটা জংলি লতায় ফিকে নীল ফুল ফুটে আছে! পাথরের কালোতে খয়েরিতে, জলের ফেনিল সাদাতে, আর এই নীল লতার নীলে এমন একটা অপার্থিব ছবি হয়েছে সে কী বলব। সিম্বিয়া লতাগুলোর কাছে গেল, তারপর বলল, এগুলোর নাম কী, জান? প্যাশানফ্লাওয়ার। এগুলো জংলি লতা মোটেই নয়। নিশ্চয়ই কোনো সৌখীন লোক এখানে এনে কোনোদিন লাগিয়ে গেছিল।

সিম্বিয়া বলল, আমি এমন জায়গা ছেড়ে নীচে যাচ্ছি না।

সেই জলধারা ধরে সামান্য এগোলেও বেশ গভীর দু'তিনটি জায়গা আছে। যেখানে জল এক কোমর থেকে বুক অবধি। সবচেয়ে মজা হচ্ছে, এখানে জল একেবারে ফটিক-স্বচ্ছ। মন হারালে, মন কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

সিম্বিয়া ফ্লাস্কে করে কফি বানিয়ে এনেছিল। আমি বললাম, তুমি চান কর, আমি কফি খাই।

ও বলল, তুমি চান করবে না নাকি?

আমি বললাম, করব, জল একটু গরম হোক।

হালকা গোলাপি রঙের একটা সাঁতারের পোশাক পরেছিল সিম্বিয়া। ঝকঝকে জলের মধ্যে একটা গোলাপি হাঁসের মতো মনে হচ্ছিল ওকে। বাদামিতে শ্বেতাতে মেশানো ওর আশ্রয়াকুল হাত দু'খানি জলের মধ্যে ফোয়ারা ওঠাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে বলছিল, সব কফি খেও না কিন্তু!

আমি কফিতে চুমুক দিচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম, এ ক'দিন শিকারে আমি প্রায় গেলামই না, অথচ কী করে যে ক'টা দিন কেটে গেল টেরই পেলাম না। সিম্বিয়া তো আর দু'দিন বাদেই চলে যাবে। তারপর সময়টা সকালবেলার কুয়াশার মতো একেবারে আমার উপর চেপে বসবে। তবু বেশ কাটল এ ক'টা দিন। এত কাছে থেকে এত দূরে কী করে থাকতে হয় সিম্বিয়ার কাছে তা শেখার আছে। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সিম্বিয়া চিৎকার করে উঠল, হেল্প, হেল্প!

তাকিয়ে দেখি, জলের তোড়ে সিম্বিয়া নিচে প্রপাতের দিকে ভেসে চলেছে আর প্রাণপণে হাত পা দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। সেখান থেকে প্রথম প্রপাতটি বড়োজোর তিরিশ চল্লিশ ফিট হবে।

কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে লাফিয়ে পড়লাম জলে! জল তো সেখানে সামান্য, হাঁটুও নয়, কিন্তু কী পিছল! লাফাবার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড আছাড় খেলাম। হাঁটুতে এমন একটা চোট লাগল পাথরের উপর পড়ে যে, মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাব। অজ্ঞান যে কেন হলাম না জানি না, কিন্তু সিম্বিয়া বেঁচে গেল, আমার পাশ দিয়ে ভেসে যাবার সময় ওর হাত আমার হাতে লাগল, এবং আমি প্রায় শোওয়া অবস্থাতেই হ্যাঁচকা টান দিয়ে একটা বড়ো পাথরে দু'পায়ে ভর রেখে, ওকে আমার কাছে টেনে আনলাম। ভয়ে বেচারির মুখ চোখ শুকিয়ে গেলেও, ওর ঠোঁটে সেই আশ্চর্য হাসিটি লেগেই ছিল। কিছুটা অভাবনীয়তায়, কিছুটা প্রাণ প্রাপ্তির আনন্দে ও অস্ফুটে কী যেন বলে উঠল, বুঝলাম না।

সিম্বিয়াকে বাঁচাতে পেরে যে আনন্দ না হল তা নয়, কিন্তু হাঁটুটাকে বোধহয় আর কোনোদিন সোজা করতে পারব না।

আমরা দু'জনে কোনোরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে কিনারে এসে পৌঁছালাম, তারপর সিম্বিয়া নিজে প্রথমে উঠে, আমাকে উঠতে সাহায্য করল! কোনোরকমে পাথরে পৌঁছে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। হাঁটুটার মাংস একেবারে থেঁতলে গেছিল। তার উপর রক্ত চোঁয়াতে শুরু করেছিল। সিম্বিয়া কী করবে বুঝতে পারছিল না। প্রথমে হাত দিয়ে রক্তটা মুছবার চেষ্টা করল, তারপর হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কপালে চুমু খেল। তারপর অনেকক্ষণ আমার ভিজে বুকে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওরকম চাপা মেয়ে যে কী করে এমন বেহিসাবি হল, ভাবতে পাচ্ছিলাম না। আমি কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে বললাম, তুমি কি পাগল হলে! বোকা মেয়ে, আমার কিছু হয়নি।

সিম্বিয়া তবু শুনল না, আমার পাশে অসহায়ের মতো বসে, আমার দিকে চেয়ে থাকল। সোনালিচুলে মোড়া ওর জল ভেজা শ্বেতা গ্রীবার দিকে তাকিয়ে একটি রাজহাঁসের কথা আমার মনে হল! যাকে আমি গুলি করেছিলাম, তারপর বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারিনি।

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। সকালের চা খাওয়া হয়ে গেছে। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছি। হাঁটুতে ব্যান্ডেজ বেঁধে। লোকজন জোগাড় করে বাঁশ দিয়ে স্ট্রেচার বানিয়ে সিম্বিয়া ঝর্নার ওপর থেকে আমাকে কাল নামিয়ে নিয়ে এসেছিল। নিজে গাড়ি চালিয়ে পূর্ণাকোট থেকে ডাক্তার এনেছিল। ডাক্তার ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেছেন আর বলেছেন যে হাড় ভাঙেনি তবে বিশ্রামের প্রয়োজন।

সমস্ত বন পাহাড় রোদে ঝলমল্ করছে। বারান্দায় থামগুলোর ছায়ার সঙ্গে রোদটা কাটাকুটি খেলছে। সিম্বিয়া বাংলোর সামনের নুড়ি বিছানো ড্রাইভে পায়চারি করছে! প্রথম যেদিন আমরা ঝর্নায় যাই মাছ ধরতে, সেদিনকার সেই পোশাকটি পরেছে সিম্বিয়া। ফিকে নীল স্কার্ট, আধফিকে গোলাপি সোয়েটার।

সিম্বিয়াকে দেখছি চুপ করে বসে। যেতে আসতে চোখাচোখি হলেই ও চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। কী যেন ভাবছে ও। বোধহয় কালকের কথা। বোধহয় ভেবে লজ্জা পাচ্ছে। আমিও ভাবছি। ভাবছি ওকে দু'একদিনের মধ্যেই বলব সেই কথাটা— বুলবুলি পাখির সঙ্গে বাসা বাঁধার কথা!

এমন সময় দুটো কুচিলা-খাঁই পাখি পাহাড় থেকে উড়ে এসে চেরি গাছটার ডালে বসে কুৎসিত গলায় ডাকতে লাগল হ্যাক্ হ্যাক্ হ্যাক। সিম্বিয়া যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। পাখি দুটো প্রকাণ্ড ঠোঁটদুটো নিয়ে ডালে ঘষতে লাগল আর বিরাট বিরাট ডানাদুটো ঝাপটাতে লাগল।

সিম্বিয়া দৌড়ে আমার ঘরে ঢুকে শট্‌গানটা নিয়ে এসে বলল, মারো তো গোটাম্, মারো তো। এগুলো সব সময় আমাকে ভয় দেখায়।

ইজিচেয়ারে বসে বসেই গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাখি গাছের ডালেই লট্‌কে রইল, মগডালে। অন্যটা ইঁক ইঁক করতে করতে উড়ে গেল।

কিছুক্ষণ আগে জঙ্গলের মধ্যে একটা দূরাগত গাড়ির ইঞ্জিনের গুনগুনানি শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। একটা কালো গাড়ি। কাছে এল গাড়িটা— পূর্ণাকোটের দিক থেকে আসছে— তারপর বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়ল। দেখলাম একটা কালো রোলস্‌রয়েস গাড়ি— সামনে কোনো দেশীয় রাজ্যের পতাকা উড়ছে পত্‌পতিয়ে।"

গাড়িটা এসে বাংলোর সামনে দাঁড়াল। উর্দিপরা সোফার এসে পেছনের দরজা খুলে ধরল। একজন মোটাসোটা ছোটোখাটো ভদ্রলোক নামলেন— পরনে দামি স্যুট, মাথায় স্ট্র হ্যাট— । বয়স কম করে পঞ্চাশ হবে।

হঠাৎ সিম্বিয়ার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

ওর চোখ দেখে মনে হল এ ওর চোখ নয়, ছুলোয়া শিকারে তাড়া খেয়ে শিকারীর সামনে পড়া কোনো চিতল হরিণীর চোখ!

যার বাঁচা হল না। হবে না।

লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে সিম্বিয়াকে বলল, what's all these about? Why Am I paying that old bitch for?

সিম্বিয়া চোখে আগুন ঝরিয়ে দু'হাত তুলে সমর্পণের ভঙ্গীতে বলল, All right! You have your way. Now for God's sake keep you bloody mouth shut.

আমি কিছু বোঝা বা বলার আগেই, সিম্বিয়া প্রায় আমার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিল, নিয়ে একবার লোকটার দিকে তুলল, তারপর আমার ঘরে রেখে এল।

রেখে এসে, আমার ইজিচেয়ারের পাশে আমার কাঁধে হাত রেখে সিম্বিয়া বলল, গোটাম আমি যাচ্ছি।

ওর হাত চেপে ধরে আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

ও বলল, আমার অতীতে ফিরে যাচ্ছি। আমি খারাপ, আমি খারাপ, আমি মিথ্যাবাদী, আমি খারাপ।

ওকে কাছে টেনে আমি বললাম, তুমি ভালো, তুমি ভালো, তোমার অতীত নেই, তোমার কেবল ভবিষ্যৎ আছে।

সিম্বিয়া আমার মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত যেন কী ভাবল, তারপর লোকটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, এটা আর একটা কুচিলা-খাঁই।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সিম্বিয়া বলল, চল্লাম গোটাম্, তোমাকে মনে থাকবে। আমাকে ভুলে যেও।

বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে দৌড়ে গাড়িতে উঠল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, সিম্বিয়া, সিম্বিয়া।

কিন্তু উত্থানশক্তিরহিত আমার চিৎকার ডুবিয়ে দিয়ে মহারাজার গাড়ির আওয়াজ বাংলোর হাতা পেরিয়ে গেল।

পেছনে পেছনে সোফার সিম্বিয়ার স্টান্ডার্ড হেরাল্ড চালিয়ে নিয়ে গেল।

সেই ভাঙা সকালের রাঙা আলোয় আমি একা একা বসে রইলাম টুল্‌কার বাংলোর বারান্দায়। হাওয়ার দোলায় মরা কুচিলা-খাঁই পাখিটার পালকগুলো আন্দোলিত হচ্ছিল। একবারের জোর হাওয়ায় মরা পাখিটা ধপ করে নিচে পড়ল।

পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, আমার বড়ো কষ্ট হল সিম্বিয়ার জন্যে। ওর জীবনময়ই কুচিলা-খাঁই, ক'টা কুচিলা-খাঁই আর ও মারতে পারবে?



উত্থিতা

আবদুশ শাকুর

'চল, তোকে আজ আমার বধূ দেখাতে নিয়ে যাব—'

'বধূ, না বঁধু?'

'বউ রে বেটা বউ — বিয়েটা করেই ফেলতে হয় আর দেরি না করে—'

'বলছিস কী রে? বি.এ.-তে ভর্তি হয়েই বিয়ে? পাসটাও না-করে?'

'পাস তো বার্ধক্যেও করা যাবে। এ দিকে যৌবন যে নাশ হয়ে যাচ্ছে —'

'কী রকম?'

'এক-একটা দিন যে যাচ্ছে, এক এক টুকরা যৌবন নিয়েই তো পালাচ্ছে। যাবি কি না বল্?'

'কোথায়?'

'নারায়ণগঞ্জ।'

'ট্রেনে?'

'শালা বলে কী। শ্বশুরবাড়ি ট্যাক্সি-ছাড়া গেলে প্রেস্টিজ থাকে নাকি?'

ট্যাক্সি শুনে বিনে পয়সায় দশ মাইল হাওয়া খাওয়ার লোভে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু হবু বধূ দেখানোর জন্য বন্ধুকে পতিতাপল্লি নিয়ে যাবে—কামরানের এতটা অধঃপতনের খবর আমার জানা ছিল না। তবে এ পথে নেমে পড়ার প্রথম দিনটিতেও ঘটনাক্রমে তার সঙ্গী ছিলাম আমিই। অবাঙালিপ্রধান নবাবপুর-হাইস্কুল থেকে সদ্য ম্যাট্রিক পাস করে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হবার মৌসুমে বিভিন্ন কলেজে আনাগোনা করার কালে জগন্নাথ কলেজে ঢুকেই পেয়ে গিয়েছিলাম আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, সিনিয়ার বন্ধু, বাহজাদ রিজভিকে। ভারতের ইউ.পি. থেকে পূর্বপাকিস্তানে আসা রেফুজি ফ্যামিলির ছেলেটি ছিল কেবল ফিচেল নয়, একেবারে বিটেল এবং খিস্তির হাঁড়ি। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার চাপে ব্যাটার চোখমুখ হলদে হয়ে গিয়েছিল। ভর্তি বিষয়ে খবর নিতে এসেছি শুনে উর্দু-বাংলা মিশিয়ে বলল:

'সমবেত শ্রোতাদর্শকের পেছনের সারি থেকে ছুঁড়ে —মঞ্চে-বসা সভাপতি কি প্রধান অতিথির কপালে পচা ডিম ফাটাতে পারবে একচান্সে?'

'না।'

'তবে তো ভর্তিপরীক্ষায় ফেল।'

'ভর্তিপরীক্ষা?'

'হাঁ, ওটা পরীক্ষার প্র্যাকটিক্যাল পার্ট, যেটা আমরাই নিয়ে থাকি। কেন-কে, এখানে টিমওয়ার্কের চেয়ে ডিমওয়ার্ক বেশি লাগে। এলাকাটাতে বহুত ঝামেলা আছে। 'লালচী গলি' ভি কাছেই—'

'সে আবার কী?'

'লাল বাত্তিওয়ালী।'

'মানে?'

'রেডলাইট ভি নেহি সামঝ্তা? চলো দেখা দেতা, সামঝি ভি দেগা।'

রিজভি আমাদের নিয়ে ইসলামপুর রোড ধরে এগিয়ে চলল। বাদামতলি ব্রিজের কাছে একটি গলির মুখে পৌঁছেই কামরানের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল:

'দো টো রোপেয়া দো তো—ধাকলাগা-কে আতে হেঁ।'

ওর ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখে কিছু না বুঝেও টাকাটা বের করে দিল কামরান। গলিতে ঢুকে গেল রিজভি, তবে নসিহত করে গেল—আমরা যেন সেখানেই অপেক্ষা করি এবং কারো ডাকাডাকিতেও কোনোদিকে না-যাই। পাশের দোকানে ঝুলন্ত কলা দেখে ক্ষুধা অনুভূত হল। অবশ্য পয়সাওয়ালা বন্ধু কামরান সঙ্গে থাকলে ক্ষুধাতৃষ্ণা সর্বদাই অনুভূত হয়। চা-সিগ্রেট শেষ হতেই, বেশ ফ্রেশ হয়ে ফিরে এল রিজভি। তার হলদে হয়ে-যাওয়া চোখমুখ রীতিমতো লালচে। ছুরি-হেসে কামরানকে জিজ্ঞেস করল :

'ধাক্ লাগাও গে?'

'বুঝিই না তো।'

'আরে যার! তোমার বোঝা লাগবে না, যার রাস্তা সে-ই খুঁজে লিয়ে ঘুসে যাবে। আও মেরে সাথ—'

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল :

'তোম ইন্তেজার কারো। আ্যায়সি তিতিরী ইন্তেজার কি লায়েক হ্যয়—নারাম ভি আছে, গারাম ভি আছে।'

সম্পূর্ণ একলা হয়ে পড়ার পরেই আমি লক্ষ করলাম যে এই গলিতে লোক আসছে পূর্ব-পশ্চিম দুদিক থেকেই —উত্তর দিক থেকেও, রাস্তা ক্রস করে। তবে গলিমুখে এসেই ঢুকে পড়ে না কেউই। সবাই একটু থতমত খায়, কিছু খোঁজার ভান করে। তারপর এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে, মুখ নিচু করে ঢুকে পড়ে। গলির মুখ থেকে যে-কটি বাড়ি দেখা যায়, তার দু-একটির গায়ে লেখা—ভদ্রলোকেব বাড়ি।

'ঠিকই এসেছেন, গলি এটাই। এত কী দেখছেন?'

এক অস্বস্তিকব লোক এগিয়ে এসে বলল।

'বাড়ির গায়ে 'ভদ্রলোকেব বাড়ি' লেখা কেন?'

'ও কয়েকটা মাত্র। গলিটিতে ওই সাইনবোর্ড-ছাড়া সবই বাড়িউলিব বাড়ি।'

'বাড়িউলিব-বাড়ি কী?'

'নতুন নাকি? আসুন, আমার সঙ্গে আসুন -- বেস্ট বাড়িটিতেই ঢুকিয়ে দেব।'

এমন সময় রিজভি ফিরে এসে খেদিয়ে দিল ফেউটিকে :

'যাও ভাই, আপনা গাবাম ঝাড়ো। বাচ্চে কো তাঙ্ কাবতে কাহে?'

পবপবই ফিরে আসে কামবান, ঘর্মস্নাত এবং সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তাকে এত জলদি ফিরতে দেখে চিন্তায় পড়ে যায় রিজভি এবং জানতে চায় :

'ক্যা হুয়া? তোমহার সাথ খারাবি কবেছে কোই?'

'না।'

'তো ইতনি জলদি? পরথম বাব না কি?'

'হাঁ।'

'তো ঘাবরায়ে কাহে? হামার ভি এবকম হুয়া থা-- দো সাল আগে। এখোন তো বহুত বোল-বদল ভি চলতা হ্যায়।'

এতক্ষণে মুখে কথা সরে কামরানের :

'বোল-বদল কী রিজভি ভাই?'

'সাপোজ ওপেনিং বোল — লে পকাপক্, দে-পকাপক্, লে-পকাপক, দে-পকাপক, আওর ফিনিশিং বোল্— চল্ মেবি ঘোড়ি, টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্, টগবগ্, টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ —'

খবিশটা এমন অশ্লীল শব্দ আব সুর করে বোলগুলি বলতে লাগল—লজ্জায আর ভয়ে তাকে থামানোর জন্য বলে উঠলাম :

'চলুন, একটা ভালো দোকানে চা খাই।'

'আচ্ছি বাত। কিন্তু, ধাক নহি লাগাগে তোম?'

'না। আগে শুনব, দুই বছর আগে কী হয়েছিল আপনার।'

কলেজ সংলগ্ন এক রেস্তোরাঁর কাউন্টারে নাস্তাসহ অর্ডার হেঁকে দীর্ঘদেহী শাহজাদ ভাই কুঁজো হয়ে কেবিনে ঢুকে বসতে বসতেই বলতে শুরু করলেন :

'ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে লম্বা ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদে, খালুর বাড়ি।'

'খালুর বাড়ি? হাজার মাইল দূরে?'

'দূরে তো আ-গ্যয়ে হামই-লোগ, ইউ.পি.র মালিহাবাদ থেকে। পার্টিশানের পরে এক বহেনের ফ্যামিলি ইস্ট পাকিস্তান এসে গেল, তো দোসরি বহেনের ফ্যামিলি চালি গ্যয়ি ওয়েস্ট পাকিস্তান—'

'আগে বলুন—আমার মতো কী হয়েছিল।'

কামরান চোখের ভাষায় আমাকে বাগড়া দিতে মানা করল।

'বি.এ.-পাস এক কাজিনের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম সন্ধ্যার পরে। রাত করে ফেরার পথে এক বাড়ির সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে সালিম ভাই ভেতরে গেল তো —আনে কা নাম নেহি। বুড়োদের পাড়ায় একটা খোকাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে — এক ওস্তাদ কাছে এসে নিচি-আওয়াজ মে বোলে ঃ

'এ বাচ্চা! এধার ক্যা কাম—ধাক লাগাও গে?'

'ভাইয়া আন্দর গ্যয়া। আমি তার এন্তেজারে আছি।'

'ওর তো বহোত দেরি হবে। ওখানে আগে গানা-বাজানা হয। ইতনে মে তোম ধাক লাগা লো একবার।'

বললাম ঃ 'ওটা কী?'

বলল ঃ 'উও সিখলা দেগি — দারুণ লাড়কি আছে, সিন্ধি হিন্দু।' হিন্দু শুনেই মালিহাবাদে আমাব বাচপান কি সাহেলি আঞ্জলি য়াদ আ গ্যয়ি। তো হাম রাজি হয়ে গেল। লেকিন তোমার মতোই খালি গেলাম আওর এলাম। পরে আরো কয়েকবার গেলাম তো বহুত কাবিল হযে গেলাম।'

'আপনার লজ্জা হল না তার কাছে আবার যেতে?'

'কেন হবে? আঞ্জলিই তো বলল —'

'অঞ্জলি?'

'মনে মনে ওকে আমি 'অঞ্জলি মালিহাবাদী' ভেবে নিয়ে ফুর্তি বাড়িয়েছিলাম। তো ও বলল, বার বাব এলে তোমাকে আমি দেখিয়ে শিখিয়ে পাক্কা খিলাড়ি বানিয়ে দেব। আমিও সুযোগটা নিয়েছিলাম। জায়গা চেনা, কাজিন ভি চালা গ্যায়া লাহোর ইউনিভার্সিটি মে ভরতি কি কোশেশ মে। লেকিন ইয়ে চম্পা তোমকো ক্যা বোলি, য়ার?'

'বলেছে যন্ত্রী আনাড়ি হলেও যন্ত্রটি ভালো।'

'হাম ভি বোলতা, সাজ আচ্ছা হ্যয তো বাজ ভি আচ্ছা হো জায়েগা — রেওয়াজ কাবো। মাগাব আকেলা না জানা। উসব খতবনাক জাগা আছে— রেড-লাইট এরিযা।'

'তো রেওয়াজ কীভাবে হবে?'

'হামকো লে জাওগে। লেকিন আজ যাও ভাই, পড়না হ্যয়—সালা ইমতেহান!'

বেরিয়ে গিযে অনেকক্ষণ দুজনের মুখে কোনো কথা জোগাচ্ছিল না, সহসা এমন অপ্রত্যাশিত একটা অভিজ্ঞতার পরে। আর কিছু না পেয়ে এক সময় আমি বললাম ঃ

'আরে ধাক-লাগানোর মানেটাই তো জানা হল না মাগিবাজটার কাছ থেকে!'

প্রায় অচেনা স্বরে জবাব দিল কামরান ঃ

'আমিও তো এখন মাগিবাজ। আমার কাছ থেকে জেনে নে।'

কেমন একটা অনিশ্চিত উপলব্ধি ঝরে পড়ে তার কন্টে-যে-কণ্ঠে স্বধিকারের সুরটি দুর্বোধ্য নয়। বললাম ঃ

'বল্ না।'

'মাত্র একটাই তো লাগাতে পেরেছিলাম ধাক্কা — আর শব্দটা তো 'ধাক' বলেই বোধ হল। তবে এরকম ফেল মারার মানে হয় না। অন্তত পাস করা পর্যন্ত রেওয়াজ চালিয়েই যেতে হবে।'

'এসব রেড এরিয়ায় একলা যেতে মানা করল না রিজভি?'

'একলা যাব কেন, তুইও যাবি—টাকা জোগাব আমি।'

'আমি তো ভাই ফেল করিনি। আমার তাই পাসেরও দরকার নেই।'

কামরানের আঁতে ঘা লাগাতে সে আমাকে তলপেটে ঘা লাগাল ঃ

'তুই তো শালা ফেল করার আগেই শেষ হয়েছিল। সালওয়ারের নেয়ারের কটা গিঁট খুলতে খুলতে আউট হয়ে গিয়েছিলি—মনে পড়ে?'

মনে পড়লে এখন আমার হাসিই পায়। বহু সাধ্য-সাধনায় এক কুমারী কাজিনকে অনুকূল স্থানকালে পেয়ে আপোসে এনেছিলাম। আশপাশ দেখে আসি বলে চলে গেল সে এবং ফিরেও এল অল্প পরে। তবে তার রহস্যময় হাসিটি সম্মতির ছিল, না শয়তানির —তা খেয়াল করিনি। কাঁপতে কাঁপতে ঘামতে ঘামতে সুইট-সিক্সটিনের সালওয়ারের নেয়ারের গিঁট খুলে চলেছি তো চলেছিই—একের পর এক, অনিঃশেষ। হায় সালোয়ার! তার গিঁট শেষ হবার আগেই ফুরিয়ে গেলাম আমি নিজেরই পাজামার ভেতরে। আমার নাজেহাল অবস্থা দেখে খিলখিল হেসে পালাতে চাইতেই সুইটির হাতটি ধরে জানতে চাইলাম, 'নেয়ারের এত গিঁটের মানে কী?' 'মানে? না—হলে অশেষ গিঁট। আর হাঁ—হলে বিশেষ গিঁট।' স্মৃতিচারণ-শেষে বললাম ঃ

'মনে পড়ে বলেই বলছি — সেই কাজিন-কথিত বিশেষ-গিঁটের সালওয়ারের অপেক্ষাতেই বসে থাকব। তবু শালা এই তুলে-রাখা শাড়ির তলে ঢুকে পড়ব না।'

তবে বিরুভি থাকতে এ কাজে সঙ্গীর অভাব কী। তার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর থেকে কামরানের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর পর্যন্ত মেধাবী ছাত্রটিকে সে বাদামতলির বেপাড়াটি শেষ করে, মায়া-সিনেমার পেছনকার এবং রায়সাহেব বাজারের ভেতরকার পাড়াগুলি চরিয়ে অবশেষে, দেশের এক নম্বর পতিতাপল্লি, নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল। এ যেন স্কুল-কলেজ শেষ করে বন্ধুটির বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাওয়া। টাকা? আদি ঢাকার বনেদি ব্যবসায়ী-পরিবারের আদরের একটা পোলার সামান্য ক্যাশের গরজ মেটানোর জন্য চাচাতো-মামাতো-খালাতো কাজিনদেরও দান-ধারের হাতগুলি খোলাই ছিল হামেশা। আর সাময়িক সঙ্কট মোচনের জন্য মাতৃহস্তের শাশ্বত উৎসটি তো সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল—শৈশবে-পিতৃহারা সন্তানটার জন্য।

এভাবে লেখাপড়াটা বন্ধ হয়ে গেলেও, হাই-আইকিউ-পুষ্ট কামরান একেবারে নষ্ট হয়ে গেল না। কারবারী হয়ে বসে গেল পৈতৃক একটা চালু ব্যবসাঘরে—ফরাশগঞ্জের 'খোন্দকার উড ডিপো'-তে। নবাবপুর হাইস্কুল এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ জীবনের বিশেষ বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ ওর স্বভাবতই শেষ হয়ে গেল। ওই তার সর্বশেষ পরিস্থিতি আমারও পুরোপুরি জানা ছিল না। শুধু এটুকু শুনেছিলাম যে বেপাড়ায় বিচরণ তার বেপরোয়া হয়ে চলেছে। সঙ্গে মদ্যপানের মান-মাত্রাও বেয়াড়া হয়ে উঠেছে—বিদেশি না পেলে দেশি, দেশি না পেলে ধেনো। এমনকি তাড়ি হলেও, নেশা তার কম্পালসারি—নিরিবিলি কোনো নালার ধারে সবান্ধব দাঁড়িয়ে গলনালি দিয়ে ঢালত, আর মূত্রনালি দিয়ে বের করে দিত।

কিন্তু তাই বলে বেশ্যাপাড়ায় বউ দেখানো? উলটে ক্ষোভ প্রকাশ করে কামরান ঃ

'বেশ্যাপাড়া বলবি না।'

'কী বলব, পতিতাপল্লি?'

'না, তাও না। এরা পতিতা, না আমরা পতিত— সেটাও বিতর্কিত।'

'তো কী বলব? বিরুভি বলছিল, হায়দ্রাবাদের মতো 'বাইজী মহল্লা' না-বলে লাহোরের-টাকে বলে 'হিরামান্ডি', মানে হিরাবাজার, মানে রত্নপুরী আর কী। ওটা বলতে তো খারাপ লাগে না—'

'এটা বলতেও খারাপ লাগে না —টানবাজার,মানে যে-বাজারে আসতে পুরুষেরা টান বোধ করে। নাম বাদ দে —নিষিদ্ধ এলাকা বললেই চলে—'

বলতে বলতে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়লাম আমরা। ঢুকতেই এলাকায় কামরানের দাপট দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দুপাশ থেকে বোতল-হাতে মাতালের দলের সালাম-কুর্নিশের যেন শেষ নেই। কেউ বলে গুরু, কেউ বলে ওস্তাদ, কেউ বলে প্রভু, কেউ বলে মহারাজ। দুয়ার ধরে দাঁড়ানো সাজগোজ করা এক মেয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে বলে ঃ

'গুরু আশীর্বাদ কইরা দেন—আইজ যেমন বউনিটা বালা অয়।'

'আগে গুরুদক্ষিণা দে।'

'এই লন!'

মেয়েটি তার পুষ্টতর বাম স্তনটি তুলে ধরল। কামরান ওটিকে একটু নেড়ে দিল। স্তনটিও পুডিং-এর মতো নড়তে থাকল, সুরক্ষিত ছিল না বলে। অপর পাশ থেকে আরেক মেয়ে এসে আবদেরে সুরে বলে ওঠে:

'হামকো ছু নেহি দেগা ওস্তাদ?'

'তরে যে ছোঁওয়া লাগে উলটা দিকে!'

মেয়েটি পেছন ফিরল এবং কামরান তার উত্তুঙ্গ নিতম্ব নেড়ে তরঙ্গ তুলে দিল। এসব দেখতে দেখতে আমার ভয় অনেকটা কেটে গেলে আমি খালি জানতে চাইলাম, সে এখানে এমন রাজাধিরাজ হল কেমন করে। জবাবে কামরান বলল: 'স্রেফ টাকা ছড়িয়ে। টাকার বশ সবাই। এখানে বলে—চান্দির গোলাম।'

আরতির ঘরে উঠে আমি আরো বিস্মিত হলাম। মেয়েটি সেজেগুজে একেবারে বধূটি হয়ে বসে আছে, নিকোনো-গোছানো পরিচ্ছন্ন ঘরে। ও যেন জানত, আজ বউ দেখতে আসবে কেউ। আমাকে সালাম আর কামরানকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল: দাদা, আপনাকে চা-না কফি (নিশ্চয় আজকের অনুষ্ঠানের জন্য কামরানের বিশেষ ব্যবস্থা)। আমাকে থতমত খেতে দেখে কামরানই বলে দিল কফি। আরতি হিটারে পানি বসাতেই পাশের ঘর থেকে এক তীক্ষ্ণ চিৎকার:

'জ্বইলা গেল খালা!'

'কী হইতাছে আরতি?'

'কী আবার, ফুল —

'ও, পুষ্পচ্ছেদন!—'

'ও খালা!— '

'মাইনাটা কেডা রে?'

'সামনের বাবিউলি '

'স্লাম ছুটাও – '

'হারাব মেয়ে হেনা-- '

'আহা, ডিফ্লাওয়ারিঙে একটু কষ্ট —'

খন্দেবটি প্লুতস্বরটি ডুবিয়ে দিল ধলাখালাব খাণ্ডার গলা:

'হালায আবার ইংরাজি মারায়। কইলাম, পরথমবার খালি গলা বারাইয়া উঁকি মাইবা আইয়া পরবি। এক মাসের লাইগা বুক করছ, এত খাই-খাই ক্যান বে? যাও চান্দু, দুই দিন আর এই মোরা আইবা না কইয়া দিলাম।'

'নিলাম অইছিল রতি?'

'হ।'

'আমার রেকর্ডটা আছে, না গেছে?'

'লোকে কয়, মহারাজ মহারাজই— '

আবার খালার গলা:

'আর তুমিও মাইয়া, কী লজ্জাটাই-না দিলা এমন একটা চিক্কইর পাইরা। তোমারে বুঝাইছিলাম না যে আমগো অইল গিযা ফিরি সাইজ— কোনো হালারে ভয় নাই। হুন। আমগো কালে পারায় এক পাঠান আইত। কেউ তারে বসাইবার চাইত না, হের ঘোড়া-মার্কা লেওডার—'

এই পর্যন্ত শুনেই কামরান দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল:

'শুরু অইল ধলাখালাব খিস্তিখেউর! চলি রতি, চল জামাল।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই কামরান বলল:

'রিজভি শালা দেখছি ঠিকই বলত —'

'কী?'

'শব্দটা শুনতেই—'

মনে পড়ল। ব্যাটা সাংঘাতিক বাঙালিবিদ্বেষী ছিল। কথায় কথায় তার বিদ্বেষ উপছে পড়ত : 'বাঙ্গালি কি জোবান ভি গরিব আছে—লাড়কি ঠো ভালো, তো বকরি ভি ভালো, আম ঠো ভালো, তো গান ভি ভালো।' মুখ কুচকে একটি খারাপ শব্দ বলল। সত্যই শব্দটি এতই অশ্লীল শোনায় যে, শুনতেই অন্সটি মোচড় দিয়ে ওঠে। ঘর থেকে নেমে বাইরের রাস্তামুখো হলে কামরানের এক সাগরেদ এসে বলে :

'ওস্তাদ, আপনার ঘরগুলার খবর নিয়ে গেলেন না?'

'তুই দেখশুনটা ভালো করলেই হল। পরে আসব।'

লোকটাকে দশ-পাঁচের নোট কয়েকটা দিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে পা চালিয়ে দিল কামরান। আমার বহু কথা জমে গিয়েছিল। কথার সুবিধার জন্য ট্রেনে ফেরা-সাব্যস্ত হল, আমারই প্রস্তাবে। তাছাড়া একটা স্মৃতিচারণার ব্যাপারও ছিল— রেলস্টেশনের চা খাওয়ার। স্কুলজীবনে আমার আর কামরানের সম্পর্কটা এমন ছিল যে কথা বলার আর গান শোনার তৃষ্ণা শেষ হত না। তাই বিচ্ছেদও একদম সইত না। রাতের দেড়টায় জনসন রোডের ইসলামিয়া আর আল-ইসলাম রেস্টুরেন্ট, আড়াইটায় একই রোডের বিসমিল্লা রেস্তোরাঁ, আর সাড়ে তিনটায় সদরঘাটের রিভারভিউ কাফে বন্ধ হয়ে যেত - -তবু আমাদের আড্ডা সাঙ্গ হত না। সুতরাং বাকি রাত কাটাতে হত ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে, যেখানে চা পাওয়া যেত সারারাত।

নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় তেমনি একটা ম্যারাথন আড্ডা চলল বহু বছর পর। শুনলাম কামরানের কাহিনির অজানা অংশটি। টানবাজারে তার শিকড় গাড়া, প্রভাববিস্তার ইত্যাদির শুরু আরতি থেকেই বরং তারই জন্য। চুরি করা শিশুটি পদ্মমাসির সম্পত্তি হিসাবে বেড়ে ওঠে। মেয়েটির দখলদারিত্বের জন্যেই কামরান টাকা ছড়িয়ে সেখানে শিকড় গাড়ে। প্রভাব বিস্তারের এক পর্যায়ে কিছু চটকদার মেয়ে জোগাড় করে কয়েকঘর পতিতার একটা খাস-মহল চালাতে শুরু করে সে - ধলাখালা, সোনামাসি আর বীরেন কেরামতদের সহযোগে। কাউকে কাজ জোগাড় করে দেবার বাহানা দিয়ে,কাউকে প্রেমে প্রতারণা করে - এখানে এনে বিক্রী করেছে কোনো খলচরিত্র। কোনো মা মরা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে সৎমা কিংবা বৈরী মামি খালা ভাই-ভাবীর অত্যাচারে এবং পড়ে গিয়েছে দালালের খপ্পরে। যাহোক, কামরানের টানবাজারের রাজকীয় ব্যয় ওই বাজারের আয় থেকেই চলে। বাড়তি থাকে গোটা পাড়ায় তার সুলতানির স্বীকৃতি। ট্রেন এসে গেলে ইন্টারক্লাসের খালি বগিটিতে বসে পড়েই জিজ্ঞেস করে সে :

'বল, আমার বউ কেমন দেখলি?'

'কিন্তু এ পাড়ির বউ তুই নিজের বাড়ি তুলবি কীভাবে?'

'সেটা অন্য প্রশ্ন, পরে উত্তর দেব। আগে তুই আমার কথার জবাব দে।'

'আরতি কি তার আসল নাম? না, পাড়ার দেওয়া নাম?'

'তুই কী জানতে চাচ্ছিস, বুঝতে পাচ্ছি। মূলে সে কী ছিল, আরতি না অন্য কিছু, হিন্দু না মুসলিম —তা সে নিজেও জানে না। ওসব আর কখনো জানাও যাবে না। কোনো এক খল কোনো এক গরিবের কোলের শিশুটিকে চুরি করে নিয়ে আসে। তাকে কিনে রাখে নিঃসন্তান পদ্মমাসি, পালন করে বাৎসল্যের শখ মেটায়। পরে নিজের যৌবনের সঙ্গে খদ্দেরেরও ভাটা পড়ে গেলে- পেটের জ্বালায়, ঘুষ দিয়ে লাইসেন্স জোগাড় করে, সাবালিকা হবার আগেই খদ্দের বসানোর জন্য পালিতা কন্যাটিকে জ্বালাতন শুরু করে। সকলের প্রিয় স্বভাবসেবিকা বালিকাটির সাহায্যে এগিয়ে আসে । একাধিক বাড়িউলি-খালামাসি, সামাল দেয় প্রৌঢ়া পদ্মার পেটের টান। সাবালিকা হলে আরতির কুমারীত্ব নিলামে তোলার ভালো একটা ব্যবস্থাও করে দায় তারা। মেয়েটিকে একটিবার দেখে দুটি কথা বলেই প্রেমে পড়ে যাই আমি, অবাস্তব দামে নিলাম ধরি এবং নিজের করে রেখে দিই—'

'আজ অবধি রেখে দিয়েছিস?'

'দিতাম, দাম জোগাতে পারলে। একদিন দুদিন করে ছেড়ে দিতে হল। এখন সপ্তাহে চার দিন আমার—শনি, রবি, মঙ্গল আর বৃহস্পতিবার। কিন্তু তুই তো আমার প্রশ্ন এড়াচ্ছিস। ঠিক আছে, বউ বাদ দে। মেয়েটিকে কেমন মনে হল বল।'

'নিষ্ঠাবতী, ভক্তিমতী—'

'এগজাক্টলি। তার এই ভক্তি-নিষ্ঠাই উলটে আমাকে কিনে ফেলেছে।'

'ওর পাড়াতে তোর যে-দাপট, সেখান থেকে ওকে বের করতে পারবি। কিন্তু নিজের ঘরে তুলতে—'

'তেমন সমস্যা হবে না। আমার বাড়ির পরিবেশ তো তোর প্রত্যক্ষ পরিচিত। এক ভাই বিয়ে করেছে কালিগঞ্জের খ্রিস্টান, আরেক ভাই বিয়ে করেছে বন্ধুর সৎমা। তাছাড়া সচ্ছল-বিরাট ওই পরিবারে কেউ কারো খবর রাখে না। রইল বাকি অসুস্থ মা। তা তাঁকে সেবা শুশ্রূষাতেই জিতে নেবে আরতি।'

জিতে নিয়েওছিল—অবশ্য শাহনাজ নামে। নামটা কামরানই বদলিয়ে দিয়েছিল, অতীতকে আরেক পোচ ঢাকার জন্য। যখনি গিয়েছি, শুনেছি—শয্যাগতা শাশুড়ির ক্ষণে ক্ষণে 'নাজ' ডাকাডাকি। ব্যস্ত ব্যবসায়ী কামরানকে প্রায়ই পাই না, তবে শানাজভাবীর চা-নাস্তা না খেয়ে ওঠাও যায় না। বাত-কে-বাত একদিন জানতে চাই :

'কেমন চলছে আরতিভাবী?'

'আরতির জ্বালাটা ছাড়া বেবাকই ভালো।'

'বুঝলাম না।'

'হের কিছু বন্ধু শানাজেরে পাত্তা না দিয়া আরতির দিকে হাত বাড়ায়। আমি কই উলঙ্গ পুরুষ মেলাই দেখছি, বাধ্য অইয়া— ইচ্ছা কইরা দেখনের শখ নাই। যারা দ্বিতীয় পুরুষ দেখে নাই তাগো কাছে গিয়া দ্যাখেন—অগো হাউস অইলেও অইতে পারে। একজনে তো কইয়াই ফালাইল : হপ্তায় হক্কল দিন তো আর একজনের আছ্‌লা না। অহন মাঝে-মধ্যে অন্যের অইলে কী অয়? কইলাম—কিছু না অইলে, রেটটা জিগায়া লইয়েন বন্ধুর কাছে। কন যদি, আমিই জিগায়া লমু নে।'

'কামরান কী বলে?'

'পাগল! তারে কইলে খুনখারাবি অইয়া যাইব না? অতীত তো সইরা যাইব পিছনের দিকে, বর্তমান যে হাত পা বারইব সামনের দিকে।

ঠিকই বলেছিল আরতি। বৈদেশিক বৃত্তি পেয়ে তিন বছরের জন্য বিদেশ যাবার সময় দেখে গিয়েছিলাম কামরানের ঘর সংসার চমৎকার রূপ নিয়েছে, দুটি পুত্রসন্তান যুক্ত হয়ে। বিদেশ থেকে ফেরার পরে শুনলাম, কামরান এখন একজন বর্ধিষ্ণু শিল্পপতি। কাঠের গোলাটিকে কেন্দ্রে রেখে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আমদানি করে সে বিরাট এক উডক্রাফট ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেছে বুড়িগঙ্গার ওপারে, এপারে দিয়েছে বিশাল এক কেন্‌ওয়ার্কের সিস্টার ইন্ডাস্ট্রি। ছুটাছুটি করছে স্ক্যান্ডিন্যাভিয়া আর মালয়েশিয়া। তার দেখা পাওয়াই ভার। তবে স্কুল বন্ধুদের মধ্যেও ঘনিষ্ঠতম দোস্তের কাছে একদিন সে নিজেই এল এবং চমকিয়েও দিল :

'তুই তো শালা বিয়েশাদি করবি না। চল তোকে আমার বধূই দেখাতে নিয়ে যাব আবারও।'

আমিও অপ্রস্তুত হয়ে আগের বারের মতোই জিজ্ঞেস করেছিলাম :

'বধূ না বঁধু?'

'হবু বধূ।'

এবার বউ দেখাতে নিয়ে গেল সে অদূরেই, ভার্সিটি ক্যাম্পাসে, রোকেয়া-হলের গেটে। খবর দিয়ে বের করে আনল এক উপস্থাপনযোগ্যা ললনা। পরিচয় করিয়ে দিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম.এ. পরীক্ষার্থিনী, রেহানা। পড়াশোনার খোঁজ-খবর নিয়ে, বেশি খেটে রোগ-না বাধানোর উপদেশ দিয়ে, বিদায় নিতেই কামরান জানাল— পরীক্ষার পরেই তাদের বিয়ে। আমার আমোদিত চোখ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে যোগ করল :

'আরতির অভাবগুলি কেমন প্রকট তা তো তোর জানা। এখন আমার ব্যবসা বেড়েছে, বাণিজ্য বদলেছে— ঢাউস ঢাউস কার্পোরেট হাউসগুলির সঙ্গে ব্যবসা, হাইয়েস্ট লেভেলে চলাফেরা। তাই অভাবী এই মেয়েটিকে রোকেয়া-হলের আবাসিক ছাত্রী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি দু বছর ধরে, হাইলেভেলের সহবত শেখাচ্ছি। সে যাক। এখন বল, বউ কেমন দেখলি?'

'চোখে পড়ার মতো।'

'আর?'

'আপাতত ওই পর্যন্তই। তোকে পাই না বলে অনেক দিন যাওয়া হয় না—চল, আজ তোর আগেই বউটিকেও দেখি—'

'আগের বউ কী রে? সে তো আছেই এবং থাকবেও। ওর প্রতি কোনো অবহেলাই হবে না —ও আমার ভাগ্যলক্ষ্মী। মায়ের মৃত্যুর পর সে-ই তো সম্রাজ্ঞী আমার হাটখোলার আদিবাড়ির। রেহানাকে নিয়ে থাকার জন্য আমি নয়াপল্টনে একটি নতুন বাড়ি কিনেছি। আজ আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনেক। তুই যা, শানাজকে একটু বোঝা বেচারি একেবারেই ভেঙে পড়েছে—'

'তোর পরিবর্তিত ব্যবহারে?'

'না, রে। ও ভাবে, ওর জীবনে যেহেতু কোনো শিকড় ছিল না, আমার জীবনেও তার কোনো ভিত্তি নেই। তুইই পারবি ওকে বোঝাতে—'

'এ কী বোঝানোর বিষয়!'

তবু আমি গিয়েছিলাম আরতিভাবীর সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে দেখেই চোখে তাঁর জল ভরে এল। কোনোরকমে কেবল বললেন :

'আপনে দ্যাশে থাকলে আপনেরে দিয়া একটু চেষ্টা কইরা দেখতাম থামান যায় কিনা মানুষটারে।

'অন্যদের দিয়া কিছুই বলাননি? যখন বিষয়টি জানলেন?'

'কারে কমু? হেরা তো থাকে উস্কায়া দিয়া মদের মাজমা জমাওনের তালে

'সব মানুষই কি এক রকম ভাবী?'

'আপনি ছাড়া হের বন্ধুবান্ধব দেখলাম হেরাকই এক রকম। হ্যাগো ব্যবসা অনেক। কামটা কিন্তুক একই, মানুষ ঠকাওনের। আলাদা খালি আপনের কামটাই—মানুষ পরাওনের।'

'তাহলে আপনাকেও একটু পড়াই, যদি অনুমতি দেন '

'দিমু না ক্যান আমারে সান্ত্বনা দেওনেরও তো আর কেউই নাই।

যিনি আপনাকে পৃথিবীতে এনেছেন তিনিই আপনাকে যেভাবে রাখার রাখবেন এবং এক সময় নিয়েও যাবেন আমাদের হাতে আসলে তেমন কিছু নেই ভাবী।'

আমিও ওই উপরের দিকেই চাইয়া থাকি—আর কিছুই যে ভাইবা পাই না।'

তাহলে আমিও আপনাকে এই মুহূর্তেই বলে দিতে পারি শেষ পর্যন্ত, আমার বন্ধু আর তার বান্ধবীর চেয়ে বেশি সুখী হবেন আপনিই '

এর অনতিপরেই আমি তিন বছর চুক্তির চাকরি নিয়ে উগান্ডার কাম্পালা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই। সেখানকার টার্ম শেষ করে নাইজেরিয়ার কালাবার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো তিন বছর চাকরি করে দেশে ফিরে শুনি মাস কয়েক আগে কামরান মারা গেছে। কী ব্যাপার? ব্যাপার সনাতন। নতুন শহরের নতুন সংসারেই কাটে কামরানের জীবনের শেষ পাঁচটি বছর। তবে এখানে কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না—কেউই না, রেহানাও না। কামরানের ছিল কেবল গৌরী সেনের ভূমিকা। অনিয়ন্ত্রিত মদ মাংসে ফ্যাট প্রেশার বেড়ে চলেছিল অতিদ্রুত। হার্টে একটা বাইপাসও হয়ে গিয়েছিল। লাগামছাড়া অপচয়ে সঙ্কুচিত হচ্ছিল বাজেট – যদিও তার চাপটা গিয়ে পড়ছিল আরতির সংসারেই।

স্কুলবন্ধুটির জীবনের শেষ বছরগুলি যে বাড়িতে কেটেছে, সেটি একবার দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে চেনামহল মানা করেছিল এই বলে যে সেই বৈরী পরিবেশে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হতে পারে। কেননা সেখানে নিত্য নতুন লোকের আনাগোনার কথাই শোনা যায়। তবু বন্ধুর শেষ ঠিকানাটা এক নজর দেখার ইচ্ছা দমন করতে পারলাম না। ডোরবেল বাজাতেই দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং মিসেস রেহানা কামরান। যেন কারো অপেক্ষাতেই ছিলেন এবং দোর খুললেন প্রতীক্ষিতজন ভেবেই। সাজগোজ দেখে মনে হল তিনি বেরুবেন। সুদূর অতীতের সাক্ষাতটির বরাত দিয়ে বললাম :

'ওইটুকু পরিচয় নিশ্চয় মনে থাকার কথা নয় —'

'আপনাকে মনে রাখার কারণ একাধিক। একটি হল, আপনি ওর একমাত্র পণ্ডিত-বন্ধু। যা হোক, বলুন।'

'বলার তো কিছু নেই, শোক প্রকাশ করা ছাড়া। বহু বছর বিদেশ করে দেশে ফিরেই শুনলাম কামরানের মৃত্যু—

'মৃত্যু তো এখানে হয়নি।'

'সেটা শুনেছি। এখানে এলাম — সে জীবনের শেষ কটি বছর এ বাড়িটিতে কাটিয়েছে এবং বাড়িটি আমি দেখিওনি—তাই। আচ্ছা, বৈঠকখানায় তো দেখছি না—তার সাম্প্রতিক কোনো ছবি দেখতে পারি।'

'কেন বলুন তো?'

'ওকে দেখিনি ছয়টি বছর। শেষের দিকে আদলটা কেমন হয়েছিল—দেখতে ইচ্ছে করে। হাতের কাছে নেই বুঝি?'

'দূরেও কোথায় আছে কে জানে—ছবি-টবির হবি আমার নেই।'

ইতিমধ্যেই রেহানা-কামরান দুবার ঘড়ি দেখেছেন। যাবার সময় কিছু বলতে হয়, তাই বললাম :

'জীবন থেকে শিকড়টা ছিঁড়তেই বুঝি সে উৎসে গিয়ে উঠেছিল শেষ মুহূর্তে —'

'কারণটা অত গভীরে খোঁজার কী আছে। পাড়ার ছেলে পাড়ার মেয়ের কাছে গ্যাছে—'

'এ কী বলছেন আপনি!'

'কী বলছি তা বোঝার অসুবিধা অন্যের হলেও, আপনার তো হবার কথা নয়। শুনেছি, ওকে বেপাড়াতে আপনিই ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ওর ঘরে পতিতা তোলার শক্তিও জুগিয়েছিলেন আপনিই—'

এমনি সময় গটগট করে ঘরে ঢুকে জনৈক ড্যান্ডি বলে উঠল :

'চলো হানি! সবি ফর ডিলে।'

হঠাৎ 'হানি'র চোখ ফলো করে বিপরীত দিকে সদর দরজার পাশের সোফায় চোখ পড়তেই অপ্রস্তুত কণ্ঠে আগন্তুক বলে উঠল :

'জামাল, তুই?'

'হ্যাঁ রে কা মাল, আমি।'

'কেয়া মাল (?) পর্যন্ত মনে আছে তোর?'

'আমাদের স্কুল ক্যাপ্টেন রিজভির কথা মনে আছে তোর?'

'আরে ওই খবিশটাকে কে ভুলতে পারে?'

'না ভুললে ওর পরিচয়টা তোর হানি কে দিয়ে দিস। তিনি আমাকে রিজভি ভেবেছেন -'

না, আপনাকে আমি ঠিকই চিনেছি -'

'না, আপনি চেনেননি-- কে জামাল আর কে রিজভি। আমিও বুঝিনি— কে পতিতা আর কে উত্থিত'। চলি রে কামাল।'

বন্ধুবিয়োগের শোকটা আমার অনেক বেড়ে গেল, যদিও তার শেষ জীবনের তাবৎ বেদনার কথা আগেই শোনা। সোজা চলে গেলাম হাটখোলায়। কী সৌভাগ্য। গেটেই পেয়ে গেলাম কামরানের আজীবন ড্রাইভার আলি মিয়াকে।

'কী ব্যাপার আলি, তুমি এখানে?'

'সায়েবের যাওনের পরে আমি তো এহানেই ডিউটি করি--হেই করোনা-গারি।'

'রেহানা ভাবী?'

'হে রে একটা করোলা-গাড়ি কিনা দিছিল সাবে। ম্যাডামেই চালায়।'

'তুমি আমাকে খালি একটা কথা একটু বুঝিয়ে বলো তো আলি। ছয়-ছয়টা বছর নতুন বাড়িতে কাটিয়ে — দুনিয়া ছাড়ার দিনটিতে পুরোনো বাড়িতে আসাটা ঘটল কীভাবে কামরানের?'

'শ্যাষের দিকে তো পেরায়ই আইয়া পরত সাবে—অবশ্য গোপনে।'

'গোপনে ক্যান? বিয়ার আগে দুইটা বছর পড়াল, শেখাল— বোঝাপড়া তো থাকারই কথা।'

'বোঝাপড়ার মানুষই না সাব। প্যাটের মাইয়া দুইটারেও অমানুষই বানাইব।'

'এসব অবশ্য হওয়ারই কথা। থাক সেসব পুরানা কেস্সা। আমাকে তুমি খালি একটা কথা বল। দুই রকম কথা শুনি। কে বলে হার্ট অ্যাটাকটা ওই বাড়ির কাছে হয়েছে, কেউ বলে এই বাড়ির কাছে। গাড়ি চালাচ্ছিলে তুমি। তুমিই আমাকে বল—রাস্তার ঠিক কোন জায়গাটায় তার বুকের ব্যথা শুরু হয়?'

'নটারডাম কলেজের সামনে—'

'সে তো নয়াপল্টনের বাসার পাশে। হাসপাতালগুলিও সব সেদিকে। এ-বাসায় নিয়ে এলে কেন?'

'আমি গাড়ি ঘুরাইতাছিলাম। সায়েবে কইল ঃ বাসায় না, বারি যামু। আমি হাসপাতালের কতা কইতেই, কাতরাইয়া খালি কইয়া উঠল ঃ 'হাটখোলা।' গাড়ি ভিতরে ঢুকাইতেই দুয়ার খুইলা ছুইটা আইল শানাজখালা। সায়েব গাড়ি থাইকা বারাইয়া দাড়াইতেই, খালার গায়ের উপ্রে পইরা গেল। ধরাধরি কইরা ঘরে তুইলা বিছানায় শোয়াইয়া দিতেই বুকে হাত দিয়ে বইসা গিয়ে, ঢইলা পইরা গেল—মাথাটা পরল খালার কোলে, বালিশেও নিবার পারল না।'

'তাহলে—কারখানায় যাবার পথে এ-বাড়ির মোড়টা ক্রস করার সময় অ্যাটাকটা হয়েছে বলে কথাটা উঠল কোত্থেকে?'

'আমার কাছ থেইকা ঘটনাটা শুইনাই ম্যাডামে আর তার খাস চেলাগুলায় ওইটা রটাইছে। আর শাসাইয়া দিছে- --হাঁচা কতাটা আমি যেমন আর দ্বিতীয়বার মুখের বাইর না-করি। আপনেরে কওন লাগে বইলাই কইলাম। লন, ঘরে যাই। খালায় আপনার দ্যাশে আগুনের কতা জিগায় মদ্যে মদ্যে।'

মেঘে মেঘে চারদিকে ঘোর অন্ধকার ছেয়ে গেছে। এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। নামুক, আমার ফেরার তাড়া নেই কোনো। আরতিভাবীকে অপ্রত্যাশিতরকম প্রশান্ত বরং উজ্জ্বলই পেলাম। বস্তুত এত সুখী তাঁকে আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। একটু সময় নিয়ে বেরিয়েছেন ভেতর থেকে, তবে চা হাতে। বসতে বসতেই বললেন ঃ

'আপনি য্যামন পীর-ফকির। আপনের কতাটাই ফইলা গ্যাছে—আমগো তিন জনের মধ্যে আইজ আমিই বেশি সুখী।'

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হলাম। বৃষ্টিও নামল তুমুল। পতিতাপল্লি থেকে তাঁর স্বামীর ঘর করতে আসার মুহূর্তেও নাকি অন্ধকার করে এমনি বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন, গুড়ুদ্দুম। তাতে হই-হাঙ্গামার ভয় কামরানের কমলেও, ভবিষ্যতের আতঙ্ক আরতির নাকি একটুও কমছিল না। বললাম ঃ

'স্বামী হারিয়েও সুখী?'

'হারাইলাম কই? আমি তো পাইলাম। আমার কোলে মাথা রাইখা বিদায় নিল! এর বেশি আর কী পাইতাম আমি!'

বৃষ্টি আরেক দফা চেপে আসতেই উঠে পড়লেন আরতিভাবী ঃ

'খারান, বাদলায় আপনের পছন্দের জিনিসটা বানাইয়া লইয়া আহি—মুড়ি-ভাজি।'

বৃষ্টির আরেক কিস্তির সঙ্গে বাতাস ধেয়ে আসতেই বেলী ফুলের গন্ধ পেলাম। আমার প্রিয়তম ফুলটির 'গোপন মৃদুল সঙ্কেত' আমাকে নিয়ে গেল দেয়ালে-ঝুলানো ঘনিষ্ঠতম বন্ধুটির কাছে। ছবিটির ফ্রেমে পরানো বেলফুলের মালাটা দেখলাম তাজাই।

বাঘনখ



অশোককুমার সেনগুপ্ত

লঞ্চ সজনেখালির ট্যুরিস্ট বাংলোর ঘাটে এসে দাঁড়াল। শীতের এই রৌদ্রহীন বেলায় জল-জঙ্গলের পটভূমিতে সন্ধ্যার নরম ময়লা আঁচল ছড়িয়ে পড়েছে। সিঁড়ি করতে তক্তা ফেলে দেওয়ার পর যাত্রীদের নামা শুরু হল। চুয়ান্নজন যাত্রী। রাত্রিবাস ওই বাংলোয়। বৃক্ষশ্রেণির নিবিড়তার চাদরে বাড়িখানার যেন আত্মগোপনের দুরন্ত চেষ্টা।

ঘাটের পরেই চমৎকার রূপসি পথ। নানান ফুলের সঙ্গে বাহারি গাছ। কাঠের এবং সিমেন্টের খুঁটি ধরে নদীতীর ঘেঁষে বেড়া চলে গিয়েছে। পাক দিয়ে আয়তাকার এক টুকরো অরণ্য হরণ। ঘাড় উঁচু বাঘ দেখার টাওয়ার ওপাশে, বনবিভাগের ছড়ানো কয়েকখানা বাড়ি। কর্মীরা থাকেন। সুন্দরবন প্রদর্শনশালাও রয়েছে। ঘাড় পিছনে ফেরাতেই নদী, বিস্তৃত চারা, ভাঁটার ছবি। অদূরে একটা লঞ্চ ভেসে যাচ্ছে। দূরে বনরেখা। জল আর জঙ্গল। এক অন্য প্রকৃতি শীত বিমর্ষতায় যেন আসন্ন সন্ধ্যাজলে অবগাহন করছে।

শ্যামল স্বল্পায়তন ঘাটের কংক্রিট চত্বরটায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখে পড়ে সামনেই ইংরাজিতে স্থির উচ্চারণ 'নীরবতা পালন করুন। বন্য প্রাণীকুল আপনাকে উপহার দেবে।' রিওয়ার্ডের বাংলা পুরস্কার না উপহার কোনটা জুতসই!

শ্যামলের মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ধূপের ধোঁয়ার মতো সুগন্ধময় এক আবেষ্টনী। কথা কত ধারালো হয়। একটা বাক্যও কী বিশাল শব্দময় সৌন্দর্যের বিপুল ধারক হতে পারে।

ডালহৌসি থেকে ট্যুরিস্ট বাসে সোনাখালি। তারপর সুশোভন লঞ্চে জলযাত্রা। সুন্দরবন। দু'দিনের ভ্রমণ। জল আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। জঙ্গল দূর থেকে এক। হেঁতোল, গরান, গেঁওয়া। সবুজ রোগাটে। জল বরাবর কালচে শেকড় নেমে এসেছে। জোয়ারে ডুবে যাওয়া জঙ্গলের বিপন্নতাও ভারি অদ্ভুত লাগছে। সবুজে শীতের রুক্ষতায় উজ্জ্বলতা নেই। রূপান্তর হীন দৃশ্যের আবৃত্তি। তবু ঘরকুনো শ্যামলের বিরক্তি নয় — বিস্ময়ের সুদীর্ঘ সীমার মধ্যে বিচরণ ঘটে। লঞ্চের অপরিচিত যাত্রীরাও কম নয়। পরস্পরের সঙ্গে আলাপী কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা, নদীতীরে শয়ান কুমির দেখে চিৎকার, হরিণ দেখার উল্লাস যে তুলছে তার মনেও সেটা ছাপ ফেলেছে। দেখা শুধু দেখা। বর্তমান সমাজ, রাজনীতি, দ্রব্যমূল্য এবং অতীত নিয়ে আলোচনা কিছুক্ষণ আগে লঞ্চের ডেকে দারুণ জমেছিল।

সারাদিন দেখার সঙ্গে সুন্দরবনের সৌন্দর্যের চেয়ে আরো এক বিস্ময় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

'কেমন আছেন?'

'অ্যাঁ। ভালো!'

'চিনতে পারলেন না?' ঠোঁটে হাসি, পঁচিশ-ছাব্বিশের যুবতি। হলুদ সিল্কের শাড়ি, হলুদ ব্লাউজ গায়ে। বলে উঠেছিল বিশ্বাসের স্থিরতায়, 'জানি পারবেন না।'

শ্যামল অদ্ভুত রহস্যময়তায় স্নাত হয়ে উঠেছিল। তার স্মৃতি এত দুর্বল যে চিনতে পারবে না। সোনাখালি আসার আগে দুটো বাসের যাত্রী। ক্যাটারারের মানুষজন সকলেরই মুখ সে পড়ে নিয়েছিল, সব অপরিচিত। ব্যাঘ্র প্রকল্পের টাওয়ারটার দিকে যাবার পথে গরানের লঞ্চ ঘাট। মাদুরের মতো বুনুনি। নেমে মাথায় তারের জাল দু'পাশ ঘেরা কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়া। শক্ত শীর্ণ গরান বিছিয়ে খালের উপর সাঁকোও করা হয়েছে। মরা রোদের মধ্যাহ্ন। শীতকাতরতা যেন সূর্যেরও। মাধবীর স্বর তার মধ্যে চমক। তখন অবশ্য নাম জানে না। ভ্রূরেখা টানটান করে শ্যামল পরিচিতির সূক্ষ্ম সুতোটাকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও পারে।

'আমি মাধবী। চিনলেন না তবুও।' মাধবীর সলজ্জ হাসি, 'কী ভুলো মন আপনার। সেই যে শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলায়। এখনও মনে পড়ল না। আচ্ছা মনে করিয়ে দেব। বিয়ে হয়ে কি আমি এতই বদলে গিয়েছি?' অণুমাত্র জড়তা নেই। ভ্রান্তির আশঙ্কার গন্ধ নেই। বরঞ্চ অনুযোগের ফিকে ছায়া মিশে ছিল কিছুটা।

'আমি ঠিক —' শ্যামল শেষ করেনি।

'মনে করার চেষ্টা করুন। আচ্ছা, সময় দিচ্ছি। পরে কথা বলব।'

তারপর বিকেল থেকে সন্ধে হল। কয়েকবার চোখে চোখ তবু মনে পড়েনি — পড়ছে না। এখন শ্যামল চেয়ে আছে সন্ধ্যাভেজা আবেষ্টনীতে যাত্রীদের লঞ্চ থেকে নামা সারির দিকে। মাধবীকেই দেখতে চাইছে।

দেববাবু ডাকলেন, 'কী শ্যামলবাবু, দাঁড়িয়ে পড়লেন — চলুন।'

দেববাবুর জন্যেই শ্যামলের সুন্দরবন ভ্রমণ। দেবব্রত চন্দ্র। তার কলিগ। অফিসে প্রস্তাবটা দিতে সে প্রথমে রাজি হয়নি। শুক্রবারের কথা। শনিবার যাত্রা।

শ্যামলের পয়সা খরচা নেই। কুণ্ঠা ছিল তার। দেববাবুর ছোটোভাই, বউমা, খুদে ভাইঝি টুয়া যাবে। মিসেস যাবে না। বাড়তি ওই টিকিটটা নষ্ট হবার কথা। সেই শূন্যতা পূরণ করার জন্যেই তার আমন্ত্রণ। তবে দেববাবুর আত্মীয়সুলভ ব্যবহার কুণ্ঠাকে রাখতে দেয়নি। টাকার কথা সে তোলেনি। দেববাবুকে অপমান করা হত।

ঘাড় ঘুরিয়ে শ্যামল বলল, 'হ্যাঁ চলুন।'

'বিউটিফুল জায়গা।' দেববাবুর হাতে ব্যাগ। বললেন, 'রুম নাম্বার ছয় সাত আমাদের জন্যে অ্যালট করা হয়েছে। শুনলেন তো লঞ্চের।'

ছোটোভাই, বউমা, ভাইয়ের কোলে টুয়া পিছনে আসছে।

মাধবী অপরূপা নয়। তবে শরীরের গঠন চমৎকার। ভরাট স্বাস্থ্যের শ্যামলিমায় দ্যুতি আছে। যুবতির মধ্যে সূক্ষ্ম আকর্ষণের নির্ঝর। দৃষ্টি শুধু স্নিগ্ধ করে না, বক্ষে তাপও সঞ্চার করে। স্বামী ভদ্রলোক স্বাস্থ্যবান। পুরু ঠোঁট। ফরসা থ্যাবড়ানো মুখ। প্যান্টের উপর সবুজ সোয়েটার।

মাধবী আলাপ করিয়ে দেয়নি। একই লঞ্চ। তবে একলা পেলেই কথা ছিটকে দিয়েছে। কথা বলার ভঙ্গিটিও গোপনীয়তায় ভরা। তার সঙ্গে সম্পর্ক যেন কেউ জানতে না পারে। অসম্পূর্ণ বাক্য এবং প্রশ্ন কয়েকবারই তার বলে।

'ওই ভদ্রলোক আপনার বন্ধু। আর ওই বউ মেয়ে নিয়ে?'

'দেববাবুর ছোটোভাই আর বউমা।'

'বন্ধুকে আমার কথা বলেছেন?'

'না।'

'বলবেন না একদম। বিয়ে করেছেন তো?'

'না।' শ্যামল বলেছে।

'ওমা কেন? আমার জন্য?' মাধবী হাসেনি। ভুরুরেখা টান টান করে রেখেছে।

'আপনাকে ঠিক —।'

'ভাবুন চিনতে পারবেন। ছেলেরা বড়ো ভুলে যায়। অথচ মেয়েরা। কিন্তু সত্যি কেন বিয়ে করেন নি বলুন তো। মেয়ে পাননি?'

শ্যামলের বিয়ে না হওয়ার কারণ শুধু অভিমান। মেজো ছোটোর বিয়ে হয়েছে। বোনেরও। তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়। দেনাপাওনা সংক্রান্ত ঝামেলা তার বিবাহ ভাগ্যকে কেটে দেয়। বাবা কিছুতেই দাবির অঙ্ক কমাবেন না। প্রচণ্ড জেদী মানুষ ছিলেন। শাসনে রাখতেন সংসারকে। শ্যামল তার বিয়ের ব্যাপারে নীরব ছিল। পাত্রীও দেখেনি। দাবির ব্যাপারটা শুনে বিয়ে করব না বলে ঘোষণা করে। মা পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু শ্যামল জানত বিনাপণে বিয়ে করা এ পরিবারে অসম্ভব। বোনের বিয়েতে মোটা টাকা ব্যয় বাবাকে খেপিয়ে দিয়েছে। মায়ের ইচ্ছা থাকলেও বাবা কিছুতেই সম্মতি দেবেন না। বাবা তারপর আর সম্বন্ধ করেননি। মেজ শান্তনুর বিয়ে দিয়ে দেন। ছোটো সজলের বিয়ে হল গত বছর।

বাবা দু'বছর আগে মারা গিয়েছেন। শ্যামলের উপর বিয়ে করার চাপ মা এবং আত্মীয়স্বজনদের এখনও শেষ হয়নি।

শ্যামল ভেবেছে মাধবীর জন্য বিয়ে করেনি সত্য হলে সে খুশি হত। মাধবী কেন অন্য কোনো নারীর জন্যেও। দুর্ভাগ্য, তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। নারী সর্বদা দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে গেল। রহস্যময়। আকর্ষক। রক্তে বাজনা বাজায় সুর উঠে আপনা থেকে।

কিন্তু মাধবী কে? প্রকৃত পরিচয় কী? তার নাম শ্যামল জানল কী করে? শুনে ভুল করছে না তো? শ্যামল তো কত লোকের নামই হতে পারে। এটা ঠিক সে বেশ ক'বার মাধবীকে দেখেছে। সেই প্রাতরাশের সময়, সোনাখালি লঞ্চে ওঠা, বসে থাকায়। সে দৃষ্টিতে কিছু ছিল না। সুন্দর দেখাচ্ছিল মহিলাকে। পাশের ভদ্রলোককে বেমানান ঠেকছিল। বেশি বয়স তো বটেই, তাছাড়া মনে হয়েছিল মানুষটা ভালো নয়। সেই দেখেই কি মাধবী তাকে স্পষ্ট ভেবে নিল তার পরিচিত শ্যামল বলে? পৌষমেলায় কিছু ঘটেছিল? বোলপুরে মাসির বাড়ি। কয়েকবারই সে পৌষমেলায় গিয়েছে। বোলপুরে বন্ধুবান্ধবও হয়েছিল দু'একজন। তাদেরই আত্মীয়? কারও বোন? কিন্তু এ বিস্মরণ! তারপর মাধবীর গোপনীয়তার চেষ্টা কেন? স্বামী ভদ্রলোক কি সন্দেহবাতিক? হতে পারে— তাহলে তো পরিচয় না দেওয়া উচিত ছিল। এক ফাঁকে লঞ্চে বিকেলে মাধবী কথা ছুঁড়ে দিল।

'আপনি কিন্তু কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আসতে পারতেন। আমি অপেক্ষায় ছিলাম।'

'কলকাতা!'

'তাও ভুলে গিয়েছেন। শোভাবাজারের ঠিকানা কি হারিয়ে ফেলেছিলেন?'

শ্যামল নীরবে শুধু মুখ দেখছে।

'কথা বলুন। সেই কম কথা বলার স্বভাব আপনার যায়নি। আমি মেয়ে হয়ে মাত্র দু'দিনে কতটা এগিয়ে গিয়েছিলাম বলুন তো!'

'আমি কিছু মনে করতে পারছি না।'

'একেবারে মুছে ফেললে এরকমই হয়। আপনার মুখ কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে ছিল— আছে। দেখা মাত্র চিনেছি। চমকে উঠেছিলাম। আপনি শোভাবাজারে এলে জীবনটা অন্য রকম হতে পারত!'

শ্যামল বিস্ময়ের থই থই জলাঘাতের মধ্যে ভাবল, মাধবীর ভুলটা পরিচয় দিয়ে সে ভেঙে ফেলতে পারে। প্রায় এক চেহারার মানুষ হয়েই থাকে। নামটাও এক হয়ে যেতে পারে। মাধবীর প্রেমিক সে নয়। অন্য কেউ। ভাবল, সুখে নেই মাধবী। নইলে জীবন অন্যরকম হতে পারত, এ কথা বলত না। বেচারা।

'কথা বলছেন না। আমাকে দেখে আপনার ভালো লাগেনি? জানতে ইচ্ছে করছে না তারপর কী ঘটেছে? আমি জানি আপনার ভেতর প্রবল আগ্রহ। কিন্তু প্রকাশ করবেন না। দীপা ঠিকই বলেছিল, মাধবী, কেন তুই জ্বলতে গেলি। বলুন তো আগুনের ছোঁয়া লেগে কাঠ কেন জ্বলে — সে কি বলতে পারে? দীপার সঙ্গে দেখা হয় না? বোলপুর যান না?'

'গত বছর তো গিয়েছিলাম।'

'আমার কথা মনে পড়েনি? ভুলে থাকা শিখিয়ে দেবেন? দিন না — তাহলে বেঁচে যাই।' মাধবীর স্বরে আর্তি ঝরে পড়েছিল। 'আপনার বন্ধু আসছে চলি।' দ্রুত সরে গিয়েছিল।

সজনেখালির বাংলোখানা যেতে দু'দিকে ফুলগাছের চমৎকৃত করা ইট-বিছানো পথ। কাঠ আর সিমেন্টের খুঁটির উপর কাঠের ঘর। টানা বারান্দা। সবুজ ম্লান রঙ। কাঠের সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। বাঁদিকে জলের ট্যাঙ্ক। উঠে বারান্দায় ভিন্ন শোভা। হেঁটে আসছে সব যাত্রীরা। কেউ নীরব নয় বুঝি। বনভূমিতে এক অদ্ভুত কোলাহল।

লম্বা সারিবদ্ধ কক্ষগুলো। মাথায় নাম্বার লেখা। বাংলোর এক কর্মীর হাতে একগোছা চাবি। প্রত্যেক ঘরের সামনে সে চাবি ধরিয়ে দেয়। একই কথা আবৃত্তি করে, 'দেখে নিন ঘর। এক্ষুনি জল পাবেন। বেশি জল নষ্ট করবেন না। নৌকায় করে খাবার জল আনতে হয়। বেসিনের কলটা ব্যবহারের পর বন্ধ করতে ভুলবেন না। নোনাজল যত খুশি ব্যবহার করতে পারেন। দেখুন হ্যারিকেনটা। ঠিক আছে তো?'

অরণ্য থেকে ছিনিয়ে নেওয়া খণ্ডটুকুতে শীতের গোধূলি এতগুলো যাত্রীর কলরবে মুখর। কাঠের এই রাত্রিনিবাস সন্দেহ নেই, একক শূন্যতায় হা হা করে। মাঝে মাঝে সঙ্গী পায় নিশ্চয়। ঘরগুলো সাজানো। দুটো খাট, ধবধবে চাদর, বালিশ, কম্বল। টুলের উপর হ্যারিকেন। জলের প্লাস্টিক জগ। পাশেই টয়লেট। বেসিন, ওদিকে পায়খানা।

দেববাবু বললেন, 'আপনি আগে যাবেন বাথরুমে?'

'না না। আপনি যান।'

'চমৎকার ব্যবস্থা তো!' দেববাবুর খুশির গলা, 'নির্বিঘ্নে ঘুমানো যাবে।'

পাশের ঘরে ভাই, বউমা, টুয়া। টুয়া বেরিয়ে এল। ওর মা বেরিয়ে শ্যামলকে দেখে হাসল। টুয়াকে বলল, 'যাও, জেঠুর কাছে গিয়ে দাঁড়াও।'

টুয়া রেলিংয়ের ফাঁকে মুখ রেখে বাইরেটা দেখছে। শ্যামল বলল, 'ভালো লাগছে টুয়া?'

ঘাড় কাত করল মেয়ে। মাথায় টুপি। উলের ফ্রক। মোজা জুতো।

'জঙ্গল। জানো তো এখানে বাঘ আছে!'

'কই— বাঘ কই?'

ওধার থেকে এগিয়ে এলেন দীর্ঘ চেহারার ব্যানার্জি। লঞ্চে হাসির কথা বলে জমিয়ে রেখেছিলেন। ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, টুয়াকে নিয়ে পড়লেন তিনি। বারান্দায় ব্যাঘ্রদর্শন নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। রাত্রে নাকি বাংলোর এই ঘেরা জায়গাতেও বাঘ এসে পড়ে। আজকেও আসতে পারে। বাঘ এলে কী হবে, যাকে সারাদিন দর্শন মেলেনি সে যদি এসে পড়ে সুখের কথা না বেদনার কথা, বিতর্কের মধ্যে এ ব্যাপারেও হাসাহাসি চলছে।

দ্রুত পায়ে পিছন দিক থেকে মাধবী এসে বলল, 'রাত এগারোটায় বাইরে আসবেন। কথা আছে।' দাঁড়াল না।

সূর্য কখন ডুবে গিয়েছে। বাংলো জুড়ে শীত-সন্ধ্যার ধূসরতা। ডুবে যাচ্ছে গাছগাছালি, দূরের নদী, চরা, সুন্দরবনের জঙ্গলে দ্বীপখণ্ডগুলো। হ্যারিকেন উসকে দেওয়া হয়েছে ঘরের। চা খাওয়া হল। বিছানায় আয়েস করে বসা হল। নৈশাহারের পর মশারি খাটিয়ে দেববাবু বললেন, 'সবাই বাঘ দেখার জন্যে উৎসুক। কিন্তু সুন্দরবন বেড়াতে এসে ক'জনে বাঘ দেখতে পায়। জল জঙ্গলের সৌন্দর্য ছাড়া আর কী আছে। সেটাই তো মস্ত। এই বিশালতার কাছে নিজেদের কত ক্ষুদ্র মনে হয়। সারাদিন তো ঘুরলেন। বোরিং লাগছে?'

শ্যামল বলল, 'না। না।'

'আপনাকে জোর করে নিয়ে এসেছি। ভালো না লাগলে—'

শ্যামল বলল, 'কে বলেছে ভালো লাগছে না?'

'তাহলে অত চিন্তা কীসের আপনার। অন্যমনস্ক প্রায় সময়?'

'তাই নাকি?' হেসে ব্যাপারটাকে শ্যামল উড়িয়ে দিতে চাইল।

'হুঁ' ভরাট গালে দেববাবু হাসলেন, 'সৌন্দর্য কি আহত করে দিল আপনাকে?'

ও ঘর থেকে টুয়া এল। শ্যামল বলল, 'এ কী টুয়া, ঘুমোওনি?'

টুয়া তার জেঠুর পাশে বসল।

দেববাবু বললেন, 'কী টুয়া, মন খারাপ করছে টুকটুকির জন্য?'

'না।' টুয়া বলল।

শ্যামল বলল, 'কিন্তু টুকটুকির জন্য টুয়া কী নিয়ে যাবে? বাঘ?'

'উহুঁ। বাঘ বড্ড হালুম হুলুম করে। একটা হরিণ নিয়ে যাবে।'

টুয়া বলল, 'হ্যাঁ, হরিণ নিয়ে যাব।'

আবহাওয়া তরল হয়ে গেল। হরিণ নিয়ে কোথায় রাখা হবে, কী খেতে দেওয়া হবে, এ নিয়ে অকারণ শিশু কথাবার্তা। শ্যামল মাধবী সম্পর্কে ভাবার অবসরই পেল না।

কিন্তু ঘুম আসতে চাইল না তার। টুয়া ওঘরে চলে গিয়েছে। দেববাবু শুয়ে পড়েছে। ঘুম এসেছে কী না কে জানে। নীরব ডাকবাংলো। শ্যামল ভাবল, দেববাবুকে কি সে বলবে মাধবীর কথা! ঘরের মধ্যে হ্যারিকেন জ্বলছে। পলতে নামানো। চার দেওয়ালের ঘরের মধ্যে শীতের অনুভূতি খুবই পলকা। শ্যামল ভাবে, কোনো ঝামেলা হবে না তো! বিপদে পড়বে না তো সে! তারপর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মোহ তার মধ্যে জন্মাল। এক নারীর ডাক যেন সুন্দরবনের রাত্রিতে তার উপহার। আগ্রহ তিরতির করে মস্তিষ্কে স্বাদু রস সঞ্চার করে।

আচ্ছা, সে যদি মাধবীর প্রেমিক শ্যামল হয়, সে রকম ব্যবহার করে! কী ক্ষতি। সজনে- খালির এই বাংলোতে

সে না হয় একটা নাটকই করল। একটা দিন মধ্যিখানে। তারপর নামখানায় নেমে বাস। এসপ্ল্যানেড এসে কলকাতার গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেব সবাইকে।

দেববাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। টের পেলেন না দরজা খুলে তার বেরিয়ে যাওয়া, বাইরে শীতরাত জাঁকিয়ে নেমেছে। ছমছম করছে চারপাশ। ঘোর আচ্ছন্নতা সজনেখালির বাংলোয়। গভীর ঘুমে যেন এই গাছগাছালি-ঘেরা দোতলা বাসগৃহ। শ্যামল পাঞ্জাবির উপর শালটাকে নিয়ে এগিয়ে যায়। কোথা যাবে। বাইরে দাঁড়াবে? মাধবী কি এখানে আসবে? ওদের রুম নাম্বার তো জানা হয়নি। ভাবনার মধ্যে বারান্দা ধরে পা পা হাঁটে। এগারোটা বেজেছে। তার ঘড়ি কি ফাস্ট? ঠিক দেখছে তো? এখন অন্ধকারে দেখা যাবে না।

চমক খায় মাধবীর স্বরে, 'নীচে চলুন।'

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দু'জনে নেমে আসে। এখন শ্যামলের ভয় করে। সে কি অতিরিক্ত সাহস দেখাল না। এখন অন্ধকারে ওই নারীকে নিয়ে যে নিষিদ্ধ অভিসার তা তো অন্যায়। অরণ্যের ছিনতাই হওয়ার অংশটুকু গাছগাছালি, সামনের নদী সব অন্ধকারে আড়াল। কেউ জেগে উঠতে পারে কি? না, সেও তুচ্ছ। ভয় শুধু এই নারীকে?

নীচে নেমে মাধবী বলল, 'আপনি কি ঠিক করেছেন কথা বলবেন না?'

'না। না। তা কেন?' শ্যামল বলল, 'কথাই তো খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আপনাকে কেন ডেকেছি জানেন?'

'না।'

'এসেছেন কেন?'

'আপনি ডাকলেন তাই।'

'তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছেন।'

শ্যামল হৃৎপিণ্ডের শব্দের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ।'

'সত্যি!'

শ্যামল মাধবীর স্বরে বিস্ময়ের সঙ্গে বিদ্রূপের মিশ্রণ টের পায় না। বলে, 'তা না হলে রাতে উঠে আসব কেন?'

'বটেই তো। আমিই বা আপনাকে ধরব কেন?' মাধবী আরও কাছে সরে আসে। বলে, 'লঞ্চে আপনার চোখ তো আমাকেই দেখছিল।'

'আপনার স্বামী ভদ্রলোক —।'

'ভদ্রলোক!' মাধবী যেন ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়।

'দাম্পত্য জীবনে অনুমান করছি আপনি অসুখী হয়েছেন।'

'দাম্পত্য জীবন?' মাধবীর জিজ্ঞাসা যেন বর্শার মতো বিদ্ধ করে শ্যামলকে।

শ্যামল বলে, 'আপনাকে বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারবেন না শ্যামলবাবু। আর বোঝার দরকারই বা কী।'

'তাহলে ডাকলেন কেন?'

'আপনি সহজে আসবেন তাই।'

'আপনার স্বামী।'

'আঃ স্বামী। দাম্পত্য জীবন। এসব বলবেন না তো। মাধবীর ঠোঁট বাঁক খায়। তীব্র ঝাঁজের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, 'স্বামী। ভদ্রলোক! ও আমার কে? ওই লোকটা?' ঘৃণায় মাধবী যেন থুতু ছিটোয়। অসুখী মানসিকতার বিষপোকার দংশনের প্রচণ্ড জ্বালা বুঝি তার শ্বাসপাতে বেরিয়ে আসে। বলে, 'তিনশো টাকা দিয়ে ফুর্তি করতে এনেছে। গলায় ঢেলে এখন ঘুমে। শুনুন, আপনি আমাকে চেনেন না। চেনার কথাও নয়। ন্যাকামির দরকার নেই। ভাবলাম ওভারটাইম করেনি। একশো টাকা দিতে পারবেন? খুব পারবেন। দিন তো।' মাধবী হাত পাতে।

'শ্যামল অন্ধকার আবছায়ায় নারীকে দেখে। শরীরে তার হিম প্রবাহের কাঁপুনি।

'আরে অবাক হবার কী আছে? হাঁ করে কী দেখছেন?'

'আপনি -আপনি-।'

'ঠিক আছে বাবা টাকাটা পুষিয়ে নেবেন। আছে একশো টাকা? সঙ্গে না থাকলে নিয়ে আসুন, কী হল?'

'মাধবী—!'

'অমন করে ডাকবেন না, প্লিজ। দিন টাকা। বুঝলেন তো আমি খারাপ মেয়ে। জানতে চাইবেন না কেন খারাপ হয়েছি শুনেই বা কী করবেন? দেখলেন তো আমি কেমন গল্প তৈরি করতে পারি। গল্প কেমন সত্য হয়ে উঠছিল। আপনি তো মশাই প্রেমিকাই ঠাউরে ছিলেন। আচ্ছা যদি হতে পারতাম। আচ্ছা যদি সত্যি হতাম! তারপর এ অবস্থায় পড়তাম। কী করতেন?' মাধবী থামে না। উত্তরের অপেক্ষা করে না। বলে, 'দীর্ঘকাল পরে দেখা। এমনি তো এ অবস্থায় পড়িনি। কী করতেন?'

'কেন পড়লেন?'

'এই দেখুন — মানুষের ভারি কৌতূহল। ধরুন লেখাপড়া শিখিনি। বাবা বাস অ্যাক্সিডেন্টে পঙ্গু। ছোটো ছোটো ভাইবোন। মায়ের হাঁপানি। যে বাড়িতে থাকি ধরুন সেই বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক একদিন শরীর দিয়ে ভাড়া আদায়ের চেষ্টা করল। বকবক করতে পারি না। টাকা ছাড়ুন।'

'যদি না দিই?'

'আপনি দেবেন। দিন। হাত বাড়িয়ে আছি।'

শ্যামল পাঞ্জাবির পকেটে হাত ভরে একশো টাকার নোটটা দিল, 'নিন। ঘরে যান।'

'দেখলেন তো দিলেন। কিন্তু ঘরে কেন? আর ঘরইবা আমার কোথায়? জন্তুটা ঘুমাচ্ছে।'

'আপনি যান।'

'দান করলেন? আমাকে দরকার নেই?'

শ্যামল বলল, 'না।'

'ঘেন্না করছেন? কেন? আপনি তো বিয়ে করেন নি? এখনও আমার শরীরে রোগ ধরেনি।'

'আপনি থামবেন?'

'ইস! এত ঘেন্না। পারবেন আমার মতো মেয়েকে বিয়ে করতে? বাঁচাতে? কী হল?'

শ্যামল নীরব।

'উত্তর দিন জানি পারবেন না। চলি শ্যামলবাবু, ধন্যবাদ। কালকে আপনাকে চিনব না। অবাক চোখে আমাকে দেখবেন না। লজ্জা করবে। আমি তো মেয়ে।' ছুটে যায় মাধবী।

শ্যামল নাটক করতে এসেছিল। কে জানত তাকেই একটা নাটক দেখতে হবে। বিস্ময়ের আঘাত লাগে না। মাধবীর কথাগুলো তার মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে। মমতা বা ঘৃণা কোনো বোধ আসছে না। একশো টাকা ছিনতাই হওয়ার শোক ধোঁয়াপুঞ্জ গড়ছে না। মাধবী তার প্রেমিকা সেজে থাকবে এ প্রত্যাশাই তো ছিল। একজন প্রেমিকের অনুভূতিপ্লুত হওয়ার রোমাঞ্চ আস্বাদন করতে চেয়েছিল চোরের মতো। সেটাই তাকে আহত করেছে। হয়তো মাধবী তেমন ভাবে আবেদন করলে সে বাঁচাতে পারত। এলোমেলো ভাবনায় সে ক্ষত-বিক্ষত হয়। ভাবে সত্যি কি সে বাঁচাতে পারে! মাধবীকে বিয়ে করতে পারে! শ্যামল শীতরাতে টের পায় শুধু জ্বালা। সারা শরীরে যেন আঁচড় ফুটে উঠেছে।

সকালবেলায় দেববাবু বললেন, 'ঘুম হয়েছে তো ভালো? আচ্ছা টের পেয়েছেন রাতে কাঠের দরজা কী জানলার ওদিকটায় কীসে যেন আঁচড়াচ্ছিল।'

'তাই নাকি'

'হ্যাঁ। আমি ভাবলাম বাঘ। আঁচড়ে কামড়ে বেটা একসময় ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।'

শ্যামল নীরব রইল।

দেববাবু বললেন, 'আপনাকে ডাকতাম। তারপর মনে হল শীতের রাতে কোনো জন্তু আশ্রয় খুঁজছিল। ইঁদুর-টিদুরও হতে পারে। আশ্রয় কিংবা খাদ্যের জন্যেও আসতে পারে।'

শ্যামল কোনো কথা বলল না। সারা গায়ে আঁচড়ের জ্বালা তার এখনও।

এক অমানুষের গল্প



আবদুল মান্নান সৈয়দ

একরোখা একটা জন্তুর মতো ছুটছিল স্কুটার, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রশিদের মনটাও যেন তিনটে ছোট্টো অতিদ্রুত ঘূর্ণমান চাকায় ভর করে শাঁ-শাঁ করে চলছিল, ভীষণ টাকার দরকার তার, পকেটে এক প্যাকেট জ্বলন্ত অগ্নি, ধানমণ্ডি পেরিয়ে নির্জন রাস্তা বেয়ে জন্তুটা যেন আরো দ্রুত ছুটে চলেছিল, দু-দিকে তখন লোকজনের বসতি কমে এসেছে, অনেকটা মফস্বলের মতো এক-একটা মাঠ, খেত, চযা জমি, গাছপালা, নির্মীয়মাণ বাড়ি ছবির মতো সরে-সরে যাচ্ছিল টাকার চিন্তায়। আহমদ সাহেবকে পাবে কিনা সেই চিন্তায় অনামনস্ক হয়ে পড়েছিল রশিদ, স্কুটারের গতির নেশা ভিতরটা মদের একটা পাত্রের মতো ভরে রেখেছিল, স্কুটারে চড়লেই ছুটে চলার অনুভূতিটা ভ'রে ওঠে আবেগের বাষ্পে, আর সেই সময়ই— প্রবল ব্রেক কষে থেমে গেল স্কুটারটা।

ছিটকে পড়েছে ঠিক রাস্তার উপরেই। বেঁচে আছে কিনা, কে জানে। কিছু ভাববার আগেই দৌড়ে নেমে এসেছে রশিদ। মেয়েমানুষ? তবু এক মুহূর্ত ইতস্তত করে, এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটি তখন উঠে-বসা থেকে দাঁড়াচ্ছে শাড়িকাপড়েব ধুলো টুলো ঝেড়ে।

রশিদেব কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ চাপা থাকেনি, 'কোথাও লাগেনি তো আপনার?'

'না, তেমন কিছু না, পায়ে একটু...'

'পায়ে? কোথায়? পায়ের পাতায়? না, গোড়ালির ওপরে?' পায়ের দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে রশিদের নজরে পড়েছে দামি হাইহিল জুতো, সুদর্শন কালো স্ট্র্যাপ যেন ফরসা পায়ের পাতা কামড়ে ধরেছে।

স্কুটার ড্রাইভার ততক্ষণে, বোধহয় কিছু হয়নি সেই সাহসেই, নেমে এসেছে। বলেছে, মেয়েটির দিকে নয়, রশিদের দিকে তাকিয়ে, 'আমার তো দোষ নাই, স্যার।'

'থামো তুমি', ধমকে উঠেছে রশিদ: মেয়েটিকে অপ্রতিভভাবে ফের বলেছে, 'দেখুন, চোট পান যদি কোথাও চলুন, ধারে কাছে ডাক্তারখানা আছে নিশ্চয়—'

'না, মানে', মেয়েটির ইতস্তত করা দেখে, রশিদ যেন নিজের অজ্ঞাতেই না-বুঝেই স্কুটার চালককে বলে, 'তুমি বসো গিয়ে, আমি আসছি।' তারপর মেয়েটিকে জিগেস করে, 'আপনি থাকেন কোথায়?

'এই তো, কাছেই', ব'লে মেয়েটি হাত উঠিয়ে দেখায়।

'তাহলে আর আপনাকে কী বলি...' রশিদ ইতস্তত করেছে, কিন্তু ততক্ষণে তার অভিজ্ঞ চোখ মেয়েটির সর্বাঙ্গে ঘুরে এসেছে, কোথায় একটা অন্য-কিছুর গন্ধ শুঁকেছে যেন তার নাক, বলেছে, 'কাছেই আপনার বাড়ি বললেন, না?' কথা খুঁজে না-পেয়ে পুনরাবৃত্তি করেছে নিজের কথার।

'হ্যাঁ, মানে, আমি থাকি রাজশাহিতে, ওখানেই আমাদের বাড়ি। আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছি এখানে।'

'ও।'

মেয়েটি নিজে থেকে কোনো প্রশ্ন করেনি। কিন্তু কেবলই রশিদের চেকশার্ট, বেলবটম ট্রাউজার্স, চোখ-থেকে-নামিয়ে-ফেলা হাতের গগলস্-এর উপরে বারবার গিয়ে পড়েছে তার চোখ, বারবার একরকম মুগ্ধতার মৌমাছির মতো মেয়েটির চোখ গিয়ে বসেছে রশিদের চেকশার্ট, বেলবটম ট্রাউজার্স, গগলস্, চকচকে জুতোর উপর— এবং সবশেষে মুগ্ধ দৃষ্টি ফেলেছে সে মুখের উপর।

রশিদের বুদ্ধি বুঝি হঠাৎ খুলে গেছে, একটু ইতস্তত দ্রুততার ভঙ্গি করে বলেছে, 'আমি এখন তো একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি, এক কাজ করুন না, কাল আসুন স্টেডিয়ামের সামনে, আমি থাকব—'

'ক'টার সময়?'

'কটার সময় হ'লে সুবিধা হয় আপনার?'

'এই ধরুন দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে?'

'ঠিক আছে।'

রশিদ আর-একবার যাবার কথা ব'লে স্কুটারে গিয়ে ওঠে। মেয়েটি হাসিমুখে, যেন পায়ের কথা একদম ভুলে গিয়ে, বিদায় দেয় ওকে।

'প্রস।' স্কুটার-ড্রাইভার ঝুঁকে গাড়ি স্টার্ট দিতে-দিতে ব'লে ওঠে, 'মাল পানি কিছু গেল নাকি, স্যার?'

নিজের ধারণা একেবারে লুকিয়ে সাধু সেজে বলে রশিদ, 'আরে, কী বলো তুমি? ভদ্রলোকের মেয়ে না?'

নির্জন রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে ড্রাইভার বলে, 'ভদ্রলোকের মাইয়া না, তা তো কই নাই, স্যার। ভদ্রলোকের মাইয়ারাই তো আছে এই লাইনে। কিন্তু মাইয়া বোধ হয় নিউ আমদানি। বেবি ট্যাক্সির সামনে কীভাবে পড়ল, দেখলেন না? আমি বেবি ট্যাক্সি কই চালাই, হে কই পড়ে।' ব'লে নিজের রসিকতায় নিজে বুঝি হেসেই ওঠে ড্রাইভার।

রশিদের মাথায় অর্থচিন্তা ঘুরে এলেও, এখন তার মনে হয়, এটা কি আর খেয়াল করেনি সে? সেজন্যেই ধমকে ওঠে, 'রাখো ওসব কথা। চালাও তুমি।' মেয়েটির সঙ্গে কাল দেখা হবে, স্কুটার ড্রাইভার টের পায়নি, বুদ্ধি ক'রে সরিয়ে দিয়েছিল আগেই, -- ভেবে তৃপ্তিপ্রসাদ অনুভব করে রশিদ।

দুই

প্রথমে দেখে তো চিনতেই পারেনি। মোরগফুলের মতো টকটকে লাল শাড়ি, মোরগফুলের মতো জ্বলজ্বলে লাল ব্লাউজ, মোরগের ঝুঁটির মতো স্তন, গো গো গগলসের নীচে কালো চোখ টিকোলো নাক, কাঁধে ঝোলানো চমৎকার ভ্যানিটি ব্যাগ।

চিনল এদিক ওদিক তাকানোর ধরন দেখে-- গো গো গগলসের ভিতর থেকে কালো চোখে সন্ধিৎসা জ্বালিয়ে খোঁজার ধরন দেখে। ঝলমলে সিগারেটের দোকানের সামনে স্টার সিগারেট টানছিল রশিদ বাতকীয় ভঙ্গিতে। ওকে দেখে এগিয়ে গেল, 'এসেছেন তাহলে?' এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষার একটা দীর্ঘ দড়ি ভিতরে ভিতরে ধিকিধিকি জ্বলছিল না, যেন বারবার মনে হয়নি, যে, মেয়েটি না ও আসতে পারে। হঠাৎ এক ঝলক দেখা, সে যা ভাবছে তা না ও হতে পারে, তার ভুল হতে পারে। কিংবা ভুল না হলেও মেয়েটি চ'লে যেতে পারে অন্য আয়তনে অন্যখানে অন্য কোথাও।

রশিদের কথা শুনে, কোনো জবাব না দিয়ে, মেয়েটি মিষ্টি হাসল কেবল। যেন তার উপস্থিতির জবাব আছে রক্তিম শাড়ি-কাপড়ে, উজ্জ্বল ঝকঝকে হাসিতে, চলার ছন্দময় ভঙ্গিতে।

কিন্তু না, রশিদের অপ্রতিভ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তারও কাপড়-চোপড় আধুনিকতম শরীর খামচে ধরা শার্ট, এরকম খামচে-ধরা যে দুই বোতামের মাঝখানে মাঝখানে গা দেখা যাচ্ছে, রোমশ বুক-পেট, কেননা গেঞ্জি নেই ভিতরে, ডবল নেটের সবুজ-রঙা ট্রাউজার, সোয়েডের খয়েরি রঙের জুতো।

এদিক থেকে ওদিক থেকে দৃষ্টি এসে পড়েছে মেয়েটার উপর ওদের উপর; এলোমেলো হাওয়া-লাগা বৃষ্টির মতো দৃষ্টি। একটা বিরাট চাকার গায়ে অগুনতি পিঁপড়ের মতো স্টেডিয়ামের বারান্দা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে। চাকার গায়ে কি আগুন লেগেছে?-- লোকজনের চলাফেরার ধরন দেখে তাই মনে হয়; যেন সবাই পালাচ্ছে। পালানোর আগে যেন যতদূর সাধ্য দীর্ঘ দৃষ্টিপাতে দেখে নিচ্ছে এক তরুণ যুগলকে। প্রণয়ী ধরে নিচ্ছে নিশ্চয়। সুবেশ সুবেশিনী প্রণয়ীযুগল — হয়তো ভিতরে-ভিতরে ঈর্ষা-হিংসায় জ্বলেপুড়েও মরছে কেউ-কেউ। গল্প উপন্যাস আর সত্যিকার জীবন কত আলাদা।

'চলুন, কোথাও গিয়ে বসি। আইসক্রিম খাবেন? চলুন, ঈগলুতে যাই।' রশিদ প্রস্তাব করে।

অসম্মতির কোনো কারণ নেই। রিকশা ডেকে উঠে পড়ে তারপর।

খররৌদ্র-জ্বলা মরুভূমি থেকে ওরা যেন একটা তরুছায়াময় ওয়েসিসের মধ্যে চলে আসে। আইসক্রিমের দোকানের ভিতরে গিয়ে বসে ওরা। আবার কিছু দৃষ্টি-বৃষ্টি।

'আমার নাম রশিদ। আপনার নামটাই কিন্তু জানা হয়নি।' সোফায় ডুবে গিয়ে রশিদ বলে।

'সাবিহা। সাবিহা বলে সবাই আমাকে ডাকে।'

'ও তা কোথায় যেন বাড়ি বলছিলেন?'

'খুলনা। খুলনা থেকে বেড়াতে এসেছি এক আত্মীয়ের বাড়ি।'

মুখে কিছু বলে না রশিদ, কিন্তু ভেতরে ভ্রূ কুঞ্চিত হয় তার। খুলনা? সেদিন কি বলেছিল খুলনায় বাড়ি?

'পড়ালেখা করেন বোধ হয়?'

'হ্যাঁ, এইচ. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে এসেছি।'

এইচ. এস. সি. পরীক্ষা কবে হল? সে ওসব খোঁজ রাখে না অবশ্য। হতে পারে। আজকাল নাকি বছরে দুবার করে পরীক্ষা হচ্ছে। সেদিন কে বলছিল, কলেজ গার্ল। ভিতরে একটু উত্তেজিত হয় রশিদ। আজকাল অবশ্য নেহাত বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েরাই কলেজে পড়ে। কী বলে, ভালো করে বুক টুক ওঠেনি, ওই এতটুকু-টুকু মেয়ে, আশ্চর্য লাগে, এক-একটা মেয়ে এত ছোটো যে, কলেজে পড়ে বিশ্বাসই হয় না। বকশিবাজার থেকে, ইডেন থেকে সে কি দ্যাখেনি ওই সব ছোটো-ছোটো মেয়েদের বেরোতে? তুলনায়, সাবিহা-মেয়েটি রীতিমতো ধিঙ্গি। তা, মফস্বলে হয়তো একটু বেশি বয়সে পড়ে। কিংবা হয়তো কারো-কারো একটু বেশি বয়স হ'য়ে যায়, কিংবা কারো কারো শরীরই থাকে বাড়ন্ত।

গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট খুলে ফস করে সিগারেট জ্বালায় রশিদ, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার ফাদার-মাদার আছে তো?'

'হ্যাঁ, আব্বা বিজনেসম্যান। খুলনায় দোতলা বাড়ি আছে আমাদের।'

এটা কি আমি জানতে চেয়েছিলাম?— 'ও।'

'ছুটিতে ঢাকা দেখতে এসেছি। তা আপনি কী করেন, বললেন না তো?'

'আমি? আমি ওসব পড়ালেখা করেই ছেড়ে দিয়েছি। ব্যবসা করি টুকটাক।'

'কীসের ব্যবসা?'

'এই আর কী— কাজ যা— এমন কিছু না— ছোটোখাটো '

সাবিহার আইসক্রিম খাওয়া শেষ হল।

'ঢাকায় আছেন কিছুদিন?' জিগেস করল রশিদ।

'হ্যাঁ। পরীক্ষার পরে এখন তো কয়েক মাস ছুটি।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে ওকে দেখছে রশিদ। ফাইন মাল! ফাস কেলাস। আর কায়দাও জানে বেশ সাজগোজের। আঁচল সরে গেছে। দীঘল তরুণ ডাঁটের উপর ফুটে উঠেছে জ্বলজ্বলে মোরগফুল।

সিনেমা দেখবেন?'

'সিনেমা?- হ্যাঁ - না, না, না— কাজ আছে আমার, যেতে হবে এখনি।' বলে সাবিহা ভ্যানিটিব্যাগ খুলে হাঁটকাতে লাগল। তারপর বলে উঠলো, 'এয্যা—'

'কী হল?'

'না, তেমন কিছু না—'

'বলুন না, যদি অসুবিধে না-থাকে, যদি আমাকে একেবারে পর মনে না করেন?' প্রেমের একটু রস লাগল রশিদ, খুশি নিজের বাচনে।

'আ, মানে আমি টাকা আনতে ভুলে গেছি— এক জায়গায় যেতে হবে।

'ও —ও কিছু না,' রশিদ যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলো সাবিহার অতিতুচ্ছ টাকার ভাবনা। মুহূর্তে পকেট থেকে বের করে আনল মানিব্যাগ। 'কত টাকা লাগবে, বলুন?'

'না, না, বেশি না। কী-যে ভুল হল— গোটা ত্রিশেক টাকা হলেই চলবে।'

তিনটে ঝকঝকে দশ টাকার নোট হালকা কোমল পাখির মতো নেচে উঠল রশিদের আঙুলে।

টাকাটা নেবার সময় সাবিহা কি ইচ্ছে করে ধরে থাকল একমুহূর্ত রশিদের আঙুল?

বিলের সঙ্গে ফেরত-পাওয়া তিনটে টাকাই বকশিশ করল রশিদ— দেখল সাবিহা। গোল্ড-ফ্লেক জ্বলল আবার। ওঠবার সময় রশিদের পিঠে কি মোরগফুলের চূড়ার মৃদু স্পর্শ লাগল?

বাইরে যখন এল, তখন হলকা ছুটছে। সাবিহার লাল শাড়ি আবার জ্বলে উঠল আগুনের শিখার মতো। আইসক্রিমের দোকান থেকে বেরোবার সময় যেন আগুনের একটা ঝাপটা লাগল চোখেমুখে। তুষারের দেশ থেকে হঠাৎ একেবারে দারুণ গ্রীষ্মমণ্ডলে এসে পড়েছে ওরা।

'এখনই যাবেন?'

'হুঁ, খুব জরুরি দরকার—'

'স্কুটার ডেকে দিই'— অতি মধুর গলায় বলল রশিদ।

'হ্যাঁ— এর পরে কবে দেখা হচ্ছে আবার?' জিগেশ করল সাবিহা।

'সামনে শুক্রবার— বলাকার সামনে আসুন— আমি থাকব— ন'টা থেকে দশটার মধ্যে— দেরি করবেন না কিন্তু—'

স্কুটার ডাকতে হল না— ওদের দেখে নিজেই এসে দাঁড়াল। শালা, দ্যাখো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও ওদের দেখা নেই, এখন, শালার মেয়েমানুষ দেখে, ঠিক হামলে পড়েছে।

নিশানের মতো লাল আঁচল উড়িয়ে, শরীরে চমৎকার দোলা লাগিয়ে, স্কুটারে উঠে বসল সাবিহা। নিজেই বলল, 'আপনি আসবেন কিন্তু— আমি ঠিক দশটার মধ্যে আসছি বলাকার সামনে—'

শা—লি! তোমাকে আমি চিনি নাই, ভাবছো? প্যান্টের বাঁ দিকের পকেট থেকে স্টার সিগারেট বের করে দুপুরের গনগনে রোদে তোপখানা রোড ধরে মতিঝিলের দিকে রওনা দিল রশিদ। এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার একটি দুর্দান্ত মার্কিন পর্নো পত্রিকা তাকে দেবে বলেছে। যদি পাওয়া যায়, দামি কাস্টমার আছে হাতে। এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেল শা-- লা

তিন

সাবিহাকে দেখে দূর থেকেই এক গাল হাসল রশিদ। কাছে এসে বলল, 'সিনেমা দেখবেন তো চলেন, শিগগির। যা ভিড় পরে আর টিকিট পাওয়া যাবে না।'

সাবিহাকে অসম্ভব নিকট মনে হচ্ছিল। আশ্চর্য, রশিদের ভিতরে একটি ছলছলানি বয়ে গেল: 'মায়া লাগল 'রেড্ডে' যেন মনে মনে উচ্চারণ করল রশিদ। আর তখনই, তার ভিতরে সিদ্ধান্ত জন্ম নিল, 'একটু দাঁড়ান' বলে ভিড় টিড় পেরিয়ে টিকিটের লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। যেন সাবিহার বিমর্ষ ভাব কাটাবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে।

সেদিন সারাদিন সাবিহার সঙ্গে কাটল রশিদের। সিনেমা দেখল, খেল রেস্তোরাঁয়, তারপর শত শত দৃষ্টি তিরের ভিতরে থেকে হাঁটতে লাগল দুজন— বায়তুল মোকাররম, স্টেডিয়াম, রমনা ভবন চষে ফেলল।

হাঁটতে হাঁটতে সাবিহা বলল, 'জানেন, মানুষ যে কী বদমাশ হয়! আমাকে সিনেমায় নামাবে ব'লে যশোর থেকে নিয়ে এল। বমা-বমা করে কত খোশমোদ তখন-- আর এখন—

রশিদ বলল, 'কার কথা বলছেন আপনি?'

'ও—না। বলছিলাম কী, টাকা পয়সা কিছু আছে নাকি আপনার কাছে? সবরকম শাড়িই আছে আমার, কিন্তু ঢাকায় এসে দেখলাম নতুন দু-একটা শাড়ি উঠেছে, আর একজোড়া জুতো খুব পছন্দ হয়েছে আমার এলিফ্যান্ট রোডে দেখলাম— '

'চলুন না, চলুন—' গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটের ভিতর থেকে স্টার সিগারেট ধরিয়ে বলল রশিদ। 'চলুন না, আমি থাকতে কোনো ভাবনা নেই। আপনার তো দরকার নেই, আপনার শখ, শখ দরকারের চেয়ে বড়ো— '

সারা শহর ঘুরে শাড়ি কেনা হল, পছন্দের জুতো কেনা হল— অবশ্য দেখা গেল কোনোটাই ঠিক আগে পছন্দ করে রাখা হয়নি, সবই নতুন করে দেখে-শুনে কেনা হল।

এন্তার খরচ করল রশিদ! শুধু স্কুটারে ওঠার সময়, সন্ধেবেলা, নিজেও উঠে বসল সাবিহার পাশে। 'চলুন, আপনার বাসাটা চিনে আসি', রশিদের এই প্রস্তাবে যেন আঁৎকে উঠল সাবিহা। 'এতগুলো টাকা গচ্চা গেল, তোমার বাসাটা চিনে নিই।' কিন্তু বাইরে সে ভাব নেই, বাইরের রশিদ দরাজদিল-- বে পেরোয়া।

সাবিহা যেন আঁতকে উঠল, সাবিহার চোখ-মুখ থেকে ভয় যায় না। 'আজ থাক, একটু অসুবিধা আছে—' বারবার বলতে লাগল সাবিহা।

'থাক্,' উদারভাবে বলল রশিদ, 'কোনো দরকার নেই। যাওয়া যাবে আর-একদিন।' মনে-মনে বলল, 'হারামজাদি, তুমি না যাও— আমার এতগুলো টাকা— অতি কষ্টের পয়সা—' স্কুটার থেকে বড়ো রাস্তার উপরেই নেমে পড়ল রশিদ। সাবিহা এটুকু পথ হেঁটে যাবে। এখান থেকে ফিরে যাবে রশিদ।

চার

'জানেন, আমার বাবা খুব গরিব', সাবিহা বলছিল।

পার্কের ঘাসের উপর বসে ওরা। দুপুর চলে যাচ্ছে। এখনো ভিড় হতে শুরু করেনি। গাছের ছায়া সবে লম্বা হতে শুরু করেছে।

'হুঁ, কিন্তু ওসব বলে লাভ নেই। ওসব শুনে মন খারাপ হয়ে যায় আমার।'

'জানেন আমার মাকে নষ্ট করেছে কে?'

অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে বসে থাকে। আশ্চর্য, এই শহরের বুকের ভিতর থেকে কোথায় কোকিল ডাকছে। বুকের মধ্যে এসে লাগে।

'আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনার আপত্তি থাকলে বলবেন।'

'কী, ছবি? কেন? ও তো অনেক হল। এখন মনে হচ্ছে, সিনেমায় চান্স আমি কোনোদিন পাব না। খামোখা— '

'না, আমি অন্য ছবির কথা বলছি। নেকেড্। অ্যাকশন ফটো। এমন কিছু না। আমার নিজস্ব ব্যাপার। কেউ জানছে না-- ' প্যান্টের হিপ-পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে সাবিহার হাতে দ্যায় রশিদ, 'এই রকম।'

পাঁচ

রোববারের বিকেল।

সমস্ত শহর রূপকথার পুরীর মতো নিঝ্ঝুম পড়ে আছে। জনশূন্য রাস্তাগুলো দীর্ঘ আর বিশাল হয়ে গেছে, সারি সারি বন্ধ দোকানপাট, নির্জন অফিসবাড়ি, হঠাৎ হঠাৎ খোলা একটা ডিসপেনসারি, কী একটা পান সিগারেটের দোকান, কী প্রায় অবিশ্বাস্য ভিড়ে রেস্তোরাঁ কলকাকলি আর গান বাজনায় উজ্জ্বল ঝলমল করছে। সারা সপ্তা তুলকালাম ছুটোছুটির পর ক্লান্ত হয়ে গিয়ে সমস্ত শহর যেন ঘুমোচ্ছে, কিংবা যেন এক রতিক্লান্ত নারী সারারাত্রি জাগরণের পর এখন অবসাদে নিদ্রায় শ্রান্তিতে ধ্বস্ত। বাতাস, বিকেল— এই সমস্ত যেন আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। ছুটির অলস মন্থর অকর্মণ্য হাওয়া মেখে চকিতে কোনো গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, কিংবা চলেছে কোনো রিকশা, অথবা মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে ফুটপাতে।

'স্টুডিও মন্ত্র'-এর সামনের ফুটপাতে একটু অধৈর্যভাবেই উত্তেজিত পায়চারি করছিল রশিদ। সাবিহা শেষ পর্যন্ত আসবে তো? না কি আসবে না? মেয়েটার পিছনে অনেক টাকা ঢেলেছে সে, হুইলের সুতো অনেকদূর অবধি ছেড়েছে, এখন সুতো গোটানোর পালা। চালে ভুল হয়নি তো তার? কিংবা সে কি প্রথম থেকেই চাল চালছে? তা তো নয়। ভাগ্য! কপাল! কপালগুণেই মেয়েটিকে পেয়ে গেছে সে। আরে শালা, এ প্রায় সিনেমার মতো ব্যাপার। কিন্তু নাঃ, জীবন আর সিনেমা আলাদা। সাবিহার প্রতি এক ফোঁটা প্রেমের তাড়না অনুভব করেনি রশিদ। বরং পদে পদে মনে হয়েছে তার : বাহ্, চমৎকার খেলুড়ে-মেয়ে। ভালো, টাকা চাই? —নাও, কিন্তু আমার ফাঁদে পা দিতে হবে একদিন। আমি তো তোমাকে চিনি— পদে-পদে। কেননা, আমিও যে তাই। বিবিসা'ব! ডালমে কুছ কালা হ্যায়। তুমি তো একদিনও যেতে বলনি তোমার বাসায়। বড়ো রাস্তায় স্কুটার থেমেছে, তুমি সেখান থেকে বিদায় দিয়েছো, তোমার বাড়িটা একদিনও চিনিয়ে দাওনি। হয়তো তোমার আগাগোড়া কাহিনিই বানানো। হযতো তোমার নামও সাবিহা না— অন্য কিছু, সফুরা বা ওইজাতীয় কোনো কিছু, পুরোনো, সেকেলে, গ্রাম্য। আর আমি, আমার নামও কি রশিদ, আবদুর রশিদ? হুঁ, নিজের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক হাসে রশিদ— আমরা দু'জন এক কিসিমের, এক লাইনের।

স্টুডিও-র মালিক মাহবুব কাউন্টারে বসে-বসে রশিদের ছটফটানি দ্যাখে— ঠিক এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, দ্যাখে— রশিদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে, বলে, 'কি ওস্তাদ, পাখি উড়ে গেল নাকি?'

'আরে না, না,' গম্ভীর হ'য়ে যায় রশিদ, 'আসবে—আসবে।'

রশিদ যে-যুবকটিকে এনে বসিয়ে রেখেছে, তার কোনো চাঞ্চল্য নেই। সে ওদের কথা শুনে নিঃশব্দ হাসে।

'সিগারেট খান,' মাহবুব প্যাকেট খুলে দ্যায়।

রশিদ প্রাণপণে সিগারেট টানে। ফুটপাতে ফের গিয়ে দাঁড়াতেই তার বুকের ভিতরে ধক্ করে ওঠে। কিন্তু মুখে এক ফোঁটা ভাবান্তর দেখা যায় না।

খুট্ খুট্ করে ফুটপাতে হাইহিলের শব্দ তুলে আসছে। সেই মোরগফুলের অগ্নিউচ্ছ্বাসের মতো লাল শাড়িটি প'রে আছে— কিন্তু এখন যেন একটু মলিন লাগছে, নিবন্ত মুমূর্ষু আগুনের মতো। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক আছে— কিন্তু কীরকম ফ্যাকাশে যেন তার রঙ। বিকেলের রাস্তায় এখন কিছু লোক যাতায়াত করছে যেন। সাবিহার প্রশস্ত পিছন, ভরা কলসির মতো পিছন দুলিয়ে হাঁটা রাস্তার লোকেরা দু'চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে যেন। নাঃ, চালে ভুল হয়নি রশিদের। ফিগার কীরে শালা। ফিগার দেখলেই হয়ে আসে। নাহ, চালে ভুল হয়নি আমার, চালে ভুল হয় না রশিদের।

সাবিহা কাছে আসতে মনের ভাব সম্পূর্ণ বুঝিয়ে রশিদ একটু বিরক্ত একটু বিস্ময়-মেশানো গলায় বলল, 'কী, স্কুটারে এলেন না কেন?' কাল যাবার সময়ে আলাদা করে দশটা টাকা দিয়ে দিয়েছিল সাবিহাকে স্কুটারে আসার জন্যে।

'বাসে আসাই সুবিধে— ওখান থেকে তো বাস ছাড়ে বেশ ভালোভাবেই ব'সে আসা যায়' বলতে বলতে সাবিহা স্টুডিওর সামনে এসে পড়ে।

মাহবুব নার্ভাস হয়ে গিয়ে সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, যন্ত্রচালিতের মতো হাত উঠে আসে ওর কপালে, অস্ফুটে বলে, 'সালাম।' পরক্ষণে আবার নার্ভাস হয়ে গিয়ে বোকার মতো হাসে।

রশিদের সঙ্গে আসা ছেলেটি চুপ করে বসেই থাকে, তার গালের পেশি একটুও নড়ে না।

সাবিহার সঙ্গে দুজনেরই পরিচয় করিয়ে দ্যায় রশিদ এবং একটুও দেরি না করে রশিদ সাবিহাকে বলে ভিতরে যেতে। মাহবুব নিজে দরজা খুলে দ্যায়। রশিদ বলে, 'আপনি যান আগে', বলে মাহবুবকে একরকম জোর করেই ঢুকিয়ে দেয়। মাহবুব অবাক, নার্ভাস বোধ করে, এবং খুশি। রশিদ পিছন থেকে 'দেরি করবেন না যেন' ব'লে দরজা বন্ধ করে দেয়।

রশিদ এসে বসে মাহবুবের জায়গায়। মাহবুব, তার বন্ধু, এই স্টুডিওর মালিক। রশিদ এর আগেও এই উদ্দেশে এই স্টুডিওটি ব্যবহার করেছে। স্টুডিওটি ভালো।

মাহবুব সব সময়ই ছুটির দিন বেছে নেয়। তার কথা হচ্ছে তোমরা যা ইচ্ছে করো, আমাকে একবার ব্যবহার করতে দিতে হবে। রশিদের নিজস্ব ক্যামেরা ট্যামেরা নেই, কিন্তু বন্ধুবান্ধব যতক্ষণ আছে, চিন্তাও নেই। নিজস্ব কিছু নেই তার, অন্যদের জিনিসেই চালিয়ে দেয়।

মাহবুব সিগারেটের প্যাকেটটা গুঁজে দিয়েছিল রশিদের হাতে। রশিদ এখন তপ্ত, হয়তো বা ভিতরে একটু উত্তেজিত, তরিবত করে একটা সিগারেট ধরায়। ইচ্ছা করে বেপরোয়াভাবে হাসে। শব্দ না করে শহিদের দিকে তাকিয়ে। বলে, 'শালা, দ্যাখ, পাগলা কুত্তা হইয়া আছিল যা, ভিতরে খেল দেইখ্যা আয়-'

শহিদ চোখ বুজে, সামান্যতম ঘাড় কাত করে অস্ফুটে বলে, 'না'।

রশিদ বলে ওঠে, 'তুই শালা একটি পাথর—'

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় রশিদ। বড়ো রাস্তার উপরে স্টুডিও কোত্থেকে কে দেখে ফ্যালে অত হাসাহাসি দরকার নেই। বাবা, এইসব মেয়েকে কতো কেউ 'ফলো' করতে পারে। স্টুডিওর মধ্যে ঢুকেছে, ছবি তুলতে এসেছে— আর কোনো কিছু না, ব্যস্। তবু কোত্থেকে কী হয়, কে জানে। সাবধানের মার নেই। একেবারে ঝাঁপ-টাপ ফেলে দিতে ভয় লাগে। তাই ওরা থাকে বাইরে। হঠাৎ খদ্দের টদ্দেরও আসতে পারে কেউ।

তার পরে আর কথা জমে না। কিংবা সারাক্ষণ ওদের মন পর্যন্ত থাকে ভিতরে, সুতরাং কথা চালাচালি হয় না আর। তবে বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয় না। দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে মাহবুব। রশিদ খুব খুশি হয়, শালা ফোকোটে-যে ঘণ্টাখানেক চালিয়ে দ্যায়নি, তাই যথেষ্ট। চোখ টিপে নামিয়ে, বলে 'কী, আউট?'

মাহবুব লজ্জার হাসি হাসে, 'শালি এক নম্বরের মাল।'

একবার রাস্তার দিকে চেয়ে কেউ লক্ষ করছে কিনা দেখে নিয়ে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে চোখের ইশারায় শহিদকে আসতে বলে দ্রুত দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে রশিদ।

টুলের উপর বসে আছে সাবিহা, কালো একটা সায়া আর ব্লাউজটা শুধু পরা। শাড়ি কার্পেটে লুটোচ্ছে।

সবগুলো উজ্জ্বল আলো ফটফট করে জ্বেলে দিল রশিদ। ক্যামেরা আগেই ঠিক করে রেখেছিল। শহিদকে জামা-কাপড় খোলার ইশরা করে সাবিহাকে বলল চোখের দিকে তাকিয়ে, 'খুলে ফেলুন ও-সব।'

তারপর ক্লিক.... ক্লিক। মাঝে-মাঝে নির্দেশ দিচ্ছে। একের পর এক। অনেক ভঙ্গিতে। স্বাভাবিক ও অস্বভাবী, উদ্ভট, বেয়াড়া আসনে। সবরকম ক্রেতার দিকে নজর রাখতে হয় তো তার। সে যখন ব্যবসাতে নেমেছে।

দ্রুত অনেকগুলো ছবি তুলল রশিদ। কিন্তু আশ্চর্য নিরাসক্তিতে। শুধু মনে-মনে প্রশংসা করল , সত্যি, ফিগার বটে মেয়েটার— দারুণ বুক, দারুণ পাছা। শেষ হয়ে যেতে শহিদকে ইঙ্গিত করল। ফটাফট ক'রে উজ্জ্বল আলোগুলো যতক্ষণে নিভলো, ততক্ষণে শহিদও উঠে পড়েছে।

সাবিহা আমূল নগ্ন, চিৎশায়িত, চোখ খুলে দেখল রশিদকে। হাত নাড়িয়ে মেঝেয় শুয়ে-শুয়েই ডাকল রশিদকে, 'এসো তুমি।' এই প্রথম সাবিহা রশিদকে 'তুমি' বলে ডাকল।

রশিদ বলল, 'না।'

পলকে উঠে বসল সাবিহা, 'তুমি এসো এবার।'

শহিদ ওদিকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নিচ্ছে। রশিদ বলল, 'না, আমি না।'

সাবিহা রশিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে কাপড় পরতে লাগল।

রশিদ পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'রাখো এটা, ঠিকঠাক হয়ে বাইরে এসো।' এই প্রথম রশিদ সাবিহাকে 'তুমি' বলল।

সাবিহা বাইরে এলে, রশিদ বলল, 'স্কুটার ডেকে দেব ? নাকি বাসেই যাবে?'

শহিদ চলে গিয়েছিল।

বাইরে ততক্ষণে সন্ধে নেমে এসেছে।

শাড়ি কাপড় পরা সাবিহাকে দেখে মাহবুবের মনে হল যে, সুদূর ও অচেনা মেয়েকে জীবনে সে এই প্রথম দেখছে। সে আবার নার্ভাস হয়ে গেল। বোকার মতো হেসে জড়িত গলায় বলল, 'আসবেন আবার।' সাবিহা কোনো জবাব দিল না।

রশিদ বেরিয়ে এল রাস্তায়, 'চলো, তোমাকে বাসে উঠিয়ে দেই।'

সাবিহা রশিদের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না। তার মুখ-চোখ সব লাল, নাকের ডগা, কানের পাতা লাল ও গরম হয়ে আছে।

অন্ধকারের পটভূমিকায় রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। ওরা হেঁটে চলেছে ফুটপাত ধরে।

সাবিহা দাঁড়িয়ে পড়ল, ওইখানে বাসস্ট্যান্ড । বলল, 'ঠিক আছে, আর যেতে হবে না।' বলল, কিন্তু তাকাল না।

সিগারেটের বিজ্ঞাপনের স্থির লাল সবুজ আলো জ্বলছে, ওরা সেই আলোয় দাঁড়িয়ে। ওদিকে ডি-আই টি র চূড়া। আলোকিত ঘড়িটি কি চলছে ? পরে কবে দেখা হবে সব সময় ঠিক হয়ে যায় ওদের। ওরা তো কেউ কারো বাড়ি চেনে না। সে সব পরবর্তী সাক্ষাৎকার আজ আর নির্ধারিত হল না। এখন কয়েকটি মুহূর্ত মুখোমুখি ওরা শব্দহীন দাঁড়িয়ে। লাল-সবুজ নিয়ন আলো ওদের উপর এসে পড়ে ওদের মুখাবয়বকে যেন কোন অচেনা, বিদেশি, সুদূর এক ভাস্কর্যের অংশ করে তুলছিল।

উল্কি



বিপ্রদাস বড়ুয়া

দীর্ঘ কুড়ি বছর স্বেচ্ছা নির্বাসনে থেকে কোব্বাদ মিয়া ডাক্তার হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে। দেশে ডাক্তারের সংখ্যা খুব কম। দু'দশ গ্রামেও একজন এল. এম. এফ. ডাক্তার নেই। গ্রামের মানুষদের ডাক্তারি বিধান দেয় কবরেজ হোমিওপ্যাথরা। তখন দেশে সবেমাত্র ধন্বন্তরি পেনিসিলিন এসেছে। হাতুড়ে ডাক্তাররা সাধারণ জ্বর ইত্যাদি সব রকম রোগে ওই পেনিসিলিন দিতে শুরু করেছে। গ্রামের মানুষও একদিনে ভালো হয়ে মাঠে চলে যায় কাজকর্মে। সে সময় অদ্ভুত স্বভাবের কোব্বাদ ডাক্তার এসে ডিসপেনসারি খুলে বসল বাজারের এক মাথায়। সারাক্ষণ চুরুট মুখে থাকে। আর লোক পেলেই শুরু করে বকবক গল্প। ডাক্তারির কী বোঝেন কে জানে। কোথায় শিখেছে কেউ জানতে চাইলে লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বসে। সেই ফিরিস্তি থেকে আসল সত্য বের করা খুব কঠিন। কিন্তু তার দরাজ গলা। প্রাণ খুলে হাসির শব্দ কি বা দেখা হলেই ভালো মন্দ খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যে লোকজন দু'দিনেই তাকে আপন করে নিল। ছোটোকাল থেকেই তার এই স্বভাব। মাঝখানে দীর্ঘ কুড়ি বছর দেশের বাইরে থাকার জন্যে তার সম্পর্কে নানা কাহিনি গড়ে উঠেছে। এখন তো সে আর পাড়ার বখাটে কিশোর নেই কিংবা বেকারও নয় যে সবাই করুণা করবে। বরং ডাক্তারহীন গ্রামে সে একজন ডাক্তার হয়ে ফিরে এসেছে। সকলেই তাই তাকে সমীহ করে খাতির রাখতে চেষ্টা করে সবাই। রাতারাতি সে এভাবে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল। কিন্তু দীর্ঘ বিশ বছর গ্রাম থেকে অনুপস্থিত সে। কেউ কিছু জানে না তার সম্পর্কে। আর জানে না বলেই কৌতূহল সবার। সেই কৌতূহলও একদিন থিতিয়ে পড়বে। কোব্বাদ ডাক্তারও সবার মতো ভিড়ে হারিয়ে যাবে।

কারও বাড়িতে ডাক্তার হিসেবে রোগী দেখাতে শুরুর আগেই একটা কাণ্ড ঘটল। গরমের এক সকালে কোথা থেকে একটা খেঁকি কুকুর তার ডিসপেনসারির সামনে এসে মরতে বসল। কোব্বাদ ডাক্তার ঘেন্না পিত্তি বিসর্জন দিয়ে কুকুরটাকে কোলে করে ডিসপেনসারিতে তুলল। জলাতঙ্ক রোগ নয়। তাহলে তো পাগল হয়ে মানুষ কামড়াতে ছুটত। সকালের বাজার জমে উঠেছে রোজকার মতো। লোকজন তরিতরকারি নিয়ে দোকান খুলে বসেছে। মুদি দোকানদার খদ্দেরের আশায় বসে আছে। লোকজনের ভিড় দেখে কোব্বাদ ডাক্তার তার স্বভাব সুলভ ধৈর্য হারিয়ে বকাবকি শুরু করল। সকলকে একে একে ডিসপেনসারি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কুকুরটাকে নিয়ে বসল। কম্পাউন্ডার নেই তার। তাই সাহায্যও করার জন্যে আনাড়ি এক লোককে হাত ধরে টেনে ঘরের মেঝের বসিয়ে দিল। বলল, কুকুরটা ধরো।

মরতে বসা কুকুরটাও চিৎপাত শুয়ে চুপ হয়ে রইল। কোব্বাদ ডাক্তার আলমারি খুলে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ডিসটিল ওয়াটারের অ্যাম্পুল এবং পেনিসিলিন বের করে নিল। একজন মানুষকে পেনিসিলিন দিতে যা যা করতে হয় প্রত্যেকটি কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করল। স্পিরিটের বাতি জ্বেলে গরম জল করা, সিরিঞ্জ ধুয়ে বীজাণুমুক্ত করা — কোনো কাজ বাদ দেয় নি। তারপর কুকুরটার পেছনের বাঁ পায়ের উরুর লোম সরিয়ে তিরিশ লাখ পেনিসিলিন পুরে দিল মমতা ভরে। সিফিলিস বা ভাইরাস রোগে তখন পেনিসিলিন মহৌষধ।

ইনজেকশন দেওয়ার সময় শার্টের আস্তিন গোটাতেই কোব্বাদ ডাক্তারের বাঁ হাতে দেখা গেল মাছের এক উল্কি। মীন রাশির দুটি মাছ পাশাপাশি আঁকা। লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। গ্রামে উল্কি আঁকা লোক একটাও নেই। চা বাগানের মেথর সর্দারের বাড়িতে উল্কি আঁকা লোক আছে। আর উল্কিদার ওই কুলি সর্দার সবার কাছে শ্রদ্ধেয় এবং অনেকটা রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় লোক। চা বাগানের কুলিরা প্রায় সবাই সাঁওতাল। তারা উল্কি আঁকে না মেথরদের মতো। সাঁওতালদের কালো রঙ শরীরে উল্কি মানায় না। তবুও কেউ

কেউ ক্বচিৎ উল্কি আঁকতে চায় বইকী! কিন্তু উল্কি আঁকতে জানা লোক এ তল্লাটে একজনও নেই। কোব্বাদ ডাক্তারের হাতে উল্কি দেখে তাই সমীহভরে তাকিয়ে রইল লোকটি।

কোব্বাদ ডাক্তারের কুকুরকে ইনজেকশন দেওয়া আর উল্কির কথা একদিনেই পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। পরদিন কুকুরটাও উঠে দাঁড়াল এবং দিব্যি সুস্থ হয়ে খাওয়া-দাওয়া, পা তুলে পেচ্ছাব করা ইত্যাদি কুকুরের স্বভাব মতো সব কাজ শুরু করল। কোব্বাদ ডাক্তারেরও নামডাক হয়ে গেল এক লহমায়। চা-বাগানের বস্তিতে খবর রটে গেল, রোগীর ভিড় বাড়তে লাগল। ডিসপেনসারিতে একজন লোক রেখে কম্পাউন্ডারি শেখাতে লাগল কোব্বাদ ডাক্তার।

বাজার থেকে মাইলখানেকের মধ্যেই বাগান, বাগানের কারখানা থেকে সারাদিন শোনা যায় ঘণ্টা পেটানোর শব্দ, রাত যত গভীর হয় ঘণ্টার শব্দ হয় আরও জোরালো, মাঝে মাঝে বাতাসের তোড়ে ভেসে আসে শুকোতে দেওয়া চায়ের গন্ধ। ছুটির পর কারখানা থেকে কুলি-মজুররা বেরিয়ে আসে হল্লা করে, আদিবাসীরা চলে যায় নিজেদের বস্তিতে, মদের দোকানে জমে ওঠে ভিড়। কোব্বাদ ডাক্তারেরও আনাগোনা শুরু হল বস্তিতে, কুকুরটিও ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করে সবখানে। কুকুর তো অকৃতজ্ঞ নয়; প্রভু বলো, জীবনদাতা বলো, সেতো ওই কোব্বাদ ডাক্তার —কুকুরটি তার ডাক্তারি পেশায় প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দিল প্রথম দিনেই, আর ডাক্তারও তাকে তাড়াতে পারল না। এভাবে শুরু হল তাদের পরস্পর পরস্পরের নির্ভরতা। সেই নির্ভরশীলতার কোনো সংজ্ঞা নেই, সীমারেখাও টানা যায় না। কোব্বাদ ডাক্তার বিয়ে বউহীন মানুষ। ঘরে আছে সমবয়েসি খুড়ো, খুড়োর পরিবারেই খায় দায়। পাড়াপড়শি তাকে ভালোবাসে, রোগশোকে ডাকে, মাঝে মাঝে কাউন্সিলের বিচার আচারেও ডাক পড়ে। তবে পারতপক্ষে সে ওসব ঝামেলা এড়িয়ে চলে।

বাগানে গরমের দিনে কলেরা, বর্ষায় আমাশয় বা মাঘ-ফাল্গুনে বসন্ত রোগের উৎপাত লেগেই আছে। বাগানের ডাক্তার থেকে ওরা ওষুধপত্র, বিধিব্যবস্থা পায়। কিন্তু কোব্বাদ ডাক্তারের প্রতিপত্তি সেই ডাক্তার ঠেকাতে পারল না। সে উল্কি আঁকতে জানে। তাই অনেকেই তার করুণা চায়। কিন্তু উল্কি আঁকার ব্যাপারে সে কারও কথায় ওঠ-বস করে না। মেথরদের মধ্যে উল্কি আঁকার রেওয়াজ তো আছে, দু'-একজন করে সাঁওতালও উল্কি আঁকার জন্যে তার কাছে ধরনা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সে হিসেবের বাইরে এক পাও হাঁটবে না। কুলি সর্দারের ছেলের গায়ে তির-ধনুকের উল্কি এঁকে দেওয়ার পর তার প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে। ঝমরু সেই থেকে শিকারে গেলে কোনোদিন খালি হাতে ফেরে না। বন শুয়োর, বনমোরগ এমনকি একদিন আস্ত এক হরিণ শিকার করে নিয়ে এল। যদিও হরিণের চেয়ে শুয়োরের মাংসই তাদের বেশি প্রিয় তবুও দুর্লভ হরিণ শিকার করার পর ঝমরুর নাম তার বাবার চেয়েও বেড়ে গেল।

কোব্বাদ ডাক্তারের মনে তবুও শান্তি নেই। তার ডাক্তারিবিদ্যা আর উল্কি আঁকা শেখার অনেক কাহিনি আছে। সে-সব কথা সে কাউকে কোনো দিন বলে নি। মাঝে মাঝে বলতে খুব ইচ্ছে করে। ছোটোকাল থেকে সে অনেক দেখেছে, অনেক ঘুরেছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর সে দেশছাড়া ছিল। মাঝে মাঝে তার বুকের ভেতর হাহাকার ওঠে। যখন সে উল্কি আঁকা শেখে তার গুরু একটি কথা বলত — উল্কি আঁকা সৌন্দর্যচর্চার অঙ্গ। যখন সে উল্কি আঁকতে শেখে, তার নিজের গায়ে যখন একে একে উল্কির সুইয়ের ফোঁড় লাগে, সিঁদুরের রঙে ডোবানো সুই যখন তাকে একে একে বিদ্ধ করে, সে-যন্ত্রণার মাঝেও তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সে উল্কি আঁকতে শিখবে। আদিম সমাজে কবে থেকে এর সূত্রপাত হয়েছিল তা কোব্বাদ ডাক্তার জানে না। শুধু জানে যে এখনও আদিম সমাজের মানুষ উল্কি আঁকে। সুন্দরী নারীর শরীরে একটি ছোটো উল্কি কী মোহনীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করে সে তার নির্বাসন জীবন কাটানোর সময় দেখেছে। উৎকল দেশ ঘুরতে ঘুরতে সে এই নিয়ে অনেক ভেবেছে। মাদ্রাজ ও পুরীর সমুদ্রতীরে সে খুঁজেছে সুন্দরী তরুণী। তার গুরু তাকে বলেছিল, খবরদার শুধু টাকার লোভে কারও গায়ে উল্কি আঁকতে হাত বাড়াবে না। সৌন্দর্যচর্চার নামে তুমি এই বিদ্যা আমার কাছ থেকে শিখতে পেলে। গুরু তাকে আরও বলেছিল, কালো ছিপছিপে ভারী উরুর কোনো মেয়ের শরীরে নির্লোভ একাগ্র মনে উল্কি আঁকো তবে সেই নারী পাবে উল্কির প্রাণীর সব গুণাগুণ। মন নিয়ে উল্কি আঁকবে, প্রতিটি ফোঁড় দেবে মমতা ভরে, আর মনে রাখবে এ-কাজ শিল্পকর্মের অঙ্গ, যে-নারীর গায়ে উল্কি আঁকবে তার প্রতি কখনও লালসার হাত বাড়াবে না। শুদ্ধ শিল্পে ও সৌন্দর্যচর্চাতেই মানুষের মুক্তি।

সেই থেকে কোব্বাদ ডাক্তার খুঁজে বেড়াচ্ছে তেমন একজন নারীকে, কিন্তু কোনো নারীর উরু দেখা তো সহজ নয়। একমাত্র অভিজ্ঞ লোকই শুধু পায়ের গোড়ালি দেখে উরুর লঘু-গুরু মাপ আঁচ করতে পারে। পায়ের গোড়ালি যাদের একটু ভারী তাদের উরুও ভারী হতে বাধ্য। কোব্বাদ ডাক্তার নানা লোকের কাছে কম্পাউন্ডারি ও ডাক্তারি শিখেছে। ডাক্তারি শিখতে শিখতে উল্কি আঁকার কথা সে ভোলে নি। শরীরবিদ্যা তো একদিনে শেখা হয় না। আর শরীরের অস্থিসন্ধি মনে রাখতে গিয়ে সে ভোলে নি উল্কি-গুরুর কথা। বাগানের কুলি মেয়েদের সে দেখে, ডাক্তারি করতে গিয়ে অনেক নারীর সংস্পর্শে আসে, কখনো কখনো মশারির বাইরে থেকে রোগীর সঙ্গে কথা বলে, রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দেয়। পর্দানশীন মেয়েদের চিকিৎসা করার দুর্ভোগ এবং তাদের সংস্পর্শে এসেও তাদের দেখতে না পাওয়া — একমাত্র গ্রাম্য ডাক্তাররাই এই সমস্যার মুখোমুখি হয়। কিন্তু চোখ-কান সে বরাবরই খোলা রাখে।

এক সন্ধেয় কোব্বাদ ডাক্তার বস্তি থেকে ফিরছে। কুকুরটিও তার আগে আগে, পিছে পিছে। হঠাৎ তার পাশ দিয়ে এক তরুণী চলে গেল। ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল। বেণী দুটি ঝাঁপিয়ে পড়েছে পিঠ ছাড়িয়ে নিতম্বে। কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে এমন শব্দ করে উঠল যে, মেয়েটি হয়তো ভয় পেয়ে আরো জোরে হনহন করে চলে গেল। কেন যে কুকুরটি এভাবে ডেকে উঠল, বা কুকুরকে চুপ করতে বলার সময়ও সে পেল না। আর আলো-আঁধারেও সে আঁচ করে নেয় মেয়েটির উরু হবে সুগঠিত, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে রোমাঞ্চকর অনুভূতি খেলে গেল। কিন্তু ভালো করে দেখা এবং কথা বলার আগেই মেয়েটি বস্তির ঘর-বাড়ির উঠোন দিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

ডিসপেনসারিতে ফেরার পর সে কাজে মন বসাতে পারল না। কম্পাউন্ডারকে কিছু না বলে ছুটি দিয়ে দিল। কুকুরটাকে রীতিমাফিক আদর না করে ভেতরের কামরায় ঢুকে চুরুট জ্বেলে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে ভাবতে লাগল, বস্তিতে যখন দেখা পেয়েছি তাকে খুঁজে পাবই। ডিসপেনসারিতেই ডাকব, উল্কি এঁকে দেব বললে সে স্বেচ্ছায় চলে আসবে, এসে উল্কির মধুর যন্ত্রণা হাসিমুখে গায়ে তুলে নেবে। ...তারপর উল্কির ছবির গুণাগুণ পেয়ে দাপিয়ে বেড়াবে।

পরদিন.... তারপরও কয়েকদিন কেটে গেল। কোব্বাদ ডাক্তার আর সেই মেয়েটিকে দেখতে পায় না। নামও জানে না যে, কাউকে জিজ্ঞেস করবে। প্রতিদিন বস্তিতে চলে যায় সে, রোগী দেখার ডাক আসুক না আসুক বস্তির গলিতে গলিতে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সে খোঁজ-খবর নেয়। সবাই যখন চা বাগানে চলে যায় তখনও ছুটে যায় বস্তিতে। এক দুপুরে মংলু সর্দারের বাড়ির পাশে মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা। অমনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কাদের মেয়েগো তুমি?

ওমা তুমি চেনো না বুঝি, ওই যে আমার বাড়ি, সর্দারের পাশের বাড়িই তো! এই বলে তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে নিয়ে গেল। কথা বলতে বলতে ডাক্তার শুধু ভাবছে, এইতো সেই মেয়েটি যাকে সে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পায়ের গোড়ালি দেখে আবার বিড়বিড় করে বলল, কী সুন্দর, কী সুন্দর! মেয়েটির শরীরের গড়নও অস্বাভাবিক সুন্দর। এমন সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না। মেয়েটি তাকে গুড় দিয়ে এক গ্লাস জল খেতে দিল। হাজার হোক ডাক্তার মানুষ, উল্কি আঁকতে জানে, লোকে বলে তার অসীম ক্ষমতা, সে ইচ্ছে করলে অদ্ভুত সব কাণ্ড করতে পারে। মানুষের শরীরে উল্কি এঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করে দিতে জানে।

চৈত্রের গরমের দুপুরে এক গ্লাস পানি ও গুড় তার শরীর জুড়িয়ে দিল। তারপর সে মেয়েটির নাম জেনে নিল, এবং আস্তে আস্তে লখিয়াকে বোঝাতে শুরু করল। লখিয়া তো নিজেই উল্কি আঁকার কথা বলত, কিন্তু তার আগেই কোব্বাদ ডাক্তার তার ব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করে দেখাল। ছবিটি রানি মৌমাছির। তারপর মেলে ধরল রানি পিঁপড়ের ছবি। তারপর একটি অতিকায় মাকড়সার ছবি বের করতেই লখিয়া চোখ বুজে চুপ করে গেল। আরেকটি ছবিতে রানি মৌমাছি পুরুষ মৌমাছিকে হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলছে দেখেই লখিয়া কেঁপে উঠল। কোব্বাদ ডাক্তার বলল, সঙ্গম শেষে পুরুষ মৌমাছির জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ পরিণতি।

কোব্বাদ ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, তুমি উল্কি আঁকবে? তোমার মতো মেয়েদের জন্ম হচ্ছে পুরুষদের শাসিয়ে বেড়ানোর জন্যে। তুমি চাও তো মৌমাছি বা মাকড়সা যে-কোনো একটি উল্কি আঁকতে পারো, তাদের শক্তি করায়ত্ত করতে পারো। পৃথিবীতে শক্তিমতী হয়ে বেঁচে থাকার মতো সুখ আর নেই।

শুনতে শুনতে লখিয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বলল, না না ও-কথা বলবেন না, আমি ঘর-সংসার নিয়ে সবার মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু মনে মনে সে লোভী হয়ে উঠল। পুরুষ মানুষকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আশা.... তার কুমারী দেহে এক অজানা শিহরণ খেলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অচেনা ভয়ও তাকে জাপটে ধরল। এই দ্বিধা-দ্বন্দে ডুবে সে বলল, অমন কথা বলবেন না, আমার খুব ভয় করছে। তারচেয়ে একটা মহুয়া ফুলের উল্কি এঁকে দিন আমার হাতে।

বসন্ত শেষ হতে বসেছে। চা বাগানের কোথাও মহুয়া গাছ আগের মতো নেই। আগে বাগানের কয়েকটি টিলা জুড়ে ছিল মহুয়ার বন। আদিবাসীরা মহুয়া খেয়ে নেশায় মেতে থাকত বলে বাগান কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে মহুয়ার বন শেষ করে দিয়েছে। কোব্বাদ ডাক্তার দেখল মেয়েটির মনের গভীরে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আছে। তাই আস্তে আস্তে সে তার মনের পর্দায় রঙ লাগাতে শুরু করল। বলল, হ্যাঁ, মহুয়ার উল্কি আমি এঁকে দিতে পারি, কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো না আমি যাকেতাকে উল্কি এঁকে দেই না। সর্দারের ছেলের গায়ে এঁকে দিয়েছি। তুমি তো সাধারণ নও, তুমি সেই নারীর বংশ যে পুরুষের মুখে লাগাম দিয়ে দাসখত লেখাতে পারে। তোমার এই সৌন্দর্য দিয়ে তুমি হতে পারো সর্বশ্রেষ্ঠ নারী, এই বাগানের পুরুষ হবে তোমার করুণা-প্রার্থী।

লখিয়ার আদিম রক্তে ঢেউ খেলে গেল। মাতৃতান্ত্রিক সাঁওতাল সমাজে নারীই সর্বেসর্বা, কাজেই এই সুযোগ সে ছাড়তেও চায় না। সাঁওতালদের মধ্যে উল্কি আঁকার রেওয়াজ নেই, তবুও সে লোভী হয়ে উঠল।

পরদিন লখিয়া কোব্বাদ ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে গেল। নদীর ধারে বাজার, দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ চারদিকে, লোকজন নেই। কম্পাউন্ডার বসে বসে ঝিমুচ্ছে, ডাক্তার ভেতরের ঘরে আরাম কেদারায় বসে চুরুট টানছে। লখিয়া তখন ঘরে ঢুকল। ডাক্তার বুঝল লখিয়ার রক্তে উল্কির নেশায় পেয়েছে। লখিয়া বলল, আমার বাবাকে বলেছি, তুমি আমাকে মহুয়ার উল্কি এঁকে দেবে। কোব্বাদ ডাক্তার তবুও আশা ছাড়ে না, সে জানে একবার যখন উল্কির নেশায় পেয়েছে তখন লখিয়াকে ইচ্ছেমতো চালানো যাবে। কোব্বাদ ডাক্তার তখন উঠে আলমারি থেকে একটা ছবি বের করল। রানি ক্লিওপেট্রার ছবি। লখিয়া জানে না ক্লিওপেট্রা কে। কিন্তু ছবির রাজরানীর রূপ তার স্নায়ুতে শিহরণ জাগিয়ে দিল। কোব্বাদ ডাক্তার তাকে বলল, কে এই রানি জানো? পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ একদিন এই নারীর অনুগ্রহ কামনা করত, সঙ্গ-কামনায় উন্মত্ত হয়ে উঠত। রানিও তার পছন্দমতো পুরুষকে বুকের কাছে টেনে নিত। পুতুলের মতো পুরুষরা রানির ইচ্ছার কাছে লুটিয়ে দাসখত লিখে দিত।

লখিয়ার তরুণী দেহে শিহরণ খেলে গেল। শরীর থেকে স্বেদবিন্দু ঝরতে লাগল। সে কী করবে বুঝতে পারল না। তার মনের কোণে জমে আছে একটি সংসারের স্বপ্ন, চা বাগানের ছায়াচ্ছন্ন জীবন, উৎসবের দিনে মাদলের নৃত্য গীত, তারপর আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গে রাত্রিবাস.... লখিয়া কোনোমতে জোর করে বলল, একটি মাদার ফুলের পাশে যদি মাদলের উল্কি আঁকতে চাই? তুমি দেবে না?

সেদিনও কোব্বাদ ডাক্তার লখিয়াকে যেতে দিল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান না ঘটিয়ে। লোকজন, বাজারবাসী সবাই জানে কোব্বাদ ডাক্তার ভালোমানুষ। পড়া-পড়শিরা তাকে দেবতাতুল্য শ্রদ্ধা করে। চা বাগানের সর্দার, কুলি কেউ তার সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। কোব্বাদ ডাক্তার দেখতে চায় তার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্যের পাশাপাশি ধ্বংসের রূপ স্বচ্ছন্দে সহাবস্থান করতে পারে কিনা, তার দীর্ঘ ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র শিক্ষার সঙ্গে এই স্থির জীবনের মিল কোথায় তা পরখ করে দেখতে চায়। বসন্তের মহুয়া খেয়ে ভালুকও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আদিবাসীরা উৎসবে মেতে ওঠে মহুয়ার গন্ধে --কোব্বাদ ডাক্তার লখিয়াকে নতুন করে গড়ে চা-বাগানে ছেড়ে দিতে চায়। সে যে উল্কি আঁকা শিখেছে, সেই শিল্পের পরিণতি দেখতে চায়। সৌন্দর্যই পৃথিবীকে শাসন করবে, লখিয়াই চা বাগানের পুরুষশাসিত সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করবে—কোব্বাদ ডাক্তার তা দেখতে চায়।

সেদিন চৈত্র পূর্ণিমার উৎসব। চা বাগানে উৎসবের ধুম লেগে গেছে। লখিয়া তার মন স্থির করে নিল। সে ছবির ওই রমণীর মতো রূপসি হয়ে উঠবে, রাজরানি হবে। পৃথিবীর সব রূপবান পুরুষ তার কামনায় অধীর হয়ে উঠবে। কোব্বাদ ডাক্তারও ছুটল লখিয়ার খোঁজে। উৎসবের উঠোনের বাইরে দু'জনের মুখোমুখি দেখা।

মংলু সর্দারও অনুমতি দিয়েছে। আস্তে আস্তে ওরা লখিয়ার বাড়ির দিকে চলল। লখিয়ার মা তাদের ঘরে ডেকে নিল। রাত গভীর হচ্ছে।

ডাক্তার ব্যাগ থেকে সুই, রঙ আর উল্কির ছবি বের করল। তারপর বলল, লখিয়া তোমার সমস্ত শরীর-মন এখন উল্কির দিকে নিয়ে যাবে। তোমার মন এখন উল্কির যন্ত্রণার কথা ভাববে না, ভাববে তুমি সুন্দরী ও শক্তিমতী হচ্ছো, তোমার রূপ ও গুণ বেড়ে বহুগুণ হচ্ছে, তুমি রাজরানি হতে যাচ্ছো।

কোব্বাদ ডাক্তার সুই তুলে সিঁদুরের রঙে ডোবাল, তারপর লখিয়ার পিঠের মসৃণ ত্বকে যত্ন করে প্রথম দাগ বসাল। সঙ্গে সঙ্গে লখিয়ার পিঠের ত্বকে মৃদু কাঁপন উঠল। সে-ব্যথা যেন কোব্বাদ ডাক্তারের শরীরেও সঞ্চারিত হল। একের পর এক সুইয়ের খোঁচায় লখিয়ার পিঠে ভেসে উঠতে লাগল ছবি। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে লখিয়া। কোব্বাদ ডাক্তার বলে, মনকে সজাগ করো, তোমার মধ্যে অলৌকিক শক্তি পুরে দিচ্ছি সুঁইয়ের প্রতিটি খোঁচে। লখিয়ার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, আবার সে মনকে শক্ত করে। একাগ্র মনে ভাবে, সে চা বাগানের রানির আসনে বসে আছে, মাথায় সেই ছবিটির মতো মুকুট, হাতে রাজদণ্ড। সে আর আগের মতো নেই।

লখিয়ার মা পাশের ঘরে, ঘর থেকে কান পেতে শুনতে চায় মেয়ের যন্ত্রণার শব্দ আসে কিনা। একসময় সেও উৎসবে চলে যায়। লখিয়ার বাবা সেই থেকে উৎসবে নেশায় ডুবে আছে। লখিয়ার ভাইয়েরও সময় নেই আজ। মাদলের শব্দ আসছে গুরু গুরু, গানের সুর ভেসে আসছে। পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য লখিয়ার মাঝে পুরে দিতে চায় কোব্বাদ ডাক্তার। সে সবচেয়ে সুখী মানুষ আজ, সে মাঝে মাঝে থেমে যায়, দুই আঙুলের ডগায় সুই ধরে রেখে রানি মৌমাছির ভারী শরীরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হুলটা হওয়া চাই তীক্ষ্ণ। সমস্ত শরীরের মাঝে এই হুল সূক্ষ্মতম। মাকড়সার ছবিও সে আঁকতে পারত। মাকড়সার মধ্যেও সংহার শক্তি আছে। রানি মৌমাছির আয়ু মাত্র তিন বছর। তার মিলনের প্রয়োজন হয় বছরে একবার মাত্র। সুতরাং চাকের শত শত পুরুষ মৌমাছির মধ্যে একটিই মাত্র মিলনের দুর্লভ সুযোগ পায়। আর এই মিলনের ফল পুরুষ মৌমাছির জন্যে মারাত্মক। কোব্বাদ ডাক্তারও চায় রানি মৌমাছির মতো যে পুরুষ তার সংস্পর্শে আসবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। সে পুরুষ হবে তার আজ্ঞাবহ, তার জীবন হবে লখিয়ার পায়ের তলায়। কাঁকড়া বিছেও আঁকতে পারত। লখিয়ার পিঠ জুড়ে একটি অতিকায় কাঁকড়া বিছের ছবি, আর তা দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকা পুরুষ—এসব ভেবে শেষ পর্যন্ত রানি মৌমাছির ছবিই আঁকতে শুরু করল।

ভোর হতে হতে কোব্বাদ ডাক্তার তার কাজ শেষ করল। সুই আর ছবি তুলতে তুলতে বলল, এবার তুমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো। ঘুম থেকে উঠবে দুপুর নাগাদ, এর মধ্যে পিঠে কাপড় লাগাবে না, কিছু খাবে না। তারপর তোমাকে চান করতে হবে, সিঁদুর গোলা পানিতে চান করার পর তুমি মুক্ত। তুমি নতুন কাপড় পড়বে, খাবে। তারপর তুমি দেখবে সৌন্দর্য তোমার হাতের মুঠোয়, সকল পুরুষের কাম্য নারী তুমি। তখন লখিয়ার মা এসেছে, বাবা এসেছে। মা এসে দেখল লখিয়া শুয়ে আছে। ওর মা-বাবা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলল, খেতে দিল বাটি ভরা চা। রাতের উৎসবের পর ওরা ক্লান্ত, তবুও ডাক্তারকে আপ্যায়ন করতে ভুলল না। চৈত্রের ফুরফুরে হাওয়ায় চা বাগান মেতে উঠল, শিমুল-গোটা থেকে তুলো উড়ছে বাতাসে, কলি আসতে শুরু করেছে বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছে। কোব্বাদ ডাক্তার এক ঝাঁক শালিকের ডাক শুনতে শুনতে বাগান ছেড়ে চলল ডিসপেনসারির দিকে। একটু ঘুম দরকার। আরাম কেদারায় বসে বসে কিছুক্ষণ ঘুমালেই শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আজ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। সে তার জীবনের দীর্ঘ দিনের আশা পূরণ করেছে। দুপুরে রঙ গোলা পানিতে লখিয়াকে চান করালে তার কাজ শেষ।

এক সময় কোব্বাদ ডাক্তার ঘুমিয়ে পড়ল আরাম কেদারায়। দুপুর বারোটা নাগাদ ধড়ফড় করে উঠে বসল। তাড়াতাড়ি ডাক্তারি-বাক্স হাতে নিয়ে বাজারের ওপর দিয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে ছুটল। সহজ-সরল আদিবাসী মেয়েটি কত কষ্ট পেয়েছে! হয়তো এখন সে স্বপ্ন দেখছে, বালিশের ওপর মুখ রেখে হয়তো এখনো ঘুমুচ্ছে! বাজার ফেলে নদীর ধার দিয়ে, বাগানের গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় কুকুরকে সঙ্গী করে কোব্বাদ ডাক্তার ছুটল হনহন করে।

লখিয়ার মা ঘুমুচ্ছে, বাবা ঘুমুচ্ছে। কোব্বাদ ডাক্তার লখিয়াকে চান করতে পাঠিয়ে দিল। মাটির বড়ো

জালায় রঙ গুলিয়ে চানের জল করে দিল কোব্বাদ ডাক্তার। চান শেষ করে নতুন পোশাক পরে যখন ঘরে আসবে সে রূপটি দেখতে চায় কোব্বাদ ডাক্তার। তখন তরুণী লখিয়ার রূপ কেমন ঝলমল করে, তার মুখে কী লাবণ্য ফুটে ওঠে, কোন্ রূপে সে তার নতুন জীবন শুরু করবে — তার সূচনা দেখে তবেই কোব্বাদ ডাক্তারের ছুটি। কোব্বাদ ডাক্তারের কুকুরটিও তখন পাড়ার কুকুরদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ছোটাছুটি করছে।

মাটির বড়ো গামলায় রঙ গোলা পানিতে লখিয়া যখন তার শরীর ডোবাল মনে হল তার পিঠ জ্বলছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল সে। প্রতিটি ক্ষতে জলের ছোঁয়ায় জ্বলতে লাগল। তবে সব যন্ত্রণার যেমন শেষ আছে লখিয়ার জ্বালাও এক সময় সহ্যের মধ্যে চলে এল। তারপর শরীর জুড়ে নেমে এল প্রশান্তি। পিঠ তো আর দেখতে পায় না, তাছাড়া হাত দিয়ে ঘষতেও নেই। বিন্দু বিন্দু রক্তের দাগগুলো কোব্বাদ ডাক্তার মুছে দিয়েছিল উল্কি আঁকার সময়। গুরু যেমন তার শিষ্যকে যত্নে পরিপূর্ণ শিক্ষা দেয় তেমনি মমতা ভরে উল্কি করে দিয়েছে কোব্বাদ ডাক্তার।

স্নান শেষে গভীর তৃপ্তি নিয়ে ঘরে এল লখিয়া। বসন্তোৎসবের জন্যে কেনা নতুন হলুদ রঙের শাড়িখানা পরল। নতুন সাজে লখিয়াকে চেনাই যায় না। যন্ত্রণার অনুভূতি হয়তো তার মুখে লেগে আছে, আর সেই আনন্দ-বিষাদে লখিয়া হয়ে উঠেছে রাজরানি। ঘরে ঢুকেই সে দেখে কোব্বাদ ডাক্তার পায়চারি করছে। তার চোখে-মুখে বিস্ময়, এবং নিজের সৃষ্টি দেখে কোব্বাদ ডাক্তার মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল। বলল, তোমার অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে, এখন ভালো তো?

কোব্বাদ ডাক্তারকে দেখে ঘুমভাঙা বাঘিনির মতো আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল লখিয়া। দৃঢ় অথচ ছন্দময় পা ফেলে লখিয়া এগিয়ে গেল ডাক্তারের দিকে, শিকরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে চিতাবাঘ যেমন সবকিছু হিসাব করে নেয়, যেমন স্থির নিশ্চিত হয় যে শিকার আর পালাতে পারবে না, ঠিক তেমনি এগিয়ে গেল লখিয়া। সে আর ভীরু, লাজুক বা দ্বিধাগ্রস্ত নয়। রাজরানির মতো গ্রীবা উঁচু করে কোব্বাদ ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তুমিই আমার প্রথম শিকার।

ঢোল সমুদ্র



সাধন চট্টোপাধ্যায়

দামোদর পেরিয়ে দলটা বাঁকুড়ায় ঢুকল। চৈত্রের মাঝামাঝি. ক্ষীণস্রোতা তটিনীর বিশাল বালুকাবক্ষে পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে উঁচু মাটির ঢিপিতে উঠতেই সর্দাব একটু থমকে দাঁড়ায়। সামনে ধু ধু রুক্ষ মাঠ। ঢেউ-খেলা। ইতস্তত কয়েকটা বাজ-পোড়া তালগাছ। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে চতুর্দিক ঝিমঝিম।

সর্দার কী যেন ঠার করছে। লালচে চোখজোড়া চতুষ্পার্শ্ব নিরীক্ষণ করে নিল। শেষে মৃদু মাথা দুলিয়ে বলল, 'নাঃ আর একটু পা চালাতে হবে গুণিন...... এ মাঠটা পেরিয়ে গেলে মনে হয় জায়গা মিলবে।' গুণিন কিছু ভেবে জবাব দেবার আগেই সর্দার পা বাড়াল। পিছনে তাকিয়ে একটু তাড়া দিয়ে বলল, 'চটপট পা চালাও সব ক্রোশটাক পথ সেরে ফেলি।'

ঝোলাঝুলি কাঁধে নিঃশব্দে দল এগোল। কেবল কয়েকজনের মুখে মৃদু লয়ে শিস আর রহস্যময় হুড়ড় হুডড় আওযাজ।

দলেব অনেকেই হাঁটতে পারছে না। সারাদিন পা চালিয়ে ক্লান্ত। মস্ত বাঁকটা কাঁধে প্রহ্লাদ রাগে সর্দারেব পিছন দিকটায তাকায়। ধুলোয ভবা মস্ত একমাথা চুল। মোটা গর্দান। সামনে একটু ঝুঁকে থপ থপ এগিয়ে চলেছে।

'আর কত দূব সর্দার?' — প্রহ্লাদের গলাটা রুক্ষ। সর্দার নিঃশব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। উত্তর করল না। প্রহ্লাদের ফৌজি মেজাজটা একটু গরম হয়ে ওঠে।

দল এগিয়ে চলেছে। চারদিক স্তব্ধ, কেবল হিস্ হিস্ হুড়ড় হুড়ড় আওয়াজ। জনা ছয়েকের মতো লোকের কাঁধে, বাঁক, মাথায় মস্ত টোকা— সঙ্গে খস্ খস আওয়াজ করে চলেছে পাঁশুটে একটুকরো মেঘের মতো একপাল শুযোর।

দলট' উত্তবের জেলা থেকে নেমে আসছে। সাঁওতাল পবগণার পথ বেয়ে বীরভূম। কত মাঠ-ঘাট, গ্রাম-গ্রামান্তর পাড়ি দিয়ে বর্ধমান ছাড়িয়ে ঢুকেছে দামোদর পেরিয়ে বাঁকুড়ার লাল মাটিতে। রুক্ষ, কঠিন মাটি। এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে হুগলির ভিতর হয়ে গঙ্গা পেরিয়ে দল চলে যাবে নিজেদের আস্তানায়। আষাঢ়ে গৃহত্যাগী হয়ে চৈত্রের শেষে ফিরে যায়। কত দেশদেশান্তর যে পাড়ি দিতে হয়!

ক্রমে ক্রমে মাঠটা শেষ হয়ে গেল। অসংখ্য চড়াই-উতরাই। একটা প্রশস্ত ঢালু ভূমিতে নেমে সর্দার আবার থমকে দাঁড়াল। চতুর্দিক চোখ বুলিয়ে গুণিনকে বলল, 'ঠিক জায়গা বটে। দেখত, ওদিকের নয়ানজুলিতে জল-টল আছে কিনা?' একটা ঢ্যাঙা মতো লোক এগিয়ে যায়।

যে যার কাঁধের বোঝা, টোকা মাটিতে রেখে ধপ করে বসে পড়ল। প্রহ্লাদের সমস্ত মাংসপেশীর মধ্যে যন্ত্রণা। কাঁধ থেকে বাঁকটা নামিয়ে সে সটান শুয়ে পড়ল।

বড়ো পাল বলল, 'ভুইয়ে গড়িয়ে পড়লে যে? .... মালপত্তর বার কবো?'

'করে নাও ... পাইরছি না।'

বড়ো পাল মৃদু হেসে বাঁকের মধ্য থেকে খন্তা, তোবড়ানো হাড়ি, থালা, চার-পাঁচটে শিশি কৌটো বার করতে করতে বলল, 'উনুনটা খোঁড়ো .... টোকাগুলো পুঁতে নাও।'

সর্দার একটা বিড়ি ধরাল। চোখজোড়া আধ-বোজা অবস্থায় মোলায়েম গলায় হুকুম করতে লাগল। নইলে যত দেরি হবে, দলটা ততই পড়বে এলিয়ে।

গুণিন গর্ত খুঁড়তে লাগল; বড়ো পাল. যাদব এবং সোমরাকে নিয়ে সর্দার চলে গেল লোকালয়ে সওদা

করতে। চাল, ডাল, আলু, তেল নুন। প্রহ্লাদ পড়ে রইল। সর্দার একবার আড়চোখে তাকাল প্রহ্লাদের দিকে, শেষে ছায়ার মতো চারটে মানুষ শিশি, থলি নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

উনুন খুঁড়তে খুঁড়তে গুণিন বলল, 'ওঠ দেখি একটু! জলটা আন তো।' প্রহ্লাদ প্রতিবাদ করল না এবার। ভুষো-কালি পড়া, টিম-টিমে হ্যারিকেনটা দুলিয়ে ভাঙা কলস হাতে চলল জলের সন্ধানে।

সেই পাঁশুটে মেঘের দলটা টুকরো টুকরো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ততক্ষণে মাটি চালতে চালতে পুকুরের দিকে নানান মূলের সন্ধানে চলে গেছে। প্রহ্লাদ একবার ডাকবার চেষ্টা করল হুড়ড় হুড়ড়, কিন্তু শব্দটা খুব ভালো রপ্ত হয়নি। গুণিন গলা দিয়ে শিসের মতো অদ্ভুত আওয়াজ বের করতেই দলটা ঘোঁত ঘোঁত করে উনুনের খানিকটা দূরে ঘেঁষাঘেঁষি শুয়ে পড়ল।

হাওয়া রহস্যময় আওয়াজ তোলে। একটু বাদেই দেখা গেল আগুনের জিহ্বা। চতুষ্পার্শ্বে ঘন অন্ধকারের মধ্যে লিকলিক করছে। প্রহ্লাদ ফিরে দূরে বসে সেদিকে তাকিয়েছিল। ভাবছিল সর্দারের সঙ্গে বীরভূমে অমনভাবে ঝগড়া করা উচিত হয়নি। কিন্তু তার দাপা-খ্যাপা মেজাজটা নিয়ে করবে কী সে? অমন পাঁশুটে আকাশ, আর রোদ্দুর দেখেই প্রহ্লাদ বুঝেছিল চোত মাস। বাড়ির টানে মনটা তার আনচান করছে। সর্দারকে বলেছিল, 'আর নয়গো সর্দার। হুগলির পথে নেমে পড়ি। বাড়ি যেতে যেতে চোত মাস কাবার হয়ে যাবে।' সর্দার গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'বন্যাডা কেমন দেখলা? ... কত জানোয়ার মারা পড়ল! ব্যবসা লাটে উঠবে ... বাঁকুড়ার মাটিতে জানোয়ারগুলো একটু চরুক?'

'যেতে তা'লে জষ্ঠিমাস? ... ও বছর না হয় ভালো কবে চরিও।'

'বেশি কথা কওনাত প্রহ্লাদ! ছোকরা বয়সে অমন ঘরটানের কী আছে?'

'বেশ, তুমি থাকো! দামোদর পার হব না আমরা' — প্রহ্লাদ কথাটা মুখে আনতেই সর্দারের চোখজোড়া কেমন নিথর হয়ে গেল। নাকের পেটিজোড়া ঈষৎ ফুলিয়ে হেসে উঠল, 'বেশি বাড় ভালো নয়, প্রহ্লাদ!' গুণিন মাঝখানে পড়ে উভয়কে থামিয়ে দেওয়ায় ব্যাপারটা আর গড়াল না।

বড়ো পাল, যাদব, সোমরা ফিরে এসেছে। সর্দার আসবে পরে। জিনিসপত্তর কিনে ওদের দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মস্ত এক হাঁড়িতে ভাত চাপানো হল। গুণিন উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে প্রহ্লাদকে বলল, 'হোমনে কিচু ডাল-পাতা আছে ... কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনত, যা হাওয়া!' উঠে গিয়ে বুকে পেঁচিয়ে আনলে, গুণিন আগুনে গুঁজতে লাগল।

এ তিনজন ঝিমুচ্ছে। গুণিন আড়-চোখে তাকিয়ে ডাক দেয়, 'ও বড়োপাল?'

'উঁ'—

'বলি, ঘুমুয়ে পড়লে যে?'

'বড্ড কেলান্ত।'

'ভাতটা হলি ডাল চাপাব।'

বড়োপাল উত্তর করে না। গুণিন একটা কাঠ গুঁজে আবার আড়চোখে তাকাল।

'বড়োপাল, এডা কোন্ দেশ?'

'পশ্চিম'।

'লোকজন কেমন দেখলা?'

উত্তর দেবার আগেই একটা ছাইবঙা শুয়োরের বাচ্চাকে একটা কালোধাড়ি মুখ দিয়ে চেপে ধরতেই চিঁ চিঁ চিৎকার শুরু হয়ে যায়। গুণিন ছুটে গিয়ে থামিয়ে দেয়। নইলে বেচারাকে হয়তো মেরেই ফেলবে।

খানিকবাদেই টিনের থালাগুলো ধুয়ে ওরা খেতে বসার আয়োজন করতে লাগল। ডাল, ভাত আর থালায় মস্ত একতাল আলুভাতে। যে যার ছোটো ছোটো দলায় খাবলে নিচ্ছে। ঠিক এই সময় নিঃশব্দে সর্দার এসে হাজির। একটা ঢেঁকুর তুলে বলল, 'খেয়ে নাও তোমরা ... আমি খাব না।'

গুণিন বলল, 'চাড্ডি খানিক খাও।'

'না' — বলেই সর্দার উনুনের ওপাশটায় অন্ধকারে বসে বিড়ি টানতে লাগল।

খেয়েদেয়ে একটু বাদেই যে যার গড়িয়ে পড়ে। প্রহ্লাদের কোনো হুঁশ নেই। টোকার তলায় কাঁথাটা মেলেই

পাজোড়া টানটান করে দিল। শুকনো ঘাসের ডগাগুলো ফুটছে শরীরে। একটু বাদেই চোখের পাতাজোড়ায় রাজ্যের ঘুম নেমে এল।

হঠাৎ যখন জেগে উঠল কত রাত বোঝা যাচ্ছে না। ঘন অন্ধকার, হু হু বাতাসের শব্দ আর উজ্জ্বল একঝাঁক তারা। পাশের টোকাগুলো থেকে শোনা যাচ্ছে ঘুমের মাঝে বোবা যন্ত্রণার গোঙানি। প্রহ্লাদের মন মুহূর্তের জন্য ছমছমিয়ে উঠল। আস্তে ঘাড়টা তুলল। পাঁশুটে মেঘের দলটা গোল হয়ে শুয়ে পরস্পর ঠেলাঠেলি আর ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করছিল।

উঠে বসল প্রহ্লাদ। একটু এধার-ওধার তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। দুজন জেগে আছে। হাঁটু গেড়ে গুণিন বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াচ্ছে আর হুসহাস্ শূন্যে কী যেন তাড়াচ্ছে। এপাশে বসে সর্দার। অন্ধকারে শুধু মুখের আকারটা বোঝা যাচ্ছে তার, কিন্তু কর্কশরূপ দেখা যাচ্ছে না। বিড়ির আগুনে অনুমান হয় চোখজোড়া ঘোলাটে লাল। তাকিয়ে আছে প্রহ্লাদের দিকে।

'গুণিন ... গুণিন' - দুবার ডেকেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সর্দার মোলায়েম গলায় বলল, 'জেগে উঠলে যে প্রহ্লাদ?'

'পা-টা টান ধরেছে সর্দার! ... ঘুমটা ছুটে গেল।'

সর্দারকে প্রহ্লাদের এই মুহূর্তে ভয় করছে। ওর ভেতর চাপা আগুন যেন।

হাতের একটা ছায়া এগিয়ে এল প্রহ্লাদের সামনে।

'ধরো, বিড়ির টান দাও' — সর্দারের গলা।

প্রহ্লাদ খানিক আশ্বস্ত হয়ে বিড়ি টানতে থাকে। গুণিনের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। একইভাবে বিড়বিড় করে যাচ্ছে।

সর্দারই আগাম বলল. গুণিন! জড়ি-বুটি, মন্ত্রতন্ত্রের কাজ চলছে ... এলাকাটা ভালো নয়।'

প্রহ্লাদ ভূতুড়ে তালগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শরীরটা ভারীভারী লাগছে।'

সর্দার খানিক ভেবে বলে উঠল, 'ঢোল সমুদ্দুরের তাবিজটা আছে তো কোমরে?'

প্রহ্লাদ কোমরটা হাতিয়ে ছোট্ট বস্তুটার অস্তিত্ব অনুভব করে নিল। এতক্ষণ তার কোনো খেয়াল ছিল না। এবার শরীর হালকা হয়ে গেল। কী এক শক্তি ভর করল দেহে।

সেই গত আষাঢ়ে পথে বেরোবার কালে মালিক যুগল দাস এটি বেঁধে দিয়েছিল। সর্দার, গুণিন সবাই ছিল পাশে। নদীর ধারে যে ঢোল সমুদ্রের পাতা পাওয়া যায়, তারই তাবিজ। কোমরে থাকলে নাকি মানুষ সর্বশক্তিমান। যুগল দাস হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'এটা তোর সম্পত্তি, আমার জিনিস হল শুয়োরের পাল। ফিরে এলে আমি আমার সম্পত্তি যাচাই করে নেব আর তোর সম্পত্তির হিসেব পথেঘাটেই তুই টের পারি।' সর্দার বলেছিল, 'এবার তুমি শক্ত-সমত্থ পুরুষ ... পথে চোর ডাকাত, দুষ্ট প্রকৃতি তোমার দেহ স্পর্শ করতে পারবে না।' গুণিন তার লম্বা জুলফি, গোল গোল চোখজোড়া মেলে সায় দিয়েছিল।

তারপর পথের মানুষ প্রহ্লাদ পথেই প্রমাণ পেয়েছে সে সর্ব-শক্তিমান। কত আওড়-বাওড়, মাঠ-ঘাট, লোকালয় পেরিয়ে গেছে, কত চোর-ছ্যাঁচোড় লেগেছে, বাউণ্ডুলে ভবঘুরে দেখেছে, কত কামিনী; ডাইনি-ডাকিনীর দেশ— শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা, এই কালো কুচকুচে শরীরটার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। কিছুই হয়নি দলটার। সেবার বীরভূমের এক মাঠে কয়েকটা শুয়োর চোরকে কী মার! দলটা টের পায় কার কোন মতলব। সর্দার মাঝে মাঝেই বলে, 'ঢোল সমুদ্দুরের তাবিজটা আছে'ত!'

আজও এই মুহূর্তে কোমরটা হাতড়ে প্রহ্লাদ স্বস্তিতে বিড়ি টানতে লাগল। ভাবল কয়েকবছর আগে এই ঢোল সমুদ্রের তাবিজ কাছে পেলে ফৌজের চাকরিটা যেত না। ঘরে ফিরেও কি দাদার অমন চাবুক খেতে হত? ঘরের কথা মনে আসতেই চিন্তা ফিকে হয়ে যায়। হৃদয় কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। হঠাৎ সর্দারকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'চোত মাসের শেষ কবে সর্দার?' সর্দার গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'শুয়ে পড় ... রাত ভোর হ'তে চলল।'

সকালে উঠে দল আবার কাজে বেরিয়ে পড়ে। এটাকে তাড়িয়ে, ওটাকে সরিয়ে হুড়ড়্ আওয়াজ করতে করতে মস্ত মাঠটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রহ্লাদের মাথায় মস্ত টোকা, হাতে লাঠি। ঘুরতে ঘুরতে অবাক চোখে এ দেশটার লোকজনের দিকে নজর করতে থাকে।

এই নিয়ে দু বছর হল সে দলে বেরোচ্ছে। অল্পবয়সে ফৌজে যোগ দেয়। বুড়ো বাপ অন্ধ হয়ে যাওয়ায় দাদা বলেছিল, 'এবার কাজ খোঁজ ... গরিবদের ঘরে কেউ বসে খায় না।' প্রহ্লাদ বরাবরের অভিমানী ও স্বাধীনচেতা। পাড়ার অনেকের কাছেই প্রিয়।

'লেখা-পড়া হবে নাত তা'লি?'

ওঘর থেকে বুড়ো বাপ জবাব দিয়েছিল, 'না না, গরিবের আবার বিদ্যের দরকারডা কী শুনি?' প্রহ্লাদের ঠোঁটজোড়া কী জবাব দিতে গিয়ে থরথর কেঁপে উঠেছিল।

তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফৌজে চাকরি। কিন্তু প্রহ্লাদের স্বাধীন মেজাজে তাও টিকল না। পালিয়ে এল। রাগে দাদা চাবুক দিয়ে পিটল। প্রহ্লাদ কাঁদল না এক ফোঁটা। কাজের ধান্দায় ঘুরতে লাগল। অবশেষে যুগল দাসের কাছে একমাস কাজ শিখে নেমে পড়েছে। দশবছরের দাদন। মাসোহারা পঞ্চাশ টাকা অন্ধ বাপের কাছে যুগল দাস পাঠিয়ে দেয়।

ঘুরতে ঘুরতে প্রহ্লাদ একসময় একটা পুকুরের কাছে ছায়ায় দাঁড়াল। জল পান করতে গিয়ে সে অবাক হয়ে যায়। লজ্জাও পায় খানিক। প্রতিটি মানুষ— কী ব্যাটাছেলে কী মেয়েছেলে উলঙ্গ জলে নামছে। পুরুষদের হাতপাগুলো কাঠি, পেটটা উঁচু। মেয়েরা মোটামুটি স্বাস্থ্যবতী। প্রহ্লাদ দৃশ্য দেখে দূরে সরে যায়। দেশের বাড়িতে মা-দিদিমার কাছে গল্প শুনেছিল এই পৃথিবীতে কোথায় ন্যাংটো দেশ আছে। মানুষ সেখানে উলঙ্গভাবে চলাফেরা করে। এই কি তবে সেই স্থান? কথাটা না জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত তার কৌতূহল নিবৃত্ত হচ্ছিল না। শেষকালে এক বৃদ্ধা তার একমাত্র সম্বল কাপড়খানি ছেড়ে স্নান সেরে চলে যাবার কালে, প্রহ্লাদ কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'বলো—'

'আপনারা সবাই বস্ত্র খুলে স্নান করেন দেখলাম — কারণটা কী?'

বৃদ্ধা তার দীনহীন মলিন মুখে ম্লান হাসি টেনে বেদনাটুকু ঢেকে বলল, 'আমরা সব যে গোপিনী বাবা .. কালাচোরা যে আমাদের বস্ত্র হরণ করেছিল।'

প্রহ্লাদ অবাক হয়ে শোনে। আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না! এলাকার অসাধারণ দারিদ্র্যের ব্যাপারটা বুঝতে পারে। গ্রামের লোকেরা প্রহ্লাদের চেহারাটাকে কালাচোরা আখ্যা দিয়েছিল। কীসের ভাবনায় মনটা তার নিবিড় হয়ে যায়।

সন্ধ্যার আগেই লোকগুলো পাঁশুটে মেষের দলটাকে তাড়াতে তাড়াতে আস্তানায় ফিরে এল। সর্দার গেছে লোকালয়ে। বড়োপাল, সোমরা এবং যাদব হাতমুখ ধুয়ে আবার শিশি, থলি ঝুলিয়ে চলল বাজারের দিকে। বসেছিল গুণিন আর প্রহ্লাদ। ওরা ফিরে এলে উনুনে আগুন দেবে।

লালচে, ছাইরঙা, কালো— নানা রঙের প্রাণীগুলো নিজেদের মধ্যে হুটোপুটি করছে। কচি কচি বাচ্চারা ধাড়িদের ঠ্যাঙের ভেতর মাথা গলিয়েছে। ঝাপটাঝাপটি, কোঁয়াৎ কোঁয়াৎ আওয়াজ। গুণিন চারিদিকে ঘুরে ঘুরে মৃদু লয়ে শিস দিতে থাকলে জানোয়ারগুলো ধীরে ধীরে ছুঁচলো মুখটা এগিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে।

প্রহ্লাদ দেখে বিশাল প্রান্তরটাকে। রুক্ষ, অসীম। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে ওঠে।

হঠাৎ দূর থেকে জনাচারেক মেয়েকে আসতে দেখা গেল। শ্লথগতি, লাস্যময়ী, পরস্পর গা ঠেলাঠেলি করে কীসের সব রসের কথা বলছে। প্রহ্লাদ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। গুণিনের কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত।

'কী করছিস ভিন্‌দেশের মানুষরা সব?' —

একটা বাচ্চা শুয়োর তির্‌তির্‌ করে মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটল। গুণিন লাঠি হাতে এগিয়ে যায়।

কালো কুচকুচে শরীরের একঝাঁক বুনো ফুল যেন মেয়েগুলো।

'তোমাদের চিনতে পারলেম না'ত?' প্রহ্লাদ হাসে।

একজন আর একজনকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'শোন লো মতি, কোন্‌ দেশের পুরুষ সব?'

মতির পিটোনো স্বাস্থ্য, পাটি করে চুল আঁচড়ান, ঈষৎ ভুরুটা কাঁপিয়ে বলল, 'তুই চুপ করতো।'

গুণিন এদের আগমনে খুশি হল না। কলস হাতে জল আনতে গেল।

প্রহ্লাদ ওদের বসতে দিল। মতি মৃদু হেসে বলল, 'তোরা কেমন দল সব, গান গাইতে লারিস?' একজন মতিকে ঠেলা দিয়ে চাপা হাসিতে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কালা কেষ্ট বাঁশি জানে কিনা জিজ্ঞেস করতো?' এতগুলো হাসির মাঝে প্রহ্লাদ কেমন অস্বস্তিবোধ করে। হেসে বলল, 'তোমাদের নিবাস?'

মতি বলে, 'হোথায় গো? ... ওই মাঠটা পেরিয়ে।'

এই মাঠটা পেরিয়ে, সর্দার যেখানে সওদা করতে যায়, সেখানে এদের বাস। জনাদশেক স্বৈরিণীর ঘর। অনেকেরই পড়ন্ত যৌবন। তাছাড়া এ তো বলতে গেলে পুরুষবিহীন দেশ। অভাবে, রোগে সব পৌরুষ হারিয়ে রোগা টিঙটিঙে হয়ে উঠছে। স্বৈরিণীদের তাই অভিসারে নামতে হয়। কোনোদিন পেট চলে, কোনোদিন চলে না।

প্রতিবার শুয়োর চরাবার দল হাজির হলে এরা আসে।

প্রহ্লাদ মতির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। 'কী দেখছ গো অমন করে?' প্রহ্লাদ বোকার মতো আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে বলল, 'না। এমনি!' মেয়েদের মুখগুলো থমথমে হয়ে ওঠে।

খানিক পরে সর্দার ফিরে আসে। স্বৈরিণীদের দেখেই মেজাজটা গরম হয়ে যায়। মোটা গলায় বলল, 'এখানে আসবেন না আপনারা।' গুণিনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এসব হচ্ছে কী গুণিন?' গুণিন প্রহ্লাদের দিকে কটমট করে তাকায়।

মেয়েরা উঠে গেল। যেতে যেতে মতি কোমর বেঁকিয়ে প্রহ্লাদের দিকে মুচকি হেসে ফেলল। প্রহ্লাদের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

খেতে বসে সর্দার গুণিনকে বলল, 'কাল-পরশু রওনা দেব গুণিন। আরও দক্ষিণে নাবব ... বন্যাডায় কেমন মার খেলাম! দুশো জানোয়ার নিয়ে বেরিয়ে মোটে পাঁচশো নিয়ে ফিরেছি।'

'রওনা দিলেই হল .. টোকা কাঁধে বাঁক নিয়ে আমরাও শোরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করে চলব।' গুণিন হাসে।

'নাঃ, আজকাল তোমরা বড্ড বেচাল করছ।'

বলেই সর্দার প্রহ্লাদের দিকে তাকায়। প্রহ্লাদ বিশেষ তোয়াক্কা করল না। পাশেই দুটো শুয়োরের মৈথুন দেখে বড়োপাল স্তব্ধ হয়ে থাকে। চোখজোড়া কাঁপে, নাকের মাথাটা নড়ে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মনের অগোচরেই ঘাসের বুকে পা ঘষতে থাকে। এই কথাবার্তায় তার মন নেই। গুণিন হঠাৎ দেখতে পেয়ে হেসে বলল, 'ও বড়োপাল?'

'উঁ —'

'মানুষের কয় জন্ম জান?—'

'না—'

'সাত জন্মের পর মুক্তি! শেষ জন্ম হল শোর চরানো। ওসব ভেবে লাভ নেই, এখন শোও।'

বড়োপালের নাক থেকে একটা মস্ত নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

পরদিন বিকালে প্রহ্লাদ খুঁজতে খুঁজতে মতিদের পাড়ায় হাজির। গতকাল মতির বিদায়কালের হাসিটা ভুলতে পারেনি।

কে একজন দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'মতি লো মতি! কালা-কেষ্ট যে তোর দোর খুঁজছে।' মতি উঠানে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল। বাটিতে জল, আয়না-চিরুনি, আলতার শিশি। তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল। প্রহ্লাদের সঙ্গে চোখাচুখি হতেই হেসে ফেলে। পাশের ঘরের দুটো মেয়ে রেগে বলে উঠল, 'মুখপুড়ির ঢং কত!'

দাওয়ায় বসতেই মতি এক বালতি জল এনে দিল। প্রহ্লাদ বলে, 'তোমার জলে পা ধোব কী করে? ... আমরা যে চাঁড়াল, শোর চরাই।'

'ধোওনা, সেতো আমার পুণ্যি!'

প্রহ্লাদ হেসে বলে, 'এমন বললে মনডা যে কেমন করে। ... আমরা যে পথের মানুষ, পথেই হারিয়ে যাব।'

মতি চোখ নামিয়ে বলল, 'মনের মানুষ যে পথে পথেই ঘোরে ....রাধি মুখপুড়িও পথের দিকে চেয়ে দিন কাটাত।'

এরপর দুজনে অনেক কথা হয়। প্রহ্লাদ কাঁপতে থাকে। হু-হু হাওয়া, অন্ধকার নামছে। হঠাৎ কাঁধে হাত রাখতেই মতি হেসে ওঠে।

'চলগো ঠাকুর, তোমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি। ... এমন করে আর মন টেকে না।'

'মোদের ঘর তো এ দেশে নয়! —'

'হোক ... তোমার সঙ্গে পথে পথেই নয় জীবনটা কাটাব।'

প্রহ্লাদ অবাক। মৃদু হেসে মতিকে বলে, 'তা হয় না। ... আমরা তো বেজাত, গাঁয়ের লোক ঘর করতে দেবে কেন?'

'তুমি তো ঠাকুর কালা কেষ্ট, রঙটুকু দেখেই বুঝেছিলাম। ... আমায় ফাঁকি দিও না।'

প্রহ্লাদ ভাবে একী জ্বালা! মতিকে নিয়ে সে কোথায় যাবে। যন্ত্রণা নিয়ে সে আস্তানায় ফিরে এল।

সর্দার বসেছিল অন্ধকারে; মেঘের টুকরোগুলোর পাশে। বিড়ির আগুনে অনুমান হয় চোখজোড়া ঘোলাটে, মদির। প্রহ্লাদকে বলল না কিছু, শুধু আড়চোখে ওর দেহটার দিকে নজর রেখে গেল।

আগুনের ছোবল নিভে গেছে। গুণিন মস্ত থালায় মাখছে আলুভাতে। প্রহ্লাদ একটা থালা ধুয়ে, পাখলে বসে পড়ল। কেউ কথা বলছে না; শুধু খাওয়ার শব্দ। হঠাৎ সর্দার বলল, 'গুণিন, তোমার বীরভূমের ওদল গাঁয়ের কথা মনে আছে?'

'আছে —'

'চাষি দুটোর কী হাল হয়েছিল?'

গুণিন চুপ করে থাকে। সর্দার নিজেই জবাব দিয়ে দিল, 'হাতের পাঞ্জাদুটো কেটে নেয়া হয়েছিল। আমি হলে চোখ দুটোও উপড়ে গরম জল ঢেলে দিতাম। ... ভয়ে অন্য চাষিরা কোনোদিন ধানগোলার দিকে চাইতে সাহস পেত না। ... এ হল বেতাল পাকাবার উপযুক্ত শাস্তি।'

সর্দার এবং প্রহ্লাদ পরস্পরের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকে। সেও ঘটনাটা জানে। বীরভূমের ওদল গ্রামে সেবার দেখেছিল গ্রামের কয়েকজন চাষি জোতদারের গোলা লুঠ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। শাস্তি হিসাবে প্রাণে না মেরে কিংবা থানায় না দিয়ে জোতদার প্রকাশ্যে তাদের পাঞ্জা দুটো কেটে নেয়। প্রহ্লাদ বোঝে ইঙ্গিতটা তার উদ্দেশে। তাকে নিয়ে নিশ্চয়ই সর্দারের মনে ভয়ঙ্কর তোলপাড় হচ্ছে। চরম শাস্তির কথা সর্দার ভাবছে। লোকটা পশু। দলের শৃঙ্খলা ছাড়া অন্য কিছু মনে আসে না।

প্রহ্লাদ খাচ্ছে। কোমরে ঢোল-সমুদ্রের তাবিজটার অস্তিত্ব অনুভব করে, আবার কটমট করে তাকায় সর্দারের দিকে।

সারা রাত ঘুম হল না প্রহ্লাদের। উন্মুক্ত প্রান্তরে হু-হু বাতাসের মধ্যে পড়ে থেকে নানান চিন্তায় হৃদয়টা তোলপাড় হতে থাকে। মতিকে যেন সে ভুলতে পারছে না।

পরদিন রোদে রোদে শুয়োর চরিয়ে, বিকেলের দিকে আবার মতির বাড়ি হাজির। উদাসভাবে মতি দাওয়ায় বসে ছিল। প্রহ্লাদকে দেখতে পেয়েই হেসে বলে, 'কী ভাগ্যি আমার! এস ঠাকুর।'

'ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লেম— কবে আবার দেখা হবে কে জানে?'

মতি জবাব দেয় না।

'আওড়-বাওড়ের মানুষ মোরা ... বেঁচে থাকলে ও বছর ...।'

মতি হঠাৎ প্রহ্লাদের পাজোড়া জড়িয়ে ফুঁপিয়ে উঠল, 'আমায় নে চল ... তোমার সঙ্গে থাকব ঠাকুর।'

'তা কেমন করে হয়? ... আমার দেশের অন্য আচার বিচার।'

মতি ঠোঁট ফুলায়। 'এই তোমার মনে ছিল, ঠাকুর?'

'তুমি থাকতে পারবে? ... মোরা দশ মাস শোর নে মাঠে ময়দানে থাকি। বর্ষাবাদলশীত মোদের শরীরের পর দে যায়। মনে সাধ হলেও বাড়ি ফেরা যায় না।'

মতি মাথা নাড়ে। সে পারবে। এদেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। আর তার কী আছে জীবনে?

থেকে থেকে সময় বয়ে যাচ্ছিল। আকাশে মেঘের ঘটা। বাতাস থমকানো। অন্ধকার যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে প্রহ্লাদ নিশ্বাস ছাড়ল।

'বেশ, তবে কাল দুপুরে ইস্টিশানে থেকো .. বিকেলের ডাকগাড়িতে চেপে বসব।'

'ডাকগাড়ি? কত দূর গো? ... সত্যি বলছ? ভুলে যাবে না তো?'

প্রহ্লাদ মাথা নাড়িয়ে বলল, 'না, গো না, অমন ভুলো মন নয় ... রদ্দুর চড়তে না চড়তে যেও ... টিকিটবাবুর ঘরের সামনে থেকো, আমি চলে আসব।'

মতির চোখজোড়া ভিজে। প্রহ্লাদের চোখেমুখে কীসের আশঙ্কা।

ওকে ফিরে আসতে দেখে সর্দার কোনো কথা বলল না। সেও আজ বিকেলে স্টেশনে গেছল। বীরভূমে প্রহ্লাদের সঙ্গে তার বচসা ও এখানে মতির ঘটনাটা 'তার' করেছিল যুগল দাসকে, জাবাব এসে গেছে। তাই জানতে গেছল।

প্রহ্লাদ খেয়েদেয়ে উঠতেই সর্দার আচমকা বলে উঠল, 'আজ শেষরাতে রওনা দেব, প্রহ্লাদ।'

'কোথায়?'

'আরও দক্ষিণে —'

'কেন?'

'বন্যায় ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে ... পালে আরও নতুন শোর আসুক ... যুগল দাস 'তার' করেছে।'

'আমাদের ঘরবাড়ি ডুবে গেল কিনা, সে খবর? ... বাপ ভাই-এর সংবাদ? তা আসেনি?'

সর্দার গম্ভীর হয়ে বলে, 'মালিকের সম্পত্তি হল শোর . তোমার বাপ ভাই-এর সংবাদ পয়সা খরচ করে 'তার' করবার কী দরকাব? বেঁচে-বর্তে নিশ্চয়ই আছে এক রকম।'

'আমায় তবে ছাড়ান দাও .. আমি টেবেনে চেপে বসি।'

সর্দাব ঘাড় বেঁকিয়ে কর্কশ মুখটা ঘোরাল। ভুষোকালিপড়া টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় লাগছে আরও নিষ্ঠুর।

'যে যাব খুশি দল থেকে চলে যাবে?' সর্দারের গলায় জ্বালা-ধরা হাসি।

'কেন. চোত মাসের পর বোশেখ জষ্টি ছুটি' — প্রহ্লাদের গলাটা গরম হয়ে ওঠে।

সর্দাব অদ্ভুত হাসি তুলে বলল, 'ছুটি? দাদনের ছুটিতো দশ বছরের আগে নয়।'

প্রহ্লাদ মুহূর্তের জন্য থমকে থাকে। শেষে টোকার মধ্য থেকে কাপড় জামার পুঁটলিটা টেনে বলল, 'দেখো, তবে যেতে পারি কিনা।'

একবার কোমর হাতিয়ে ঢোল সমুদ্রের তাবিজটা দেখে নিল। সর্বশক্তিমান সে। সর্দারের মতো কত বদরাগী বোয়াড়া লোক পথে-ঘাটে টিট করেছে। এটা কোমবে থাকলে ভয় কী তার? সর্দার ছুটে এসে পথ আগলাতেই প্রহ্লাদ বলে, 'ছাড়ো. যেতে দাও।'

পাশ কাটিয়ে দু পা যেতেই সর্দার জাপটে ধরল। প্রহ্লাদ চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাড়ো।'

শেষে লাফ দিয়ে চেপে ধরল সর্দারের গর্দানটা। যেমন করে বীরভূমে দুটো ছিঁচকে শায়েস্তা করেছিল। আচমকা সর্দার নীচে পড়ে যায়। প্রহ্লাদের মূর্তিটা ভয়ানক। গল্লাটা চেপে সরোষে মাটিতে ঠুকে দিতে দিতে বলল. 'এইবার আমি চললাম.... আটকাও।'

গুণিন ছুটে এল। বড়ো পাল বলল, 'কী সব্বনাশ! তোমার সব খেপে গেলে যে!'

সোমরা চেঁচিয়ে উঠল, 'ছেড়ে দে প্রহ্লাদ, সব্বনাশ, করিসনি।'

উন্মুক্ত প্রান্তরে চলছে দাপাদাপি। শক্ত কাঁকুরে মাটি এবং দগ্ধ ঘাস দলে মলে গেল। হঠাৎ সর্দার এক ঝটকায় উঠে পড়ে। প্রহ্লাদ গড়িয়ে যায়। বাঘের মতো বুকটা খামচে এবার সর্দার চেপে বসল। আওয়াজ উঠল গোঁ গোঁ।

শুয়োরের পাল নিশ্চুপ। শুধু একটা বাচ্চা ভয়ে মায়ের দুধের বাঁটে মুখ লাগিয়ে চুকুচুক আওয়াজ করতে লাগল। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা বাতাসের ঝাপটা জানান দিয়ে গেল জল নামছে।

সর্দার ডেকে উঠল, 'গুণিন ... ছুরিখানা দাও!' গুণিন বুঝেছে সর্বনাশ। সর্দারকে সে বহুদিন থেকে চেনে। এবার কণ্ঠনালিটা ফেড়ে দিয়ে, দল চলে যাবে। পড়ে থাকবে প্রহ্লাদের দেহ। গুণিন তাই হাতজোড় করে বলল, 'একি সর্দার! তুমিও অমন বেচাল হয়ে গেলে?'

'তোমার ওদল গ্রামের কথা মনে নেই?'

এবার গুণিনও একটু খেপে যায়। 'ছেড়ে দাও সর্দার! অমন করলে কেউ শুয়োর পাল নিয়ে বেরোবে না।'

প্রহ্লাদ ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে। শক্ত হাঁটুর চাপে বুকটা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। চোখজোড়া ঠেলে বেরোচ্ছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সে যেন গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ গুণিনের মুখের দিকে তাকিয়ে সর্দার বলল, 'তুমি বলছ? ... বেশ! তবে একদম ছাড়তে নেই।'

নীচে নেমে এসে তলপেটের একপাশে এমন কায়দায় দুটো চাপ দিল, প্রহ্লাদের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সর্দার পা দিয়ে একটা গুঁতো মেরে উঠে পড়ে।

এরপর বৃষ্টি নামল। রাত্রির মেঘ রাঢ়ের মাটিতে বর্ষণ ঢালে। সঙ্গে বাতাস। ক্ষণেক আগের রুক্ষ মল্লভূমিটুকু পিছল হয়ে ওঠে। আচ্ছাদনহীন বিশাল প্রান্তরে পাঁশুটে মেঘের টুকরোটার পাশে জীববিবর্তনের উন্নততম পর্যায়ের কয়েকটি প্রাণী জল-বাতাসে একাকার হয়ে গেছে।

শেষরাতের দিকে দল এগিয়ে চলেছে। টোকার পর বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা। অন্ধকার। কাঁচা সড়ক ধরে স্টেশন পেরিয়ে নেমে যাবে দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে। রাঙাধুলোর কাদা জড়িয়ে তুর্‌তুর্‌ করে চলেছে লোমভেজা শুয়োরের পালটা। প্রহ্লাদের কাঁধে বাঁক, মাথায় টোকা, হাতে ভুষোপড়া টিমটিমে হ্যারিকেন। ক্লান্ত শরীরে থপথপ করে চলেছে।

ক্রমে লোকালয় ছাড়িয়ে, লাইন পেরিয়ে দলটা ঢালু মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। অন্ধকার, দূরে সিগন্যালের লাল আলো, অস্পষ্ট টিকিট ঘরটার দিকে নজর পড়তেই প্রহ্লাদ থমকে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই ভোরের আলো ফুটলে ওখানে একজন দাঁড়িয়ে থাকবে! হৃদয়টা কে যেন খামচাতে লাগল। হাত দিয়ে কোমরটা অনুভব করল। অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে কী যেন ঝুলছে। কোনো বিশ্বাস নেই আর তার। একটানে ছিঁড়ে ঢোল সমুদ্রের তাবিজটা হাতের মুঠোয় পিষতে লাগল। তারপর রাগে দূরে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারে। যেখান থেকে কোনোদিন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দুলে উঠল হাতের আলো, গায়ে এল বর্ষার ছাঁট, বাঁকটা কাঁধবদল করে মাঠ ভেঙে সেও চলল দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে।



সময়ের অঙ্ক



তৃষিত বর্মণ

ঘরের বাইরে মরা বিকেলের ঝিম-মারা আলো। সদ্য-খোলস-ছাড়া কালনাগিনীর মতো আঙুরের খসখসে কোমরের অনেকটাই এখন খোলা। সেদিকে তাকিয়ে নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো বুঁদ হয়ে বসেছিল গণেশ সাঁতরা। যেমন আরও অনেক সন্ধে থাকে।

বৃন্দাবন দাসের দো-চালার ঘরের ভেতর একখাবলা অন্ধকার। আঙুরের বেতের মতো শরীরে লাল ডুরে শাড়িটা পেঁচিয়ে নিতে সেটা যেন আরও হিলহিলিয়ে উঠল আধো অন্ধকারে। কপাটা দুটো ভেজানো। ঘরঘরে গলায় গণেশ বলল — আলোটা জ্বেলে দে আঙুর। তোকে একটু প্রাণভরে দেখি।

কিঙ্করবাটিতে অনেকদিন ইলেকট্রিক এলেও আঙুরের মাটির ঘরে আলো ছিল না। অবস্থার গতিকে থাকার কথাও নয়। এখন খোলার চাল থেকে ঝোলানো টিমটিমে আলোটা সামনের মণ্ডল বাড়ি থেকে ধার করে টানা। আপাত বে-আইনি।

কিন্তু তাতে কী আসে যায়? এখানকার ইলেকট্রিক কো-অপারেটিভের লাইনম্যান গণেশ সাঁতরা তো আঙুরের আঁচলে বাঁধা। বাইরের চটক আর গা ঘেঁসে বসা দুটো চটুল কথাতেই সে আজ দু'বছর ধরে নাচাচ্ছে গণেশকে। দুটো পয়েন্ট বাবদ দশ-দশ কুড়িটা টাকা যে আঙুর প্রতি মাসে গুনে মণ্ডলগিন্নির হাতে দিয়ে আসে, সেটাও ওঁ গণেশায় নমঃ।

মির্জাপুর-বাঁকিপুরে একটা কল ছিল। সেটা সেরে ভরসন্ধেবেলা সাইকেলটা বৃন্দাবন দাসের মাটির দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে গণেশ ঘরের ভেতর বসেছিল জম্পেশ মেরে। দু-মাস হল পুজো পার। তবু শীত যেন জব্বর আড়ি দিয়েছে। শুধু সন্ধে নামলেই মাথার ওপর পাতলা ধোঁয়ার চাদর।

বৃন্দাবন আপাতত বাড়ি নেই। এ সময়টা কোনোদিনই সে থাকে না। কালীতলার মোড়ে হাবুলের চায়ের দোকানে যে জমাটি আড্ডাটা বসে, বৃন্দাবন সেখানকার নিয়মিত খদ্দের। এর মধ্যে যদি দলে পড়ে কোনোদিন চার নম্বর রেলগেটের নীচে পেল্লাদের ঠেকে গিয়ে বসে তো সেদিন আর সময়ের হুঁশ থাকে না। দু-পাত্তর চড়িয়ে দিলটাকে সিরাজ করে বৃন্দাবন যখন টালমাটাল পায়ে ঘরে ফেরে, তখন ভাগ্য সত্যিই তার সঙ্গে মিরজাফরের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করে। লটপটে পা দুটো নিয়ে উঁচু দাওয়ায় উঠতে গেলে অত রাতে আঙুরকেই হাত বাড়াতে হয়।

গণেশের কথা শুনে ফিক্ করে হাসল আঙুর। শরীরের ভাঁজে একটা গা-ছমছমে ঢেউ তুলে বলল -- দেকে দেকে বুঝি আশ আর মেটে না? বলে হাত দিয়ে গণেশের চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর ছেড়ে। চৌকি থেকে উঠে গণেশ খপ্ করে আঙুরের হাতটা চেপে ধরে তাকে কাছে টানতে চাইল। দুটো আঙুল দিয়ে গণেশের নাকটা আলতো নেড়ে দিয়ে আঙুর বলল — তর্ সইছে না বুঝি? ছাড়। আগে চা-টা বস্যে আসি।

এখন সবে সন্ধেরাত। বৃন্দাবনের ফিরতে সেই রাত নটা। গণেশের হাতে এখন অঢেল সময়। তারই খানিকটা না হয় এমনিই খরচা হল? দিলদরিয়া মেজাজে বেহিসেবি হয়ে সে আঙুরকে বলল — আচ্ছা যা। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিস।

বৃন্দাবন দাসের দো-চালায় রান্নাঘর বলে আলাদা ঘর নেই। দাওয়ার এক কোণে দরমা- ঘেরা মেঝেয় পাশাপাশি দুটো মাটির উনুন পাতা। কাঠকুটোর আগুনে তিন কাপ চায়ের জল চাপিয়ে ঠোঁট টিপে নিজের মনে হাসছিল আঙুর। আঠারোতে বিয়ে হয়েছিল তার। এখন বাইশ। অথচ এই চার বছরে এখনও কোনো ছেলেপুলে হল না আঙুরের।

ঠিকমতো হিসেব ধরলে না হওয়ারই কথা। কেননা সে বৃত্তান্ত আঙুর আর বৃন্দাবন ছাড়া আর কেউ জানে

না। চার বছরে বৃন্দাবনকে সে চারবারের জন্যেও কাছে ঘেঁসতে দেয়নি। বয়সের অনেক ফারাক দুজনের। তাছাড়া আঠারো বছরের একটা তরতাজা মেয়ে ...।

এখনকার কথা থাক। আগের কথা আগে বলা দরকার। মোট কথা আঙুরের বিয়ের ব্যাপারে কোনো কিছুই তার ভায়েদের কাছে বাধা বলে মনে হয়নি। বাপ অনেকদিন গেছে। এ ঝুটঝামেলা ঘাড় থেকে যত তাড়াতাড়ি নামে, ততই ভালো। শুধু বড়ো ছেলের গলগ্রহ বিধবা মা মৃদু আপত্তি তুলে বলেছিল — অমন ফুটফুটে সোন্দর চেহারা দেকেই তোদের বাপ ওর নাম রেখেছিল আঙুর। ওর তো রাজরানি হবার কতা বাবা।

তা তোমার সেই রাজপুত্তুর জামাইটিকে ধরে আনলেই তো পারো? কে বারণ করেছে? বড়ো ছেলে সাধুরাম গজগজ করে, কিঙ্করবাটির বেন্দাবন দাস কি খারাপ পাত্র? বয়সটাই যা একটু বেশি। নিজের দো-চালা ঘর। বিঘে দুয়েক ধানি জমি আছে। তিনকুলে কেউ নেই। আঙুর আমাদের সুখেই থাকবে।

হ্যাঁ, খু-উ সুখে আছে আঙুর। মায়ের কথামতো রাজরানি সে হয়নি বটে, তবে কিঙ্করবাটি গ্রামের এতৎ অঞ্চলে সে রানি বই কি!

ভাবতে ভাবতেই চা তৈরি। ইচ্ছে করেই সে একটু বেশি সময় নিচ্ছে। রান্নাঘরে আগুনের সামনে বসে আঙুর সময়ের অঙ্ক কষছিল। বছর দুয়েক হল, সে এই নতুন খেলায় মেতেছে। গ্রামের মাতব্বর মদন বেরা এসে পড়ল বলে।

ইদানিং গ্রামেগঞ্জে সাক্ষরতার জব্বর ঢেউ উঠেছে। কিঙ্করবাটির ঘরে ঘরে এখন অক্ষর পরিচয়ের জোয়ার। সেই সুবাদেই আজ বছর দুয়েক হল মদন বেরার এখানে আনাগোনা। মাতব্বর হিসেবে এ দায়িত্ব সে স্বেচ্ছায় নিয়েছে। একদিন সন্ধেবেলা নেশাগ্রস্ত বৃন্দাবনকে সে বলেছিল — আঙুরের মধ্যে জিনিস আছে বেন্দাবন। ঘসে মেজে নিতে পারলে চমকাবে।

তিন কাপ চায়ের এক কাপ কাঁসার ঘটিতে ছেঁকে রেখে দুটো হাতল-ভাঙা কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল আঙুর। গণেশ উলটে কাত মেরে আছে চৌকিতে। চা-টা হাতে ধরিয়ে দিয়ে আঙুর ঠোঁট টিপে হেসে বলল — আগে খেয়ে নাও দিকি।

আঙুরের বলার ভঙ্গিতে একটা প্রবহমানতার সুর ছিল। যা শুনে মনে হতে পারে চা-টা খাওয়ার পর যেন অবশ্যম্ভাবী কিছু ঘটবে। গণেশ ঝটিতি উঠে বসল। বে-হিসেবিপনায় অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। নয় নয় করে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল সে এখানে এসেছে। বাইরে দেওয়ালের গায়ে সাইকেল দাঁড় করান। হলেই বা অন্ধকার। দিনকাল ভালো নয়। পাঁচজনে পাঁচরকম ...। যন্ত্রপাতির ব্যাগটা সঙ্গে আছে, তবু রক্ষে।

দু চুমুকেই চা শেষ। বাঁশের আড়া থেকে পেঁচিয়ে নেমে আসা চল্লিশ পাওয়ারের আলোতে আঙুর দেখল, গণেশের কুতকুতে চোখ দুটো বে-বাড়ির টুনি বাল্বের মতো জ্বলছে।

মদন বেরা আজ এত দেরি করছে কেন? খালি কাপ দুটো তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে যাচ্ছিল সে। তার আগেই কপাট আটকে উঠে দাঁড়িয়েছে গণেশ। দু-বছর ধরে সে আঙুরবালার পায়ে পায়ে ঘুরছে। আজ একটা হেস্তনেস্ত সে করবেই।

আঙুর বিন্দুমাত্র ঘাবড়াল না। গণেশের চোখে চোখ রেখে বলল — অত তাড়া কীসের? ঘরে তো আর পরিবার বসে নেই। তোমার বেন্দবনদার আসতে এখনও ঢের দেরি। দাঁড়াও, কাপ দুটো আগে রেকে আসি।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের অন্ধকার উঠোনে সাইকেলের ঘন্টি বাজল। শুনে গণেশের দুটো চোখে সর্বস্ব হারানোর হতাশা। একপলক আঙুরের হাসি হাসি মুখের দিকে অবাক চোখে চেয়ে সে ফিরে এল কঠোর বাস্তবে। ফোলিও ব্যাগের ভেতর থেকে চট করে বেরিয়ে এল ইনস্যুলেটেড প্লায়ার্স, টেস্টার, ব্ল্যাক টেপ ইত্যাদি। তারপরই যে-মানুষটা যন্ত্রপাতি গোছাতে গোছাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আঙুরকে উদ্দেশ্য করে বলল, তার লিক করছিল। ব্ল্যাক টেপ মেরে দিয়েছি। আর সট্ হবে না — সে আঙুরবালার প্রেমিক নয়। কিঙ্করবাটি রুর‍্যাল ইলেকট্রিক কো-অপারেটিভের লাইনম্যান গণেশ সাঁতরা।

মেজাজ বেহদ্দ খারাপ। তবু দেওয়ালের গা থেকে সাইকেলটা নিতে নিতে সে জিজ্ঞেস করল— কী মদনদা, ভালো আছেন? আধো-অন্ধকার উঠোনে মদন বেরার মুখের রেখাগুলো পড়া যাচ্ছিল না। হাবেভাবে মনে হল, ঠিক এই সময়ে সে অন্য কারো মুখোমুখি হতে চায়নি। গলায় যথাসম্ভব মাতব্বরি গাম্ভীর্য এনে বলল — চলছে। তোর কাজ হল?

সাফাই গাইতে গিয়েও থেমে গেল গণেশ। মদন বেরা হঠাৎ এসে 'কাবাব মে হাড্ডি' না হলে কী হত, বলা যায় না। আশাভঙ্গের হতাশায় তার মাথায় আগুন জ্বলছিল। কিঙ্করবাটিতে এত রকম সমস্যা। সে সব ছেড়ে মদন বেরা-ই বা কেন এই ভরসন্ধেবেলা আঙুরের উঠোনে?

ব্যাজার মুখে সাইকেলে উঠতে উঠতে গণেশ বলল — বেন্দাবনদার আলোটা সট্ করছিল। ঠিক করে দিইচি। অন্ধকার রাস্তাতেও তার চোখের সামনে আঙুরের ছিপছিপে শরীরটা ভাসছিল। পাশাপাশি মদন বেরার ভাল্লুকের মতো মুখটা মনে পড়তেই খাটো গলায় একটা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে উঠল গণেশ।

দুই

তিন গেলাস শেষ। তবু নেশাটা যেন আজ ঠিকমতো জমছে না। বাঁশের মাচায় বসে মাটির দেওয়ালে পিঠ রেখে ঝিম-মারা বৃন্দাবন জিজ্ঞেস করল — তেলিপুকুরের বাগেরা কি মালে নুন দিতেচে নাকি রে পেল্লাদ? ক্যামন নোনতা পারা নাগচে?

বলে চার নম্বর গেলাসটার দিকে হাত বাড়িয়েছে কি বাড়ায়নি, পেল্লাদের ঠেকেব মাটি দেওযাল কাঁপিয়ে গুড়মুড় শব্দে সি ছশো সাতষট্টি আপ হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন লোকাল ছুটে বেরিয়ে গেল। দেরি হলে বেজায় চেল্লামেল্লি করে আঙুর। বলে — যে ভাগাড়েই থাক, রাত নটার মধ্যে ঘরে এসবে। নইলে দরজা খুলবনি আমি। এই পষ্ট বলে দিনু।

এখানেও আঙুরের সময়ের অঙ্ক খেলা। মাতাল হোক আর যাই হোক, তবু তো স্বামী। চৌকিতে পাশাপাশি বসে অক্ষর চেনাতে চেনাতে যখন মদন বেরার নিশ্বাসে আঙুর আগুনের তাপ পায়, কিংবা আঙুরের চক-পেনসিল-ধরা হাতটা যখন মাতব্বর স্লেটের ওপর অনাবশ্যক জোরে চেপে ধরে রাখে, তখন অন্ধকার উঠোনে বৃন্দাবনের খুক্ খুক্ কাশির আওয়াজে বুকে বল পায় সে। মনে মনে ভাবে, যাক মানুষটা তাহলে ঠিক সময়েই এয়েচে। তখন সাত তাড়াতাড়ি দবজা খুলে, মাতাল স্বামীকে হাত ধরে উঁচু দাওয়া পার করে ঘরে ঢোকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সতী-সাধ্বী আঙুরবালা।

কোনোদিন মাত্রা বেশি হয়ে গেলে লটপটে শরীরটা বৃন্দাবনের একা সামলাতে পারে না সে। মুখে রাজ্যের বিরক্তি আর বুকে আগুন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মাননীয় মাতব্বরকেই তখন আঙুর হুকুম করে বসে — পায়ের দিকটা একটু ধরুন তো। মানুষটাকে চৌকিতে শুইয়ে দিই।

ভূতে-পাওয়া মানুষেব মতো আচরণ করে মদন বেরা। যেন আঙুরেব অঙ্গুলি হেলনেব ওপর তার জীবন-মরণ সব নির্ভর করছে। যে জায়গাটায এতক্ষণে তার শোওয়ার কথা, সেই চৌকির ওপরই বৃন্দাবনের ছিন্নভিন্ন, দুর্গন্ধযুক্ত শরীরটা তুলে দিতে দিতে একটা অশ্রাব্য গালি পাড়ে মদন বেরা নিজের মনে।

আঙুর ততক্ষণে হাঁটুমুড়ে উঠে বসেছে চৌকিতে। বেহেড স্বামীর পাশে। সময়েব অঙ্ক খেলায় সে দশে দশ। মনের গভীরে কোথায় যেন মাতাল স্বামীর প্রতি সূক্ষ্ম একটা বোধ কৃতজ্ঞতা আর সহানুভূতিতে মাখামাখি।

লাল ডুরে পাড় শাড়িটা সে আজই ভেঙেছে। তবু একটুও মায়া না করে তারই চকচকে আঁচল দিয়ে পরম যত্নে সে মুছিয়ে দেয় বৃন্দাবনের কষ বেয়ে গড়িয়ে আসা তরল নির্যাসটুকু।

দিনকাল আর আগের মতো নেই। তাই গ্রাম উন্নয়নের অফিসে বসলে মদন বেরা কিঙ্করবাটির তাবড় তাবড় মানুষকেও চেয়ার এগিয়ে দেয় না। সেই মানুষটাই বৃন্দাবনের চৌকিব সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, উজবুক মাতালটা ঠিক এই সময়েই কোত্থেকে হাজির হল, কে জানে। সারাদিন টো টো করে এলাকার উন্নতির জন্যে হাড়ভাঙা খাটুনির পর ঘরে ফিরে তার সুখ নেই। দুটো বিইয়ে পরিবার শুকনো কাঠ। হাজার নেঙড়ালেও রস বের হয় না। তেমনি তিরিক্ষে মেজাজ আর সন্দেহ। বলে, গ্রাম উন্নয়ন না ছাই। তোমাকে আমি চিনি না? তুমি ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছ।

কিঙ্করবাটির ক্ষমতাশালী মাতব্বর মদন বেরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো বৃন্দাবন দাসের অন্ধকার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দু-বার জিভ চাটল। বছরখানেক ধরে কিছুতেই সে আঙুরবালাকে কব্জা করতে পারছে না। দিনে আসার উপায় নেই। রাতে কিছু না কিছু বিপত্তি এসেই যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই এই হিসেবের ব্যাপারটা ইদানিং ভাবাচ্ছে মদন বেরাকে।

দাওয়ার কপাট দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মাতব্বর অদ্ভুত চোখে আঙুরের দিকে তাকাল। আঙুর এখন নিরাপদ দূরত্বে। তার স্বামীর কাছাকাছি। নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে মদন বেরা হিস্‌হিসে গলায় বলল — পরশু আসবখন। তৈরি থাকিস।

সামনে কেষ্ট মণ্ডলের বাড়ির বাইরের আলোটা জ্বলে উঠল। সে আলোর অনেকটাই এসে পড়ে বৃন্দাবনের উঠোনে। কেষ্ট মণ্ডল দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছে। আবার সেই অঙ্ক কষা, হিসেব মেলানোর খেলা। আঙুর চৌকি থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল — পরশু কখন?

বলতে গিয়েও কী ভেবে নিজেকে সামলে নিল মাতব্বর। আগের এবং আজকের ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলোর

মধ্যে একটা পারস্পরিক যোগসূত্র খুঁজতে খুঁজতে সে চিন্তিত গলায় বলল — কাজের মানুষ। সময় কী করে বলব? তবে আসব নিশ্চয়। আবছা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মদন বেরা নেমে গেল বৃন্দাবন দাসের দাওয়া ছেড়ে।

তিন

সন্ধের ঝোঁকে বৃন্দাবনকেই যাই মনে হোক না কেন, দিনের আলোয় সে অন্য মানুষ। বাঁধা-ধরা কোনো রোজগার তার নেই। যে দু-বিঘে ধানি জমি দেখে আঙুরের ভাইয়েরা তার সুখ কল্পনা করেছিল তার সামান্যই এখন অবশিষ্ট। নিজের হাল-বলদ রাখার সামর্থ্য নেই। তাই বাকি এক বিঘে জমি হারু মোড়লই চাষ আবাদ করে। তা বাদে জোগাড়ের কাজ মাসে পনেরো-বিশ দিন। আঙুরের সব সুখ তাই বৃন্দাবন দাসের ছোট্ট উঠোন পার হয়ে কিঙ্করবাটিব বাসরাস্তা ছাড়িয়ে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ...।

মাস আষ্টেক আগের কথা। বৃন্দাবনই জোর করে একদিন আঙুরকে নিয়ে গিয়েছিল সেন্টারে। কদিন ধরে শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিল না। খিদেতেষ্টা বোধ বলে কিছু নেই। যা খায়, হজম হয় না। বমি হয়ে বেরিয়ে আসে। তাছাড়া তিন বছরের ওপর হয়ে গেল, ছেলেপুলে কিছু হচ্ছে না। সব মিলিয়ে বৃন্দাবন বলেছিল — শুনেচি, সেন্টারে লতুন ডাক্তার এয়েচে। মাখন, বিশু, তারক ওরা সব বলতেছিল। এ ডাক্তারের নাকি খুব হাতযশ। ছুঁলেই রোগ সেরে যায়। পয়সা তো লাগবেনি। চল তোরে একবার দেকো আনি।

তা কথাটা বেন্দাবন অনেয্য বলেনি। নতুন ডাক্তার একবার ছুঁতেই আঙুরের দেহের রোগ কিছুটা সারল বটে, কিন্তু সে ঘরে ফিরে এল বুকের মধ্যে এক নতুন দগদগে ক্ষত নিয়ে।

বেডে শুইয়ে ডাক্তার যতক্ষণ আঙুরকে পরীক্ষা করছিল, সে হাঁ করে চেয়ে ছিল নতুন ডাক্তারের সোন্দরপানা মুখটাব দিকে। চোখের কোল টেনে, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাক্তার যখন আঙুরের শরীরে রক্তের পরিমাণ বোঝার চেষ্টা করছিল, তখন সব রক্ত এসে জমা হয়েছিল তার মুখে। একটা হালকা অথচ মিষ্টি পুরুষালি গন্ধ লাগছিল আঙুরের নাকে। তার একুশ বছরের শরীরটা যা সে বৃন্দাবনকেও কোনোদিন ভালো করে ছুঁয়ে দেখতে দেয়নি, অবলীলায় সেটা নতুন ডাক্তারের হাতে সঁপে দিয়ে আশ্চর্য এক ভালোলাগায় ভাসছিল সে।

আঙুরের জীবনে কোনো রক্তমাংসের মানুষকে সত্যিকারের ভালোলাগা সেই প্রথম। যা প্রকাশের কোনো ভাষা বা আধুনিক ভঙ্গি তার জানা ছিল না। বার দশেক যাতায়াতের পর তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, হপ্তার কোন কোন দিন নতুন ডাক্তার সেন্টারে বসে। সোম, বুধ, শুক্রবার সেই তিনটে দিন আঙুর উন্মুখ হয়ে থাকত সব কাজ ফেলে

ওয়ার্ড এর বাইরে বারান্দায় বেঞ্চিতে বসে থাকত বৃন্দাবন। সব কথা তার জানার কথা নয়। তবু তারই মধ্যে সকাল আটটায় হাসপাতাল যাওয়ার নামে আঙুরের অত সাজগোজ দেখে তার ঘোলাটে চোখেও ছায়া পড়েছিল। খালি গায়ে ফতুয়া চাপাতে চাপাতে একদিন সে বলেছিল — কী ব্যাপার, বল দেকি? এত সেজেগুজে তুই সেন্টার যেতেচিস না বে বাড়ি? এ্যাঁ?

আঙুরের পরনে পাটভাঙা ডুরে শাড়ি। পাতা পেড়ে চুল বাঁধা। চোখে কাজল। কপালে কাচপোকার টিপ। পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় বেন্দাবনের মনে হল, একটু খুশবুও যেন ছাড়ল?

তিন চার বারেব পর থেকেই অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল আঙুর। দু-চারটে কথাও বলত নিচু গলায়। নতুন ডাক্তাব শুনত আব পরীক্ষা করত। আদেখলার মতো হাঁ করে সে চেয়ে থাকত ডাক্তারের মুখের দিকে।

কী সোন্দর কাটা কাটা মুখ নাক চোখ নতুন ডাক্তারের। ঠিক যেন ঠাকুরের মতো। এমন মানুষকে কি হাসপাতালে মানায়? মন্দিরেই যেন ভালো।

দিনবাত্তির গণেশ আর মদন বেরার মতো নর্দমার পোকা ঘেঁটে ঘেঁটে সত্যিই বুঝি একদিন আঙুরের মাথায় ভূত চাপল। কানে নল লাগিয়ে বুক পিঠ পরীক্ষা করছিল ডাক্তার। জিজ্ঞেস করল — কাশলে কোথায় ব্যথা হয়?

দুঃসাহসিনী আঙুর নিজের বুকের ওপর নলসুদ্ধ ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরে বলল — এই খেনে।

আঙুরের দৈহিক সৌন্দর্য হেলাফেলার নয়। ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল নতুন ডাক্তারের। জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল — তোমার সঙ্গে কে এসেছে? তোমার স্বামী? হতবুদ্ধি, হেঁটমাথা আঙুর ঘাড় নাড়ল — হ্যাঁ। ডাক্তার বলল — তাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও।

তলব পেয়ে সেই প্রথম হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করে ডাক্তারের টেবিলের সামনে হাজির হল বৃন্দাবন।

চোখ তুলে তাকিয়েই চমকে উঠল ডাক্তার। আঙুরবালা দাসীর এহেন আচরণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যেন স্পষ্ট লেখা আছে সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা তার স্বামীর চেহারায়।

কাগজপত্র সব সই করে বৃন্দাবনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নতুন ডাক্তার বলল — তোমার বউ ভালো হয়ে গেছে। আর সেন্টারে আনার কোনো দরকার নেই, বুঝেছ?

চার

বৃন্দাবনের বাকি দশ কাঠা জমিতে এবার আলু চাষ করেছিল হারু মণ্ডল। তা এমনিতেই পোড়া কপাল, নীল আকাশ থেকে ছুটে এসে যেন বাজ পড়ল বেন্দাবনের মাথায়।

মাঘের মাঝামাঝি। শীতের দিন। হঠাৎ কোত্থেকে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে, এক আধ ঘণ্টা নয়, জের চলল টানা দু-দিন। দেখতে দেখতে আলুখেতে হাঁটুজল। মাটি কেটে সেই জল যে তাড়াতাড়ি বের করবে, সে উপায় নেই। পাশে অন্যালোকের জমি।

সকালে হারু মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে কোদাল কাঁধে বেন্দাবন ছুটল মাঠে। যদি কিছু বাঁচানো যায়। কিশোরী চারাগুলো সব মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। জলেকাদায় মাখামাখি। কাঁচা, অপুষ্ট ছোটো ছোটো আলুগুলো মাটি ফুঁড়ে উঁকি মারছে বাইরে। যেন বুঝে নিতে চাইছে, এ ষড়যন্ত্রের হোতা কে? কোনো অবিমৃষ্যকারী মানুষ? না খেয়ালি প্রকৃতি?

হঠাৎ-আসা ঝড়বৃষ্টিতে কিঙ্করবাটির ইলেকট্রিকের তার সব ছিঁড়ে একাকার। কাল রাত থেকেই সব অন্ধকার। খবর এসেছে, বলরামবাটিতে গাছ পড়ে লাইনের তার ছিঁড়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। বেলা দুটো নাগাদ দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে গণেশ ছুটল অকুস্থলে। আজ সন্ধের মধ্যে মেরামত না হলে অফিসে হামলা হতে পারে।

হাটতলা ছাড়াতেই অধীর পাত্রের সঙ্গে দেখা। সাইকেল নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে সে ছুটছে। গণেশ তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল — কী ব্যাপার গো অধীরদা? উড়তে পুড়তে কোতায় চলেচ?

সাইকেল দাঁড় করিয়ে গণেশের সঙ্গীদের এগিয়ে যেতে দিল অধীর। তারপর ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বলল — খবর খুব খারাপ। মদন বেরার বউ দুপুরে বিষ খেয়েছে। আমি সেন্টারে যাচ্ছি। অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে। চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। মদনদা বলেচে, কতাটা যেন পাঁচকান না হয়, দেকিস।

অধীর পাত্র চলে গেলে কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল গণেশ। একা ওর মনে হল, ছোটো ছোটো দুটো বাচ্চা রেখে যে মেয়েমানুষ এভাবে সংসার ছেড়ে চলে যেতে চায়, না জানি তার কত দুঃখ।

মদন বেরাকে উদ্দেশ্য করে হাওয়ায় কতকগুলো গালাগালি ভাসিয়ে দিল সে। শালা, বুড়ো ভাম কোথাকার গ্রামের মাতব্বর বলে যেন মাতা কিনে নিয়েচে। ঘরে বউ-বাচ্চা। তবু অন্য মেয়েমানুষে ছোঁকছোঁকানি গেলনি।

দু-পাশে বিধ্বস্ত আলুক্ষেত। সন্ধের মুখে বলরামবাটি থেকে ফেরার পথে মদন বেরাকে তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে অক্ষম আক্রোশে ফুলছিল গণেশ। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা সম্ভাবনার কথা তার মনে আসতেই সব বিরসতা কেটে গেল এক মুহূর্তে। মাতাল বেন্দাবনকে হিসেবের মধ্যে না রেখে, প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন একটা অসম লড়াইয়ে নিজেকে অনিবার্য বিজয়ী ভেবে খুশি হল সে।

বিকেলবেলা মাঠ থেকে ফিরে ঝিম মেরে দাওয়ায় বসেছিল বেন্দাবন। এক কোণে কাঁচা, অপুষ্ট জলেভেজা আলুর স্তূপ। চোখ ফেটে জল আসছিল তার। ভালো ফলন আর বৃন্দাবনের কপালে নেই। না নিজের মাঠে। না ঘরে।

একে মনমেজাজ সব নেতিয়ে আছে। তায় সন্ধে থেকেই আঙুর সুর তুলেচে, কাল সকালে সে সেন্টারে যাবে। বলচে, তার শরীর গতিক নাকি ভালো নয়। বিরক্ত বৃন্দাবন বলল— লতুন ডাক্তার বলেচে, তোর রোগ সেরে গেচে। সেন্টারে যাওয়ার আর দরকার নেই।

সন্ধেবেলা সাজতে বসেছিল আঙুর। ভুরু কুঁচকে অবিশ্বাসী চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল— লতুন ডাক্তার আমায় কিছু বললনি, আর তোমায় বলেচে? বৃন্দাবন রেগে উঠে বলল— তবে কি আমি তোকে বাইনে বাইনে বলচি?

আঙুরের ঘ্যানঘ্যানানি আর থামে না। সারাদিন আলুখেতে শরীর আর মেজাজ দুটোই ম্যাদা মেরে আছে। 'ধুত্তেরি' বলে দাওয়া ছেড়ে দাঁড়াল বেন্দাবন। তারপর আড়া থেকে ফতুয়া আর চাদরটা টেনে নিয়ে নেমে গেল অন্ধকার উঠোনে।

কিঙ্করবাটি জুড়ে আজ ঘুটঘুটে অন্ধকার। কাল দিনের আলোয় ছাড়া লাইন মেরামত হবে না। বৃষ্টির পর

ঠান্ডা যেন নতুন করে জাঁকিয়ে বসেছে। গ্রামের প্যাচপেচে রাস্তায় লোক চলাচল কম। আলো নেই। তাই সন্ধে হতেই যে যার দোরে হুড়কো তুলে বসে আছে।

বৃন্দাবনের দাওয়ায় জমাট অন্ধকার যেন শিকারি চিতার মতো ওঁত পেতে বসে। সাইকেলটা নিঃশব্দে মাটির দেওয়ালে শুইয়ে রেখে, কলে যাওয়ার ফোলিও ব্যাগ হাতে অন্ধকার দাওয়ায় উঠে এল গণেশ। তারপর গুনে গুনে কপাটে তিনটে টোকা মেরে বলল— আমি গণেশ। কপাটটা খোল। আলোটা বিগড়েচে। ঠিক করে দিই।

সময়ের জটিল অঙ্কে এতদিন আঙুর একশোয় একশো। দু-বছর ধরে গণেশকে খেলাতে খেলাতে নিজেরই ভেতর কেমন একটা আস্থা জন্মে গেছে। মাতব্বর আসার আগে আজও ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দেওয়া তার কাছে কোনো ব্যাপার নয়।

নির্দ্বিধায় কপাটটা হাট করে খুলে দিল আঙুর। গণেশের সঙ্গে একঝলক ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকে লম্ফর শিখাটা কাঁপিয়ে দিল শুধু। আঙুর নিজেই দরজায় হুড়কো তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল— এতো অন্ধকারে কোতায় বেইরেছিলে?

— তোর এখেনে। বলে ফোলিও ব্যাগটা রেখে চৌকিতে টান টান গণেশ। আঙুর নিরক্ষর। বিজলির অতশত, গলিঘুঁজি সে চেনে না। জিজ্ঞেস করল, আলো সারাবে বললে যে? কুতকুতে চোখে অদ্ভুত হাসল গণেশ— সারা কিঙ্করবাটি আঁধার। তোর ঘরে আলো জ্বলবে কোত্থেকে?

নিজের বাইশ বছরের জীবনে এই প্রথম ভয়ের একটা ঠান্ডা শিরশিরানি টের পেল আঙুর। বলল— তোমার মতলবটা কী শুনি? বেতের মতো ছিপছিপে শরীরটা তার লম্ফর কাঁপা কাঁপা আলোয় মায়াবিনীর মতো দেখাচ্ছিল।

দু-বছর ধরে মনের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভ, হতাশা আর কামনা মিলেমিশে গণেশকে বে-পরোয়া করে তুলল। 'বলচি' বলে দৈত্যের শক্তি নিয়ে সে এক ঝটকায় আঙুরকে তুলে এনে ফেলল চৌকিতে।

ব্যাপারটা এমনই আচমকা ঘটল যে, নিজেকে সামলাবার সময় পেল না সে। একটা বিস্ময়মেশানো শব্দ শুধু তার বুকের ভেতর থেকে উঠে এসে গলার কাছে আটকে গেল। দাপাদাপিতে পা লেগে লম্ফটা উলটে পড়ল মেঝেয়। সারা ঘর জুড়ে শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

এমন পরিস্থিতি আঙুরের জীবনে এই প্রথম। হঠাৎ ছবিটা আজকে কেমন বেবাক বদলে গেছে। গণেশের আসুরিক আলিঙ্গনে হাঁসফাঁস করতে করতে সে শুধু বলতে পারল— ছেড়ে দাও বলছি। নইলে ভালো হবে না।

—ছেড়ে দোব? উন্মাদ গণেশ ঘডঘড়ে গলায় বলল— অ্যাদ্দিন তুই আমার নাকে দড়ি দিয়ে শুধু ঘুরিয়েচিস্। তোর তেজ আজ আমি ভাঙব। দেখি, কোন শালা মাতব্বর তোকে বাঁচাতে আসে।

গণেশের শরীরে যেন দশটা হাতির বল। আঙুরের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। সময়ের অঙ্ক আজ কিছুতেই মিলছে না। কান খাড়া করে অন্ধকার উঠোনে আর কারো পায়ের শব্দের প্রত্যাশায় আঙুর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল প্রাণপণে।

বুকের ওপর গণেশের অক্লান্ত, বে-হিসেবি শরীর। অন্ধকার ঘরেও আঙুরের চোখের সামনে ভেসে উঠল নতুন ডাক্তারের ঠাকুরের মতো মুখখানা। ঘেন্নায় জ্বলে উঠল তার দুটো চোখ। সে আগুন নজরে পড়ল না কামার্ত গণেশের।

শেষবারের মতো গণেশকে তার শরীরের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারল না আঙুর। দাঁতে দাঁত চেপে ডান হাতটা অন্ধকার হাতড়ে সঠিক পৌঁছে গেল বালিশের নিচে। বৃন্দাবনের সদ্য তৈরি করে আনা চকচকে কাতানটা হাতে তুলে নিতে গিয়ে এই প্রথম তার হদ্দমুদ্দ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় দু-চোখ ছাপিয়ে কান্না এল আঙুরের।

ব্যভিচারিণী



তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

'খা বে পদ্ম, খা, একটু চুমো খা', বলতে বলতে লখীন্দর তার পেশল-কবজিতে পদ্মকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটদুটো ভরে নেয় নিজের ঠোঁটের ভিতর, একটা পিচ্ছিল শিরশির চেতনা লখীন্দরের শরীরময়, আর মুহূর্তে পদ্মর লাল চেরাজিভ ছুঁয়ে ফ্যালে লখীন্দবের জিভ। পদ্মর ঠোঁটদুটো বার করে কিছুক্ষণের জন্যে অবশ হয়ে যায় সে, তার শরীরে ঝিম ধরে, জিভ থেকে রক্তের ভিতরে ক্রমশ সেঁধিয়ে যেতে থাকে একটা ঘুম। ততক্ষণে পদ্ম লখীন্দরের শরীরে জড়িয়ে জড়িয়ে মাথাটা রাখে তার কাঁধের উপব। এক-একবার চেরাজিভ বাব করে চকিতে ঢুকিয়ে নেয় মুখ, শরীরের ক'ফোঁটা বিষ ঝরে যেতে তারও শরীবে অবশ ভাব। আধো-ঘুম আধো-জাগরণে তখন লখীন্দবের জিভ অস্ফুট কণ্ঠে আউড়ে যাচ্ছে, পদ্ম, পদ্ম রে, আ, জেবন জুড়ায়—

চারচালা খোড়োঘরের দরজা তখন হা-হা খোলা, দখনে হাওয়া কপাট ঠেলে হু-হু করে ঢুকছে। বাইরে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ, কিন্তু না লখীন্দব না পদ্ম, কারো তাতে হুঁশ নেই। তেলচিটে বিছানায় একমুখ কালো ও পিঙ্গল রঙে মেশা দাড়িগোঁফ নিয়ে আরামে গোঙাচ্ছে লখীন্দব। এখন তার সমস্ত সত্তা, রক্তমাংসে ভরে রয়েছে পদ্মর দেয়া আরাম। গাঁয়ের একধারে, কালনাগিনী নদীর প্রান্তে তার ঘব। নদীর নামও কালনাগিনী, লখীন্দরের ঘরভর্তিও নানান জাতের সাপ। সে সমস্ত সাপই তার পোষাপুত্তুব। শুধু এর মধ্যে এই পদ্ম, এই সোনার বর্ণ এই পদ্মগোখবো, যার চোখের ভিতর লখীন্দবের জন্যে এক অদ্ভুত চোরাটান, তার সঙ্গেই লখীন্দরের যত ভাব-ভালোবাসা। ঘরের মধে সে পদ্মর পিচ্ছিল শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, 'পদ্ম, পদ্ম বে, তুই আব জন্মে লিচ্ছয় আমার বউ ছিলিস।'

বিষেব কণাগুলো জিভ থেকে আস্তে আস্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে তাব চোখেব সামনে নেমে আসে একটা লীল-নীল জাল, সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা। তার সুতো বেয়ে সে ক্রমশ ভাসতে থাকে, উড়তে থাকে, এক অন্তহীন সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় স্বর্গের দিকে। পা থেকে মাথা অবধি একটা হালকা-ভাব, বঁমচুলিব রন্ধ্রে রন্ধ্রে অদ্ভুত একধরনের সুখ তাকে বুঁদ করে রাখে। কখনো মনে হয় আকাশ থেকে একটা নীল রঙেব পরি, যার গা-টা তুলোর মতো নরম, লখীন্দরকে উম্‌উম্‌ শব্দ করে চুমকুড়ি দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

এভাবে পুরোটা দিন বিছানায় শুয়ে থাকে লখীন্দর, আর তার শরীরে লেপটে থাকে পদ্মের পিচ্ছিল শরীব। লখীন্দরে স্যাঙাত ষষ্ঠীপদ একবার উঁকি মেরে দেখল, তার গুরু ঝিম মেরে পড়ে আছে, চোখদুটো বোজা, উশকোখুশকো চুল, লালা গড়াচ্ছে তার দু-কষ বেয়ে। এসময় তাকে বিরক্ত কবাটা ষষ্ঠীপদ পছন্দ কবে না। এর আগে ষষ্ঠীপদ ক'বার ডেকে ভীষণ দাবড়ানি খেয়েছিল তার গুরুর কাছে।

পদ্মর সঙ্গে তার এই ক'বছরের ভাব-ভালোবাসা, তার বিষের এই ছোবলে লখীন্দরের শরীর একেবারে বদলে গিয়েছে। টানটান চামড়ার রঙ কালচে মেরে গেছে, কুঁকড়ে গেছে আঙুলগুলোর চামড়া, হলদেটে হয়ে গেছে চোখের রঙ। এসব বুঝতে পারে লখীন্দর, মাঝে মাঝে পদ্মকে বলে, 'শুধু চামড়ার রঙ নয় রে, পদ্ম, তোর চুমু খেয়ে আমার রক্তের রঙটাই বদলে গেল রে।' একদিন ষষ্ঠীপদকে হাসতে হাসতে তাই বলেছিল।

ষষ্ঠীপদ বিশ্বাস করেনি, লখীন্দর হঠাৎ তার দিকে তীব্র চোখে চেয়ে বলে, 'প্রেত্যয় হয় না? দেখবি তবে-' বলে একটা ধারালো অস্ত্র বিছানার তলা থেকে বার করে নিজের কবজিতে একটা আঁচড় কাটে, অমনি রক্তের ধারা বেরিয়ে আসতে থাকে তার শিরার ভিতর থেকে। ষষ্ঠীপদ দেখে থ হয়ে গিয়েছিল।

দুই

এই পদ্মের সঙ্গে লখীন্দরের ভাব-ভালোবাসা আজ দু-আড়াই বছরের। ঝিম কেটে যেতে লখীন্দরের মনে পড়ে যায় পদ্মর সঙ্গে তার প্রথম দেখার কথা। কী বিশাল ফণা তার, সোনার বর্ণ রঙ, সারাগায়ে মাছের আঁশের

মতো দাগ, মাথায় একটা খড়মচিহ্ন। খোঁদল থেকে বেরিয়ে একলাফে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফণাটা তাক করেছিল লখীন্দরের কপাল বরাবর, চোখে জিভে গনগনে রাগ, দাঁতে অ-কামানো লকলকে বিষ। লখীন্দরের শরীরে বেদেনির রক্ত। তার বাপ ছিল জেলে, কীভাবে যেন এক দলছুট বেদের মেয়েকে বিয়ে করেছিল, আর সেই বেদেনির পাল্লায় পড়ে তার বাপ মাছ ধরার পেশা ছেড়ে সাপের গুণিন হল, খুব নামডাক হয়। সেই রক্ত লখীন্দরের শরীরে ছিল বলে মুহূর্তে গোখরোটার গলার কাছে চেপে ধরে বশ মানিয়ে ফেলেছিল। খেয়াল হতে দেখল এটা সাপ নয়, সাপিনি, তাই এত চোখের ছেনালি। পোষ মানতেই লখীন্দর তার নাম দেয় পদ্ম।

পদ্মর খবর প্রথমে এনে দিয়েছিল ষষ্ঠীপদ, তার স্যাঙাত, বয়সে তার চেয়ে ঢের ছোটো। ষষ্ঠীপদ তাকে 'সাপের মাস্টার' নাম দিয়েছে। নামটা তার মন্দ লাগে না। প্রায়ই ষষ্ঠীপদ তার পায়ের কাছে বসে বলে, 'গুরু, সাপের নাড়িনক্ষত্র তোমার মতো ভূ-ভারতে কেউ জানে না।' সেই ষষ্ঠীপদই একদিন ভোর-ভোর এসে বলেছিল, রামনবমীপুরের বোসবাড়ির ফাটলে নাকি সাপ দেখা গেছে। বোসবাড়ির বোসবাবুরা এখন আর গাঁয়ে থাকে না। ছেলেপুলেরা চাকরি-বাকরি নিয়ে কলকাতা চলে যাবার পর ওখানেই বাড়িঘরদোর করেছে। গাঁয়ের অত বড়ো বাড়িখান এখন পোড়োবাড়ি। তার দালানে বাস করে নটে ভিখিরি। বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করে। সাপটা নাকি তাদের বেছানার পাশে এসেছিল রাতেরবেলা।

লখীন্দরের রক্তে তখন সাপ ধরে বেড়ানোর নেশা। জঙ্গলে গাছের ডাল থেকে, পুরোনো বাড়ির ফাটল থেকে টপাটপ সাপ ধরে আনে। এমনকি ধানখেতের আলের উপর ঝিলিক ছড়িয়ে পালিয়ে যেতে থাকা আলকেউটেও ছুটে ধরে ফেলেছে সে। তার খোড়োঘরে ঝাঁপির পর ঝাঁপি সাপে ভরে উঠেছে। ষষ্ঠীপদর কাছে নতুন সাপের খবর পেয়ে তক্ষুনি বোসবাড়ির দিকে ছুটে গিয়েছিল।

প্রায় সাতদিন সাপটার সঙ্গে জড়িবুটি খেলায় ওম হয়েছিল লখিন্দর। তিনতলা পোড়োবাড়িটার কোন ফাটলে কিংবা চোরাকুলুঙ্গিতে সাপটা লুকিয়ে রয়েছে তা মগজে আনতে বেশ ক'দিন ক'রাত কেটে গিয়েছিল। তারপর এক ঠা ঠা দুপুরে এক ফাটলের ফাঁকে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ তার লাল চেরা জিব লখীন্দরকে দেখিয়ে তার অস্তিত্ব জানান দেয়। তারপর থেকে সেই জড়িবুটি খেলা, কখনো তার ফণাটা একনজরে চোখে সেঁধোয়, কখনো তার এক চিলতে লেজ। আবার মুহূর্তে সে ফাটা-ফাটলের ফাঁকে ফেরার। একঘর থেকে অন্যঘরে, দোতলা থেকে তিনতলার চিলেকোঠার ঘরে। তক্কেতক্কে লখীন্দরও আর পিছুপিছু। গন্ধ শুঁকেই সে বুঝেছিল এটা পদ্মগোখরো না হয়ে যায় না। তারপর সোনালি রঙের ঝিলিক দেখে তার ধারণা মিলে যায়। সাতদিনের দিন এক খোঁদলে পুরো হাতখানা ঢুকিয়ে গোখরোটাকে বার করে নিয়ে আসে লখীন্দর। জড়িবুটি খেলে পোষ মানিয়ে ওকে ঘাড়ে ফেলে বলেছিল, 'চ রে পদ্ম, ঘরে চ'। এই পোড়াবাড়িটায় তরে আর মানায় না।'

চারচালার খোড়ো ঘরটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঝাঁপি। কোনোটায় কেউটে, কোনোটায় শঙ্খচূড়, কোনোটায় খান কুড়ি-পঁচিশ অইরাজ। অন্যপাশের ঝাঁপিতে রয়েছে শাঁখামুটি, রক্তকানড়, কালাজ। বিশ-পঁচিশটা ঝাঁপির ভিতর ভিনজাতের সাপের বাস, আর এদের নিয়েই লখীন্দরের সংসার। তার এই ছোট্ট ঘরখানাকে ষষ্ঠীপদ নাম দিয়েছে সাপঘর। লখীন্দরের চেতনা, অনুভূতি, জীবিকা সবকিছুকেই ঘিরে রয়েছে মা মনসার এই জীবগুলো। বলা যায় এদের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। এদের চাউনি, লকলকে জিবের ওঠাপড়া, ফণার দুলুনি দেখে সে বুঝতে পারে ওদের কথা। জীবগুলোও লখীন্দরকে ভালোবাসে, সোহাগ জানায়। আবার লখীন্দরের চোখে রাগ দেখলে ভয়ে কুঁকড়ে যায়, ফণাসুদ্ধ একলাফে পিছিয়ে গিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে সভয়ে লক্ষ করে লখীন্দরকে। এক-একটা সাপের এক-একরকম কেতা, লখীন্দর সব বুঝতে পারে।

সাপঘরের এইসব জীবের দেখাশোনা করার ভার ষষ্ঠীপদর উপর। লখীন্দরকে গুরু মেনেছে সে। তার ভারী ইচ্ছে, 'সাপের মাস্টারের' পা ধরে একদিন সেও মাস্টার হবে। লখীন্দর যখন গোখরো কিংবা রক্তকানড় গলায় ঝুলিয়ে দুক্রোশ পথ ভেঙে নারায়ণগঞ্জে সনাতন মল্লিককে নেশা বেচতে যায়, তখন সঙ্গে থাকে ষষ্ঠীপদ। সাপের ছোবল জিভে নিয়ে বুঁদ হয়ে যায় সনাতন মল্লিক। একছিলিম গাঁজার মতো একছোবল বিষ। ষষ্ঠীপদ ভয়ে ভয়ে একবার সনাতন মল্লিককে দ্যাখে, একবার লখীন্দরকে, আরেকবার লখীন্দরের গলায় ঝোলানো গোখরোকে, ষষ্ঠীপদর চাউনি দেখে লখীন্দর কখনো বলে ওঠে, 'খাবি নাকি রে এক ছিলিম'। বলে গোখরোটাকে এগিয়ে ধরতেই ষষ্ঠীপদ তিড়িক করে লাফ মারে, কিন্তু তার পিছু ছাড়ে না। আবার লখীন্দর যখন রাত-বিরেতে ভিনগাঁয়ে সাপের বিষ ঝাড়তে যায়, তখনো ষষ্ঠীপদ তার সঙ্গে থাকে। অবাক হয়ে দ্যাখে, কীভাবে লখীন্দর বিষদাঁতের ক্ষতের উপর খোলামকুচি চেপে ধরে মন্ত্রের অমোঘ টানে বিষ নামিয়ে নিয়ে আসে। আবার শহুরে বাবুরা যখন

কাচের টিউব এনে লখীন্দরের সাপঘর থেকে বিষ কিনে নিয়ে যায়, তখনো ষষ্ঠীপদ তার পাশে। বস্তুত এসব ব্যাপারে ষষ্ঠীপদই সব যোগাযোগ করে। দেনাপাওনা, দরদাম সব ষষ্ঠীপদর হাতে। মা মনসার জীবের খাবারও জোগাড় করবার ভার তার উপর, তাদের বাস করার ঝাঁপির দরকার হলেও সে।

ষষ্ঠীপদ এসবই করে বিদ্যে-শেখার লোভে। লখীন্দর 'সাপের মাস্টার', একদিন তার সব বিদ্যে নিশ্চয় সে ষষ্ঠীপদকে দিয়ে যাবে। কখনো লখীন্দরের কাছে ভয়ে ভয়ে এ প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু লখীন্দরের সেই কথা, 'দূর বেটা, তুই সাপের লেজ ধরতে ভয় পাস, তুই আবার সাপের মন্তর শিখবি কী রে। যা ভাগ।'

গাঁয়ের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গেও লখীন্দরের সম্পর্ক খুব কম। সে পড়ে থাকে গাঁয়ের একপ্রান্তে, নদীর ধারে. একা তার মা মনসার জীবদের সংসারে বুঁদ হয়ে। এক ষষ্ঠীপদ ছাড়া বাকি মানুষজন সাপঘরের নাম শুনলে তার সাতহাত দূর দিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের ধারণা, লখীন্দরের ঘরের ত্রিসীমানায় কেউ পা মাড়ালে সে তার সাপদের লেলিয়ে দেবে। লখীন্দর এসব কথা শুনে হাসে, দাড়িগোঁফের জঙ্গলে সে হাসির ঝিলিক বড়ো অদ্ভুত।

লখীন্দর ষষ্ঠীপদকে বলে, 'বুঝিলি বেটা, সবাই আমাকে ডরায়, আবার সাপে কাটলে আমাকেই আবার তারা তালাশ পাঠায়। এ ভারি মজার কথা।'

কখনো ষষ্ঠীপদকে বলে, সাপের মন্তর শিখবি, তার আগে সাপের চোখ ভালো করে নজর দিয়ে চেন। সাপের নজরই হল আসল। শাঁখামুটির চোখ আর বাঁশবুনে কেউটের চোখ এক রকম নয়, একটার চোখে খচরামি তো অন্যটার চোখে শয়তানি। আবার মেটেসাপের চোখ, তার মধ্যে কেমন সতর্কতা আর ভয়।

ষষ্ঠীপদ হাঁ করে শোনে, আর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

তিন

লখীন্দরের বাপ ছিল সাপের গুণিন। কিন্তু সাপের নজর লখীন্দর ভালো করে ঠাহর করতে শেখে যেবার ভীমরাজ বেদের দল তাঁবু গেড়েছিল তাদের গাঁয়ের ধারে। ষষ্ঠীপদ এখন যেমন ছুঁকছুঁক করে, তেমনি জড়িবুটি খেলার লোভে সেও ঘুরঘুর করত বুড়ো বেদে ভীমরাজের আশে-পাশে। একদিন বুড়ো রেগে গিয়ে নিজের গলা থেকে একটা মস্ত কেউটেসাপ খুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল তার গায়ে। লখীন্দর সতর্ক হবার আগেই কেউটেটা ছোবল বসায় তার হাতে, মুহূর্তে চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে, মুখে গাঁজলা। পরে জেনেছিল সেই ভীমরাজ তার কাটা ক্ষত থেকে একচুমুকে বিষ তুলে নিয়েছিল। লখীন্দরের জ্ঞান ফিরলে তার পিঠে চাপড় মেরে বলেছিল, 'যা বেটা, তোর হাতেখড়ি হল আজ।'

তারপর থেকে বুড়ো ভীমরাজ তাকে প্রায় সম্মোহিত করে রেখেছিল, একে-একে চিনে নিল সাপের ঘরসংসার, তাদের চাউনি। ক্রমে তার নিজের চোখও সাপের মতো তীক্ষ্ণ আর তীব্র হয়ে উঠল, যেরকম ছুরির মতো দৃষ্টি সে দেখতে পেত বুড়ো ভীমরাজ আর তার ছেলে নগারির চোখে। নগারি তখন তার বয়সি এক যুবক। একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর তামার মতো গায়ের রঙে অজস্র পেশি তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে চেনায়। নগারি তার বাপের মতোই সাপের দোস্ত এবং যমও। অনায়াসে তাজা একটি গোখরোর ঠোঁট দু-আঙুলে ফাঁক করে তার বিষদাঁত ভেঙে নিত নিজের ঝকঝকে সাদা দাঁতের আঁকশিতে। লখীন্দরের বউ গোলাপি একদিন এই কাণ্ডটা দেখে চোখ ছানাবড়া করে বলেছিল, 'হাই মা, ই কি দস্যি না দানব।'

লখীন্দর তার দোস্তের দিকে গৌরবের দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বউকে বলেছিল, 'উটা একটা গৌড় বকেট।' গরুড় শব্দটা নগারির পক্ষে সবচেয়ে মানানসই ছিল। সাপের উপর তার একটা অহেতুক হিংস্রতা। যে সাপটা তার কথা শুনত না, কিংবা হেরফের ঘটাত তার আচরণে, ভীষণ রেগে যেত নগারি। তার ঝাঁকড়া চুল আরো ফুলে উঠত রাগে, কিড়মিড় করত দাঁত। কখনো এমন হয়েছে, এক আছাড়ে একটা গোখরোকে মেরে ফেলেছে। লখীন্দরের মুখে এমনটা শুনে গোলাপি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে বলত, 'লোকটা কী গো, ই তো চণ্ডালের রাগ।'

সেই নগারি যখন লখীন্দরের দোস্ত হল, লখীন্দরের সঙ্গে তার ঘরে আসত। গোলাপি প্রথমটা ভয়ে আঁতকে সরে থাকত দূরে। বলা যায় না, লোকটার যা রাগ! কিন্তু তাকে যখন কাছ থেকে দেখল, তখন নগারি অন্যরকম। তার দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর সাতকাহন গল্প বলত লখীন্দর আর গোলাপির কাছে। কখনো সমুদ্রের পাড়ে কখনো গভীর জঙ্গলে তাঁবু ফেলে তাদের বসবাসের কথা, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব কাণ্ডকারখানার গল্প। তখন দুজনেই হাঁ করে শুনত সেসব। তারপর একদিন যখন নগারি গোলাপিকে একটা হরেক ডিজাইনের পুঁতির

মালা দিল, তাতে ঝকঝক করছে লালনীল স্ফটিকখণ্ড। তাই দেখে গোলাপি তো আনন্দে থ। মনে মনে ভাবল, লোকটার বাইরেই অমন রাগ, ভিতরটা নরম।

লখীন্দর তখন বুড়ো বেদে ভীমরাজ আর নগারির কাছে একের পর এক জড়িবুটি খেলা শিখছে, বশ মানাচ্ছে বিষে টইটম্বুর সাপগুলোকে। কোন সাপের মেজাজ কীরকম, কার দুর্বলতা শরীরের কোন জায়গায়, এইসব সাবাক্ষণ তার মাথায়। রাতে ঘরে ফিরে গোলাপিকে তার বিদ্যের রকম বোঝাত, জাহির করত তার ক্ষমতা। সাপ সম্পর্কে গোলাপির প্রাথমিক আড়ষ্টতা কেটে গেলে সেও হাঁ করে শুনত লখীন্দরের বিদ্যের রকম।

যখন লখীন্দরের জড়িবুটি খেলা শেখা প্রায় শেষ, নতুনভাবে জীবন শুরু করার স্বপ্নে যখন মশগুল ঠিক তখনই একদিন বাড়ি ফিরে দেখল তার ঘর ফর্সা। বুড়ো ভীমরাজ বেদে তার তাঁবু গুটিয়ে দলবল নিয়ে যখন দেশান্তরে রওনা দিয়েছে, তখন গোলাপিও কোন ফাঁকে ভিড়ে গেছে নগারির সঙ্গে। ব্যাপারটা লখীন্দর জেনে একেবারে নিথর। মা মনসার জীবকে সে ভালোবাসতে শিখছিল বটে, কিন্তু গোলাপিকেও তো ভালোবাসা দিতে কিছু কম করেনি। ঘরে এসে সংবিত ফিরতে সে বিড়বিড় করে শুধু বলেছিল, 'যা রে গোলাপি, তুই বেবাজিয়া হয়ে যা।'

এ-কথা ঠিক, গোলাপির প্রায়-ফর্সা চাবুকের মতো শরীরটার মধ্যে সে অনেক সুখ পেয়েছিল। গোলাপি রঙঢঙ জানত বেশ। আব বেদেদের সাপগুলো চেনার পর গোলাপির শরীরটাও মনে হত আরেকটা সাপ, অমনই পিচ্ছিল, অমনই সোন্দর। লখীন্দরের ঘরে যে গোলাপি তার অস্তিত্বের অর্ধেক ছিল, সেই গোলাপি কখন যে তার রঙঢঙের ভাগ নগারিকে দিয়েছিল, তা লখীন্দর বোঝেনি। যখন বুঝল, তখন তার সারা ঘরে গোলাপির স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নেই। বেবাজিয়ার দল তখন তাদের তাঁবু গুটিয়ে কত দূরে চলে গেছে কে জানে।

গোলাপি গেল, কিন্তু সর্দার ভীমবাজের কাছ থেকে যে বিদ্যে লখীন্দর শিখে ফেলেছে, তাতে সে বিদ্যের এক জাহাজ। জড়িবুটি মন্তর পড়ে সমস্ত সাপকেই সে এখন বশ মানাতে পারে, সাপে-কাটা রুগি বাঁচাতে পারে, সাপের চাউনি দেখে তার কথা বুঝতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে তার সাপঘর। ভেবেছিল, আবেকটা গোলাপি ঘরে নিয়ে আসে, কিন্তু বোসবাড়ির ফাটল থেকে হঠাৎ এই পদ্ম তার ঘরে এসে সব ওলট-পালট করে দিল।

এখন সেই পদ্মের আকর্ষণে সে প্রায় সম্মোহিত হয়ে থাকে সারাদিন। যতক্ষণ ঘরে থাকে, ততক্ষণ পদ্মকে নিয়েই তার খেলা। কখনো পুরোটা দিন বিছানায় শুয়ে থাকে সে, আর পদ্মও তার শরীরে জড়িয়ে সোহাগ দিয়ে, গায়ে লেপটে পড়ে থাকে। কখনো পদ্মের ঠোঁটে চুমু খায়, পদ্মও তার চেরাজিব মেলে চেটে দেয় লখীন্দরের গাল। দেখলে মনে হয ও তার বে-কবা বউ। পদ্মের পিচ্ছিল শরীরের স্পর্শে তার শরীর জেগে ওঠে, এক অদ্ভুত সুখ তাকে অবশ করে দেয়। শুধু চুমুই দেয় না, এক ভীষণ বর্ষার রাতে পদ্মের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে এক অদ্ভুত বিজাতীয় প্রক্রিয়ায় রত হয়েছিল।

ব্যাপারটা ক্রমশ তাকে নেশায় আচ্ছন্ন করে। এক অদ্ভুত রতিক্রিয়ায় বুঁদ হয়ে থাকে মাঝে মাঝে, অমন নধর হিলহিলে সাপটার সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটানোটা তার কাছে মধুর হয়ে ওঠে। গোলাপিকে হারিয়ে তার ভিতরে যে ক্রোধ, হতাশা আর ক্ষোভ ছিল পদ্ম ঘরে এসে তা অনেকটা মিটিয়ে দেয়। বরং তার মনে হয়, পদ্ম তাকে যে আনন্দ দেয়, তা গোলাপি কখনো দিতে পারেনি। পদ্মকে নিজের শরীরের সঙ্গে জড়াতে জড়াতে ভাবে, 'যা রে গোলাপি, তুই বেবাজিয়া হয়ে যা, আমার পদ্ম তর চয়ে ঢের ভালো, এ তর মতো বেইমানি করবে না।'

ক্রমে পদ্মের উপর তার ভাব-ভালোবাসা এমন ওম হয়ে ওঠে যে তাকে একদণ্ড কাছছাড়া করে না লখীন্দর। যেখানেই যায়, পদ্ম তার সঙ্গে আছে। তা এই নিয়ে একদিন বিটকেল কাণ্ড ঘটে গেল। গোপালনগরের ভবগোঁসাই লখীন্দরের এক বাঁধা খদ্দের। হপ্তায় একবার জিবে সাপের ছোবল নেয়। শুধু নেশাই করে না, সে একজন রসিক মানুষ। কোন সাপের সোয়াদ কেমন তা নিয়ে লখীন্দরের সঙ্গে মশকরা করে, 'তোর ওই বাঁশবুনে কেউটে সেদিন আমার ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছিল, বুঝলি লখীন্দর। শালা মহা বজ্জাত আছে।' তা এই ভবগোঁসাই হঠাৎ লখীন্দরের কাঁধে সুন্দরী পদ্মকে দেখে হাসতে হাসতে বলে, 'পদ্মর চুমু কি তুই একলাই খাবি, লখীন্দর? একদিন আমাকেও দে না ওকে। না হয় একটু বেশিই দাম দেব।' বলে তার নীলচে জিব বার করে দেয়।

ইঙ্গিত বুঝে লখীন্দর ভীষণ রেগে গিয়েছিল। তখন তার চোখদুটো লাল, মুখটা চকিতে হিংস্র হয়ে ওঠে, হয়তো ভবগোঁসাইকে একটা ভীষণ আঘাত করে ফেলত। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'তোমার বে-করা বউটাকে কি একদিন আমার সঙ্গে শুতে দেবে, ভবগোঁসাই?'

মুখের উপর এমন একটা জবাব দিতে পেরে বেশ খুশি হয়েছিল লখীন্দর। পদ্মকে তার শরীরের সঙ্গে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এসেছিল। টাকার গরম দেখাতে এসেছে ভবগোঁসাই, পদ্ম যে তার কতখানি সেটা তো হারামখোরটা জানে না।

চার

শহর থেকে একদল বাবু হপ্তায় একবার এসে লখীন্দরের সাপঘর থেকে বিষ কিনে নিয়ে যায়। লখীন্দর জানে, এসব বিষের থেকে ওষুধ তৈরি হয়। বাবুরাও লখীন্দরকে বেশ খাতির করে। এতরকম সাপের বিষ নাকি আর কোথাও তারা পায় না, আর এখানে মেহনতও সবচে কম, দামেও সস্তা।

তা এসব থেকে টাকা-পয়সার যা আমদানি হয়, তার হিসেব রাখে ষষ্ঠীপদ। সাপের খাবার যেমন সে জোগাড় করে, তেমনি লখীন্দরের খাবারের দায়িত্বও তার উপর। এটুকু হলেই লখীন্দর খুশি, বাকি পয়সা ষষ্ঠীপদ কী করে, তা সে খোঁজ রাখে না। মাঝেমাঝে ষষ্ঠীপদ অবশ্য বলে, যা টাকা-পয়সা জমেছে, তা দিয়ে একটা পাকাবাড়ি বানাব, তার ভিতর সাপঘর হবে। সাপ রাখার জন্যে বড়ো বড়ো কাচের বয়েম কিনে আনব। দেখার জন্যে সারা শহর ভেঙে পড়বে।

লখীন্দর অবাক হয়। পাকাবাড়ির ভিতর সাপঘর। বলে, 'তোর মাথাখান খুব পোষ্কার, ষষ্ঠীপদ।'

একদিন ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর। কালীনারায়ণপুরের এক জোতদারের বাড়ি থেকে ফিরছে লখীন্দর, কাঁধে একটা তাজা রক্ত-কানড়। একটু আগে জোতদার শ্রীধর সামন্তের জিবে বিষ ঢেলে দিয়ে এসেছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় পদ্মকে একটা ঝাঁপির ভিতর রেখে সে বলে এসেছে, 'একটু জিরেন নে, দুফারবেলা আসব।' ভবগোঁসাই পদ্মর উপর লোভ দেখানোর পর থেকে সে আর ওকে নিয়ে কারো বাড়ি যায় না। পদ্ম তার একার। তাছাড়া সঙ্গে অন্য কোনো সাপ থাকলে পদ্ম কেবলই গরগর করে। ফোঁস-ফোঁস শব্দে তার রাগ জানাতে থাকে।

ফিরতে ফিরতে লখীন্দর ভেবেছিল, বেচারা জোতদার, এই নেশা তাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে ফেলেছে। সর্বক্ষণ বিজনেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে জমিজমা দেখার সময় কোথায়? সামন্তবাড়ির লোকজন লখীন্দরের উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। তার গলায় এমন এক-একখানা রক্ত-কানড় কিংবা পদ্ম-গোখরো ঝোলানো থাকে যে ভয়ে আর রা কাড়ে না। ইদানিং অবশ্য ওঁর এক ছেলে সাবালক হয়ে জমিজমা দেখাশোনা করছে, তাতে একটু হাল ফিরেছে।

ফেরার পথে হঠাৎ ষষ্ঠীপদ বলল, 'গুরু, রূপনগরের পুজোর দালানে একটা পদ্ম-গোখরো দেখা গেছে।'

লখীন্দর ক্লান্ত ছিল, কিন্তু পদ্ম-গোখরোর নাম শুনে চমক জাগে। এক পদ্ম ছাড়া তার কাছে আর যে দু-একটা পদ্ম-গোখরো আছে, তারা হয় বুড়ো না হয় নির্জীব। আবার একটা চনমনে পদ্ম-গোখরো ঘরে নিয়ে এলে হয়। পরক্ষণেই ভাবে, নতুন একটা পদ্ম-গোখরো এলে তার পদ্মের আবার গোঁসা হবে না তো!

কিন্তু ষষ্ঠীপদ বলে, 'না হয় ওটা আমিই পুষব খনে। ক'দিন তোমার কাছে রেখে বিষদাঁত ভেঙে একটু মানুষপানা করে দাও।' একটু ভেবে হঠাৎ গলায় পেঁচানো রক্ত-কানড়টাকে ষষ্ঠীপদর দিকে ছুঁড়ে বলে, 'তাহলে এটাকে ধর। দুফারটা সাপ ধরে কাটাই আজ। অনেকদিন জড়িবুটি খেলা হয় না। আমি জঙ্গল থেকে একটা শিকড় খুঁজে নে আসি।'

ষষ্ঠীপদ ভয়ে ভয়ে রক্ত-কানড়টা লুফে ধরে, সাবধানে গলায় পেঁচায়, একটা হাতে ধরে রাখে সাপটার গলা। কী চমৎকার দেখতে রক্ত-কানড়টা, পেটের কাছ থেকে দুদিকে মাথা পর্যন্ত লাল টকটকে দাগ, যেন দুপায়ে আলতা পরানো। লাল জিবটা ফালুক ফুলুক করে বাইরে এনে আবার চকিতে ভিতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। হিলহিলে শরীরটা ষষ্ঠীপদর গায়ে-গলায় শিরশির করে নাড়তে থাকে। গুরুর আদলে সেও রক্ত-কানড়টার গায়ে একটা চুমু খেয়ে নেয়।

একটা শিকড় জোগাড় করে আনে লখীন্দর। রূপনগরের পুজোর দালানে দুজনে পৌঁছোয়, নাকের রোঁয়া বাড়িয়ে বড়ো করে ঘ্রাণ নেয় লখীন্দর, হাঁ একটা গন্ধ বেরুচ্ছে বটে। তারপর সে কয়েকটা ফাটলের কাছে পরপর টোকা মারে, আবার নাকে ঘ্রাণ নেয়, শিকড় বোলায়, বিড়বিড় করে কী সব বকে, তারপর মাথা নাড়ে। সাপটা তার সঙ্গে জড়িবুটি খেলছে। দালানের সব দেয়ালেই ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। কোথাও বেশি, কোথাও কম, তার মানে জীবটা চট করে ধরা দেবে না। যত সময় যায়, তত মন্তর খরচ হয়, শিকড়ের গন্ধ উবে যায়, কিন্তু

গোখরোটা কাবু হয় না। এদিকে খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। ষষ্ঠীপদ বলে, 'চল গুরু, আজ আর হবে না, কাল আবার আসব।'

কিন্তু লখীন্দরের তখন রোখ চেপে গেছে, পদ্মও তার সঙ্গে এরকম লুকোচুরি খেলেছিল, এই মা মনসার জীবটাও ঠিক একইরকম খেলছে। লখীন্দরের চোখদুটো ভাঁটার মতো ঘুরতে থাকে। সেই ভোরবেলা কালীনারায়ণপুরে গিয়েছিল, তারপর থেকে এই টানাপোড়েন। গায়ে মুখে টলটল করছে ঘাম, ঘনঘন শ্বাস ফেলছে, লালচে হয়ে উঠেছে দুটো চোখ। একটা প্রচণ্ড নেশা তাকে দালানের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ঝাড়া চারঘণ্টা লড়াই চালানোর পর একটা খোঁদলের ভিতর থেকে পদ্ম-গোখরোটার টুঁটি টিপে ধরে টেনে বার করল সে। দড়াম করে শানের মেঝেয় ফেলতেই বিশাল ফণা তুলে দাঁড়াল ওটা। একেবারে তাজা, চকচকে, সোনালি রঙ। লখীন্দর লক্ষ করল, ওটা সাপিনি নয়, সাপ। বোধহয় মরদ বলে তার ফোঁসফোঁসানিও ভয়ঙ্কর। কিন্তু লখীন্দরের গায়ে বেদেনির রক্ত আছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সাপটা তার কাঁধে জড়িয়ে লেপটে থাকে গায়ের সঙ্গে। ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবল, পদ্ম কি একে দেখলে হিংসেয় জ্বলবে! পদ্মকে কাঁধে-গলায় জড়িয়ে যখন সে তার শঙ্খচূড়, রক্ত-কানড় কিংবা বাঁশবুনে কেউটেটাকে ঝাঁপি থেকে বার করে ঘরের মেঝেয় রাখে, ওদের নিয়ে খেলা করে, কিংবা ওরা তার মালিককে একটু সোহাগ জানায়, অমনি পদ্ম ফোঁস-ফোঁস করে রাগ জানাতে থাকে, লখীন্দরের গলায় আরো শক্ত করে ফাঁস জড়ায়। একদিন তো একটা শামুকভাঙা কেউটের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিল।

যেতে যেতে ষষ্ঠীপদকে বলল, 'বুঝলি ষষ্ঠীপদ, এটাকে দেখলে আমার পদ্ম খুব গোঁসা করবে।'

ষষ্ঠীপদ এসব বোঝে না, বলল, 'ওটার বিষদাঁত দেখছ গুরু, বিষে টঙ হয়ে রয়েছে, শহরে খবর দেব নাকি?'

লখীন্দর হাসে, 'তোর শুধু টাকা আমদানির ফিকির। বরং এর বিষটা জিভে নিতে কেমন লাগে, তা দ্যাখ দিকি।' বলে সাপটা তার গলা থেকে খোলবার ভঙ্গি করে। অমনি ষষ্ঠীপদ চিৎকার করে ওঠে, 'দোহাই গুরু, একেবারে মরে যাব। আগে তোমার বিদ্যেটা শিখিয়ে দাও, তখন তোমার মতো অমন পথ-গোখরো নিয়ে আমিও বিছানায় শোব।'

লখীন্দর মশকরা করে, 'গোখরো নিয়ে বিছানায় শুবি, তো তোর বউ কোথায় শোবে?'

মশকরায় যোগ দেয় ষষ্ঠীপদ, 'বউও শোবে, গোখরোও শোবে, দুজন দু'পাশে।'

হেসে ওঠে লখীন্দর, গলায় ঝোলানো সাপটার লেজ আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে, 'দূর বোকা, ওরা যে সতীন, একসঙ্গে ঘর করে না।'

সাপঘরের কাছে আসতে ষষ্ঠীপদ এবার রক্ত-কানড়টাকে লখীন্দরের কাছে দিয়ে দিল, 'আজ চলি গুরু। কাল একটা নতুন ঝাঁপি কিনে এনে দেব।' বলে সে ঘরমুখো হাঁটা দেয়। লখীন্দর এবার তার শিকল খুলে ঘরে ঢোকে। রক্ত-কানড়টাকে ছেড়ে দিতে সে ঠিক তার ঝাঁপির ডালা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। এদিকে নতুন পদ্ম-গোখরোটাকে দেখে পদ্মর অদ্ভুত ব্যবহার। অন্যদিন সে ঘরে ঢুকলেই পদ্ম তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঠোঁটে, গালে, কপালে জিব বুলিয়ে ভালোবাসা দেয়। আজ যেন সে লখীন্দরের গায়ে অন্য এক গন্ধ পেয়েছে, আর সেই গন্ধ নাকে যেতে তার কী ঝাঁপাঝাঁপি, ফোঁসফোঁসানি। দু-তিনবার ছোবল মারল লখীন্দরের বুকে, কপালে। লখীন্দর আজ তাকে সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে গেল। হেসে বলল, 'বাপরে মেয়ের কী তেজ!' অন্য পদ্ম-গোখরোটার দিকে পদ্ম তার ফণা তুলে তাকিয়ে আছে। মেঝের দু-পাশে দুটো ফণা-তোলা পদ্ম-গোখরো দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। লখীন্দর অবাক হল, বুঝতে পারল না দুজনের চোখের চাউনির ভাষা, একটু পরে দুজনেই ফণা নামিয়ে দুপাশে সরে গেল।

ক'দিনের মধ্যেই বোঝা গেল, নতুন পদ্ম-গোখরোটার বেশ তেজ আছে। তা সত্ত্বেও লখীন্দরের বেশ ন্যাওটা হয়ে পড়ল। ষষ্ঠীপদ একদিন শহরে বাবুদের ধরে এনে বেশ খানিকটা বিষ বেচে দিল তার। নতুন গোখরোটা লখীন্দরকে বেশ পছন্দ করছে দেখে কিন্তু পদ্ম তাকে মোটেই হিংসে করল না, বরং সেও নতুন সাপটাকে বেশ পছন্দ করতে লাগল। আশ্চর্য, পদ্ম কি হঠাৎ ভালো মেয়ে হয়ে গেল!

পাঁচ

ষষ্ঠীপদ একদিন একটা মজার খবর দিল। লখীন্দরের কাছে খবরটা বেশ মজার বইকী। শহরের এক বাবু নাকি সাপ পোষে। মস্ত বড়ো দালানবাড়ি, কিন্তু সারাঘরের দেওয়ালে সাপের ছবি, সাপের উপর মস্ত মস্ত বই,

বাবু সারাদিন একমনে সাপ নিয়ে পড়াশোনা করে। তার ঘরে অনেকগুলো কাচের বয়ামে সাপ রাখা আছে, নানান ধরনের সাপ। কাচের বয়ামগুলোকে নাকি অ্যাকোরিয়াম বলে। সেই বাবু নাকি একটা গোখরো সাপ কিনতে চায়। তার জন্যে মোটা টাকা দেবে।

লখীন্দর সাপ ধরে বটে, কিন্তু সাপ বেচে না কখনো। হয় তার ঝাঁপির মধ্যে রাখে, নচেৎ পছন্দ না হলে মাঠেঘাটে ছেড়ে দেয় —যা মা মনসার জীব, চরে খা।

ষষ্ঠীপদ বড়ো বড়ো চোখ করে বলে, একদিন দেখবে চল গুরু, কী সোন্দর দেখতে কাচের বয়ামগুলান। অমনি ক'টা বয়াম তোমার জন্যেও কিনে দেব। তোমার তো অনেক সাপ, ক'টা বেচে দাও। কাচের বয়াম কিনে ঘর সাজাই।

তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ে লখীন্দর, উঁহু সাপের গুনিন আমি, সাপ বেচতে নেই। মা মনসার গোঁসা হবে।

শহরের বাবু সাপ নিয়ে লেখাপড়া করে শুনে অবাক হয়ে যায় লখীন্দর, সাপ নিয়ে আবার লেখাপড়া করা যায় নাকি। আশ্চর্য তো! সে তো সাপ নিয়ে তার জীবন কাবার করতে চলল, তা নিয়ে আবার বই হয় তা তো সে জানত না। মানুষ যে কতরকম ধ্যানাচি জানে।

লখীন্দরের কথা শুনে ষষ্ঠীপদ মুষড়ে পড়ে, 'তুমি তো ইচ্ছে করলেই অনেক সাপ ধরতে পারো গুরু, ক'টা সাপ বেচলে কিছু যাবে আসবে না।'

কিন্তু লখীন্দরের সেই এক বা। সাপ বেচব না। ষষ্ঠীপদ ফাঁপরে পড়ে। বোঝে না তার গুরু অত বেশি করে তাব পোষাপুত্তুরদের ভালোবাসে কেন।

দু-একদিনেব মধ্যে লখীন্দরের মনে হল, পদ্ম আর তাকে আগের মতো সোহাগ দিচ্ছে না, বিছানায় তার সঙ্গে জড়াজড়ি করে না, কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। মাঝরাতে সেই পদ্ম আর চুমো দেয না তাকে, গায়ে জড়ায না, বুকেব উপব ফণা তুলে নাচ দেখায় না। হল কী পদ্মর? লখীন্দরের অভিমান হয়, রাগ হয, পদ্মকে হঠাৎ টান মেবে ছুঁড়ে ফেলে দেয মেঝেতে, যা ভাগ, ছুঁড়ি, তুই মেঝেয় শুয়ে থাক, তব বেছানা মানায না।

ক'দিন এবকম মান-অভিমানের পালা চলল, গুটি-গুটি সাপটা তার বিছানায় উঠে এলেও লখীন্দর আর তাকে কাছে নেয না, কাঁধে-গলায় জড়ায় না। চুপচাপ তার বিছানায় পড়ে থাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে। ষষ্ঠীপদ একদিন ডাকতে এসে প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে চলে গেল। বুঝতে পারল না গুরুর মেজাজ এত তিরিক্ষি কেন।

একদিন মাঝরাতে ফোঁস-ফোঁস শব্দ শুনে লখীন্দরের ঘুম ভেঙে যায়। নিশুতিরাত সমস্ত ঘরে ডাঁই হয়ে জমে আছে, চালেব একটা খড়ও চোখেব নজব কাড়ে না। ফোঁসফোঁসানির শব্দটা আসছে ঘরের কোণ থেকে। কী মনে হতে উঠে বসল লখীন্দর। ষষ্ঠীপদ শহর থেকে তাকে একটা লাইটার কিনে এনে দিয়েছিল, তাব ছোট্ট চাকাটা ঘোরাতেই ফস করে আলো জ্বলে ওঠে। খাট থেকে নেমে অন্ধকারে হাতড়ে ঘরের কোণের দিকে যায় সে। মনে হল কী একটা গন্ধ বেরুচ্ছে ঘবে, গন্ধটা তার খুব চেনা। ফস করে লাইটার জ্বালতেই দেখল, ঠিক যা ঠাহর করেছিল তাই। পদ্ম তার বিছানা থেকে নেমে নতুন ঝাঁপিটার চারপাশে ঘুরঘুর করছে, যার মধ্যে সদ্য-ধরে-আনা পদ্ম-গোখরোটা রাখা আছে।

মাথাটা গরম হয়ে গেল লখীন্দরেব। বুকের মধ্যে একটা বিষপিঁপড়ে কুটুস করে কামড়ে দিল। গত ক-বছরের মধ্যে যা ঘটেনি, পদ্ম এমনধারা হয়ে যাওয়াতে তার চোখের সামনে একটা বিদ্যুৎ ঝিকমিক করে খেলে যায়, কী রে পদ্ম, তোর খুব গুমর হয়েছে, তাই না? আমার বেছানা তর আব ভালো লাগে না।

লাইটার জ্বালতেই পদ্ম হতচকিত হয়ে ফণা তুলে দাঁড়াল, তারপর লখীন্দরের পায়ে জড়িয়ে সোহাগ জানাতে শুরু করে, যেন পদ্ম খুঁজে পাচ্ছিল না লখীন্দরকে, এখন দেখতে পেয়ে পা থেকে জড়িয়ে গায়ে ওঠে, গালে জিব বুলিয়ে দেয়। লখীন্দরের রাগ তৎক্ষণাৎ নেমে যায়, গলে জল হয়ে যায় তার অভিমান। পদ্মকে নিয়ে বিছানায় চলে আসে, পদ্মর পিচ্ছিল শরীরে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় —'পদ্ম রে দেখ, তরে কতো ভালোবাসি আমি, তর জন্যে আরেকটা বউ আনি নাই। নইলে গোলাপি আমারে অমন একটা দাগা দিল!'

পদ্ম ওর বুকের উপর ফণা তুলে দাঁড়ায়, মাঝে মাঝে লতিয়ে নেমে চুমু খায় ওর গলায়, গালে। অদ্ভুত সুখ পায় লখীন্দর। ঘোররাত আরো ঘনঘোর হয়ে আসে। বাইরে ঝিঁঝি ডাকে, শিশির পড়ার মতো টুপটাপ শব্দ হয়।

ভোরে উঠে পদ্মকে বলল, 'তুই তোর ঝাঁপির মধ্যে আজ সারাদিন থাকবি। আমি শহরে যাচ্ছি।' বলে পদ্মকে তার ঝাঁপির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। প্রথমে মুখ, তারপর সরসর করে তার সমস্ত শরীর, তারপর লেজ,

আস্তে আস্তে পদ্মর শরীর ঝাঁপির মধ্যে চলে যায়। শহরে বেরুবার আগে নতুন পদ্ম-গোখরোটার ঝাঁপির উপর দুটো থানইট চাপা দেয়। লখীন্দর ভাবে, পদ্মটার হঠাৎ কি নোলা বদলেছে! নতুন পদ্ম-গোখরোটা মদ্দা-সাপ, সাপেদের মধ্যে মরদ। এমন একটা মদ্দার গন্ধ পেয়ে পদ্ম কি তার জাতপুরুষকে খুঁজে পেল! আর লখীন্দর যে এতকাল ওকে তার সোহাগ আর ভালোবাসা দিয়ে আসছে সেটা কি পদ্মর মনে নেই? হঠাৎ লখীন্দর ভাবল, এসব কী এলোমেলো ভাবছে, হয়তো নেহাত খেয়ালবশে পদ্ম তাদের নতুন অতিথির তালাশ নিতে গিয়েছিল।

আসলে তার মনের এই যে বিষপিঁপড়েটা, তা ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে গোলাপিই। নইলে আগে সে এমনধারা ছিল না। গোলাপি তো তার সামনেই নগারির সঙ্গে কত রসের কথা বলেছে, সে তো কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি, গোলাপির মনে অন্যরকম ছিল।

নতুন পদ্ম-গোখরোটা লখীন্দর বেচে দেবে, এই খবর শুনে যষ্ঠীপদ লাফিয়ে উঠল।'চলো গুরু, শহরে যাই, বাবুটার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।'

সাপ-নিয়ে-লেখাপড়া-করা বাবুটার সঙ্গে লখীন্দরেরও কথা বলার খুব ইচ্ছে, সে সাপের গুণিন, প্রতিটা সাপের নিশ্বাস সে চেনে, তার চেয়ে বেশি আর কে জানে!

সেইকথাই বলল শহুরে বাবু। লোকটার এককাড়ি বয়স না, মুখে ছেলেমানুষ ভাব। ঘরের চারপাশে অ্যাকোরিয়াম, তার মধ্যে বেশ কটা সাপ, একটা কেউটে, একটা লাউডোগ, একটা চিতে। ঢোঁড়া আর মেটেসাপও রেখেছে ক'টা। দেখে লখীন্দরের হাসি পায়। নির্বিষ সাপ কেউ বয়ামে রাখে। মাঠে ছেড়ে দাও, চরে খাক। দেয়ালে কতরকম সাপের ছবি, আলমারিতে কত বই। টেবিলে দু-একখানা বইয়েব মলাটেও সাপের ছবি আঁকা।

শহুরে বাবুটা তাকে অনেকক্ষণ ধরে জেরা করল, কতসব খবর জানতে চায়। লখীন্দরের জীবনভর জানার জগৎ সে ছিঁড়ে খুঁড়ে বার করে আনছে, সাপের নাড়িভুঁড়ির খবর। তার সঙ্গে বাবুটা যত কথা বলছে, ততই উত্তেজনায় উৎসাহে সে লাফিয়ে উঠেছে। লখীন্দর নাকি একটা হিরেব খনি, তাকে খুঁড়লে জগৎসংসার নাকি চমকে যাবে।

পদ্ম গোখরোটার দাম ঠিক হল মোটা টাকায়। লখীন্দর যদি তাকে আরো সাপ ধরে দেয়, তবে ভালো দাম দিতে সে দ্বিধা করবে না। লোকটা আবো বলল, একদিন সে লখীন্দরেব সাপধব দেখতে যাবে।

শহুবে বাবুকে লখীন্দরেরও বেশ ভালো লেগে যায়, যষ্ঠীপদকে বলে, ওই পদ্ম-গোখরোটার সাথে আরো কিছু সাপ দিয়ে আয় যষ্ঠীপদ। আরামে থাকবে, খাবে। বাবু মস্ত বড়োলোক, আব বেশ সমঝদাব।

ডেরায় ফিরতে ফিরতে বেলা দুপুর। যষ্ঠীপদ ফেরার পথে হোটেলে খাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু লখীন্দব রাজি হয়নি। হয়তো পদ্মও এতক্ষণে মুখে কুটোটি কাটেনি। অনেকক্ষণ ধরে যে বিষপিঁপড়েটা কামড় দিচ্ছিল, এখন তার ধার একটু ভোঁতা। নতুন পদ্ম-গোখরোটা বিদেয় হবে ভেবে স্বস্তি পায়। মনে মনে বলে, তর কোনো দোষ নাই রে পদ্ম। ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। গোলাপিটা বাজারে মেয়ে ছিল। বেবাজিয়া হয়ে গেছে, বেশ করেছে!

একরাশ ঘাম, ক্লান্তি আর ভাবনা মাথায় নিয়ে দবজা খুলল লখীন্দর। ঘরে ঢুকেই যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল, তাতে তার হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেল শরীরের। কোথাও উপছে পড়ল এক ঝলক রক্ত, অথবা রক্তের ভিতরে একটা ঘূর্ণি টাল খেয়ে গেল। ঘোরলাগা চোখে দেখল, মেঝের উপবে একজোড়া সাপ। প্রায় লেজের উপর ভর করে শঙ্খ ছড়াচ্ছে। অমন সোনারঙা দুটো সাপের শঙ্খ দেখে লখীন্দর অন্যসময় হলে মুগ্ধ হত, পরিবর্তে তার শরীরে চাবুক মারতে লাগল কেউ। তুই পদ্ম, তুই এমনধারা —

পদ্মও লখীন্দরকে দেখে একমুহূর্ত থমকে গিয়েছিল। তার চোখ আর জিভ মেলে একবার তাকাল লখীন্দবের দিকে, কিন্তু তখন তার শরীরভর্তি ভালোবাসা আর কাম। নতুন পদ্ম- গোখরোটাও বা তাকে ছাড়বে কেন! একলহমা থেমে আবার শরীরে টঙ্কার তুলল তারা, লেজের উপর ভর করে সরে সরে যেতে লাগল লখীন্দরের কাছ থেকে। সেই মুহূর্তে লখীন্দব তার বিছানার তলা থেকে বার করল একটা হাঁসুয়া। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঝলসে উঠল চকচকে ফলাটি, আব মেঝেয় আছড়ে পড়ল দুটো সাপের কাটা মুণ্ডু। লাল টকটকে চোখে সেদিকে তাকিয়ে হিংস্রভাবে লখীন্দব বলে ওঠে তা'হলে তুইও গোলাপির মতো।

মালতীর প্রকারভেদ



পীযূষ ভট্টাচার্য

ছুটে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে অমূল্য, ছুটতে থাকার সময় নিজের দৈর্ঘ্য যতটা লম্বা করা যায় করা হয়েছিল, থেমে যাবার সময় গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে, তাতেই তার শরীরের আকৃতিতে এসেছে বৃত্তময়তা, যেন চাপ খাওয়া স্প্রিং—বিস্ফারিত চোখ— চোখ ছাড়া মুখের ওপর অন্ধকার — যেন মৃত্যুশিবির থেকে কিছু ইচ্ছা বার হয়ে গেছে।

না. সে দেখতে চায়নি. দেখবে না. যদি দেখার হয় অন্য কেউ দেখুক বলে দৌড়ে চলে এসেছিল বাড়ি থেকে। যদিও বাড়ি বলতে নদী যেখানে সহনশীল হয়েও এখানে প্রতিবাদী, খাল হয়ে গিয়ে নিজের রূপকে কাদা মাখিয়ে করে তুলেছে কদর্য। মজাখালের স্রোত ভাঙা মুখ নিয়ে মালতী শুয়ে আছে। যদিও মাথার সিঁদুর ঘামে ভিজে গড়িয়ে যাচ্ছে। অমূল্য দেখে না. তার তো দেখবার কথা নয়, সে শুধু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থ। কিন্তু দরজার পাল্লায় হাত রাখতেই শব্দ করে সামান্য খুলে গিয়েছিল—দরজা খোলা. আত্মহননের জন্য কোনো গোপনীয়তা দরকার নেই যেন! এ পাড়ায় তো এরকমই ঘটে — নূতনত্ব নেই। স্রোত ভাঙা মুখে খিস্তি, সব কিছুর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াও যেমন ঠিক, তেমনই হঠাৎ এক সময়ে নিজেকে প্রকট করে তোলে নিজেদের স্ত্রীঅঙ্গ সমেত, যদিও নিজেকে উপাচার করতে উদগ্রীব নয় কিন্তু বাধ্য। এই ফলিডল খেয়ে শুয়ে থাকাও যেন চরম বাধ্যবাধকতার মধ্যেই পড়ে। এখন তো মালতীর দেহটা ঘিরে নৃত্যরত ছায়ার বিস্তার. যেন এই ছায়া নিজেই লজ্জা পেয়ে কাপড় হয়ে উলঙ্গ মালতীকে জড়িয়ে ধরতে চায়। কিন্তু সমস্ত দিনমানের তাপ রাত্রির চার দেয়ালে দমবন্ধ অমূল্য দাঁড়ায়নি, ছুটে চলে যাচ্ছিল ঈষৎ বেরিয়ে আসা মালতীর জিবের ডগায় যে প্রশ্ন ঝুলে থাকে বা আছে — তার উত্তরের অপেক্ষায় কেউ থাকে না –

সুন্দর মিস্ত্রির টর্চের আলোর বৃত্তের মধ্যে অমূল্য স্প্রিং-এর মতন গুটিয়ে যেতে যেতে দেখে আলোর বৃত্ত ভেঙে যাচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট নিশানা নেই, শুধু চলকে চলকে উঠছে। ব্রিটিশ আমলের প্রাচীন শিশুগাছটির মগডাল ছুঁয়ে পিচ রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। এক সময় সেই আলো স্থির হয়ে যায় মালতীর শরীরে।

এখানে মালতী দু'প্রকার— গায়ের রঙ ফর্সা বলে একজন ধলিমালতী —অন্যজন হাঁটুর নিচ পর্যন্ত একটা পা নেই সে লেংড়িমালতী। আর এ হচ্ছে ধলিমালতী, তাকে দেখেই সুন্দর মিস্ত্রি খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠলে বাতাসে সিমেন্ট বালির গন্ধের সঙ্গে উগ্র দেশি মদের গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে বহে যেতে যেতে ধলিমালতীর সস্তা প্রসাধনের গন্ধের সঙ্গে একাকার হয়ে গা গুলিয়ে ওঠে অমূল্যর। গোটানো স্প্রিং ছাড়া পেয়ে লম্বা হয়ে গতি পেয়ে যায়—আবার ছুটতে থাকে। তখনই পাড়ার ভিতরে একটি ট্রানজিস্টার অচেনা সেন্টারে আর্তনাদ করে উঠলে চলা থামিয়ে চমকে ওঠে। কেউ দেখল নাকি? কিন্তু ট্রানজিস্টার অচেনা সেন্টার পার হয়ে পরিচিত সেন্টারে কোনো এক সুরের খাদে বহে যেতেই সে ঘুরে তাকায়। তখন দেখে ধলিমালতী সুন্দরের টর্চের আলোর বৃত্তের বাইরে চলে গিয়ে বাড়ির দিকে পিচ রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে। সেখানে ছাঁটা চুলের গুচ্ছের মতন অন্ধকার, রাস্তার ঘোলাটে আলোর সঙ্গে কোনো সঙ্গতি নেই, শুধু মিশে আছে মাটির সঙ্গে। এরই মধ্যে তার হাঁটা, ঘাড় ঘুরিয়ে চাউনির মধ্যে মেয়েমানুষের বাড়তি ঐশ্বর্য ঝরে পড়ে। আজ ধলিকে পায়ে হেঁটেই দারোগার বাড়ি থেকে কাজ করে ফিরতে হচ্ছে। অমূল্য রিকশা নিয়ে যায়নি।

'দারোগার ঘুড়ী ঘাস খায় না — দানা খায়' সুন্দর ওখান থেকে খেঁকিয়ে চলা দেখতে থাকে। এক সময় ধলিমালতী যখন সমস্ত শরীরের প্রচলিত অন্ধকার নিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়, সুন্দর মিস্ত্রি শাসায় — 'সমাজ মানবি না তুই?'

ধলিমালতীর নিজস্ব শরীরটা পাতালমুখী নেমে যেতেই অমূল্যকে ছমছম ভয়ের ভিতর এমনই মগ্নতা গ্রাস করে যে, নিজের ছুটন্ত পা-জোড়া কখনই যে আটকে গেছে বুঝতে পারে না। সে কেবলই অপেক্ষা করতে থাকে কখন ধলি চিৎকার করে উঠবে ঈষৎ ফাঁক হয়ে যাওয়া দরজা দিয়ে লেংড়িকে দেখে। কিন্তু কোনো চিৎকারই হয় না, আস্তে আস্তে চতুর্দিক নিঝুম হয়ে গেলে অমূল্য অন্ধকারের চোরাবালির ভিতর ডুবে যেতে থাকে। শালা এই মাগিকে নিয়ে যখন দারোগার বাড়ি থেকে রিকশা চালিয়ে ফিরত রিকশা তো নয় যেন পক্ষিরাজ, উড়েই চলত কিন্তু এখন আর উড়ে চলা ধলির ফিনকি দেওয়া হাসি কোনো কাজেই লাগছে না।

'তুই যে প্রত্তিক দিন ধলিক রিকশা চালায় নিয়া আসিস, পয়সা দেয়?' অমূল্য সুন্দরের প্রশ্নের উত্তরে যদি বলতো— 'ভাড়া দেয়' তবে ঝামেলা মিটে যেত কিন্তু অমূল্য সুন্দরের মাতব্বরি ঢঙের কথাবার্তার উপর এক ঝাপটা মেরে বলে ওঠে — আব্বে দেয় কি না দেয় আমিই বুঝবো তোর কী রে?

সুন্দর রিকশায় ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাং তুলে 'সমাজ বলে—' ধরতাই কথাটা বলতেই অমূল্য এক ঝটকায় ব্রেক কষতেই সুন্দর ছিটকে পড়েই যাচ্ছিল। পড়লে একেবারে ট্রাকের তলায় পড়তো তখন সমাজ নিয়ে ভাবনায় ভর্তি মাথাটা, ধলির চালচলন লক্ষ করবার জন্য চোখ দুটো এবং এলাকার নেতা নেতা মাতব্বরি মারবার ঢঙটা থেতলে কিমা হয়ে যেত। এখন আর অমূল্য পেডেল করছে না, ব্রিজের ঢালু রাস্তায় রিকশা ছুটছে। বিনা কসরতে সুন্দর মিস্ত্রির সমাজ গড়াচ্ছে, রাস্তা ফাঁকা দেখে অমূল্য লাফ দিয়ে নেমে পড়লে সুন্দর মিস্ত্রির সমাজ কাণ্ডারীবিহীন হয়ে ছুটে যাচ্ছে আর সুন্দরের প্রাণপণে চিৎকার 'এটা কিন্তু ভালো হল না—দেখে নেবো'— দেখে নিতে গিয়েই সুন্দর লাফ দিতেই রিকশা সুদ্ধু উলটে একেবারে লেজে গোবরে। — তুই তো মানুষ খুন করবার পারিস্।

অমূল্য দেখছিল সামনের চাকাটা দুমড়ে গেছে, সকালেই মালিকের গ্যাবাজে নিয়ে যেতে হবে — সে হবে খ'ন ভেবে, সুন্দরের কাছে ভাড়া চায়।

— ভাড়া?

— ব্রিজের খাড়াই-এ রিকশা টানলাম তার ভাড়া। নামারটা নাই বা দিলি।

সুন্দর সিমেন্ট বালিতে ক্ষয়ে যাওয়া আঙুল তুলে শাসায়— দেখে নিব। 'নিজের বিয়ে-করা মাগকে দেখ— ধলিক দেখবার হবে না' বলে সামনের চাকা দোমড়ানো রিকশাটিকে পিছনের দু'চাকার উপর ভর করে সাইট করে দেয়। রিকশাটি মৃগয়ার আহত শিকার হয়ে তিন পায়া জন্তুর মতন ঝিমায়। অমূল্য এই সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে, সে নিজে এবং তার একান্ত নিজস্ব আত্মলগ্ন কথাও কোনো এক সম্পর্কের জালে আটকে গিয়ে বেসুরে গান ধরে আর তাতেই লেংড়িমালতী বা ধলিমালতীকে জড়িয়ে সৃষ্টি হয় অন্ধকার।

অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার মতন শরীরটাকে ঘষটে ঘষটে নিয়ে আসছে লেংড়িটা। একটু আগেই লাথি মেরে হটিয়ে দিয়েছে অমূল্য কিন্তু কুঁকড়ে গিয়েও চলে আসছে কেননা সে তো পাপী তাকে তো আসতেই হবে। তখন অমূল্যর প্রশ্ন লেংড়িকে— খুউব কি লেগেছে?

—উম।

'মিছা বলবি না' বলে লেংড়িমালতীর শরীরের কোন অংশে লেগেছে দেখতে গিয়ে দেখে আঘাত আর মালতীর শরীরে চিৎকার করে উঠছে না। তবে কি মিলনের প্রতি আস্থা আছে এখনও? তাই সরল পথে চলতে চায় শরীর! তখনই শরীর দুটো ঘিরে তৈরি হয় এক কালচক্র, রক্তস্রোত উজানে না ভাটায় বুঝবার উপায় নেই— দলা পাকানো মাংসস্তূপের ওপর অন্ধকারের স্থায়িত্ব—

কিন্তু অমূল্য আজ চাইছে সুন্দর এখন বাড়ি ফিরে যাক এবং সর্টকার্ট করবার জন্য তার বাড়ির উঠানের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ঈষৎ ফাঁক হওয়া দরজা দিয়ে লেংড়িকে দেখে চিৎকার করে উঠুক। কিন্তু কোনো শালাই প্রথম দেখার সাক্ষী হতে চাইছে না।

অমূল্য গভীরভাবে ডুব দিতে চায় এই স্রোতহীন অন্ধকারের নদীর ভিতর— সেখানের কোন এক অতলতায় পৌঁছাবার ব্যাকুলতা নিয়ে বসে থাকে যেন এই মুহূর্তেই হঠাৎ করে উন্মোচিত লেংড়িমালতীর সঙ্গে জীবনের প্রথম মৈথুন!

নিটোল মৃত্যুকে কেউ কি দেখে? 'আমি দেখি—আমি-আমি।' কিন্তু কেন সে দেখবে?

থ্রি নট থ্রি ঝুলিয়ে আনিসুরের সঙ্গে এসেছিল বগুড়ার মানুষেরা ক্যাম্পে আছে শুনে। মুক্তি ফৌজি দেখেই ধরণী জিজ্ঞেস করেছিল— 'বাপজানেরা স্বাধীন হইছো।'

উত্তর না দিয়ে আনিসুর লাইটারের দীর্ঘ-নীলাভ শিখায় সিগারেট ধরায়— নীলাভ আলোতে তার মুখের কুঞ্চনে ভীষণ চঞ্চলতা। অমূল্য দেখেছিল ধরণী কী একটা খুঁজছে, অস্থির চোখের মণি আলোর বৃত্তের মতন ঘুরছে এবং এক সময় দৃষ্টি স্থির হয়ে যায় ঘরের ভিতর মালতীর উপর। এপারে আসবার সময় খানসেনাদের চোরা মাইনে একটি পা উড়ে গেছে। সিগারেটের লম্বা টান দিয়ে আনিসুর জানতে চেয়েছিল তারা স্বাধীন বাংলাদেশে যাবে কিনা?

'কী করুম যাইয়া— এই মাইয়া ওপারেও ভিক্ষা কইরা খাওন লাগবে এপারে থাকলিও ভিখ মাঙ্গবার হবে— সবই সমান—'। অমূল্যর মুহূর্তের সিদ্ধান্ত সেই সময়ে— সে এই মেয়েকেই বিয়ে করবে। আনিসুরের কাঁধে থ্রি নট থ্রিটা তুলে দিয়ে বলে 'আপনি ফিরে যান আনিসুর ভাই আমি এই মেয়েকে নিয়া ঘর করুম।'

— সে তো ওপারেও করন যায়।

'যায়', 'দেখি' বলে উদাস ভাবে আকাশে তাকাতেই দেখে কিছু মেঘ হটিয়ে চাঁদটা জেঁকে বসবার চেষ্টা করছে। সে এই ঘোষণাতেই বীর হয়ে যায় ক্যাম্পের দু'পাওয়ালা যুবতিদের কাছে— সে এখন কী করেই বা বলবে লেংড়িমালতী মরে গেছে।

তখন ছিল একজনই মালতী। রিকশা চালিয়ে অমূল্য ঘরে ফিরলে মালতীকে ঘরের কাজে সাহায্য করত— মানুষটা নিজের জীবনের সুখ ভুলে তাকে নিয়েই আছে ভাবতে মালতীর নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হত তাই তার লাঠির উপর ভর করে চলার প্রতিটি পদক্ষেপে লাঠির যে শব্দ তুলত তা যেন পৃথিবীর বুকে কাঠঠোকরা পাখি অনবরত তীক্ষ্ণ ঠোঁটের আঘাতে খুঁড়ে যাওয়া এবং চতুর্দিকে নীরবতার গভীরতা কতখানি তা শব্দের প্রতিধ্বনিতেই বোঝা যেত বলেই অমূল্যর চুপচাপ উপস্থিতিও অভ্যস্ততা পেয়ে যায় একদিন।

'হায় ভগমান একী সব্বনাশ' লেংড়িমালতীর চিলে চিৎকারে দিনটিব শুরু

— বেবুশ্যেটাকে আর রিকশায় তুলবি?

—চুপ গেলি।

মালতী ঝটিতি উত্তর দিয়েছিল 'একটা মাগকে পুষবার মুরাদ নাই— চুপ যাব ক্যান্?'

এমন করে মুক্তিফৌজি পৌরুষে আঘাত সেই বা সহ্য করবে কেন? সে তো অনায়াসে বলতে পারত ধলিমালতী স্বাধীন হবার বছরে এপারে এসেই এঘাট-ওঘাটে ঘুরতে ঘুরতে বেশ্যা হয়ে দারোগার ঘাটে ভিড়েছে। কিন্তু এসব কিছু না বলে সে শুধু 'তোর খাই মেটাচ্ছি' বলে মালতীর দিকে ধেয়ে আসে। এই আক্রমণ তো নতুন নয়, মালতী তো অভ্যস্তই এ আক্রমণে। বুকের ওপর চেপে বসবার পদ্ধতিতে সে তো কেবলই ঝিম মেরে পড়ে থাকত অমূল্যর শরীরের ঘামের উত্তেজক কটুগন্ধের মধ্যে। মালতী নিজেকে বাঁচাবার জন্য নয়, আঘাত থেকে দূরে সরে যাবার জন্যও নয়, শুধু টক্ টক্ গন্ধে কাহিল হয়ে গিয়ে অমূল্যকে কাছে টেনে নিত শরীরের জোর শ্বাস-প্রশ্বাসের মোচড়ে। এ অবশ্য অন্য গল্প।

কিন্তু সেই মালতী লাঠি ফেলে অমূল্যকে হঠাৎ ঝাপটে ধরতেই বিষয়টা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে ভাববার মধ্যেই দেখে সে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে মালতী বুকের ওপর। 'বল মাগীর কাছে যাবি' মালতীর মরিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবেই বা কী করে? দমবন্ধ, চোখ বড়ো হয়ে যাচ্ছে — অদ্ভুত এক অন্ধকার ঘনীভূত চতুর্দিকে যখন তখনই মালতী তাকে ছেড়ে দেয়— কেননা সে এই বিপরীত পদ্ধতিতে অভ্যস্ত নয়।

'এ কী পাপ করলাম ভগমান'। এ কোন পাপের শাস্তির পথ নিজেই বেছে নিয়েছে মালতী। অমূল্যর গায়ে হাত তুলবার জনাই এই কাণ্ড ঘটানো! না, দুটো পা-ওয়ালা ধলিমালতীর কাছে সে হেরে গেছে!

দু'জনের যখন একই নাম তবে আমরা 'সই'— ধলিমালতীর কথার উত্তর মালতী নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল— 'কোথায় সতী-সাবিত্রী আর কোথায় বেবুশ্যে'। অসহায় ধলি অমূল্যর উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কীসের জন্য এমন পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে জীবনে বুঝবার জন্য, 'সই'-এর জন্য অপেক্ষা করে ফিরে গিয়েছিল।

নিজের কাছে নিজেরই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা নিরর্থক এখন— অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরের জন্য সামনের দিকে তাকায় অমূল্য। এই নির্জন শূন্যতা— স্রোতহীন নদীর বুকে কুয়াশার আগ্রাসন — ব্রিটিশ আমলের

পুরোনো বাড়িটার ভেতর পরিত্যক্ত সাপের খোলসও হাওয়ায় সচল হয়ে যে-কোনো সময়ে ফণা তুলতে চায়। কোন স্বাধীনতার জন্য লড়াই ছিল সেদিন? বাতিল মুক্তি ফৌজের থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলি কি স্বাধীনতার শত্রুকে বিদ্ধ করেনি। সে শুধু পিছিয়েই যাচ্ছে — পিছিয়ে যাচ্ছে দলবদ্ধ মানুষের কাছ থেকে। ইদানিং তার রিকশা চলতে চলতে পিছিয়ে পড়লে প্যাসেঞ্জার জোরে চালাবার তাগাদা দিলে, ওভারটেক করতে বললে সে রিকশা থামিয়ে বলত— 'রিকশা এভাবেই চলবে, তাড়া থাকলে অন্য রিকশায় যান।' চোরাপথে কোন এক আত্মসম্মানবোধ খেলে যেত তখন— তবে কি সমস্ত চলার ধরনটাই ভুল! কই কেউ তো এখনও চিৎকার করে উঠছে না মালতীকে দেখে। তবে কি এখন আর কেউ মৃতকে দেখে না। সচল ধলিমালতীকে দেখে— সে এখন দারোগার বাড়ি থেকে ফিরে নির্জন বিছানায় কীভাবে ঘুমাবে? একথাই কি ভাবে সকলে?

সেই বা কেন ধলিমালতীর কথা ভাবছে?

একসময় রাত গভীরতায় চলে গেলে স্যাঁতসেঁতে জ্যোৎস্নার ভিতর ঘরে চালে গুটি ধরা চালকুমড়া উপর থেকে ফুল খসে পড়বার শব্দ বাতাসে ভাসে। এ তো সেই একই ছবি। যদি ধলিমালতী দারোগার মেজাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত আপাতত একটা হিল্লে হয়ে যেত। এসব কিছুই না হয়ে শিশুগাছটির ডালে বাতাস আটকে তাচ্ছিল্যের শব্দ হচ্ছে। পরিত্যক্ত ব্রিটিশ কোয়ার্টারে কপাটশূন্য দরজা-জানালাগুলোর হাঁ-মুখে গভীর শ্বাস নেবার আওয়াজ। সে বুঝতে পারছে না— কেন যে ধলিমালতী লেংড়িকে বলেছিল, দারোগার দেওয়া বাহারি ব্রেসিয়ারটা অমূল্যই দিয়েছে। ডাহা মিথ্যা কথাটা কেন যে বলল?

ছায়ার মতন কিছু একটা জাপটে ধরতেই সে সরে গেল— লেংড়ি যেন পাশে শুয়ে— অভ্যাসবশে সরতে সরতে ঘুম ভেঙে যায়। জেগে উঠে অমূল্য ভাবতে থাকে— কেউ নিশ্চয় লেংড়িকে দেখে প্রথম চিৎকার করেছে ঘুমের মধ্যে সে শুনতে পায়নি।



সংসার

হুমায়ূন আহমেদ

মজিদেব বযস সাড়ে চাব বছব। এই বযসেই সে তাব বাবাব প্রতিভাব একজন মুগ্ধ সমঝদাব। আজ তাব মুগ্ধতা আকাশ স্পর্শ কবেছে। কাবণ তাব বাবা কুদ্দুস মিযা তাকে একটা ইঁদুব ধবে দিযেছে। শুধু ধবে দেয না, লাল সুতা দিযে ইঁদুবেব লেজ বাঁধা। সুতা ছেড়ে দিলে ইঁদুব কুট কুট কবে হাঁটতে থাকে। সুতা টেনে ইঁদুব কাছে আনা যায।

মজিদ তাব সাড়ে চাব বছবেব ক্ষুদ্র জীবনে অনেক বিস্ময়কব জিনিস তাব বাবাব কাছ থেকে উপহাব পেযেছে। এমন বিস্ময়কব কিছু পাযনি। ইঁদুবেব সুতা ধবে তাব আনন্দে প্রায কান্না পেযে গেল।

কুদ্দুস মিযা পুত্রেব আনন্দ কিছুক্ষণ দেখল। তাবপব উদাস ভঙ্গিতে একটা বিড়ি ধবাল। তিনটি মাত্র বিড়ি আজ তাব সাবাদিনেব সম্বল। দিন সবে শুব হযেছে। এব মধ্যেই একটা অকাবণে খবচ কবে ফেলা নিতান্তই বেকুবি তাবপবেও কুদ্দুস মিযা বেকুবিটা কবল কাবণ ছেলেব আনন্দিত মুখ দেখে তাব মনটা উদাস হযেছে। মন উদাস হলে বিড়ি সিগাবেট টানতে ইচ্ছা কবে।

মজিদ বাবাব দিকে তাকিযে বলল বাবা ইন্দুব কামড় দয?

কুদ্দুস মিযা না সূচক মাথা নাড়ল। ছেলেব সঙ্গে সে কথাবার্তা খুব কম বলে। ছেলেমেযেদেব সঙ্গে কথা কম বলাই নিযম। বেশি কথা বললে প্রশ্রয দেওযা হয। প্রশ্রয দেওযা ঠিক না। প্রশ্রয পেলে ভয ভক্তি কমে যায। কুদ্দুস মিযাব ধাবণা ছেলেমেযে মানুষ কবাব সবচেযে উত্তম পদ্ধতি হল তাদেব দিকে একেবাবেই নজব না দেওযা অকাবণে কথা না বলা। কিছুতেই যেন বাবাব ভালোবাসাব প্রকাশ এবা টেব না পায। ভালোবাসা প্রকাশ কবাব জিনিস নয ভালোবাসা গোপন বাখাব জিনিস। যে ভালোবাসা যত গোপন সেই ভালোবাসা তত গভীব। এই যে মজিদ ইঁদুব নিযে খেলছে খেলাটা দেখতে তাব ভালো লাগছে। সেই ভালোলাগা পুত্রেব টেব পাওযা খুবই ভুল হবে। কাজেই সে আকাশেব দিকে তাকিযে বিড়ি টানতে লাগল। তাব এই ঘব থেকে আকাশ দেখা যায এটাও এক আনন্দেব কথা। তবে এটাকে ঘব বলা ঠিক হচ্ছে না। পাইপ ঘব বলা যায। এক মাসেব উপব হল তাবা উঠে এসেছে সিউযাবেজ পাইপে। শুবতে কুদ্দুসেব কঠিন আপত্তি ছিল। পাইপেব ভেতব মানুষ থাকে? বাতে ঘুমেব মধ্যে পাইপ গড়াতে শুব কবলে তখন? তাব ইচ্ছা ছিল মনোযাবাব সঙ্গে সে একটা কঠিন ঝগড়া কবে। শেষ পর্যন্ত ঝগড়াটা কবল না মেযেছেলেব সঙ্গে ঝগড়া কবে ফাযদা কি? এবা যুক্তি বোঝে না। আলাহপাক যুক্ত বোঝাব ক্ষমতা এদেব দেন নাই। তাছাড়া মনোযাবা সংসাবেব জন্য খেটে মবছে। তাব সামান্য কথা শুনলে সে খুশি হয হোক। মানুষকে খুশি কবাব মধ্যেও সোযাব আছে।

মিবপুব ইলেকট্রিক সাব অফিসেব মাঠে জমা কবে বাখা গোটা পনেবো পাইপেব মধ্যে একটায তাবা দখল নিযেছে। পাইপগুলো দূব থেকে যত ছোটো মনে হয আসলে তত ছোটো না। ঝড়বৃষ্টিব সময বড়োই আবাম। বৃষ্টি একটা ফোঁটাও ভিতবে আসে না। পাইপেব দুই মাথা পলিথিন দিযে ঢেকে দিলেই হল। সবচেযে বড়ো সুবিধা মশাব যন্ত্রণা নাই। প্রথম দুই বাত ঘুমাতে একটু কষ্ট হযেছিল। দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছিল। মনোযাবাকে সে এক সময বলেই ফেলল,

—ও বউ। মনে হইতেছে কববেব ভিতবে শুইযা আছি। মানকেব, নেকেব আইস্যা সোযাল-জোযাব শুরু কবব। মনোযাবা জবাব দেযনি। স্বামীব অধিকাংশ কথাব সে কোনো জবাব দেয না। এটা এক ধবনেব বেযাদবি। বোজ হাশবে মনোযাবা এই বেযাদবিব কাবণে বিপদে পড়বে। কুদ্দুস ঠিক কবে বেখেছে সুযোগ সুবিধা মতো বিষযটা সে স্ত্রীকে বুঝিযে বলবে। সে বকম সুযোগ সুবিধা হচ্ছে না। মনোযাবাব মেজাজ খুবই খাবাপ যাচ্ছে।

মনোয়ারা কোনো জবাব না দিলেও মজিদ উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, মানকের নেকের কে বাপজানে?

কুদ্দুস পুত্রের কৌতূহলে আনন্দিত হয়। মানকের নেকেরের সোয়াল-জবাব বিশদভাবে বলতে যায়—

'এরা হইল আল্লাহ্ পাকের দুই ফেরেশতা। এরা আইস্যা পরথমে বলে...তোমার রব কে? তারপর বলে, কে তোমার রসুল? তারপরে বলে....'

মনোয়ারা চেঁচিয়ে বলে, চুপ কইরা ঘুম যান। দিক কইরেন না।

এটাও আদবের বরখেলাফ। স্বামীকে ধমক স্বামী বড়োই আদরের জিনিস, তারে ধমক দেওয়া যায় না। এর জন্যও রোজ হাশরে মনোয়ারার জটিল অসুবিধা হবে।

মনোয়ারার ধমকে কুদ্দুস খানিকটা উদাস হয়, তবে বিচলিত হয় না। যে সংসারের জন্য এত খাটাখাটনি করে তার কিছু ভুলত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখা যায়। এই যে থাকার জন্য পাইপে সংসার পেতেছে মনোয়ারার জন্যই সম্ভব হয়েছে। এইসব খোঁজখবর সেই রাখে। গত শীতে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কিছু কম্বল দেওয়া হয়েছে। সংখ্যায় অতি অল্প। মনোয়ারা সেই কম্বল দুটো জোগাড় করে ফেলল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একটা তারা বিক্রি করেছে। বিয়াল্লিশ টাকায়। দর ভালো পেয়েছে। অনেকে কুড়ি পঁচিশ টাকায়ও বিক্রি করেছে। সেই টাকা জমা আছে। একদিন রিশা কেনা হবে। মনোয়ারার ধারণা তাদের একটা নিজস্ব রিশা থাকলে সব সমস্যাব সমাধান হয়ে যাবে। মেয়েছেলে যে কী পরিমাণ নির্বোধ হয় এটা তার একটা প্রমাণ। রিকশা চালানোর শক্তি কি তার আছে? একটা পা বলতে গেলে অবশ। সে যে দিন-রাত ঘরে বসে থাকে অকারণে থাকে না। উপায় নেই বলেই থাকে। কোনো কারণে পা ঠিক হলেও ঢাকা শহরে মোটর গাড়ির যে উৎপাত এর মধ্যে রিকশা চালানো সহজ কথা? জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার। বেবিটেক্সি হলে ভিন্ন কথা ছিল। কলের ইনজিন। চালিয়ে আরাম, চালানোর মধ্যে একটা ইজ্জতও আছে। রিকশাওয়ালাকে সবাই তুই-তুমি করে। বেবি টেক্সিওয়ালাকে বলে আপনি করে। ইজ্জত ছোটো করে দেখার কোনো বিষয় না।

কুদ্দুস অবশ্যি এখনো কিছু বলছে না। সময় হোক। সময় হলে বলবে। রাগারাগি চিৎকার করবে না। মেয়েছেলে অবলা প্রাণী, এদেব সঙ্গে রাগারাগি করা যায় না। বুঝিয়ে বলতে হবে। তবে কুদ্দসের ধারণা বুঝিয়ে বলারও দরকার হবে না। রিকশার টাকা জামানো তো সহজ কথা না। বিপদ আপদের কি কোনো শেষ আছে? হুট করে একটা বিপদ আসবে। খরচ করো টাকা। গত ভাদ্র মাসে যে রকম বিপদ এসে ঘাড়ের উপর পড়ল, মনে হলে এখনো গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। তারা তখন পাকা দালানে মোটামুটি সুখেই ছিল। কল্যাণপুরে আটতলা দালান হচ্ছিল। কী কারণে কয়েক বছর ধরে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। ওই বাড়ির বিভিন্ন ঘর তাদের মতো মানুষেরা সেলামি দিয়ে ভাড়া নিয়ে থাকে। তারাও দু'শ টাকা সেলামি দিয়ে চারতলায় উঠে গেল। সিঁড়িতে রেলিং নাই —এইটাই সমস্যা। অন্ধকারে উঠতে নামতে ভয় ভয় লাগে। পরিবেশও খুব খারাপ, আজেবাজে মেয়েছেলে থাকে। রাদদুপুরে হুল্লোড়। এই সব জায়গায় সংসার করা ঠিক না। তারপরেও ছিল, উপায় কি? তখন বড়ো মেয়েটা পরল অসুখে, কথা নাই, বার্তা নেই, আকাশ পাতাল জ্বর। তবে চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই। মনোয়ারা তার জমা টাকার প্রতিটি পাই-পয়সা খরচ করেছে। আজেবাজে মেয়ে যে কয়টা ছিল তারাও সাহায্য করেছে। মেয়েটার মৃত্যুর পর আজেবাজে মেয়েগুলোও গলা ফাটিয়ে কেঁদেছে। রোজ হাশরে এই মেয়েগুলোর বিচার হবে। তখন কারোর সুপারিশ কাজে লাগবে না। যদি কাজে লাগত তাহলে অবশ্যই কুদ্দুস সুপারিশ করত। আল্লাহ পাককে বলত, ইয়া পরওয়ারদেগার, ইয়া গাফুরুর রহিম! তুমি এই মেয়েগুলোরে ক্ষমা করে দিও। এরা অভাবে পড়ে মহা অন্যায় করেছে। এই অভাব তোমারই দেওয়া। তুমি অবশ্য পরীক্ষা করার জন্যই অভাব দিয়েছ। এরা তোমার জটিল পরীক্ষা পাস করতে পারে নাই। কিন্তু মেয়েগুলোর অন্তর ভালো ছিল।

বড়ো মেয়েটার কথা কুদ্দুসের প্রায়ই মনে হয়। তখন মনটা উদাস হয়। মেয়েটা বড়োই সুন্দর ছিল। ছবি দেখার পোকা ছিল। সবসময় ঘ্যান ঘ্যান করত —বাপজান ছবি দেখব। ছবি দেখা বিরাট খরচান্ত ব্যাপার, তাছাড়া মনোয়ারা পছন্দ করে না। লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েকবার মেয়েকে ছবি দেখিয়ে এনেছে। ছবির মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু নাই। টাকা নষ্ট, তারপরেও শিশুর আবদার বলে কথা। শিশুদের প্রশ্রয় দিতে নাই, কিন্তু তাদের দু একটা আবদার রাখতে হয়। এই বিষয়েও নবীজির নির্দেশ আছে, নবীজির শিশুদের স্নেহ করার জন্য কঠিন নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

কুদ্দুস নবীজির নির্দেশ মেনে মেয়েটাকে স্নেহ করেছে। প্রয়োজনের বেশি করেছে। করা উচিত হয় নাই। আর একটু কম স্নেহ করলে তার মৃত্যুতে কষ্ট কম হত।

তবে আল্লাহ পাকের হিসাবে ঠিক আছে। মেয়েটা বেশি সুন্দর ছিল। বড়ো হলে মেয়েকে নিয়ে বিপদ হত।

স্নেহ দেখানোতে বিপদ আছে বলেই মজিদকে সে স্নেহ কম দেখাচ্ছে। ইঁদুরের বাচ্চা ধরে দিয়েছে। এতে অনেকখানি স্নেহ দেখানো হয়ে গেছে। কোনো এক ফাঁকের কঠিন একটা ধমক দিয়ে স্নেহ কমিয়ে দিতে হবে।

'বাপজান!'

'উ!'

'ইন্দুর কী খায়।'

'যা পায় খায়। চিড়া গুড় মুড়ি, কাগজ, লোহা খায় না এমন জিনিস নাই। ইঁদুর আর ছাগল দুইজনেই একপদের, খাওনে উস্তাদ।'

মজিদ চোখ বড়ো বড়ো করে বাবার কথা শুনে, এতে বড়ো ভালো লাগে কুদ্দুসের। মনোয়ারা আজকাল আর তার কথা শোনে না। কিছু বলতে গেলে বলে চুপ যান। দিক কইরেন না।

মজিদের কথা বলতে ইচ্ছা করে। সংসার ধর্ম করতে হলে কথা বলতে হয়। কথার মধ্যেই থাকে ভাব-ভালোবাসা। কথা না থাকলে ভাব-ভালোবাসা আসবে কীভাবে? মনোযারা এই সহজ সত্য বোঝে না। তার শুধু রোজগারের চিন্তা। পথের ফকির হওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে। আমাদেব নবীজিও বলতে গেলে পথের ফকির ছিলেন।

'বাপজান! বাপজান!'

'উ!'

'ইন্দুরটার খিধা লাগছে।'

'তোর নিজের লাগছে?'

মজিদ লাজুক ভঙ্গিতে হাসে। কুদ্দুসের বড়োই মায়া লাগে।

'তোর মা আসুক ব্যবস্থা হইব।'

খিধের কথায় কুদ্দুস নিজেও খানিকটা অস্থির বোধ করে। তার নিজেরও খিধে হচ্ছে। প্রবলভাবেই হচ্ছে। ঘরে খানিকটা চিড়া ছিল। দুপুরে ভিজিয়ে মজিদকে দেওয়া হয়েছে। কুদ্দুসের ধারণা ছিল মজিদ খানিকটা হলেও বাবার জন্য রেখে দিবে। তা রাখে নাই। বড়ো মেয়েটা বেঁচে থাকলে অবশ্যই রাখত। মায়ের জাত তো, চারদিকে নজর না করে এরা খেতে পারে না এটাও আল্লাহ পাকের হুকুমে হয়। আল্লাহ পাকের সবদিকে খুব কঠিন নজর।

'খিধা লাগছে বাপজান।'

'একবারতো শুনছি। এক কথা একা' বার বলনে ফয়দা নাই। দিক করিস না।'

মজিদ চুপ করে যায়। ইঁদুরের বাচ্চা নিয়ে খেলে। সুতা ধরে ঝুলিয়ে রাখে। ক্ষুদ্র প্রাণীটি ছটফট করে। মজিদ তাতে মজা পায়। কুদ্দুস আরেকটা বিড়ি ধরায়। বিড়িটা ধরায় খিধা কমানোর জন্য। বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া খিধার জন্য বড়ো উপকারী। তবে মনে ক্ষীণ সন্দেহ হয় মনোয়ারা যদি খালি হাতে আসে। কী উপায় হবে? জমানো টাকা সে খরচ করবে না। বড়োই কঠিন মেয়ে। এই টাকায় সে রিকশা কিনবে। কে চালাবে তার রিকশা? কিছুই বলা যায় না। হয়তো সে নিজেই চালাবে। বড়োই কঠিন মেয়ে। তার অসাধ্য কিছুই নাই। মেয়েটার এখন কিছুটা মাথা খারাপের মতো হয়ে গেছে। রোজগারের কোনো পথ দেখছে না। কুদ্দুসকে সে কিছু বলে না। কিন্তু সে বুঝতে পারে।

মনোয়ারা রাত ন'টার দিকে ফিরল। মনোয়ারাকে দেখে কুদ্দুসের বুক ধ্বক করে উঠল। কারণ মনোয়ারার পেছনে ভদ্রলোক কিসিমের এক লোক। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, হাতে রুমাল। মাঝে মাঝে নওশার মতো সেই রুমাল নাকে চেপে ধরছে। সেই লোক সন্দেহজনক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখছে। খুক খুক করে কাশছে। এই দৃষ্টি, এই কাশি, নাকে চেপে ধরা এই রুমাল কুদ্দুস চিনে। সে বড়ো বিষণ্ণ বোধ করে।

কুদ্দস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। বেহেশতে তার একটা সুন্দর সংসার হবে এটা সে ধরেই নিয়েছিল। মজিদ,

সরিফা আর তার স্ত্রী মনোয়ারাকে নিয়ে অতি সুন্দর সংসার। সেখানে ছবিঘর থাকলে মেয়েটাকে রোজ ছবিঘরে নিয়ে যেত। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর চারজনে মিলে দাওয়ায় বসে গল্পগুজব। বেহেশতে নিশ্চয়ই চাঁদনি আছে। চাঁদনি পসরে গল্পগুজবের মজাই অন্য। এখন মনে হচ্ছে বেহেশতের সেই সংসারে মনোয়ারার স্থান হবে না। রোজ হাশরে মনোয়ারা কঠিন বিপদে পড়বে। স্বামীর সুপারিশ সেদিন গ্রাহ্য হবে না। গ্রাহ্য হলে সে অবশ্যই বলত, আল্লাহপাক এই মেয়ে তার সংসার বড়ো ভালোবাসে। সে যা করেছে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্যই করেছে, স্বামী হয়ে আমি তাকে ক্ষমা করেছি। তুমিও তাকে ক্ষমা করে দাও।

মনোয়ারা কুদ্দুসের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, আফনে মজিদের লইয়া একটা খুইরা আহেন। কুদ্দুস মজিদকে কোলে তুলে নিল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে মনোয়ারা। তার দিকে তাকিয়ে বড়ো মায়া লাগে কুদ্দুসের। মজিদের হাতে ধবা সুতার মাথায় ইঁদুর ঝুলতে থাকে। মানুষের নিষ্ঠুরতায় সে ইঁদুর বড়ো কাতর বোধ করে।

ক্ষুর ও ব্রহ্মকমল



বীরেন শাসমল

ছায়ার ভিতর ছায়া ছিল। আমের ভিতর আঁটি।
কথার ভিতর কথা ছিল। ছিল দুধের বাটি।
পিঠার ভিতর পুর ছিল। স্বজন ছিল দূর।
জামার ভিতর জামা ছিল। আর ছিল এক খুর।

এইখানে আমলকী বন কেঁপে উঠেছিল।

সে নাকি ক্ষুর দেখেছে।

আজ শরৎ নয়।
তবু পাতা খসানোর শুরু হয়ে গেল।
আজ।

পাঁচালির সুরের মতন মিঠা মেয়ে দ্রৌপদী। সেই দ্রৌপদী সতী হল। তার আঁচল গাছাটি খসা। কবরীর চুল এলোমেলো। তার হাত-কাঁকনে পাথরের ঘা। বুকের ওপর বনবিড়ালের আঁচড়। চোখ-ফুলে দ্বিতীয়ার চাঁদ। সারা মুখে তার মেঘের যাওয়া-আসা। হাওয়ায় বাদল রাতের গুম্‌রি-কাঁদন। ডাহুকীগলার বিষ।

কে খেলো গো বিষ? কে গেল?

সেকি যায় লো! সে যে থেকে যায়। সে এখন পূজার থালের আগে শুয়ে আছে। প্রাণ নেই তবু প্রাণের যাতনা। গা-ভর ধূপের গন্ধ। হায় হায়! অমন চাঁদের বগ্লো মেয়ে। কাজ কী রে তোর ঘোম্‌টাখানি দিয়ে? গা রাখ্‌লি এই অকালে, হায়! অত্‌সকালে সাঁঝের নাও বায়?

দ্রৌপদী এইখানে ছিল।

এই ছায়ার ভিতরে। এইখানে গাছেদের জটলায় সে দাঁড়িয়ে কথা কইত। এইখানে রূপবতীর রূপ দেখে মজেছিল রূপবান।

লম্বা, দোহারা চেহারা। গায়ের রঙ মাজা। কান দুটি খরগোশের মতন লম্বা। এবং খাড়া। চোখে বন-তিতিরের দিষ্টি। গমনে উটপাখি, ঝুঁটি উঁচু করলে লড়ুয়ে মোরগ। সবে একুশ ডিঙিয়েছে রূপবান। গা-গঞ্জে বিয়ের জল আগেই ছিঁচে দিয়েছে প্রকৃতি। একদা প্রদোষকালে যুবা-আলোতে সে দ্রৌপদীকে দেখিয়া মরিল। যা হয়। ভিডিওতে মায়নে প্যার কিয়া দেখেছে। গান শুনেছে দিল হুম হুম করে। পথে যেতে ষাঁড়কে দেখেছে গাইয়ের গা চাটতে। দুই পাখিতে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে কথা বললে থমকে দাঁড়িয়েছে। বসন্তসমাগমে গাছে গাছে ফুলের কোরকে দামড়া ভোম্‌রার লুঠতরাজ আর পেছন বাঁচিয়ে উড়ে যাওয়া। এসব দেখার পর মত্ত বর্ষণকালে তার ভেতর মাটি সোঁদা গন্ধ মাছের আঁশটে গন্ধ আর মেয়েছেলের শরীর গন্ধ। বসন্তে উড়ন হাওয়ার আউলানি। ফুলগুলি, মেঠো ফুলগুলি অকারণে হাসে। গায়ে ঢলে ঢলে পড়ে কচিপাতা, হাওয়ায় হাহাকার আর কোকিলার কাঁদন তার বুকে ঢুকে পড়েছে।

সে এখন ঝানু যুবক।

দু-দুবার বারো ক্লাসে ফেল মেরে এখন বিমলের প্যান্টে তিনটে চারটে ক্রিজ দিয়ে, বিন্নী লজ্জা থ্রিডির হালফ্যাশনের ছিটকাপড়ে পেছনে প্লিট দিয়ে, প্যান্টের ডিজাইন চার্লি চ্যাপলিনের মতন ঢোল করে কোলকাতা থেকে বাটা কোম্পানির জুতো কিনে এবং বাপের নগদা তিরিশ চল্লিশ হাজার খরচা করে একটি ভি সি আর কিনে সস্তায় তামিল ছবির ক্যাসেট নিয়ে এসে উদোম গা দেখে গরুর মতো গা কাঁপিয়ে যখন শরীর শুঁকতে শুরু করেছিল।

তখনই দ্রৌপদীকে দ্যাখে।

দ্যাখে এবং টলে যায়।

যুবক।

আগুপাছু বিচার করল না। জলে ঝাঁপ দিল।

দুই

ভুবনে ভুবন দিয়া।

বাণে চন্দ্র মিশাইয়া।

ঋতু তাতে করিল ক্ষেপণ—

আহা গো। অমৃতভাষী পদকর্তার কথার এপিঠ ওপিঠ দুপিঠ দেখায় কীর্তনিয়া।

পালাগানের আসরে দ্রৌপদীর শাড়ির একদিক দেখে চুপটি মেরে আছে রূপবান।

পালাগায়ক বোঝাচ্ছে চোদ্দ চোদ্দ আটাশ ভুবন। তার সাথে পঞ্চবাণ। তার সাথে এক ঋতু। কত হল গো মা জননীরা? নারীমহলে গুঞ্জন। কে ভাঙে পালার আখরের রহস্য?

দ্রৌপদী উঠে পড়ে বলল— চল্লিশ।

তারপর?

চল্লিশ সেরে হয় এক মন।

তারপর?

রাধা কৃষ্ণের জন্য মালা গাঁথছে একমনে।

সাধু, সাধু। এ কন্যে তো কন্যে নয়, দেবী।

রূপবান দেবীর পদতলে। দেহি পদপল্লবমুদারম। পদকর্তার গান গায়কের মুখে ঘোরে।

পদ্মা, তুমি কী ভাগ্য করেছিলে গো! দাও তোমার রাঙা পা দুখানি। তুমি কৃষ্ণ দরশন করেছ, সৌভাগ্যবতী তুমি।

রূপবান তাকিয়ে আছে দ্রৌপদীর শাড়ির দিকে। আধা-আঁধারে হ্যাজক লাইটের তলায় পোকায় ঝাঁক বেঁধেছে। দ্রৌপদী য্যান হ্যাজাকলাইট। তার চারপাশে পোকা। কিন্তু আমার তো তাকে চাই। রাধা বিনে প্রাণ বিসর্জন দোব যমুনার জলে। ঝকমক করে ওঠে রূপের বৈভব। আমি পোকা হব ও গো রানি। দেব খোঁপায় তারার ফুল। মাঝখানে কিছুদিন গানের শখ হয়েছিল বাবাজী রূপবানের। গানের সুর চিনে তাল চিনে ভাঙা লাইন ঘুরে মরে এ ছার পরাণে।

চোখাচোখি হল। উদাস বাউলে গেয়ে গেল। হাওয়া বয়ে নিয়ে গেল হাতচিঠি। দেখা হওয়া সেই স্থানটি মন্দির হয়ে গেল। ঘরে মন টেঁকে না। ছেলে বাউণ্ডুলে হল। চোখের কোণে কালের কালি। যৌবন থমকে যায়। ছেলে আমার বাড়ছে না তেমন। কুটে মেরে যাচ্ছে। কোন রাঁড়ির ঝিতে বাণ মেরেছে! মা বাপকে বোঝাল, ছেলের বে দিয়ে দাও।

বাপের ফলন্ত চেহারা। এথায় ধানের তো ওথায় পানের! মাটির বুক ফাটিয়ে দুধ তুলে নেয় সে। সে দুধে তার চাষ হয়। সোনার কুঁড়ি হয়। সম্পন্ন চাষি। ব্যবসাপাতি বোঝে। জাতে তিলি। রক্তে তেজারতি। কারবারী বংশের ছড়ানো ঝাড়। লোকে বলে গুছোঁচা তিলি। তিলির দুকিসিম আছে। ঘানি-আছে তিলি, আবার ঘানি টানায় না এমন তিলি। দুকিসিমে উঁচা নিচা নিয়ে কাজিয়া আছে। মান অপমান আছে। ঘানি-নেই তিলি বড়ো। মেয়ে খুঁজতে লাগে বাপে। নি-ঘানি তিলির ঘরের মেয়ে। দেবে থোবে এই মেলা— খোঁজে। নি-খাকী বংশে উঠব না। ছেলে আমার ফ্যালনা নয়। রূপবান ঘোষণা করে, বিয়ে করব না।

কেউ দেখতে এলে মেয়ের বাড়ি থেকে, সে পালায়।

এর মধ্যে পাড়ার এক বুড়িকে হাতেপায়ে ধরে রূপবান। তার তো পায়রা নেই। ঘোড়া নেই। বুড়ি দূতী হয়। গুয়াপান নিয়ে চুপিচুপি দেখা করে দ্রৌপদীর সাথে।

দ্রৌপদীর ঘর-গেরস্তি বড়ো ছোটো। দেখবার সীমানা ছোটো। ডানা ভেঙে যাবার ভয়ে সীমানা ছাড়িয়ে সে

ওড়ে না। ছোট্ট তার আকাশ। সে আকাশে তার বাপের চালাঘর। নিচু উঠোন। একটুকরো দাওয়া। দুটি গোরু। চারটি ছাগল। বাপ মা ভাই আর বাঁশগাছের মাথা, অর্জুন গাছের ঝুলে-পড়া ডালে মাছরাঙা। পচা এঁদোপুকুরের ঝিমকালো জল। নিজের ঘর বলতে আঁচলটি। আঁচলের তলায় ধুকধুক প্রাণটি। লুকিয়ে দেখে ফেলা নিজের বুকের আদল। গায়ের আড়বাড়। আয়নায় ভেসে ওঠা সুন্দর মুখের ডৌল, সুছাঁদ সুডৌল। এমন চাঁদ এমন ঘরে কেন গা? ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো সয় না যে।

এ দেখে যায় ও দেখে যায়, দ্রৌপদীর ভয় করে।

তুরিপিসি একটা খাসী পুষত।

ফি-সপ্তাহে একজন করে ব্যাপারি আসত। দেখে যেত। ব্যাপারি দু-হাতে শরীর তুলে ধরে ওজন আন্দাজ করে বলত, কত আর হবে? ছোটোতে দেবে তো দাও। পিসি বলত, অ-রে মুখপোড়া, আরো চারকেজি বাড়বে। ব্যাপারি বলত কচি খাসীতে ভালো দাম। পিসি বল্‌ত যা রে ড্যাক্‌রা। সেই খাসীটাকে একদিন দিনের বেলা মাঠের ধারে চার শেয়ালে মেরে ভোজ খেল। তার তো ছিল দুদিক করাত। মানুষে খেলেও খাবে, শেয়ালে খেলেও খাবে।

দ্রৌপদী ,যালোয় পা দিয়ে কাঁচা চিবুতে লাগল চারদিক। অন্তত অভিজ্ঞ লোকে তাই বলে। রূপের আলোয় ত্রিভুবন আলো। দর্শদিশ জিনি মুখচন্দ্র।

তোমার এমন বাড় কেন? এমন ঝলক কেন? একঝাঁক মেয়েছেলের মাঝে তোমার মুখ হল বিজলীর চমক্‌। এমন চমক গরিবের মেয়ের হয় কেন?

গাঁয়ের দশবিশ জোয়ান বলে, আমি দ্রৌপদীকে লুবো। যেন বলটল হবে, লুফব।

দ্রৌপদীর চালাঘরের চারদিকে অনেক কাক। একা বসে কর কী/এসো বাছা ঠুক্‌রে দি।

দ্রৌপদী বোঝে কিছু। কতক চাউনি ধরতে পারে। আবার কতক ছলার কাছ মাড়ায় না। সে ভারি ভালো মেয়ে। গা ঢেকে রাখে আঁচলে। আঁচল তার ঘর। কেউ এসে কপাটে ঠকঠক করলে তার বাপে খুর দেখায়। খুর তার অস্তর। গলা কেটে দেবে যে চোখ ফেলবে।

খুর নিয়ে বড়ো ভয় হয়।

দ্রৌপদী নাপতেব মেয়ে। ছোটো জাত। চাকরবাকর। কাজ হল খেউরী করা। দাড়ি গোঁফ বগল কামিয়ে দেযা, পায়ের হাতের নখ কেটে দেয়া, উৎসবে ব্যসনে পুজো আচ্চায় গেরস্তের মিষ্টির হাঁড়ি আত্মীয়তার গুয়াটি বয়ে দিয়ে আসা। ফেরার সময় বিদেয় নেওয়া। মানে দক্ষিণা নিয়ে বাড়ি ফেরা। নাপতের আর কিছু নেই, আছে একটি ধারাল খুর। রাত বিরেতে সে মেয়ে পাহারা দেয়। আয়, এই খুর দিয়ে চুল কাটি, আবার এই খুর দিয়ে গলা কাটব। মেয়েকে নিয়ে গর্ব তার। আলোর মতো মে'য। যায় না মেয়ে আঁধার খেয়া বেয়ে। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

মেয়ের জন্যই ছেঁড়া-ছোকরাগুলো ভিড় করে। চুল বাড়েনি তবু বলে চুল কাটতে এসেচি। দাড়ির দেখা নেই তবু দাড়িকামানোর সাধ। ছলকল সব তার জানা। মনটা কু-গায়। মেয়ের গতরে তার রোজগার বাড়ে বটে। নিজের ওপর ঘেন্নাও বাড়ে।

তিন

রূপবান চুল কাটতে যায় না।

তার চুল বাড়তে থাকে। সে যায় শুধু শুধু। সকাল বিকাল সংকীর্তনের ফেরতাই।

লেগে থাকলে কী না হয়। কী না হতে পারে! পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করতে পেরেছিল শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে। সেও দ্রৌপদীর নাম নেয়। দ্রৌপদীময় দেখে দুনিয়া। দ্রৌপদীর সোনার অঙ্গের পরশ পেতে নাপ্‌তে পাড়ায় আড্ডা দেয়। প্রিয়জন যেথায় থাকে সেইখানে বন্ধু খুঁজিয়া লইতে হয়। যাহাতে আসিতে যাইতে তাহার নজরে পড়ি। বারবার আসিতে যাইতে তাহার মন কোমল হইবেই। তখন বসন্ত আসিবে। শীতের রুক্ষ হাওয়ায় দ্রৌপদী যেন রাতের বেলার লেপ কাঁথা। ঝড়ের রাতে কপাটবন্ধ কোঠাবাড়ির ওম্‌। রূপবান মাছরাঙাকেও দ্রৌপদী বলে ভ্রম করে। মাছরাঙার গায়ের হলুদ রঙের ছোপ, নীলরঙের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা। দ্রৌপদীর শাড়ির নীল এমনই। বড়ো

সূক্ষ্ম। বড়ো রাগ হয়। অভিমানে ভগবানকে বলে, দিলি তো দিলি নাপ্‌তের ঘরে। নাপ্‌তের এ ধন নিয়ে কী লাভ?

ফিকির খোঁজে। এখন আমার মরাইতে থাকবে।

টাকা ছড়ালে কী না হয়! বুড়ি আবারো ছুটে যায় দ্রৌপদীর কাছে।

ওলো দুরপদী, তোর কপালে সোনাদানা। হিরে মণি।

দ্রৌপদী বলে, আমার হীরে মণিতে কাম নাই।

বুড়ি বলে, চল্ নানী ঘাটে যাই, তোর সাথে কথা আছে।

এই স্থলে রাধা তাহার সখীদের সহিত যমুনার ঘাটে স্নান সারিতে যায়। কৃষ্ণর ইচ্ছা করে তীরে বসিয়া তাহাদের সহিত রঙ্গ করে। ইহাতে সখীগণ আহ্লাদিত হইলে হইতে পারে, রাধাকে ভুলানো যায় না। কৃষ্ণর মোহন সুন্দর বাঁশি নাই যে কালিন্দী নদীর তীরে ডাকিয়া আনিবে।

অগত্যা বুড়ির ডাক পড়ে।

বুড়ি বলল, আমার নাতিনী রূপবতী। তার কুন তুলনা নাই।

তার চুলের শোভা দেখে তালকলি লাজে ম'লো।

সোনার পদ্মের পারা তার চোখে দ্যুতি— চাঁদ সূর্য দূরে পালাল।

কাজলরেখা ডাগর চোখে, নীলপদ্ম জলে ডুবল শরমে।

তিলফুলের মতো নাতনীর নাক—

দ্রৌপদী বলল বুড়ি, এত রূপের বাখান কেন? তোমায় কে পাঠাল? সত্যি করে বলতো?

তার অনেক আছে দুরপদী, তোকে সোনায় মুড়ে রাখবে।

আমার সোনা চাই না। মানুষ চাই।

ওরে, ও যে মানুষ না রে। দেব্‌তার পারা!

আমার দেব্‌তা চাই না। মানুষ চাই।

মানুষ না তো কি জানোয়ার? তোর জন্য পাগল হয় আর তুই বলিস তাতে কী হয়?

দিদিগো! আমি যে নাপিতের বাড়ির মেয়ে।

এখন আর কেউ জাত মানে না।

এটা কথার কথা। আমার বিশ্বেস নেই।

ওরে, যেচে আসবে।

শরীরে খিদে থাকলে যেচেই আসে। খিদে মিটে গেলে ফেলে দেয়।

তোর বড়ো গুমর।

গুমর আছে বলেই তো রূপবান পাগল হল।

ওমা! রূপবান যে পাগল হয়েচে তা তুই জানিস?

জানব না কেন?

জেনেও তুই সাড়া দিবি না?

আমি তো ছাগল না, ম্যা ম্যা করব। কাঁঠালপাতা দেখিয়ে আ আ তুতু করলে চলে যাব!

অত বাড় ভালো না।

তোমার রূপবানকে বলগে যাও। তারও অত বাড় ভালো না। আমি পঞ্চায়েতে যাব।

আরে থাম্ থাম্। আ-রে মাগি তোর চাড় কেন রে? সোনা ধুলে সোনা, রূপা ধুলে রূপা? সোনার অঙ্গ কালি হয় তা জানিস? দাব্‌নার জুলুস চেরদিন থাকে না, গালের লাল ফিকা হয়।

তখন দেখব।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলচিস। ওর ক্ষ্যামতা জানিস্‌নে। ও তোকে নেবেই নেবে।

নিলেই হল! আসুক দেখি! আজ নেবে আদর করে/কাল ফেলবে যমের দোরে। কেন যাব?

চার

পাথর ঘষলে ক্ষয়ে যায়। মাটি ঘষলে গুঁড়ো। সোনায় ঘষলে কালি ওঠে। মনে ঘষলে দাগ। মেয়েছেলে কোমলমতি/আধেক ছলা আধেক রতি। মেয়েছেলে রামধনুর রঙ্। মেয়েছেলে পাষাণ না। সে বড়ো নরম। মাটি। কেউ গেলে তার দাগ হয়ে যায়। গাঁ-দেশে পেরেম হল শরীর বাগানে চাষ। হালুম করে হুলো বেড়ালে ধরল। প্রেমের গমন কোথায় আর তেমন। তাই বারবার গেলে পথ হয়। উচাটন হয় মন। রূপবান খিড়কিতে দাঁড়ায়। পুকুরঘাটের কাছে গিয়ে মাছ হয়। মাছ কেমন সুরত দেখে। মাছ দ্রৌপদীকে গাঙে ডাকে। রূপবান গভীর রাতের মাঝি হয়। নদীর বুকে বৈঠা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

তখন বাঁশপাতা কাঁপে। আমলকী বনে হাওয়া ফিসফিস করে। বুকের ঘরে দড়াম করে দরজা খুলে যায়। মোহন বাঁশি নেই রূপবানের, তবু বাঁশি বাজে।

বেচারা দ্রৌপদী! যাব না যাব না বলে জলকে যায়।

মাঝরাতে দ্রৌপদী-রূপবান কথা।

কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে সেই মেয়ে। নিশিতে ডেকেছে তাকে।

রূপবানের ছাতি ফুলল। শরীরের রোঁয়া ফুলল। ব্যাগী প্যান্টের পকেটে হাত রেখে একেবারে হিরোর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে সে বলল, আমি তোমায় বিয়ে করব। দুনিয়া একদিকে, তুমি একদিকে।

দ্রৌপদী কেঁপে উঠল। তার কথা হারিয়ে গেল।

আমি জাত মানি না।

দ্রৌপদী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ি থেকে বাধা দিলে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব।

দ্রৌপদী আবারও কেঁপে উঠল।

আত্মীয় স্বজন না মানলে দহের জমিতে ঘর বাঁধব।

দ্রৌপদীর কথা শুকিয়ে। দহে জল নেই।

সাতবিঘে বন্ধটা তোমার নামে লিখে দোব।

দ্রৌপদী কাঠপুত্‌লী। সাড় নেই।

তিনভরির হার গড়িয়ে দোব। কাঞ্জিভরম শাড়ি কিনে দোব।

দ্রৌপদীর চোখে ভয়ের কালো জল।

রূপবান তার হাত ধরে ফ্যালে। কাঁদ ক্যান? কথার জবাব নাই কুন? পদের মানে ভাঙতে পার, আষাঢ় মাসের জলের মতন হাসতে পার, দুনিয়াভর ছোক্‌রা নাচাতে পার, এখন কথা নাই?

ওদের নাচার ইচ্ছা নাচে, আমার কী দোষ?

তোমার রূপ আছে, নাচতে আসে।

রূপ আছে আমার ঘরে, তুমি তা দেখে নাচবে কেন? তোমার ঘরে অনেক টাকা আছে, আমার কি চোখ নাচে? তোমার ঘরে সুখ আছে, গয়না আছে, ধানের মরাই আছে, আমার কি চোখ নাচে? তোমার ঘরে কাঞ্জিভরম শাড়ি আছে, আমার কি মন নাচে?

এ তোমার অভিমানের কথা।

বোঝ তুমি? আমাদের যে মান আছে তা তোমাদের মনে হয়?

একথা বলছ ক্যান?

আজ এসেছ ভোলাতে আমায়/কালকে যাবে ভোলাতে শ্যামায়। তোমার টাকা আছে, টাকার রস আছে। মন তো ফাটা জমি। মনে কি তোমাদের ফুল ফোটে? আজ যৌবন জ্বালায় জাত মান না। কাল? নেশা কাটলে, রাত ভোর হলে, আমি নাপিত তুমি সুজাত।

না গো না। তোমার জন্য চুরি করি, তুমি বল চোর!

চুরি করতে তোমার ইচ্ছা তুমি কর। আমায় জড়াও কেন?

তোমার জন্য চুরি করব। তোমার জন্য পাপ করব। তোমার জন্য নরকে যাব, তোমার জন্য সাগর মন্থন করব। তোমার জন্য বিষ পান করব—

দ্রৌপদীর চোখ জলে ভরে যায়। হৃদয় উথলে আসে। বুকের ভেতর পাখি ডাকে। কথা লাফ দেয় খালবিলের মাছ। প্রেমসুগন্ধি ভুরভুর করে। শাওনের পাকা তাল। ভয়ে হাত চাপা দেয় রূপবানের মুখে। অমন কথা বলে না। অমন নিঠুরের মতন কাটে না। নাপিতানির জন্য মরবে কেন? আমি তো গুয়ের ভেতর গোলাপ ফুল। গায়ে গন্ধ লাগবে। নিন্দা লাগবে। কুল মজাবে এই করে? লোকে বলবে, শেষে কিনা নাপিতের ঘরে!

তুমি আমার কাছে নাপিত না, তুমি মানুষ।

এতদিন বলনি। আজ বলছ গা দেখে। সুরত দেখে। মানুষ বলে মানুষ ভাবছে না।

তোমার এত অবিশ্বেস কেন?

পুরুষ জাতটাকে একদম বিশ্বাস নেই।

কী প্রমাণ চাও? এই আমি গাছে উঠে গেলাম। মগডালে উঠব। ওখান থেকে ঝাঁপ দেব। দায়ী হবে তুমি।

রূপবান মালকোঁচা মেরে গাছে উঠতে থাকে।

দ্রৌপদী হাঁ হাঁ করে। আরে অমন করে উঠে যাও ক্যান? পড়ে মরবে যে।

মাঝে পৌঁছে রূপবান বলে, আমি মরলে কার কী?

তোমার মায়ে-বাপে কষ্ট পাবে।

আমি এখন সাবালক। মা-বাপের আঁচল ধরি না।

তাহলে তুমি নেমে এসো। রাতের বেলা কেউ গাছে ওঠে? এই দেখে দিকিনি, আবার উঠে যায়। নেমে এসো।

নামব না।

আরে আরে আর মাত্র একটা সরু ডাল। একদম টঙে উঠেছ—

তোমার কষ্ট হয়?

হয়তো।

তুমি তো মাকড়া পাথর।

না না।

তুমি জষ্টি মাসের খরা।

না না।

তুমি মহাজনের চোখের মতন।

উঃ! আমায় অমন অপবাদ দিও না।

তুমি কসায়ের কাটারি।

ছিঃ ছিঃ। আমি একটা হাবাগোবা মেয়ে। আমায় অমন করে কাটো কেন? তুমি নেমে এসো।

নামব, আগে বল ভালোবাসবে—

একি দোকানির ঘরের জিনিস নাকি, দাও বললাম দিয়ে দিল। চোখ দেখে বুঝতে হয়, রঙ দেখে চিন্‌তে হয়, কষণ দেখে আঁচ করতে হয়। নতুন বউ দেখনি? গা ঝলমল করে, মুখের ওপর সুখের ছাপ, নাকের চারপাশে চিকচিক— তোমার বোঝার হলে বুঝে নাও।

রূপবান তরতর করে গাছ থেকে নেমে আসে।

একেবারে কাছে দাঁড়ায়। গা ঘেঁষে। তার হাতের ছোঁয়ায় দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর চোখ বুজে আসে। তারপর আকাশ মুখ ঢাকে লজ্জায়। চাঁদ মেঘের আড়াল তুলে দেয়। হাওয়া তোলপাড় করে। গাছগুলি নিষিদ্ধ কোনো কিছু দেখে চুপ মেরে যায়। একটি রাতপেঁচা কোটর থেকে মাথা এলিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়।

দ্রৌপদীর শরীর ঘিরে উৎসব। তার বিম্বফলের মতো ঠোঁট দুখানিতে দংশনের দাগ। মৃণাল বাহুর অনেকাংশ অনাবৃত। শাঁখের মতো গলায় আঁচড়ের ক্ষত। পাকা পেয়ারার মতো অনাবৃত স্তনে রূপবান শিশুর মতো অমৃত লুটিল। নগ্ন উরুর সন্ধিস্থলে গাছগুলি পাতা দিয়া ঢাকিয়া দিল।

পাঁচ

দ্রৌপদীর বাপে খুর দেখায়। খুর নিয়ে ঘোরে।

বল্, কে সে?

দ্রৌপদী বলে রূপবান।

বাপ রাগে জ্বলতে থাকে। কাটব আমি তাকে।

রূপবান বাড়ির আনাচেকানাচে ছিল। বুক ফুলিয়ে বলল, কাটবে কেন? আমি দ্রৌপদীকে ভালোবাসি। তাকে বিয়ে করব।

সমাজ তোমাকে একঘরে কববে।

করুক।

বাপ-মা ত্যাজ্যপুত্র করবে।

ভয় পাই না। আমার নামে সম্পত্তি আছে, লিখে দোব দ্রৌপদীকে।

এখন বলছ বড়ো বড়ো কথা, চাপে পড়লে সব প্রতিজ্ঞে জলে যাবে। তখন আমাব মেয়ে জলে ভাসবে।

বেঙ্কে টাকা আছে, লিখে দিচ্ছি।

তোমার আত্মীয়স্বজন এসে গরিবেব বুকে চেপে বসবে। আমি কোথায় যাব?

রূপবান বলল, আমি তা হতে দেব না।

এখন বলছ, তখন তেলেজলে মিশে যাবে, আঁটি থাকবে পড়ে।

দেখ আমি কী কবি।

দিকে দিকে রটি গেল কথা। নাপিতপাড়ায় পৌছিল বারতা। পাকা মাথা হল এক ঠাঁই।

রূপবানে বাঁধা ছাড়া গত্যন্তব নাই।

রূপবান আব দ্রৌপদীকে ঘববন্দি কবা হল। রূপবান বলল, আমার কোনো পাপ নাই। আমি বিয়ে করব। কোর্টে চল।

গোপনে তাকে কড়া পাহাবায কোর্টে নিয়ে যাওয়া হল। এফিডেবিট করে রেজিস্টারের সামনে শপথ বাক্য উচ্চাবণ কবে বিবাহপর্ব শেষ হল। তারপব দিন তিনেকের অজ্ঞাতবাস।

এদিকে তিলিপাড়ায় খবব গিয়েছে চলে। থোকাথোকা মানুষের জটলা। আত্মীয়স্বজনের ঘন ঘন আগমন। ভিন্‌গাঁযেও খবব ছুটেছে। সেখান থেকেও দূব-নিকটের আত্মীয় নীতিজ্ঞানের ভাঁড়ার ঘেঁটে এল। জাতিকুলমান জলাঞ্জলি দেওযাব নিন্দাবাক্যে মুখর হল। তিলিপাড়ায় আবার জাত-ঐক্য মাথাচাড়া দিল। ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে এই পাষণ্ডের কাজ এবং পায়ের তলাব চাকরেব এহেন স্পর্ধার বিরোধিতা করতে গোপন শলাপরামর্শ হল। পাড়াময় কাজকর্ম লাটে উঠল। বিজ্ঞজনে বলল, তোমবা দলবেঁধে যাও— তিলিপাড়ার কলঙ্ককে ওখান থেকে তুলে নিয়ে এস। দ্বিতীয় বিজ্ঞজনে বলল, কী হয়েছে না হয়েছে জানি না, যদি কোনো আদালতেব কাগজের জোবে মামলা করে দেয়। তার চেয়ে উলটে আমবাই মামলা করি : আমাদের ঘরের ছেলেকে জোর করে আটকে রেখেছে। তৃতীয় বিজ্ঞ বলল, কে কাকে আটকে রেখেছে এটা প্রমাণ করা মুশকিল। আসল দাবার ঘুঁটি হল রূপবান। রূপবানকে একবার কায়দা করে এদিকে হড়কে আনতে হবে। নাপিতপাড়াও সরগরম। রূপবানকে বাঁধো।

দলে দলে পোকা এল। ইঁদুরে গত্ত করে ঢুকল। রাতপাখি নিশাচরে এল। সুড়ঙ্গ খুঁড়ল। রূপবান— এই জেলখানা থেকে পালিয়ে এসো। তোমার মায়ে কাঁদে বাপে কাঁদে। আত্মীয়স্বজন এদিক ওদিক জাল পাতল। রূপবান, এই দিক দিয়ে গেলে এসো। তোমার জন্য লাখ লাখ টাকা আর রাজকন্যে। ফেলো ছড়াও মাখো। ভিখিরির ঘরে, নিচু জাতের ঘরে, মান থাকে না। লোকে হ্যাটা করবে। একবার মনটাকে শক্ত করো। একটু শিক্ষিত লোকজনেও নাপিতকে ঠিক গিলতে পারে না। সংস্কারে লাগে। রবীন্দ্রনাথ কত কথা বলেছেন লালন ফকিরে বলেছেন শ্রীচৈতন্য বলেছেন নজরুল বলেছেন— সে সব শিক্ষিতের মাথায় আছে, তবু নাপ্‌তে। পা বাড়িয়ে দিলে নখ কাটে। মরা মাস-চাম কাটে! বিয়েবাড়িতে চাকর বাকর। নাপিতের মেয়ে মানে চাকরের মেয়ে। অচ্ছব বা অসবর্ণের ঘরবাড়ি দূরের ঘরবাড়ি। তার সমাজ দূরের সমাজ।

তাতে জলচল হয় না। অন্তেবাসীর সাথে কুটুম্বিতে হয় না।

রূপবান বলে— যাব, তবে বউ নিয়ে যাব।

তাকে অজ্ঞাতবাস থেকে যেতেও হয়। খাবে কী? ট্যাকের পয়সা কবে খতম। শ্বশুর- শাশুড়ি বড়োলোক জামাইকে খাওয়ায় কী?

রূপবান সদম্ভে বউ নিয়ে ঘরে ঢোকে।

তার বউয়ের জন্য বরণডালা থাকে না। কুলোতে প্রদীপ জ্বালানো থাকে না। দুখ্ আঁধারে রূপ জ্বালিয়ে রেখে দ্রৌপদী চুপ। মায়াময় মুখের জমিতে শকুন ওড়ে। ভেতর ঘরে শাশুড়ি গাল দেয়— মর রাক্ষসী মুখে রক্ত উঠে। নানান কু-কল্পনা করে। গায়ের ওপর উঠে আসা ডেঁয়ো পিঁপড়ে। পায়ের উপর উঠে আসা জোঁক। জোঁক কামড়ে ধরে আছে। নুন দাও, নুন দিয়ে মেরে ফ্যাল। ঝেড়ে ফ্যাল। রূপবান দ্রৌপদীর চোখের জল মুছিয়ে দেয়। সান্ত্বনা দেয়। মিষ্টি কথা বলে। কদিন আর, মানিয়ে নাও। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আঁধারে আলো জ্বলবে। পাথর গলবে। গাঁয়েও 'প্রগতিশীল' কথাটি রাজনীতির কল্যাণে ঢুকে পড়েছে। পার্টির মধ্যে দু-একজন প্রগতিশীল এসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেয়। ব্রেভো। ওয়েলডান। এসব ইংরেজিও বলে। মরদের কাজ করেছ। এতদিনের অচল পথে চলেছ।

আজকের যুগ কম্পিউটারের যুগ।

আবার অন্য দলে বলে, ঘোর কলি। বিষ্ণুপুরাণে আছে না— গরুড়পুরাণে আছে না— ফলবে কথা ফলবে। ঘোর কলিতে উলটা বিধি চলবে।

এক শিক্ষিত ছোক্‌রা তর্ক করে— সমাজ ভাঙছে, সমাজ সম্পর্ক ওলটপালট হচ্ছে। পিছড়ে বর্গ ওপরে উঠে আসছে। আর কতকাল ওরা আমাদের, উচ্চবর্ণদের ঘাড়ে করে বইবে? ওরা রয়েছে বলেই আমরা ওপরে উঠেছি। এবার ক্রান্তিকাল। ওরা উঠবে। আমরা নামব। এটাই ইতিহাসের নিয়ম। ধ্রুপদী ধুতি পাঞ্জাবি চশমা গোঁফ পইতে একসাথে জেগে ওঠে :

রাখো তোমার ইতিহাস! ইতিহাসের ইয়ে করি। আমরা কি মরে গিয়েছি নাকি? নিম্নবর্ণের লোকেরা কাঁধে উঠবে। গোড়া কেটে দাও।

উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র লইয়া আইসে।

ক্ষিপ্ত ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবেরা গভীর রাতে তরবারি শ্যানাইতে বসিয়া যায়।

ক্রুদ্ধ তিলি বৈশ্যরা দল বাঁধিয়া আসিয়া জানাইয়া যায় রূপবান যদি এ মেয়েকে পরিত্যাগ না করে তাহলে আমরা জল গ্রহণ করিব না।

গ্রামদেশে এজাতীয় জলগ্রহণ না করিবার সিদ্ধান্ত বিস্ফোরক। ধিকিধিকি আগুন জ্বলে। ভেতরে ভেতরে জতুগৃহ তৈরি হয়। রাতভিত জটলায় উত্তেজনার আগুন ধূমায়িত হয়। আপাতশান্ত মানুষগুলি একটা অহেতুক অথচ উত্তেজনাময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

ক্ষমতার কেন্দ্রভূমিতেও কম্পন দেখা দেয়। পঞ্চায়েত স্পষ্টত দুভাগ হয়ে যাবার শঙ্কা দেখা দেয় :

একদল রূপবান দ্রৌপদী নাপিতপাড়ার পক্ষ নেয়।

অন্যদল তিলিপাড়ার পক্ষে।

এখনই ঘটনা ঘোর এবং জটিল। দুই বৃহৎশক্তির আণবিক বোমার ভয়ে দুই বৃহৎশক্তিই যেন সমঝে চলার নীতি নেয়। প্রতি সকালে নতুন গুজব। কেউ বলে রূপবানকে মেরে ফেলবে তিলিপাড়া। অন্য কেউ বলে দ্রৌপদীকে খুন করে পাঁকে পুঁতে ফেলবে। তৃতীয় কেউ বলে, এসব হবে না গোত্রকাট করে দেবে। গোত্রকাট মানে জ্ঞাতিগুষ্ঠিরা সব্বাই রূপবানের পরিবারকে জ্ঞাতিসূত্র থেকে খুলে ফেলে দেবে। জাতিত্যাগ মহা পাতকের কাজ। নিজের জাতপরিচয়-বিহীন এই মানুষ থাকতে পারে না। রক্তের ভেতরে কোথাও এদের বাঁধন ছেঁড়ার, গ্রন্থি খুলে যাওয়ার বেদনা হতে থাকে। জাতের সুতো সমাজসুতো। নিজের পায়ের গাঁট বা জোড় খুলে যাওয়ার যন্ত্রণা।

না এ হতে পারে না। তিলিপাড়া গর্জে ওঠে।

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক রাজনীতির লোকেদের মেরুকরণও ধীরে ধীরে আকার নেয়। অস্পষ্ট অলিখিত

যুদ্ধের সম্ভাবনায় এক নতুন বিন্যাসও হতে থাকে। এক রাজনৈতিক দল তার দলের প্রগতিশীলদের বলে, চুপ মারো। দলের কথা তোমার কথা। ওরা গেছে ওদের দলে— মানে ওরা আমাদের শত্রু। ওই দলেও এমনিভাবেই দলমতের কাছে ব্যক্তিমতের নতি স্বীকার করানো হয়।

যুদ্ধের আগে যুদ্ধের হুম্‌কি।

পালটা হুম্‌কি।

তিলিপাড়া বলে, রূপবান আমাদের।

নাপিতপাড়া বলে, রূপবান আমাদের।

দ্রৌপদী মেয়েছেলে। সে ক্ষুদ্র হয়ে যায়। নগণ্য।

সকাল থেকে রাতত'ক সে আঁধার দ্যাখে। আঁধারে কবন্ধ দ্যাখে। শাশুড়ির নিষ্ঠুর মুখ। শ্বশুরের কঠোর কণ্ঠস্বর। দেওরের কুৎসিত চাউনি। আত্মীয়-স্বজনদের নিঃশব্দ চলাফেরা। গভীর রাতে ফিসফিস কথা হয়।

ঘরের পাশের পুকুরে রাতভ'র শোল বোয়ালের চুনোমাছ শিকারের শব্দ।

দ্রৌপদী কাঁদে। এছাড়া কিছুই করার নেই তার। ভয়ে থাকে রূপবান বাইরে বেরোলে। এছাড়া অন্য কিছু ভাববার অবকাশ নেই তার। রূপবান কাছে থাকলে সে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। রূপবানকে ভালোবাসা খাওয়ায়। শরীরের ওম্‌ খাওয়ায়। স্বপ্ন দেখে তারার দেশের। স্বপ্নের পেছনে দৈত্যদের দেশের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। রূপবান বলে, হাসো. হাসো না কেন? দ্রৌপদী বলে, এই তো হাসি। রূপবান পাপড়ি টানে—

ফোটো—

এই তো ফুটি·

বলে বটে। কিন্তু ফোটে কী করে?

কেউ তাকে কাপড়-চোপড় ছুঁতে দেয় না। হেঁসেলে ঢুকতে দেয় না। ঠাকুরঘরের কাছে যাওয়া বারণ। কাঁসার থালায় খেতে দেয় না। কলাই-কবা কানাচটা ডিশ দেয়। কুকুরকে বিলভাত দেয় ওরা। ও যেন মরা। মৃতকে বিলভাত দেয় ওরা. দ্রৌপদীকেও দেয়।

দ্রৌপদী ছোট্ট চালাঘর ছাড়িয়া আসিয়াছিল। অর্জুনের নুয়ে-আসা ডাল, গাছেদের জটলার ভেতরে উঁকি-দেওযা চাঁদ। ছোট্ট ছাগলছানা। গোরুবাছুর। একখণ্ড আকাশ। দূরবর্তী আকাশের স্বপ্ন। এখন তাহারা স্মৃতিতে আসিয়া ভিড় করে। আকাশ কুশল শুধায়। চাঁদ বলে, ও চাঁদবয়সী মেয়ে. শুকোও কেন?

দ্রৌপদী করুণ চোখে চাহিয়া থাকে।

ছয়

কয়েকদিন বাদে এক ধ্রুপদী ব্যক্তি রূপবানের বাপের ডাক পাইয়া আসে। মামলা মোকদ্দমা ঝগড়া কাজ্জা থামানো এবং লাগানো দুয়েই দক্ষ সেই ব্যক্তি একটি নতুন পথ দেখায়।

রাত্রি প্রভাতিলে নতুন একটি দৃশ্য দেখে মানুষ।

নতুন পালা।

দলে দলে লোক আসে। তারা বলে রূপবানকে — তোমার খুর কোথায়?

চুল কাটব। আরেকদল আসে, ক্ষুর কোথায়? দাড়ি কাটব।

একদিন সক্কালবেলা ঘরের সামনে দুহাঁড়ি মিষ্টি।

কই গো রূপবান, আমেদপুরে মেয়ের বাড়িতে মিষ্টির হাঁড়ি যাবে। ওরা বড়োলোক, ভালো বিদেয় দেয়। তোমায় পুষিয়ে দেবে।

রূপবান চুপটি করে দ্যাখে।

আরেকজন এসে বলে. তোমার খুর কোথায় গো? অ, তুমি তো আবার আমেদপুর যাবে, তা তোমার বাপকে পাঠাও। তোমার মা কোথায়? মেয়েরা সব আল্‌তা পরবে বলে পা বাড়িয়ে আছে যে— তাড়াতাড়ি পাঠাও—

ক্রোধে অন্ধ রূপবান লাঠি নিয়ে তাড়া করে।

আরে আরে মারতে তাড়া করো কেন? যার কাজ সে করবে তাতে আবার লাজ কী?

রূপবান উন্মাদের মতন হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরায়। সবকটাকে কাটব। লোকে বলে, তোমার কাজ তলোয়ার ধরা না, তোমার কাজ খেউরি করা। তুমি তাই কর হে—

দ্রৌপদীর বাপ শুনে বলে, সবকটাকে খুর দিয়ে কাটব।

লোকে হাসে। খুর কবে তলোয়ার হল গো?

এই ছোট্ট খুরে কি গলা কাটা যায়?

রূপবানকে বাবা বলে, কুলের কলঙ্ক! দূর করে দোব।

রূপবান বলে, দূর করে দাও! সম্পত্তি ভাগ করে দাও।

কিচ্ছু পাবি না।

আলবত পাব। আমার পাওনা দিয়ে দাও, আমি চলে যাব।

মা কেঁদে পড়ে। এখন বউ হয়েছে তোর আপন? গু থেকে উঠে এসে ভেবেছিস এবাড়ির বউ হবি, রাজলক্ষ্মী পটের বিবি/ঘরের চালটা দেখে নিবি/ঘরের চালে খড় নেই রাজবাড়িতে চোখ। চোখ গেলে দোব রাক্ষসীর। আমার ছেলেটাকে খেল, কচকচ করে চিবিয়ে খেল। রূপ যৌবন। এই রূপে পোকা পড়বে. শেয়াল শকুনে ভোজ দেবে— তবেই আমার নাম কাদম্বিনী।

দ্রৌপদী কেঁদে বলে, আমি আসতে চাইনি মা।

তোর সাট নাই তো ছেলে ওরকম হল কী করে? ধোয়া তুলসীপাতা? যেমন এসেছিস তেমনিই চলে যা টাকা দোব। যা চলে যা—

দ্রৌপদী বলে, নিজের স্বামীকে ছেড়ে কোথায় যাব?

ভাগাড়ে যা, শ্মশানে যা। যেথা ইচ্ছা সেথা যা।

এই সক্কালে শ্মশানে যেতে বললে মা?

হাঁ বললাম।

দ্রৌপদীর ফুলের মতো মুখে কান্নার কালি। চোখের নীচে কালি। বুকের ঝোরায় পাথর ঢাকা। ডাগর চোখ আলো হারায়। রূপবান ডাকলে সাড়া পায় না। রূপবান বলে, কী হল তোমার?

দ্রৌপদী বলে, কিচ্ছু না।

এই দেখ অত হেঁয়ালি ভালো না। সাফ সাফ বল।

তুমি আমায় কেন যে বিয়ে করলে।

এ বলে কেন বিয়ে কল্লে? ও বলে কেন বিয়ে কল্লে? ও আসে বলে খুর কোথায়? আমার যে কী অপমান হচ্চে, তাতে তোমার কষ্ট হয় না?

হয় তো। হয় বলেই একথা বলি।

কেন যে ছাই নাপিতের ঘরে তোমার জন্ম হল!

বুকে ভাল্লা চালায় কেউ। দ্রৌপদী নিঃশব্দে কাঁদে। বলে, আমি আগে বলেছিলাম। আগে সাবধান করেছিলাম। তুমি পারবে না। নিজের সাথেই তোমার লড়াই হয়নি।

না. পারব না! সব শালাকে দেখব এবার। দেখি পারি কিনা।

আজ রাতে এরা কেউ কাউকে আকর্ষণ করে না। ভালোবাসে না। আজ রাতে এদের মাঝখানে আমলকী বন ফিসফিস করে। আজ রাতে অন্ধকার গভীর থইবিহীন।

রূপবান ঘুমোতে চেষ্টা করে। ঘুমোতে গেলেই তার বারবার খুরের ছবি ভেসে আসে চোখের সামনে। খুর এখন তার কাছে ভয়ঙ্কর ঘৃণার বস্তু হয়ে গিয়েছে। খুর দেখলেই সে ভয় পায়। ঘুমের ঘোরে আজ সারারাজ খুরের কথা খুরের ছবি এবং খুর হাতে মানুষ— যার নাম নাপিত। লড়তে লড়তে সে ক্লান্ত! বরং কিছুদিন—

এই শুনছ—

কী?

তুমি বরং এখন কিছুদিন বাপের বাড়িতে থাকো।

না। আমি তোমার কাছে থাকব।

যাও না। এদিকে ব্যাপারটা খানিক থিতিয়ে যাক।

দ্রৌপদী ম্লান বিদায়ে যায়। তখন পোকারা, ইঁদুরেরা, নিশাচরেরা গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসে। তাহারা ধ্রুপদী খুরটি লইয়া অন্ধকারে খেলা করিতে থাকে। কী ঘটেছিল কেউ জানে না।

ফুলটি দূরে ফুটিয়াছিল। পথিকের চোখ ধাঁধাইত। যুবাপুরুষেরা ছল করিয়া দেখিতে যাইত। মধ্যবয়সিরা রিপুর তাড়নে অস্থির হইয়া উঠিত। সবাই বলিত, ফুলটা কী সুন্দর দেখ! সুন্দর বলিয়াই যুবারা উন্মাদ হইয়া উঠিত। সবার মনে আকাঙ্ক্ষা আমিই উহাকে পাড়িব— আমিই হইব উহার মালিক। কিন্তু সে ফুল দূরে ফুটিয়াছিল। নরক পার হইয়া তাহার কাছে যাইতে হইত। পাহাড় পর্বত ডিঙাইতে হইত। কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইত। তাও সই। দুঃসাহসী যুবারা আগাইয়া চলিতে ঘ্রাণে অন্ধ হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যাইতে ধ্রুপদী মানুষেরা আতঙ্কিত হইলেন।

তাহার পর কী ঘটিয়াছিল?

দিন কয়েক বাদে রূপবান গিয়ে দ্রৌপদীকে বলল, চল বেড়াতে যাই।

দ্রৌপদী নেচে উঠল, কোথায়? রূপবান বলল, শহরে।

দ্রৌপদী শহরে যায়নি। গিয়েছে শুধু একবার, কোর্টে।

রূপবানের সাথে শহরে যাবার পথে তার আনন্দ ধরে না। সে রূপবানকে বলে, তুমি অত গোঁ মেরে আছ ক্যান? রূপবান কোনো জবাব দেয় না। দেখ দেখ, আকাশটা কী সুন্দর হয়ে চাঁদোয়ার মতো ঘিরে আছে আমাদের? রূপবান কোনো জবাব দেয় না। তোমার সেই রাত্রিবেলা গাছে ওঠার কথা মনে আছে? রূপবান নিরুত্তর। এই, আমার ওপর রাগ করেছ? দ্রৌপদী তারপর হাসে, হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে ফুল হয়ে যায়। রূপবান কাঠের পুতুলের মতো বসে থাকে।

শহরে পৌঁছে, রূপবানের নির্দেশমতো দ্রৌপদী কোর্টে যায়। কোর্টে গিয়ে সে দেখে চারপাশে সব খুর-হাতে মানুষ। তিলিপাড়া এ-পাড়া ও-পাড়া মিলে অনেক লোকজন। প্রত্যেকের হাতে তার বাবার চাইতে বড়ো বড়ো ধারালো খুর।

দ্রৌপদী ভয় পেয়ে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু উপস্থিত খুর-আলা মানুষেরা তাহাকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কীসব আইনি কাগজপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া হাতে কিছু টাকা গুঁজিয়া দিয়া বাসস্ট্যান্ডে ছাড়িয়া আসে

অদ্যাবধি দ্রৌপদী সেই বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কিংবা দাঁড়াইয়া নাই।



শবযান ও মোতিসুন্দরী



মধুময় পাল

বাজারের শেষে রাস্তাটা যেখান থেকে চড়াই, সাইকেল ভ্যান টানতে বেশ যুঝতে হয়, নীচে ওলন্দাজ না আরমানিদের ঘর ছিল বলে পুরসভার সরু বইয়ে লেখা আছে. সেখানে ল্যাম্পপোস্টের নীচে আদিগন স্পষ্ট দেখল, নদী বয়ে যাচ্ছে। আলো পড়লে জলের ভাঁজে ভাঁজে যে-রকম জরির কাপড়ের মতো চিকচিকে ভাব তৈরি হয়, পুরসভাব মরা আলোয় চিকচিকে ভাবটা ময়লা-ময়লা, তবু আদিগন বুঝতে পারে, ওখানে জল। জল মানে গভীর নদী, হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ডুবে যাওয়া, অসহায় ভেসে যাওয়া। কয়েক মাইল দূরে কোনো জেটিতে আটকে যাওয়া তার ফোলা পচা দেহটা মাছে খাবে, কাকে খাবে, শকুনে খাবে, আর শরীরেই ভেতর বাস করা আত্মীয়ের মতো পোকামাকড়ে খাবে। আদিগন বুঝতে পারল, সে মরতে চায় না। ঘরে বকুল দুটো বাচ্চা নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, ইদানিং বউটা আরো বেশি নিশ্চিন্ত যে, রাজু-বিজুর বাপ আর গাঁজা খায় না, দুটো বাচ্চা মা-কে লেপটে আছে, বকুল ঘুমের মধ্যেই হাত নাড়িয়ে বাচ্চাদের ছুঁয়ে নিচ্ছে। শুধু সংসারের জন্য আদিগনকে বাঁচতে হয়? নিজের ইচ্ছে নেই? বাঁচতে তার নিজের তাগিদ নেই? ওইসব চিন্তা মাথার ভেতর কাঁচা কয়লার নীল ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ার আগেই সে প্যাডেলে জোরে জোরে চাপ দিয়ে গতি বাড়িয়ে নিতে চায়। যাতে চড়াইয়ের মুখে গিয়ে থমকে যেতে না হয়। সিট থেকে পাছা তুলে, শক্ত হাতে হ্যান্ডেলে ভর রেখে আদিগন একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঝুঁকে ভ্যান দ্রুত ধাবমান করে।

আস্তে চালা। মৃত্যুপথযাত্রী ও ভ্যানেব যাত্রী মোতিবুড়ির খোনা গলায় ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ, উৎস যদিও নির্দিষ্ট ও প্রাকৃত, আদিগনের রক্তের কণায় কণায় জমে থাকা অপ্রাকৃত স্বরের ভয়ের সংস্কারে বেজে ওঠে। এর ফলে একটা উপকার হয়, যাত্রীর কথা ভুলে নদী ও মৃত্যুর খপ্পরে পড়া আদিগনের মাথায় আবার স্পষ্ট হয় পিচের ছাল উঠে যাওয়া ঘেয়ো পথ, এই বাংলার, অনেকটা দূর যেতে হবে, হাসপাতালে। ভ্যানে শুয়ে আছে মোতিবুড়ি, বয়সের আদিঅন্তহীন বৃদ্ধা, যে আর ফিরবে না বলে সবাই জেনেছে।

ওই দূরে দেখা যাচ্ছে বিনোদের হোটেলের আলো। সারাবাত জ্বলে। পতিতের ইস্কুলের সামনে পুঁতে দেওযা হাত-পা ছাড়া মানুষের মূর্তির মাথায় আলোটা আর জ্বলে না। থানার বারান্দায় আলো আছে, ছায়া ঘোরাঘুরি করে। ঢালে পড়ে হড়হড়িয়ে নেমে যেতে পাবত আদিগন। কিন্তু সে প্যাডেল স্থির রেখে পেছনের চাকার ব্রেক আলতো চেপে রাখে। খানা-খন্দ যতটা পারে এড়িয়ে যায। মোতিবুড়ি ভ্যানেই টেঁসে যাক, সে চায় না। যদিও, এই বিশ্বাস তারও হচ্ছে যে, বুড়ি আর ফিরবে না।

আর কোনোদিন যেন না ফেরে সেই ব্যবস্থা পাকা করতেই তো মোতিবুড়িকে আদিগনের ভ্যানে তুলে দেওয়া হল। পাড়ার লোকজনের সে কী আনন্দ! কতকাল পর, হয়তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, হয়তো দেশভাগের পর, খুন-খারাবি আর জনসেবা আর অবিবত নষ্ট সন্তান আর চড়া বাজারে খড়ের মতো বিবর্ণ হয়ে যেতে থাকা মানুষ সবুজ হেসে বলল, ঈশ্বর আছেন। নইলে যমের অরুচিও শেষটানে পড়ে। দয়া করো হে মা কালী, মা শীতলা, ওলাবিবি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বুড়িকে তুলে নাও, আর যন্ত্রণা দিও না। কে যেন বলল, আদি শেষ কাজটা তুই কর। আমরা তোর ছবি বাঁধিয়ে রাখব।

মাস চার-পাঁচ হল ভ্যান চালায়নি আদিগন। নানারকম কাজ হবে বলে পুরসভা একটা মোটর ভ্যান কিনেছিল। এখন সেটা প্রধানত লাশ বয়। বাড়িতে বার্ধক্যে মরা, হাসপাতালে রোগে মরা, আগুনে পুড়ে মরা, ফাঁসিতে ঝুলে মরা, কত রকমের মৃত্যু যে হয়, ট্রেনে কাটা বাসে চাপা লাশও পুরসভার গাড়ি নেয়। না হলে গাড়ির খরচা ওঠে না, ধার-দেনা করে কেনা তো, সুদ বাড়ে কচুরিপানার মতো। সেবার গণপিটুনিতে এগারোটা ডাকাতের লাশ,

একথাই বলা হয়েছিল. পড়লে আদিগনের ভালোই রোজগার হয়। বাজার কমিটি খুশি করে দিয়েছিল। সেটাই লাস্ট। তারপর ভ্যান পেয়ারা গাছে শেকলে বাঁধা পড়ে আছে।

বকুলও ভ্যানটাকে মড়ার গাড়ি বলে। কখনও রেগে-চেঁচিয়ে. কখনও কেঁদে-কঁকিয়ে এই মড়ার গাড়ির হাত থেকে মুক্তি চায়। যেন তাকে নেবে, যেন তার সন্তানদের নেবে. যেন তার সংসার নেবে বলে বসে আছে। চোখের সামনে যমদূতের মতো অষ্টপ্রহর দাঁড়িয়ে থাকলে মানুষের মনের অবস্থা কী হয়। ছেলেরা যখন খেলতে খেলতে গাড়ির ওপর চেপে বসে, বকুলের বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। একা দুপুরে দাওয়ায় খেতে বসে বকুল দেখেছে, গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে তার খাওয়া লক্ষ করছে। যেন এটাই বকুলের শেষ খাওয়া। একা রাতে উঠোনে বেরোতে ভয় করে। যেন অপদেবতারা গাড়িতে বসে আছে। আদিগন কি বকুলকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে শাসন করে? নাকি উঠোনে মৃত্যু বেঁধে রেখে সংসার সুন্দর করে?

আদিগনের ভ্যান 'মড়ার গাড়ি'র খ্যাতি এতটাই পেয়েছে যে. এই ভ্যানে কেউ মালপত্র আনতেও বলে না। সুদামবাবুর গোলায় ইটের মতো নিরেট জিনিস বওয়ারও আস্থা ভ্যানের নেই। কলার আড়তে ভ্যানের চাহিদা খুব। কিন্তু আদিগনের বেলায় দরকার নেই। একবার যাত্রার প্রচার করবে বলে জেলেপাড়ার ক্লাব থেকে ভাড়া করল। জানাজানি হতেই ছেলেরা পিছিয়ে গেল। ওই গাড়িতে উঠে প্রচার করবে কে, আর করলে শুনবে কে।

তবু আদিগন ভ্যানটা বিক্রি বা বিসর্জনের কথা ভাবতে পারে না। কেন? কোনো সুখের স্মৃতি কি আছে, যা তাকে বারণ করে? কোনো সাফল্য আছে কি যা তাকে গর্বিত করে? নাকি দুঃখের স্মৃতির মতোই আদরণীয় এই ভ্যান? সদুত্তর পায় না আদিগন। তবু সে মড়ার গাড়িটা অন্তত নিত্যচলনের আড়ালে রাখার কথা ভাবে না। নিজের মৃতদেহ নিজে বওয়া যায় না। স্ত্রী বা সন্তানের মৃতদেহ বওয়ার দুঃস্বপ্ন সে দেখে না। আদিগনের মনে হয়. খুব ঠান্ডা মাথায়, একা একা, একেবারে একা থাকার মুহূর্তে সে ভেবেছে, মড়ার গাড়ি একদিন পালটে যাবে। জীবনের গাড়ি হয়ে উঠবে। কিন্তু কীভাবে? আদিগন জানে না।

পঞ্চায়েত ভবনের অন্ধকার পেরিয়ে শ্মশানের পথ পেরিয়ে দরগায় পেন্নাম ঠুকে আদিগন পেছন ফিরে দেখে. মাজা-ভাঙা মোতিবুড়ি ফালিচাঁদের মতো পড়ে আছে। অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ নেই। বেঁচে আছে কি না বোঝা মুশকিল। আদিগন বুঝতে চায় না। আর মাইলটাক হবে হাসপাতাল। হিসেব কষে প্যাডেলে চাপ দিতে হচ্ছে। যেন জোরে চলার ঝাঁকুনি না লাগে। যেন আস্তে চলার দেরিতে হাসপাতাল পিছিয়ে না যায়। গাড্ডার ফাঁকফোকর খুঁজে ভ্যানের চলন মসৃণ রাখতে আদিগনের চোখ পুরোনো অভ্যাসে আবার প্যাঁচার মতো হয়ে উঠেছে

মোতিবুড়ি নাকি রূপসি ছিল। মন্বন্তরের লোকজনের মুখে আদিগন শুনেছে। ফর্সা, লম্বা, মাথায় চুলের মেঘ, রূপসি বলতে যা যা লাগে। দলে দলে মানুষ যখন শহরে খেতে বা মরতে যাচ্ছে. মোতি গাঁয়ে এল। সেই থেকে রয়ে গেছে। তাকে নিয়ে অনেক রহস্যের গল্প, গল্পের রহস্য আছে। নোনা-খাওয়া দেওয়াল. হেলে-পড়া চালা আর সন্দেহের গর্তভর্তি যে আতঙ্ক থেকে সবাই মিলে মোতিবুড়িকে ধরাধরি করে ভ্যানে তুলে দিল. সেটা নাকি একসময় মৌচাক বললে মৌচাক. রসকদম বললে রসকদম. ফলের মধ্যে বেদানাও। বলতে পার, তেমনটাই ছিল। সেইসব রহস্যের গল্প বা গল্পের রহস্যের চোদ্দআনাই আদিরসের।

এমনকি অধ্যাত্মের মোড়কের অন্ধকারেও কাম-কথা। আদিগন ঢের শুনেছে। নিজে তো সেই মোতিসুন্দরীকে দেখেনি। তাই তার ভালো লাগে এক লাবণ্যময়ীর মাটি-ছোঁয়া চুল শুকোনোর কথা. পশলা বৃষ্টিতে উঠোনের জমা জলে শেষ বিকেলের আলোয় নথ-টিকলি-সিঁদুর শোভিত মুখ ভেসে ওঠার কথা. আঁধার-ভাঙা ভোরে রমণী-কণ্ঠের গানে আলো জাগার কথা, স্তব্ধ রাতের কালো জানালায় প্রদীপের আলোয় দুটি ভেজা ভেজা ডাগর চোখে অন্তহীন নিদ্রাহীনতার কথা। সেই সুন্দরীর শুকনো খোসা ভ্যানের পাটাতনে পড়ে আছে।

মোতিবুড়িও মরতে চায় না। কত বয়স হবে? মন্বন্তর আকাল যুদ্ধ স্বাধীনতা পরাধীনতা সব পার করে বুড়ি চলেছে। চোখে পুরো দেখতে পায় না, কানে পুরো শুনতে পায় না, মাজা পড়ে গেছে, হেঁচড়ে হেঁচড়ে দুয়ার থেকে নেমে দু-হাতে মাটি খাবলে চলে, লম্বা লম্বা হাতের খলখলে চামড়া দোলে, পাটের নুড়ির মতো কগাছি চুল মাথার পেছনে ঝোলে, সারা গায় গু-মুত-বমি লালার গন্ধ। মোতিবুড়ি এখন পাড়ার সবারই ঘৃণার পাত্র! তা শুধু নোংরা বলে নয়, দুর্গন্ধের পিন্ড বলে নয়, বুড়ি যাকে তাকে যা নয় তা-ই গালমন্দ করে। নীতীশ

মাস্টারকে একদিন বলল, কচি কচি ছেলেমেয়ের মাথা চিবিয়ে বেশ নাদুস-নুদুস হয়েছিস। নারান ডাক্তারকে একবার বলেছিল, মানুষ মেরে নিজের মরণ ঠেকিয়ে রাখো। কার্তিক পাল সাতে-পাঁচে থাকে না, তাকেও কিনা বলল, গেরস্তর বউ ভাড়া খাটে কেন, কেতো? কার্তিক পালের বউ তেড়ে এসেছিল। তাকে শুনতে হল, মিছে কথা বলিস না বউ। তোর পেটে ক্যান্সার হবে। মোতিবুড়ির ঘৃণিত হওয়ার এটাও কারণ যে, তার অভিশাপ ফলুক না ফলুক ভয় দেখায়। কে বা কারা যেন স্বপ্ন দেখেছিল, মোতিবুড়ির বিষদাঁত গজাচ্ছে। নিঃশব্দে সেই দাঁত লোকজনের পিঠে কাঁধে কামড় বসাচ্ছে। ঘৃণায় ভয়ে আতঙ্কে গোটা পাড়া পালা করে মোতিবুড়ির ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে শুরু করে। তুষ্ট রাখতে এবং বুড়ি যেন বাইরে না বেরোয়।

মোতিবুড়ির শ্বাসটান যখন শুরু হল, খবরটা কে প্রথম আনে তা নিয়ে মতভেদ আছে, পাড়ার ঘরে ঘরে উৎসবের খুশি, স্বস্তির ফুরফুরে বাতাসে এই প্রার্থনাও উচ্চারিত হয় যে, বুড়িকে আর কষ্ট দিও না, ঠাকুর। জন্মভর যন্ত্রণা পেয়ে শেষটা বিষধর হয়ে উঠেছিল। সুখ না পেলে বিষ তো জমেই।

মোতিবুড়ি যে-সে মানুষ নয় যে, শেষটান উঠল, শরীর ঝিমিয়ে পড়ল আর পট করে মরে গেল। শেষটানের যেন আর শেষ নেই। চলছে তো চলছেই। প্রতিটি টানই শেষ মনে হয়, গলার ভেতর কফ ঘষটে বাতাস বেরোয়, পাঁজর দু'হাতে বাতাস টানে, বাতাসের শব্দে শব্দে ঘরের ভেতর প্রাণ লুকোচুরি খেলে। বাইরে রাত গভীর হয়। উৎসবের খুশি ধীরে ধীরে মুছে আসে। ঘৃণা ভয় আতঙ্ক আবার একটু একটু করে ফিরতে থাকে। লোকজন গোপনে গোপনে জোড়া পাঁঠা, বারো ঘোড়া, সিন্নি মানত করে। বুদ্ধিটা দিল নীতীশ মাস্টার। ডাকো আদিগনকে। ওর ভ্যানে মোতিবুড়িকে হাসাপাতালে পাঠাও। মনকে বুঝ দেওয়ার মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। আবার মরণটাও নিশ্চিত হল। ও ভ্যানে উঠলে আর ফিরবে না। ঘরে পড়ে কদিন বাঁচে কে জানে। ঘরে মরলে অপদেবতাও হতে পাবে। মোতিবুড়ি দেবী না দানবী, সে মীমাংসা তো আজও হয়নি। দাও, সবাই মিলে মড়ার গাড়িতে তুলে দাও মোতিসুন্দরীকে। হাত লাগাও, ঘেন্না কোরো না, পরিষ্কার মনে ছুঁয়ে নাও।

কত রাত হল, আদি? সাপের ঠান্ডা লেজ যেন হিলহিলিয়ে গেল আদিগনের শরীরে। পাটাতন থেকে প্রশ্নটা এল।

মোতিবুড়ি ঠিক সেইভাবে পড়ে আছে, যেভাবে তাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আদিগন দেখে। মরা না বাঁচা বোঝার উপায় নেই। টানের শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। ভ্যান থামিয়ে একবার সে যাচাই করে নিতেই পারে। কী লাভ? এটুকু সুখ, অন্তত হাসপাতাল পর্যন্ত থাক যে, সে বহুকাল পর জ্যান্ত মানুষ বইছে।

রাত কত হল?

আদিগন যেন শুনতে পায় না। সাতঘরার মোড় পেরিয়ে গেল। এত অন্ধকার যে পথ আছে কি না বোঝা যায় না। যেন আকাশ থেকে ঝুপঝুপিয়ে নামছে অন্ধকার। মাটি থেকে ফিনফিনিয়ে উঠছে অন্ধকার। অন্ধকার চোখে-মুখে ঢুকে পড়ছে; আদিগন চোখ বুজে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করে। যেন বুজলে যতটা অন্ধকার তার চেয়ে কিছু বেশি আলো বাইরের পৃথিবীতে এখনও আছে। যেন চোখের পাতা দিয়ে মণির ওপর জমা অন্ধকার কিছুটা মুছে নেওয়া যায়।

লক্ষ্মী হতে গিয়ে মুকুন্দর বউ আর ফেরেনি, না রে আদি! তরতাজা বউটা তোর গাড়িতে চাপল। মোতিবুড়িই কথা বলছে। আদিগনের ভালো লাগে, মানুষটা বেঁচে আছে। এই অন্ধকার বাতাসে সহস্র শাঁকচুন্নির গল্প মনে করিয়ে দিলেও সে আর ভয় পায় না। এখন সে কথা বলতে চায়। কথা শুনতে চায়। কথা চালাচালির মধ্য দিয়ে বুঝতে চায় যে, মোতিবুড়ি বেঁচে আছে, সে নিজে বেঁচে আছে। হাসপাতালে যাচ্ছে তার গাড়ি।

আদি, মনে আছে, গাছ থেকে পড়ে রামুর হাত ভাঙল। তোর গাড়িতে চেপে হাসপাতাল গেল। আর ফেরেনি। ওরম মস্ত জোয়ান, সেও মরে গেল। মোতিবুড়ি আদিকে সব মনে করিয়ে দিচ্ছে। বুড়ির খেয়ালে একটু নড়চড় নেই। শরীর বিকল, মাথার কল চকচকে। চোখ-কানসহ সর্বশরীরে পঙ্গুতা নিয়ে, ঘরে বসেই মোতিবুড়ি যেমন ঠিক বুঝতে পারত, নীতীশ মাস্টার যায়, মুকুন্দর দ্বিতীয় পক্ষ যায়, পদ্মমণির ঘরে লোক আসে, গোপীনাথের বাড়িতে ভারি-ভারি লোকজন আসে, তেমনি করেই সে আদিগনকে মনে করিয়ে দেয় মড়ার গাড়ি হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত। আদিগন শোনে। ছোটো-ছোটো জবাব দেয়। মৃত্যুর গল্প বলতে বলতে জীবনের গাড়ি টানছে জেনে সে খুশি হয়।

মোতিবুড়ি. তুমি খুব সুন্দরী ছিলে?

খেঁ খেঁ করে হাসে ভ্যানের যাত্রী।

গাঁয়ে নাকি এত বড়ো সুন্দরী আর আসেনি?

আমি কী বলব রে পোড়ামুখো! যারা সগ্‌গে গেছে তাদের শুধো গে যা।

আদিগনের ফাজলেমি করার বাসনা হয়। ক'জন গেছে?

মোতিবুড়ি আবার খেঁ খেঁ করে হাসে। যারা দেখতে জেনেছিল। অত গোনাগুনতি তো নয়।

একবার দেখাবে। সগ্‌গে যেতে বড়ো লোভ। নকুড়বাবুর পোলে চড়তে গিয়ে ভ্যান ঝাঁকুনি খেল গর্তে পড়ে। মোতিবুড়ি খনখনিয়ে ওঠে, তুই কি আমাকেও মারবি হারামজাদা? চোখের মাথা খেয়েছিস? মাঝখান দিয়ে চল। কুচো পাথর ফেলে তাপ্পি দিয়েছে।

পোলের গড়ানটা সামলে-সুমলে নামতে নামতে আদিগন শুনতে পায়, মোতিবুড়ি বলছে, ওরা সবাই তোর ভ্যানে চাপিয়ে দিল। আর তুই আহাম্মক একবার গাঁইগুঁইও করলি না?

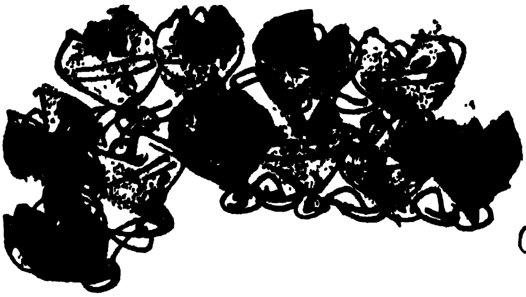
কী জবাব দেবে আদিগন? তার গাড়ি যে কোনো একদিন কাউকে বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরবে এই বিশ্বাসটা যখন নিজের কাছেই মুছে যায়, তখন কীভাবে সে রুখে দাঁড়ায়? তার মনে হয়, সে নিজেও একটা মড়ার গাড়ি। প্রত্যেকেই তাই। মানতে চায় না। ওইটাই ছলনা, বেঁচে ওঠার ভাবনার ছলনা।

মোতিবুড়ি আর কথা বলে না। দুঃসহ স্তব্ধতায় চাকার শব্দই একমাত্র আশ্রয় হয়। এটা তো স্পষ্ট, মোতিবুড়িকে খুনের দায় সে নিয়েছে। ভাঙা ঘরে থাকলে বুড়ি বাঁচতেও পারত। তখনও তো মরেনি। মোতিবুড়ি বেঁচে থাক এরকম একটা ইচ্ছে খুব মিহি হলেও তার মধ্যে ছিল, এটা আদিগন কীভাবে বোঝাবে?

সেই শূন্যতায় স্তব্ধতায় অপবাধময়তায় রমণীকণ্ঠের উচ্ছল হাসি আদিগনকে স্তম্ভিত করে। হাসিটা যেন অনেক দূর থেকে এসে তার ঠিক পেছনে দাঁড়াল। আদিগন ফিরে দেখে, ভ্যানে বসে এক আশ্চর্য যুবতি। দুর্গার মতো, জগদ্ধাত্রীর মতো তার রূপ নয়। তবু অপরূপা। এ রূপের ছায়া আদিগন বহুবার দেখেছে। এ রূপের বর্ণনা সে জানে না এতটাই চেনা। যুবতি হাসছে। ভালোবাসার হাসি। যুবতি বলল, আদিগন. তুমি কী চাও? তোমার একটা চাওয়া মেটাতে পারি। বলো, কী নেবে?

আদিগন বুঝল, সেই মোতিসুন্দরী। দেবী না দানবী যা মীমাংসিত হয়নি। হয় ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, নতুবা নতুন ছদ্মবেশ ধরেছে। টাকাপয়সা চাওয়াই যায়। দেবী বা দানবী যাই হোক, টাকা সহজেই দিতে পারে। ভাবল, সোনার ভ্যান চাইবে। আর মড়ার গাড়ি বলবে না কেউ। দিকে দিকে এটা সোনার রথ হয়ে যাবে। আবার ভাবল, বাচ্চা দুটো যেন খেয়ে-পরে বাঁচে. এটুকু সে চাইতেই পারে। এ চাওয়ায় লোভ নেই। সন্তানের জন্য চাওয়ায় অসম্মান নেই। কিন্তু আদিগন কিছুই চাইতে পারে না। কোনোটাই তার নিজের চাওয়া নয়। সে যা চায় তা বলতে পারে না। আদিগন মোতিসুন্দরীকে চায়।

মরণোত্তর



সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

চণ্ডীদাসবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল একটু-একটু করে। কীভাবে, সেটা বলার আগে ভদ্রলোকের পরিচয়টা একটু দিয়ে দিই।

কলকাতার উত্তর-প্রান্তে যে অঞ্চলে আমি বড়ো হয়ে উঠেছি, তিনি সেখানেরই স্থায়ী বাসিন্দা। তবে আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন এঁদের অধিকাংশেরই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। ল্যান্ডো, ফিটনের দিন কবেই গিয়েছে, বিশাল-বিশাল অট্টালিকাগুলি লোকাভাবে জীর্ণ, রুগ্ণ। সুযোগ বুঝে টাকার থলি নিয়ে এলাকায় ঢুকে পড়েছে নব্য ধনীশ্রেণির প্রতিভূ প্রমোটার সম্প্রদায়, চণ্ডীদাসবাবুদের মতো লোকেদের পৈতৃক বাড়ি ভেঙে উঠছে অমুক অ্যাপার্টমেন্ট, কিংবা তমুক হাউসিং।

এসবের মধ্যেও চণ্ডীদাসবাবুকে দেখেছি চুনোট-করা ধুতি আর গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে, হাতে একটি বাহারি ছড়ি নিয়ে কাছাকাছি পার্কের দিকে হেঁটে যেতে। ছোটোবেলায় দেখা ওঁর গাড়িটা বিক্রি হয়ে গিয়েছে কবেই, এমনকি বাড়িটারও অর্ধাংশও ভাইদের কেরামতিতে চলে গিয়েছে প্রমোটারের গর্ভে। শুধু রহস্যজনকভাবে তাঁর অংশটাই রয়ে গিয়েছে প্রাচীনত্বের যাবতীয় চিহ্ন বহন করে।

ভদ্রলোক বরাবরই অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। বিকেলের একটি নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কেউ তাঁকে রাস্তায় বেরোতেও দেখেননা কখনও। একফালি পার্কটায় গিয়ে বসে থাকেন। একাই।

অবশ্য, তাঁর এই পার্কে যাওয়া-আসা নিয়ে এলাকাতে, এমনকি আমার বাড়িতেও একটা চাপা ঠাট্টা-মশকরা চালু আছে। আগে নাকি তাঁর ঠিকানা ছিল অন্যত্র। জায়গাটা পার্ক ছাড়িয়ে আর একটু সামনে। বড়ো রাস্তার প্রায় কাছাকাছি। সেখানে গলির মুখে ওঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত ড্রাইভার-সমেত। বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত সেই গলির নাম আর করবনা। তবে সেই গলির ভিতরে কিন্নরীদের হাটেই ছিল তাঁর রসের আখড়া। চণ্ডীদাসবাবু গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন অনেকদিন। এবং তারপর থেকেই নাকি আর ও-পাড়ায় যান না। বহু পুরোনো অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছেন। কারণটা পরিষ্কার নয়। নানাজনে নানা কথা বলে। তার মধ্যে সবচেয়ে যেটি বিশ্বাসযোগ্য সেইটিই বলি।

চণ্ডীদাসবাবুর স্ত্রীর নাম পরমা। বোধহয় পরমাসুন্দরী বলেই। স্বামীর তুলনায় স্ত্রী মিশুকে স্বভাবের। আমরা মাঝে-মাঝেই তাঁকে 'মাসিমা-টাসিমা' বলে পুজো কিংবা ফাংশনের জন্য চাঁদা আদায় করেছি। বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাসবাবুকে 'মেসোমশাই' ডাকার সাহস আমাদের হয়নি।

অবশ্য যতই মিশুকে স্বভাবের হোন না কেন, এই পরমাদেবীরও ব্যক্তিত্বে আভিজাত্যের খোলসটি বেশ ভালোভাবেই আঁটা ছিল। কথাবার্তা যতটুকু বলতেন, আমাদের মতো কমবয়সি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেই। হয়তো আমরা তাঁর সন্তানতুল্য বলেই। এখানে এইটুকু জানিয়ে রাখি, পরমাদেবী নিজে নিঃসন্তান।

আমাদের বয়েস বাড়তে-বাড়তে চণ্ডীদাসবাবুর বাড়িতে ক্ষয়রোগ ধরে গেল। গাড়ি বেচে দিলেন, পরমাদেবীও গৃহবন্দি হয়ে রইলেন এবং এই লৌহ-যবনিকার আড়াল থেকেও একদিন একটুকরো খবর পাড়াময় ভেসে গেল, পরমাদেবী নাকি অসুস্থ।

মোটামুটি এই দুঃসময়েই কিন্তু আমার সঙ্গে চণ্ডীদাসবাবুর আলাপ। পাড়ায় তখন একটা আই-ডোনেশান সেন্টার খুলেছি। আমার কয়েকজন ডাক্তার-বন্ধুর সহযোগিতা ছিল। শর্ত একটাই। ওরা সকলেই ব্যস্ত ডাক্তার। আমি সাধারণ চাকুরিজীবী। সুতরাং আমাকেই সেক্রেটারি হয়ে এই সেন্টারের দেখাশুনো করতে হবে।

একসময় পাড়ার পুজো কমিটির সদস্য হিসেবে বিস্তর চাঁদা চেয়ে বেড়িয়েছি। এখন দুটোই চাই। চোখ এবং চাঁদা। এলাকায় মোটামুটি জনপ্রিয় বলে একটু-আধটু অহংকারও যে ছিলনা তা নয়, কিন্তু কাজে নেমে বুঝলাম,

চাঁদা তবুও পাওয়া যায়, কিন্তু চোখ সত্যিই দুর্লভ। তবুও একটা উদ্যোগ বলে কথা। লড়ে যাচ্ছি এবং এভাবে লড়তে-লড়তেই একদিন গিয়ে হানা দিলাম চণ্ডীদাসবাবুর দুর্গে।

রবিবারের বিকেল। ভদ্রলোক তখন তাঁর একমাত্র বিনোদন পার্কের দিকে হাঁটার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। যাই হোক, আমি আর আমার বন্ধু বীরু দু-মিনিটের সময় পেলেই ধন্য। অতএব, নীচের বসার ঘরে অপেক্ষা করার অনুমতি মিলল।

ভদ্রলোকের কাছে আমরা সরাসরি চোখই চাইলাম। তাঁর নিজের এবং পরমাদেবীর। আবেদন শুনে সামান্য হাসলেন। তারপর বললেন, 'পরমাদেবীর কথা কিছু বলতে পারবনা। আপনারা আমারটা পেতে পারেন।'

কথাটা শুনে একটু অবাকই হলাম। পরমাদেবীকে মৃত্যুপথযাত্রী হিসেবে ধরে আমরা তাঁর চোখদুটোর ওপরেই বেশি ভরসা করেছিলাম। সুস্থ লোকদের খুব অল্পজনকেই আমরা রাজি করাতে পেরেছি। তা-ও লাখখানেক কথা খরচ করে।

যাই হোক, সইসাবুদ হয়ে গেল। চা-ও এল। দু-মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট হয়ে গেল। আমরা উশখুশ করছি, এমনসময় চণ্ডীদাসবাবু বললেন — 'ইচ্ছে করলে আমার কাছে আরও গোটাদশেক ফর্ম রেখে যেতে পারেন।'

গোটাদশেক! আমি আর বীরু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। চমক ভাঙল ভদ্রলোকের কথায়। —'একটু বসুন। আমি আসছি।'

ভদ্রলোক ভেতরে গেলেন। ফিরে এসে একটা গোলাপি কাগজ আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন — 'আমার চাঁদাটা।'

একটা চেক! একশো-এক টাকার!

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাটা নাটকীয় হয়ে যাবে ভেবে হাত-জোড় করেই নমস্কার-টমস্কার মেরে উঠে পড়েছি, ভদ্রলোক বললেন —'আপনার বাড়িতে অনেক পুরনো গানের রেকর্ড আছে না? আপনি পরে একবার আসবেন। দরকার আছে।'

এইভাবে গত এক বছরে গানের রেকর্ড নিয়ে চণ্ডীদাসবাবুর বাড়িতে অন্তত তিন-চারবার গিয়েছি। রেকর্ডগুলো আমার ছোটোকাকার কেনা। কাকা হঠাৎ মারা যাবার পর পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছিল। উনি তার কিছু কিছু কিনে নিতেন। এভাবেই তাঁর সঙ্গে একটু-একটু করে আলাপ হয়েছে।

এ-বছর আই-ডোনেশান ক্যাম্পের একটু ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেছি। দু-একজন মন্ত্রী-টন্ত্রীকেও আনার চেষ্টা চলছে। সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান। বীরু বলল —'বুড়োকে প্রধান অতিথি করে দে। আর এই মওকায় ফর্মগুলোর খবর নে। তোর সঙ্গে তো এখন প্রায়ই দেখা-টেখা হচ্ছে।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। একদিন আলাদাভাবেই গিয়ে কথাটা পাড়লাম চণ্ডীদাসবাবুর কাছে। তবে সুবিধে হল না। এককথায় খারিজ করে দিয়ে বললেন -- 'আমার স্ত্রী অসুস্থ। আমি কোথাও যাই না।

প্ল্যানটা ভেস্তে গেল। কটা দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। যেদিন প্রোগ্রাম, সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় বারোটা হল। ফিরে এসে স্ত্রীর মুখেই দুঃসংবাদটা পেলাম। ঘণ্টাকয়েক আগে পরমাদেবী মারা গিয়েছেন।

ভেবেছিলাম, পরের দিনই যাব। পারিনি। সব মিলিয়ে তিন-চারদিনের মতো দেরি হয়ে গেল।

সেই বসার ঘর। সেই নিস্তব্ধ পুরী। একমাত্র ভৃত্যটি ওপরে খবর দিতে গেল। মিনিট পাঁচেক পর নেমে এলেন চণ্ডীদাসবাবু। বললেন —'দুঃখিত। আমার দেরি হয়ে গেল।'

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

চণ্ডীদাসবাবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে একগোছা কাগজ বার করলেন। বললেন —'দুঃখিত। আপনাদের অনুষ্ঠানের দিন পৌঁছে দিতে পারলাম না। দেরি হয়ে গেল।'

—এসব?

— আপনাদের আই-ডোনেশান ফর্ম। দশখানা রেখে গিয়েছিলেন। গুনে নিন।

আশ্চর্য! ভদ্রলোক পারলেন শেষ পর্যন্ত!

ফর্মগুলো উলটে-পালটে দেখতে গিয়ে প্রথম নামটিতেই ধাক্কা খেলাম— উত্তমা দাসী! ইনি কে? চণ্ডীদাসবাবুর নিজস্ব সমাজে এরকম নাম হয়না।

পরের ফর্ম—ললিতবালা সরখেল। তৃতীয়জন—আশালতা। পদবি নেই। আশ্চর্য! এরা কারা? চমক ভাঙল চণ্ডীদাসবাবুর কথায়।

আপনি বোধহয় ফর্মগুলো ঠিক গুনেও দেখেননি। একটা কম রয়েছে।

কী বলব ভেবে পেলাম না।

—আসলে অনেকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে ওটা আমি কালই এলাহাবাদের একটা ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ফিরে আসতে কিছুদিন সময় নেবে।

—এলাহাবাদে? সেখানে কে আছেন? আপনার কোনো আত্মীয়?

—নাঃ। এরা কেউই আমার আত্মীয় নয়। আপনি কি এদের একজনকেও চেনেন?

মাথা নাড়লাম। একজনকেও চিনিনা।

চণ্ডীদাসবাবু হাসলেন। তারপর বললেন— 'অন্তত একজনকে নামে চিনবেন। যে এখন কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদে রয়েছে। —হরিদাসী।'

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও এতটা চমকে উঠতাম না। হরিদাসী! হ্যাঁ, এলাকার ছেলে হিসেবে একে নামে চিনি বটে। কুখ্যাত পল্লির একসময়ের গণিকাপ্রধান।

চণ্ডীদাসবাবু বললেন —'এরা কেউই আর কাজ করেনা। বয়েস হয়েছে। তবে ও-পাড়াতেই থাকে। কোথায় আর যাবে? তবুও দেরি হয়ে গেল। কয়েকটা মেডিক্যাল টেস্টও করালাম। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ওদের জাতে যে-দোষই থাক, চোখে নেই।'

আমি নির্বাক। একবছর ধরে এই কাণ্ড করেছেন আমাদের কিছুই না জানিয়ে!

—'শুধু একজনকেই রাজি করতে পারলাম না।'— চণ্ডীদাসবাবুই নীরবতা ভাঙলেন। —'কারণটা আপনাকে জানানো দরকার। অবশ্য, তার আগে জানা দরকার আপনি বা আপনারা আমার সম্বন্ধে কী জানেন।'

এ তো বড়ো জটিল, কূট প্রশ্ন! কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়নেওলা নয় বুঝে হোঁচট খেতে-খেতে শুরু করলাম।

উনি সবটা শুনলেন। তারপর ধীরে-সুস্থে বললেন— 'আর কিছু?'

আর যা জানি, সেটা বলা যায় না। চুপ করেই রইলাম।

চণ্ডীদাসবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। তারপর বললেন —' আপনি তো আসল কথাটাই এড়িয়ে গেলেন, এ-পাড়ায় যেটা সবচেয়ে মুখরোচক সংবাদ। নিষিদ্ধ পল্লিতে আমার নৈশ বিহার।'

আমি পুরোপুরি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম।

—দেখুন, ও-পাড়ায় আমাদেব অন্তত চার-পুরুষের যাতায়াত। বলতে পারেন, নেশাটা আমাদের রক্তেই রয়েছে। আমার অন্য তিনভাই যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেও, আমি আমার বনেদিআনা ছাড়তে পারিনি। আমার ছেলে-মেয়ে নেই। সেটাও একটা সুবিধে। তবে পরমা আমার এই অভ্যাস মেনে নিতে পারেনি।

— সেটাই তো স্বাভাবিক। সাহস করে বললাম।

—খুব স্বাভাবিক নয়। পুরোটা শুনলে বুঝবেন। পরমা নিজেও বনেদি ঘরের মেয়ে। ব্যাপারটা তার কাছে অভিনব কিছু নয়। আর কোনো নৈতিক কারণে ও আপত্তি তোলেনি। আসলে, ওর মনে সবসময় একটা আতঙ্ক থেকে গিয়েছিল।

—আতঙ্ক?

—হ্যাঁ। বেশ্যাব শরীর থেকে বিষ টেনে এনে যদি আমি ওর রক্তে ঢুকিয়ে দিই!

— আশ্চর্য!

—আশ্চর্য কিছু নয়। পরমা সুন্দরী ছিল। আর ভালোবাসত শুধু নিজের সৌন্দর্যকে।

—এরকমও হয়?

—কতরকম হয়। কেউ শরীরটাকে নিয়ে খেলে, কেউ সিন্দুকে তুলে রাখে। পরমা ছিল দ্বিতীয় জাতের। আর সেইজন্যেই আমরা নিঃসন্তান।

—কিন্তু, আমরা যে শুনেছি ....

— সেটা শোনা কথাই। পরমার কোনো শারীরিক ত্রুটি ছিলনা। শুধু ওর আতঙ্কটা বহুদূর পর্যন্ত চারিয়েছিল। ও ভাবত, বেশ্যার বিষে ওর সন্তান হবে বিকলাঙ্গ।

—কিন্তু, ভয়টা কি অমূলক? ওদের ঘরে কত উলটোপালটা লোক যায়।

—আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের বনেদি ঘর। আমাদের বাঁধা মেয়েমানুষ থাকে। আমার বাপ-ঠাকুর্দার ছিল। আমারও ছিল। তার নাম চাঁপা। পরমা তাকে দেখেনি কখনও। দেখার কথাও অবশ্য নয়। তবু আমি প্রথা ভেঙে দেখাতে চেয়েছিলাম। আসলে আমি ওর আতঙ্কটা দূর করতে চাইতাম। কিন্তু ততদিনে ওর ভয়টা শুচিবায়ুতে পরিণত হয়েছিল। যার ফলে চাঁপার স্বাভাবিক মৃত্যুও ওর কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

—আপনি কি তারপরেই ওখানে যাওয়া ছেড়ে দেন?

—না, ঠিক তারপরেই নয়। আরও গিয়েছি। প্রায় বছর-দুই।

—কেন?

—হয়তো খানিকটা অভ্যাস। আর খানিকটা, লতিকার প্রতি টান।

—লতিকা কে?

—চাঁপার পাশের ঘরেই থাকত। বয়েসে অনেক ছোটো। ওকে বাজারি আওরতই বলা যায়। তবু, চাঁপার অসুখের সময় দেখেছিলাম ওর সেবা। হয়তো তাতেই ভালো লেগে থাকবে। সুতরাং, চাঁপার পরে আমি লতিকার ঘরেই যাতায়াত শুরু করলাম। ঝামেলা যে কিছু হয়নি, তা নয়। তবে সে-সব ঠান্ডা করার ওষুধও আমাদের বনেদি রক্তে মিশিয়ে দেওয়া আছে।

—পরমাদেবী?

—সবই জানতেন। তবে ও তখন ওর পুজোপাঠ নিয়েই থাকে। আমরা কেউ কাউকে ঘাঁটাই না।

—তারপর?

—বছরখানেক এভাবেই কেটে গেল। তারপর আর ভালো লাগত না। লতিকার কম বয়েস। মনে হত, ওকে আটকে রেখেছি। ওকে একদিন বলেও ফেললাম সে-কথা। শুনে ও বলল— 'এ কী কথা বলছেন বাবু? চাঁপাদির ভাগ্য কত ভালো! পুরো শরীরটাই আপনাকে নিবেদন করে গেল। আর আমাদের দেখুন? শরীর নিয়ে এ-ঘাটে ও-ঘাটে খেলা করে বেড়িয়ে অসুখই বাঁধিয়ে ফেললাম। এ' শরীরের আর কাউকে কিচ্ছু দেবার নেই বাবু। যদি কিছু থাকে তো আছে বিষ।

পরমার মুখে এই শব্দটা বহুবার শুনেছি। সেদিন লতিকার মুখে শব্দটা শুনে চমকে উঠলাম। ও তৎক্ষণে পায়ের গোছ থেকে শাড়িটা অল্প সরিয়ে আমাকে বলল —'আপনি ধনী লোক, আপনাকে পা দেখাতে শরম লাগে। তবু এই দেখুন বাবু, দু-পায়েই সাপে ছোবল মেরে গেছে। তাগার বাঁধন দিয়েও আঁটতে পারছিনা। বিষ মাথায় চড়ল বলে।'

চণ্ডীদাসবাবু একটু থামলেন। সামান্য জল খেলেন। ভৃত্য এসে আমাকে এক কাপ চা দিয়ে গেল।

—আপনি সোরাইসিস রোগটার নাম শুনেছেন?

মাথা নাড়লাম। শুনিনি কখনও।

—বড়ো ভয়ংকর এক চর্মরোগ। বীভৎসও বলতে পারেন। মেডিক্যাল সায়েন্সের ওপর আমার একটু-আধটু শখের পড়াশুনো করা আছে। লতিকার পায়ের ঘায়ের ধরনটা সেই সোরাইসিস রোগেরই পূর্বলক্ষণ বলে আমার মনে হল।

—বলেন কী!

—হ্যাঁ। তখনও গাড়িটা ছিল। মেয়েটাকে নিয়ে গেলাম বিখ্যাত স্কিন-স্পেশালিস্ট ডাক্তার মল্লিকের চেম্বারে। ওষুধ-বিষুধ, রক্ত-পরীক্ষা কিছুই বাদ গেলনা। রোগটা কিন্তু কিছুতেই ধরা পড়লনা। উলটে ছড়াতেই লাগল। সমস্ত শরীরের চামড়া ফেটে পুঁজ বেরোতে লাগল। লতিকা ঠিকই বলেছিল। বিষ শেষপর্যন্ত মাথাতেও চড়ে বসল। অসহ্য কষ্টে ওর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল। চোখে একটা ঘোর হলদেটে ভাব। আমাকে দেখলেই বিড়বিড় করে বলত —'আমাকে শুদ্ধ করে দাও বাবু। চাঁপাদির মতো শুদ্ধ করে দাও। কোনোদিন ছুঁয়েও দেখনি আমাকে। একবার ছুঁয়ে দাও। পায়ে পড়ি তোমার।'

ও-পাড়ায় রব উঠে গেল, লতিকার কুষ্ঠ হয়েছে। খদ্দেরপাতি কমে গেল। আমিও ভেবে দেখলাম, ওকে ট্রপিক্যালে ভর্তি করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। ওখানের ডাক্তার যোশীর নাম শুনে থাকবেন। উনিই ওকে দেখতেন।

—তারপর?

—কিন্তু কিছুই হল না। উলটে চেহারা হয়ে উঠল আরও বীভৎস। মাথাটাও গেল পুরো খারাপ হয়ে। কাউকেই চিনতে পারে না। শুধু আমাকে দেখলেই বিড়বিড় করে একই কথা বলে— 'শুদ্ধ করে দাও বাবু। চাঁপাদিব মতো শুদ্ধ করে দাও।' শেষটায় আমিও আর রোজ যেতাম না। বড়ো কষ্ট হত।

—কিছুই হলনা?

—নাঃ। দিন দুই আর হাসপাতাল-মুখো হইনি। তৃতীয়দিন সন্ধে নাগাদ টেলিফোন পেলাম। লতিকা মুক্তি পেয়েছে। সৎকার সমিতির গাড়িটা নিয়েই গেলাম। ডাক্তার যোশীর চেম্বারে ঢুকে বললাম— 'ডেথ সার্টিফিকেটটা লিখে দিন।'

ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর বললেন— 'এই বডির তো সৎকার হবে না।'

—'তার মানে?'— আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

ডাক্তার বললেন— 'দিন দুই আগে এই পেশেন্ট একটা অদ্ভুত কথা বলতে থাকে। একে প্রস্টিটিউট, তার ওপর ক্র্যাক্‌ড ব্রেন, সেজন্য প্রথমটায় কেউ আমল দেয়নি। আমি একটু কাজে দিল্লি গিয়েছিলাম। আমার জায়গায় ডাক্তার মিত্র ওকে দেখতেন। তাঁকে বলতে শুরু করে—'বেঁচে থেকে আর শুদ্ধ হব না বাবু। মরার পর শুদ্ধ করে দাও। শরীরটা পুড়িয়ে দিওনা, বিষটা খুঁজে বার কর তোমরা।' ডাক্তার মিত্রর সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়। আমি বলি —'মনে হচ্ছে এই পেশেন্ট বডি ডোনেট করতে চায়। সুযোগটা ছাড়বেন না।' তখন ডাক্তার মিত্র ওকে দেহদানের ফর্ম এনে দিয়েছিলেন। আপনার নাম্বার না জানায় টেলিফোন কবতে পারেননি। পেশেন্ট এককথায় সই করে দিয়ে গেছে। ওই বডি এখন হসপিটালের সম্পত্তি।'

চণ্ডীদাসবাবু সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন— 'কাজেই, আপনি যাকে ভাবছেন আমাব সাফল্য, তাতে আমার কোনোই হাত নেই। লতিকাই ওদের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল।'

—আর পরমাদেবী? তাঁর ঠিক কী হয়েছিল?

—লতিকার মতো ওর অসুখটাও ধরা পড়েনি। রক্তের মধ্যে কোথা থেকে কোন এক অজানা ভাইরাস এসে দানা বাঁধল, বোঝা গেলনা কিছু। জ্বর আর ছাড়ত না। যে রূপকে ও এত ভালোবাসত, সেই রূপ অল্প অল্প করে ঝরে গেল। মাথার চুল উঠে গেল, শরীর শুকিয়ে কাঠি, বংটাও জ্বলে গেল। আমার কথা শুনবে না জানতাম, তাই ডাক্তার রুদ্রকে দিয়েই বলিয়েছিলাম।

—কী কথা?

—শরীরটা দিয়ে যাও, পরমা। অন্তত একটা কাজে লাগিয়ে খাও। সহবাসে তৃপ্তি পেলে না, সন্তানধারণ করলে না, মৃত্যুব পর শরীরের একটা গতি করে দিয়ে যাও। ... শুনল না। ঝরে-যাওয়া শরীরের জন্যও এত মায়া!

চণ্ডীদাসবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন— 'শেষপর্যন্ত শরীরের আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু চোখদুটো চেয়েছি। বলেছি— ছেলেরা আমাদের সন্তানতুল্য। কতবার ওদের কত আবদার রেখেছ। অন্তত চোখদুটো দিয়ে যাও।' —শুনে একটু নরম হয়েছে। বলেছে—'ফর্মটা বালিশের নীচে রেখে যাও।'

সারাদিন অপেক্ষা করেছি। রাত আটটা নাগাদ নার্স এসে আমাকে ডাকল। ততক্ষণে সব শেষ। বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে বার করলাম। সব সাদা! কোথাও একটা কালিব আঁচড়ও নেই!'

আমাব আব কিছু বলার ছিল না।

চণ্ডীদাসবাবুই বললেন— 'অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম আপনাকে। অনেক কথা বললাম। আসলে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া দরকার। লতিকা বলত— 'শুদ্ধ করে দাও বাবু। পায়ে পাড়ি তোমার।' মহাপুরুষ নই। কিছুই করতে পারিনি। আর পরমাকে মনে মনে বলেছি—নিজেকে শুদ্ধ করে নাও। এই শেষ সুযোগ তোমার।— বোঝাতে পারিনি। আমি স্বর্গ-নরক মানিনা। তার নিজের বিচারে পরমা হয়তো শুদ্ধই ছিল। আপনারা বলবেন, শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধদেহীর স্বর্গবাসই হয়। তাহলে লতিকার মতো অশুদ্ধার কী হবে? আমি জানি না।'

নরকের



শুভমানস ঘোষ

ভয় মানুষকে কুৎসিত করে তোলে। তাই বুদ্ধিমান ও রুচিশীল মানুষ ভয় পেলেও চট করে বুঝতে দেন না।

অবিজিত মুখোপাধ্যায় রুচিশীল ও বুদ্ধিমান তো বটেই, উচ্চশিক্ষিতও। কাজেই ধীরে ব্রেক কষে স্কুটার দাঁড় করিয়ে দিল। চাপ চাপ সাদা ধোঁয়ায় সামনেটা পুরো ঢেকে গেছে। বোমা-টোমা? কাঁদানে গ্যাস? না কি কাছাকাছি কোনো ফ্যাক্টরি থেকে গ্যাস লিক করেছে?

আতঙ্কিত হলেও দৃশ্যত নিরাসক্ত চোখে অবিজিত ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিল ফুটপাথের দিকে। ফুটপাথে যথারীতি লোকজন, দোকানপাট, ফুটকা, মুড়ি-মশলা, আখের রস এবং গুটিয়ে পাকিয়ে শুয়ে থাকা নেড়ি কুকুর—কানে তার শুকনো খরখরে কাদা ঝুলছে।

—মেনবোর্ডে ধোঁয়া দিয়ে পাবলিকের চোখে ধুলো দিচ্ছে। এখানে যেন মশা বসে আছে! যেমন অপদার্থ সরকার, তেমনি কর্পোরেশন'

একজন লোক। গজগজ করতে করতে ধোঁয়া ভেদ করে চলে গেল। বোমা নয়, গ্যাস-ট্যাসও নয়, মশামারা ধোঁয়া! অবিজিত নিঃশব্দে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

হুঁ, ম্যালেরিয়া নিয়ে কিছুদিন ধরে শহর তোলপাড় হচ্ছে। যে রোগটা কিছুকাল আগেও সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে বলে মনে করা হত তা নতুন ভাবে শক্তি সংগ্রহ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিনশো বছরের মহানগরীর বুকে। ইতিমধ্যেই ম্যালিরিয়ার আক্রমণে শ-খানেকের মতো লোকও মারা পড়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে পৌরসভা সকলেই নড়ে বসেছে। তারই প্রমাণ এই ধোঁয়া। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের অঙ্গ হিসেবে খানিক আগে এই পথ দিয়ে মশামারা কামানবাহী শকট ছুটে গেছে। শেষে মশা মারতে মানুষকে সেই কামানই দাগতে হল!

মনে মনে 'শিট' বলে অবিজিত ট্রাউজার্সের পকেট থেকে বের করে আনল রুমাল। ঘাড় ও গলা মুছতে মুছতে সে ভাবছিল, ম্যালেরিয়া নিয়ে প্রেসের লোকেরাও একটু বাড়াবাড়িই করছে।

মিনিট পাঁচ। ধোঁয়া সরে গেল। আলো-চকচকে ট্রাম-লাইন, সামান্য বিরতির পর একপাল বুনো মোষের মতো ধেয়ে আসা রকমারি গাড়ি ও আগেপিছে অধৈর্য হর্নের শব্দে দেখতে দেখতে রাজপথ তার স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পাচ্ছিল।

অবিজিত স্কুটারের স্টার্টারে পদাঘাত করল। গুড়গুড় করে উঠল যন্ত্র। কিন্তু সামনে একটা কুৎসিত ঠেলা।

—অ্যাই ঠেলা বাড়া না! তীব্র হর্নের শব্দের সঙ্গে অবিজিতের মুখ থেকে ছিটকে বেরোল চিৎকার, মশামাছি সব এসে জুটেছে কলকাতায়!

মশার কামড়ে মানুষ মরা নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু তা নিয়ে এতটা লাফালাফির কী আছে তা অবিজিত ভেবে পায় না। কাল বিকেলেই স্ত্রী সুচিরার সঙ্গে তার এ নিয়ে কথা হচ্ছিল। সুচিরাকে আশ্বস্ত করে সে বলেছিল, আরে এ সব কাগুজে গিমিককে পাত্তা দিচ্ছ কেন? প্রতি বছরই শীতের গোড়ায় বস্তিটস্তি এরিয়ায় এ রকম দুচার পিস পাবলিক মরে। মাথা থেকে নামাও তো সব।

—কী বলছ! সুচিরা বলে উঠেছিল, এই তো আজই পেপারে পড়লাম, সাউথের দিকেই ম্যালেরিয়া বেশি ছড়াচ্ছে— বড়োলোক-গরিব মানছে না। পাপাইকে নিয়েই আমার চিন্তা।

পাপাই সামনেই ছিল। তাদের একমাত্র সন্তান। সামনের ডিসেম্বরে চারে পড়বে। শুধিয়ে উঠেছিল, ম্যালেরিয়া কী মাম্মি?

—ম্যালেরিয়া একটা রোগ। সুচিরা উত্তর দিয়েছিল।

—রোগ! যত্ত ঘ্যানঘেনে বাংলা! অবিজিত বলে উঠেছিল, বলো, আ কাইন্ড অফ ডিজিজ— সাচ অ্যাজ —

—ম্যালেরিয়া হলে কী হয় ড্যাড?

—কাগজের বিক্রি হয় আর ডাক্তারের পকেট ভর্তি হয়। অবিজিত অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল।

তৎক্ষণাৎ পাপাইয়ের মুখ ভার হয়ে গিয়েছিল। 'তুমি দুষ্টু' বলে বাবাকে ঘুষি দেখিয়ে চলে গিয়েছিল ঘর থেকে। সে চলে যেতেই—

অবিজিত গাড়ির গতি কমাল। আবার বাধা। হই-হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসছে। কর্কশ যান্ত্রিক শব্দে পড়ে যাচ্ছে দোকানপাটের সাটার। আতঙ্কিত হয়ে লোকজন ছোটাছুটি করছে এদিকে ওদিকে। আবার কী হল?

ছেলে চলে যেতেই সুচিরা অবিজিতের দিকে ফিরেছিল, দেখলে? ছেলে একদম তোমার বসানো। কিছু বলা যাবে না—ডাঁটের ঠেলায় অস্থির।

অবিজিতের ধারালো ঠোঁটদুটো আরও ধারালো হয়ে উঠেছিল, ওর পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। মোর দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড ফিটের সাউথ ফেস্‌ড ফার্নিশড ফ্ল্যাট, বাবা প্রোফেসর, এমন সুন্দরী মা—ছেলেকে দোষ দেওয়া যায় না।

—সুন্দরী! সুচিরা ঘাড়ছাঁটা চুলের রাশি নাচিয়ে ঝরঝর করে হেসে উঠেছিল, এর বেলা ঠিক তোমার ঘ্যানঘেনে বাংলা। ভ্যাট!

—ভ্যাট? অবিজিত সোফা থেকে উঠে এসে সুচিরাকে টেনে নিয়েছিল কাছে, এই মেয়েটা যদি সুন্দরী না হয় তবে সুন্দরী কে?

—অ্যাই ছাড়ো ছাড়ো! পাপাই এসে পড়বে!

অবিজিত আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছিল সুচিরার, তোমার গালের নীচের এই আঁচিলটা—কী বলব, মার্ভেলাস? উহুঁ। চার্মিং? উহুঁ। দিই একটা?

—কী হচ্ছে তোমার!

অবিজিতের তৃষ্ণার্ত সুন্দর ঠোঁটজোড়া এগিয়ে আসছিল সুচিরার গালের আঁচিল লক্ষ্য করে। সুচিরার চোখের সামনে আস্তে আস্তে ঢেকে যাচ্ছিল মাথার ওপর সিলিঙে শিকারের অপেক্ষায় বসে থাকা তাদের ড্রয়িংরুমের টিকটিকিটা। তার পর ক-সেকেন্ড? জানে না সুচিরা।

—এ কী! ছিটকে সরে গিয়েছিল অবিজিত।

প্রচণ্ড শব্দে বোমা পড়ল একটা। অবিজিত ভয় পেয়ে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিল। দুদ্দুড় করে কোত্থেকে দৌড়ে আসছে চার-পাঁচজন যুবক। তাদের কারুর হাতে পিস্তল, কারুর হাতে শোর্ড, সাইকেলের চেন। একজন বোমা নিয়ে ছোড়ার ভঙ্গিতে দৌড়ে আসতে আসতে চিৎকার করছিল, সরে যান! সরে যান!

কয়েক সেকেন্ড। তার মধ্যেই মনস্থির করে স্টার্টারে সবলে লাথি কষিয়ে অবিজিত স্কুটারের মুখ ঘুরিয়ে দিল। বাঁ দিকে একটা গলি। হাত সাত-আট চওড়া হবে কি হবে না। আলোবাতাসহীন গুহা বললেই হয়। হেডলাইটের ঝাঁঝালো আলোয় গলি কাঁপিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর দাঁড়িয়ে যেতে হল অবিজিতকে। গলি শেষ। সামনে হাড়পাঁজরা বেরনো একটা বাড়ি।

বাড়িটার সামনে তারে ষাট পাওয়ারের লালচে একটা বাল্‌ব জ্বলছিল। তার বিষণ্ণ আলোয় বাড়িটাকে সর্বাঙ্গে ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়ার বিষকীটে মুমূর্ষু রোগীর মতো লাগছিল। বাড়ির দরজা খোলাই ছিল। অবিজিত গাড়ি ঠেলে ঢুকিয়ে স্ট্যান্ড করে হেলমেট খুলে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একজন মাঝবয়েসি মেয়ে এগিয়ে এল। মেয়েটির গায়ের রং কালো। মুখে প্রচুর পাউডার মেখেছে। গায়ে লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ। কণ্ঠার হাড় উৎকট ভাবে উঁচু হয়ে আছে তার।

—কে এল গো রানিদিদি?

বলতে বলতে আর একটি মেয়ে এগিয়ে এল। তার পরনে ঘাগরা আর ব্লাউজ। বয়েস বেশি নয়, কিন্তু মুখের মধ্যে রুক্ষতা আর কর্কশতা এর মধ্যে ক্ষতের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অবিজিতের গা শিরশির করে উঠল। এ সে কোথায় এসে পড়ল!

মেনরোডে আবার বোমা পড়ল। দৌড়তে দৌড়তে বাইরে থেকে এসে পড়ল আরও তিনজন মেয়ে। তাদের

একজনের শাড়ির প্রায় গোটাটাই তার হাতে। সে রানির দিকে চেয়ে রাগে ফেটে পড়ল, আজ আবার হিস্যা নিয়ে লেগেছে। কুত্তাগুলোর জ্বালায় রোজ রোজ ধান্দাপানি চৌপাট।

বলতে বলতে মেয়েটার নজর গেল অবিজিতের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার গলার স্বর বদলে গেল, এ মালটা আবার কে? হেভি টুসটুসে চেহারা তো! কোন দোকানের রসবড়া গো তুমি?

মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ল একে অন্যের গায়ে।

—অ্যাই রেখা তুই ভেতরে যা। চোখ নেই, দেখতে পাস না, ভদ্দরনোক? বিপদে পড়ে গেছে। রানি চোখ পাকিয়ে মেয়েটিকে শাসন করে ঘুরল অবিজিতের দিকে, বাবু, আপনি আমার সাথে আসেন। ভেতরে যেয়ে বসবেন। ঝামেলা মিটলে যাবেনখন।

রেখা অশ্লীল দেহভঙ্গি করে বলল, রসবড়া ঢেকে নিয়ে যেও গো রানিদিদি—কাক-শালিকে না ছোঁ মারে।

মেয়েরা আবও জোরে হেসে উঠল। কান-মাথা গরম হয়ে গেল অবিজিতের। তাড়াতাড়ি হেলমেটটা মাথায় আঁটতে আঁটতে গলা চড়িয়ে দিল, অ্যাই সরো সরো! আমি গাড়ি বের করব। হটো!

রেখা বলে উঠল, ও মা, রসবড়া কই? এ যে লাটগিন্নির নাং। অ্যাই গরম লিচ্চে। কেউ সরবিনি।

আবার বোমা পড়ল। পব পর দুটো। মেয়েরা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ পড়িমরি ছুটল যে যার ঘবের দিকে। রেখাও লাফিয়ে উঠল। 'শালার আসছে রে' বলে কুৎসিত একটা গালি দিয়ে শাড়ি লুটতে লুটতেই ঢুকে গেল তার ঘবে।

—বাবু, এখানে দাঁড়াবেন না। আসেন আসেন। বলে রানি দিল টান অবিজিতের হাত ধরে।

অবিজিতেব গা ঘিনঘিন করে উঠল। রূঢ়ভাবে রানির হাত সবিয়ে দিয়ে রানিকে অনুসরণ করল। উঠোন আর রেলিংভাঙা নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে রানির পিছু পিছু একটু গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ছোটো একটা ঘুপচি ঘর।

ভেতবে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে রানি ডাক দিল, আসেন বাবু।

ঘরে ঢুকে অবিজিতের গা গুলিয়ে উঠল। মদের বোতল, সিগারেটের প্যাকেট থেকে শুরু করে তুলো-বেরনো কুৎসিত কাঁথা— মোটামুটি সবই আছে ঘরের ভেতর। ছোটো একটা চৌকিব একপ্রান্তে গুটিয়ে রাখা আছে বিছানা। তার ভেতবে থেকে নোংবা কালো মশারিব অংশ বেরিয়ে ঝুলছে।

মশাবি মানে তো মশা। হুঁ, চাবপাশে তার গুঞ্জনধ্বনি বেশ শোনা যায়। আর এখানকার মশা মানেই নির্ঘাত ম্যালেবিয়া। আর ম্যালেরিযা মানে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াব জীবাণু মহা ভয়ংকর প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম। অবিজিত পা ঠুকতে আরম্ভ করেছিল।

—বসে পড়েন বাবু।

অবিজিত 'না না' বলে শিউরে উঠে পা ঠুকতে আরম্ভ করেছিল আরও জোরে জোরে।

—কী হল বাবু, ইঁদুর? ঘরের যা ছিরি, ইঁদুর আসবেনি? রানি ঘুবে গেল দরজার দিকে, একটু দাঁড়ান বাবু। বাইরে প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ল কাদের সম্মিলিত গলা। হিস্যার লড়াই ঢুকে পড়েছে এখানে।

—অ্যাই কোথায় যাচ্ছ? অবিজিতের গলা কেঁপে গেল।

রানি ঘুরে গেল, এই যাব আর আসব।

রানি চলে গেল। বাইরের গর্জন বাড়ছে। কটা ছেলে ঢুকেছে এখানে? মারধোরের শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল যেন। এ তো ভালো বিপদ হল দেখছি।

—বাবু!

অবিজিত দরজার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। সেই রাগি মেয়েটা। রেখা। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে তাকে চুপ করে থাকতে বলে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিয়ে চলে গেল।

ঘরের দেওয়ালে সেক্স-ম্যাগাজিন থেকে কেটে-নেওয়া কয়েকটা উলঙ্গ নারীদেহের ছবি। তার ওপর বসে আছে একটা টিকটিকি। অনেকটা তাদের ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুমের টিকটিকির মতন না? টিকটিকিমাত্রই সবই কেন যে একই রকমের মনে হয়!

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল রানি। ওর হাতে একটা ছোটো টুল। সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি এটায় বসেন বাবু।

অবিজিত এতক্ষণে মেয়েটার দিকে পূর্ণচোখে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তঃকরণ কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। কুৎসিত কুৎসিত! রোদে চৌচির মালভূমির মাঠের মতো সারা শরীরে অমিতাচারের চিহ্ন। নরকের কীট কথাটা কি এদের কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছিল?

এই ঘরের কিছুই সে ছোঁবে না। কিচ্ছু না। অবিজিত 'না' বলে গলা খাটো করে ফেলল, আমি এখানেই ঠিক আছি। ওফ্, আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম!

রানি টুলটা নামিয়ে হাত নাড়ল, আপনি চিন্তা করবেন না বাবু। আমরা তো আছি। আপনার গায়ে আঁচড়টি লাগবেনি। একটু জল খাবেন?

অবিজিতের মাথাটা হুট করে তেতে উঠল। গলাও চড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, না!

রানির ঠোঁটে হাসি আঁচড় কাটল। বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা খারাপ মেয়েছেলে, জল খেতে হবেনি। রাস্তা পরিষ্কার হলেই আপনাকে পৌঁছে দে আসব।

রানি দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল আবার।

জীবনের এক-একটা দিন অন্য দিনগুলোর তুলনায় একেবারেই অন্যরকম হয়ে যায়। অবিজিতের যেমন হল সে দিনটা। পতিতাপল্লি থেকে প্রাণ নিয়ে নিরাপদে ফেবার পব ফ্ল্যাটের বেল বাজিয়ে যাচ্ছিল। কেউ সাড়া দিচ্ছিল না।

কী করছে সুচিরা এতক্ষণ? অবিজিত চিন্তিতভাবে দরজা ঠেলতেই অবাক হয়ে গেল। দরজা লক কবা। তাব মাথার মধ্যে ভিড় করে এল একটাব পব একটা প্রশ্ন। কিন্তু কোনোটারই লাগসই জবাব ভেবে পেল না। তাদের ফ্ল্যাটের উলটোদিকে দয়াময় দত্তর ফ্ল্যাট। অবিজিত এগিয়ে গেল।

দয়াময় দত্ত রিটায়ার্ড সরকারি চাকুরে। ভদ্রলোক ঘরেই ছিলেন। সোফার সামনে রাখা চকোলেট-রঙা বাহারি মোড়ায় দু পা তুলে দিয়ে টিভিতে বলিউডি নাচ দেখছিলেন। অবিজিতকে দেখে কয়েক সেকেন্ড তার দিকে অপলকে চেয়ে থেকে বলে উঠলেন, আপনার স্ত্রী? ও হ্যাঁ, কী যেন নাম নার্সিংহোমটাব? অ্যাই শুনছ?

—নার্সিংহোম? অবিজিত চমকে উঠল।

—কই গো? কোথায় রাখলে কাগজটা? বলতে বলতে দয়াময় দত্ত বিদ্যুৎ গতিতে ঘাড় ঘুরিয়ে গর্জন ছাড়লেন, ময়না! বেরিয়ে আয়! বেরিয়ে আয় বলছি!

বেডরুমের দবজাব পর্দা থেকে বেবিয়ে এল কাজের মেয়ে। রোগাটে গড়ন। মোটামুটি মিষ্টি মুখখানা। চটে-যাওয়া ফ্রকের প্রান্ত আঙুলে পাকাচ্ছিল। ভয় পেয়েছে। কয়েক সেকেন্ড মারমুখী ভঙ্গিতে চেয়ে থেকে দয়াময় দত্ত রাগে ফেটে পড়লেন তার ওপর, তোকে একদিন বারণ করেছি না লুকিয়ে লুকিয়ে টিভি দেখবি না? অসভ্য বদ! ফের যদি কোনোদিন দেখি ঘাড় ধরে বের করে দেব বাইরে। কই গো, একবার এসো না!

মেয়েটার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। তার দিকে চেয়ে হঠাৎ অবিজিতের পতিতাপল্লির একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। এই রকমই বয়েস। রানি তাকে দরজা টেনে চলে যাওয়ার খানিকক্ষণ পরে সে এসেছিল। অসম্ভব ফরসা গায়ের রং। মুখখানা অদ্ভুত ঢলঢলে। মেয়েটার পায়ে নূপুর ছিল। দরজাটা অল্প ফাঁক করে সে অবাক হয়ে দেখছিল অবিজিতকে। ওর দিকে চেয়ে অবিজিতের আফশোশ হচ্ছিল। ক্রমাগত যৌনপীড়ন একদিন এমন সুন্দর মেয়েকেও দেওয়ালের টিকটিকির মতো খসখসে করে দেবে।

—আবে গুড়িয়া ইধর ক্যা?

দড়াম করে দরজাটা খুলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন বছর তিরিশের যুবক। চোয়াল ঠেলে ওটা মুখ, চোখে একজোড়া জ্বলন্ত কাঠকয়লা। মেয়েটাকে একটা নোংরা গালি দিয়ে সে হুঙ্কার ছেড়েছিল, ভাগ্ হিয়া সে।

মেয়েটা ঝুনঝুন করে দৌড়ে চলে গিয়েছিল। ছেলেটা অবিজিতের দিকে চেয়ে হেসে উঠেছিল। দাঁত দেখে বোঝা যায় খইনি-পান-বিড়ি সবই চলে ওর। রহস্য করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল অবিজিতকে, ক্যা জি সব ঠিক হ্যায় না?

না, কিছুই ঠিক নেই। তবু অবিজিত ঘাড় নেড়েছিল। ছেলেটা দরজা টেনে দিয়ে চলে গিয়েছিল। তার পর আরও আধঘণ্টা তো হবেই। বাইরে থেকে ভেসে এসেছিল রেখার গলা, রানিদিদি, এই বেলা তোমার ভদ্দরনোককে বিদায় করো বাপু। আবার কখন লেগে যায় ঠিক কী।

ঘুপচি ঘরের ভেতরে তখন শ্বাস উঠে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল অবিজিতের। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল সে। তবে যাওয়ার সময় রানি তাকে মেনরোড পর্যন্ত আগিয়ে দিয়ে যায়।

—চেঁচাচ্ছ কেন? কে এসেছে?

হাত মুছতে মুছতে দত্তগিন্নি ঘরে এলেন। বয়েস পঁয়তাল্লিশের কিছু বেশিই। ঘরে ঢুকেই অবিজিতের দিকে চোখ পড়তেই ভুরু বেঁকে গেল তাঁর। বললেন, ও আপনি? আপনার স্ত্রী তো খুব অসুস্থ। নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হয়েছে। আপনার বাবা এসেছিলেন। মনে হয় আপনার ভায়রা—বেহালা না টালিগঞ্জে থাকে— এসেছিল। আপনি আজ কলেজে যাননি?

অবিজিতের মুখ থেকে রক্ত নেমে যাচ্ছিল। কোনোরকমে বলল, গিয়েছিলাম। তার পর একটা কাজে কলেজ স্ট্রিটে চলে যাই। সুচিরার হঠাৎ কী হল?

দত্তগিন্নির গলা চড়ল, হঠাৎ কী বলছেন? শুনলাম আপনার স্ত্রী অনেক দিন ধরে ভুগছেন। খুব বমি করছিল। হাই টেম্পারেচার, ব্লাডপ্রেশারও শুনলাম হঠাৎ করে ফল করে গিয়েছিল।

দয়াময় দত্ত টিভি থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না। বললেন, নার্সিংহোমের ঠিকানাটা দিয়ে দাও না।

নার্সিংহোমের ঠিকানা নিয়ে দয়াময় দত্ত ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বেরোতেই গতকাল বিকেলের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল অবিজিতের। ম্যালেরিয়া নিয়ে কথা হতে হতে সুচিরার কাছাকাছি হতেই সে চমকে উঠেছিল। বলেছিল, এ কী! তোমার গায়ে যে বেশ জ্বর চিরা!

—জ্বর! ও কিছু না। শীতের শুরুতে আমার হয়। জ্বরের ট্যাবলেট খেয়ে নিই, সেরে যায়। সুচিরা কথাটা যেন উড়িয়ে দিতে চাইছিল, আজ খাওয়া হয়নি।

অবিজিত রেগে উঠেছিল, সে কী? তুমি রোজ রোজ জ্বরের ওষুধ খাও?

সুচিরা অবিজিতকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছিল, না না যেদিন টেম্পারেচার ওঠে সেদিন। শীতটা পড়লেই ফিট হয়ে যাব দেখো! তুমি ভেব না।

সেই তো ভাবালে সুচিরা। অবিজিতের বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল।

নার্সিংহোমটা মেনরোডের ওপরেই। জায়গাটা খুব দূরে নয়, গাড়িও ছিল, তবু রাত নটা বেজে গেল অবিজিতের পৌঁছতে পৌঁছতে।

নার্সিংহোমের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন অবিজিতের বাবা অরুণোদয়বাবু। এ বয়সেও মাথাভর্তি চুল, যদিও সব পাকা। অবিজিতকে দেখে যেন হাঁফ ছাড়লেন, এসেছিস! ফ্ল্যাটে কখন ফিরলি?

—সুচিরার কী হয়েছে? অবিজিত পালটা প্রশ্ন করল।

অরুণোদয়বাবু সিগারেটে টান দিয়ে মাথা নাড়ালেন, ম্যালেরিয়া। কী করিস তোরা!

রাস্তা দিয়ে চলে গেল আপাদমস্তক মালে বোঝাই পাহাড়ের মতো বিশাল এক ট্রাক। বিস্ময়, বিরক্তি ও ভীতি মিশে গেল অবিজিতের কণ্ঠে, ম্যালেরিয়া! অ্যাবসার্ড!

—গাড়ি রাখ। অরুণোদয়বাবু সিগারেট ফেলে দিলেন, ওপরে চল্। তোর জন্য সকলে অপেক্ষা করছে।

—পাপাই কোথায়?

—ওকে ওর ঠাকুমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওর ঠাকুমা তো কিছুতে যাবে না। অনেক বলেকয়ে তবে পাঠানো গেছে।

দোতলার আই সি ইউতে সুচিরাকে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কারুর ও ঘরে যাওয়ার অনুমতি নেই। একটু দূরে করিডোরের কোণে টবে ডালপালা ছড়িয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পাতাবাহার গাছ। তার পাশে সার দিয়ে ফাইবারের মোল্ডেড চেয়ার। অবিজিতের ভায়রা প্রিয়ঙ্কর থমথমে মুখে বসে আছে। ওর স্ত্রী সুপ্রীতি পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

—অবিদা কোথায় ছিলেন আপনি? সুপ্রীতি কান্নাজড়ানো গলায় বলল, দিদি—

আই সি ইউ থেকে বেরিয়ে এল বয়স্কা নার্স। চেহারাখানা গোলগাল, ঈষৎ স্থূল। অবিজিত এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই তার মুখখানা বেঁকে গেল। খরখর করে উঠল, এতক্ষণে সময় হল আপনার আসার? পেশেন্ট তো সুবিধের নয়। ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া—বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখে দিয়েছিলেন? ভগবানকে ডাকুন।

সর্বাঙ্গে মেদের কম্পন তুলে মহিলা গটগট করে চলে গেলেন। রাগে-অপমানে অবিজিতের মুখ রাঙা হয়ে গেল।

অরুণোদয়বাবুও উঠে এসেছিলেন। অবিজিতকে বললেন, তুই এটা কী করলি অবি? দেখছিস চারদিকে ম্যালেরিয়া হচ্ছে—মিনিমাম রক্ত পরীক্ষাটা তো করাবি। ডাক্তাররা বলল, সুচিরার অ্যাটাক হয়েছে কম করে দশ দিন।

—তার জন্য আমি কী করব? অবিজিত রেগে উঠল, ওর যে এত শরীর খারাপ, আমাকে বলেছে সে ভাবে?

-- -বলবে কী? মুখচোরা মেয়ে—তোর ভয়েই বলেনি। অরুণোদয়বাবু মাথা নাড়ালেন, তোকে তো চিনি—সব সময় ফণা তুলে বসে আছিস। তোর এই সেন্টিমেন্টের জন্য তোর সঙ্গে আমাদের কোনোদিন পটল না।

---বাবা!

প্রিয়ঙ্কর এগিয়ে এসে পিঠে হাত রাখল অবিজিতের, আপনি চলুন আমার সঙ্গে। নীচে।

অবিজিত ঘুরল। দেখছে প্রিয়ঙ্করকে। চোখের পাতা পড়ছে না তার।

—কী হল, কী দেখছেন? প্রিয়ঙ্কর উদ্‌বিগ্ন হল।

অবিজিতের চোখে অদ্ভুত ছায়াচ্ছন্নতা। বলল, আজ কী বার বলো তো প্রিয়?

প্রিয়ঙ্কর চেয়ে রইল।

পরের দিন মঙ্গলবার। সকাল দশটা। ডাক্তার-নার্সদের ব্যস্ত ছোটাছুটি, ওষুধের গন্ধ, রংবেরঙের সারি সারি মোল্ডেড চেয়ার, মা ও সুপ্রীতির বুকফাটা কান্না এবং নিঃসঙ্গ নিষ্কম্প পাতাবাহার গাছ একাকার হয়ে গেল অবিজিতের মাথার মধ্যে। পাপাই বাইরের বাগানে দাদুর হাত ধরে ঘুরছিল। সিঁড়ি ভেঙে ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে এল সে।

– ড্যাড, এখনও মাম্মির ঘুম ভাঙল না?

অবিজিত চেয়ে রইল ছেলের দিকে। ভয় মানুষকে কুৎসিত করে তোলে। কিন্তু শোক? ডাক্তার আর নার্সরা একে একে বেরিয়ে আসছে আই সি ইউ থেকে। মৃত্যু এদের কাছে পেশাগত অভ্যাসের একটি। তবু যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডা. সেনশর্মা। বয়েস অল্প, রোগা রোগা গড়ন, চোখে চশমা নেই। অবিজিতের পিঠে হাত ছুঁইয়ে বললেন, আই অ্যাম সরি। যান ভেতরে, দেখে আসুন।

--কী দেখব? অবিজিত চেয়ে রইল।

ডা. সেনশর্মার মুখে বিষণ্ণতা ছায়া ফেলল। অরুণোদয়বাবুর দিকে চেয়ে 'একে দেখুন' বলে চলে গেলেন।

অরুণোদয়বাবু এগিয়ে এসে ছেলের হাত ধরলেন, চল্ দেখে আসবি।

—কী দেখব? কী? আচমকা চোখের ভেতর আগুন জ্বলে উঠল অবিজিতের, ডাক্তারদের অপদার্থতা, সরকারের ক্যালাসনেস, না কি সায়েন্টিস্টদের নির্বুদ্ধিতা? এই টোয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরিতেও মশার কামড়ে মানুষ মারা যাবে—সেটা আমাদের গিয়ে দেখতে হবে? তোমরা যাও, তোমরা যাও।

—ওহ্ অবি, শক্ত হ। যা হওয়ার হয়েছে। অরুণোদয়বাবু অবিজিতকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

—যা হওয়ার মানে? অবিজিত ভেঙে পড়ল, আলটিমেটলি ম্যালেরিয়া। ছি ছি ছি— আমি লোককে কী বলব? কীভাবে মুখ দেখাব তাদের কাছে? প্রোফেসর এ এম, তোমার কপালে এই ছিল!

অবিজিত তার জামার কলার চেপে ধরল। যেন নিজেই নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার। গত সপ্তাহের এই দিনের সঙ্গে আজকের দিনটার একটা মর্মান্তিক পার্থক্য হল, সে দিনও

সুচিবা বেঁচে ছিল, কিন্তু আজ কিছুক্ষণ পবেই সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। কোনোভাবেই কি সেই দিনটায় আব একবার ফিরে যাওয়া যায় না?

অবিজিত বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা কষ্ট অনুভব কবছিল। আকাশেব পাখিব দিকে চেয়ে মানুষ উড়তে পারে না বলে হয়তো এই রকম কষ্ট অনুভব কবে।

—দাদা, ওপরে সব রেডি। চল্।

সন্ধ্যা নামছে। চুল্লিঘবেব সিঁড়িতে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ছিল অবিজিত। ছোটোভাই অনুজিতেব গলা পেয়ে মুখ তুলল সে। চুল উশকোখুশকো, চোখে ক্লান্তি ও হতাশার ছাপ। এই কয়েক ঘণ্টাব মধ্যে তাব বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দব চেহারাখানা কেমন শুকিয়ে গেছে। শোক যদি আগুনেব মতো না-ও হয়, সিবিষ কাগজেব ঘষণ তো বটেই।

—অ্যাঁ?

অনুজিত বলল, চুল্লি খালি হয়ে গেছে। তোকে ডাকছে।

অনুজিতেব মাথার ঠিক ওপরে শ্মশানেব বিশ্রামকক্ষেব দেওয়াল। তাতে অজস্র মৃত মানুষেব আঁকিবুকি। অবিজিতেব চোখ ঘুবতে লাগল। অমব বায়। ইনিও কি মঙ্গলবাবে মাবা যান? সুজয় দত্ত—এ? শ্রীমতী মিনতি. অবিজিত উঠে পড়ল। চুল্লিঘবেব গেটেব সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়ঙ্কব। প্যান্ট-শার্ট, কোমবে গামছা তাব। গালে না কাটা দাড়ি, মাথাব চুল এলোমেলো। তাব মাথাব ওপবে অনুজিতেব মতো দেওয়াল-টেওয়াল নয় একঝাঁক মশা

অবিজিতেব গা শিবশিব কবে উঠল। এই বকম কোনো একটা কীট তাব সবচেয়ে কাছেব মানুষকে তাব কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশী আব বন্ধুবান্ধবেব কাছে তাব মাথা হেঁট কবে দিয়েছে। লোকেব কাছে সে এখন নিতান্ত দ্রষ্টব্য বস্তু, খববেব কাগজেব পক্ষে উত্তপ্ত ও উপাদেয় খোবাকমাত্র।

—চলো। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এগিয়ে গেল অবিজিত।

মিনিট পাঁচ। পিণ্ডদানেব কাজকর্ম মিটে যাওয়াব পব সুচিবাব দেহ থেকে সবিয়ে নেওয়া হচ্ছিল সমস্ত আচ্ছাদন। মুখ ঘুবিয়ে নিল অবিজিত।

চুল্লিঘবেব জানলায় বিনবিন কবছে একঝাঁক মশা। ভয়ংকব অথচ ক্ষুদ্র। প্রাণদাত্রী কিন্তু কী অদ্ভুত নিবাসক্ত। একজন সুন্দবী যুবতিকে কত সহজে সকলেব সামনে উলঙ্গ কবে দিচ্ছে। অথচ এই দেহে যখন প্রাণ ছিল তখন তাব আবরু বক্ষাব জন্য অবিজিতেব চেষ্টাব অন্ত ছিল না। বাতে বিছানায় শুয়ে সে কতদিন হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠেছে, কেউ বাইবে থেকে দেখে ফেলছে না তো সুচিবাকে?

সেটাও সম্ভবত মঙ্গলবাব ছিল একটা। সুপ্রীতিব সঙ্গে সুচিবা মার্কেটিংয়ে গিয়েছিল। ফেবাব সময় ওবা অটো নিয়েছিল। শুনে অবিজিত মৃদু ধমকেব সুবে সুচিবাকে বলেছিল, অটো। যাব তাব সঙ্গে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসেছিলে? শিট।

সেই মহামূল্যবান দেহকে পাতলা একটা কাপড়ে ঢেকে বাঁশেব চালিসুদ্ধ আস্তে আস্তে শুইয়ে দেওয়া হচ্ছে আগুন-মেশিনেব লোহাব পথেব ওপব। ঘড়াং কবে খুলে গেল চুল্লিব মুখ। ভেতবে লাল দগদগে আগুন নেচে নেচে উঠছে। নবকাগ্নি! নবকাগ্নি!

কিন্তু এ কী! ভেতবে কে বসে আছে? কাব মুখ ওখানে? বানি? হ্যাঁ স্পষ্ট। কালকেব মতো যেন টুলটা বাড়িয়ে দিয়ে সে এবাব অপেক্ষা কবছে সুচিবাব জন্য। অবিজিত থবথব করে কেঁপে উঠল। তাব মনে পড়ে গেল, কাল রানিব দিকে চেয়ে সে তখন কী ভাবছিল। ভাবছিল একটা শব্দেব মানে।

সেক্স-ওয়ার্কাব। যৌনকর্মী। ওব তখন মনে হচ্ছিল, এব চেয়ে নিষ্ঠুর বসিকতা আর কিছু হয না। এদেব জন্য একটাই উপযুক্ত শব্দ আছে ইংরেজিতে-বীচ। অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণায় সমস্ত অন্তরাত্মা গুটিয়ে পাকিয়ে যাচ্ছিল তার। ওব মনে হচ্ছিল, কতটা নীচ রুচি হলে মানুষ এইসব জায়গায় আসে! কতটা অকল্পনীয় ঘৃণ্য এবং অসুস্থ হলে তবেই এইসব নাবীব সামনে মানুষ উলঙ্গ হয়, ব্যভিচারে লিপ্ত হয।

লোহাব পথ সুচিবাকে নিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছে চুল্লির আগুনঘবেব ভেতর। চড় চড় কবে পুড়ে যাচ্ছে পাতলা আচ্ছাদন। ওই ওই সুচিবাব গালেব 'চার্মিং' আঁচিলটাব ওপব নবকেব আগুনেব ফুলকি ছিটকে উঠল। বানি 'আহা গো' বলে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিল তার।

—অবিজিতদা, সরে আসুন। বেশি সামনে যাবেন না। প্রিয়ঙ্কর বলে উঠল পেছন থেকে।

হুঁ, কাল সন্ধেয় তো আমি বেশিই সামনে চলে গিয়েছিলাম ওদের। একেবারে ওদের ঘরের ভেতর। প্রচণ্ড একটা ঘৃণা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল আমার সারা শরীর জুড়ে। বন্ধ হয়ে আসছিল দম। ম্যালেরিয়ার বীজাণু না কি আংটির মতো। সিফিলিসের কেমন? গণোরিয়া, এইডসের?

অবিজিত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, রানির পা থেকে মাথা পর্যন্ত কুৎসিত সব রোগের বীজাণু কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

—প্রিয় দেখছ— সব জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। সমস্ত। অবিজিত ফিসফিস করে উঠল।

প্রিয়ঙ্কর হাত ধরে টান দিল অবিজিতের, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি আসুন এ দিকটায়।

অবিজিত আবার ঘুরে গেল। চুল্লির দরজা বন্ধ হচ্ছে। ভেতরে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে শত বর্তুজিব লেহন করতে শুরু করেছে সুচিরাকে। রানি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে যেন বলছে, আর একটু কষ্ট কর্ মেয়ে। প্রথমটা পুড়তে বড়ো লাগে মা। তার পরে সব সয়ে যায়।

—প্রিয়, নরকের কীট কী রকম জানো? অবিজিত বলল।

—নরকের কীট!

হ্যাঁ। দে আর অবভিয়াসলি ফিমেল ইন সেক্স। যেমন ধরো স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা। এরা মানুষকে নরকের পথ দেখায় ঠিকই, স্টিল নরকেও তারা মানুষের সঙ্গে থেকে যায়। কাকে তুমি ঘেন্না করবে প্রিয়?

অবিজিত অপ্রকৃতিস্থের মতো হা হা করে হেসে উঠল।

সেদিন রাত নটা। গলির মুখে সেজেগুজে খদ্দেরের অপেক্ষায় অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল রানি। আগের দিনের মোটামুটি সব মেয়েকেই দেখা যাচ্ছিল। রেখাও ছিল। আজ তার পরনে খাটো স্কার্ট। অবিজিতের সঙ্গে আজ গাড়ি নেই। হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে এল সে তাদের কাছে।

— নাও গো রানিদিদি, তোমার ভদ্দরলোক এসে গেছে। রেখা মন্তব্য করল।

আহা, একদিনেই ভদ্দরলোকের কী ছিরি হয়েছে গো? সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে। আর একজন বলল

- তোরা থাম তো। রানি হাত তুলে তার সঙ্গিনীদের থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনি কিছু বলবেন বাবু? কাল ঠিকঠাক বাড়ি পৌঁছেছিলেন তো?

- একদম ঠিক। বিষণ্ণ হাসল অবিজিত। বলল, চলো ভেতরে।

—এখন? রানির ভুরু কুঁচকে উঠল, আমার এখন ধান্দাপানির সময়।

—আরে যাও না গো রানিদিদি, অত করে বলছে। রেখা বলল।

রানি খুশি হল না। কিন্তু কী ভেবে 'আচ্ছা চলেন' বলে অবিজিতকে নিয়ে ঘরে এল। পাশের ঘর থেকে আজ টেপ রেকর্ডারের উদ্দাম শব্দ ভেসে আসছিল। অবিজিত চৌকির ওপর উঠে বসল। রানি দেখছে তাকে। অস্পষ্ট আলোয় ঘরের ভেতর এখানে ওখানে ওড়াউড়ি করছিল ঘাতক কীট। উড়ুক। অবিজিত একবারও পা ঠুকল না।

রানির ভুরু কুঁচকে উঠল, আপনার কী হয়েছে?

— আমার? অবিজিত মাথা ঝাঁকাল, কিছু না। কিছু না।

— হয়েছে। ঠিক করে বলেন, বাবু, কী হয়েছে আপনার।

অবিজিত থরথর করে কেঁপে উঠল। গলাও কাঁপতে শুরু করল তার, কিছু না, কিছু না। কাল খাইনি। আজ তোমার হাতে জল খেতে এসেছি শুধু।

রানি যেন চমকে উঠল, আমাদের হাতে আপনারা জল খাবেন? আমরা তো খারাপ মেয়েছেলে।

—তাতে কী হয়েছে? সুচিরাও তো খেল। চুল্লির ভেতর অনেকক্ষণ ধরে পুড়ে পুড়ে ওর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তুমিই তো তাকে জল দিলে। আমাকেও দাও, আমাকেও দাও রানি।

অবিজিত মুখ ঢেকে ফেলল। রানি অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ঃ জন্মস্থান কলকাতাব জোড়াসাঁকো। বাংলা সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, শিক্ষা, বাজনীতি, ধর্ম-বিজ্ঞান, নাটক, প্রহসন, ভ্রমণ কাহিনি, দিনলিপি, সাহিত্যেব এমন কোনো বিষয় নেই যাতে তাঁব সৃজনশীলতাব ছাপ পড়ে নি। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুবস্কাব পান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ গীতাঞ্জলি, সোনাব তবী, লিপিকা, বলাকা, গোবা, চোখেব বালি, কালান্তব, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি।

চিত্তবঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ঃ জন্মস্থান কলকাতা। বিখ্যাত ব্যাবিস্টাব, পবে আইন ব্যবসা ত্যাগ কবে দেশেব স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাহিত্যে তাঁব প্রবল অনুবাগ ছিল। 'নাবায়ণ' নামেব মাসিক সাহিত্যপত্র পবিচালনা কবতেন। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ বচনায় পটু ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ সাগব সঙ্গীত, মালঞ্চ, অন্তর্যামী ইত্যাদি।

প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায (১৮৭৩-১৯৩২) ঃ জন্মস্থান বর্ধমান জেলাব ধাত্রীগ্রাম। ব্যাবিস্টাব। ভাবতী পত্রিকাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রীমতী বাধামণি দেবী ছদ্মনামে লিখে কুন্তলীন পুবস্কাব লাভ কবেন। মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকাব সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বত্নদীপ, অভিশাপ, গল্পবীথি, দেশি ও বিলাতি সিঁদুব কৌটা প্রভৃতি।

শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায (১৮৭৬-১৯৩৮) ঃ জন্মস্থান হুগলি জেলাব দেবানন্দপুব। মাতুলালয ভাগলপুব বাসেব সময়ে সাহিত্য বচনা শুরু। ১৯০৩ সালে জীবিকাব সন্ধানে ব্রহ্মদেশে যান। প্রকৃতপক্ষে সেখানেই তাঁব সাহিত্য বচনাব দিগন্ত খুলে যায। বাংলাব অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্রীকান্ত (৪টি পর্ব), শেষপ্রশ্ন, গৃহদাহ, পথেব দাবী, চবিত্রহীন দেবদাস ইত্যাদি।

পবশুরাম (বাজশেখব বসু) (১৮৮০-১৯৬০) ঃ জন্মস্থান বর্ধমান জেলাব বামুনপাড়া। বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস-এব ডিবেক্টাব ছিলেন। বাঙ্গ গল্প বচনায সহজাত নৈপুণ্য তাঁকে অচিবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি ববীন্দ্র স্মৃতি পুবস্কাব ও একাডেমি পুবস্কাব পেয়েছেন। পদ্মভূষণ সম্মান ও। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ গড্ডলিকা, কজ্জলী, কৃষ্ণকলি, আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প। হনুমানেব স্বপ্ন ইত্যাদি। চলন্তিকা নামে বাংলা অভিধান গ্রন্থ সংকলিত কবেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪) ঃ সাংবাদিক- সাহিত্যিক। দৈনিক হিন্দুস্থান-এব সাংবাদিক। বৈকালী, যাদুঘর, জাহ্নবী পত্রিকায সম্পাদনার কাজ কবেছেন। 'বেতাব জগৎ' পত্রিকাব প্রথম সম্পাদক। চলচ্চিত্রেব সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। চিত্রনাট্য বচনা ও পবিচালনা কবেছেন অনেক ছবিব। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মহাস্থবির জাতক (৩ খণ্ড), বাজীঘব, চাষাব মেয়ে, আনাবকলি ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ঃ জন্মস্থান উত্তব ২৪ পবগনা জেলাব মুবাতিপুব। নানা ধবনেব পেশায় যুক্ত থাকলেও শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘকাল। প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী প্রকাশিত হওযার পরই বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান পাকা হয়। তিনি রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পথেব পাঁচালী, ইছামতী, আরণ্যক, দৃষ্টি প্রদীপ, চাঁদের পাহাড়, কিন্নবদল ইত্যাদি।

রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪-১৯৬৩) ঃ জন্মস্থান কলকাতা। পেশায় কবিরাজ, সাহিত্য তাঁর নেশা। সাহিত্য সেবক সমিতি নামে এক সমিতি গড়ে সাহিত্যিকদের স্বার্থে নানাবিধ কাজ করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কুরপালা, সাদা ঘোড়া, চক্রবাক, সাগ্নিক ইত্যাদি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ঃ জন্মস্থান বীরভূম জেলার লাভপুর। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী। প্রথম জীবনে কিছুকাল সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত থাকলেও পরে সাহিত্যকর্মে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সৃজনশীলতার জন্য রবীন্দ্র স্মৃতি, একাডেমি, ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, আরোগ্য নিকেতন, কবি, জলসাঘর, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা ইত্যাদি।

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) (১৮৯৯-১৯৭৯) ঃ জন্মস্থান পূর্ণিয়া জেলার মণিহারি। পেশায় ডাক্তার-প্যাথোলজিস্ট। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত। তিনি রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ স্থাবর, জঙ্গম, ডানা (৩ খণ্ড), হাটেবাজারে, পশ্চাৎপট ইত্যাদি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) ঃ জন্মস্থান বিহারের পূর্ণিয়া। আইন ব্যবসা ছেড়ে সাহিত্য রচনাকেই পেশা করেন। দীর্ঘদিন হিন্দি চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনি ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কাহিনি রচনায় অত্যন্ত দক্ষ। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বাংলা সাহিত্যে তাঁর সৃষ্ট বিখ্যাত চরিত্র। তিনি রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ তুঙ্গভদ্রার তীরে, গৌড়মল্লার, বিষের ধোঁয়া, সদাশিব তিনকাণ্ড, চুয়াচন্দন ইত্যাদি।

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭) ঃ জন্মস্থান যশোহর জেলার ডোঙাঘাটা। প্রথমজীবনে শিক্ষকতা করেছেন। পরে বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলেন। বাংলা কথাশিল্পীদের মধ্যে অগ্রণী। আকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ নিশিকুটুম্ব, ভুলি নাই, বাঁশের কেল্লা, নরবাঁধ, বনমর্মর, চীন দেখে এলাম ইত্যাদি।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) ঃ জন্মস্থান কাজির পাড়া, চট্টগ্রাম। প্রথমে বিভিন্ন স্কুল, পরে সরকারি কলেজে শিক্ষকতা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন প্রবীণ বয়সে। মূলত চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। গল্প উপন্যাস ও নাটকও লিখেছিলেন। "রেখাচিত্র" তাঁর অনবদ্য আত্মজীবনী। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চৌচির, জীবপথের যাত্রী; শ্রেষ্ঠ গল্প; স্বয়ম্বরা; মানবতন্ত্র, সমকালীন চিন্তা, সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) ঃ জন্মস্থান মালদহ জেলার চাঁচোল। রঙ্গব্যঙ্গ রচনায় বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তক। বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি, বাড়ি থেকে পালিয়ে, ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, ইতুর থেকে ইত্যাদি, প্রেমের বিচিত্র গতি প্রভৃতি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) ঃ জন্মস্থান নোয়াখালি, বিচারকের চাকরি করতেন। কল্লোল পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার। কথাসাহিত্য ও কবিতায় অনায়াস পারদর্শিতা। জীবনী সাহিত্য রচনায় নতুন যুগ এনেছিলেন। রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বেদে, কাকজ্যোৎস্না, উত্তরায়ণ, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, জৈষ্ঠের ঝড়, মৃগ নেই মৃগয়া ইত্যাদি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) ঃ জন্মস্থান বারানসী। কথাসাহিত্য, কবিতা, শিশুসাহিত্যের সব্যসাচী লেখক। বিচিত্র ধরনের জীবিকা গ্রহণ ও বর্জন করেছেন। সাহিত্য ছাড়াও চলচ্চিত্র পরিচালনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অন্যতম গোষ্ঠীপতি। আকাডেমি ও রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ সাগর থেকে ফেরা, সম্রাট, বেনামী বন্দর, ভাবীকাল, পুতুল ও প্রতিমা, অফুরন্ত ঘনাদা ইত্যাদি।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) ঃ জন্মস্থান উড়িষ্যার ঢেঙ্কানল। আই.সি.এস পদাধিকারী প্রশাসক। কবিতা ও কথাসাহিত্যকার। চমৎকার ছড়া লিখিয়ে। একাডেমি ও বিদ্যাসাগর পুরস্কারপ্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পথে প্রবাসে, জাপানে, উড়কি ধানের মুড়কি, আগুন নিয়ে খেলা, রত্ন ও শ্রীমতী ইত্যাদি।

সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪-১৯৭৪) ঃ জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। বহুভাষাবিদ। কৌতুককাহিনি ও করুণরসের সফল লেখক। ভ্রমণ কাহিনিতে অনবদ্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, শবনম, টুনিমেম ইত্যাদি।

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩) ঃ জন্মস্থান কলকাতা। রম্য ভ্রমণকাহিনির প্রথম লেখক। জীবিকার প্রয়োজনে নানা ঘাটে ঘুরেছেন। শেষে সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক। এক সময়ের জনপ্রিয় কথাশিল্পী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মহাপ্রস্থানের পথে, দেবতাত্মা হিমালয়, প্রিয় বান্ধবী, হাসুবানু, নদ ও নদী, বনস্পতির বৈঠক ইত্যাদি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) ঃ জন্মস্থান দুমকা, প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার। মূলতঃ সাহিত্যরচনাই ছিল তাঁর জীবিকা। বাস্তবতা, সমাজ সচেতনতা, মনের জটিলতার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পদ্মানদীর মাঝি, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, জননদী, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, প্রাগৈতিহাসিক ইত্যাদি।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪) ঃ জন্মস্থান কলকাতা। বাংলার বিশিষ্ট কথাশিল্পী, গ্রাম্যজীবনের গল্পকার। আকাডেমি ও রবীন্দ্রস্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কলকাতার কাছেই, পৌষ-ফাগুনের পালা, পাঞ্চজন্য, রাত্রির তপস্যা, উপকণ্ঠে ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ঃ জন্মস্থান কুমিল্লা, বিখ্যাত কবি, গল্পকাব, প্রবন্ধ লেখক, অধ্যাপক। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক এবং প্রগতি নামক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ তিথিডোর, দ্রৌপদীর শাড়ি, অনাম্নী অঙ্গনা, রাতভোর বৃষ্টি, পৃথিবীর পথে, তপস্বী ও তরঙ্গিনী প্রভৃতি।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) ঃ জন্মস্থান হাজারিবাগ। নানা ধবনের পেশার শেষে সাংবাদিকতায় থিতু। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত ছিলেন। প্রখ্যাত গদ্যশিল্পী। রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ফসিল, পরশুরামের কুঠার, ভারত প্রেমকথা, তিলাঞ্জলি, কিংবদন্তীর দেশে ইত্যাদি।

বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১) ঃ জন্মস্থান কলকাতা। বিশিষ্ট কথাশিল্পী। সাহেব বিবি গোলামের গল্পকার। রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বেগম-মেরী বিশ্বাস, আসামী হাজির, পুতুলদিদি, দিনের পরে দিন, চলো কলকাতা ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২) ঃ জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা। নানা ধরনের জীবিকা ছিল তাঁর। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ সূর্যমুখী, শালিখ কি চড়াই, বারোঘর এক উঠোন, প্রেমের চেয়ে বড়, মীরার দুপুর, এই তার পুরস্কার ইত্যাদি।

প্রতিভা বসু (১৯১৫-) ঃ জন্মস্থান ঢাকা। একদা কণ্ঠশিল্পী পরে কথাশিল্পী। বুদ্ধদেব বসুর সহধর্মিনী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মনের ময়ূর, মাধবীর জন্য, রাঙা-ভাঙা চাঁদ, বনে যদি ফুটল কুসুম, মধ্যরাতের তারা, জীবনের জলছবি ইত্যাদি।

নবেন্দু ঘোষ (১৯১৬-) ঃ জন্মস্থান ঢাকা, সাহিত্য রচনা ছাড়াও চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ফিয়ার্স লেন, ডাক দিয়ে যাই, নহে ফুলহার, পাপুই দ্বীপের কাহিনী, মালা পরার খেলা ইত্যাদি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-১৯৭৫) ঃ জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার সরবদিগ্রাম। বাংলার বিশিষ্ট কথাশিল্পী, আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ চেনা মহল, সূর্য-সাক্ষী, তিনদিন তিনরাত্রি, দ্বীপপুঞ্জ, ধূপকাঠি, মলাটের রঙ ইত্যাদি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) ঃ জন্মস্থান দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গি। প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কৃতী ছাত্র, জনপ্রিয় অধ্যাপক। টেনিদার স্রষ্টা। কবিতা লিখতেন, কথাশিল্পে খ্যাতনামা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ শিলালিপি, বীতংস, উপনিবেশ, পদসঞ্চার, পঞ্চাননের হাতি ইত্যাদি।

মির্জা আবদুল হাই (১৯১৯) ঃ জন্মস্থান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ছায়া প্রচ্ছায়া, বিস্ফোরণ ইত্যাদি।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৯৯) ঃ জন্মস্থান কলকাতা। বিচিত্র কর্মজীবন। কারখানা থেকে জাহাজ কোম্পানি। শেষে পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আধিকারিক। বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বন্দরে বন্দরে, জনপদবধূ, দ্বিতীয় অন্তর, সীমান্ত শিবির, তোমার পতাকা, নাট্য দেউলের বিনোদিনী ইত্যাদি।

সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) ঃ জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি শহরে। সাংবাদিক-সাহিত্যিক। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক ছিলেন। আকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কিনু গোয়ালার গলি, শ্রীচরণেষু মাকে, নানা রঙের দিন, চিনেমাটি, শুকসারি ইত্যাদি।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৭২) ঃ জন্মস্থান বাংলাদেশের বগুড়া। সাংবাদিকের কাজ করেছেন বিভিন্ন দৈনিক পত্রে। শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি, রাম ও রহিম, তিমিরাভিসার, নিকষিত হেম, মিশ্ররাগিণী ইত্যাদি।

বিমল কর (১৯২১-২০০৩) ঃ জন্মস্থান শাঁখচূড়া, টাকি। আনন্দবাজাব গোষ্ঠীর দেশ পত্রিকার সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। আকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পূর্ণ অপূর্ণ, অসময়, দেওয়াল, যদুবংশ, গ্রহণ, আঙুরলতা ইত্যাদি।

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২) ঃ জন্মস্থান খড়গপুর। আনন্দবাজার পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক। আকাডেমি ও রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ খারিজ, এই পৃথিবী পান্থনিবাস, লালবাঈ, এখনই, যে যেখানে দাঁড়িয়ে, অরণ্য আদিম ইত্যাদি।

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) ঃ জন্মস্থান ঢাকা জেলাব বাজনগর। বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন। প্রধানত সাহিত্যিক। মহানগর নামে একটি বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন কিছুকাল। কালকূট ছদ্মনামের আড়ালে অনেক ভ্রমণোপন্যাস লিখেছেন। আকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ শাম্ব, বি.টি. রোডের ধারে, বিবর, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে, কোথায় পাব তারে ইত্যাদি।

মিহির সেন (১৯২৬-) ঃ জন্মস্থান বরিশাল জেলার শোলক গ্রাম। নানা ধরনের লেখায় দক্ষ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ শেষ তিনদিন, কাগজের দেওয়াল, আরো একজন, লেনিনের মা, লোকহাসানো লোকটি ইত্যাদি।

ইন্দ্র মিত্র (১৯২৮-) ঃ প্রকৃত নাম অরবিন্দ গুহ, সে নামে কবিতা লিখে থাকেন। রসিক গল্পকার। বিশেষ ধরনের ইতিহাস চর্চায় অক্লান্ত। রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, সাজঘর, নিত্য নূতন, নিপাতনে সিদ্ধ, নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ইত্যাদি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-) ঃ জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্যও অনেক লিখেছেন। আকাডেমি এবং বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ অলীক মানুষ, নিষিদ্ধ প্রান্তর, তোমার বসন্ত দিনে, রানীঘাটের বৃত্তান্ত, রহস্যভেদী কর্ণেল, নিষিদ্ধ অরণ্য ইত্যাদি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১) ঃ জন্মস্থান খুলনা। এ যুগের অন্যতম শক্তিশালী কথাশিল্পী। আনন্দবাজার, অমৃত, আজকাল পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। আকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ শাহজাদা দারাশুকো, বৃহন্নলা, হিমপড়ে গেল, পরস্ত্রী, হাওয়া গাড়ি ইত্যাদি।

চিত্ত ঘোষাল (১৯৩৩-) ঃ জন্মস্থান আসামের হালসিয়া চা বাগান। বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ক্ষুধা ও অন্যান্য গল্প, স্বদেশপ্রেম, নায়কের মতো, রন্ধ্রে রন্ধ্রে গান, ঘোড়সওয়ার ইত্যাদি।

প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪-) ঃ জন্মস্থান ঢাকা। অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী। এবারে আকাডেমি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। ইতিপূর্বে বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন। যুগান্তর পত্রিকায় বিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ক্রান্তিকাল, কেয়াপাতার নৌকো (২য় খণ্ড), সিন্ধুপারে পাখি, পূর্ব পার্বতী, মহাযুদ্ধের ঘোড়া, নোনা জল মিঠে মাটি ইত্যাদি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-) ঃ জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার আসগ্রাম। দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত। কবিতা ও কথাসাহিত্য রচনায় সমান দক্ষ। আকাডেমি ও বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পূর্ব-পশ্চিম, সেই সময়, মহাপৃথিবী, হঠাৎ নীরার জন্য, ভয়ঙ্কর সুন্দর ইত্যাদি

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-) ঃ জন্মস্থান রঙপুর জেলার কুড়িগ্রাম। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ শীতবিকেল, রক্ত গোলাপ, আনন্দের মৃত্যু, এক মহিলার মৃত্যু, খেলারাম খেলে যা, আয়নাবিবির পালা ইত্যাদি।

আল মাহমুদ (১৯৩৬-) ঃ জন্মস্থান কুমিল্লার মোড়ালি গ্রাম। প্রধানত কবি, তবে কথাসাহিত্যশিল্পীও। কবিতার জন্য বাংলা আকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পানকৌড়ির রঙ, জলের কলস, সায়্যারি, পর্দা দুলে ওঠো, পাখির কাছে ফুলের কাছে ইত্যাদি।

শওকত আলি (১৯৩৬) ঃ জন্মস্থান উঃ দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ। বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গল্পকার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ উপকূল বাসনা, লেলিহান স্বাদ, পিঙ্গল আকাশ, যাত্রা, টুনকু নামে হাড়ি ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব গুহ (১৯৩৬) ঃ জন্মস্থান কলকাতা। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। খ্যাতনামা কথাশিল্পী। কিছু কবিতা ছড়াও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মাধুকরী, একটু উষ্ণতার জন্যে, চানঘরে গান, কোয়েলের কাছে, হলুদ বসন্ত, ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ইত্যাদি

আবদুশ শাকুর (১৯৪১) ঃ জন্ম বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার বামেশ্বরপুরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ, হেগ থেকে এম. এস। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বাংলা ছোটোগল্পে বাংলা আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ক্রাইসিস, উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ, ক্ষীয়মান, এপিটাফ, ধস, চুয়াত্তরের কড়চা, প্রভৃতি।

অশোক কুমার সেনগুপ্ত (১৯৪১) ঃ জন্মস্থান বীরভূম জেলায়। গ্রামজীবনের চিত্ররূপায়ণে সিদ্ধহস্ত কথাশিল্পী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ধর্ম নদী, যে কোনো নিশীথে, সামনে নদী ইত্যাদি।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪২) ঃ জন্মস্থান২৪ পরগনা জেলা। বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক। কবিতা ও কথাসাহিত্য রচনায় নিপুণ। বাংলা আকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত। প্রকাশিতগ্রন্থ ঃ জ্যোৎস্না রৌদ্রে চিকিৎসা, সত্যের মতো বদনাম, মৃত্যুর অধিক, লাল ক্ষুধা, পোড়ামাটির বাজ ইত্যাদি।

বিপ্রদাস বড়ুয়া (১৯৪২) ঃ জন্মস্থান চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের অগ্রণী লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ অচেনা, সূর্য লুটের গান, কাছের পাখি দূরে পাখি ইত্যাদি।

সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪) ঃ জন্মস্থান বরিশাল জেলার শোলন গ্রামে। পেশায় শিক্ষক। একালের অন্যতম কথাকার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মনোনয়ন, মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন, পক্ষ বিপক্ষ, গহীন গাঙ, দুই ঠিকানা ইত্যাদি।

তৃষিত বর্মণ (১৯৪৬) ঃ জন্মস্থান হুগলি জেলার সিঙ্গুর। নানাধরনের লেখা লিখে থাকেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ প্রতিপক্ষ, প্রত্যাবর্তন, তুরুপের তাস, ইত্যাদি।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭) ঃ জন্মস্থান বাংলাদেশের সাতক্ষীরার কলাবোয়া। পঃ বঃ সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের অধিকর্তা। কবিতা ও কথাসাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত। বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ নদী-মাটি-অরণ্য (৩য় খণ্ড), বাংলার মুখ। শিকড়ের খোঁজে, শঙ্খচিলের ডানা, টাঁড় বাংলার উপাখ্যান ইত্যাদি।

পীযূষ ভট্টাচার্য (১৯৪৮) ঃ চাকরিজীবী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কুশপুত্তলিকা, কীর্তিসুখ, পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প ইত্যাদি।

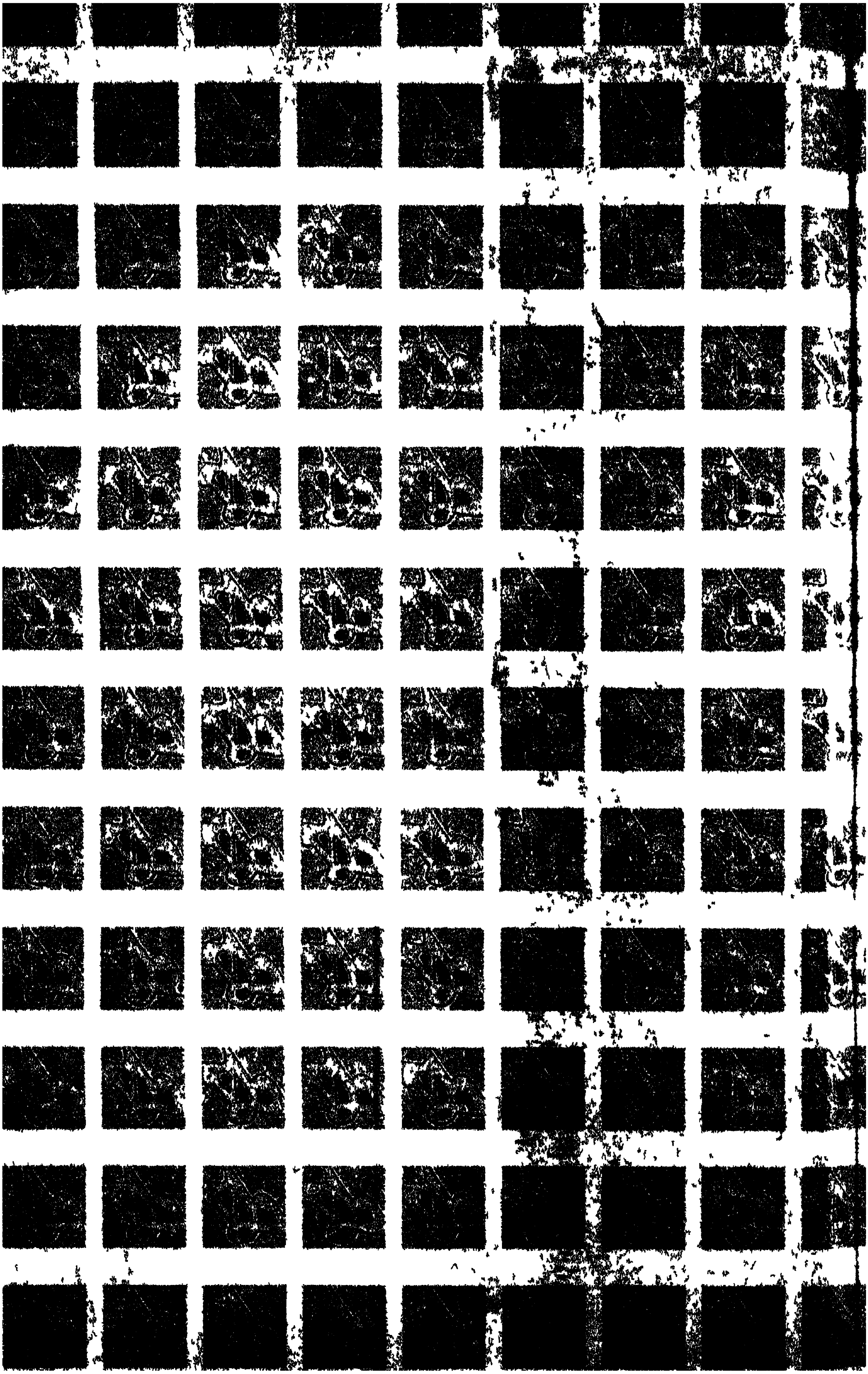
হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮) ঃ জন্মস্থান ময়মনসিং জেলার কুতুবপুর। বর্তমানকালে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক। উপন্যাসের জন্য বাংলা আকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ নিশিকাব্য, নন্দিত নরকে, আগুনের পরশমণি, এই সব দিনরাত্রি, ময়ূরাক্ষী, অমানুষ ইত্যাদি।

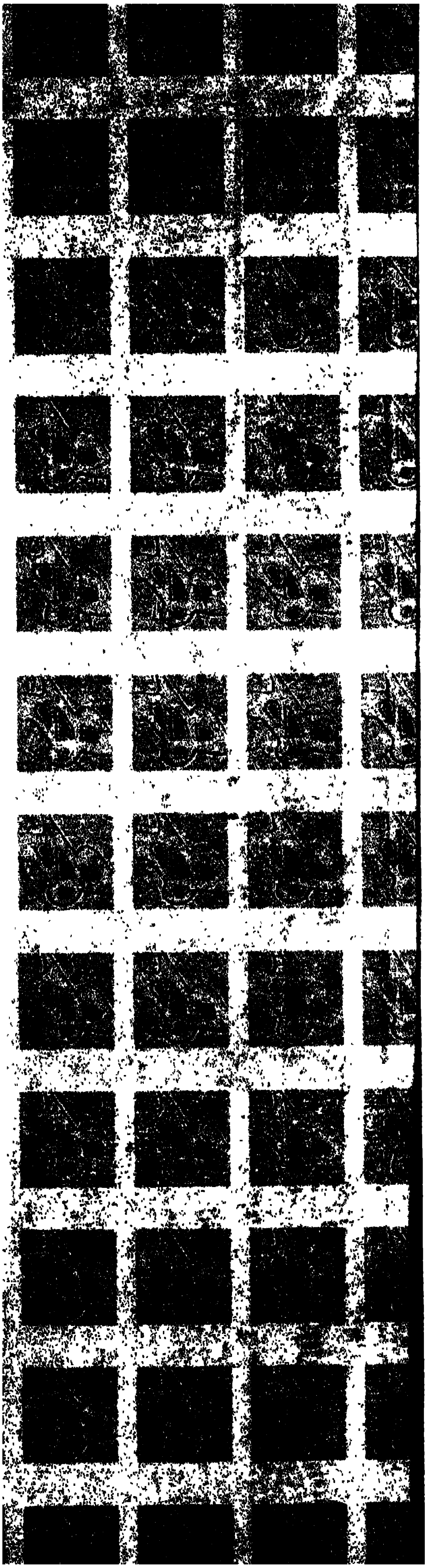
বীরেন শাসমল (১৯৫২) ঃ জন্মস্থান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কিয়া গ্রাম। চাকরিজীবী। তীব্র কুঠার পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পানপাতা মুখ, সাদ্দামের জন্য বাঙ্কার কবির জন্য তাকিয়া, ভাইরাস ভাইরাস, মাছেরা ইত্যাদি।

মধুময় পাল (১৯৫২) ঃ জন্মস্থান ঢাকা। পেশা সাংবাদিকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আলিঙ্গন দাও রানি, রক্তকরবী, বাত্রির পরিধি, সাহেব গলি ইত্যাদি।

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত (১৯৫৮) ঃ জন্মস্থান শ্রীরামপুর। পেশা অধ্যাপনা।

শুভমানস ঘোষ (১৯৫৮) ঃ জন্মস্থান সালকিয়া, হাওড়া। পেশা অধ্যাপনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ গল্প অল্প স্বল্প, ঝড় ঝঞ্ঝা, সিংহারণ্যে সাংঘাতিক ইত্যাদি।





যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, আবুল ফজল, শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার, সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রতিভা বসু, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মির্জা আবদুল হাই, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, মিহির সেন, ইন্দ্রমিত্র, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষাল, প্রফুল্ল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, শওকত আলী, বুদ্ধদেব গুহ, আবদুশ শাকুর, অশোককুমার সেনগুপ্ত, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বিপ্রদাস বড়ুয়া, সাধন চট্টোপাধ্যায়, তৃষিত বর্মণ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, পীযূষ ভট্টাচার্য, হুমায়ুন আহমেদ, বীরেন শাসমল, মধুময় পাল, সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত, শুভমানস ঘোষ।